বর্ষ ১৮ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮ · ১৮৮৩ শক

সংখ্যা ২

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বর্ষ ১৮ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮ · ১৮৮৩ শক

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বর্ষ ১৮ সংখ্যা ২ কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮ · ১৮৮৩ শক

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮ · ১৮৮৩-৪ শক

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী পরপৃষ্ঠায়

মূল্য এক টাকা

চিত্রসূচী

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯ · ১৮৮৪ শক

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী পরপৃষ্ঠায়

মূল্য এক টাকা

চিত্রসূচী

পুষ্পচয়িনী

শিল্পী শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৮ সংখ্যা ১ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮ · ১৮৮৩ শক

চিঠিপত্র রাজশেখর বসুকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

এতদিন পরে বাঙ্‌লা ভাষার অভিধান পাওয়া গেল। পরিশিষ্টে চলন্তিকায় বাঙ্‌লার যে সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ দিয়েচেন তাও অপূর্ব্ব হয়েচে।

প্রাকৃত বাংলার বানান সম্বন্ধে আমার একটা বক্তব্য আছে। ইংরেজি ভাষার লিখিত শব্দগুলি তাদের ইতিহাসের খোলস ছাড়তে চায় না— তাতে করে তাদের ধ্বনিরূপ আচ্ছন্ন। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রাকৃত এ পথের অনুসরণ করেনি। তার বানানের মধ্যে অবঞ্চনা আছে, সে যে প্রাকৃত, এ পরিচয় সে গোপন করেনি। বাংলা ভাষায় ষত্বণত্বের বৈচিত্র্য ধ্বনির মধ্যে নেই বল্‌লেই হয়। সেই কারণে প্রাচীন পণ্ডিতেরাও পুঁথিতে লোকভাষা লেখবার সময় দীর্ঘহ্রস্ব ও ষত্বণত্বকে সরল করে এনেছিলেন। তাঁদের ভয় ছিলনা পাছে সেজন্য তাঁদের কেউ মূর্খ অপবাদ দেয়। আজ আমরা ভারতের রীতি ত্যাগ করে বিদেশীর অনুকরণে বানানের বিড়ম্বনায় শিশুদের চিত্তকে অনাবশ্যক ভারগ্রস্ত করতে বসেচি।

ভেবে দেখলে বাঙ্‌লা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ একেবারেই নেই। যাকে তৎসম শব্দ বলি উচ্চারণের বিকারে তাও অপভ্রংশ পদবীতে পড়ে। সংস্কৃত নিয়মে লিখি সত্য কিন্তু বলি শোত্তো। মন শব্দ যে কেবল বিসর্গ বিসর্জ্জন করেচে তা নয় তার ধ্বনিরূপ বদ্‌লে সে হয়েছে মোন্‌। এই যুক্তি অনুসারে বাংলা বানানকে আগাগোড়া ধ্বনি অনুসারী করব এমন সাহস আমার নেই— যদি বাংলায় কেমাল পাশার পদ পেতুম তা হলে হয়তো এই কীর্ত্তি করতুম— এবং সেই পুণ্যে ভাবীকালের অগণ্য শিশুদের কৃতজ্ঞতাভাজন হতুম। অন্তত তদ্ভব শব্দে যিনি সাহস দেখিয়ে ষত্বণত্ব ও দীর্ঘহ্রস্বের পণ্ডপাণ্ডিত্য ঘুচিয়ে শব্দের ধ্বনিস্বরূপকে শ্রদ্ধা করতে প্রবৃত্ত হবেন তাঁর আমি জয়জয়কার করব। যে পণ্ডিতমূর্খরা "গভর্নমেণ্ট্‌" বানান প্রচার করতে লজ্জা পাননি তাঁদেরই প্রেতাত্মার দল আজো বাংলা বানানকে শাসন করচেন—এই প্রেতের বিভীষিকা ঘুচবে কবে? কান হোলো সজীব বানান, আর কাণ হোলো প্রেতের বানান একথা মানবেন তো? বানান সম্বন্ধে আমিও অপরাধ করি অতএব আমার নজীর কোনো হিসাবে প্রামাণ্য নয়। ইতি ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

আপনার গুণগ্রাহী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৩

১০ই অক্টোবর ১৯২৭, সোমবার। প্রাতরাশের পরে আমরা অপেক্ষা করলুম— দশটার সময় এখানকার যুদ্ধবিগ্রহের আর সামুদ্রিক সেনা বিভাগের মন্ত্রী নগর-স্বর্গ (নাখোন্-সাৱংখ্)-এর রাজকুমারের সঙ্গে শিষ্টাচার-সম্মত সাক্ষাৎ ক'রতে নিয়ে গেল। এই রাজকুমার জার্মানিতে শিক্ষা পেয়ে এসেছিলেন, এঁরই মা যাঁর নাম শ্যামীভাষায় সুখুমাল্ বা সুখুমান্ মারাসিরি, তাঁরই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান হবে, এবং তাঁরই মৃত্যুর জন্য এই কয়মাস শ্যামজাতি অশৌচ পালন ক'রছে। নগর-স্বর্গের রাজকুমার অতএব মহারাজ চূড়ালংকারের অন্যতম পুত্র বিধায়, এখনকার রাজার এক পিতৃব্য— যেমন রাজকুমার ধনীনিৱাৎ। রাজকুমারের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাওয়ার পথে রাজা চূড়ালংকারের ব্রোঞ্জে তৈরী অশ্বারোহী মূর্তির পাদপীঠে সমবেত হ'লুম, কবি সেখানে আধুনিক শ্যামের স্রষ্টা এই রাজার স্মৃতির উদ্দেশ্যে মালা দিলেন। নগর-স্বর্গের রাজকুমারের বাড়িতে অল্পক্ষণ আমরা ছিলুম। ইংরিজিতে কিছু শিষ্টাচার ক'রে, আমরা গেলুম তুষিত প্রাসাদে (শ্যামীভাষায়, তুসিং প্রাসাৎ)। সেখানে চূড়ালংকারের অন্যতম রাণী, রাজার সৎঠাকুরমা, নগর-স্বর্গের কুমারের মাতার শবদেহ রক্ষিত হ'য়ে আছে, কয় সপ্তাহ পরে খুব ঘটা ক'রে তার অগ্নিসৎকার হবে। প্রাসাদের মধ্যে একটি বড়ো ঘরে যেন সোনায় মোড়া একটি স্তূপের মতন। তার ভিতরে শবাধার রক্ষিত হ'য়ে আছে। চারিদিক যেন সোনার কাপড়ে আর জরিতে মোড়া। মাটিতে অনেকগুলি রাজসেবক এবং রাজবাড়ির দাসী উবু হ'য়ে ব'সে আছে। শবাধারের চৈত্যটির চারি ধারে চারজন সেপাই ফৌজি কায়দায় বন্দুক উল্টো ক'রে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে— বন্দুকের কাঠের কুঁদ উপরের দিকে করা, তার মুখ বা নল মাটিতে ঠেকানো। এরা একেবারে পাষাণমূর্তির মত নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আর শোক-প্রকাশের জন্য মাথা হেঁট ক'রে র'য়েছে। পরলোকগত রাজমহিষীর নামটির ঠিক পালি বা সংস্কৃত কি হবে, আমি ঠিক-মত ধ'রতে পারিনি। এটা হচ্ছে 'সুকুমার অমরশ্রী'। কিন্তু আমি 'সূক্ষ্ম মাল্যশ্রী' ব'লে ভুল অনুমান করেছিলুম। পরে জানতে পারি এ অনুমান আমার ভুল। শ্যামী ভাষায় শব্দের অন্তে 'র' থাকলে সেটাকে 'ন' উচ্চারণ করে। সেটা পরে জানতে পারি ; যেমন Khmer (খ্মের) শব্দকে এরা উচ্চারণ করে 'খ্মেন'। আর শ্যামী ভাষায় রচিত রামায়ণের নাম হচ্ছে "রামকীর্তি"— এদের মুখে এই শব্দ প্রথম হ'য়ে যায় "রামকীর্", তার পর এখন বলে "রামকীয়েন্"। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ-মত আমি সাদা কার্ডের উপরে নাগরী অক্ষর আর রোমান অক্ষরে একটী ছোট সংস্কৃত সমর্পণ-বাক্য লিখে দিই, সেটী রেশমী সুতো দিয়ে কালকের আনা ফুলের মালায় গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। সেই বাক্যটি হ'চ্ছে এই— "পুণ্যচরিতায়া/মহারাজাধিরাজশ্রী-চূড়ালংকরণ-দেব-মহিষ্যাঃ/অগ্ররাজদেব্যাঃ পুণ্যলোকবাসিন্যাঃ / শ্রী-সূক্ষ্ম-মাল্যশ্রিয়ঃ / শ্রদ্ধোপায়নম্ / মাল্যময়ম্ অর্ঘ্যম্ এতৎ / অর্পিতং কবিনা ভারতবর্ষাদ্ আগতেন / শ্রীরবীন্দ্রেন // বুদ্ধাব্দাঃ ২৪৭০ / আশ্বিন পৌর্ণমাস্যাম্ ॥"/

কবি মালাটি চৈত্যের পাদমূলে রাখলেন, তারপরে আমরা— ভুঁইয়ের উপর গালচে পাতা ছিল—

তাতে খানিকক্ষণ বসলুম। এর পরে আমরা অমরেন্দ্রপ্রসাদ (অমরিন্ প্রাসাং) দেখে, শ্যামরাজবংশের সবচেয়ে পবিত্র দেবমন্দির, যাতে শ্যামদেশের পুণ্যতম বুদ্ধবিগ্রহ রক্ষিত আছে সেটী দেখতে গেলুম। কিন্তু সেখানে ঐ লক্ষণীয় মূর্তিটি দেখা হ'ল না, কারণ তখন মন্দিরের ভিতর মেরামত হচ্ছিল ব'লে বন্ধ ছিল। এই মূর্তিটি খুব বড় একখণ্ড মরকত বা পান্না কেটে তৈরী। মূর্তির ছবি দেখেছি, কিন্তু কারুকার্য্য তেমন সুন্দর নয়। শ্যামজাতির ধার্মিক আর রাজনৈতিক জীবনের যেন কেন্দ্রস্থান বা পীঠস্থান এই Wat Phra-Keo ব়াৎ-ফ্রা-কেও ইংরিজীতে শ্যামীরা তাদের Panthaon অর্থাৎ সর্বদেবনিকেতন বা সুধর্মাসভা বলে অভিহিত করে। এই মন্দিরের আশপাশে ছোটোখাট আধুনিক আর প্রাচীন নানা রকমের মন্দির আর পাথরের আর ব্রোঞ্জের নানা মূর্তি রেখেছে। এইসব মন্দির আর মূর্তি থাই শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন। একটি লম্বা হল-ঘরে বা গ্যালারির দেয়ালে শ্যামী রামায়ণের অজস্র রঙিন চিত্র আঁকা। কম্বোজ দেশের বিখ্যাত আঙ্কর-বাৎ মন্দিরের একটী ছোটো অনুকৃতি আছে। ব্রোঞ্জের মূর্তির মধ্যে একটী মূর্তি এক উঁচু পাদপীঠের উপরে স্থাপিত— এটী বিশেষ লক্ষণীয়— এটি 'রুসি' অর্থাৎ ভারতীয় ঋষির মূর্তি,— এই ঋষিটি অত্যন্ত কৃশকায়, এবং দাড়ি-গোঁফ-বিহীন জটাধারী উপবিষ্ট মূর্তি, মুখে একটু কৌতুকহাস্যের আভাস। ভারতবর্ষের ঋষির সম্মান বহির্ভারতের প্রায় সব দেশেই গিয়ে পৌঁচেছে, আর প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরায় বিভিন্ন ঋষি আর ঋষিপত্নীদের কল্পিতমূর্তির ছবি চীন ও জাপানেও পাওয়া যায়— যেমন অগস্ত, বশিষ্ঠ, অত্রি প্রভৃতি। পাথরের যে মূর্তিগুলি এখানে আছে, তার মধ্যে কতকগুলি হ'চ্ছে জোড়া জোড়— একটী পুরুষ ও একটী নারীর মূর্তি একই পাদপীঠের উপরে। এগুলির মধ্যে দুটী আমার কাছে লক্ষ্মণীয় লাগ্‌ল— একটি হ'ল হনূমান আর "মে-মাচা"-র মূর্তি। হনূমান যখন সাগর অতিক্রম ক'রে লঙ্কায় পৌঁছান, তখন সমুদ্রের এক উপদেবী এই মে-মাচা বা মৎসকন্যা বা জলদেবী হনূমানকে বাধা দেবার চেষ্টা করে কিন্তু হনূমান তাকে পরাভূত করেন এবং মৎসকন্যা হনূমানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই আখ্যানে মে-মাচার আর হনূমানের প্রণয়ের কথাও জড়িত। শ্যামদেশে এই অদ্ভুত কাহিনীর মূর্তি বা ছবি খুবই প্রচলিত— বিকট-মুখ হনুমান মে-মাচার পশ্চাদ্ধাবন ক'রছেন। এখানে যা মূর্তি দেখলাম— পাশাপাশি দাঁড়ানো হনূমান আর মৎস্যকন্যা-রূপী নারী। আর একটি জোড়-মূর্তি হ'চ্ছে একটি প্রাচীন শ্যামী উপকথাকে রূপ দিয়ে— একজন রাজকুমার আর একজন রাজকুমারী— প্রেমিক ও প্রেমিকা— সামনাসামনি দাঁড়িয়ে' কথা কইছেন। এই দুটি মূর্তির মধ্যে যেন প্রাচীন শ্যামের সংস্কৃতি আর রোমান্স মূর্ত হ'য়ে ধরা দিয়েছে। এই ব়াৎ-ফ্রা-কেও হাতাটি তার এই শিল্পসম্ভারের ঐশ্বর্য্যের জন্য একটী দর্শনীয় স্থান বটে।

ব়াৎ-ফ্রা-কেও এইভাবে দেখবার পর, নানান্ ছোটো বড়ো আঙিনা আর হল-ঘর অতিক্রম করে একজায়গায় আমরা একটি নূতন ধরনের জিনিস দেখলুম— একটী বড়ো ঘরে জনপঞ্চাশেক যুবক ধীর ললিত নাচের ভঙ্গিতে সমবেত স্বরে গান গাইছে। এদের পরনে শ্যামী 'ফাহুম্', আর গায়ে একটা করে সাদা কামিজ, আর খালি পা। বেশ ফুর্তি ক'রে জোর গলায় গান ধ'রেছে— সঙ্গে শ্যামী অর্কেষ্ট্রা বা ঐক্যতান বাদন। কয়েকটী যন্ত্র যবদ্বীপের গামেলান বাদ্যের যন্ত্রের মতো, আর এই বাজনার আওয়াজ গামেলানেরই ধরনের— যেন খালি তালের আধারে। আমাদের তখন বুঝিয়ে দিলে— কি জন্য ছেলেরা এই গানের মহড়া দিচ্ছে। ১৬ই অক্টোবর থেকে, আমরা শ্যামদেশ ছেড়ে

যাবার দিন থেকে, দরবারে একটা বড়ো রকমের উৎসব শুরু হবে, সেইজন্যে। শ্যামদেশে সাদা হাতিকে লোকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে, যেন সাক্ষাৎ বুদ্ধদেবের অবতার। হাতিদের মধ্যে কখনও কখনও শ্বেতী রোগের দ্বারা গ্রস্ত Albino বা সাদা জানোয়ার পাওয়া যায়। ইন্দ্রের ঐরাবতের রঙও সাদা। এইরকম সাদা হাতি কালে-ভদ্রে, হয়তো পঞ্চাশ-ষাট বৎসরে, একটা দেখা দিলে। এইরূপ সাদা হাতির আবির্ভাবকে শ্যামীরা দেশের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণের কথা ব'লে মনে করে, আর সাদা হাতি পাওয়া গেলে খুব যত্ন ক'রে রাজসম্মানের সঙ্গে তাকে এনে রাজবাড়িতে স্থান দেওয়া হয়। সাদা হাতি পোষা এক খরচের ব্যাপার। সেইজন্য ইংরিজীতেও White Elephant-কে অবলম্বন করে প্রবাদ বাক্য দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এরূপ বলা হয় যে শ্যামের রাজারা কোনও অমাত্য বা দরবারী লোকের আর্থিক দণ্ড দেবার জন্যেই তাকে এরকম সাদা হাতি উপহার দিতেন, আর এই হাতির পালন-পোষণ আর তার পূজা-সম্মানের জন্যে বেচারীকে ফতুর হ'য়ে যেতে হত। যাই হোক, বহুদিন পরে এই সাদা হাতি পাওয়া গিয়েছে ব'লে তাকে বাঙ্কক্ শহরে যেদিন আনানো হবে, সেইদিন তার স্বাগতের জন্য এই নাচগানের জোর মহড়া চলেছে।

এর পরে আমরা ব্যাঙ্কে কিছু টাকা বদ্‌লে হোটেলে ফিরলুম। চৌত্রিশ বছর আগে টাকাকড়ির ব্যাপারে আজকের মতো কড়াকড়ি ছিল না। যবদ্বীপে বক্তৃতা দিয়ে যে একশো গিল্ডার দক্ষিণা পেয়েছিলুম, তার বদলে অষ্টাশী শ্যামী টাক টিকল পেলুম। তখন শ্যামের টিকল আমাদের টাকার চেয়েও বেশি দামী ছিল। এবার গত ১৯৫৯ সালে দেখলুম এই টিকলের দাম খুব প'ড়ে গিয়েছে— আমাদের এক টাকার বদলে এখন ওদের সাড়ে-তিন টিকলের বেশি পাওয়া যায়।

হোটেলে ফিরে এলুম, তার পরে বিশ্রাম। তিনটের একটু পরে তিনজন চীনা ভদ্রলোক কবি-দর্শন করবার জন্যে এলেন। অতি বিনীতভাবে কবিকে নমস্কার ক'রে চ'লে গেলেন। সাড়ে-তিনটের সময় যেতে হ'ল বিদেশ-মন্ত্রী Traidos ত্রৈদস-এর সঙ্গে দেখা করতে। ইনি হচ্ছেন "পিংসানুলোক্" অর্থাৎ বিষ্ণুলোক নগরের রাজকুমার। এঁর বাড়িতে আমরা অল্পক্ষণ ছিলুম, আর ইনি আগামী কাল ওঁর সঙ্গে ডিনারের জন্য নিমন্ত্রণ ক'রলেন। তার পরে চারটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কবি মোটরে ক'রে একটু শহর ঘুরে বেড়ালেন। পাঁচটার সময়ে শ্যামদেশের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, রাজকুমার দামরঙ্ রাজানুভাব Prince Damrong Rajanubhav-এর বাড়িতে আমরা গেলুম। ইনি শ্যামদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে একপত্রী। অর্থাৎ পণ্ডিত বলে এঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি। অমায়িক ব্যক্তি, বয়সে প্রবীণ, বেঁটে-খাটো হাস্যমুখ মানুষটী। পরনে ছিল কালো সিল্কের ফানুম— গায়ে সাদা জামা আর ডানহাতে আস্তিনের উপর শোক-প্রকাশক কালো কাপড়ের ঘের। এঁর একটি মস্ত বড়ো শিল্পসংগ্রহ আছে। বিশেষ করে প্রাচীন, শিল্প-ছবি ইত্যাদি নিয়ে। এঁর কাছে জার্মানী ফেরত এক শ্যামী ডাক্তার এসেছিলেন, ইনি সতেরো বৎসর জার্মানীতে কাটিয়েছিলেন। দামরঙের তিন মেয়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এঁদের সঙ্গে কবি প্রাচ্যদেশের মধ্যে যাতে একটা সাংস্কৃতিক সংযোগ ঘটতে পারে সেই কথা বললেন।

দামরঙের বিশেষ আগ্রহে কবির সঙ্গে তাঁর ছবি তোলা হ'ল। চা-যোগের প্রচুর আয়োজন ছিল, নানা শ্যামী পিঠা এবং মাংস মাছ ও চালের গুঁড়ার প্যাটি— চীনা চা, ইয়োরোপীয় চা, আইসক্রিম,

আইস-লেমনেড প্রভৃতি ; সঙ্গে সঙ্গে বেশ হালকাভাবে গভীর বিষয় আলোচনাও চ'ল্‌ল। কবি এই উচ্চশিক্ষিত এবং উদার রাজকুমারের সঙ্গে আলাপ ক'রে খুব খুশি হলেন।

তার পরে ৬টা ১৫ মিনিটে আর একজন রাজা— চূড়ালংকারের আর একজন পুত্র— ভানুরংসীর সঙ্গে দে'খা ক'রতে গেলুম। ইনি বয়সে বৃদ্ধ, কিন্তু খুব দিলখোলা হাসকুটে' মানুষ, কবিকে পেয়ে যেন কি ক'রবেন ঠিক করতে পারছেন না। তিনি অন্য কথার মধ্যে কবিকে বললেন Heard your name, and admire your aim— যেন নিজের এই ইংরেজী কথায় মিল বা অন্ত্য-অনুপ্রাস দেখে নিজেই খুশি হ'য়ে হাসতে লাগলেন। এঁর এখানে এক পেয়ালা ক'রে চীনা চা খেতে হল।

কবি হোটেলে ফিরে এলেন। সুরেন-বাবু আর আমি— সঙ্গে রাজধর্মনিবেশও ছিলেন, তিনি আমাদের এক চীনা মণিহারীর দোকানে নিয়ে গেলেন— বড়ো পোষ্ট-আপিসের সামনে। এ তল্লাটে সমস্ত দোকান-পাট চীনাদের, দোকানদারটী সিঙাপুর থেকে এখানে এসে ব্যবসা খুলেছে। কথাবার্তায় মানুষটিকে বেশ ভালো লাগ্‌ল। এর স্ত্রী খাসা ইংরিজী জানে। শান্তিনিকেতনে কলাভবনের জন্য সুরেন-বাবু শ্যামী মূর্তি কিছু কিনলেন। কবির সঙ্গের লোক ব'লে, এই চীনা দম্পতি আমাদের খুব খাতির ক'রলেন। দোকানের দারোয়ান একজন ভারতীয় ভোজপুরী— আমাদের ভারতীয় দেখে এরও বড়ো আনন্দ।

রাজধর্মনিবেশ রাত্রে হোটেলে আমাদের সঙ্গে খেলেন। ইতিমধ্যে আমরা দেখলুম, একটী ভারতীয় ভদ্রলোক—সম্ভবত কোন ভোজপুরী দারোয়ানদের সর্দার, বা দুগ্ধ-ব্যবসায়ী হবেন— নিজের নাম লিখে দিয়ে গেছেন Siew Misir বা শিব মিশ্র, কবির জন্য এক-ঝুড়ি ফল আর দু ছড়া ফুলের মালা। এই অজানা অচেনা ভারতবাসীর এইভাবে শ্রদ্ধাপ্রকাশ আমাদের বেশ লাগ্‌ল।

ফিয়া-থাই হোটেলে ভীষণ মশা। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কবির ঘুম নেই। তাঁর ঘরে গিয়ে মশা তাড়াবার টীনা চাকার মতো জড়ানো ধূপ জ্বালিয়ে দিলুম।

এই রচনার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব যথাক্রমে বিশ্বভারতী পত্রিকার নবম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (কার্তিক-পৌষ ১৩৫৭) ও একাদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৯) প্রকাশিত হয়।

অধ্যাত্মবিশ্বাসে টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

গান্ধীজী টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ এই তিন মনীষীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় মিল যাহা দেখিতে পাই তাহা হইল তিন জনেরই গভীর অধ্যাত্মবিশ্বাসে। তিনের ক্ষেত্রেই এই অধ্যাত্মবোধের বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা কাঁহাকেও জগৎ-বিমুখ এবং মানব-বিমুখ করিয়া তোলে নাই, তিন জনকেই অসীম প্রেমে মানবমুখী করিয়া তুলিয়াছে। কথাটাকে উল্টা করিয়া বলিতে চাহিলেও আপত্তি করিব না; তিন জনের মনই সহজভাবে ছিল মানবমুখী; কিন্তু যে অসীম প্রেম তাঁহাদিগকে নিত্য মানবমুখী করিয়া রাখিয়াছিল সে প্রেম মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সে প্রেম ছিল উর্ধ্বমূল এবং অধঃশাখ, অধ্যাত্মবিশ্বাসে তাহার প্রতিষ্ঠা। তিন জনের ক্ষেত্রেই আরও লক্ষ্য করিতে পারি, ধর্ম কাহারও নিকটে কোনও প্রথাবদ্ধ পদ্ধতিতে আসিয়া দেখা দেয় নাই, ধর্মবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে গভীর জীবনবোধের ভিতর দিয়া; এই কারণেই ধর্ম কাঁহারও নিকটেই জীবনবিরোধী হইয়া উঠিতে পারে নাই। গভীর জীবনবোধের ভিতর দিয়া যাহার উদ্‌বোধ সমগ্র জীবনকে ধারণ করিয়া রাখাই তো তাহার মুখ্য কর্ম। তিন জনের ক্ষেত্রেই ধর্মবিশ্বাস তাই জীবনকে সর্বতোভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্যই।

টলস্টয়ের জীবনের ভিতর বেশ স্পষ্ট দুইটা ভাগ দেখা যায়:

প্রথম ভাগে তিনি উচ্ছৃঙ্খল, তৎকালীন রাশিয়ার অভিজাত শ্রেণীর সকল মহৎদোষে দুষ্ট, বিশ্বাসের বালাই তাঁহার ভিতরে এ যুগে প্রায় ছিলই না। কিন্তু এ যুগেও দুইটি মহৎ জিনিস তাঁহার হৃদয়-মন অধিকার করিয়াছিল— তাহা পরবর্তী জীবনে তাঁহাকে বিশ্বাসের পথে এবং ঋষিজীবনে টানিয়া লইয়াছিল। প্রথমাবধিই ছিল তাঁহার হৃদয়ে একটা গভীর জীবনজিজ্ঞাসা। বিলাস-ব্যসনের অভিজাত জীবনে তিনি বেপরোয়াভাবে চলিতেছিলেন, কিন্তু সমস্তের মধ্যেই কি-একটা গভীর অশান্তি তাঁহাকে মাঝেমাঝে প্রায় উন্মাদ করিয়া তুলিত; ইহাই হইল মানুষের মধ্যে 'দিব্য অসন্তোষ', যে অসন্তোষ মানুষকে জীবনের পিছনে একটা মহত্তম মূল্যকে আবিষ্কার করিবার জন্য নিরন্তর উদ্‌বেজিত করিয়া তুলিতে থাকে। আমার বিশ্বাস, এই দিব্য অসন্তোষের আলোড়নে উদ্ভূত যে জিজ্ঞাসা তাহারই সমাধান রূপে আবির্ভাব ভগবদ্‌বিশ্বাসের। টলস্টয়ের মধ্যে অপর জিনিস লক্ষ্য করি, মানুষের সঙ্গে অসীম সমবেদনা। এই সমবেদনা দিন দিনই তাঁহার ভিতরে একটা যুদ্ধবিরোধী এবং হিংসাবিরোধী মনোভাব গড়িয়া তুলিতে লাগিল। প্রথমজীবন হইতে নানাভাবে নিজে যুদ্ধের সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, যুদ্ধের বিরাট ইতিহাসই রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার বিপুলায়তন উপন্যাস 'সংগ্রাম ও শান্তি'র ভিতরে; যুদ্ধ এবং যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকারের নৃশংসতাই কি তাঁহার মনকে এতখানি হিংসাবিরোধী করিয়া প্রেমোন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল?

জীবনের দ্বিতীয় ভাগে যখন বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল তখন টলস্টয়ের জীবনবেদের সহিত নিবিড় যোগ দেখা দিল বাইবেলের 'নিউ টেস্টামেন্টে'র; বাকি জীবন তখন চেষ্টা চলিল সাহিত্যকর্মে জীবনচর্যায় এই 'নিউ টেস্টামেন্টে'র বাণীকে রূপায়িত করিয়া তুলিবার। টলস্টয় তখন খাঁটি খ্রীষ্টান-

বিশ্বাসকেই জীবনের সর্বস্ব করিয়া তুলিলেন, যিশুখ্রীষ্টের জীবন ও বাণীকে জীবনের প্রদীপ করিয়া তুলিলেন; কিন্তু প্রচলিত চার্চধর্মের তিনি একান্তভাবে পরিপন্থী হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, প্রার্থনা কখনো চার্চে বা কোনও বারোয়ারী স্থানে গিয়া করিতে হয় না, সর্বোত্তম প্রার্থনা হইল নিজের মনের মধ্যে। স্বর্গীয় পিতা, একমাত্র পুত্র যিশুখ্রীষ্ট ও 'হোলি গোস্ট' (Holy Ghost) এই ত্রিমূর্তিতে ভগবান আরাধ্য— এ কথা টলস্টয় অস্বীকার করিলেন। ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি প্রেমস্বরূপ— প্রত্যেক মানুষ তাঁহার সেই প্রেমস্বরূপতার মধ্যে বিধৃত, এই প্রেমই জীবনের আসল বস্তু; চাই প্রেমস্বরূপ ভগবানের প্রতি প্রেম, আর সেই প্রেমস্বরূপের সহিত যুক্ত সকল মানুষের প্রতি প্রেম। যিশুখ্রীষ্ট ভগবান নন, যিশুখ্রীষ্ট মানুষের মধ্যে আদর্শ পূর্ণমানব; কারণ তাঁহার জীবনের মধ্য দিয়াই ভগবানের প্রেমের বাণী পূর্ণপ্রকাশ লাভ করিয়াছে। প্রেমে করুণায় সমস্ত মানুষকে 'সম' বলিয়া অনুভব করা, সেই 'সম'ত্বের অনুভূতিতে মানুষের ভিতরকার সর্বপ্রকারের ভেদভাব সর্বপ্রকারের হিংসাদ্বেষ দূরীভূত করিয়া দেওয়া, টলস্টয়ের মতে ইহাই হইল খাঁটি খ্রীষ্টান ধর্মসাধনা, আর সব কিছু হইল ধর্মের নামে বাহ্য ভড়ং। চার্চের ধর্মাধিপতিগণ টলস্টয়ের উপরে অসম্ভবভাবে ক্ষেপিয়া গেলেন, দীর্ঘদিনের জন্য টলস্টয় ধর্মচ্যুত বলিয়া ঘোষিত রহিলেন; মৃত্যুর পরে খ্রীষ্টানমতে ধর্মকৃত্য তাঁহার ক্ষেত্রে প্রতিপালিত হইতে পারে নাই।

টলস্টয়ের এই যে চার্চবিরোধী খ্রীষ্টধর্মের ব্যাখ্যা এ ব্যাপারে টলস্টয়ের উপরে প্রাচ্যদেশী ধর্মমতগুলির কিছু প্রভাব থাকিতে পারে বলিয়া কেহ কেহ ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রাচ্য ভাষা সাহিত্য ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে টলস্টয়ের একটা ঝোঁক বরাবরই ছিল। ছাত্রাবস্থাতেই টলস্টয় প্রাচ্য ভাষাসমূহকে তাঁহার প্রথম বিষয় রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৭০ সালে তিনি রূপকথার যে সংকলন করেন তাহার ভিতরে ভারতীয় রূপকথাও স্থান পাইয়াছিল। তিনি Sacred Books of the East প্রকাশনমালা হইতে চীন-দর্শন এবং ভারতীয় দর্শন পড়িয়াছিলেন; স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পড়িয়া টলস্টয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমেরিকা-প্রবাসী বাবা প্রেমানন্দ ভারতী নামক জনৈক বাঙালী বৈষ্ণব লিখিত কৃষ্ণবিষয়ক বইখানি তাঁহার এত ভালো লাগিয়াছিল যে তিনি বইখানিকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। এইসব মিলিয়া টলস্টয়ের মনের উপরে কিছু প্রাচ্য প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক মনে হয় না। এ বিষয়ে অ্যালেক্স আরন্‌সন্‌ (Alex Aronson) তাঁহার *Europe Looks at India* গ্রন্থখানিতে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রনিধানযোগ্য। "প্রাচ্য যে টলস্টয়কে ধর্মবিচারের নূতন মানদণ্ড দান করিয়াছিল সেসম্বন্ধে সন্দেহ নাই; এই প্রাচ্যলব্ধ মানদণ্ডই টলস্টয়কে সাহায্য করিয়াছিল খ্রীষ্টধর্মের পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টায়। আমরা যদি অবশ্য টলস্টয়ের ভারতবর্ষের প্রতি ঠিক ঠিক কি দৃষ্টি ছিল তাহার বিচার করিতে চাই তবে তাঁহার জীবনের শেষ দশ বৎসরে তিনি প্রধান প্রধান ভারতীয়গণের নিকটে যেসব চিঠিপত্র লিখিয়াছেন সেগুলি ভালো করিয়া দেখিতে হইবে। তাঁহার দার্শনিক লেখাগুলি অপেক্ষা এই চিঠিগুলির একদিক হইতে একটা অধিক মূল্য আছে; এগুলি একেবারে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে লিখিত বলিয়া তাহার নৈতিক জীবনের ও ধর্মজীবনের সকল আবেগই এগুলির মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন।" বিরুকফ্‌ (Birukoff) প্রকাশিত *Tolstoy Und der Orient* বইখানির মধ্যে ভারতীয়গণের নিকটে লিখিত টলস্টয়ের এই চিঠিগুলি পাওয়া যায়।

মোটামুটিভাবে দেখিতে পাই জীবনের শেষ দিকে ধর্মীয় জীবনে প্রাচ্যদেশের সহিত টলস্টয়ের একটা আত্মিক যোগই গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী আবার জন্মহিন্দু হইলেও বৌদ্ধধর্ম ইস্‌লাম প্রভৃতিকেও যেমন সশ্রদ্ধায় পড়িয়াছেন এবং জীবনে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তেমনই 'নিউ টেস্টামেণ্টে'র খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতিও আন্তরিক ভাবেই অনুরক্ত ছিলেন; ফলে মহাত্মা গান্ধীর ধর্মবিশ্বাসের উপরে কিছু কিছু পাশ্চাত্য প্রভাবও অবশ্যস্বীকার্য। টলস্টয় এবং গান্ধী উভয়ের ক্ষেত্রেই তাই দেখিতে পাই, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অতি সহজ মিলন হইয়াছিল।

খ্রীষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে মনোভাবে গান্ধীজী ছিলেন টলস্টয়ের সহিত সম্পূর্ণ একমত। যিশুখ্রীষ্টের মহান প্রেমের আদর্শ ও ত্যাগের আদর্শ, তাঁহার সহজ সরল জীবনযাত্রার আদর্শ, তাঁহার বিনয় সেবা মৃদুতা অথচ মৃত্যুপণ সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতা—ইহার সবই গান্ধীজীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। যিশুখ্রীষ্টের 'সারমন্ অন্ দি মাউণ্ট' অর্থাৎ পাহাড়ের উপরে বসিয়া প্রদত্ত যে উপদেশাবলী তাহা মহাত্মা গান্ধীর নিকটে প্রায় নিত্যস্মরণীয় ছিল। কিন্তু গান্ধীজীও চার্চপ্রচারিত গোঁড়া খ্রীষ্টানমতের পরিপন্থী ছিলেন। টলস্টয়ের ন্যায় গান্ধীজীও হরিজন-পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, "আমি তাঁহাকে [যিশুখ্রীষ্টকে] একজন ঐতিহাসিক মানব বলিয়া মনে করি, মানবগুরুগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ গুরু।" যিশুখ্রীষ্টের সকল বাণীর সারমর্ম ছিল প্রেম; সেই প্রেমই আনে সমাজবোধ, আনে অহিংসা—আনে চরম আত্মত্যাগের দ্বারা মহামানবের সেবার অনিবার্য প্রবৃত্তি। যিশুখ্রীষ্টের জীবন এবং বাণীকে যে এই আলোকে বুঝিল না সে যিশুখ্রীষ্টকে কিছুই বুঝিল না, কিছুই গ্রহণ করিতে পারিল না। হরিজন-পত্রিকায় আর-এক বার তিনি লিখিয়াছিলেন, "আজ আমি গোঁড়া খ্রীষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, কারণ আমি এ বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ যে ইহা যিশুর বাণীকে সম্পূর্ণ বিকৃত করিয়া দিয়াছে।"

গান্ধীজীর ধর্মজীবনও কোনও প্রথাবদ্ধভাবে গড়িয়া ওঠে নাই; তাঁহার ধর্মবোধ তাঁহার নিজের মনের মধ্যেই একটা বিশেষ রূপ লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহার গভীর মানবতাবোধকে অবলম্বন করিয়া। যে গীতাকে মধ্যজীবন হইতে গান্ধীজী জীবনের প্রধান অবলম্বন করিয়া লইয়াছিলেন সেই গীতার সহিত আশৈশব গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠপরিচয় ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়া শৈশব হইতে উপনিষদের ভাবধারার মধ্যেই মানুষ হইয়াছেন গান্ধীজীও অনুরূপভাবে আশৈশব গীতার ভাবধারার মধ্যেই বর্ধিত হইয়াছেন, এমন কথা বলিতে পারি না। গান্ধীজীর আত্মজীবনের মধ্যে পিতার ধর্মজীবনের পরিচয় দিতে গিয়া গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, তিনি মাঝেমাঝে মন্দিরে যাইতেন এবং ধর্মোপদেশ শুনিতেন, তাহার ভিতর দিয়াই তাঁহার পিতার যেটুকু হোক ধর্মজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার পিতা জীবনের শেষভাগে অবশ্য একটি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপদেশে গীতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; পূজার সময়ে তিনি উচ্চে গীতার কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। কিন্তু গান্ধীজীর জীবনে ইহার তেমন কোনো ব্যাপক প্রভাব ছিল মনে হয় না। গান্ধীজীর মাতা অবশ্য অতি নিষ্ঠাবতী রমণী ছিলেন। তিনি দৈনন্দিন পূজা-প্রার্থনা না করিয়া অন্ন গ্রহণ করিতেন না; নিত্য তিনি বৈষ্ণব-মন্দিরে যাইতেন, চাতুর্মাস্য চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রত-উপবাসাদি তাঁহার লাগিয়াই ছিল। গান্ধীজী মাতার নিকট হইতে সম্ভবতঃ বৈষ্ণবপ্রবণতা লাভ করিয়াছিলেন, আর লাভ

রবীন্দ্রনাথ

ন্ধী

টলস্টয়

করিয়াছিলেন উপবাসের প্রবণতা। শুধু মায়ের নিকট হইতে নয়, গুজরাটি সমাজজীবন হইতেই সম্ভবতঃ তিনি অতখানি উপবাস-প্রবণতা একটা সামাজিক উত্তরাধিকার-সূত্রেই লাভ করিয়াছিলেন। ব্রত-উপবাস ভারতবর্ষের কোনো অঞ্চলের মহিলাগণের মধ্যেই কম নয়, উপলক্ষ্য একটা যেন কিছু পাইলেই হইল। কিন্তু গুজরাট-রাজস্থানের কিছু কিছু অঞ্চলে অল্পবয়সের মেয়েদের মধ্যেও (পুরুষের মধ্যেও) এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ উপবাসের কথা নিজে যেমন করিয়া জানিয়াছি তাহাতে মনে হইয়াছে গান্ধীজীর জীবনের এত উপবাসের পিছনেও সামাজিক উত্তরাবিকারের খানিকটা উপাদানের প্রশ্ন হয়তো একেবারে অবান্তর নহে।

গান্ধীজী গীতা পড়েন প্রথমে লণ্ডনে বসিয়া দুইটি থিয়োসফিস্ট বন্ধুর প্রভাবে। মূল গীতা পূর্বে কোনও দিন পড়েন নাই, প্রথম পড়িলেন ইংরেজি অনুবাদ, সার্ এড্উইন আরনল্ডের *Song Celestial*, দ্বিতীয় অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক অনুবাদের ভিতর দিয়াই তাঁহার মনকে সচকিত করিয়া দিয়াছিল; সেই হইতেই গীতা গান্ধীজীর উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। গভীর মানবতাবোধের ভিতর দিয়া এবং সহজাত সত্যনিষ্ঠার ভিতর দিয়া গান্ধীজী ভগবানকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন সত্যস্বরূপ এবং প্রেমস্বরূপ করিয়া। পরবর্তী কালে গুজরাট-মারাঠার বৈষ্ণব সাধককবিগণ এবং উত্তর ও মধ্য ভারতের সন্ত কবিগণও গান্ধীজীর ধর্মবোধকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। গীতার পরে যে গ্রন্থখানি গান্ধীজীর ধর্মজীবনে অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা হইল গোস্বামী তুলসীদাসের রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'রামচরিতমানস'। এ কথা আজ আর কাহারও অবিদিত নাই যে গান্ধীজী যে শোষণহীন স্বায়ত্ত-শাসনে সুখী রাম-রাজত্বের আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার চিত্রটি তিনি তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গান্ধীজীর ধর্মচেতনা যেরূপ মুখ্যতঃ গীতাকে আশ্রয় করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা তেমনই প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়াছিল উপনিষদ্। সবগুলি উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের অতি ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হয় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থখানির মধ্যে আমরা উপনিষদ্ হইতে একটি সংকলন দেখিতে পাই; উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এই সংকলনের মধ্য দিয়াই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কারণ রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে উপনিষদের যত মন্ত্রের উল্লেখ এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন সে মন্ত্রগুলি সবই এই সংকলনের ভিতরে ধৃত। অল্পবয়স হইতেই এই মন্ত্রগুলি তিনি হাতের কাছে পাইয়াছিলেন, পিতার নিকট হইতেই উপনিষদের মর্মবাণীটিও লাভ করিতে পারিয়াছিলেন; আর শৈশব হইতে এই মন্ত্রগুলিকে বিশুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করিতেন।

শৈশব হইতে উপনিষদের সহিত এইরূপে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলিয়া আমাদের মধ্যে একটা ধারণা গড়িয়া উঠিতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া উপনিষদের ধারাতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের এ ধারণা ভুল। অনন্যসাধারণ মন ও জীবন লইয়া যাঁহারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের নিজেদের ধর্ম তাঁহারা নিজেরা গড়িয়া তোলেন, অথবা বলা যায়, তাঁহাদের নিজেদের ধর্ম নিজেদের ভিতরেই তাঁহাদের চিন্তা অনুভূতি ও জীবনযাত্রাকে লইয়া গড়িয়া উঠিতে থাকে। শাস্ত্র ও সাধু-সন্ত মহাপুরুষগণের বাণীকে তাঁহারা সেই ভাবেই

আহরণ ও গ্রহণ করেন যেভাবে করিলে তাঁহাদের ভিতরে ভিতরে গড়িয়া ওঠা ধর্মবোধ সমর্থন লাভ করিয়া বা অনুরূপ চিন্তা-অনুভূতি-অভিজ্ঞতার রসদ লাভ করিয়া উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ নিজে বার বার এ কথা বলিয়াছেন যে তাঁহার ধর্ম বাহির হইতে আসে নাই, কোনও শাস্ত্র বা প্রথাকে অবলম্বন করিয়াও আসে নাই, তাঁহার জীবনানুভূতির পথ ধরিয়া আপনার মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। আপনার মধ্যে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে কবি উপনিষদের সঙ্গে তাহাকে কেবলই মিলাইয়া লইয়াছেন। এই মিলাইয়া লইবার কাজে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যে শুধু উপনিষদকে অনুসরণ করিয়াছেন তাহা নহে, অনেক স্থলে স্পষ্ট বোঝা যাইবে, নিজের মনন ও অনুভূতিকে উপনিষদের ভিতরে খুঁজিয়া পাইবার উৎসাহে তিনি উপনিষদের বাণীকে নিজের মতন করিয়া ঢালিয়া লইয়াছেন। গান্ধীজীও যে তাহা করেন নাই তাহা নয়। তিনি নিজে ছিলেন কর্মযোগী; তাঁহার প্রবণতা ও অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি কর্মের নিজস্ব কতকগুলি কৌশল গড়িয়া লইয়াছিলেন; তিনি যখন গীতাকে নিজে গ্রহণ করিয়াছেন বা অপরের কাছে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তখন সেইভাবেই গীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন বা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই অধ্যাত্মবিশ্বাসী ছিলেন, জীবনের যাহা-কিছু সকলেরই চরমমূল্য দান করিয়াছেন অধ্যাত্মসত্যের আলোকে; এদিক হইতে উভয়ের মধ্যে গভীর মিল ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতা-সংগীতের ভিতর দিয়া এবং শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনকে লইয়া যত কর্মপ্রচেষ্টা-সকলের ভিতর দিয়া মানুষকে যে অধ্যাত্ম-উন্মুখী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি গান্ধীজীর গভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের ইহা একটি মুখ্য কারণ। আবার বিরাট কর্মযোগী গান্ধীজী যে তাঁহার সকল কর্মের ভিতর দিয়াই মানুষের ভিতরকার অধ্যাত্মসত্যকে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সর্বপ্রকার কর্মের মধ্য দিয়াই যে মানুষকে এই বোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা সম্ভব ইহা সমগ্র জীবন ধরিয়াই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' আখ্যা দিবার রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ইহাই বোধ হয় প্রধান কারণ ছিল আরও একটি জিনিস পূর্বেই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। টল্‌স্টয় গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথ কেহই ধর্মকে মানুষের সহিত অখণ্ডযোগ হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে পারেন নাই। যাহা-কিছু ব্যক্তি-মানুষকে বৃহৎমানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে—পার্থিব স্বার্থের লোভেই হোক, আর অপার্থিব মুক্তির লোভেই হোক—তাহাকে তাঁহারা কেহই ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। ভগবৎ-আশ্রয়ের তাৎপর্যই হইল মহাপ্রাণ ও মহাপ্রেমকে আশ্রয়. মানুষকে অস্বীকার করিয়া এই মহাপ্রাণ এবং মহাপ্রেমকে আশ্রয় করিতে যাওয়া যে একেবারেই একটা স্ববিরোধ। সুতরাং তিন জনের পক্ষেই ধর্ম-জীবনের মূল কথা ছিল নিঃস্বার্থ সেবার ভিতর দিয়া মহামানবের সহিত যুক্ত হওয়া: মানুষের সেবার মধ্য দিয়া ভগবৎ-সেবা, মহামানবের বিকাশের ভিতর দিয়া মহাদেবতাকেই জাগ্রত এবং তৃপ্ত করিয়া তোলা।

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ধর্মের ক্ষেত্রে এই গভীর মিল সত্ত্বেও গান্ধীজীর ধর্মমতের সহিত রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতের লক্ষণীয় অমিলও ছিল অনেক দিক দিয়া। একটা মুখ্য অমিল ছিল এই যে, গান্ধীজী প্রকৃতিতে মুখ্যতঃ কর্মযোগী ছিলেন; তিনি সত্যস্বরূপ প্রেমস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ ভগবানে আত্মচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া নিঃশেষে আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া কর্মযোগে মহামানবের সেবাকেই মুখ্য করিয়া দেখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিতে কবি ছিলেন বলিয়া সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ভিতর দিয়া মানুষের মুক্তির আদর্শকে অত্যন্ত বড় করিয়া

দেখিতেন। রবীন্দ্রনাথের একটি মূল বিশ্বাস ছিল, ভগবত্তা কোনও অপ্রাকৃত ধামে চিরকালের জন্য হইয়া বসিয়া নাই ; তিনি অনন্ত দেশে অনন্ত কালে অনন্তদেব হইয়া উঠিতেছেন। প্রত্যেক মানুষ যে তাঁহার অংশ এ কথার অর্থ হইল প্রত্যেক মানুষের মধ্য দিয়া সৃষ্টিপ্রবাহে নিরন্তর জায়মান বিধাতা তাঁহার অনন্ত ধ্যানের এক-একটি কণা তরঙ্গিত করিয়া দিয়াছেন ; সেই ধ্যান জড়সৃষ্টির সকল বিবর্তন অতিক্রম করিয়া জীবসৃষ্টির প্রাণলীলার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া চৈতন্যলীলার মধ্য দিয়া পূর্ণতার পথে বিকাশমান। চৈতন্যের অনন্তবিকাশে 'নিজ মর্তসীমা' লঙ্ঘন করিয়া মানুষ তাহার মধ্য দিয়া দেবত্বকে ফুটাইয়া তুলিতেছে। মানুষের এই পরিপূর্ণ বিকাশ শুধু রাষ্ট্রশক্তির হস্তান্তরের দ্বারা বা বিশোধনের দ্বারা সম্ভব হয় না, কোনওরূপ গঠনমূলক কার্যের দ্বারা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের দ্বারাও হয় না ; জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্যশিল্প সংগীতনৃত্য—ইহার সকলের দ্বারাই মানুষের চেতনার বিকাশ মনের মুক্তিকে সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে। এই কারণে সংগীতই ছিল রবীন্দ্রনাথের মুখ্য সাধনা, অপর পক্ষে গান্ধীজী বলিতেন, 'সাফাই' দিয়াই মানুষের অধ্যাত্মসাধনার আরম্ভ। সৌন্দর্যের সাধনা শিল্পের সাধনা বাদ দিয়া কোনওজাতীয় বিশুদ্ধ গঠনমূলক কাজে রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই তেমন উৎসাহ বোধ করেন নাই ; এইজন্য তাঁহার কর্মজীবন গড়িয়া উঠিয়াছে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনকে লইয়া, যেখানে কোনও কর্মই সৌন্দর্যসাধনা সাহিত্যসাধনা শিল্পসাধনাকে বাদ দিয়া নয়। কৃষি-উন্নতির কোনও পরিকল্পনাকে তিনি সংগীত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া ফেলিতে পারেন নাই। গান্ধীজী সাহিত্য শিল্প সংগীতকে যে প্লেটোর ন্যায় ভারতবর্ষের সাধারণতন্ত্র হইতে দূর করিয়া দিবার পক্ষপাতী ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিপ্রকৃতি লইয়া মানুষের ধর্মের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ দেবত্বের পথে, মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এগুলিকে যেভাবে অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন গান্ধীজী তাহা করিতেন না। এইজন্যই শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর অনেক জিনিস গান্ধীজীর মনঃপূত ছিল না ; আবার বিশ্বভারতীর অনেক জিনিস ঢালিয়া সাজিয়া নূতন রূপ দিবার গান্ধীজীর যেসব উপদেশ-পরিকল্পনা ছিল রবীন্দ্রনাথের তাহার সবটা খুব মনঃপূত ছিল না।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় কর্মজীবনের ভিতর দিয়া গান্ধীজীর ধর্মবোধ একটা বিশেষ রূপ লাভ করিল। মন্দির-দেবালয়ের বৈষ্ণব পরিবেশে গান্ধীজীর জন্ম ও পরিবর্ধন ; সুতরাং কর্মময় জীবনের এই ধর্মবোধের যে বিকাশ তাহা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অনেকখানি বৈষ্ণবপ্রবণতা লাভ করিয়াছিল। গান্ধীজীর যে ভগবদ্‌বিশ্বাস তাহা অনেকখানি ছিল দ্বৈতবাদী হিন্দু বা খ্রীষ্টানগণ বা মুসলমানগণের ন্যায় Personal God বা পুরুষ-ভগবত্তায় বিশ্বাস। এই পরমপুরুষ গীতার পুরুষোত্তম— তিনি ক্ষরও বটেন, অক্ষরও বটেন ; আবার ক্ষর ও অক্ষর উভয়কে অতিক্রম করিয়া তিনি পুরুষোত্তম। তিনি নিরাকারও বটেন, আবার যুগে যুগে সাকাররূপে রামরূপে কৃষ্ণরূপে তাঁহার অবতারত্বও সমভাবে সত্য। তাই গান্ধীজীর ভগবান গীতার পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, সন্ত তুলসীদাসের 'রামচরিতমানসে'র রাম। তিনি শুধু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণরূপে— জগৎপ্রপঞ্চের অচলপ্রতিষ্ঠারূপে— বিরাজমান নহেন ; তিনি গীতার

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥

বহির্বিশ্ব এবং মানুষের অন্তর্লোক— এই দুইকে একই ছন্দে একই বিধানে তিনি নিত্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন।

সকল ঐশ্বর্যের ভিতরে প্রেমের ঐশ্বর্যই তাঁহার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য এবং শক্তি। গান্ধীজী যে উপনিষদ্ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন তাহা নহে; তবে তিনি মনেপ্রাণেই বিশ্বাস করিতেন যে সকল উপনিষদ্ হইল গাভী, দোগ্ধা হইলেন গোপালনন্দন; পার্থ বৎস, সুধী ভোক্তা— গীতা হইল এইরূপ মহৎ অমৃত-দুগ্ধ। উপনিষদের সারকে গান্ধীজী গীতামৃতের মধ্যেই লাভ করিয়াছিলেন; গীতাই ছিল তাই তাঁহার প্রধান আশ্রয়; এই গীতা হইতেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন শুধু জ্ঞান নয়— সকল বল ও অন্তঃপ্রেরণা।

অন্যদিকে দেখিতে পাই, গীতা রবীন্দ্রনাথকে কোনো দিনই তেমন একটা প্রেরণা দান করিতে পারে নাই; বরং দু-এক স্থানে গীতার সম্বন্ধে সামান্য একটু বিরূপ উক্তিই করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে অপর্যাপ্ত লেখা রহিয়াছে তাহার ভিতরে গীতা হইতে উদ্ধৃতি বা আলোচনা লক্ষণীয় ভাবেই স্বল্প, সব জুড়িয়া চারি-পাঁচটি শ্লোকের বেশি হইবে না। গীতার মহিমাসূচক উক্তি যে প্রসঙ্গক্রমে তিনি কোথাওই করেন নাই, এমন নহে। 'পরিচয়' গ্রন্থের 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

"আতসকাচের এক পিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর-এক পিঠে তেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আর-এক দিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি— সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্‌গীতা।"

মাঝেমাঝে এ-জাতীয় উক্তি সত্বে গীতা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে বেশ একটা কিন্তু ছিল। রবীন্দ্রনাথও অবশ্য অধ্যাত্ম সত্যের 'পুরুষ'ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু এ 'পুরুষ' গীতোক্ত পুরুষোত্তম নহেন, ইনি উপনিষদের—

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ-
র্যাথাতথ্যতো ঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

তিনি সর্ব্যাপী জ্যোতির্ময় অকায় অব্রণ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ; তিনি কবি মনীষী সর্বোত্তম স্বয়ম্ভূ; শাশ্বত কালের জন্য যথাতথ্যতঃ কর্তব্যবিধান করিতেছেন। ইনি একদেবতা সর্বভূতে গূঢ়, সর্বব্যাপী— সর্বভূতে অন্তরাত্মা, তিনি কর্মাধ্যক্ষ, সর্বভূতের আশ্রয়, সাক্ষী চেতা নির্গুণ। তাঁহার কাছে শুধু প্রার্থনা করা চলে, তিনি আমাদের ধী-সমূহকে চালিত করুন, তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত করুন। জগতের পতিতগণের জন্য কর্মযোগের দ্বারা সেবাব্রতে উৎসুক গান্ধীজীর নিকট ভগবানের বিগ্রহবান্ 'পতিতপাবন'-রূপটিই সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া উঠিয়াছিল; রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিয়াছিলেন 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'; রবীন্দ্রনাথের নিকটে তাই 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' এবং তাহার পিছনকার যে 'শান্তংশিবমদ্বৈতম্' তাহাই প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছিল।

আমরা আরও লক্ষ্য করিতে পারি, গান্ধীজীর বিশ্বাসটা একবার যখন পাকা হইয়া উঠিল তখন তাহার ভিতরে আর বিশেষ কোনও বিবর্তন দেখিতে পাই না। বিবর্তনের মধ্যে একই তানে এই বিশ্বাস দিন-দিন বাড়িয়াই গিয়াছে। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষের সর্বসাধারণকে লইয়াই যখন তাঁহাকে

সমস্ত জীবন কাজ করিতে হইয়াছে, শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত সকলকেই সর্বদা নিজের সঙ্গে টানিয়া লইতে হইয়াছে, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-পার্শী কাহাকেও বাদ দিলে চলে নাই—তখন ধর্মমতকে গান্ধীজী এই-সকল শ্রেণীর জনসমাজের যে একটা সরল বিশ্বাসের মত ও পথ আছে, সেই মত ও পথের যতটা সম্ভব কাছাকাছি রাখিয়া গ্রহণ ও প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেন। এই ভাবেই 'রামধুন' গান তাঁহার সর্বপ্রিয় ভজন হইয়া উঠিয়াছিল। অন্য কোনও তাত্ত্বিক কারণ হইতে এই ভজনে যে ভারতবর্ষের সর্বস্তরের জনসাধারণ সহজে যোগ দিতে পারে ইহার পিছনে এই তত্ত্বটাই বড় ছিল বলিয়া বিশ্বাস করি। রবীন্দ্রনাথেরও বিশ্বমানবতার সঙ্গে একটা অখণ্ডযোগের আকাঙ্ক্ষা সারাজীবন ভরিয়াই দেখিতে পাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই যোগসাধনের পন্থা ছিল অনেকখানি পৃথক্। তাঁহার এই যোগসাধনের মুখ্য পন্থা ছিল নিরন্তর আনন্দসৃষ্টির আয়োজনের ভিতর দিয়া—তাঁহার সমস্ত জীবনের কবিকর্মের ভিতর দিয়া। অন্য কোনও পন্থা যে তিনি কোনও দিন গ্রহণ করেন নাই তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রূপে তিনি কাজ করিয়াছেন, উপাসনা-মন্দিরে আচার্য রূপে তিনি অনেক উপাসনা করিয়াছেন, ভাষণ দান করিয়াছেন; কিন্তু তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনে ধর্মের প্রকাশ ইহার মধ্য দিয়া ততখানি সত্য হইয়া ওঠে নাই যতখানি সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার কবিকর্মের ভিতর দিয়া। নিখিলমানবের সঙ্গে এবং তাহার ভিতর দিয়া নিখিলমানবের হৃদয়ে সদা সন্নিবিষ্ট যে মহান্ পুরুষ তাঁহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজের অন্তর্নিবাসী পুরুষের যোগ সর্বাপেক্ষা সহজ এবং গভীর করিয়া অনুভব করিয়াছেন এই পন্থায়। বিশ্বমানবের জন্য শ্রমকে নিঃস্বার্থ সেবাকর্মে রূপান্তরিত করিবার তাগিদ লইয়া তিনি শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই তাগিদের মধ্যে কোথাও কোনও খাদ ছিল না, মানুষের সঙ্গে নিজের যোগকে আরও প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবারই সত্যকারের ব্যাকুলতা, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলিকেও তিনি শুধুমাত্র কতকগুলি কর্মপ্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া তুলিতে পারিলেন না; সমস্ত কর্মকেই তিনি এমন পরিকল্পনায় রূপ দিলেন যে, সে কর্মও তাঁহার নিজস্ব সৃজনাত্মক কবিধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে।

প্রশ্ন করা যাইতে পারে, শরণপ্রপত্তি প্রেমভক্তির প্রাধান্য লইয়া গান্ধীজীর মধ্যে দেখা দিয়াছে ভারতের বৈষ্ণব-প্রবণতার প্রাধান্য এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা দিয়াছে উপনিষদের অনির্দেশ্য পুরুষে বিশ্বাস—এ কথা রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে স্মরণ করিয়া কিভাবে স্বীকার করা যায়। গীতাঞ্জলির গানগুলি যদি প্রেমভক্তির গান না হয়, আত্মনিবেদনের ভগবৎশরণের গান না হয়, তবে প্রেমভক্তি ও আত্মনিবেদনের গান বলিব কাহাকে। রবীন্দ্রনাথের যে গানগুলি ব্রহ্মসংগীত নামে প্রসিদ্ধ সেগুলির ভিতরেই বা প্রেমভক্তি এবং আত্মনিবেদনের অভাব কোথায়। রবীন্দ্রনাথের এই-জাতীয় অনেকগুলি গান গান্ধীজীর নিজেরই তো অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

এই প্রশ্নের উত্তরে বলিব, রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ব্রহ্মসংগীতগুলি এবং গীতাঞ্জলির যুগে রচিত গানগুলিই রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের সমগ্রতার পরিচয় বহন করে না। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন যুগের অন্যান্য সব কবিসৃষ্টি হইতে এই গানগুলিকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া ফেলিয়া আমাদের প্রচলিত ধর্মচেতনার আলোকে এগুলিকে ব্যাখ্যা করিয়া লইলে আমরা সমগ্র সত্যকে লাভ করিতে পারিব না। যে ব্রাহ্মধর্মের পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই ব্রাহ্মধর্ম যত সংস্কারপন্থীই হোক-না কেন তাহার ভিতরেই

দু-এক রকমের একটা প্রথাবদ্ধতা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলির মধ্যে এই প্রথাবদ্ধতা যে অনেকখানি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল সে কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই নানা প্রসঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির যুগের কতকগুলি গানকে আমরা প্রচলিত ভক্তি-প্রপত্তির পন্থায় যে ভাবে গ্রহণ করি তাহাও সর্বথা ঠিক নহে। এখানকার কবির ভগবৎ-চেতনার মধ্যেও বিশ্বপ্রবাহ এবং সেই বিশ্বপ্রবাহের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন 'আমি'-প্রবাহের বিচিত্র কবি-অনুভূতির যে একটি দীর্ঘদিনের ইতিহাস রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এইসব সত্ত্বেও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, গীতাঞ্জলির যুগে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহিত ভক্তি-প্রপত্তি-প্রধান বৈষ্ণবতার অনেক প্রবণতা প্রকাশ পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনাকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইতে হইলে এই একটি মৌলিক কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রথাপদ্ধতি শাস্ত্র-আপ্তবাণী বা বিশ্বাসের পথকে অবলম্বন করিতে পারেন নাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা কোনও একটানা স্রোতে প্রবাহিত হয় নাই। তাঁহার বিচিত্র কবি-অনুভূতিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার ধর্মবোধ সমস্ত জীবন ধরিয়া বিচিত্রভাবে বিবর্তিত হইয়াছে। অল্পবয়সেই তাঁহার উপনয়ন হইয়াছিল এবং অল্পবয়স হইতেই গায়ত্রীমন্ত্র এবং উপনিষদের মন্ত্র বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতেন; কিন্তু ইহাকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার ধর্মবোধ গড়িয়া ওঠে নাই। এই বয়সে শুধু উপনিষদ্ হইতে সঞ্চয়, সেই সঞ্চয় কাজে লাগিয়াছে পরবর্তী কালে ধর্মচেতনার বিবর্তনের সঙ্গেসঙ্গে। তাঁহার কাব্যজীবনের ভিতর দিয়া যে ধর্মচেতনার বিবর্তন হইয়াছে তাহা যে তাঁহার মনের অজ্ঞাতে উপনিষদের ঋষিগণের ধর্মচেতনার অনুরূপভাবেই হইতেছিল ইহা কবির নিজের নিকটেই একদিন একটা আবিষ্কার রূপে দেখা দিয়াছিল; তাহার পর হইতে উপনিষদের সঞ্চয় হইতে সচেতনভাবেই কেবল নিজের ধর্মচেতনার সায় খুঁজিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার বিবর্তনের প্রথম যুগটা দেখি অনন্ত জিজ্ঞাসার যুগ; তাহার পরে দেখি এই অনন্ত জিজ্ঞাসা লইয়াই নিজের কবি-অনুভূতির ভিতর দিয়া একটা 'জীবনদেবতা'র আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছে।

'নৈবেদ্যে'র সময় হইতে এই 'জীবনদেবতা'র সহিত উপনিষদের মহানপুরুষের প্রত্যক্ষ যোগ ও মিলন হইতে লাগিল। 'খেয়া' পার হইয়া গিয়া 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য' 'গীতালি' প্রভৃতির ভিতর দিয়া তিনি 'জীবনদেবতা'কে অনন্ত লীলাময় 'তুমি' করিয়া লইলেন এবং কিছুদিন ধরিয়া সৃষ্টির ভিতর দিয়া আত্মাস্বাদনে চিরপিপাসিত অনন্ত লীলাময় 'তুমি'র সঙ্গে 'আমি'র একটি নিত্যলীলার রহস্যে মাতিয়া উঠিলেন। 'আমি' হইলাম 'তুমি'র একটি ভাবকণা, একটি অখণ্ড জীবনপ্রবাহের ভিতর দিয়া ক্রমপ্রসার্যমান ব্যক্তিত্বে তাহার অনন্ত বিকাশ। এই 'আমা'র বিকাশ ও তাহার ভিতর দিয়া 'তোমা'র প্রকাশ— এই বিকাশ-প্রকাশের আনন্দলীলা লইয়া কাটিয়াছে 'গীতাঞ্জলি'র যুগ। 'বলাকা' হইতে আবার বাঁক ফেরা আরম্ভ হইল। বহির্বিশ্বের সঙ্গে এবং তাঁহার সকল রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে ব্যাপক যোগের ফলে চিত্তে দেখা দিতে লাগিল নূতন করিয়া জিজ্ঞাসা— সুরে ধরা পড়িল সংশয়ের রেশ। ভাবপ্রাধান্যের পরিবর্তে ঠিক যুক্তিপ্রাধান্য দেখা না দিলেও ভাবদৃষ্টিকে যুক্তি-দ্বারা কিছু-কিছু যাচাই করিয়া লইবার প্রবণতা দেখা দিয়াছে। ঈশ্বরে অন্ধভক্তিহীন মানবতাবাদ কবির মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া না

রাখিলেও তাহা কবির চেতনার মধ্যে নূতন শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। মহানপুরুষকে—'বিশ্বকর্মা দেব'কে—সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের মধ্যে খুঁজিয়া পাইবার চেষ্টা প্রবল হইয়া উঠিল, মানুষের সেবার মধ্য দিয়াই যে সেই 'মহান পুরুষ'কে অনুভব করিতে ও তাঁহার সেবা করিতে হইবে সকল অধ্যাত্ম চিন্তার মধ্যে—এই কথাটাই শেষজীবনে বড় হইয়া উঠিল। পূর্বেই বলিয়াছি, মহামানবের সঙ্গে যোগসাধনের প্রধান পন্থাও শেষপর্যন্তই রহিয়া গিয়াছে তাঁহার কবিকর্মে। অন্য কর্মপন্থার আদর্শ তিনি দিয়াছেন, সে বিষয়ে চিন্তা জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন, প্রেরণা দান করিয়াছেন, তাঁহার ভাব-ভাবনা চিন্তা-উপদেশ পরিকল্পনা-উৎসাহ দ্বারা কতকগুলি কাজ তিনি সহকর্মিগণের দ্বারা করাইয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজের পক্ষে যোগসাধনের শ্রেষ্ঠপন্থা রাখিয়াছিলেন সর্বপ্রকারের সাহিত্য ও শিল্পকর্ম।

ধর্মের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর এবং রবীন্দ্রনাথের মনের কাঠামোর যে কিভাবে মৌলিক পার্থক্য ছিল তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে একটি বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে তাঁহাদের কিছু বাদ-প্রতিবাদের ভিতর দিয়া। ১৯৩৪ সালে বিহারের ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা দেখা দিল। মহাত্মা গান্ধী তখন দক্ষিণ-ভারতে। সেখান হইতে তিনি হরিজন-পত্রিকায় একটি বিবৃতিতে মত প্রকাশ করিলেন যে বিহারের বর্ণহিন্দুগণের অস্পৃশ্যতা-পাপই হইল বিহারের ধ্বংসলীলার মূল কারণ; রুদ্র বিধাতার নিকট হইতে পাপের শাস্তি রূপেই এই ধ্বংসের কঠোর দণ্ড নামিয়া আসিয়াছে। বিবৃতি প্রকাশিত হইবার সঙ্গেসঙ্গে ভারতবর্ষের চিন্তানায়কগণের শ্রেষ্ঠপ্রতিনিধিস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে তৎকালীন 'ইউনাইটেড প্রেসে'র মারফত একটি তীব্র প্রতিবাদ বাহির হইল, প্রতিবাদে প্রকাশ পাইল রবীন্দ্রনাথের বেদনামিশ্রিত বিস্ময়। রবীন্দ্রনাথের মুখ্য বক্তব্য ছিল এই—

"প্রাকৃত জড়ঘটনাসমূহের একটি বিশেষ সমবায়ই হইল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অনিবার্য এবং একমাত্র কারণ। বিশ্ববিধানসমূহ অলঙ্ঘ্য; এই বিধানগুলির কাজে ঈশ্বর নিজেও কোনো দিন হস্তক্ষেপ করেন না। যদি করিতেন তবে তিনি নিজেই তাঁহার নিজের সৃষ্টির সামগ্রিক সততা নষ্ট করিয়া দিতেন। এই কথায় যদি আমরা বিশ্বাস না করিতাম তাহা হইলে বর্তমান যে ঘটনাটি ভয়াবহরূপে ব্যাপকভাবে আমাদের মর্মে তীব্র আঘাত করিয়াছে এই জাতীয় ঘটনাস্থলে বিধাতার কার্যকলাপের সমর্থন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত।

"আমরা যদি আমাদের নৈতিক সত্যগুলিকে বাহ্যসৃষ্টির ঘটনাসমূহের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলি তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে নৈতিক দিক দিয়া বিধাতা হইতে মানবপ্রকৃতি অনেক বড়; কারণ, দেখা যাইবে সৎচরিত্র-শিক্ষার প্রচারের জন্য তিনি এমন বিপর্যয় ঘটাইয়া বসেন যাহা সর্বনিকৃষ্ট চরিত্রের পরিচায়ক। আমরা মানুষের মধ্যে এমন কোনও সুসভ্য শাসকের কথা কল্পনা করিতে পারি না যিনি আকস্মিক নরহত্যার দ্বারা একটা বাছবিচারহীন দৃষ্টান্ত স্থাপনের চেষ্টা করিবেন; এ নরহত্যার মধ্যে শিশু আছে, অস্পৃশ্য সমাজের লোকেরাও আছে; আর এই হত্যাসাধন করা হইবে সেইসকল লোকেরই মনে দাগ কাটিবার জন্য যাহারা নিরাপদে দূরে বাস করিতেছে—অথচ তাহারাই হইল তীব্র নিন্দার ও শাস্তির যোগ্য।"

বিবৃতির শেষদিকে কবি বলিয়াছেন—

"আমাদের দিক হইতে এই বিশ্বাসেই নিজদিগকে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতেছি যে আমাদের

পাপ এবং ভুলভ্রান্তি যত বিপুলই হোক— তাহারা এত শক্তিশালী কখনোই নয় যাহাতে সৃষ্টির কাঠামোটিকেই নিম্নে টানিয়া লইয়া একেবারে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে।

"এই সৃষ্টির কাঠামোর উপরে আমরা পাপী এবং পুণ্যাত্মা, গোঁড়া এবং প্রথাভঙ্গকারীর দল— সকলেই নির্ভর করিতে পারি। মহাত্মাজী তাঁহার বিস্ময়কর প্রেরণা-দ্বারা দেশবাসীর মনে যে ভয় ও ভীরুতা সঞ্চিত ছিল তাহা হইতে সকলকে মুক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন; তাহার জন্য তাঁহার কাছে আমরা যাহারা অশেষভাবে কৃতজ্ঞ বলিয়া মনে করি তাহারাই আবার মনে অত্যন্ত বেদনা বোধ করি যখন দেখি যে মহাত্মাজীর মুখ হইতে এমন বাণী নিঃসৃত হইতেছে যাহা সেইসব দেশবাসীর মনে অযুক্তির উপাদানসমূহকে বড় করিয়া তুলিতে পারে— এই অযুক্তিই হইল সকল অন্ধশক্তির মূল আকর— যাহা আমাদিগকে জোরপূর্বক স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানের পথ হইতে দূরে সরাইয়া লইতে পারে।"

দেখা গেল যে রবীন্দ্রনাথের এই তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও মহাত্মাজী তাঁহার পূর্বমত হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বরঞ্চ নিজের মতে দৃঢ়তর রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি হরিজন-পত্রিকায় (১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪) কবির প্রতিবাদের উত্তরে আবার বিবৃতি দিয়া বলিলেন—

"শান্তিনিকেতনের কবি শুধু শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসিগণেরই 'গুরুদেব' নন তাঁহার নিজেরও 'গুরুদেব'। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই গুরুদেব এবং আমি আমাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির কতকগুলি পার্থক্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি। আমাদের নানা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের দ্বারা আমাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রীতির কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই, বিহারের বিপৎপাতের সহিত আমি অস্পৃশ্যতার যোগাযোগ স্থাপন করায় গুরুদেব সর্বশেষে যেসব কথা বলিয়াছেন তাহা দ্বারাও এই শ্রদ্ধাপ্রীতির কোনও লাঘব হইবে না।

"তিন্নোভেলিতে বসিয়া আমি প্রথমে যখন বিহারের বিপৎপাতকে অস্পৃশ্যতার সহিত যুক্ত করিয়াছিলাম তখন আমি যতদূর সম্ভব ভাবিয়া-চিন্তিয়াই কথা বলিয়াছিলাম, এবং সে কথা আমার পরিপূর্ণ অন্তর হইতেই বাহির হইয়াছিল। আমি যেমন বিশ্বাস করি তেমনই বলিয়াছিলাম। আমি বহুদিন ধরিয়া এই কথা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি যে প্রাকৃতিক ঘটনা প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক এই উভয়বিধ ফলই উৎপাদন করে। আমি ইহার উল্টাটাকেও সমভাবেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।

"আমার কাছে ভূমিকম্প ভগবানের কোনও খেয়ালমাত্র নয়, নিছক কতকগুলি অন্ধশক্তির মিলনেও ইহা সংঘটিত হয় নাই। আমরা ভগবানের সব বিধানের কথা জানি না, সেগুলির কার্যবিধির কথাও জানি না। সর্বাপেক্ষা সমুন্নত বৈজ্ঞানিক অথবা সর্বাপেক্ষা বড় অধ্যাত্মবাদীর জ্ঞানও একটি ধূলিকণার মত। আমার কাছে আমার ভগবান আমার পিতার ন্যায় একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জীব নন, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনন্তগুণে বেশি। আমার জীবনের ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটিতেও তিনি আমাকে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। আমি আক্ষরিক ভাবেই এ কথা বিশ্বাস করি যে তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত একটি পাতাও নড়ে না। তাঁহার করুণাময়ী ইচ্ছার উপরেই আমার প্রত্যেকটি শ্বাস নির্ভর করিতেছে।

"তিনি এবং তাঁহার বিধান এক। বিধানই ঈশ্বর। তাঁহার সম্পর্কে যেটাকে বিভূতি বলিয়া বলা হয় তাহা বিভূতি মাত্র নহে; তিনি নিজেই বিভূতি। তিনিই সত্য প্রেম বিধান— মানুষের

বুদ্ধিচাতুর্য আরও যত লক্ষ লক্ষ জিনিসের নাম করিতে পারে তিনি তাহার সবই। গুরুদেবের সহিত আমিও বিশ্ববিধানের অমোঘতায় বিশ্বাস করি, যাহার ভিতরে ভগবান নিজেও হস্তক্ষেপ করেন না। ইহার কারণ ঈশ্বর নিজেই বিধান। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার নিবেদন এই যে, আমরা বিধানসমূহের বিধান জানি না, এবং আমাদের নিকটে যাহা একটা সর্বনাশ বলিয়া মনে হয় তাহা ঐরূপ মনে হইবার কারণ এই যে, আমরা বিশ্ববিধানসমূহকে যথোপযুক্তভাবে জানি না।· ·

"গুরুদেবের সহিত আমি এ কথায় একমত নহি যে, 'আমাদের পাপ এবং ভুলভ্রান্তি যত বিপুলই হোক—তাহারা এত শক্তিশালী কখনোই নয় যাহাতে সৃষ্টির কাঠামোটিকেই নিম্নে টানিয়া লইয়া একেবারে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে।' অপর পক্ষে আমার বিশ্বাস, অন্য কোনও প্রাকৃতিক ঘটনা অপেক্ষা আমাদের নিজেদের পাপ-সমূহ এই কাঠামোটিকে ধ্বংস করিয়া দিতে অধিক শক্তিশালী। জড়বস্তু ও আত্মার মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য বিবাহবন্ধন রহিয়াছে; আমরা এতদুভয়ের ফলগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই অজ্ঞতাই অনেককে বাহ্য বিপৎপাতকে নিজেদের নৈতিক উন্নয়নের কাজে লাগাইতে সক্ষম করিয়া তুলিয়াছে।"

বিবৃতি দুইটির মধ্যে গান্ধীজীর এবং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে বড় দুইটি পার্থক্য দেখা দিয়াছে তাহা হইল এই: প্রথমতঃ গান্ধীজীর বিশ্বাস বাহ্যপ্রকৃতির নিয়ন্ত্রণকারী বিধানগুলি এবং মানুষের অন্তর্জগতের নিয়ন্ত্রণকারী বিধানগুলি সম্পূর্ণভাবে পৃথক পৃথক নয়, ভগবানের একই বিধানের দ্বারা জড়প্রকৃতি ও মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি একইভাবে নিয়ন্ত্রিত; তাঁহার ইচ্ছাই বিধানরূপে কাজ করে, সুতরাং বিধান এবং বিধাতা একই। জড়জগতের কোনও ঘটনা তাই মানুষের অন্তর্জীবনের ঘটনা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইতে পারে না; ভূমিকম্পস্বরূপ একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সহিত নিশ্চয়ই তাই মানুষের কর্মের যোগ রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিবৃতিতে সেই কথাটি অস্বীকার করিতেছেন; তিনি বলিতেছেন যে প্রকৃতির কতকগুলি অলঙ্ঘ্য বিধানের দ্বারা প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত, মানুষের নৈতিক বিধানের সহিত তাহার কোনও অচ্ছেদ্য যোগ নাই, মানুষের পাপভারে পৃথিবী কখনো রসাতলে যাইতে পারে না। গান্ধীজীর ধারণা, পৃথিবীকে রসাতলে পাঠাইবার ক্ষমতা মানুষের পাপেরই হইল সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ বর্তমান ক্ষেত্রে ধর্মের নামে এমন-কিছু বিশ্বাস করিতে ইচ্ছুক নন যাহা সরাসরি আমাদের যুক্তির বিরুদ্ধে যায়। গান্ধীজী সে ক্ষেত্রে বলিবেন, মানুষের বুদ্ধিবিচারের শক্তি একেবারেই সীমাবদ্ধ; তাই সেই বুদ্ধিবিচারের উপরে সর্বত্র নির্ভর করা সম্ভব নহে। ভগবান কোন্ ইচ্ছা লইয়া কোন্ কাজ করেন তাহা আমরা সবটা বুঝিয়া উঠিতে পারি না বলিয়া ভগবানের সক্রিয় ইচ্ছাকে যদি আমরা অস্বীকার করি তবে তো আমরা ভগবানকেই অস্বীকার করিয়া বসিব।

এখানে কাঁহার বিবৃতি, ঠিক কাঁহার বিবৃতি, যে ঠিক ইহা নির্ধারণ করা আমি দুঃসাধ্যই মনে করি; কারণ যুক্তি দিয়া যদি বিচার করিতে যাই তবে উভয়ের সঙ্গেই তর্ক করা যাইতে পারে; আসলে এখানে লক্ষ করিবার জিনিস হইল বিভিন্ন ধাতুতে গঠিত দুইটি মনে ধর্মবোধের স্বাভাবিক বিভিন্ন প্রকাশ। মানসিক সংগঠনের সঙ্গে এখানে মানসিক পরিবেশের পার্থক্যের প্রশ্নও অবজ্ঞেয় নহে। যে মানুষ এমন এক ইচ্ছাময় অনন্ত শক্তিমান ভগবানে বিশ্বাসী যিনি নিজের অনন্ত ইচ্ছাকেই অনন্ত শক্তিরূপে চালিত করিয়া সম-উদ্দেশ্যে সমচ্ছন্দে জড় ও চেতনাকে প্রতিমুহূর্তে পরিচালিত করিতেছেন

তাঁহার পক্ষে একটি বিরাট ভূমিকম্পকে ঈশ্বরের কোনও বিশেষ ইচ্ছার সঙ্গে যোগহীন চেতনমনুষ্যের জীবনযাত্রার সহিত সম্পূর্ণভাবে যোগহীন একটি প্রাকৃতিক নিয়মে আকস্মিক ঘটনামাত্র বলিয়া কিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব; এই প্রাকৃতিক বিপযয়ের দ্বারা মানুষই বিশেষভাবে বিপযস্ত হইতেছে অথচ মানুষের জীবনযাত্রার দোষগুণ বা পাপপুণ্যের সঙ্গে ইহার কোনই যোগ নাই এ কথাই বা কি করিয়া বলা চলে; হাজার হাজার মানুষ চরম দুর্গতি এবং যন্ত্রণা লাভ করিতেছে জড়প্রকৃতির কাছ হইতে— অথচ এই চরম দুর্গতির এবং যন্ত্রণার কারণ তাহার নিজের মধ্যে কোথাও এতটুকুও নাই— আবার সঙ্গে সঙ্গে বলিব যে এমন এক প্রেমময় মঙ্গলময় বিশ্বদেবতা রহিয়াছেন যাঁহার ইচ্ছা-সঙ্কল্প ব্যতীত গাছের পাতাটিও নড়ে না— ইহা যে স্ববিরোধী কথাই হইয়া দাঁড়ায়। একজন চরম ভগবদ্-বিশ্বাসীরূপে এ পর্যন্ত গান্ধীজীর কথা একরকম বুঝিতে পারি; কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে এই সত্যকে প্রয়োগ করিতে মনুষ্যবুদ্ধির উপরে সত্যসত্যই অত্যাচার করিতে হয়, এ-কথা অস্বীকার করিতে পারি না। যুদ্ধ মহামারী ভূমিকম্প প্রভৃতি জাতীয় আপৎপাত-কালে যখন এক সঙ্গে সহস্র সহস্র বা লক্ষ লক্ষ লোক সমভাবে চরম নিগ্রহ লাভ করে তখন এ কথা ভাবিতে সত্যই বাধা পাই যে কোনও পাপের সমকর্মফলেই ইহারা এই সমনিগ্রহ লাভ করিল। তাহা ছাড়া যেই বিশেষ ক্ষেত্র লইয়া এই বিতর্ক সেখানে আমরা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান আছে তাহাতে অস্পৃশ্যতার পাপের ফলে বিধাতার রুদ্ররোষ ভূমিকম্পরূপে দেখা দিলে বিহারের পূর্বে দক্ষিণ-ভারতের বহু ভূমিখণ্ড ফাটিয়া ধসিয়া বসিয়া যাওয়া উচিত ছিল; তাহা তো কোনো দিনও আমরা দেখিলাম না। এইখানেই উত্তর আসিবে ভগবৎ-ইচ্ছা কোথায় কিভাবে কাজ করে তাহা একান্তভাবেই মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। ইহা চরম বিশ্বাসীর কথা; গান্ধীজীরও এই কথা। রবীন্দ্রনাথ আসলে ঠিক এই ধরণের ব্যক্তি-ভগবানে বিশ্বাসী ছিলেন না, ধর্মের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ধরণের বিশ্বাসও তাঁহার ছিল না। যে-বিশ্বাস যুক্তিদ্বারা সমর্থিত নয় তাহাকেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'অযুক্তি' (unreason); তাঁহার মতে যাহা অযৌক্তিক তাহাই কুসংস্কার। গান্ধীজী বলিবেন, ইহা অযৌক্তিক নহে; যুক্তির অগোচর; যুক্তির অগোচর হইয়াও ইহা আমার চৈতন্যের ঘনীভবনের দ্বারাই নিজের ভিতরে লব্ধ, অতএব ইহা সত্য।

আমি একটু পূর্বেই মানসিক ধাতুগত পার্থক্যের সহিত মানসিক পরিবেশ পার্থক্যের কথা বলিয়াছি। বর্তমান ক্ষেত্রে মনে হয়, এই যুগে গান্ধীজীর দেহমন অস্পৃশ্যতা-রূপ মানবিক অবিচারের দ্বারা এমনভাবে অধিকৃত এবং উদ্বেজিত ছিল, অস্পৃশ্যতাকে ভারতবর্ষের জাতীয়-জীবনে তিনি এমন একটা মর্মন্তুদ অন্যায় বলিয়া প্রতি পলে উপলব্ধি করিতেছিলেন যে তাঁহার অন্তর্নিহিত সহজাত ন্যায়বোধই নানা দিক হইতে ইহার একটা প্রতিফলের আশঙ্কা করিতেছিল। ইহার ফলেই তিনি বিহারের ভূমিকম্পকে বিহারবাসীগণের অস্পৃশ্যতা-পাপের ফল বলিয়া সহজেই গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, ইহারই কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি হিবার্ট লেকচারস্-এ *'The Religion of Man'* ও কমলা লেকচারস্-এ 'মানুষের ধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। এই সময়ে তাঁহার ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচিন্তা মানবতাবাদের ধারার সহিত উপনিষদ্‌কে মিলাইয়া মিশাইয়া একটা নূতন রূপ গ্রহণ করিতেছিল। মানবতাবাদের দিকে ঝোঁকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মধ্যে যুক্তিবাদ ও

বিজ্ঞাননিষ্ঠার প্রাধান্যও লক্ষণীয়। পূর্বেও এই ঝোঁক তাঁহার মধ্যে যদি সমভাবে বর্তমান দেখিতে পাইতাম, পূর্বেও তিনি যদি এত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতে পারিতেন যে জড়জগতের প্রাকৃতিক বিধানের সহিত মনুষ্যজগতের নৈতিক বিধানের কোনওরূপ কোনও যোগ নাই তবে তাঁহার ভিতরকার নিত্যপরিবর্ধমান আমি-পুরুষটি যে বহুযুগ এক সঙ্গে একই ছন্দে ধূলি তৃণের সঙ্গে রোমাঞ্চিত হইয়া বিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে সেই কবি-অনুভূতিটি এত সহজ ও সুন্দর হইয়া দেখা দিতে পারিত না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে হইয়াছে। জীবনপথে গান্ধীজী আজীবনই কর্মযোগী; রবীন্দ্রনাথেরও কর্মজীবন রহিয়াছে, তথাপি সেই কর্মজীবনের মধ্যেও মুখ্যতঃ তিনি কবি। আজীবন কর্মী বলিয়া গান্ধীজী তাঁহার সকল ধর্মানুভূতি এবং ধর্মবিশ্বাসকে সর্বদাই জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিতেন। সকল রাজনৈতিক আন্দোলন, অর্থনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন— ভাবনাকে ইহার প্রত্যেক ক্ষেত্রে বাস্তবতা যেখানে রূঢ়তম রূপ ধারণ করিয়াছে গান্ধীজী সেইখানেই তাঁহার ধর্মের বিশ্বাস এবং ভাবনাকে সমস্ত দেহমন দিয়া বার বার করিয়া প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ধর্মবোধকে জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন নাই এমন কথা প্রকাণ্ড ভুল কথা হইবে, কিন্তু গান্ধীজীকে জীবনের প্রতি পদে পদে যেরূপ বাস্তব রূঢ়তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে রবীন্দ্রনাথকে তাহা হইতে হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের ধর্মানুভূতির ক্ষেত্র তাই মুখ্যভাবে কাব্যানুভূতির ক্ষেত্র। সেই কাব্যানুভূতির ভিতর দিয়া তাঁহার ধর্মবিশ্বাস জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাব্যানুভূতির ভিতর দিয়া লব্ধ রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাসের মুখ্য কথা হইল সৃষ্টির উপরিতলায় 'যদ্ বিভাতি' তাহা সবকিছুই 'আনন্দরূপমমৃতম্' আর ইহার নীচের তলায় নিত্যকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া আছেন 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্'। কবি-অনুভূতির ভিতর দিয়া এই ধর্ম-অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনে একান্তভাবে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল; শুধু তাঁহার নিজের জীবনে নয়, তাঁহার গান ও কবিতার মধ্য দিয়া এই সত্যকে তিনি নিখিল মানবের জীবনে অনেকখানি সত্য করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গান্ধীজীর অবিচলিত শ্রদ্ধার ইহার একটি মূল কারণ। টলস্টয় বার বার করিয়া এই কথাটি বলিয়াছেন যে, কবিরা হৃদয়ের কাছে প্রত্যক্ষ আবেদন জানাইয়া সত্যকে বৃহত্তর জনসমাজে যেভাবে গ্রাহ্য করিয়া তুলিতে পারেন অপর কেহই তেমন করিয়া পারেন না। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেই কথাটি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়াতেই রবীন্দ্রনাথকে তিনি আন্তরিকতার সহিতই 'গুরুদেব' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কিন্তু গান্ধীজীর ন্যায় প্রত্যেক রূঢ় বাস্তবতার খুঁটিনাটির ভিতরে ধর্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ তেমন অভ্যস্ত ছিলেন না বলিয়াই হয়তো ঐ জাতীয় প্রসঙ্গে সর্বত্র ধর্মকে টানিয়া আনাটা রবীন্দ্রনাথের তেমন ভালো লাগত না। এই জন্যই কি গীতার উপস্থাপনাটি তাঁহার তেমন ভালো লাগে নাই? অতবড় একটা যুদ্ধের প্রয়োজনের সঙ্গে গীতার অধ্যাত্ম উপদেশের মিশ্রণ রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত ছিল না। রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত ১৩১৫, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে লিখিত একখানি পত্রে (পত্রখানি শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'ধম্মপদ-পরিচয়' গ্রন্থে উদ্‌ধৃত আছে) দেখিতে পাই—

"গীতার মধ্যে কোনো-একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনের সুর আছে। তাই ওর নিত্য অংশের সঙ্গে একটা ক্ষণিক অংশ জড়িয়ে গিয়ে কিছু যেন বিরোধ বাধিয়ে দিয়েছে। কোনো-একজন

মহাপুরুষের বাক্যকে কোনো একটি সংকীর্ণ ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করলে যে রকমটি হয়, গীতায় সে রকম একটা টানাটানি আছে। অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্যে আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে তার মধ্যেও বিশুদ্ধ সত্যের সরলতা নেই। আমার মনে হয় বৌদ্ধ উপদেশে ভারতবর্ষকে যখন নিষ্ক্রিয় করে তুলেছিল, যখন অহিংসাধর্মের সাত্ত্বিকতা কেবলমাত্র negative লক্ষণাক্রান্ত, সুতরাং পূর্ণ সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল, তখন কোনো একজন মনস্বী পূর্বতন গুরুর উপদেশকে কর্মোৎসাহকরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সম্মুখে একটি সাময়িক প্রয়োজন অত্যন্ত উৎকটভাবে থাকাতে ব্যাখ্যাটির মধ্যে খুব উচ্চভাবের সঙ্গেও তর্কচাতুরী খানিকটা না মিশে থাকতে পারে নি।"

আসলে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া অত অধ্যাত্মিক উপদেশের ছড়াছড়ি রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগে নাই। গান্ধীজীর কিন্তু এইটিই আবার সর্বাপেক্ষা বেশি ভালো লাগিয়াছে। তিনি বলিতেন, ধর্মোপদেশের প্রকৃষ্ট স্থান কোথায়? যেখানে ক্ষুদ্র স্বার্থের লোভে ভাইয়ে ভাইয়ে সর্বধ্বংসী যুদ্ধের সম্ভাবনা তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়াই তো মানুষকে মানুষের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। উপরের তলায় সবই যদি 'আনন্দরূপমমৃতম্‌' হয়, আর নীচের তলায় শুধু 'শান্তং শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌' হয় তবে বিহারের ভূমিকম্পের সত্যকে কিভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে এ কথাটা সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রবল হইয়া জাগিয়া ওঠে নাই; তাই তিনি এ প্রসঙ্গে কোনও 'অযুক্তি'র কথা না বলিয়া পারিয়াছেন, গান্ধীজী অগ্রবর্তী হইয়া এখানেও ধর্মবোধকে যেভাবে প্রয়োগ করিতে গিয়াছেন রবীন্দ্রনাথকেও সেইভাবে কথা বলিতে হইলে তিনিও কিছু 'অযুক্তি'র কথা বলিয়া ফেলিতেন আশঙ্কা করি। 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি', বিহারের ভূমিকম্পের বজ্রও সহস্র সহস্র মানুষের উপরেই পতিত হইয়াছিল। সেই বজ্রে কি কোনো বাঁশিই বাজে নাই? সাধারণভাবে বজ্রে বাঁশি বাজে এ কথায় তেমন কোনও আপত্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বজ্রপাতে কি বাঁশি বাজিল সেইখানেই তো সকল সমস্যা।

পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে পথে ধর্মবোধের জাগরণ ও ধীরে ধীরে ঘনীভবন ঘটিয়াছে গান্ধীজীর জীবনে সে পথে ধর্মবোধের জাগরণ ও ঘনীভবন হয় নাই। শুধু শাস্ত্র পারিবারিক প্রভাব বা সামাজিক পরিবেশের ভিতর দিয়া ইঁহাদের ধর্মবোধের জাগরণ নয়। মহাত্মা গান্ধীর ক্ষেত্রে দেখিয়াছি প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ-আফ্রিকায় লাঞ্ছিত মানবের জন্য সত্যাগ্রহের সংগ্রামের ভিতর দিয়া আরম্ভ হইয়াছে তাঁহার কর্মজীবন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চলিয়াছে এই সংগ্রামময় কর্মজীবন। এই কর্মজীবনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গান্ধীজী সর্বদার জন্য অফুরন্ত আত্মিক শক্তির প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন, ভিতর হইতেই তীব্র আবেগ বোধ করিয়াছেন আত্মিক শক্তির কোথাও একটি অফুরন্ত আকর আবিষ্কার করিয়া লইতে; ভগবৎ-বোধ তাঁহার ভিতরে জাগ্রৎ হইয়া উঠিল এই আত্মিক শক্তির অনন্ত আকররূপে; দেহমন শিথিল হইতে চাহিলে তিনি আত্মস্থ হইয়া ভগবানের সহিত তাঁহার সমগ্র জীবনের এবং তৎসহ সমগ্র বিশ্বজীবনের একান্তযোগকে অনুভব করিতে চাহিতেন, ভগবানের নিকট হইতে নব নব শক্তি ও প্রেরণা লাভ করিবার চেষ্টা করিতেন, জীবন শুকাইয়া আসিতে চাহিলে ভগবৎ-প্রেমের অমৃতরসে তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন। গান্ধীজীর জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়াছে লাঞ্ছিত মানুষ, নিপীড়িত মানুষ এবং মেহনতী মানুষের

মধ্যে। মেহনতী মানুষের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে গান্ধীজীর মধ্যে এই ভাবটি পরিপুষ্ট এবং দৃঢ়মূল হইয়া উঠিল যে কায়িক শ্রম অধ্যাত্মচিন্তা ও অনুভূতির ভিত্তিভূমি, দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির ইহাই প্রাথমিক সোপান। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, সহজাত প্রবণতা হইতেই তিনি জীবনের প্রথমাবধি বিশ্বসৃষ্টিকে অসম্ভব রকমে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছেন। যেমন তাঁহার রূপমুগ্ধতা, তেমন তাঁহার প্রেমমুগ্ধতা। সৌন্দর্যের অনুভূতি অজস্রভাবে লাভ করিয়াছেন বিশ্বপ্রকৃতির নিকট হইতে; সেই সৌন্দর্যকে আবার মানুষের অনন্তরহস্যময় চেতনার স্পর্শে পরিপূর্ণ করিয়া পাইয়াছেন মানুষের প্রেমে। তাই তিনি বিশ্বপ্রকৃতির সব-কিছুকেও ভালোবাসিয়াছেন, মানুষকেও ভলোবাসিয়াছেন। এই গভীর ভালোবাসায় বিশ্বপ্রকৃতির সব-কিছুর মধ্যেও নামিয়া আসিয়াছে অনন্তের স্পর্শ, মানুষের সব-কিছুর মধ্যেও নামিয়া আসিয়াছে অনন্তের স্পর্শ। সকল সীমা কবিহৃদয়ে জাগাইয়া তুলিতে লাগিল অসীমের আভাস। কবির গভীর হৃদয়ানুভূতির মধ্যে সে অসীম নিছক একটা তথ্যগত বা রূপরসহীন তত্ত্বমাত্র হইয়া প্রকাশ পায় নাই—প্রকাশ পাইয়াছে জীবনের সকল সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমের আকররূপে। সেই অসীমই রবীন্দ্রনাথের সকল অধ্যাত্মচেতনার মূলে।

এই যে দুইটি পথ ইহা সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী দুইটি পথ নয়, জীবনে ইহারা দেখা দেয় পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক হইয়া। রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজীর ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের গান, গান্ধীজীর মনকে সরস করিয়া তুলিয়াছে; আবার জীবন-সংগ্রামের সর্বক্ষেত্রে অধ্যাত্মবোধে অচল প্রতিষ্ঠা গান্ধীজীর জীবনে যে বার বার সত্যমূল্য লাভ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাহার সর্বত্রই অনুভব করিয়াছেন চিত্তবিস্তার। এ-ভাবে উভয়ের ধর্মবোধ উভয়ের অনুপূরক; পরিণাম দুইয়ের মধ্যে গভীর মিল এবং ঐক্য। গান্ধীজীর সকল ধর্মচিন্তা ও অনুভূতি চরম পরিণতি লাভ করিল জীবনের এই ধ্রুবপদে যে জীবনের যাহা-কিছু সকলের মূল্য অধ্যাত্মসত্যের স্পর্শে, রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনেরও এইটিই ধ্রুবপদ। একদিকে উভয়ই যেমন জীবনের চরমমূল্য লাভ করিতে চাহিয়াছেন অধ্যাত্মবিশ্বাসের মধ্যে, অপর দিকে উভয়ই আবার এই অধ্যাত্মবোধের চরমসার্থকতা লাভ করিতে চাহিয়াছেন মহামানবের কল্যাণের মধ্যে।

গান্ধীজীর ক্ষেত্রে দেখিলাম, লাঞ্ছিত অত্যাচারিত সংগ্রামী মানুষ এবং শ্রমনির্ভর মেহনতী মানুষের সংস্পর্শেই অধ্যাত্মচেতনার উদ্বোধন ও পরিপুষ্টি। এই দিক হইতে টলস্টয়ের সহিত গান্ধীজীর একটা গভীর মিল এবং যোগ ছিল। টলস্টয়ও ছেলেবেলা হইতে পারিবারিক চার্চধর্মের প্রথাবদ্ধ প্রার্থনা-অনুষ্ঠানাদির মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু যত বয়স বাড়িতে লাগিল এবং বুদ্ধি বাড়িতে লাগিল টলস্টয় তত তীব্রভাবে নাস্তিক হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার 'আমার স্বীকৃতি' *(My Confession)* নামক গ্রন্থে একস্থানে তিনি বলিয়াছেন—

"মানুষের জীবন ও বিবর্ধনের মূলে রহিয়াছে কতকগুলি অধ্যাত্মিক কারণ, সেই আধ্যাত্মিক কারণগুলিই ভাবাদর্শরূপে মানুষের জীবন পরিচালন করে। এই ভাবাদর্শগুলি প্রকাশ লাভ করে মানুষের ধর্মে, বিজ্ঞানে, শিল্প-কলা-সাহিত্যে, মানুষের বিভিন্ন প্রকারের রাষ্ট্রব্যবস্থায়। এই ভাবাদর্শগুলি ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া উর্ধ্বগামী হইতে থাকে, শেষে গিয়া পরম শ্রেয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি

নিজে একজন মানুষ, মানুষের এই ভাবাদর্শকে প্রচার করা এবং তাহাদিগকে সর্বজনগ্রাহ্য করিয়া তোলায় সাহায্য করাই আমার একান্ত কর্তব্য।"

কিন্তু টলস্টয় অসাধারণ সারল্যের সঙ্গে তাঁহার স্বীকৃতিতে বলিয়াছেন, তাঁহার তৎকালীন ভোগলিপ্সু বিলাস-ব্যসনে মগ্ন উচ্ছৃঙ্খল অভিজাত জীবনে এ কথাগুলি যথার্থ কোনো সত্য বহন করিত না, এগুলি দেখা দিত জীবনের দুর্বল মুহূর্তগুলিতে কতকগুলি অলীক সান্ত্বনা বা বঞ্চনার মত। তিনি বলিয়াছেন যে তিনি নিজের দিকে কেবল তাকাইতেন এবং পরশ্রমনির্ভর অত্যাচারী ভোগলিপ্সু তাঁহার সমশ্রেণীর অভিজাত-সম্প্রদায়ের লোকদিগের দিকে তাকাইতেন; তাকাইয়া তাকাইয়া তাঁহার মনে হইত চারিটি উপায়ে এই সম্প্রদায়ের লোক জীবনের ভীষণতাকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছে। পলায়ন-চেষ্টার প্রথম চেষ্টা হইল অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া; জীবন জিনিসটাই যে খারাপ, ইহার সবটার মধ্যেই রহিয়াছে যে অসংগতি— এইটাকে অনুভব না করিবার এবং না বুঝিবার চেষ্টা করিয়া। দ্বিতীয় উপায় হইল এপিকিউরীয়— আমরা যাহাকে বলিতে পারি চার্বাকীয়; জীবনের সকল নৈরাশ্যের মধ্যেই যেখানে যেটুকু সুবিধাজনক আছে তাহাকে কাজে লাগাইয়াই যতটুকু সুখে থাকা যায়। তৃতীয় উপায় হইল চরিত্রের দৃঢ়তা ও সরলতা অবলম্বনে জীবনের ভীষণতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা; জীবনকে হত্যা করিয়াই এখানে আমরা জীবন হইতে রক্ষা পাইতে চাই। চতুর্থ উপায় হইল চরম দুর্বলতার আশ্রয় গ্রহণ করা, সেই দুর্বলতা হইতেই উদ্ভব আমাদের তথাকথিত ধর্মের। এই-জাতীয় আত্মাবলোকন বহুদিন পর্যন্ত টলস্টয়কে জীবনের চরম অর্থহীনতাবোধের এমন-একটা অসহ্যজ্বালার মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল যে তিনি মনে করিতেছিলেন আত্মহত্যা ব্যতীত এই যন্ত্রণা হইতে আর মুক্তি নাই।

কিন্তু এইভাবে দীর্ঘদিন মানসিক দ্বন্দ্ব ও অশান্তির পরে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের কালে টলস্টয় মানুষের জীবনের মধ্যেই তাঁহার প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সংশয়-নৈরাশ্যের আত্মঘাতী বিষযন্ত্রণা পরশ্রমোপজীবী বিলাসী অভিজাত তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মানুষেরই সৃষ্টি। সহজ সরল যে কোটি কোটি মানুষ খাটিয়া খাইয়া দরিদ্রজীবন যাপন করিতেছে তাহারা উপরিউক্ত চারি-উপায়ের কোনও উপায়েই জীবনকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করে না; শত দারিদ্র্য-দুঃখের মধ্যেও তাহারা কি গভীর বিশ্বাসে জীবনকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে। তথাকথিত শিক্ষিত সভ্য নাগরিক-মনের বুদ্ধিবৃত্তি জীবনের সত্যকে বুঝিতে গিয়া নিরন্তর ব্যর্থতায় কেবল মৃত্যু কামনা করিতেছে; আর এই চাষী-মজুর শ্রেণীর কোটি কোটি মানুষ যুক্তিতর্ক ব্যতীত তাহাদের নির্মল চেতনার মধ্যে একান্ত সহজাতভাবেই জীবনের একটা গভীর অর্থ আবিষ্কার করিয়া জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। মানুষের স্বার্থান্ধ ভোগলিপ্সু শোষকের বিকৃত বুদ্ধির কাছেই সত্যকার জীবন-জিজ্ঞাসার কোনও উত্তর নাই; শ্রমপূত সুস্থ সবল মানুষের তর্ককুজ্ঝটিকাহীন চেতনায় জাগিয়া ওঠে জীবনের যে গভীর প্রত্যয় তাহাই বুঝাইয়া দেয় জীবনের সত্যকার অর্থ। এই গভীর জীবন-প্রত্যয়ই তাহাদের জীবনে দেখা দেয় বিশ্বাস রূপে; এই বিশ্বাসই জীবন-শক্তি, এই বিশ্বাস কখনও মরিতে প্ররোচিত করে না— বাঁচিয়া থাকিতে আনন্দ ও প্রেরণা দান করে। নিজের জীবনেও তখন টলস্টয় বিশ্বাস লাভ করিলেন; সেই বিশ্বাস তাঁহাকে ইহাই শিক্ষা দিল—

"কোনও এক পুরুষের ইচ্ছাতেই এই জগতের জীবন প্রবাহিত হইতেছে। এমন একজন কেহ

আছেন যিনি আমাদের নিজেদের জীবন এবং এই বিশ্বজীবনকে তাঁহার দুর্জ্ঞেয় যন্ত্র-বিধানের দ্বারা ধারণ করিয়া আছেন। সেই ইচ্ছা আমাদের জীবনের ভিতর দিয়া কি চায় তাহা ঠিক ঠিক বুঝিয়া লইবার আশা করিলে প্রথমে আমাদের সেই ইচ্ছাকে পালন করিতে হইবে, আমাদের জীবনে যাহা করণীয় তাহা আমাদিগকে করিতে হইবে। আমার যাহা করণীয় তাহা যে পর্যন্ত আমি না করি সে পর্যন্ত আমার দ্বারা তিনি কি করাইতে চান তাহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিব না, বিশ্বসৃষ্টির পিছনে তাঁহার কি উদ্দেশ্য তাহা আরও কম বুঝিতে পারিব।" এখানে টলস্টয়ের মুখ্য বক্তব্য এই, জীবনের সুষ্ঠু যাপনের ভিতর দিয়াই জীবনের পশ্চাতে নিহিত ভগবৎ-ইচ্ছাকে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়, জীবনকে ঠিকভাবে যাপন না করিয়া তাহাকে অতৃপ্ত বাসনা লইয়া শুধু ভোগ করিতে চাহিলে জীবনের মহিমা বা তাহার অন্তর্নিহিত ভগবৎ-ইচ্ছা কিছুই বোঝা যাইবে না। সুষ্ঠুভাবে শ্রমপূত নির্লোভ জীবন যাপন করিলে আমরা জীবনের যে অর্থ বুঝিতে পারিব, টলস্টয়ের ভাষায় তাহা হইল এই—

"আমরা সকলেই পৃথিবীতে আসিয়াছি ভগবৎ-ইচ্ছায়; ভগবান মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে মানুষ নিজের আত্মাকে ধ্বংসও করিতে পারে রক্ষাও করিতে পারে। নিজের আত্মাকেই রক্ষা করাই যখন মানুষের জীবনের সমস্যা তখন মানুষকে ভগবৎ-বিধান অনুসারে জীবন যাপন করিতে হইবে। ভগবৎ-বাণী ও ভগবৎ-বিধান অনুসারে জীবন যাপন করিতে হইলে মানুষকে জীবনের সকল ভোগ-আরাম ত্যাগ করিতে হইবে, কায়িক শ্রম করিতে হইবে, বিনীত হইতে হইবে, ধৈর্যশীল হইতে হইবে— প্রত্যেক মানুষের প্রতি করুণায় জাগ্রত হইতে হইবে।"

এই যে মহাকরুণায় সদা চিত্তকে জাগ্রত রাখিয়া নিখিলমানবের সহিত একান্তযোগের কথা ধর্মের ক্ষেত্রে এ কথা টলস্টয় গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথ— এই তিনেরই চরম কথা। কিন্তু টলস্টয় এবং গান্ধীজীর জীবনে দেখিতে পাই, তাঁহারা তাঁহাদের সহজাত প্রবণতা বশে পৃথিবীর শোষিত মানুষের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন; সেই যোগের মধ্য দিয়া তাঁহারা অধ্যাত্ম একের সহিত যোগ জীবনের প্রতি স্তরে অনুভব করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিজীবনের প্রথম হইতেই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি এবং মহামানবকে নিজের জীবনের সহিত অখণ্ডভাবে যুক্ত করিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমজীবনে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তাঁহার হৃদয়ের যোগ যত প্রত্যক্ষ ও সত্য ছিল বিশ্বমানবের সহিত যোগ সেভাবে প্রত্যক্ষ ছিল না; বিশ্বমানবের সহিত যোগ প্রকাশ পাইয়াছে একটা সহজাত প্রবল কবি-আকাঙ্ক্ষা-রূপে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনেও আমরা লক্ষ করিতে পারি, বিশ্বসৃষ্টির পিছনকার একটি এক সত্যের চেতনা তাঁহার ভিতরে যতই স্থির এবং ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল ততই তাঁহার ভিতরে একটা দৃঢ়বদ্ধ ধারণা জন্মিতে লাগিল— যে একেকে পায় সে সকলেই পায়; যে একের ভিতর দিয়া সকলকে না পাইল তাহার জীবনে একের উপলব্ধি কখনও সত্য হইয়া উঠিতে পারে না। অধ্যাত্মপ্রেম যদি নিখিলমানবের প্রতি সক্রিয় প্রেমে বিষয়ীকৃত হইয়া না উঠিল তবে অধ্যাত্মপ্রেম একটা শূন্য পদার্থ হইয়া রহিল। যিনি এক তিনি শূন্য এক নন, তিনি পূর্ণ এক; নিখিল-মানবকে এড়াইয়া গিয়া আমরা পূর্ণ একের কোথায় সন্ধান পাইব; রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও তাই এই আশ্চর্য জিনিসটি লক্ষ করি, তিনি জীবনে অধ্যাত্মসত্যে যত বেশি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা

করিতে লাগিলেন ততই বেশি করিয়া নিজেকে মানবসত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহামানবের পরিপূর্ণ বিকাশের ভিতর দিয়াই যে মর্ত্যের মধ্যেই দেবত্বের পূর্ণাবতরণের সম্ভাবনা এই কথাটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরিণত বয়সের কবিতা গান ও গদ্য প্রবন্ধ ও ভাষণের মধ্য দিয়া সমস্ত জগতের মধ্যে এত তারস্বরে এবং হৃদয়গ্রাহী ভাবে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন যে সে বাণী দেশকালের সীমানা অতিক্রম করিয়া নিখিল-মানবের নিকটে একটি নিত্যকালের আহ্বান হইয়া রহিয়াছে।

কবি-গুরুদেব

সুনীলচন্দ্র সরকার

শিক্ষাচিন্তার প্রাচীনতম নিদর্শন খুঁজতে হলে অবশ্য চলে যেতে হয় উপনিষদে গীতায়। কণফ্যুসিয়স্ ও লাওৎসে বা প্লেটো ও এরিস্টটলের রচনায়। কিন্তু সে সম্বন্ধে রীতিমত ধারাবাহিক চিন্তা একটা আধুনিক ঘটনা ; আর শিক্ষাসমস্যাগুলিকে মানুষের জীবন ও সভ্যতার পশ্চাৎপটে রেখে দেখবার চেষ্টা বা শিক্ষার পরিকল্পনা ও পদ্ধতিগুলিকে বিবর্তন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমন্বিত করার চেষ্টা তো আরো সাম্প্রতিক। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়ে তাঁদের যাঁরা আজ পৃথিবীর সব দেশেই great educators বা শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু হিসাবে স্বীকৃত : জঁ জাক্ রুশো (১৭১২-৭৮), পেস্টালৎজি (১৭৪৬-১৮২৭), ফ্রোয়েবেল (১৭৮২-১৮৫২), আর জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২)।

এঁরা প্রত্যেকে যে কাজের দায়িত্ব বেছে নিয়েছিলেন তাতে সফল হবার জন্যে আবশ্যক ছিল শুধু অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিই নয়, তা ছাড়া বহুলপরিমাণ কল্পনাশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি এবং বিচিত্র ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে সহানুভূতি ও মূল্যবোধ। আদর্শ শিক্ষাগুরুর মধ্যে একত্র হওয়া চাই দার্শনিক, কবি, মরমী সন্ত, সমাজসংস্কারক, বৈজ্ঞানিক ও কর্মবীরের প্রতিভা ; কারণ তাঁকে সকল ধরণের লোক ও তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বুঝতে হবে। মানুষের ব্যক্তিত্বের সমস্ত দিক, তার অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তর, চেষ্টা ও সিদ্ধির বিভিন্ন ক্ষেত্র—এর সব-কিছুই তাঁকে হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে। যে চারজন শিক্ষাগুরুর নাম করা হয়েছে তাঁদের কেউই এইসমস্ত গুণ ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেই অন্তত স্বনির্বাচিত কাজের উপযুক্ত গুণ ও ক্ষমতাগুলি লাভ করেছিলেন।

রুশো চেয়েছিলেন দোষসংস্পর্শমুক্ত শুদ্ধ মানবপ্রকৃতি নিয়ে তাঁর শিক্ষাসৌধ রচনা করতে ; রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক চিন্তায় ছিল তাঁর মৌলিকদানের দাবি, আর মানুষ ও প্রকৃতিকে একটি গভীর তাৎপর্যময় দৃষ্টিতে দেখবার ক্ষমতা ছিল তাঁর যা কবিদের পক্ষেই সম্ভব।

পেস্তালৎজি ছিলেন চার্চের একনিষ্ঠ কর্মী ও একাগ্র সমাজসংস্কারক। একটি ধর্মানুগত পরিবারের জীবনে যে সুন্দর ও মূল্যবান উপাদানগুলি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তারই সাহায্যে তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা ও সমাজ দু'এরই সংস্কার করতে। সেই উপাদানগুলি হচ্ছে : বাপমায়ের স্নেহ, সন্তানের শ্রদ্ধা ও কর্তব্যপরায়ণতা, সেবার আদর্শ, ধৈর্য ও যত্নের সঙ্গে করা হাতের কাজ, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, কুটীরশিল্প। গান্ধীজীর সঙ্গে এই মহানুভব ব্যক্তির সাদৃশ্য স্বীকার করতেই হয়। এই পূর্বগামী শিক্ষা নিয়ে যে ধরণের পরীক্ষা করেছিলেন তার সঙ্গে গান্ধীজীর নয়া তলিমের যথেষ্ট মিল আছে।

ফ্রোয়েবেলও ছিলেন এক ধর্মযাজকের ছেলে। গভীর গণিতচিন্তার সঙ্গে একটি মরমী বা আধ্যাত্মিক মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গির মিলন হয়েছিল তাঁর প্রকৃতিতে। তিনিও ছিলেন প্রকৃতির অনুরাগী ; আর বনবিভাগের এক পদস্থ কর্মী হিসাবে কাজ করবার সময় প্রকৃতির খুব ঘনিষ্ঠ ও গভীর সান্নিধ্য লাভ করবার সুযোগও হয়েছিল তাঁর। তিনিই প্রথম শিক্ষার ক্ষেত্রে আনলেন খেলা ও আনন্দময় অভিজ্ঞতার নীতি, শিশুর আন্তর পরিণতির সঙ্গে সম্পর্কিত করতে চাইলেন একটি সার্বিক মনের ক্রিয়া

সম্বন্ধে তাঁর যা ধারণা তার। স্কুলকে তিনি রূপান্তরিত করে তুলতে চাইলেন একটি সুন্দর ছোট বাগান, একটি কিণ্ডারগার্টেন, যেন তার উপর অবাধে ঝরে পড়তে পারে এই বিশ্বের সমস্ত মঙ্গলময়শক্তি ও প্রভাবগুলি। এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এই পূর্বগামীর মিল সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

পাশ্চাত্ত্য জগতের আধুনিকতম শিক্ষাগুরু জন ডিউই ছিলেন একজন বিশিষ্ট দার্শনিক। বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধি বিশ্লেষণ ও কল্পনার নিপুণ ও ব্যাপক প্রয়োগে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই তাঁর সমসাময়িক চিন্তানায়কদের মধ্যে তাঁর স্থান অতি সহজেই ছিল সকলের উপরে। ডিমোক্রেসি ও শিক্ষা— যে শিক্ষার সাহায্য ছাড়া ডিউইর মতে ডিমোক্রেসির ভিত পাকা করবার অন্য কোনো উপায় নেই— এই দুটির উপরই ছিল তাঁর দৃঢ় আস্থা। প্রাণতাত্ত্বিক প্রকৃতিবাদের (biological naturalism) গভীর তত্ত্বানুসন্ধানী তিনি— তাই বিবর্তন ও শিক্ষা দুই ক্ষেত্রেই জীবন-অভিজ্ঞতার মূল্য তিনি বিশেষভাবে ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষা একরকমের সংহত সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি যা নির্ভর করে মানুষের এই জীবন-অভিজ্ঞতা ও তার বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী চিন্তার ধারাবাহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর। রুশোর আবদেনগুলির মধ্যে সযত্নে বাছাই করে যা-কিছু মূল্যবান বলে মনে হয়েছে ডিউই অবাধে তা গ্রহণ করেছেন। নিজে সমাজ-অভিজ্ঞতা ও শিশুর সমাজীকরণের সমর্থক হওয়ায় পেস্টালৎজির পদ্ধতি থেকে তিনি নিয়েছেন অন্তরঙ্গতা ও পারস্পরিক প্রীতির ঘরোয়া মনোরম পরিবেশ, শুভ চিন্তা ও অনুভূতি আর স্বাধীন ও সফল সম্বন্ধ-স্থাপনের উপর একটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। ফ্রোয়েবেলের কাছে তিনি শিখেছেন খেলার রীতি (play-way) আর জগতের সমস্ত ব্যাপার ও ঘটনার প্রতি এক্‌স্‌পেরিমেণ্টসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি। এইসমস্ত উপাদানগুলি অনন্যসাধারণ চিন্তাসংহতির আশ্চর্য কৃতিত্বে তিনি সমন্বিত করেছেন। দর্শনের প্রয়োগবাদী দলের (pragmatist school) একজন নেতা হিসাবে সেই ধরণের চিন্তাকেই ডিউই প্রাধান্য দিয়েছেন যা ব্যাবহারিক জগতে কোনো ফল দর্শাতে পারে। তাঁর দুই পূর্বগামী পেস্টালৎজির ও ফ্রোয়েবেলের মত ডিউইও নিজেই শিক্ষা সম্বন্ধে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্‌ চালিয়েছেন শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর আগে ১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত তাঁর ল্যাবরেটরি স্কুলে— এইটে দেখবার জন্যে যে তাঁর ধারণা ও পরিকল্পনাগুলির সত্যই কোনো ব্যাবহারিক সার্থকতা আছে কিনা। কিন্তু অপরপক্ষে ডিউইর মধ্যে যার অভাব দেখা যায় এমন কতকগুলি গুণ অপর শিক্ষাগুরুদের ছিল। যথা : ফ্রোয়েবেলের মরমী তত্ত্বজ্ঞতা, পেস্টালৎজির ধর্মানুরাগও ও আত্মদান, কিম্বা রুশোর কবিসুলভ সংবেদনশীলতা ও বোধের সূক্ষ্মতা। কিংবা যদি বা মনের গভীরে এইসব ব্যাপারে কিছুটা প্রতিবেদনক্ষমতা তাঁর থেকেই থাকে, তাঁর শিক্ষাপরিকল্পনার মধ্যে সেগুলিকে তিনি এত নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত বেশে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন যে প্রকৃতিবাদসম্মত নীতি ও বৃত্তান্তগুলির থেকে তাদের আলাদা করে চিনে নেওয়াই শক্ত হয়ে পড়েছে। ডেমোক্রেটিক জীবনরীতি আর বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতিই হচ্ছে দু'টি প্রহরী যারা ডিউইর শিক্ষাজগৎকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের আয়ত্তাধীন করে রেখেছে।

তাঁর নিজের একটি বিদ্যালয় খোলবার আগেই রুশোর মতবাদ ও ফ্রোয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয় কিছুটা পরিচয় ছিল। আর তাঁর নবতর এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট শিক্ষাসত্রের সূচনার আগে ডিউইর চিন্তাধারা ও এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট পদ্ধতির বিষয়েও তিনি অনেক কথা জানতে

পেরেছিলেন। শ্রীএল্‌ম্‌হার্স্ট— যিনি শ্রীনিকেতন পল্লীউন্নয়ন কেন্দ্রের কাজে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী বন্ধু ও সহকর্মী হিসাবে এসে যোগ দিয়েছিলেন এবং শিক্ষাসত্র এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্ব অনেক পরিমাণে বহন করেছিলেন, তিনি— ছিলেন ডিউইর মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির সূক্ষ্মতর আবেদনও এল্‌ম্‌হার্স্ট সাহেবের মনে সাড়া জাগিয়েছিল।

কিন্তু এ কথা নিশ্চয় যে শিক্ষাগুরু হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব তাঁর ব্যক্তিগত পরিণতির অন্তর্গত একটি ব্যাপার, তাঁর আজন্ম জীবন ও অভিজ্ঞতাধারার অবশ্যম্ভাবী ফল। যে পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল কে জানে কেমন করে সেই পরিবার নিজের বাসস্থানটিকে করে তুলেছিল সব রকমের নূতন অভিসারী ভাব চিন্তা কাজের একটি নীড়, অসংখ্য সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অভিগতির (Movement) একটি কেন্দ্র বিশেষ। আর সেই পরিবারের বহু প্রতিভাধর ব্যক্তি কেউ-না-কেউ মানুষের প্রায় প্রতিটি অভীপ্সা ও কীর্তির প্রতিনিধিস্বরূপ হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন, যথা: আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, দর্শন, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি— প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দুরকমেরই, কাব্য ও শিল্পকলা, সংগীত ও নাটক, জাতিগঠন ও সমাজসংস্কার, এমনকি ব্যবসাবাণিজ্যও বাদ নয়। আর, রবীন্দ্রনাথের ছিল এমন সূক্ষ্ম ও বহুমুখী গ্রহণক্ষমতা, এমন অসীমিত শিক্ষানম্রতা (educability) যার তুলনা বোধ হয় মানুষের ইতিহাসে নেই, কিম্বা অতি অল্পই আছে। এই প্রসঙ্গে হয়তো কারো কারো মনে আসতে পারে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি ও গ্যেঠের নাম। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁর আত্মীয়দের বিচিত্রজীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির যে ধারাগুলি রূপলাভ করেছিল রবীন্দ্রনাথ তা সমস্তই একান্ত আগ্রহে গ্রহণ করে স্বাঙ্গীকৃত করেছিলেন।

এই অনতিপ্রকাশ্য কিন্তু অমোঘক্রিয়াশীল আত্মশিক্ষণের পালা— যা রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সম্ভাবনা ও ক্ষমতাকে রূপায়িত ক'রে যথাযথ পথে চালিত করেছিল— তার ফলেই সাবেকি স্কুলে-পাঠের অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে শুধু একটা যন্ত্রণাদায়ক সময়ের অপচয় বলে মনে হয়েছিল। পূর্ণ ও বিচিত্রতম শিক্ষা-অভিজ্ঞতার মধ্যে নিজেকে সমর্পিত করে তিনি শিক্ষারহস্য সম্বন্ধে অনেক বেশি জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে যেসব শিক্ষানীতি তিনি বিবৃত করেছেন ও তাঁর শান্তিনিকেতনের সাধনায় প্রয়োগ করেছেন তার সবই তিনি আত্মশিক্ষার দিনে স্বাধীনভাবে শুধু আবিষ্কারই করেন নি, নিজের জীবনে পোহন (experience) করেছেন। অনেক পরে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাগুরুদের রচনায় ও ক্রিয়াকলাপে তিনি তাঁর নিজের এইসব আবিষ্কারেরই সমর্থন পান।

সহজেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের সহজাত গুণের বিচিত্রতা তাঁকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার যে সামর্থ্য দিয়েছিল তেমন আর কারো ভাগ্যে কখনো ঘটে নি। তাঁর মন ও বুদ্ধি ছিল সর্বদা সজাগ, উৎসাহে উদ্দীপিত, সহজবিজয়শীল, তা সে মনক্রিয়ার যে-কোনো ব্যাপার বা জ্ঞানবিজ্ঞানের যে-কোনো শাখাতেই তা ব্যবহার হোক-না-কেন। মানবিক বিষয়গুলিতে (humanities) যেমন বিজ্ঞানবিষয়গুলিতেও তাঁর ঠিক তেমনই অন্তরঙ্গ ও সহজ বিচরণক্ষমতা ছিল। ডিউইর জ্ঞানরুচির সীমা ছিল অতি বিস্তীর্ণ এ কথা স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু উচ্চ কল্পনামূলক যে বিষয় ও শিল্পগুলির কোনো বিশেষ বোধ ডিউইর মধ্যে তেমন দেখা যায় না সেগুলি হচ্ছে এই: কাব্য, দর্শনের উচ্চতর ও

সূক্ষ্মতর স্তরগুলি, সংগীত ও চারুশিল্পকলার গভীরতর ও অন্তরতর দিকগুলি। রবীন্দ্রনাথ রুশো ও ফ্রোয়েবেলের মত গভীরভাবে প্রকৃতির অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু তাদের তিনি অতি সহজেই অতিক্রম করেছিলেন প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অন্তর্মিলনের গভীরতায়, শিক্ষায় এই মিলনের সার্থকতা সম্বন্ধে সচেতনতায়। এই উপলব্ধিই প্রত্যক্ষ মূর্ত হ'য়েছিল তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমে।

রুশো সমাজকে সহ্য করতে পারেন নি। এ বিষয়ে রুশোর মত নয়, অপর তিনজন শিক্ষাগুরুর মত রবীন্দ্রনাথের চেতনা অতি সুপরিণত ছিল। তাঁর মন অবশ্য কল্পনা ও অধ্যাত্মদর্শনের উচ্চতম লোকে বিহার করতে পারত, কিন্তু তা হলেও একটি অন্তরঙ্গ মানবসমাজের মধ্যে ও তাদেরই জন্যে ছাড়া তাঁর পক্ষে জীবনধারণ ও কর্মসাধন অসম্ভব ছিল। 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'— তাঁর কাব্যজীবনের সূত্রপাতই হয় এই সুর দিয়ে, এ কথা বললে অন্যায় হয় না। এই ক্ষেত্রে তাঁর দান শুধু পেস্টালৎজিও ফ্রোয়েবেলের সমস্ত অবদানের সমানই নয়, তার পরিপূরক। ফ্রোয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেনের আধ্যাত্মিক উপাদানটুকু, সেই খেলানাচ সৃজনমূলক কাজের প্রতীকী আবর্তনচক্র, শুধু কঠোর সাংসারিক জীবনের নোঙরমুক্ত রূপলোকের পরিবেশেই সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল হতে পেরেছিল। শিশুদের সামনে অস্তিত্বের কতকগুলি সুন্দর ও সার্বিক দিক নিশ্চয় এই কার্যসূচি মুক্ত করে দিতে পেরেছিল, কিন্তু যে জগৎ শিশুরা উত্তরাধিকারসূত্রে পায় তার পূর্ণ সত্যটিকে তা উন্মোচিত ক'রে দিতে পেরেছিল এমন কথা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আধ্যাত্মিক উপাদানের ক্রিয়া শুধু শৈশবকাল বা অভিজ্ঞতার কোনো বিশেষ পর্যায় বা স্তরের মধ্যে সীমিত করেন নি। যে অধ্যাত্ম-সম্পদ তিনি পেয়েছিলেন— প্রধানত তাঁর মহর্ষি পিতার কাছ থেকে, এবং অন্যান্য উৎস থেকেও বটে, এবং যা তিনি নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সাহায্যে নিজের প্রয়োজনমত বিস্তৃত ও বিন্যস্ত করে নিয়েছিলেন, তাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সকল বয়স ও স্তরের শিক্ষ-অভিজ্ঞতা ও চেষ্টার কেন্দ্রস্থলে।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাগুরুরা যা আবিষ্কার ও পরীক্ষা করে দেখলেন তার প্রভাব পশ্চিমের দেশগুলিতে আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত শিক্ষাচিন্তা ও কর্মকে নিত্য প্রেরণার যোগান দিয়েছিল। আর ডিউইর শিক্ষাগত কর্মসূচি— যা ইয়োরোপীয় শিক্ষাগুরুদের দানের মধ্যে যা কিছু বিশিষ্ট ও স্থায়ী তার সমন্বয়ে রচিত হয়েছিল— তাকেই একসময় মনে হয়েছিল পৃথিবীর সর্বরোগনিবারক। কিন্তু এই পদ্ধতির প্রাথমিক সাফল্যে যে প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছিল তা পূর্ণ হয় নি। এক তো এই দুরূহ নূতন ক্রিয়াভঙ্গির পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ যারা একে নিয়েছিল তাদের পক্ষেও সহজ ছিল না, তা ছাড়া সুশাসিত পরিবেশে অল্পসংখ্যক ছাত্রের মধ্যে যে প্রক্রিয়া ও উপায়গুলি সফল হয়েছিল বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগের সময় স্বভাবতই তাদের কার্যকারিতা অনেক পরিমাণে কমে গিয়েছিল।

কিন্তু এ ছাড়া অন্য কারণ থাকাও অসম্ভব নয়। এই শিক্ষাসূচির আপাতপূর্ণতা সত্ত্বেও হয়তো এর মধ্যে কিছু কিছু গুরুতর অভাব বা অপূর্ণতা ছিল। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের ও মানবপ্রকৃতির যেসব সত্যের উপরে এর ভিত্তি তা হয়তো শেষ কথা নয়। তারও পিছনে হয়তো গভীরতর নিত্যতর সত্য আত্মগোপন করেছিল। লোকব্যবহার ও সংস্কৃতিসচেতনতার একটি স্বাভাবিক মানরক্ষার জন্য ডিউই নির্ভর করেছিলেন তাঁরই প্রস্তাবিত একটি ব্যবস্থার উপরে: সে হচ্ছে

গণতান্ত্রিকভাবে গঠিত শিক্ষাসমাজের মধ্যে বিভিন্ন দলগুলির অবাধ ও অন্তরঙ্গ মেশামেশি ও তাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সুযোগ করে দেওয়া। ডিউইর আশা ছিল এই: যদি মানুষের বিভিন্ন স্তর, সম্প্রদায়, স্বার্থানুসারী দল ও মতবাদের মধ্যকার প্রাচীরগুলিকে দূর করে পারস্পরিক সদিচ্ছা ও বন্ধুতার আবহাওয়ায় চিন্তা ও অভিজ্ঞতার অবাধ প্রবহণকে অব্যাহত রাখা যায়, তা হলে সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি নিত্য নূতন হয়ে ও নেতৃস্থানীয় লোকদের মনের মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল হয়ে সমাজকে স্বনির্ভর করে তুলবে, আর সর্বরকমের অবস্থার সম্মুখীন হতে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে তাকে সাহায্য করবে।

কিন্তু উনিশ শতক শেষ হবার আগেই ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরায় ডিউইর আশা অলীক প্রতিপন্ন হল— পরে যা ঘটল তার তো কথাই নেই। দেখা গেল সঙ্কটমুহূর্তে কি ব্যক্তির কি সমষ্টির ব্যবহার বর্বর, এমনকি অমানুষিক স্তরে নেমে যেতে চায়, ভাব ও চিন্তার স্বাধীন আদান-প্রদানের সুযোগ সমাজ-প্রতিক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ দিকগুলি সকলের কাছে সুলভ করে দেওয়া দূরে থাকুক বরং অসহায় সমাজকে নিক্ষেপ করে অভিসন্ধিপ্রবণ দল বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বা শক্তিগোষ্ঠীর হাতে, তাদের নিষ্করুণ প্রচারযন্ত্রের কবলে। ইতিহাসযাত্রা জনসমাজ ও জাতিগুলিকে এমন কতকগুলি সঙ্কটের সম্মুখীন করে দিল যাতে তারা বাধ্য হল ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে আরো দোষসম্ভাবনামুক্ত স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য নীতি বা তত্ত্বের সন্ধান করতে।

প্রাণতাত্ত্বিক প্রকৃতিবাদ (biological naturalism) যে সাধারণ প্রয়োজন, তাগিদ ও প্রেষণাগুলিকে স্বীকার করেন তাই যথেষ্ট বলে ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা গেল না, সযত্নমার্জিত গণতান্ত্রিক যন্ত্রে যে সামাজিক শক্তি ও ক্রিয়াকৌশলের উৎপাদন ও রক্ষণ সম্ভব হতে পারে তাও নয়। পুরানো আদর্শবাদী বা অধ্যাত্মবাদীরা যেসমস্ত তত্ত্ব ও শক্তির কথা বিশ্বাস ও প্রচার করতেন— তাতে তাঁদের বুদ্ধিমত্তা বা নির্বুদ্ধিতা যাই প্রকাশ পেয়ে থাক্— তারই মত কোনো কিছু নতুন করে আবিষ্কার করার মধ্যেই আছে একমাত্র নিষ্কৃতির উপায় এই কথা আপনা থেকেই লোকের মনে হল। প্রাণতত্ত্ব ও গণতন্ত্রের উপর ডিউই যে জোর দিয়েছেন তার ফলে তাঁর পরিকল্পনা থেকে এইসব উপাদান আপনি বাদ পড়ে গেছে। জগৎ কিন্তু এখন এমন-এক শিক্ষাগুরুর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় রইল যিনি পূর্বতন শিক্ষাগুরুদের দান স্বীকার করেও আরো গভীরক্রিয়াশীল চিরন্তন কতকগুলি তত্ত্বকেও স্থান করে দিতে পারবেন, যিনি প্রাচীন জ্ঞানের সম্পদ্ নূতন করে জেনে বর্তমান দিনের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিত করতে পারবেন, যিনি এইসব সত্যের শুধু বুদ্ধিগত ব্যাখ্যাই করবেন না— নিজের উপলব্ধির সাহায্যে স্বাধীনভাবে তাদের মর্ম উদ্‌ঘাটন করবেন, যিনি শুধু এই তত্ত্বগুলির অস্তিত্ব প্রমাণ করেই ক্ষান্ত হবেন না— মানুষের জীবনে কেমন করে সেগুলি কাজ করে তা দেখিয়ে দিতে পারবেন। লোকচিত্তের এই দাবির উত্তর এল পশ্চিম থেকে নয়, পূর্বদেশ থেকে। ভারতবর্ষ থেকে। ঐসব প্রত্যাশা পূরণ করবার জন্যে প্রেরিত হয়েই যেন বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হলেন দৃশ্যমঞ্চে কবি-গুরুদেবের ভূমিকায়।

আরো একটি জিনিস রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছিল এ কথা বলা দরকার। সে হল তাঁর ভারতীয়ত্ব —শুধু ঐ বাহ্য ব্যাপারটাই নয়, ভারতীয় ঐতিহ্যের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম তার সঙ্গে একাত্ম

হবার ক্ষমতার দ্বারা যে ভারতীয়ত্ব তিনি অর্জন করেছিলেন তারই কথা বলা হচ্ছে। বহু বিচিত্র ও বিভিন্ন ভাব ও আদর্শকে সংশ্লেষিত করা— শুধু বুদ্ধিপ্রয়োগ বা ভাবমণ্ডল (system) বা রচনার কৌশলে নয়, সমস্ত উপাদানগুলিকে নিজস্ব অভিজ্ঞতার পাত্রে গলিয়ে— ভারতের অনেক অনন্য চারিত্রিক বিশেষত্বের মধ্যে এই হল একটি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই নানা উপলক্ষে এ কথা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেছেন। এই বিশেষ ক্ষমতার বলেই রবীন্দ্রনাথ ডিউইর অত্যাশ্চর্য সংশ্লেষণী প্রতিভাকে অতিক্রম করে তাঁর কীর্তির যেটুকু অপূর্ণতা ছিল তা পূরণ করতে পেরেছেন।

পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা, পূর্ণ মানবতার শিক্ষা, integral education, education of the whole man— এই দাবি প্রায় এক শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাব্রতীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের 'পূর্ণ মানবে'র ধারণা ছিল সীমাবদ্ধ। কারণ reason বা বুদ্ধি-যুক্তিবাদকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে গিয়ে তাঁরা উপেক্ষা করেছিলেন অনেককিছু মূল্যবান্ উপাদানকে, যথা : গ্রীকদের কাম্য চারিত্রিক গুণ-গুলি (virtues), রোম্যানদের প্রশংসিত মানবিক অভীপ্সা ও সাংস্কৃতিক কীর্তির আদর্শ, রিনায়সাঁস্ ইয়োরোপে বা ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ডের মনোহর স্বপ্নাভিযান ও আদর্শপ্রয়াণগুলি, কিম্বা প্রাচীন বা মধ্যযুগের চার্চের অভীষ্ট অধ্যাত্মসম্পদ্। এইসব উপাদানে— এমনকি যেখানে সেগুলি অমার্জিত, প্রমাদ ও কুসংস্কার-মিশ্রিত ও তার দ্বারা কঠিন আচ্ছন্ন সেখানেও— মানুষের প্রকৃতির কতকগুলি পরিণতির মূল প্রবেগ যে লুকানো আছে এটা তাঁদের কাছে ধরা পড়ে নি। এইসব উপেক্ষিত উপাদানকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করে তাদের অস্পষ্টতা ও অশুদ্ধি-ক্ষালন করলেন ও তাদেরই অনাবৃত রশ্মিতে মানবপ্রকৃতির সমস্ত দিকগুলিকে উদ্ভাসিত করলেন। তার ফলে তিনি দেখাতে পারলেন কেমন করে সমগ্রের কাঠামোর মধ্যে সবরকমের অভিজ্ঞতাকেই যথাযথ স্থানে স্থাপিত করা যায়। কেমন করে সাধারণ মানুষের প্রকৃতির দাবিগুলির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায় উচ্চতর প্রকৃতি বা পরা প্রকৃতির দাবি, reason বা বুদ্ধিবাদের প্রতিপত্তিকে কেমন করে, শুধু খাপ খাইয়ে নয়, পূর্ণায়ত করে নেওয়া যায় আত্মার চিরন্তন সত্যগুলির সঙ্গে।

ব্যক্তিত্বের কতকগুলি দিকের অর্থ ও ক্রিয়াশীলতার মর্যাদা রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে বিস্তৃততর করেছেন যা তাঁর আগে আর কেউ করে নি। কল্পনা, নন্দনবোধ ও উচ্চতর হৃদয়াবেগগুলিকে তিনি ঐ বুদ্ধির প্রায় সমপর্যায়ে স্থাপন করেছেন। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বুদ্ধির মত কাব্য-সংগীত-শিল্পের ক্ষেত্রে এরাও জগৎসত্য আবিষ্কারের উপায়। আর যদি রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য হয় যে মানুষের জীবনের আসল তাৎপর্য আর অভিপ্রায়ই হচ্ছে নিজের ব্যক্তিত্বকে বার বার পুনর্জন্ম দিয়ে তাকে বিশ্বস্রষ্টার *সৃষ্টিলীলার* অংশীদার করে তোলা, তা হলে স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে *সৃষ্টির* সহায়তা করে যে গুণ ও ক্ষমতাগুলি তারা বুদ্ধির চেয়ে অন্তত: হেয় নয়। ডিউই ও হোয়াইট্‌হেড্ বৈজ্ঞানিক কল্পনার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। আর আধুনিক কালে হার্বার্ট রীডের মত চিন্তাশীলরা আর্টেরও বিশেষ মূল্য আবিষ্কার করেছেন— যদিও তা অন্য কারণে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে এই গুণ বা শক্তিগুলিকে তাঁর পরিকল্পনার কেন্দ্রে স্থান দিয়েছেন তা শুধু অবচেতন ঝোঁক ও তাগিদগুলির মুক্তির আশাতেই নয়, সাধারণভাবে প্রকৃতির একটা নম্রতা ও সৌষ্ঠব সাধনের জন্যও নয়, এমনকি

কতকগুলি বিশিষ্ট সম্ভাবনা ও ক্ষমতার স্ফুরণের জন্যেও নয়। শিক্ষার সমস্ত পরিবেশটিই এইগুলির ক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হবে এই তাঁর প্রত্যাশা।

এই নূতন কতকগুলি দিকের মূল্যায়ন ছাড়াও আরও একদিকে রবীন্দ্রনাথ ডিউইর সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেছেন। বুদ্ধিকেও তিনি বাধাহীন বিচরণভূমি দিয়েছেন যা প্রয়োগবাদ (pragmatism) ও সমাজহিতকর চিন্তনের সমর্থক ডিউই দিতে রাজী ছিলেন না। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বরং শুদ্ধবুদ্ধি ও তার উচ্চবিহার-অধিকারের বিখ্যাত সমর্থক কার্ডিন্যাল নিউম্যানের সঙ্গী।

যে ভাবে রবীন্দ্রনাথ মানুষের ব্যক্তিত্বের অর্থকে বিস্তৃততর করেছেন, সমস্ত চিন্তাপ্রমাদ কুসংস্কার ও ভুলমাত্রার আরোপ থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন অংশগুলিকে সৌষম্যে মিলিত করেছেন তা একটা অলৌকিক কীর্তির মতই আশ্চর্য। এ যে তিনি পেরেছিলেন তার কারণ শিক্ষাগুরু হতে গিয়ে তিনি তাঁর ঋষিকবির ভূমিকা থেকে অবসর গ্রহণ করেন নি। এই দুই ভূমিকাই তাঁর মধ্যে এক হয়ে গেছে। এরই ফলে তিনি পশ্চিমের যুক্তিবাদী চিন্তার প্রধান প্রধান আপত্তিগুলি খণ্ডন করতে পেরেছেন, যুক্তির অতীত তত্ত্বকে সংগতভাবেই তার যোগ্যস্থান দিতে পেরেছেন।

একটি আপত্তি হল এই যে আত্মা বা অন্তরপুরুষ যদি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তাই হয়, যাকে অনাবৃত করা ছাড়া শিক্ষার আর কোনো কাজ নেই, তা হলে শিক্ষা তার অর্থগৌরব ও নিজস্ব অধিকার অনেক পরিমাণেই হারাতে বাধ্য। কারণ ঐ একই কাজ আরো সোজাসুজি ও অবিক্ষিপ্তভাবে করতে পারার গর্ব করে যে সাবেকী ধর্মীয় চর্যাগুলি তাদেরই হাতে তা হলে শিক্ষার রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দেওয়াই হবে সংগত কাজ। তা ছাড়া আপেক্ষিকতা ও পরিবর্তনশীলতার ভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত আধুনিক মনের কাছে যে-কোনো রকমের নিরপেক্ষ পরমতা, অপরিবর্তন অবিচিত্র যে-কোনো অস্তিত্বসত্যের ভাবনা অরুচিকর ও গ্রহণের অযোগ্য মনে হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের উত্তর এই যে আত্মা পূর্ণ হলেও পরিবর্তনহীন অবিচল নয়। বরং চির-ক্ষর ও আত্মসৃষ্টিপরায়ণ। তার সমগ্রতার মধ্যে একটা আয়তন আছে যেখানে তা অপরসকল আত্মা, সার্বিক আত্মা বা পুরুষের সঙ্গে একেবারে একীভূত। কিন্তু তা হলেও প্রত্যেকটি ব্যক্তির আর-এক আয়তন আছে যেখানে সে অনন্য ও বিশিষ্ট ও নিজস্ব একটা বিবর্তন বা আত্মসৃষ্টির পথ ধরে এগিয়ে চলে। সার্বিকপুরুষ এই অসংখ্য ব্যক্তিক অভিগতির পোষক এবং এইগুলিকে নিজের সত্তার মধ্যে ধারণ করে রূপ ও ভাবকল্পের অনন্ত বিচিত্র পরম্পরার মধ্য দিয়ে নিজেকে বিবর্তিত করে চলেন। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির ফলে বিবর্তন ও আপেক্ষিকতার সমর্থকদের সমস্ত আপত্তিই আপনিই খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। এই মত অনুসারে শিক্ষা একটি দ্বিমুখী ক্রিয়া—তা আবরণমোচনও (unfoldment) বটে আবার আত্মলাভ (self-realisation) বা আত্মসৃষ্টিও বটে।

দ্বিতীয় আপত্তি হল এই যে, একই সার্বিক তত্ত্ব কেমন করে বিচিত্রের জন্ম দিতে পারে, একই সার্বিকপুরুষ কেমন করে বহুর মধ্যে বহুরূপ ধারণ করতে পারে? এর উত্তর খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত নয়। এমনকি পাশ্চাত্ত্য চিন্তকদের কাছেও বুদ্ধিকে একটি সার্বিক তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃতিদান শক্ত বলে মনে হয় না। যদিও এই universal reason -এর কোনো সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, তবু তার প্রকৃতি ও ক্রিয়া তার সমর্থকদের কাছে অবাস্তব অনিশ্চিত বা অবোধ্য বলে মনে হয়

না। কিন্তু এই একই শক্তি নানা ধরণের মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রকাশ ও ক্রিয়ার সুযোগ পেতে পারে। কিন্তু যুক্তিপ্রয়োগ ও তর্কের সমস্ত বিসম্বাদী প্রক্রিয়া, এই শক্তির নানা রকমের পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবহার, অবান্তর আবেগ-অনুরাগের কাছে এর অবনমন ইত্যাদি সত্ত্বেও যারা একে জানে তাদের পক্ষে এই reason-এর শুদ্ধাবস্থায় এর অব্যর্থ কার্যকারিতায় বিশ্বাস অক্ষত রাখা অসম্ভব নয়। আর সার্বিক বুদ্ধিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে কথা খাটে, সার্বিক মানস এমনকি পূর্ণায়ত সার্বিক পুরুষ সম্বন্ধেই বা তা খাটবে না কেন? এই দর্শনই রবীন্দ্রনাথ তাঁর *The Religion of Man* গ্রন্থে সযত্নে ও সবিস্তারে বুঝিয়ে বলেছেন।

গণতান্ত্রিক দর্শন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগের একটা অসুবিধা হল এই যে, তা দৃশ্যপট থেকে সমস্ত বাইরের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে দেয় এবং ছাত্রদের নিজেদের খেয়ালখুশি ঝোঁক, বা তার চেয়েও অবাঞ্ছিত দলগত ঝোঁক বা মেজাজ—যা ডিউই শিক্ষাপরিস্থিতির একটি আবশ্যিক উপাদান হিসাবে গণ্য করেছেন—তারই হাতে ছেড়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ছাত্রের স্বাধীনতায় ঐ একই পরিমাণ বা আরো বেশি আস্থা রেখেও গুরুর জন্যেও একটি স্থান রেখেছেন। এই গুরু শিষ্যকে শেখান কেমন করে নিজেকে, নিজের অন্তরপুরুষকে জানতে হয় এবং সেই জ্ঞানকে সহায় করে কেমন করে চিরন্তন স্বাধীনতা লাভ করা যায় আত্মসত্য নিয়ে পরীক্ষা করবার।

আর এই বিশেষ ভাবস্থিতির ফলে আরো একটি বিরোধের সমাধান হয়েছে। সে হল ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যকার সম্বন্ধগ্রন্থনসমস্যা। ব্যক্তি সমাজের দাবিতে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের নির্বাচিত যে-কোনো দিকে ক্ষমতা অনুযায়ী নিজেকে গঠিত করে তুলতে পারে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, যদি-না অবশ্য সে নিজের ভিতরকার সত্য থেকে স্খলিত হয় বা তাকে সম্পূর্ণ হারিয়ে বসে। ব্যক্তি ও সমষ্টির পিছনে শেষ পর্যন্ত একই সত্য থাকায় এর একটির সেবা অপরটিরও আনুকূল্য করতে বাধ্য অন্ততপক্ষে পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলিকে প্রভাবিত করে, আর শীঘ্রই হোক বা কিছু পরেই হোক প্রত্যক্ষ একটা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও আরম্ভ না হয়ে উপায় নেই। এমন সময় আসবেই যখন অন্তরপুরুষকে অনুসরণ করতে করতে ব্যক্তি সম্মুখীন হবে সার্বিকপুরুষের এবং আবিষ্কার করবে যে ও দুই-ই এক। তখন আর সমাজের কাজ করবার জন্যে তার গণতান্ত্রিক সদিচ্ছা ও মৈত্রীর সাধনা করতে হবে না। তখন নিজের জন্যে বাঁচা আর সমাজের জন্যে বাঁচা তার কাছে হবে এক অদ্বিতীয় অন্তহীন রোমাঞ্চকর এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্। সে জানবে আত্মদান্ও আত্ম-আবিষ্কার একই বৃত্তান্তের দুদিকের দুটি মুখ। দেখবে, একই সত্তাকে সম্বোধন করে বলা যায়: 'অন্তর-মাঝে তুমি শুধু একা একাকী, তুমি অন্তরবাসিনী' আর 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে তুমি বিচিত্ররূপিণী'।

এই হল সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবাণী। 'সাধারণ মানুষের পক্ষে ঐ অন্তঃসত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া সহজ নয়'—এই পাশ্চাত্যমানসসুলভ আপত্তির উত্তর দেবেন রবীন্দ্রনাথ এই বলে যে সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সত্যকার গুরুর নেতৃত্বে ঐ আবিষ্কার শুধু কয়েকজনের পক্ষে সম্ভবই নয়, অধিকাংশ শিষ্যের পক্ষেই সহজ ও অবশ্যম্ভাবী। রুশো প্রকৃতি বলতে যা বুঝেছেন তার চেয়ে গভীরতর অর্থে, রবীন্দ্রনাথ বাংলার বাউলদের সহজিয়া সাধনার আপ্তবাক্য উল্লেখ করে দেখাবেন যে মানুষের পক্ষে সব চেয়ে সোজা কাজ হচ্ছে নিজেরই চিরন্তন প্রকৃতি ও সত্যের মধ্যে প্রবেশ করে তাই হয়ে ওঠা। এর

জন্যে একমাত্র কৌশল যা দরকার তা হচ্ছে, যা কৃত্রিম অবান্তর, যা অপ্রয়োজনীয় ও গৌণ অথচ যা সত্যবস্তুকে গোপন করে, কঠিন আচ্ছাদনে ঢাকা দিয়ে দেয়, তাকে বর্জন করতে পারা।

রবীন্দ্রনাথ নিজে শান্তিনিকতনকে নাম দিয়েছিলেন; 'একটি প্রত্যক্ষ কবিতা,' 'একটি নৌকা যা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বহন করছে।' সন্দেহ নেই কবি ও লেখক হিসাবে তাঁর অনন্য কীর্তি যুগের পরে যুগ আরো বেশি করে স্বীকৃত হবে। কিন্তু তাঁর নিজের সাক্ষ্য থেকেই দেখা যায় যে তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রধান যে তিনটি ক্ষেত্র, যথা: আত্মজীবন রূপায়ণ, সাহিত্য সংগীত শিল্পকলা, আর তৃতীয়ত: শান্তিনিকেতন-সাধনার মধ্য দিয়ে লোকজীবনকে প্রভাবিত করা— তার মধ্যে তাঁর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রমশই সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তৃতীয়টিকেই। অপর দুই ক্ষেত্রে যা তাঁর প্রাপ্তি তা তিনি অসংকোচে উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর ঐ শিক্ষাভিসারের পথ প্রশস্ত করবার জন্যে। শান্তিনিকেতনে যাঁরা একবারমাত্র এসেছেন, তাঁদের প্রাথমিক রবীন্দ্রপ্রীতির কারণ সম্পূর্ণ আলাদা হলেও, পরে তাঁদের সকলেরই মুখে ঐ নাম উচ্চারণের সময় 'রবীন্দ্রনাথ' যেন অজান্তেই 'গুরুদেবে' রূপান্তরিত হয়েছে। এটাই হয়তো একটা পূর্বলক্ষণ যার থেকে বোঝা যেতে পারে যে এমন একদিন অনতিদূর ভবিষ্যতে আসবে যখন শুধু কবি হিসাবে নয়, সমস্ত জগৎ তাঁকে জানবে ও তার শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন করবে 'কবি-গুরুদেব' হিসাবে।

'ছিন্নপত্র' ও রবীন্দ্রমানসের উপাদান

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

সফল ভাবীর জাগরণ
ভূমিগর্ভে গুপ্ত থাকে, বাহিরের আকাশে যখন
আশা আর নৈরাশ্যের উদ্বিগ্ন পর্যায়
খর রৌদ্রে কভু শাপ দেয়,
আশা দেয় মেঘের সঙ্কেতে।[১]

—রবীন্দ্রনাথ

১

'ছিন্নপত্রে' সংগৃহীত পত্রখণ্ডগুলির রচনাকাল ৩০ অক্টোবর ১৮৮৫ হইতে ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৫ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন কিঞ্চিদধিক চব্বিশ বৎসর হইতে কিঞ্চিদধিক চৌত্রিশ বৎসরের মধ্যে। কবির যৌবনের প্রারম্ভ হইতে যৌবনমধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত খণ্ডজীবনের যে আলেখ্য এই পত্রাংশগুলিতে চিত্রিত হইয়াছে তাহা নানা দিক্ দিয়া বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশটিতে কবি তাঁহার তৎকালীন মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

"'বহুদিন চিঠিপত্র লিখি নি, কারণ চিঠি লেখা কম কাণ্ড নয়। দিনের পর দিন চ'লে যাচ্ছে, কেবল বয়স বাড়ছে। দু বৎসর আগে পঁচিশ ছিলুম, এইবার সাতাশে পড়েছি— এই ঘটনাটাই কেবল মাঝে মাঝে মনে পড়ছে; আর কোনো ঘটনা তো দেখছি নে। কিন্তু সাতাশ হওয়াই কি কম কথা! কুড়ির কোঠার মধ্যাহ্ন পেরিয়ে ত্রিশের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া। ত্রিশ, অর্থাৎ ঝুনো অবস্থা। অর্থাৎ যে অবস্থায় লোকে সহজেই রসের অপেক্ষা শস্যের প্রত্যাশা করে— কিন্তু শস্যের সম্ভাবনা কই? এখনো মাথা নাড়া দিলে মাথার মধ্যে রস থল্ থল্ করে— কই, তত্ত্বজ্ঞান কই? লোকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছে, 'তোমার কাছে যা আশা করছি তা কই? এতদিন আশায় আশায় ছিলুম। তাই কচি অবস্থার শ্যাম শোভা দেখেও সন্তোষ জন্মাত। কিন্তু তাই ব'লে চিরদিন কচি থাকলে তো চলবে না। এবারে তোমার কাছে কতখানি লাভ করতে পারব তাই জানতে চাই— চোখে-ঠুলি-বাঁধা নিরপেক্ষ সমালোচকের ঘানিসংযোগে তোমার কাছ থেকে কতটুকু তেল আদায় হতে পারে এবার তার একটা হিসেব চাই।' আর তো ফাঁকি দিয়ে চলে না। এতদিন বয়স অল্প ছিল, ভবিষ্যতে সাবালক অবস্থার ভরসায় লোকে ধারে খ্যাতি দিত। এখন ত্রিশ বৎসর হতে চলল, আর তো তাদের বসিয়ে রাখলে চলে না। কিন্তু পাকা কথা কিছুতেই বেরোয় না শ্রীশবাবু! যাতে পাঁচ জনের কিছু লভ্য হয় এমন বন্দোবস্ত করতে পারছি নে।· ·হঠাৎ একদিন বৈশাখের প্রভাতে নববর্ষের নূতন পত্র পুষ্প আলোক ও সমীরণের মধ্যে জেগে উঠে যখন শুনলুম আমার বয়স সাতাশ তখন আমার মনে এই-সকল কথার উদয় হল। আসল কথা— যতদিন আপনি কোনো লোককে বা বস্তুকে সম্পূর্ণ না জানেন ততদিন কল্পনা ও কৌতূহল মিশিয়ে তার প্রতি এক প্রকার বিশেষ আসক্তি থাকে। পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত কোনো লোককে সম্পূর্ণ জানা যায় না— তার যে কী হবে, কী হতে পারে

১ পুত্র রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষপূর্তিতে কবির আশীর্বাণী হইতে উদ্ধৃত।

কিছুই বলা যায় না; তার যতটুকু সম্ভূত তার চেয়ে সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু সাতাশ বৎসরে মানুষকে একরকম ঠাহর করা যায়— বোঝা যায় তার যা হবার তা একরকম হয়েছে, এখন থেকে প্রায় এই রকমই বরাবরই চলবে। এ লোকের জীবনে হঠাৎ আশ্চর্য হবার আর কোনো কারণ রইল না। এই সময়ে তার চার দিক থেকে কতকগুলো লোক ঝরে যায়, কতকগুলো লোক স্থায়ী হয়— এই সময়ে যারা রইল তারাই রইল। কিন্তু আর নূতন প্রেমের আশাও রইল না। নূতন বিরহের আশঙ্কাও গেল। অতএব এ একরকম মন্দ নয়। জীবনের আরামজনক স্থায়িত্ব লাভ করা গেল। আপনাকেও বোঝা গেল এবং অন্যদেরও বোঝা গেল। ভাবনা গেল।"[২]

কবির এই উক্তি লঘু পরিহাসচ্ছলে করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে সবটাই যে পরিহাস নহে, কতকাংশে সত্যতাও যে আছে তাহা কবিজীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলির সহিত যাঁহারই পরিচয় আছে তিনিই স্বীকার করিবেন। 'ছিন্নপত্রে'র পর্ব কবিজীবনের এক প্রচ্ছন্ন প্রস্তুতির পর্ব, লোকলোচনের অন্তরালে নির্জনবাসের মধ্যে নিরন্তর সাধনার পর্ব; স্নিগ্ধ প্রসন্ন পল্লীপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে কবির অন্তঃপ্রকৃতি তখন আত্মসমাহিত ও প্রশান্ত। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সাহিত্যসৃষ্টিতে যেসকল চিন্তা ও ভাবনা পুষ্পিত পল্লবিত ও ফলিত হইয়া উঠিয়াছে, 'ছিন্নপত্রে' তাহাদেরই বীজাকারে প্রথম নিঃসংশয় আবির্ভাব আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। "সাতাশ বৎসরে মানুষকে একরকম ঠাহর করা যায়— বোঝা যায় তার যা হবার তা একরকম হয়েছে, এখন থেকে প্রায় এই রকমই বরাবরই চলবে। এ লোকের জীবনে হঠাৎ আশ্চর্য হবার আর কোনো কারণ রইল না।" এক দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি যেমন অযথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, আর-একদিক দিয়া ইহার সত্যতাও তুল্যরূপে অবিসংবাদিত। কেননা, প্রাক্-'ছিন্নপত্র' পর্বের সাহিত্যকৃতি যেমন কবির পরবর্তী দীর্ঘজীবনের বিচিত্র সৃষ্টির রূপকল্প ও শিল্পসৌন্দর্যের অজস্র বৈভবের নেত্রপ্রতিঘাতী ঔজ্জ্বল্যের নিকট হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছে, তেমনই ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে 'ছিন্নপত্রে'র খণ্ডিত পত্রাংশগুলিতে কবির অন্তর্জীবনের যে চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার পরবর্তী সর্ববিধ শিল্পকর্মের ও অভীপ্সার সারসংগ্রহ। কবিমানসের সেই অভীপ্সাই নানা আকারে, নানা অবস্থায় বিচিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু কবির সেই মানস-আকৃতি পরবর্তী কোনও বিরোধী আদর্শের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছে কি-না সন্দেহ। বরং 'ছিন্নপত্রে' কবির মানস-ভূমণ্ডলের যে নীহারিকাচ্ছন্ন অস্পষ্ট আবির্ভাব সূচিত হইয়াছে, তাঁহার উত্তর-জীবনের সাহিত্য ও শিল্প-কর্মে তাহারই উত্তরোত্তর জ্যোতির্ময় প্রকাশ সংঘটিত হইয়াছে— দেখিতে পাওয়া যায়। এই দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থখানিকে কবিজীবনের একটি অনবদ্য testament বলিয়া নির্দেশ করিলেও নিতান্ত ভুল করা হইবে না।

২

রবীন্দ্রনাথ চিরকালই নগরের কলকোলাহল হইতে দূরে নির্জন প্রকৃতির প্রশস্ত উৎসঙ্গের স্নিগ্ধ-কোমল স্পর্শ লাভের জন্য লালায়িত ছিলেন। তাই যখনই তিনি কলিকাতার নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা ও

---

২ ছিন্নপত্র. পত্রসংখ্যা ৮। রচনাকাল ২৭ জুলাই ১৮৮৭। তুলনীয়: "· ·চিরদিন স্কুল পালিয়ে কাটালুম, কুঁড়েমি করেই এমন মানবজন্মের সাতাশটুকু বছর বৃথা নষ্ট করলুম—" · ·ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র° ৪২ [৭ই আশ্বিন ১৩২৮]। অপিচ—"ভানুসিংহের বয়স যে সাতাশ বছরে এসে চিরকালের মতো ঠেকে গেছে, বালিকার এই একটি স্বরচিত বয়ঃপঞ্জীর বিধান ছিল।"—ঐ. পাদটীকা।

সংকীর্ণতার দ্বারা পীড়িত বোধ করিতেন তখনই পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গলাভের জন্য শিলাইদহ পতিসর সাজাদপুর অথবা বোলপুরের দিকে রওনা হইতেন। নাগরিক-জীবনের চঞ্চল পরিবর্তনশীল জীবনপ্রবাহের সহিত মফস্বলের স্থির-মন্থর কালস্রোতের তুলনা করিয়া তিনি একটি পত্রে লিখিতেছেন—

"সবে দিন-চারেক হল এখানে এসেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কতদিন আছি তার ঠিক নেই। মনে হচ্ছে, আজই যদি কলকাতায় যাই তা হলে যেন অনেক বিষয়ে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাব।

"আমিই কেবল সময়স্রোতের বাইরে একটি জায়গায় স্থির হয়ে আছি; আর, সমস্ত জগৎ আমার অজ্ঞাতে একটু একটু করে ঠাঁই বদল করছে। আসলে, কলকাতা থেকে এখানে এলে সময়টা চতুর্গুণ দীর্ঘ হয়ে আসে; কেবল আপনার মনোরাজ্যে বাস করতে হয়, সেখানে ঘড়ি ঠিক চলে না। ভাবের তীব্রতা-অনুসারে মানসিক সময়ের পরিমাপ হয়; কোনো কোনো ক্ষণিক সুখদুঃখ মনে হয় যেন অনেকক্ষণ ধরে ভোগ করছি। সেখানে বাইরের লোকপ্রবাহ এবং বাইরের ঘটনা এবং দৈনিক কার্যপরম্পরা আমাদের সর্বদা সময়-গণনায় নিযুক্ত না রাখে সেখানে, স্বপ্নের মতো, ছোটো মুহূর্ত দীর্ঘকালে এবং দীর্ঘ কাল ছোটো মুহূর্তে সর্বদাই পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই আমার মনে হয় খণ্ড কাল এবং খণ্ড আকাশ আমাদের মনের ভ্রম। প্রত্যেক পরমাণু অসীম এবং প্রত্যেক মুহূর্তই অনন্ত।"[৩]

পল্লীর এই নিস্তব্ধ রহস্যনিকেতনে কবির চিত্ত নিরন্তর প্রকৃতির অনুধ্যানে নিমগ্ন থাকিত।—

"পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাত্রে সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ-সংসারে এ-যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়। সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্ব দিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে এক প্রকাণ্ড পাতা উল্‌টে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য লিখন—আর, এই ক্ষীণপরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর আর ওই ছবির মতন পরপারধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ—এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা! যাক্। এ কথাগুলো রাজধানীতে অনেকটা 'পৈট্রি'র মতো শুনতে হবে, কিন্তু এখানকার পক্ষে কথাগুলো কিছুমাত্র বেখাপ নয়।"[৪]

কবি তাঁহার বোটের উপর শুইয়া রহস্যময়ী রজনীর নীরব বার্তা শুনিবার চেষ্টা করিতেন—প্রকৃতির অনন্ত শান্তি ও সৌন্দর্যের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করিয়া দিতেন। কেন যে কখনও কখনও অকারণে তাঁহার চোখ অশ্রুবাষ্পে ভরিয়া উঠিত তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না।—

"আজকাল আমার এখানে এমন চমৎকার জ্যোৎস্নারাত্রি হয় সে আর কী বলব।··একলা বসে বসে আমি যে এর ভিতরে কী অনন্ত শান্তি এবং সৌন্দর্য দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারি নে।··মাথাটা জানলার উপর রেখে দিই—বাতাস প্রকৃতির স্নেহহস্তের মতো আস্তে আস্তে আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছল্ ছল্ শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিক্ ঝিক্ করতে থাকে এবং অনেক সময় 'জলে নয়ন

৩ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১০৪ (শিলাইদহ, ২৪ জুন ১৮৯৪)।

৪ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১০ (শিলাইদহ ১৮৮৮)।
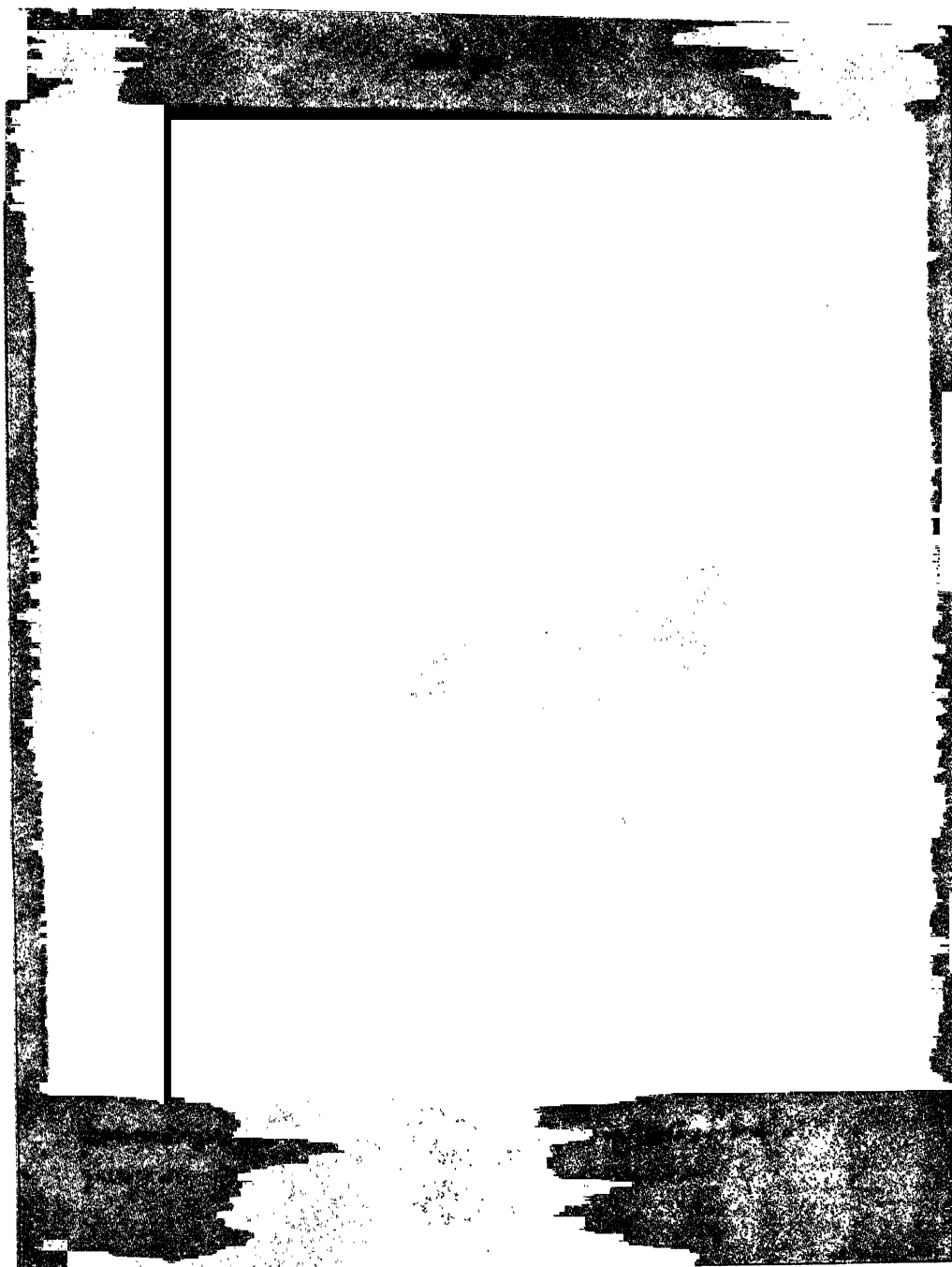
পারাবত

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আপনি ভেসে যায়'। অনেক সময় মনের আন্তরিক অভিমান, একটু স্নেহের স্বর শুনলেই অমনি অশ্রুজলে ফেটে পড়ে। এই অপরিতৃপ্ত জীবনের জন্য প্রকৃতির উপর আমাদের যে আজন্মকালের অভিমান আছে, যখনি প্রকৃতি স্নেহমধুর হয়ে ওঠে তখনি সেই অভিমান অশ্রুজল হয়ে নিঃশব্দে ঝরে পড়তে থাকে। তখন প্রকৃতি আরো বেশি করে আদর করে এবং তার বুকের মধ্যে অধিকতর আবেগের সহিত মুখ লুকোই।"[৫]

এই নির্জন রহস্যময়ী প্রকৃতির নিবিড় স্নেহালিঙ্গনের মধ্যে মানবসমাজের কোলাহল ও কর্মতৎপরতা হইতে দূরে থাকিয়া কবি আপনার অন্তরের অলক্ষ্য অন্তঃপুরের মধ্যে আপনাকে গুটাইয়া লইতেন। মানুষের— তা সে যতই অন্তরঙ্গ ও আত্মীয় হউক-না কেন, সঙ্গ তখন তাঁহার নিকট অসহনীয় বোধ হইত—

"আমার এই ক্ষুদ্র নির্জনতাটি আমার মনের কারখানাঘরের মতো; তার নানাবিধ অদৃশ্য যন্ত্রতন্ত্র এবং সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ চার দিকে ছড়ানো রয়েছে— কেউ যখন বাইরে থেকে আসেন তখন সেগুলি তাঁর চোখে পড়ে না— কখন্ কোথায় পা ফেলেন তার ঠিক নেই, দিব্য অজ্ঞানে হাস্যমুখে বিশ্বসংসারের খবর আলোচনা করতে করতে আমার অবসরের-তাঁতে-চড়ানো অনেক সাধনার সূক্ষ্ম সূত্রগুলি পট্ পট্ করে ছিড়তে থাকেন। . . অনেক কথা, অনেক কাজ, অনেক আলোচনা আছে যা অন্যের পক্ষে সামান্য এবং জনতার মধ্যে স্বাভাবিক কিন্তু নির্জন জীবনের পক্ষে আঘাতজনক। কেননা, নির্জনে আমাদের সমস্ত গোপন অংশ গভীর অংশ বাহির হয়ে আসে; সুতরাং সেই সময়ে মানুষ বড়ো বেশি নিজেরই মতো অর্থাৎ কিছু সৃষ্টিছাড়া গোছের হয়— সে অবস্থায় সে লোকসংঘের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। বাহ্যপ্রকৃতির একটা গুণ এই যে, সে অগ্রসর হয়ে মনের সঙ্গে কোনো বিরোধ করে না; তার নিজের মন ব'লে কোনো বালাই না থাকাতে মানুষের মনকে সে আপনার সমস্ত জায়গাটি ছেড়ে দিতে রাজি হয়; সে নিয়ত সঙ্গদান করে, তবু সঙ্গ আদায় করে না। . ."[৬]

এইভাবে প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় প্রকৃতির রূপসুধা কবি আকণ্ঠ পান করিতেন, তাহার অন্তরের গোপন বাণীটি কান পাতিয়া শুনিবার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। কিন্তু শুধুই নিস্তব্ধ ধ্যান নয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বিচিত্র বিভাগের সহিত আপনাকে নিরন্তর যুক্ত করিয়া রাখিবার জন্য কবির কী ব্যগ্রতা।

৩

১৮৯৩ সালে লিখিত একটি পত্রে কবি বলিতেছেন—

"আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয়, এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তা হলে তো মন্দ হয় না; আবার যখন একটা-কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই কী, এটাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার যখন 'বাল্যবিবাহ' কিম্বা 'শিক্ষার হেরফের' নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয়, এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ। আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ যে চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা

৫ ছিন্নপত্র. পত্রসংখ্যা ২৬ (সাজাদপুর ২২ জুন ১৮৯১)।

৬ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১০৭ (শিলাইদহ, ৩০ জুন ১৮৯৪)। তুলনীয়: পত্রসংখ্যা ১১২ (শিলাইদহ ৮ অগস্ট্‌ ১৮৯৪)।— "একটিমাত্র মানুষ কেবলমাত্র সামনে উপস্থিত থাক্‌লেই প্রকৃতির অর্ধেক কথা কানে আসে না। আমি দেখেছি, থেকে থেকে টুকরো টুকরো কথাবার্তা কওয়ার চেয়ে মানসিক শক্তির অপব্যয় আর কিছুতে হতে পারে না। দিনের পর দিন যখন একটি কথা না কয়ে কাটে তখন হঠাৎ টের পাওয়া যায়, আমাদের চতুর্দিকই কথা কচ্ছে।. ."অপিচ, তু° ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১৩২ (শিলাইদহ ৭ ডিসেম্বর ১৮৯৪)।

আছে তারপ্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি— কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকেও সহজে পাবার জো নেই— তাঁর একেবারে ধনুক-ভাঙা পণ— তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।"[৭]

'ছিন্নপত্র'-পর্বে কবি কত বিচিত্র বিদ্যার অনুশীলনে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন, তাহার মোটামুটি একটা রেখাচিত্র আমরা পত্রাংশগুলি হইতে সংগ্রহ করিয়া জুড়িয়া জুড়িয়া খাড়া করিয়া তুলিতে পারি। তাঁহার বাল্যাবস্থায় বয়োজ্যেষ্ঠগণের তত্ত্বাবধানে যে নানাবিদ্যার আয়োজন হইয়াছিল তাহা তৎকালে যতই ভীতিপ্রদ ও অরুচিকর বলিয়া মনে হউক-না কেন, পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধানলের উন্মেষসাধনে যে তাহা বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই। ১৮৯৩ সালে একটি পত্রে কবি লিখিতেছেন—

"এই বোটটি আমার পুরানো ড্রেসিং-গাউনের মতো— এর মধ্যে প্রবেশ করলে খুব একটি ঢিলে অবসরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খুশি পড়ি, যত খুশি লিখি, এবং যত খুশি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন মনে এই আকাশপূর্ণ আলোকপূর্ণ আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি।"[৮]

৪

'ছিন্নপত্রে'র পত্রাংশগুলিতে কবির বিদ্যানুশীলনের বিচিত্র আয়োজনের যে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে তাহা লক্ষ্য করিবার মত। ১৮৮৮ সালে শিলাইদহ হইতে লিখিত পত্রে কবি জানাইতেছেন— "গতকল্য এই মায়া-উপকূলে অনেক ক্ষণ ধরে বিচরণ করে বোটে ফিরে গিয়ে দেখি— ছেলেরা ছাড়া আমাদের দলের আর কেউ ফেরেন নি— আমি একখানা কেদারায় স্থির হয়ে বসলুম— Animal Magnetism নামক একখানা অত্যন্ত ঝাপসা subject-এর বই একটা বাতির আলোতে বসে পড়তে আরম্ভ করলুম।"[৯]

রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থও কবি কিরূপ আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিতেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশটি হইতে জানা যাইবে—

"এখানে এসে আমি এত এলিমেন্‌ট্‌স্‌ অফ পলিটিক্‌স্‌ এবং প্রব্‌লেম্‌স্‌ অফ দি ফ্যুচার পড়ছি শুনে বোধ হয় খুব আশ্চর্য ঠেকতে পারে। আসল কথা, ঠিক এখনকার উপযুক্ত কোনো কাব্য নভেল খুঁজে পাই নে। যেটা খুলে দেখি সেই ইংরিজি নাম, ইংরিজি সমাজ, লন্‌ডনের রাস্তা এবং ড্রয়িং রুম, এবং যতরকম হিজিবিজি

---

৭ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৯২ (সাজাদপুর, ৩০ আষাঢ় ১৮৯৩)। তু° "আমি এখন আছি গান নিয়ে— কতকটা ক্ষ্যাপার মতো ভাব। আপাতত ছবির নেশাটাকে ঠেকিয়ে রেখেচি— কবিতার তো কথাই নেই। আমার যেন বধুবাহুল্য ঘটেচে— সব কটিকে একসঙ্গে সামলানো অসম্ভব।"— ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর নিকট কবির পত্র। দ্র° চিঠিপত্র ৫, পত্রসংখ্যা ৩৫ (শান্তিনিকেতন, ৭ মার্চ ১৯৩১)। অপিচ, দ্র° চিঠিপত্র ৫ পত্রসংখ্যা" ৪ পৃ. ৩১।

৮ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৭৯। শিলাইদহ, মে ১৮৯৩। তুলনীয়: "আমি অবিলম্বে শিলাইদহ অভিমুখে যাত্রা করচি। সেখানে বর্ষাটা বোটের মধ্যে একাকী যাপন করতে হবে। অনেকগুলি কেতাব এবং গুটিকতক খালি খাতা সঙ্গে যাবে।" — চিঠিপত্র, ৫, পত্র ১৪ (কলকাতা, ১৬ জুন, ১৮৯৪), প্রমথ চৌধুরীর নিকট লিখিত পত্র।

৯ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১০।

হাঙ্গাম। বেশ শাদাসিধে, সহজ, সুন্দর, উন্মুক্ত এবং অশ্রুবিন্দুর মতো উজ্জ্বল, কোমল, সুগোল, করুণ কিছুই খুঁজে পাই নে।· ·যাই হোক, এলিমেন্‌ট্‌স্‌ অফ পলিটিক্‌স্‌ জলের উপরে তেলের মতো এখানকার নিস্তব্ধ শান্তির উপর দিয়ে অবাধে ভেসে চলে যায়; একে কোনো রকমে নাড়া দিয়ে ভেঙে দেয় না।"[১০]

কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থ ছিল কালিদাসের রচনাবলী— বিশেষ করিয়া মেঘদূত, এবং বৈষ্ণব পদাবলী। ১৮৯৩ মার্চ মাসে তিরন হইতে লেখা একটি পত্রে কবি বলিতেছেন—

"· ·মনে করেছিলুম বৃষ্টি বাদলা একরকম ফুরোল, এখন স্নাত পৃথিবীসুন্দরী কিছুদিন রৌদ্রে পিঠ দিয়ে আপনার ভিজে এলোচুল শুকোবে, আপনার সিক্ত সবুজ শাড়িখানি রৌদ্রে গাছের ডালে টাঙিয়ে দেবে· ·বাসন্তী আঁচলখানি শুকিয়ে ফুরফুরে হয়ে বাতাসে উড়তে থাকবে। কিন্তু রকমটা এখনও সে ভাবের নয়—বাদলার পর বাদলা। এর আর বিরাম নেই। আমি তো দেখে-শুনে এই ফাল্গুন মাসের শেষভাগে কটকের এক ব্যক্তির একখানি মেঘদূত ধার করে নিয়ে এসেছি। আমাদের পাণ্ডুয়ার কুঠির সম্মুখবর্তী অবারিত শস্যক্ষেত্রের উপরে আকাশ যেদিন আর্দ্রস্নিগ্ধ সুনীলবর্ণ হয়ে উঠবে সেদিন বারান্দায় বসে আবৃত্তি করা যাবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার কিছুই মুখস্থ হয় না— কবিতা ঠিক উপযুক্ত সময়ে মুখস্থ আবৃত্তি করে যাওয়া একটা পরম সুখ, সেটা আমার অদৃষ্টে নেই। যখন আবশ্যক হয় তখন বই হাৎড়ে সন্ধান করে পড়তে গিয়ে আবশ্যক ফুরিয়ে যায়। ·এইজন্যে মফস্বলে যখন যাই তখন অনেকগুলো বই সঙ্গে নিতে হয়; তার সবগুলিই যে প্রতিবার পড়ি তা নয়; কিন্তু কখন্‌ কোন্‌টা দরকার বোধ হবে আগে থাকতে জানবার জো নেই, তাই সমস্ত সরঞ্জাম হাতে রাখতে হয়।· ·যখন পুরী খণ্ডগিরি প্রভৃতি ভ্রমণ করছিলুম তখন যদি মেঘদূতটা হাতে থাকত, ভারী সুখী হতুম। কিন্তু মেঘদূত ছিল না, তার বদলে Caird's Philosophical Essays ছিল।"[১১]

'মেঘদূত' কবিকে কতদূর প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রানুরাগী পাঠক মাত্রই জানেন। এইস্থলে 'ছিন্নপত্রে'র কয়েকটি পত্রাংশ সাক্ষ্যস্বরূপ উদ্‌ধৃত হইল—

"কাল ভাবলুম, বর্ষার প্রথম দিনটা আজ বরঞ্চ ভেজাও ভালো, তবু অন্ধকূপের মধ্যে দিনযাপন করব না। জীবনে '৯৯ সাল আর দ্বিতীয় বার আসবে না—ভেবে দেখতে গেলে পরমায়ুর মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম দিন আর কবারই বা আসবে— সবগুলো কুড়িয়ে যদি ত্রিশটা দিন হয় তা হলেও খুব দীর্ঘজীবন বলতে হবে। মেঘদূত লেখার পর থেকে আষাঢ়ের প্রথম দিনটা একটা বিশেষ চিহ্নিত দিন হয়ে গেছে, নিদেন আমার পক্ষে।· ·হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই যে আষাঢ়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, আমার জীবনেও প্রতি বৎসরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশজোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়—সেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির, সেই বহু বহু কালের শত শত সুখদুঃখ-বিরহমিলন-ময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথমদিবসঃ। সেই অতি পুরাতন আষাঢ়ের প্রথম মহাদিন আমার জীবনে প্রতি

---

১০ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৪৪ (শিলাইদহ, ৮ এপ্রিল ১৮৯২)।

১১ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৭৪। তুলনীয়—"বহুকাল এরকম রীতিমত ঝড় দেখি নি। এখানকার লাইব্রেরিতে একখানা মেঘদূত আছে, ঝড়বৃষ্টি দুর্যোগে, রুদ্ধদ্বার গৃহপ্রান্তে তাকিয়া আশ্রয় করে দীর্ঘ অপরাহ্নে সেইটি খুব করে পড়া গেছে— কেবল পড়া নয়— সেটার উপরে বই নিয়ে বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখেও ফেলেছি।"— চিঠিপত্র. ৫, পত্র°৪ [প্রমথ চৌধুরীর নিকট লিখিত পত্র। রচনাকাল ১৮৯০ (?)]।

বৎসর একটি একটি করে কমে যাচ্ছে— অবশেষে এক সময় আসবে যখন এই কালিদাসের দিন, এই মেঘদূতের দিন, এই ভারতবর্ষের বর্ষার চিরকালীন প্রথম দিন, আমার অদৃষ্টে আর একটিও অবশিষ্ট থাকবে না। এ কথা ভালো করে ভাবলে পৃথিবীর দিকে আবার ভালো করে দেখতে ইচ্ছে করে; ইচ্ছে করে, জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিই। ·"[১২]

পুরী হইতে লিখিত আর-একটি পত্রখণ্ড এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—

"কাঠজুড়ি পেরিয়ে আমাদের পথ। সেখানে গাড়ি থেকে নেবে আমাদের পাল্কিতে উঠতে হল। ধূসর বালুকা ধূধূ করছে। ইংরেজিতে একে যে নদীর বিছানা বলে— বিছানাই বটে। সকালবেলাকার পরিত্যক্ত বিছানার মতো— নদীর স্রোত যেখানে যেমন পাশ ফিরেছিল, যেখানে যেমন তার ভার দিয়েছিল, তার বালুশয্যায় সেখানে তেমনি উঁচু-নিচু হয়ে আছে, সেই বিশৃঙ্খল শয়ন কেউ আর যত্ন করে হাত দিয়ে সমান করে বিছিয়ে রাখে নি। এই বিস্তীর্ণ বালির ওপারে একটি প্রান্তে একটুখানি শীর্ণ স্ফটিকস্বচ্ছ জল ক্ষীণ স্রোতে বয়ে চলে যাচ্ছে। কালিদাসের মেঘদূতে বিরহিণীর বর্ণনায় আছে যে, যক্ষপত্নী বিরহশয়নের একটি প্রান্তে লীন হয়ে আছে, যেন পূর্বদিকের শেষ সীমায় কৃষ্ণপক্ষের কৃশতম চাঁদটুকুর মতো। বর্ষাশেষের এই নদীটুকু দেখে বিরহিণীর যেন আর একটি উপমা পাওয়া গেল।"[১৩]

আর-একস্থলে প্রকৃতির শোভা দেখিয়া কবির মনে শকুন্তলার একটি দৃশ্য উদিত হইতেছে—

"· ·এই সময়টা সকালবেলায় নওয়াড়ির কাছে উঁচুনিচু প্রস্তরকঠিন তরুবিরল পৃথিবীর উপর সূর্যোদয় হয়।· ·দুইধারে বিদীর্ণ পৃথিবী, কালো কালো পাথর, শুকনো জলস্রোতের নুড়ি ছড়ানো পথচিহ্ন, ছোটো ছোটো অপরিণত শাল গাছ, এবং টেলিগ্রাফের তারের উপর কালো লেজ-ঝোলানো চঞ্চল ফিঙে পাখি। একটা যেন বৃহৎ বন্য প্রকৃতি পোষ মেনে একটি জ্যোতির্ময় নবীন দেবশিশুর উজ্জ্বল কোমল করস্পর্শ সর্বাঙ্গে অনুভব করে শান্ত স্থিরভাবে শুয়ে পড়ে আছে। কিরকম ছবিটা আমার মনে আসে বলব? কালিদাসের শকুন্তলায় আছে দুষ্মন্তের ছেলে শিশু ভরত একটা সিংহশাবক নিয়ে খেলা করত। সে যেন একদিন পশুবৎসলভাবে সিংহশাবকের বড়ো বড়ো রোঁওয়ার মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে আপনার শুভ্রকোমল অঙ্গুলিগুলি চালনা করছে, আর বৃহৎ জন্তুটা স্থির হয়ে পড়ে আছে, এবং মাঝে মাঝে সস্নেহে একান্ত নির্ভরের ভাবে আপনার মানববন্ধুর প্রতি আড়চক্ষে চেয়ে দেখছে।"[১৪]

সাজাদপুর হইতে লিখিত একটি পত্রখণ্ডও কবির অসীম কালিদাস-প্রীতির নিদর্শন হিসাবে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"কালকের চিঠিতে লিখেছিলুম, আজ অপরাহ্ণ সাতটার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজমেণ্ট্‌ করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে, বইখানি হাতে, যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি, হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্টমাস্টার এসে উপস্থিত। মৃত কবির চেয়ে একজন জীবিত পোস্টমাস্টারের দাবি ঢের বেশি। আমি তাঁকে বলতে পারলুম না, 'আপনি

১২ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৫২ (শিলাইদহ বুধবার। ২ আষাঢ় ১২৯৯)।

১৩ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৭১ (পুরী, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩)

১৪ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৫ (বোয়ালিয়া, ১৮ নভেম্বর ১৮৯২)।

এখন যান, কালিদাসের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে।' বললেও সে লোকটি ভালো বুঝতে পারতেন না। অতএব পোস্টমাস্টারকে চৌকিটি ছেড়ে দিয়ে কালিদাসকে আস্তে আস্তে বিদায় নিতে হল।· ·

"পোস্টমাস্টার চলে গেলে সেই রাত্রে আবার রঘুবংশ নিয়ে পড়লুম। ইন্দুমতীর স্বয়ংবর পড়ছিলুম। সভায় সিংহাসনের উপর সারি সারি সুসজ্জিত সুন্দর-চেহারা রাজারা ব'সে গেছেন, এমন সময় শঙ্খ এবং তূরীধ্বনির মধ্যে বিবাহবেশ প'রে সুনন্দার হাত ধরে ইন্দুমতী তাঁদের মাঝখানে সভাস্থলে এসে দাঁড়ালেন। ছবিটি মনে করতে এমনি সুন্দর লাগে। তার পরে সুনন্দা এক-একজনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আর ইন্দুমতী অনুরাগহীন এক-একটি প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। এই প্রণাম করাটি কেমন সুন্দর। যাকে ত্যাগ করেছেন তাকে যে নম্রভাবে সম্মান করে যাচ্ছেন এতে কতটা মানিয়ে যাচ্ছে। সকলেই রাজা, সকলেই তাঁর চেয়ে বয়সে বড়ো, ইন্দুমতী একটি বালিকা, সে যে তাঁদের একে একে অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে এর অবশ্য-রূঢ়তাটুকু যদি একটি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত তা হলে এই দৃশ্যের সৌন্দর্য থাকত না।"[১৫]

কালিদাসের কাব্য কবির চেতনার সহিত কিরূপ ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছিল, উপরের উদ্ধৃতগুলি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কালিদাসের কাব্য পাঠ যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কেবল মানস-বিলাস মাত্র ছিল না, উহা যে তাঁহার অন্তরের অদম্য রসপিপাসার পরিতৃপ্তিসাধনের অন্যতম প্রধান সহায় ছিল, তাহা 'ছিন্নপত্রে'র উদ্ধৃত পত্রগুলি হইতে অতি সুন্দরভাবে প্রমাণিত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে আচার্য জগদীশচন্দ্রকে লিখিত কবির একটি পত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পত্রটি যদিও পরবর্তীকালের রচনা, তবুও কবির মজ্জাগত কালিদাস-প্রীতির অপূর্ব সাক্ষ্য হিসাবে ইহা স্মরণীয় এবং 'ছিন্নপত্রে'র উদ্ধৃত অংশগুলির সহিত একাত্মতা-সূত্রে গ্রথিত। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপে জগদীশচন্দ্রের জয়সংবাদ পাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া পত্রের অন্তিমছত্রে জানাইতেছেন—

"পত্রের মধ্যে আমাদের আশ্রমবৃক্ষ হইতে কালিদাসের শিরীষ পুষ্প তোমাকে পাঠাইলাম।"[১৬]

প্রবাসী প্রিয়তম বন্ধুর নিকট প্রীতির অর্ঘ্য স্বরূপ আশ্রমবৃক্ষ হইতে শিরীষ পুষ্প পত্র মধ্যে প্রেরণ করার কল্পনা রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কাহারও মনে উদিত হইত কি ? ইহাত' শুধু বুদ্ধি দিয়া কালিদাসকে ভালো লাগা নহে, সমস্ত প্রাণমন দিয়া ভালোবাসা, মহাকবির সুকুমার শিল্পকলাকে একেবারে আত্মসাৎ করিয়া লওয়া![১৭]

'জীবনস্মৃতি' যাঁহারাই পড়িয়াছেন তাঁহারাই রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি আবাল্য আকর্ষণের কথা অবগত আছেন। কবি নিজেই নানাস্থলে দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করিয়াছেন যে, উপনিষদ্ ও বৈষ্ণব কবিতা— এই দুই'এর সংমিশ্রণে তাঁহার মানসিক আবহাওয়া রচিত হইয়াছে। 'ছিন্নপত্রে'র নানাস্থলে

১৫ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৫৯ (সাজাদপুর, ২৯ জুন ১৮৯২)।

১৬ দ্র° চিঠিপত্র ৬, পত্র° ১৯ [এপ্রিল ১৯০২]।

১৭ তু° "বাংলা ভাষায় প্রেম অর্থে দুটো শব্দের চল আছে ; ভালো লাগা আর ভালো বাসা। এই দুটো শব্দে আছে প্রেমসমুদ্রের দুই উলটো পারের ঠিকানা। যেখানে ভালোলাগা সেখানে ভালো আমাকে লাগে, যেখানে ভালোবাসা সেখানে ভালো অন্যকে বাসি। আবেগের মুখটা যখন নিজের দিকে তখন ভালোলাগা, যখন অন্যের তৃপ্তির দিকে তখন ভালোবাসা। ভালোলাগায় ভোগের তৃপ্তি, ভালোবাসায় ত্যাগের সাধন।"— পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি : যাত্রী, পৃ. ১২৮-১২৯।

পদাবলী-সাহিত্যের যে উল্লেখ আছে তাহা হইতেই অনুমান করিতে পারা যায় কালিদাস-প্রীতির মতই কবির পদাবলী-প্রীতি ছিল সহজাত। শিলাইদহ হইতে লিখিত একখানি পত্রে কবি বলিতেছেন—

"এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাই নে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোটো ছোটো পদ ছাড়া।"[১৮]

বোলপুর হইতে লিখিত আর একখানি পত্রে কবি বর্ষণমুখর গভীর নিশীথিনীতে বৈষ্ণব কবিগণ-কর্তৃক রাধিকার অভিসার-বর্ণনার যে সকৌতুক উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বেশ উপভোগ্য—

"বাড়িমুখে যেমন ফিরেছি অমনি প্রকাণ্ড মাঠের উপর দীর্ঘ পদক্ষেপ করতে করতে সরোষ গর্জনে একটা ঝড় আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। আমার আবার চোখে eye-glass ছিল; সেটা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে, কিছুতেই রাখতে পারি নে। এক হাতে চষমা ধ'রে আর-এক হাতে ধুতির কোঁচা সামলে, পথের কাঁটাগাছ এবং গর্ত বাঁচিয়ে চলছি। যদি এখানকার কোপাই নদীর ধারে আমার কোনো প্রণয়িনীর বাড়ি থাকত, আমার চষমা এবং কোঁচা সামলাতুম না তার স্মৃতি সামলাতুম! বাড়িতে ফিরে এসে কাল অনেকক্ষণ ভাবলুম— বৈষ্ণব কবিরা গভীর রাত্রে ঝড়ের সময় রাধিকার অকাতর অভিসার সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো মিষ্টি কবিতা লিখেছেন; কিন্তু একটা কথা ভাবেন নি, এরকম ঝড়ে কৃষ্ণের কাছে তিনি কী মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হতেন। চুলগুলোর অবস্থা যে কিরকম হত সে তো বেশ বোঝা যাচ্ছে। বেশবিন্যাসেরই বা কি রকম দশা! ধুলোতে লিপ্ত হয়ে, তার উপর বৃষ্টির জলে কাদা জমিয়ে, কুঞ্জবনে কিরকম অপরূপ মূর্তি ক'রে গিয়েই দাঁড়াতেন! এসব কথা কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের লেখা পড়বার সময় মনে হয় না। কেবল মানসচক্ষে ছবির মতো দেখতে পাওয়া যায় একজন সুন্দরী শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রে বিকশিত কদম্ববনের ছায়া দিয়ে, যমুনার তীরপথে, প্রেমের আকর্ষণে, ঝড়বৃষ্টির মাঝে আত্মবিহ্বল হয়ে স্বপ্নগতার মতো চলেছেন। পাছে শোনা যায় ব'লে পায়ের নূপুর বেঁধে রেখেছেন, পাছে দেখা যায় ব'লে নীলাম্বরী কাপড় পরেছেন; কিন্তু পাছে ভিজে যান ব'লে ছাতা নেন নি, পাছে পড়ে যান ব'লে বাতি আনা আবশ্যক বোধ করেন নি। হায়, আবশ্যক জিনিসগুলো আবশ্যকের সময় এত বেশি দরকার, অথচ কবিত্বের বেলায় এত উপেক্ষিত!"[১৯]

আর-এক পত্রে দেখিতে পাই কবি বোটে করিয়া পদ্মাবক্ষে ভাসিয়া চলিতেছেন, বর্ষাপ্রকৃতির শ্যাম সমারোহ তিনি মুগ্ধ নেত্রে দর্শন করিতেছেন, আর বৈষ্ণব পদাবলীর বর্ষাবর্ণনা তাঁহার মনে পড়িতেছে—

"আমাদের বোট ছেড়ে দিয়েছে। তীরটা এখন বামে পড়েছে। খুব নিবিড় প্রচুর সরস সবুজের উপর খুব ঘন নীল সজল মেঘরাশি মাতৃস্নেহের মতো অবনত হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে গুরুগুরু মেঘ ডাকছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষার যমুনা-বর্ণনা মনে পড়ে। প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণব কবির ছন্দোঝংকার এনে দেয়। তার প্রধান কারণ এই, প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়; এর মধ্যে একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্ছে, এর মধ্যে অনন্ত বৃন্দাবন। বৈষ্ণব পদাবলীর মর্মের ভিতর যে প্রবেশ করছে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে সে বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।"[২০]

১৮ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা, ৪৪। (৮ এপ্রিল ১৮৯২)।

১৯ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা, ৪৮। বোলপুর। মঙ্গলবার। ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯২।

২০ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা, ১১৮। কুষ্টিয়ার পথে। ২৪ অগষ্ট, ১৮৯৪।

বৈষ্ণব কবিতা কিভাবে তাঁহার কবিদৃষ্টিকে প্রভাবিত করিয়াছিল, কবির তরুণ বয়সের এই স্বীকারোক্তি তাহার এক নিঃসংশয় সাক্ষ্য।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিত 'ছিন্নপত্র'-পর্বের অন্তর্ভুক্ত একখানি পত্র হইতে জানা যায় কবি কিরূপ অভিনিবেশ সহকারে বাণভট্টের 'কাদম্বরী' পাঠ করিতেছিলেন। 'প্রাচীন সাহিত্যে'র সুপ্রসিদ্ধ 'কাদম্বরী' সমালোচনা যে কবির পরোক্ষ-প্রত্যয়-সঞ্জাত নহে, বাণভট্টের গদ্যশিল্পের প্রকৃত রসাস্বাদনের জন্য যে কবি ছাত্রের ন্যায়ই এই দুরূহ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তি—

"হাঁ— গৃহ অর্থে 'কক্ষ' শব্দের ব্যবহার আমি কাদম্বরীতে অনেক জায়গায় পেয়েছি এবং আরো দুই-একটা সংস্কৃত বইয়ে পাওয়া গেছে। কাদম্বরী অল্প অল্প করে এগচ্চে। শ দুয়েক পাতা হয়েছে— আরো ততগুলো পাত বাকি আছে।"[২১]

ইহারই কিছু পরবর্তীকালে রচিত 'ছিন্নপত্রে'র অন্তর্ভুক্ত এক চিঠিতে কবি বলিতেছেন—

"'পশুপ্রীতি' বলে ব— একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছে; আজ সমস্ত সকালবেলায় সেইটে নিয়ে পড়েছিলুম।· ·কাদম্বরীর সেই মৃগয়াবর্ণনা থেকে অনেকটা আমি ব— কে তর্জমা করতে বলে দিয়েছি।[২২] পাখিরাও যে কতকটা আমাদেরই মতো, একটা জায়গা আছে যেখানে তাতে আমাতে প্রভেদ নেই, এইটে বাণভট্ট আপন করুণ কল্পনাশক্তির দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করেছেন।"[২৩]

৫

এই যুগে কবি যে শুধু রস-সাহিত্যেই আপনাকে আকণ্ঠ নিমগ্ন রাখিয়াছিলেন, তাহা নহে। ভারতের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার সহিত পরিচয় লাভের আগ্রহ তাঁহার কিছুমাত্র কম ছিল না। আমরা জানি উপনিষদের মন্ত্রপাঠ আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত মহর্ষি-পরিবারের প্রত্যেকেরই প্রাত্যহিক উপাসনার অঙ্গ ছিল। কিন্তু উপনিষদের প্রতি কবিচিত্তের অনুরাগ শুধু মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারাই চরিতার্থতা লাভ করিত না। তিনি উহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য মননের দ্বারা উপলব্ধি করিবার জন্য সতত যত্নশীল ছিলেন। 'ছিন্নপত্র' -পর্বে উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শন কবি কিরূপ আগ্রহের সহিত অনুশীলন করিতেছিলেন তাহার পরিচয় আমরা পাই নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশটিতে—

"এবারে আমার সঙ্গে আমি রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলী এনেছি। তাতে গুটি তিনেক সংস্কৃত বেদান্ত গ্রন্থ ও তার অনুবাদ আছে। তার থেকে আমার অনেক সাহায্য হয়েছে। বেদান্তপাঠে বিশ্ব এবং বিশ্বের আদিকারণ সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসংশয় হয়ে থাকেন, কিন্তু আমার সংশয় দূর হয় না। এক হিসাবে অন্য অনেক মত অপেক্ষা বেদান্তমত সরল। সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা কথাটা শুনতে সহজ কিন্তু অমন সমস্যা আর নেই। বেদান্ত তারই একেবারে গর্ড্যান-গ্রন্থি ছেদন ক'রে বসে আছেন— সমস্যাটাকে একেবারে আধখানা ছেঁটেই ফেলেছেন। সৃষ্টি একেবারেই নেই, আমরাও নেই, আছেন কেবল ব্রহ্ম আর মনে হচ্ছে যেন

২১ চিঠিপত্র ৫, পত্র° ১২ক সাহজাদপুর। ৮ শ্রাবণ [১৮৯১]

২২ দ্র° বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, পৃ. ৪২—৫০ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ১৩৫৯)। উদ্ধৃত পত্রেই *Amiel's Jonrnal* এর যে অংশ কবি উল্লেখ করিয়াছেন, বলেন্দ্রনাথের 'পশুপ্রীতি' শীর্ষক প্রবন্ধের পাদটীকারূপে তাহাও বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকায় (চৈত্র ১৩০০)।

২৩ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১০০। পতিসার, ২২ মার্চ, ১৮৯৪।

আমরা আছি। আশ্চর্য এই, মানুষ মনে এ কথা স্থান দিতে পারে। আরও আশ্চর্য এই, কথাটা শুনতে যত অসংগত আসলে তা নয়— বস্তুত কিছুই যে আছে সেইটে প্রমাণ করাই শক্ত। যাই হোক, আজকাল সন্ধ্যাবেলায় যখন জ্যোৎস্না ওঠে এবং আমি যখন অর্ধনিমীলিত চোখে বোটের বাইরে কেদারায় পা ছড়িয়ে বসি, স্নিগ্ধ সমীরণ আমার চিন্তাক্লান্ত তপ্ত ললাট স্পর্শ করতে থাকে, তখন এই জল স্থল আকাশ, এই নদীকল্লোল, ডাঙার উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধ জন পথিক ও জলের উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধখানা জেলেডিঙির গতায়াত, জ্যোৎস্নালোকে অপরিস্ফুট মাঠের প্রান্ত, দূরে অন্ধকারজড়িত বনবেষ্টিত সুপ্তপ্রায় গ্রাম— সমস্তই ছায়ারই মতো, মায়ারই মতো বোধ হয়, অথচ সে মায়া সত্যের চেয়ে বেশি সত্য হয়ে জীবনমনকে জড়িয়ে ধরে এবং এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মুক্তি এ কথা কিছুতেই মনে হয় না। দার্শনিক বলতে পারেন, জগৎটাকে সত্য জ্ঞান করাতে দিনের বেলায় যে একটা দৃঢ় বন্ধনজাল থাকে, সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত ছায়াময় ও সৌন্দর্যময় হয়ে আসাতে সেই বন্ধন অনেকটা পরিমাণে শিথিল হয়ে আসে। যখন জগৎটাকে একেবারে নিছক মায়া ব'লেই নিশ্চয় জানব তখনই মুক্তির বাধা থাকবে না। এ কথাটা আমি অতি ঈষ—ৎ অনুমান এবং অনুভব করতে পারি; হয়তো কোন্‌দিন দেখব বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে আমি জীবন্মুক্ত হয়ে বসে আছি।"[২৪]

আচার্য শঙ্করের মায়াবাদ যে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল ইহা আমরা তাঁহার 'শান্তিনিকেতন' ভাষণাবলী হইতে সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারি। 'ছিন্নপত্রে'র উদ্‌ধৃত অনুচ্ছেদটিতে তাহারই আভাস আমরা পাইতেছি।

বৌদ্ধদর্শন ও সাহিত্য কবি কম অধ্যবসায়ের সহিত এই সময়ে অনুশীলন করেন নাই। ১৮৯৩ সালে তিরন হইতে লিখিত পূর্বোদ্‌ধৃত পত্রে 'নেপালীজ বুদ্ধিস্টিক লিটারেচর'এর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সুবিখ্যাত গ্রন্থ *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*[২৫] যে কবির সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে কিরূপ গভীর প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল তাহা রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের নিকট অজ্ঞাত নয়। শুধুই সাহিত্যের বিষয়বস্তু আহরণের অফুরন্ত ভাণ্ডার রূপে নহে, কবি মহাযান বৌদ্ধধর্মের সাধনপ্রণালী ও দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগ পাইলেন এই গ্রন্থের মাধ্যমেই। হীনযান মতাবলম্বীর নির্বাণ-সাধনা যে কবির মনঃপূত ছিল না, বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা ও ভক্তিসাধনাই যে কবিকে সমধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহা আমরা পরবর্তীকালে রচিত কবির বহু প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারি। 'ছিন্নপত্রে'র একটি পত্রেও এই হীনযান মতের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই যেন কবি বলিতেছেন—

"কেননা সৃষ্টি কখনোই সম্পূর্ণ সুখের হতে পারে না। যতক্ষণ অপূর্ণতা ততক্ষণ অভাব, ততক্ষণ দুঃখ থাকবেই। জগৎ যদি জগৎ না হয়ে ঈশ্বর হত তা হলেই কোথাও কোনো খুঁত থাকত না— কিন্তু ততটা দূর পর্যন্ত দরবার করতে সাহস হয় না। ভেবে দেখলে সকল কথাই গোড়ায় গিয়ে ঠেকে যে, সৃষ্টি হল কেন— কিন্তু সেটা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি যদি না করা যায় তা হলে, জগতে দুঃখ রইল কেন এ নালিশ উত্থাপন করা মিথ্যা। সেইজন্যে বৌদ্ধেরা একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ মারতে চায়; তারা বলে যতক্ষণ

---

২৪ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১১৭। শিলাইদহ ১৬ অগস্ট, ১৮৯৪।

২৫ প্রকাশকাল ১৮৮২।

অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ দুঃখের সংশোধন হতে পারে না, একেবারে নির্বাণ চাই। খৃস্টানরা বলে দুঃখটা খুব উচ্চ জিনিস, ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ হয়ে আমাদের জন্যে দুঃখ বহন করেছেন। কিন্তু নৈতিক দুঃখ এক, আর পাকা ধান ডুবে যাওয়ার দুঃখ আর। আমি বলি, যা হয়েছে বেশ হয়েছে ; এই যে আমি হয়েছি এবং এই আশ্চর্য জগৎ হয়েছে, বড়ো তোফা হয়েছে— এমন জিনিসটা নষ্ট না হলেই ভালো। বুদ্ধদেব তদুত্তরে বলেন, এ জিনিসটা যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে দুঃখ সইতে হবে। আমি নরাধম তদুত্তরে বলি, ভালো জিনিস এবং প্রিয় জিনিস রক্ষা করতে যদি দুঃখ সইতে হয় তা হলে দুঃখ সব'— তা, আমি থাকি আর আমার জগৎটি থাকুক। মাঝে মাঝে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, মনঃক্ষোভ, নৈরাশ্য বহন করতে হবে ; কিন্তু সে দুঃখের চেয়ে যখন অস্তিত্ব ভালোবাসি এবং অস্তিত্বের জন্যই সে দুঃখ বহন করি তখন তো আর কোনো কথা বলা শোভা পায় না।"[২৬]

পত্রাংশটুকুরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই দীর্ঘকাল ব্যবধানে ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীরই নিকট লিখিত কবির আর একখানি পত্রে। কবির বয়স তখন সপ্ততিবর্ষ। কবি বলিতেছেন

"হিসাব করে যদি দেখিস্ তো দেখতে পাবি বয়স হোলো প্রায় সত্তর, অর্থাৎ বৈতরণীর ধার ঘেঁষে চলেচি। কিন্তু বোধ হচ্চে ভোগ যেন কিছু বাকি আছে, তাই যদিচ ঘাটে আসন পেতেছি তবু খেয়ায় এখনো জায়গা হোলো না। একটা অত্যন্ত নিশ্চিত সত্য আছে সেটা মানুষ তার সমস্ত জীবনে কেবল একবার মাত্র প্রমাণ করতে পারে, সে হচ্চে মানুষ অমর নয়। কিন্তু নাইবা হোলো— কিছুদিন বেঁচেছি, অত্যন্ত নিবিড় করে জেনেচি আমি হচ্চি আমি— অন্তহীন আমি-নয়-এর মাঝখানে এই একটিমাত্র আমি— অসীম জগতে এই পরমাশ্চর্য সত্য অসীম কালের অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় আমার মধ্যে দীপ্ত হয়ে উঠেছে এর চেয়ে আর কী চাই। মৃত্যু কি এর চেয়েও বড়ো যে ভাবনা করতে হবে। সাধকেরা বলেচেন দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে হওয়াটাকেই সমূলে উপড়ে ফেল্‌তে হবে— কিন্তু আমি বলি হওয়াটা যদি মিট্‌ল তবে দুঃখটা গেল কি না গেল তাতে কি আসে যায়। রুগী বল্‌চে, কব্‌রেজ মশায়, জ্বর ছাড়াও— কবিরাজ নস্য নিয়ে বল্‌লেন দেহ ত্যাগ করলে জ্বরের উৎপাত একেবারে ঘুচবে। রুগীর বক্তব্য এই যে দেহটার জন্যেই জ্বরের অবসান কামনা করা, দেহটারই অবসান যদি একমাত্র উপায় হয় তাহলে জ্বরটা না হয় রইল। আমি আছি এইটে হোল শেষ কথা, এটাকেও শেষ করলে বাকি রইল কি ? মৃত্যুতে ওটা শেষ হয় কি না হয় জানি নে, কিন্তু বেঁচে থাকতে থাকতেই যে সব সন্ন্যাসী ওটাকে কেবলই রগ্‌ড়ে মুছে ফেলবার চেষ্টায় লেগে থাকে তাদের সঙ্গে কোনোদিন আমার বনিবনাও হোলো না। জীবনে কঠিন দুঃখ পেয়েছি এবং নিবিড় সুখ। কিন্তু সেই দুঃখে আমার হওয়াটাকেই তীব্র করে প্রমাণ করেচে, অতএব তাকে নিন্দে করব না।· ·"[২৭]

তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে 'ছিন্নপত্র'-পর্বে জগৎ ও জীবনসম্পর্কে বত্রিশ বৎসর বয়সে তরুণ কবির মনে যে ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল, শঙ্করের মায়াবাদ এবং হীনযান বৌদ্ধধর্মের নির্বাণতত্ত্ব-সম্পর্কে কবিমানসে যে প্রতিক্রিয়ার উদয় হইয়াছিল, তাহা বয়ঃপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর স্থায়িত্ব দৃঢ়তা অর্জন করিয়াছে, কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই।

---

২৬ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৮৮ শিলাইদহ, ৪ জুলাই ১৮৯৩।

২৭ চিঠিপত্র ৫, পত্র° ৩৪। [New Haven, ২৫ অক্টোবর ১৯৩০].

৬

পুরাতত্ত্ব ও ভ্রমণবৃত্তান্ত সংক্রান্ত গ্রন্থরাজি কবির বিশ্বগ্রাসী বুভুক্ষানলের ইন্ধন জোগাইত। ১৯০০ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে বিলাতপ্রবাসী বন্ধুবর জগদীশচন্দ্রের এক পত্রের উত্তরে কবি লিখিতেছেন—

"আমাকে তুমি কি এক দিগ্‌গজ পুরাতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া ভ্রম করিয়াছ? প্রাচীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের কি পর্য্যন্ত আলোচনা হইয়াছে তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানি না। ত্রিবেদী সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞান (astronomy) সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ তাঁহার 'প্রকৃতি' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন—সেই গ্রন্থ তোমাকে পাঠাইয়া দিব।"[২৮]

কবির এই উক্তি নিতান্তই বিনয়প্রসূত। ইতিহাস পুরাবৃত্ত এমনকি প্রত্নতত্ত্ব বা archaeologyও তাঁহার ঔৎসুক্যের পরিধির বহির্ভূত তো ছিলই না; বস্তুতঃ এমন-সব প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও আবিষ্কারের সহিত কবি পরিচিত ছিলেন যাহা আমাদের দেশের বহু ডিগ্রিধারী উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক-প্রধানেরও জ্ঞানের অগোচর। এইখানে প্রাসঙ্গিকভাবে একটি উদাহরণ উদ্ধার করিতেছি। 'শেষের কবিতা' কবির পরিণত-বয়সের রচনা। এই উপন্যাসের নায়ক অমিত রায় তাহার বন্ধু শোভনলাল সম্পর্কে নায়িকা লাবণ্যের কাছে বলিতেছে—

"তবে বলি। হঠাৎ শোভনলালের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তার নাম শুনেছ বোধ হয়— রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-ওয়ালা? ভারত-ইতিহাসের সাবেক পথগুলো সন্ধান করবে বলে কিছুকাল থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে। সে অতীতের লুপ্ত পথ উদ্ধার করতে চায়। আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতের পথ সৃষ্টি করা।· ·

"এক সময়ে সে খেপেছিল, আফগানিস্থানের প্রাচীন শহর কাপিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো রাস্তা চলেছিল সেইটেকে আয়ত্ত করবে। ওই রাস্তা দিয়েই ভারতবর্ষে হিউয়েন সাঙের তীর্থযাত্রা, ওই রাস্তা দিয়েই তারও পূর্বে আলেকজাণ্ডারের রণযাত্রা। খুব কষে পুশতু পড়লে, পাঠানি কায়দাকানুন অভ্যেস করলে। সুন্দর চেহারা, ঢিলে কাপড়ে ঠিক পাঠানের মতো দেখতে হয় আমাকে এসে ধরলে, সেখানে ফরাসি পণ্ডিতরা এই কাজে লেগেছেন, তাঁদের কাছে পরিচয়পত্র দিতে। ফ্রান্সে থাকতে তাঁদের কারও কাছে আমি পড়েছি। দিলেম পত্র, কিন্তু ভারতসরকারের ছাড়চিঠি জুটল না। তার-পর থেকে দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে কেবলই পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে— কখনো কাশ্মীরে, কখনো কুমায়ুনে। এবার ইচ্ছে হয়েছে, হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তটাতেও সন্ধান করবে। বৌদ্ধধর্মপ্রচারের রাস্তা এদিক দিয়ে কোথায় কোথায় গেছে সেইটে দেখতে চায়। ওই পথ-খেপাটার কথা মনে করে আমারও মন উদাস হয়ে যায়। পুঁথির মধ্যে আমরা কেবল কথার রাস্তা খুঁজে খুঁজে চোখ খোওয়াই, ওই পাগল বেরিয়েছে পথের পুঁথি পড়তে, মানববিধাতার নিজের হাতে লেখা।· ·"[২৯]

এই উক্তি যে দাম্ভিক অমিত রায়ের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত উচ্ছ্বাসমাত্র নহে, প্রৌঢ় কবির গভীর প্রত্নতত্ত্ব-প্রীতির প্রচ্ছন্ন সাক্ষ্য যে উহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, ইহা হয়তো অনেকেরই মনে উদয় হইবে না। ফরাসি অধ্যাপক ফুশে (A. Foucher) ১৯০১ সালে *Bulletin d' École Francaise d'*

২৮ চিঠিপত্র ৬, পত্র ৮।

২৯ শেষের কবিতা § ১৩, 'আশঙ্কা'।

Extrême-Orient নামক সুবিখ্যাত পত্রিকায় প্রাচীন ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটির নাম— *Géographie ancienne du Gandhāra :* Itinéraire de Hiuan-tsang en Afghanistan. পরবর্তী কালে তিনি এই বিষয় লইয়া আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে *La vieille route de Gandhāra à Taxilâ* নামক তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ প্রাচীন ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা-কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ যে ফরাসি পণ্ডিত ফুশে'র এই গবেষণাকে লক্ষ্য করিয়াই অমিত রায়ের মুখ দিয়া শোভনলাল-প্রশস্তি গাহিয়াছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে মহর্ষির সাহচর্যে যে দেশভ্রমণের সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহা হইতেই দেশ-ভ্রমণের নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। ইহারই পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য কবি চিরকাল ভ্রমণবৃত্তান্তের বই আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। সংকীর্ণ গৃহকোণে তাঁহার দেহ ও মন দুইই সমানভাবে পীড়িত হইত। 'ছিন্নপত্রে'র এক জায়গায় তিনি লিখিতেছেন—

"ইচ্ছা করছে কোনো-একটা বিদেশে যেতে— বেশ একটি ছবির মত দেশ— পাহাড় আছে, ঝর্ণা আছে, পাথরের গায়ে খুব ঘন শৈবাল হয়েছে, দূরে পাহাড়ের ঢালুর উপরে গোরু চরছে, আকাশের নীল রঙটি খুব স্নিগ্ধ এবং সুগভীর, পাখি পতঙ্গ পল্লব এবং জলধারার একটা বিচিত্র মৃদু শব্দমিশ্র উঠে মস্তিষ্কের মধ্যে ধীরে ধীরে তরঙ্গাভিঘাত করছে। দূর হোক গে ছাই, আজ আর কিছুতে হাত না দিয়ে দক্ষিণের ঘরে একলাটি হাত-পা ছড়িয়ে একটা কোনো ভ্রমণবৃত্তান্তের বই নিয়ে পড়ব মনে করছি— বেশ অনেক-গুলো ছবিওয়ালা নতুন-পাতকাটা বই। আলোচনা করবার মতো, মনের উন্নতি সাধন করবার মতো বই পৃথিবীতে অসংখ্য আছে, কিন্তু কুঁড়েমি করবার মতো বই ভারী কম; সেই রকম বই লিখতে অসামান্য ক্ষমতার দরকার।. .”[৩০]

বোলপুর হইতে লিখিত আর-একটি পত্রে কবি জানাইতেছেন—

“কাল কেবল বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে একখানি ছোটো কবিতা লিখেছি এবং একটি তিব্বতভ্রমণের বই পড়েছি। এরকম জায়গায় নভেল আমি ছুঁতে পারি নে।. .ভ্রমণবৃত্তান্তের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, তার মধ্যে অবিশ্রাম গতি আছে অথচ প্লটের বন্ধন নেই— মনের একটি অবারিত স্বাধীনতা পাওয়া যায়। এখানকার জনহীন মাঠের মাঝখান দিয়ে একটি রাঙা রাস্তা চলে গেছে; সেই রাস্তা দিয়ে যখন দুই-চার জন লোক কিম্বা দুটো-একটা গোরুর গাড়ি মন্থর গমনে চলতে থাকে, তার বড়ো একটা টান আছে— মাঠ তাতে আরও যেন ধূ ধূ ক'রে ওঠে, মনে হয় এই মানুষগুলো যে কোথায় যাচ্ছে তার যেন কোনো ঠিকানা নেই। ভ্রমণবৃত্তান্তের বইও আমার এই মানসিক নিরালার মধ্যে সেই রকম একটি গতিপ্রবাহের ক্ষীণ রেখা অঙ্কিত ক'রে দিয়ে চলে যেতে থাকে; তাতে করে আমার মনের সুবিস্তীর্ণ আকাশ আরও যেন বেশি ক'রে অনুভব করতে পারি।”[৩১]

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ কবিতা 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি'— ইহার মধ্যে 'ছিন্নপত্রে'র উদ্ধৃত পংক্তি-কয়টির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবানুষঙ্গ লক্ষণীয়।

---

৩০ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১৪২ (কলকাতা ৯ এপ্রিল ১৮৯৫)।

৩১ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১২৭ (বোলপুর। ১৯ অক্টোবর ১৮৯৪)।

জীবনীসাহিত্যও কবির কম প্রিয় ছিল না। ডাউডেন-রচিত ইংরেজ কবি শেলির সুপ্রসিদ্ধ জীবনীগ্রন্থ যে কবি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশটুকু তাহার প্রমাণ—

"আমরা প্রত্যেক মুহূর্ত মাড়িয়ে মাড়িয়ে জীবনটা সম্পূর্ণ করি, কিন্তু মোটের উপর সবটা খুবই ছোটো; দুটি ঘণ্টা কালের নির্জন চিন্তার মধ্যে সমস্তটাকে ধারণ করা যেতে পারে। শেলি ত্রিশটা বছর প্রতিদিন সহস্র কাজে সহস্র প্রয়াসে জীবন ধারণ করে দুটিমাত্র ভলুম জীবনচরিতের সৃষ্টি করেছেন; তার মধ্যেও ডাউডেন সাহেবের বাজে বকুনি বিস্তর আছে। আমার জীবনের ত্রিশটা বছরে বোধ করি একখানা ভলুমও পোরে না।· ·"[৩২]

শিলাইদহ-প্রবাসকালে কবির নিত্যসহচর ছিলেন আমিয়েল সাহেব—

"আমার একটি নির্জনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে— আমি লোকেনের ওখান থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি, যখনই সময় পাই সেই বইটা উল্টেপাল্টে দেখি; ঠিক মনে হয়, তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা কচ্ছি; এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি। অনেক বই এর চেয়ে ভালো লেখা আছে এবং এই বইএর অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু এই বইটি আমার মনের মতো।· ·আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু আমিয়েল পশুদের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছে; ব—র লেখায় আমি সেইটে সমস্তটা নোট বসিয়ে দিয়েছি।"[৩৩]

'ছিন্নপত্রে'র যুগেই প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিত কবির এক পত্রে দেখি—

'Bashkirtscheff-এর Journal আমিও পড়ছি— মন্দ লাগ্‌চে না কিন্তু মোটের উপরে কষ্টকর ঠেক্‌চে।· ·'[৩৪]

৭

'ছিন্নপত্রে'র যুগে রবীন্দ্রনাথ জর্মান ভাষা শিক্ষায় মনোযোগ দিয়াছিলেন, এবং বেশ কিছুটা যে অগ্রসরও হইয়াছিলেন তাহার পরিচয়ও আমরা পাই। ১৮৯০ খৃস্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে শিলাইদহ হইতে কবি প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিতেছেন—

"জর্মান Faust অল্প অল্প করে পড়তে চেষ্টা করচি। তুমি থাকলে তোমাকে আমার সহপাঠী করা যেত। এরকম পড়া দুজনে মিলে লাগলেই তবে এগোয়। পড়ার মাঝে মাঝে মৌলবীর বক্তৃতা

---

৩২ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১৩৮ (শিলাইদহ ১৬ ফাল্গুন ১৮৯৫)। Edward Dowden রচিত *Life of Shelley* প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে।

৩৩ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১০। (পতিসর, ২২ মার্চ ১৮৯৪)। দ্র° বলেন্দ্রনাথের 'পশুপ্রীতি' প্রবন্ধ।

৩৪ চিঠিপত্র ৫, পৃ. ১৫১ (১৭ মাঘ ১৮৯১)।

তু° "আর একটু বড় হলে আমরা গুরুজনদের সঙ্গে সাধারণভাবে অনেকগুলি ইংরেজ লেখকের বই সমানে পড়ে উপভোগ করেছি। Marie Bashkirtscheff-এর জার্নাল আর এমিয়েলের জার্নাল বোধ হয় তার মধ্যে ছিল"—ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী: রবীন্দ্রস্মৃতি, পৃ.৪৫। দ্র° "Bushkirtscheff Marie (1860-84), a Russian diarist, whose 'Journal', written in French and published posthumously in 1887, attained a great vogue by its morbid introspection and literary quality, and was translated into several languages (Eng. translation, 1890, by Mathilde Blind)."—*The Oxford Companion to English Literature*, 3rd Edn., 1946, p. 67.

নায়েবের কৈফিয়ৎ প্রজাদের দরখাস্ত এসে পড়লে জর্মান ভাষা বুঝে ওঠা কিরকম ব্যাপার হয় তা তুমি সহজে অনুমান করতে পারবে।· ·"[৩৫]

'ছিন্নপত্রে'র অন্তর্ভুক্ত আর-একটি পত্রেও ইহার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে—

"Goetheর একটি কথা আমি মনে করে রেখেছি, সেটা শুনতে সাদাসিধা কিন্তু বড়োই গভীর—

Entbehren sollst du, sollst entbehren

Thou must do without, must do without.

কেবল হৃদয়ের অতিভোগ নয়, বাইরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিসপত্রও আমাদের অসাড় করে দেয়। বাইরের সমস্ত যখন বিরল তখনি নিজেকে ভালোরকমে পাই।"[৩৬]

১৯২৪ খৃস্টাব্দে প্রদত্ত *The Religion of an Artist* শীর্ষক সুপ্রসিদ্ধ ভাষণে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জর্মান ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন—

"I myself have tried to get at the wealth of beauty in the literature of the European languages, long before I gained a full right to their hospitality. When I was young I tried to approach Dante, unfortunately through an English translation. I failed utterly, and felt it may pious duty to desist. Dante remained a closed book to me.

"I also wanted to know German literature and, by reading Heine in translation, I thought I had caught a glimpse of the beauty there. Fortunately I met a missionary lady from Germany and asked her help. I worked hard for some months, but being rather quick-witted, which is not a good quality, I was not persevering. I had the dangerous facility which helps one to guess the meaning too easily. My teacher thought I had almost mastered the language which was not true. I succeeded, however, in getting through Heine, like a man walking in sleep crossing unknown paths with ease, and I found immense pleasure.

"Then I tried Goethe. But that was too ambitious. With the help of the little German I had learnt, I did go through *Faust*. I believe I found my entrance to the place, not like one who has keys for all the doors, but as a casual visitor who is tolerated in some general guest-room, comfortable but not intimate. Properly speaking, I do not know my Goethe, and in the same way many other great luminaries are dusky to me."

ইহারই সঙ্গে ফরাসি ভাষা শিক্ষার জন্যও কবি তৎপর হইয়াছিলেন। তাহার সাক্ষ্য জগদীশচন্দ্রের নিকট লিখিত একখানি পত্রের মধ্যে আমরা পাই। পত্রখানি 'ছিন্নপত্র'-পর্বের কয়েক বৎসরের ব্যবধানে রচিত—

---

৩৫ চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

৩৬ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১৫০ (কুষ্টিয়া, ৫ অক্টোবর ১৮৯৫)

"চুপচাপ বসে একখানা ফরাসী ব্যাকরণ নিয়ে ওল্‌টাচ্ছিলুম এমন সময় চিঠিখানি পেয়ে মৃতভেকের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের সঞ্চার হয়ে খুব ধড়ফড় ক'রে উঠেছি।"[৩৭]

অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সুবিদিত; সুতরাং তাঁহাদের সাহচর্য ও প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও য়ুরোপীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বাহন স্বরূপ এই উন্নত ভাষাটির চর্চার প্রতি আগ্রহান্বিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি ঐ বিষয়ে কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিলেন তাহা সঠিক বলা কঠিন। কেননা, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট লিখিত একাধিক পত্রে কবি ফরাসি ভাষায় আপনার দক্ষতার অভাব লইয়া অভিযোগ করিতেছেন, দেখা যায়। কয়েকটি পত্রাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"তোমাকে একখানি ফরাসী বই পাঠাচ্চি। এখানি একজন ইংরেজ অধ্যাপক খুব প্রশংসা করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন— বলেছিলেন এ বই আমার পড়া উচিত। কিন্তু এই কর্তব্যটি পালন করা কেন আমার পক্ষে কঠিন সে কথা তোমার কাছে গোপন নেই।· · বেলজিয়মে যে নূতন ইস্কুল হয়েছে তার খবর সবুজপত্র থেকে দাবী করচি। তুমি সম্প্রাত নানা লেখা, কিম্বা সম্ভবত না-লেখা, নিয়ে ব্যস্ত আছ— অতএব আমার পরামর্শ, বিবিকে এই কাজের ভার দেও। মস্ত আশার কথা, জ্যোতিদাদা ওখানে আছেন। তিনি এটা পেলে হয়ত ফস্‌ করে এটাকে গৌড়ীয় ভাষায় ঢালাই করে নিতে পারেন। যাই হোক তোমাদের যে রকম মর্‌জি তাই কোরো কিন্তু আমার এটাতে গরজ আছে। এর শেষ পরিচ্ছেদ, যার বিষয়টা হচ্চে "Éducation Morale, Sociale et Artistique"— ঐটেই আমার সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয়। তর্জমা নয়, কিন্তু এর ভাবার্থটা কি পাওয়া যাবেনা?"[৩৮]

অপিচ—

"ফরাসী চিঠিগুলো আমাকে তর্জমা করে পাঠাতে পারবে কি জবাব দিতে হবে। দেরি কোরো না।..."[৩৯]

কবির আগ্রহেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ফরাসি সাহিত্য অধ্যাপনার সূচনা হয়; এবং বেনোয়া (Benoit) নামক একজন ফরাসি অধ্যাপকের উপর অধ্যাপনার ভার অর্পিত হয়— ইহা আমরা জানি।[৪০]

ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' হইতে কয়েকটি পংক্তি ফরাসি সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম অনুরাগের সাক্ষ্যস্বরূপ উদ্ধারযোগ্য—

"বস্তুত তাঁর সাহচর্য ও সান্নিধ্যের ফলে আমরা বাড়িতে সর্বদাই একটি সাহিত্যের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি। সুরেনের এক জন্মদিনে তিনি হার্বার্ট স্পেনসারের সমগ্র রচনাবলী তাকে উপহার দিয়েছিলেন। আমি লরেটো ইস্কুলে ফরাসী শিখতুম বলে একবার আমার জন্মদিনে ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি টেবিলের উপর তখনকার দিনের বিখ্যাত ফরাসী কবি কপ্পে, মেরিমে, ল্যা কঁংদ্‌লীল্‌, লা ফঁতেন প্রভৃতির

---

৩৭ চিঠিপত্র ৬, পত্র ৪ (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০০। শিলাইদহ)।

৩৮ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৫৯ (শান্তি° বোলপুর, ২৩ অক্টোবর, ১৯১৭). পৃ. ২২৪-২২৬।

৩৯ চিঠিপত্র ৫ পত্র° ৮৩[ক]—তারিখ নাই। অপিচ তু° "সেই মোটা ফ্রেঞ্চ বই আমার পূর্বগামীরূপে বোলপুরে রওনা হয়ে গেছে। ইতি ভাদ্র তারিখ জানি নে, ১৩৩৫।"—ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর নিকট লিখিত কবির পত্রাংশ। দ্র° চিঠিপত্র ৫।

৪০ দ্র° চিঠিপত্র ৫।

রচনাবলী সুন্দর করে বাঁধিয়ে সোনার জলে তাদের নাম ও আমার নাম লিখিয়ে সাজিয়ে রেখেছিলেন। দেখে যে কত আনন্দ হয়েছিল বলা যায় না। এখনো সেই বইগুলি শান্তিনিকেতনের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শোভাবর্ধন করছে।"

রবীন্দ্রনাথের জর্মান ও ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন হয়তো ততখানি গভীর ছিল না; কিন্তু এক দিক দিয়া তাঁহার এই উদ্যম যে ব্যর্থ হয় নাই তাহা কিছুটা বুঝিতে পারি বাংলা ভাষাতত্ত্ব লইয়া তাঁহার রচিত অগণিত প্রবন্ধের ভিতর দিয়া। বিভিন্ন ভাষার গঠন ও প্রকৃতি, ধ্বনি-তত্ত্ব, প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের যে ক্লেশ তিনি যৌবনকালে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইয়াছিল বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতি লইয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনার কালে।

৮

রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট এক চিঠিতে লিখিতেছেন—

"· ·আমার বিষয়ভোগের বয়স গেছে, যখন ছিল তখনও ভোগ করি নি। এখনও আমিরী সখ আমার একটিও নেই। সুন্দর জায়গায় নদীর ধারে পাহাড়ের গায়ে বনচ্ছায়াতলে একটি অতি মনোহর কুটীর বানিয়ে একটি আরামকেদারা এবং তিন আলমারি বই নিয়ে নিভৃতে জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেব এই রকমের একটা সখ অনেকদিন থেকে মনের মধ্যে সময়ে অসময়ে গুঞ্জন করে বেড়ায় বটে কিন্তু বুঝে নিয়েছি সে আমার কপালে নেই। টাকার যা সংগতি হয়েছিল তাতে কিছুই অসম্ভব ছিল না, কিন্তু আমার প্রকৃতির মধ্যে আরেক ব্যক্তি আছেন বসে, যাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে বল্‌তে হয় Thy need is greater than mine.· ·"[৪১]

রবীন্দ্রপ্রতিভার মধ্যে একই আধারে কত বিচিত্র উপাদানের যে সমাবেশ হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয় তিনি কবি। তবুও কবিত্বশক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, শুধু পাণ্ডিত্যের কথা ধরিলেই আধুনিক কালে তাঁহার ন্যায় বহুজ্ঞ বা ব্যুৎপন্ন পুরুষ আমাদের দেশে অল্পই জন্মিয়াছেন। এই নিছক মনীষা বা পাণ্ডিত্যের প্রভা তাঁহার কবিশক্তির ভাস্বর জ্যোতিশ্ছটায় ঢাকা পড়িয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের হৃদয়ের মধ্যে বিশুদ্ধ মননশীলতা বা জ্ঞানার্জন-স্পৃহার প্রতি যে আজন্ম সহজাত আকর্ষণ ছিল, এবং সাহিত্যসৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে যে তিনি সেই জ্ঞানযোগীর নির্লিপ্ত উদাসীন মূর্তির দিকে সস্পৃহ লুব্ধ নেত্রে তাকাইতেন—আপনার জ্যেষ্ঠ অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে যাহার আভাস প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পত্রধারার নানাস্থানে ব্যক্ত হইয়াছে। যাহা হইতে পারিত, অথচ হয় নাই—তাদের জন্য কবির অনুশোচনা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থখানিকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথের মনীষা ও নিরলস জ্ঞানসাধনার যে পরিচয় উদ্‌ঘাটন করিবার আমরা চেষ্টা করিয়াছি, তাহা কবিমানসের ভবিষ্যৎ বিবর্তনের ইতিহাসের যথাযথ আলোচনার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। গ্রন্থকীট পণ্ডিত অনেকেই আছেন। কিন্তু এমন জ্ঞানযোগী দুর্লভ যাঁহার প্রতিভার জারকরস-

---

৪১ চিঠিপত্র ৫, পত্র° ৬২। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও মনে মনে অনুরূপ আক্ষেপ বহন করিতেন। তু°—"বিদ্যাসাগরের অনেক গুণ। প্রথম বিদ্যানুরাগ। একদিন মাষ্টারের কাছে এই বল্‌তে বল্‌তে সত্য সত্য কেঁদেছিলেন, 'আমার তো খুব ইচ্ছা ছিল যে পড়াশুনা করি, কিন্তু কৈ তা হ'লো! সংসারে পড়ে কিছুই সময় পেলাম না'।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ।

স্পর্শে তথ্য ভারাক্রান্ত শুষ্ক পাণ্ডিত্য রসস্নিগ্ধ শিল্পাকারে পরিণত হইয়া উঠে। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে কবি এক পত্রে লিখিতেছেন—

"চিত্তরঞ্জনের কাছে শুনলুম তুমি রীতিমত 'Varsity man হয়ে গেছ। ভার্সিটি ম্যানের কি কি লক্ষণ জানি নে কিন্তু শব্দটা শুনলেই আমাদের মত বিশ্ববিদ্যালয়বিমুখ লোকের মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়।"[৪২]

পাণ্ডিত্যের যে সাধারণ লক্ষণ আমরা সচরাচর লক্ষ্য করিয়া থাকি তাহার মধ্যে অখণ্ড বস্তুকে বিশ্লেষণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখার প্রবণতাই প্রাধান্য অর্জন করিয়াছে দেখা যায়। এই শুষ্ক তার্কিকতা বা scholasticism, যাহা বস্তুর সমগ্র রূপটির যথাযথ উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক না হইয়া বাধক হইয়া দাঁড়ায়, রবীন্দ্রনাথের মনে চিরকালই সে সম্বন্ধে একটা বিভীষিকা ছিল। 'জাভাযাত্রীর পত্রে' কবি এক জায়গায় লিখিতেছেন—

"আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ, আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজে তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্ব-ব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ।"[৪৩]

কবি শিলাইদহ-বাসের নিভৃত দিনগুলিতে যে বিচিত্র বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অখণ্ড দৃষ্টি তো আচ্ছন্ন হয়ই নাই, পরন্তু মানসলোক বিচিত্র ঐশ্বর্যসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল। এই তপস্যালব্ধ জ্ঞানসম্ভার তাঁহার মনের কোন্ অবচেতন গুহায় যে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিত, এবং কখন যে কোন্ অবসরে কোন্ অজ্ঞাত কারণে চেতনার স্তরে উন্মগ্ন হইয়া বিচিত্র বাণীর আকারে জন্মলাভ করিত, তাহা কবির নিকটও এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যই ছিল। তাই দেখি, এক জায়গায় কবি বলিতেছেন—

"ছেলেবেলা হতেই বিদ্যার পাকা বাসা থেকে বিধাতা আমাকে পথে বের করে দিয়েছেন। অকিঞ্চন বৈরাগির মত অন্তরের রাস্তায় একা চলতে চলতে মনের অন্ন যখন-তখন হঠাৎ পেয়েছি। আপন মনে কেবলই কথা বলে গেছি, সেই হল লক্ষ্মীছাড়ার চাল। বলতে বলতে এমন-কিছু শুনতে পাওয়া যায় যা পূর্বে শুনি নি। বলার স্রোতে যখন জোয়ার আসে তখন কোন্ গুহার ভিতরকার অজানা সামগ্রী ভেসে ভেসে ঘাটে এসে লাগে। মনে হয় না, তাতে আমার বাঁধা বরাদ্দের জোর আছে। সেই আচমকা পাওয়ার বিস্ময়ই তাকে উজ্জ্বল করে তোলে, উল্কা যেমন হঠাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে আগুন হয়ে ওঠে।· ·

"যাই হোক, মাস্টারের হাতে বেশি দিন ছিলেম না বলে আমি যা-কিছু শিখেছি সে কেবল বলতে বলতে। বাইরে থেকেও কথা শুনেছি, বই পড়েছি; সে কোনো দিনই সঞ্চয় করবার মতো শোনা নয়, মুখস্থ করবার মতো পড়া নয়। কিছু-একটা বিশেষ করে শেখবার জন্যে আমার মনের ধারার মধ্যে কোথাও বাঁধ

---

৪২ চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৪। [পত্র ১৪ কলকাতা, ১৬ জুন ১৮৯৪]।

৪৩ 'জাভাযাত্রীর পত্র. ৪': যাত্রী পৃ. ২০২।

বাঁধিনি। তাই সেই ধারার মধ্যে যা এসে পড়ে তা কেবলই চলাচল করে, ঠাঁই বদল করতে করতে বিচিত্র আকারে তারা মেলেমেশে। এই মনোধারার মধ্যে রচনার ঘূর্ণি যখন জাগে তখন কোথা হতে কোন্ সব ভাসা কথা কোন্ প্রসঙ্গ মূর্তি ধরে এসে পড়ে তা কি আমি জানি।"[৪৪]

শিলাইদহ-যুগে কবির এই অতন্দ্র জ্ঞানসাধনা যেমন তাঁহার মননশীলতাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে নিছক ভাবালুতার কবল হইতে রক্ষা করিয়া রস ও ভাবের (idea and emotion) অপূর্ব সমন্বয় সঞ্জাত এক বিচিত্র দিব্য সৌরভ সঞ্চার করিয়া তাহাকে চিরকালীন সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিল। আমাদের দেশের প্রচলিত সাহিত্যানুশীলনের ক্ষেত্রে— লেখক ও পাঠক, স্রষ্টা ও রসয়িতা, এই উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেই মননশীলতার প্রতি গভীর অনাসক্তি ও বৈমুখ্য কবিকে চিরকালই অত্যন্ত পীড়িত করিত। তাই দেখিতে পাই, 'সবুজ পত্র'-পর্বে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিত এক পত্রে কবি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

"আমাদের দেশের পনেরো আনা লেখার মধ্যে মন জিনিষটা নেই— আমাদের পাঠকদের পাকযন্ত্র সেই জন্যে ওটা এখনও হজম করতে শেখে নি। উপদেশ এবং অশ্রু এবং উত্তেজনা যতই জোগাবে তার অফুরান কাট্তি। কিন্তু মন জিনিসটা বড় বালাই। ওটাকে গালের মধ্যে দিলেই অমনি গলে না। ওটার সঙ্গে কারবার করতে হলে যে পরিণতির দরকার, যে কারণেই হোক, আমাদের দেশে সেটা দুর্লভ হয়েচে। আমরা মননের আবহাওয়ার মধ্যে জন্মাই নি— যে দেশে সকল ভাবনা ভাবিত এবং সকল কর্ম কৃত হয়ে চিরদিনের জন্যে খতম হয়ে গেছে সেই 'আমার জন্মভূমি'তে আমরা মানুষ। তার পরে আবার আমাদের বিদ্যাশিক্ষাও মূল বই থেকে নয়, নোটবই থেকে। এই রকম করে আরেক জনের মন যেটা চিবিয়ে আমাদের জন্যে অর্ধেক হজম করে দেয় সেই খাদ্যেই আমাদের মনের বাড়বার বয়স কাটল। এমন সময়ে হঠাৎ আমাদের ভাবতে বল্লে আমাদের রাগ হয়— এবং ভেবে যেটা দাঁড়ায় সেটা অজীর্ণতা। তুমি কিছুকাল যদি ইব্‌সেন মেটারলিঙ্ক ডস্টেভ্‌স্কি বার্নার্ড শ কোট্ করে এবং ব্যাখ্যা করেই স্কুলমাস্টারি করতে পার তাহলে তার মূল্য যতই তুচ্ছ হোক্ তার কাট্তি এবং খ্যাতি হবে প্রচুর। কিন্তু তোমার দোষ হচ্ছে তুমি নিজে ভাব সুতরাং তুমি ভাবনা দাবী কর— এতবড় দুরাশা আমাদের দেশে চলবে না। অক্ষয় মজুমদার বলতেন 'অভিনয় করবার সময় দর্শকদের মনে করতুম বাঁদর, তাতেই অভিনয় করা সহজ হত।' কিন্তু অভিনয়ের বেলা যেটা খাটে সাহিত্যের বেলা সেটা খাটে না। সাহিত্যের বেলা মনে রাখতেই হবে যাদের জন্যে লিখচি তারা সকলেই মানুষ, তাদের সকলেরই মন আছে। আমাদের পাঠকদের মধ্যে সেই মনের যাচাইটা খাটি এবং কড়া নয় বলেই কতই যে বাজে লেখা লিখেচি তার ঠিকানাই নেই। বাহির থেকে আদায় করে নেবার লোকটি না থাকলে ভিতরের দান করবার শক্তিতে বিকার ঘটে। কিন্তু এসমস্ত মেনেও কোমর বেঁধে চলতে হবে এবং জানতে হবে, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"[৪৫]

রবীন্দ্রনাথের রচনায় কবিত্বের সহিত মনীষার এমনই মণিকাঞ্চন-যোগ ঘটিয়াছিল যে, ইহার ফলে একদিকে তাঁহার কাব্য-উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্য কর্ম যেমন ক্ষণজীবী সাময়িক সাহিত্যের স্তর হইতে উন্নীত হইয়া চিরকালের বিদগ্ধ সমাজের উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে, অপর দিকে তাঁহার বিশুদ্ধ মননাত্মক রচনারাজিও— যেমন,

৪৪ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি : যাত্রী, পৃ. ১১০-১১১.

৪৫ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৬৭ (ফাল্গুন ১৩২৪)।

'শান্তিনিকেতন' ভাষণাবলী, 'মানুষের ধর্ম', বাংলা ছন্দ ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনা সংক্রান্ত অসংখ্য নিবন্ধ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী ইত্যাদি— তেমনই প্রসাদগুণাঢ্য হইয়া উঠিয়াছে; পড়িতে পড়িতে মনেই হয় না যে, কী গভীর পাণ্ডিত্য ও মনীষা উহার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিত একখানি পত্রে তাঁহার তরুণ বয়সের এই অনলস ও বহুধাবিসারী বিচিত্র সাহিত্যসাধনার কথা জানাইয়া বলিতেছেন—

"এইবার নতুন লেখকদের খুব কষে নাড়া দাও। আমরা যে এতদিন সাহিত্যের দরবার করে এসেচি সে তো নেহাৎ সৌখীন চালে করিনি। যখন তম্বুরা ধরবার হুকুম পেয়েছি তখন ভৈরোঁ থেকে শুরু করে মালকোষে এসে শেষ করেচি। আবার যখন ঢাল সড়কির পালা তখন নিজের বা অন্যের মাথার পরে দরদ রাখি নি। গালমন্দর তুফান বেয়ে পাড়ি লাগিয়েচি, হাল ছাড়ি নি। দিন রাত যে মাথার পরে কোথা দিয়ে গেচে খবর রাখিনি। যাঁরা নবীন সাহিত্যিক তাঁরা এ কথা মনে রাখবেন। সাহিত্যের পেয়ালা একেবারে চুমুক মেরে উজাড় করতে হয়, এতে বাইরে থেকে ঠোকর মেরে কোনো ফল হয় না। যাঁরা লাগবেন তাঁদের পুরোপুরি লাগতে হবে।"[৪৬]

কবির এই আত্মঘোষণা যে কত সত্য, তাঁহার সুবিশাল সাহিত্যই তাহার প্রমাণ। কিন্তু সেই সাহিত্য-সৃষ্টির অন্তরালে কবির যে বিরামহীন প্রস্তুতির ইতিহাস লুক্কায়িত রহিয়াছে, 'ছিন্নপত্রে'র খণ্ডিত পত্রাবলী সেই ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিবার পক্ষে পরম সহায়, ইহা প্রত্যেক সহৃদয় পাঠকই স্বীকার করিবেন।

---

৪৬ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৫২ (শান্তিনিকেতন ১৩ এপ্রিল, ১৯১৭)।

রবীন্দ্রনাটকের নায়ক

শ্রীভবতোষ দত্ত

'রাজা ও রানী'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সেই তাঁর প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা[১]। অথচ 'রাজা ও রানী'র আগে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' বা 'মায়ার খেলা' বাদ দিলেও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকখানি রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা বলে সুপরিচিত। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ এ কথা স্পষ্ট করে স্বীকার করেছিলেন।[২]

"এই প্রকৃতির পরিশোধেও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্য রকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা।· ·তত্ত্বহিসাবে সে ব্যাখ্যার কোনো মূল্য আছে কি না, এবং কাব্যহিসাবে প্রকৃতির প্রতিশোধের স্থান কি তাহা জানি না, কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটি মাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানাবেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।"

অন্য কাব্যের প্রসঙ্গে যাই হোক প্রকৃতির প্রতিশোধের ভাবটি যে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মর্মেও নিহিত আছে, তাও একটু পরীক্ষা করলে বোঝা যায়। ইংরেজি রোমান্টিক ট্র্যাজেডির আদর্শে পরিকল্পিত 'রাজা ও রানী' নাটকটিকে তাঁর প্রথম নাটক মনে করলেও প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে এর ভাবগত মিলটিকেও তিনি দেখিয়েছিলেন এইভাবে[৩]—

"প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে রাজা ও রানীর এক জায়গায় মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে।"

অর্থাৎ সত্যকে এরা কেউ সীমা ও অসীমের পূর্ণ মিলনের মধ্য দিয়ে পায় নি। সন্ন্যাসী সীমাকে অবজ্ঞা করে অসীমকে পেতে গিয়েছিল। এও যেমন অন্ধতা তেমনি বিক্রমও বিশ্বকল্যাণ থেকে বিযুক্ত করে আসক্তিতে বদ্ধ হয়েছিল সেও তেমনি অন্ধতা। দুয়ের মধ্যেই আছে সত্যের অবমাননা। সত্যকে কোনো সংকীর্ণ স্বার্থে, কোনো সাম্প্রদায়িক চেতনায় কিংবা বিশ্বহিতবিরোধী কোনো খণ্ডিত উপলব্ধিতে পাওয়া যায় না। তাকে পাওয়া যায় জীবনের সামগ্রিক উপলব্ধিতে। সত্য যেমন জীবনের বাইরে নেই, সত্য তেমনি নেই জীবনের খণ্ড আকাঙ্ক্ষায়, যে আকাঙ্ক্ষা বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে চলতে পারে না। লক্ষ করলে দেখা যায় শুধু রাজা ও রানীতে নয়, বিসর্জনের রঘুপতির মধ্যে, মালিনীর ক্ষেমংকরের মধ্যে, অচলায়তনের মহাপঞ্চকের মধ্যে, মুক্তধারার বিভূতির মধ্যে, রক্তকরবীর রাজার মধ্যে একই তত্ত্ব নানা আকারে দেখা দিয়েছে। এরা সবাই আপন আকাঙ্ক্ষায় অন্ধ, বিশ্বের দিকে

১ দ্র° তপতী

২ জীবনস্মৃতি, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'

৩ রবীন্দ্ররচনাবলী ১ : 'রাজা ও রানী'র ভূমিকা

তাকায় নি। তাই একদিন এদের মোহভঙ্গ হয়েছে— সত্যের আলোয় এরা জন্মান্তর লাভ করেছে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' পুরোপুরি নাটক নয়। একে নাট্যকাব্যই বলা উচিত। এতে দ্বন্দ্ব নেই। সন্ন্যাসীর সামান্য অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে সত্যবোধ ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত হয়েছে। সেইজন্য নাটকখানি কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। ভাব বা তত্ত্ব যা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে, সেটাই এখানে মুখ্যত বিচার্য। সেই তত্ত্বটিকে আলাদা করে সূত্র হিসাবে রবীন্দ্রনাথই দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। এই সূত্রটি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনারও মূল বক্তব্য। এইজন্য এ কথা বলা চলে যে চরিত্র এবং পরিবেশ-সৃষ্টির বাস্তবনিষ্ঠার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে ভাবনিষ্ঠাই বড় হয়ে উঠেছে। চরিত্রগুলির দৈহিক সংস্কার তাদের চালিত করে নি। নাট্যকারের তত্ত্ব প্রতিপন্ন করতে গিয়ে তারা তত্ত্বের প্রয়োজনে চালিত হয়েছে। সত্য ও অসত্যের সংঘর্ষ দেখাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে দুই বিরোধী নায়কের সৃষ্টি করেন মূলত তাদের মধ্যেই তাঁর বক্তব্য সংহত। পাশ্চাত্ত্য নাটকে যেমন শুধু চরিত্র নয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থারও একটা শক্তিশালী ভূমিকা থাকে, রবীন্দ্রনাটকে তা নেই। অবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বের অনুকূলেই সাজিয়ে তোলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধে প্রধান চরিত্র দুটি নেই কিন্তু পরবর্তী অনেক নাটকেই আছে। 'রাজা ও রানী'তে বিক্রমদেব ও সুমিত্রা, বিসর্জনে গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতি, মালিনীতে মালিনী ও ক্ষেমংকর, প্রায়শ্চিত্তে প্রতাপাদিত্য ও ধনঞ্জয় বৈরাগী, অচলায়তনে পঞ্চক ও মহাপঞ্চক, মুক্তধারার বিভূতি ও অভিজিৎ, রক্তকরবীতে রাজা ও নন্দিনী। লক্ষ করলে দেখা যাবে এই দ্বৈত নায়কদের মধ্যে একজন কবির সত্যবোধের প্রতীক, অন্যজন তার শক্তিশালী বিরোধী। দুয়ের দ্বন্দ্বে সৃষ্টি হয়েছে নাটকের গতিবেগ। রবীন্দ্রনাট্যের পরিকল্পনা এই যে, সত্যের বিরোধিতা করেছে যে তারই পরাজয় ঘটে অবশেষে। অবশ্য 'পরাজয়' অর্থ তার ভিতরে যে মিথ্যাবোধটুকু ছিল সেটারই বিনাশ; আর বেঁচে ওঠে তার মধ্যেকার সুপ্ত সত্যবোধ। দৈহিক মৃত্যু কখনোই তাদের হয় না, কারণ মৃত্যু হলে অপরাজিত সত্য প্রকাশ পাবে কি ভাবে?

অথচ নাটকে যে মৃত্যু নেই তা নয়। কিন্তু মৃত্যু ঘটে এক নিষ্পাপ চরিত্রের। সত্য ও অসত্যের সংঘর্ষে অসত্যের হিংস্রতা যতই প্রকাশ পেতে থাকে ততই মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। অবশেষে এই বলি দিয়েই অসত্যের নগ্ন ও চরম রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। তার পরেই ঘটে নাটকের দিক-পরিবর্তন।[৪]

এই তত্ত্ব-রূপায়নে রবীন্দ্রনাট্যের এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে— দ্বৈনায়কত্ব। শেক্সপীয়রীয় নাটকে নায়ক একজনই। নাটকীয় গতিবেগের সৃষ্টি হয় যেমন অন্তর্দ্বন্দ্বে, তেমনি বহির্দ্বন্দ্বে। বহির্দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে ওঠে অবস্থার সঙ্গে নায়ক-চরিত্রের মধ্যে। মৃত্যু আসে নায়কেরই। রবীন্দ্রনাটকে অবস্থার গুরুত্ব নেই। তার পরিবর্তে আছে সত্য ও অসত্যের গুরুত্ব, তাই নাটকে দুই প্রধান চরিত্রের প্রয়োজন, কিন্তু প্রশ্ন এই, নায়ক বলব কাকে?

---

৪ জীবনকৃষ্ণ শেঠ, রবীন্দ্র-নাটক-প্রসঙ্গ ১৩৬৩, 'রবীন্দ্র-ট্র্যাজেডির স্বরূপ-লক্ষণ' এবং 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিশ্ববিধানের স্বরূপ' অধ্যায় দুটি দ্রষ্টব্য।

২

'রাজা রানী'কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন নাটক-রচনার প্রথম প্রয়াস। এই উক্তির সার্থকতা কি? রবীন্দ্রনাথ যখন নাটক রচনা করতে আরম্ভ করলেন তার কিছুদিন আগে থেকেই আমাদের দেশে ইংরেজি পঞ্চাঙ্ক নাটকের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন[৫]—

"শেক্সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।"

আমাদের আধুনিক নাটক রচনার প্রথম যুগে সংস্কৃত নাট্যরীতি ও ইংরেজি নাট্যরীতির মধ্যে কিছুকাল দোলাচলতা চলেছিল। মধুসূদনই ইংরেজি নাটক রচনার আদর্শকে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করলেন, তার পর দীনবন্ধু গিরিশচন্দ্র সেই আদর্শকেই অনুসরণ করে এসেছেন। এই নাট্যরীতির উদ্‌ভব হয়েছিল পাশ্চাত্ত্য নাট্যসাহিত্যেরই বিবর্তনের ধারায়। গ্রীক ও রোমান নাট্যকলার সূত্র ধরে এই বিশিষ্ট রীতি স্বাভাবিক ভাবেই সে দেশে দেখা দিয়েছিল। এইজন্য দেখা যায় অ্যারিসটট্‌ল নাটকের যে সূত্র নির্মাণ করেছিলেন, সেই সূত্রটিকে মূলত রক্ষা করে তারই সম্প্রসারণ অথবা সঙ্কোচন করে পরবর্তী নাট্যকলার আদর্শ নির্ধারিত হয়েছে। এই নাট্যরীতির বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল নায়ক-কল্পনা। অ্যারিসটট্‌ল দেখিয়ে গিয়েছিলেন ট্র্যাজেডির নায়ক হবে একজন অসাধারণ ব্যক্তি (highly renowned and prosperous)। কিন্তু অসাধারণ বলে সে আদর্শচরিত্রের ব্যক্তি হবে, তা নয়, বরং সে হবে দোষে গুণে আমাদেরই মত মানুষ। তার দুর্ভাগ্য তার কোনো পাপের জন্য নয়। তার দুর্ভাগ্য আসে কোনো ভ্রান্তি বা দুর্বলতার জন্য। মোটামুটি এই পরিকল্পনা শেক্সপীয়রেরও ছিল। তাঁর নায়কেরাও অসাধারণ ব্যক্তি। কিন্তু তারাও আমাদের মতই মানুষ।[৬] কিন্তু এই মানুষই স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে আবেগের অন্ধতায়— লক্ষ্য বস্তুর তীব্র আকাঙ্ক্ষায়। ব্র্যাডলি বলেন, চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য ভয়ংকর, কিন্তু এর সঙ্গে একটি মহত্ত্বের স্পর্শও আছে। বিশেষ করে এর সঙ্গে যখন যুক্ত হয়, হৃদয়ের ঔদার্য, প্রতিভা কিংবা অপরিমেয় শক্তি, তখনই যেন আমরা আত্মার সুপ্ত সম্ভাবনাটি টের পাই, আর যে দ্বন্দ্বে সে লিপ্ত হয়, তারই মধ্যে থাকে এমন একটি বিশালতা যা শুধু করুণা ও সহানুভূতিই জাগায় না, তারই সঙ্গে জাগায় বিস্ময় মুগ্ধতা এবং ভীতি। এমনই একটি চরিত্র অবস্থা বিপর্যয়ে যখন ভুল করে বসে তখনই আসে ধ্বংস। এই ধ্বংস শুধু অসতের নয়, সৎ প্রবৃত্তিরও। তাই ট্র্যাজেডিতে অপচয়ের বেদনা জাগে।

শেক্সপীয়রের নাটক একটি বিশিষ্ট রীতিতে এই নায়ক-চরিত্রের পরিণামকে ফুটিয়ে তুলেছে। সেকালের বাঙালি পাঠক নাটকের এই চরিত্র-ভাগ্য দেখে জীবনের এমন-একটি রস আস্বাদন করেছে যা আমাদের সাহিত্যে এর আগে পায় নি। শেক্সপীয়রের নাটক চরিত্র-কেন্দ্রিক অর্থাৎ একটি নায়ক-চরিত্রের পরিণামই এতে দর্শনীয়। শেক্সপীয়রের নাটকের নামকরণ থেকেই বুঝতে পারা যায়,

৫ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪ : 'মালিনী'র ভূমিকা

৬ "His tragic characters are made of the staff we find within ourselves and within the persons who surround them".—A. C. Bradley. *The Shakespearean Tragedy,* The Substance of Tragedy.

একটি কেন্দ্রীয় প্রধান চরিত্রের ভাগ্যবিবর্তন দেখানোই নাট্যকারের লক্ষ্য। কিন্তু এই ভাগ্যকে সে যে শুধু নিজেই বহন করে আনে তা নয়, প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় লীলায় জড়িত হয়ে তাকে দুর্ভাগ্যের দণ্ড স্বীকার করতে হয়। তাই নায়ককে মূলত দেখানোই নাট্যকারের উদ্দেশ্য হলেও প্রকৃতির ভূমিকা এতে কম জটিল নয়। এ জন্যেই নায়ক এখানে কোনো কবিকল্পিত তত্ত্বের বাহক নয়, তার দেহ-মন প্রকৃতির প্ররোচনাতেই দ্বন্দ্বলিপ্ত। তার মৃত্যু এই দ্বন্দ্বেরই পরিণাম।

জীবনমুগ্ধতার এই লক্ষণ রবীন্দ্রনাথের এইসময়ের কবিতায় ছড়িয়ে আছে। রুদ্র অশান্ত প্রকৃতি এককথায় নৈতিক-তত্ত্বমুক্ত অনাবৃত এক জীবন কবির চোখের সামনে আদিম বিস্ময় ও রহস্যবোধ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। এই প্রকৃতির এক নিষ্ঠুর ভীষণ শক্তি nature in the tooth and claw কবিচিত্তকে বারবার অভিভূত করেছে। তার পরিচয় আছে রবীন্দ্রনাথের অনেক বিখ্যাত কবিতায় 'সিন্ধুতরঙ্গ' 'ঝুলন' 'বসুন্ধরা' 'যেতে নাহি দিব' প্রভৃতিতে। একটা আরণ্য আদিম শক্তি মানুষের সমস্ত নৈতিক বুদ্ধিকে স্তম্ভিত করে বিরাজিত। কবি যেন তারই সন্ধান পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আত্মহারা হয়ে বলেছিলেন।[৭]

যত অন্ত নাহি পাই, তত জাগে মনে
মহা রূপরাশি—
তত বেড়ে যায় প্রেম যত পাই ব্যথা,
যত কাঁদি হাসি।
যত তুই দূরে যাস
তত প্রাণে লাগে ফাঁস,
যত তোরে নাহি বুঝি
তত ভালোবাসি।

কিন্তু এক আশ্চর্য দ্বিধার লক্ষণও আছে রবীন্দ্রনাথের সময়ের কাব্যে। প্রকৃতিনিষ্ঠা যেমন তাঁর প্রবল, প্রকৃতিকে অতিক্রম করে কোনো তত্ত্বের মধ্যে নিশ্বাস ফেলে নিঃসংশয়িত হবার আকাঙ্ক্ষাও অপ্রবল নয়। তাঁর অনেক কবিতাই যে শেষাংশে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠে তার কারণ প্রথমাংশের রুদ্রতার শান্তরসে অবসাদ। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা কিঞ্চিৎ অবান্তর হয়ে পড়বে বলে বক্তব্য বিশদ করবার জন্য একটি দৃষ্টান্তই নেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটিতে প্রকৃতির অন্ধ মমতাময় রূপ আবার সেইসঙ্গে এক কঠোর রুদ্র শক্তির রূপও ফুটে উঠেছে। এই কবিতায় যেমন বিচ্ছেদের করুণতা আছে, তেমনি আছে এক মহানিয়তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করবার ভারমুক্তি। এই মুক্তিতে আনন্দ নেই সত্য কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের পরবর্তী যুগে এই আত্মনিবেদনই এক নিশ্চিন্ত আনন্দময়তায় রূপান্তরিত হয়েছে। জীবনের প্রত্যক্ষ আবেগের চেয়ে যেন একটা বৃহৎ তত্ত্বের উপলব্ধিই অধিকতর সত্য এবং সংগত বলে মনে হয়েছে। মানসী-চিত্রার যুগে রবীন্দ্রকবিমানসের বৈশিষ্ট্যই ছিল পাশ্চাত্ত্যরীতির প্রকৃতিপ্রেম। এ সময়ের গল্পরচনাতেও জীবনের সেই নৈসর্গিক রূপটাই

৭ মানসী, 'প্রকৃতির প্রতি' ১৮৮৮

ফুটে উঠেছে। আবার 'কাবুলিওয়ালা' 'পোস্টমাস্টার' গল্পেও বাস্তব-তীক্ষ্ণতাকে তত্ত্বের রসে অভিষিক্ত করবার লক্ষণও আছে।

এই দ্বিধার লক্ষণ রয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাটকেও। য়ুরোপের রেণাশাঁস-পরবর্তী সাহিত্যে এই জীবনমুগ্ধতা এবং প্রকৃতিচেতনা পাশ্চাত্যে যে অপূর্ব নাটক ও কাব্য সৃষ্টি করেছিল, রবীন্দ্র-কবিমানসকে তা একদিন প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাই তাঁর মধ্যে যেমন দেখি প্রকৃতিনিষ্ঠা তেমনি দেখি তারই সাহিত্যরীতির অনুসরণ। য়ুরোপের সেই নাট্যরীতিতে জীবনপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত নায়কের করুণ-মধুর ভাগ্যপরিবর্তন স্তরে স্তরে উন্মোচিত করে দেখানো হয়েছে। এই উন্মোচনের সূত্র অবলম্বনে গড়ে উঠেছে নাটকের পাঁচটি ভাগ। বাংলা সাহিত্যের নতুন নাটকরীতি এই পাঁচটি ভাগকেই যথাযথ রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিল। রবীন্দ্রনাথও এই আদর্শকে অনুসরণ করেছিলেন। সেইজন্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নিজস্ব অনুপ্রাণনায় লিখলেও পরবর্তী নাটক 'রাজা ও রানী'তে তিনি য়ুরোপীয় নাট্যাদর্শে প্রবর্তিত হয়েছেন।

কিন্তু য়ুরোপীয় জীবনপ্রকৃতি থেকেই যে নাট্যাদর্শের উদ্ভব তা তাদের জীবনে যত স্বাভাবিক ও সত্য, বাঙালির সাহিত্যে তা ততখানি স্বাভাবিক ও সত্য হল না।[৮] বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের নাটকেই এই দ্বন্দ্ব রয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মতই রবীন্দ্রনাথের নাটকেও প্রকৃতির জটিল বিস্তার যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি দেখানো হয়েছে প্রকৃতির বিক্ষোভের ঊর্ধ্বে শান্ত ধীর নির্বিকল্প এক সত্যের অবিচল মহিমা। তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছে দুই নায়কের— একজন সুমিত্রা-শ্রেণীর আর একজন বিক্রম-শ্রেণীর, একজন সত্যের প্রতীক আর-একজন মোহের প্রতীক। য়ুরোপীয় নাটকে প্রথমোক্ত শ্রেণীর নায়ক বিরল, দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর চরিত্রই শেক্সপীয়রীয় নাটকের নায়ক। এই একটি চরিত্রই প্রধান, আর সব চরিত্রের মধ্যে থেকেও অসাধারণ, গর্বোন্নত। তার অসাধারণত্ব কোনো চিরন্তন সত্যের আদর্শে লগ্ন থাকার জন্য নয়, তার দেহায়তনেই জীবনপ্রকৃতির উৎসবলীলার আয়োজন হয়েছে বলে। প্রবল প্রবৃত্তির আত্মঘাতী খেলায় মত্ত বলেই সে অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথের নাটকে এই শ্রেণীর এক শক্তিশালী চরিত্রও থাকে। তার প্রবৃত্তিবেগ কিছুকালের জন্য বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু সেই বিপর্যয় শেক্সপীয়রীয় নাটকের পরিণামের মত মৃত্যু ও অপচয় নিয়ে আসে না, আনে পরিবর্তন। সত্যবোধের প্রতীক অন্য যে প্রধান চরিত্র, তারই আদর্শে ফিরে এসে প্রমত্ত দ্বিতীয় নায়ক শান্ত হয়। এইজন্যেই পাঠক স্থির করে উঠতে পারে না— নাট্যকারের অভিপ্রেত নায়ক কে? একজন কবির সত্যের আদর্শকে বহন করছে; শেষ পর্যন্ত তারই আদর্শ বিজয় লাভ করছে। আর-একজন শেক্সপীয়রীয় নাটকের নায়কের মতই শক্তিমান্ অসাধারণ ও বিস্ময়োদ্দীপক। তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যজনকে কবি বিজয়ী করছেন বটে, কিন্তু এর প্রতি কবির আকর্ষণ যে কিছু কম তা তো মনে হয় না। আর সে আকর্ষণ থাকাই তো স্বাভাবিক। তিনি নীতিবিদ্ শুধু নন,

---

৮ "য়ুরোপীয় চিত্তের এই চাঞ্চল্য, এই নিয়মবন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেখানকার ইতিহাস হইতেই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহার অন্তরে বাহিরে একটা মিল ছিল। সেখানে সত্যই ঝড় উঠিয়াছিল বলিয়াই ঝড়ের গর্জন শুনা গিয়াছিল। আমাদের সমাজে যে অল্প-একটু হাওয়া দিয়াছিল তাহার সত্য-সুরটি মর্মরধ্বনির উপরে উঠিতে চায় না।" —জীবনস্মৃতি, 'ভগ্নহৃদয়'

তিনি কবি। কৌতুক বোধ করি, তিনি 'রাজা ও রানী' এবং মালিনীর ভূমিকায় বারবার স্মরণ করিয়ে দেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সঙ্গে এদের মিল আছে। রবীন্দ্রকবিমানসের এই দ্বন্দ্বের শেষ পরিণতি কোথায়, তা লক্ষ করার প্রয়োজন আছে।

৩

মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' সম্পর্কে একটি অভিমত প্রচলিত আছে ধর্মপ্রাণ কবি ঈশ্বরকে কাব্যের নায়ক করতে গিয়ে তাকে প্রাণহীন পুতুলে পরিণত করে ফেলেছেন এবং কবির অজ্ঞাতসারে শয়তান প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও উদ্ধত ব্যক্তিত্ব নিয়ে কাব্যের নায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিলটনের শয়তানের বর্ণনা যেমন সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, শয়তানের মুখের বহু উক্তি তেমনি জীবনযুদ্ধে প্রবল পৌরুষের বাণী হয়ে আছে। রেনার্শাঁসের পর য়ুরোপে প্রকৃতি এমনি করেই প্রতিশোধ নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের নাটকেও দেখি, যে ভ্রান্ত আদর্শের তিনি পরাজয় দেখিয়েছেন, সেই আদর্শের প্রতিনিধি একটা আশ্চর্য বীর্যবত্তার অধিকারী হয়ে আমাদের সম্ভ্রম আকর্ষণ করেছে। 'তপতী'র এই নায়ক বিক্রম বলেছে—

"তুমি আমাকে চিনতে পারলে না— তোমার হৃদয় নেই, নারী! শংকরের তাণ্ডবকে উপেক্ষা করতে পার কি? সে তো অপ্সরার নৃত্য নয়। আমার প্রেম, এ প্রকাণ্ড, এ প্রচণ্ড, এতে আছে আমার শৌর্য— আমার রাজপ্রতাপের চেয়ে এ ছোটো নয়। তুমি যদি এর মহিমাকে স্বীকার করতে পারতে তা হলে সব সহজ হত। ধর্মশাস্ত্র পড়েছ তুমি, ধর্মভীরু— কর্মদাসের কাঁধের উপর কর্তব্যের বোঝা চাপানোকেই মহৎ বলে গণ্য করা তোমার গুরুর শিক্ষা! ভুলে যাও, তোমার ঐ কানে মন্ত্রগুলো। যে আদিশক্তির বন্যার উপর ফেনিয়ে চলেছে সৃষ্টির বুদ্‌বুদ্ সেই শক্তির বিপুল তরঙ্গ আমার প্রেমে— তাকে দেখো, তাকে প্রণাম করো, তার কাছে তোমার কর্ম-অকর্ম দ্বিধাদ্বন্দ্ব সমস্ত ভাসিয়ে দাও। একেই বলে মুক্তি, একেই বলে প্রলয়, এতেই আনে জীবনে যুগান্তর।"

ইংরেজিতে একেই বলে elemental। প্রেমের এই আদিমতায় এক রহস্যময় প্রাকৃতিক শক্তি অন্ধ আবেগ নিয়ে ফুটে উঠেছে। এ শক্তি সব নীতিতত্ত্বের বাইরে, পর্বত সমুদ্র ঝঞ্ঝা মৃত্যু উল্কাপাতের মতই সত্য। মানুষ যে নীতির কথা বলে সে মনঃকল্পিত; আর এই দুর্জয় আবেগ কঠোর কঠিন রুদ্র বাস্তব। এই নীতির প্রতিনিধি যে নায়িকা, তপতীর সেই সুমিত্রা প্রেমের এই প্রমত্ত লেলিহান অগ্নিশিখার সামনে দাঁড়িয়ে ত্রস্ত হয়ে বলে উঠেছে—

"সাহস নেই মহারাজ, সাহস নেই! তোমার প্রেম তোমার প্রেমের পাত্রকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে— আমি তার কাছে অত্যন্ত ছোটো। তোমার চিত্তসমুদ্রে যে তুফান উঠেছে তাতে পাড়ি দেবার মতো আমার এ তরী নয়— উন্মত্ত হয়ে যদি ভাসিয়ে দিই তবে মুহূর্তে এ যাবে তলিয়ে। আমার স্থিতি তোমার প্রজাদের কল্যাণলক্ষ্মীর দ্বারে— সেখানকার ধূলির পরেও যদি আসন দিতে, আমার লজ্জা দূর হত।"

বিক্রমের প্রেমের ভার বহন করবার শক্তি সুমিত্রার নেই। সুমিত্রা তুলে নিয়েছে প্রজার কল্যাণের ব্রত। তাতেই সে পেয়েছিল জীবনের অভীষ্ট। তার প্রেমের কল্পনা অন্যরকম। আসলে সে ঠিক প্রেমকেই চায় নি, সে চেয়েছে রাজাকে নিজের আদর্শ দিয়ে কল্পনা করতে। রাজাকে হতে হবে

দেবতা— প্রেমিক নয়। লক্ষ করবার বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও এমনি-এক দাম্পত্য সমস্যা আছে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে একটির কাহিনী রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' কিংবা 'তপতী'র কাহিনীর মত। সীতারাম ও শ্রীর মধ্যে বিচ্ছেদটা প্রথমত আদর্শের জন্য ছিল না। ছিল প্রেমেরই জন্য। স্বামীকে ভালোবাসে বলেই শ্রী স্বামী থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে। এ সমস্যা প্রাণের, মনের নয়। কিন্তু পরে শ্রী যখন দেবীতে পরিণত হল, তখন সীতারামের প্রবল শক্তি তার প্রেমকে রূপান্তরিত করল একটা হিংস্র রিপুতে। বঙ্কিমের উপন্যাসে শেক্সপীয়রীয় কল্পনার ছায়া আছে, তবু সীতারামের মত শক্তিমান নায়ককে রিপুপরবশ হতে দেখে মনে হয় সীতারাম প্রেমকে দুর্বার করে তুলতে না পেরে বরং তাকে দুর্বল হীনতার বশীভূত করেছে। রবীন্দ্রনাথের বিক্রমদেব এই দুর্বলতার বশীভূত হয় নি। বিক্রমদেবের চরিত্রে যে নায়ক-লক্ষণ ফুটে উঠেছে তা আরও নিরঙ্কুশ এবং দুঃসাহসিক অর্থাৎ সে দুর্বৃত্ত-নায়ক, ইংরেজিতে যাকে বলে villain hero।

'তপতী'র বিক্রমদেবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নায়কের একটি পূর্ণবিকশিত রূপ কল্পনা করেছেন। ইতিপূর্বে এক রঘুপতি ছাড়া ঠিক এতখানি পূর্ণাঙ্গতা আর কোনো দ্বিতীয় নায়কে দেখা যায় না। মালিনীর ক্ষেমংকর চরিত্রটির মধ্যে আছে এক অটলতা ; তেমনি অটলতা আছে অচলায়তনের মহাপঞ্চকের। এরা দু জনেই পাষাণের মত দুর্ভেদ্য। এই চরিত্র-পরিকল্পনাতে মহত্ত্বের স্পর্শ (touch of greatness) আছে। এ কথা রবীন্দ্রনাথই অন্য চরিত্রের মুখ দিয়ে পরোক্ষে বলিয়েছেন। অচলায়তন যখন ভেঙে পড়ছে, সবাই যখন গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করছে মহাপঞ্চক তখন বলছে,

"পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম— যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।"

তখন দাদাঠাকুর বলছেন,

"শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না।"

স্পষ্টতই এই চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ কল্যাণবোধের দিক দিয়ে স্বীকার করতে না পারলেও এর শক্তিকে তিনি অস্বীকার তো করতে পারেনই নি, বরং এর প্রতি এক ধরণের বিস্ময় এবং সম্ভ্রম অনুভব করেছেন। কিন্তু মহাপঞ্চকের চরিত্রে এই শক্তিটি ছাড়া আর-কোনো বিশেষত্ব নেই, সেইজন্যই এর চরিত্রবিকাশের আর-কোনো সূত্র নেই। এই চরিত্রটি যেন একটি কঠিন ধাতুপিণ্ড মাত্র ; এই ধাতু দিয়ে আর কিছু গড়া হয় নি। মালিনীর ক্ষেমংকর চরিত্রটিও এই শ্রেণীর। তার মধ্যেও একটি অন্ধশক্তি আছে, কিন্তু তার পূর্ণবিকাশ ঘটে নি। অথচ ক্ষেমংকর নাট্যকারের সত্যবোধের প্রতিকূল শক্তি হলেও দৃঢ়তা ও একমুখিনতায় সে নায়ক-লক্ষণযুক্ত। 'মুক্তধারা'র রাজা রণজিৎকেও আমরা এই শ্রেণীভুক্ত করতে পারি কিন্তু নাটকের শেষাংশে অভিজিতের জন্য তার অসহায় উদ্‌বেগ তার চরিত্রকে নমনীয় করে তুলেছে। রণজিৎ যেন ক্ষেমংকর এবং রঘুপতি মিলিয়ে পরিকল্পিত।

বিসর্জনের রঘুপতি-চরিত্রটিতে কেবল নায়কের দৃঢ়তা ও শক্তির অন্ধতাই প্রকাশ পায় নি, জয়সিংহের প্রতি স্নেহে এবং আরও নানা দ্বন্দ্ব-সংশয়ে তার চরিত্র ক্রমবিকাশশীল। এই হিসাবে সে নাটকের

নায়ক হবার যোগ্য সন্দেহ নেই। বরং এ দিক দিয়ে রাজা গোবিন্দমাণিক্য নাট্যকারের সত্যবোধের প্রতীক হলেও এবং শেষপর্যন্ত তারই আদর্শকে বিজয়ী দেখালেও সে স্থির, পরিবর্তনহীন। তার চরিত্রের আর-কোনো বিশেষত্ব নেই বা সূত্র নেই। রঘুপতির আদর্শের প্রতি নাট্যকারের শ্রদ্ধা না থাকলেও সে গোবিন্দমাণিক্যের চেয়ে অধিকতর জীবন্ত। স্রষ্টা রূপে রবীন্দ্রনাথ রঘুপতির রূপায়ণে অধিকতর অবহিত। তার ট্র্যাজেডি এই যে রঘুপতি তার নিজের পরাজয়ের বিষবাণ নিজেই অজ্ঞাতসারে বহন করেছে। জয়সিংহের প্রতি স্নেহই সেই বাণ। সেই অমৃতই অবস্থা-বিপর্যয়ে হল তার কাছে বিষোপম, তার মৃত্যু। এই তার প্রকৃতির প্রতিশোধ। একটি কারণে রঘুপতি ঠিক শেক্সপীয়রীয় নায়ক হয়ে ওঠে নি। রঘুপতির চরিত্রে শক্তি শেষপর্যন্ত শ্রদ্ধা জাগায় না, কারণ সে যেসব মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে তা তার আদর্শকে কলুষিত করেছে। পাঠকের সম্ভ্রম শেষপর্যন্ত আকর্ষণ করতে পারে না। রঘুপতি দুর্বৃত্ত-নায়কও নয়। তার দুর্বৃত্ততার মধ্যে নায়কোচিত শক্তির বলিষ্ঠ অনাবৃত দুঃসাহসিকতা নেই যা বরং আমরা তপতীর বিক্রমদেবের মধ্যে দেখি। আবার পুরোপুরি নায়কগৌরবও সে পায় না তার চরিত্রগত হীনতার জন্য।

এই দ্বিধার হাত থেকে কিছু মুক্তি রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন 'রক্তকরবী'র রাজার কল্পনায়। রক্তকরবী রূপক নাটক, রাজাও একটি সাংকেতিক চরিত্র মাত্র এবং সে দিক থেকে অন্য নাটকের সঙ্গে ঠিক তুলনাও টানা উচিত নয়। তবু রক্তকরবীর রাজার মধ্যে শক্তির একটা অভ্রভেদী বিশালতা ফুটেছে। অবশ্য এই রূপ ক্রিয়ার (action) চেয়ে বর্ণনাতেই প্রকাশিত—

"অদ্ভুত তোমার শক্তি। যেদিন আমাকে তোমার ভাণ্ডারে ঢুকতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে কিছু আশ্চর্য হই নি, কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেইগুলোকে নিয়ে চূড়ো করে সাজাচ্ছিলে, তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম।"

প্রাণসত্তা মুগ্ধ হয়েছে শক্তিকে দেখে, যদিও এই একই শক্তির 'নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ' লালিত হয়েছে। রক্তকরবীর রাজা যে শক্তির প্রতীক, সেই শক্তির লক্ষণই এই যে হৃদয়হীনতাই একে ক্ষয় করে ফেলে—

"আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি— তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ওই একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।

"তুমি যে এত ক্লান্ত তোমাকে দেখে তো তা মনেই হয় না। আমি তো তোমার মস্ত জোরটাই দেখতে পাচ্ছি।"

বিসর্জনের রঘুপতি যেমন শক্তির সঙ্গে স্নেহের দুর্বলতা লালন করেছে, মরকরাজও তেমনি শক্তির সঙ্গে লালন করেছে একটা অপরিতৃপ্ত ক্ষুধাকে। শক্তির মত্ততায় তারা জানতে পারে নি এই দুর্বলতাই তাদের শক্তিমত্তাকে একদিন পরাস্ত করবে। চরিত্রকল্পনার এই রীতিও নাটকীয়। শেক্সপীয়রের নায়কেরা একই সঙ্গে প্রাণ ও মৃত্যুকে বহন করেছে।[১] কিন্তু রঘুপতি চরিত্রের মধ্যে

---

১ "It is a fatal gift but it carries with it a touch of greatness."—A. C. Bradley. *The Shakespearean Tragedy.* The Substance of Tragedy.

কার্যসাধনের যে হীনতা আছে, রাজার চরিত্রে তা নেই। এইজন্য রাজার যে নায়ক-গৌরব আছে, রঘুপতি পুরোপুরি সে অধিকারে বঞ্চিত।

৪

এককালে শেক্সপীয়রের নাটক আমাদের দেশে নাট্যরচনার আদর্শ ছিল। রবীন্দ্রনাথও প্রথম যুগে বহিরঙ্গ নাট্যরীতিতে অন্য সকলের মত শেক্সপীয়রকে অনুসরণ করেছেন। বিশেষ করে 'রাজা ও রানী' 'বিসর্জন' ও 'প্রায়শ্চিত্তে'—এই তিনটি নাটক ঘটনাধারার দিক দিয়ে এই প্রথাকে যথাযথ অবলম্বন করেছে। কিন্তু 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তার লক্ষণ পরবর্তী নাটকে অক্ষুণ্ণ আছে। দুই পদ্ধতি মিলে রবীন্দ্র-নাটকের এক মিশ্ররূপ গড়ে উঠেছে। কবির কল্যাণভাবনা এবং জীবনভাবনা রবীন্দ্রনাথের নাটকে সংঘাত সৃষ্টি করেছে। তারই ফলে দ্বিনায়কত্বের সৃষ্টি। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক (১৯০৯) থেকেই রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতি থেকে মুক্ত হবার চেষ্টাও করেছেন। নিজস্ব পদ্ধতি, যা পরবর্তী নাটকে পূর্ণ-প্রকাশিত, তার কিছু কিছু লক্ষণ এখানে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু আমরা দেখেছি বিদেশী নাট্যপদ্ধতিকে বেশি করে মানলেও প্রথম যুগেও রবীন্দ্রনাথের নিজের চিন্তা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রবল থাকলেও দুই নায়কের মধ্যে একজনের কল্পনায় শেক্সপীয়রীয় নায়ক-লক্ষণ তীব্রতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের এইসব আলোচ্য নাটকগুলিকে দুই শ্রেণীতে ফেলতে পারা যায়। যেসব নাটকে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে মূলত অবলম্বন করে নায়কের পরিকল্পনা করেছেন সেগুলি অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ, জীবনধর্মী এবং নাটকীয়। যেসব নাটকে তিনি চরিত্রের প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে মুখ্য না করে একটা কোনো বহিরঙ্গ আদর্শের প্রতীকরূপে এঁকেছেন, সেই নাটকে নায়ক-চরিত্র স্বভাবতই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে নি। 'রাজা ও রানী' এবং 'তপতী' প্রথমশ্রেণীর। প্রেম ও প্রবৃত্তির সংঘাত এই নাটকের বিষয়। বিসর্জনকেও এরই অন্তর্ভুক্ত করা চলে। কারণ ধর্মের মোহ রঘুপতিকে ক্ষমতামত্ত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ করেছিল বলে এতেও মানবস্বভাবকেই তিনি নাটকীয় দ্বন্দ্বের বিষয়ীভূত করেছেন। কিন্তু 'মালিনী' 'অচলায়তন' 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী'র বিষয় অন্যরকম। কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম, যন্ত্রশক্তি অথবা ধনশক্তির পাপ দেখানোই এইসব নাটকের উদ্দেশ্য। সুতরাং এদের নাটকীয় বিষয়টা ব্যক্তিস্বভাবের উপর ততটা নির্ভর ক'রে নেই, যতখানি স্থাপিত সামাজিক সমস্যার উপর। তাই এখানকার নায়করা পূর্ণবিকশিত নয়। এদের পর্বতকঠিন অটলতা কবিকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। সেই মুগ্ধতা এবং বিস্ময় দিয়ে কবি এদের গড়েছেন বলেই এরা অসাধারণ এবং সেই গরিমায় নায়ক হবার যোগ্যতা কোনো অংশেই কম নয়। এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য, কবি যে কোনো চরিত্রের নামে নাটকের নামকরণ করতে পারেন নি তার একটি কারণ ছিল এই দ্বিনায়কত্ব। ভাব-সংঘাতের প্রকৃতি দিয়ে তিনি নাটকের নাম দিয়েছেন, কোনো চরিত্র দিয়ে নয়। যাকে ভালোবাসলেন তাকে তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। যাকে পূজা করলেন তারই আধিষ্ঠান-বেদী তিনি রচনা করলেন।

বিশ্বসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় সাতষট্টি বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর-কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে সংযুক্ত নহে; তাহারা বিচ্ছিন্ন।"[১]

এখন আমরা জাতীয় সংহতির প্রশ্ন নিয়ে ভাবছি। রবীন্দ্রনাথ একাত্মবোধের সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত পথটি নির্দেশ করে গিয়েছেন। সাহিত্যের মধ্যে মানবগোষ্ঠীর যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জানাই প্রকৃত জানা। একদা সংস্কৃত সাহিত্য ভারতের জনসাধারণকে এক সংস্কৃতি-ভাবনায় যুক্ত করেছিল। বেদ উপনিষদ্ ও কালিদাসের কাব্য ভারতের সকল অঞ্চলের পক্ষেই সমান সত্য ছিল। সংস্কৃত সাহিত্য দেশের সর্বত্র রচনা করেছিল এক সাংস্কৃতিক পটভূমি।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব নানা কারণে ক্ষীণ হয়ে আসবার পর থেকে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ আরম্ভ হয়। সকলের দৃষ্টির অন্তরালে ধীরে ধীরে আঞ্চলিক সাহিত্যগুলি সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বিদেশী সরকার এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন বললে অত্যুক্তি করা হয় না। তখন ইংরেজি ভাষার দাপটে আঞ্চলিক ভাষা তার দারিদ্র্য নিয়ে মর্যাদার আসন লাভ করবার সুযোগ পায় নি।

ইংরেজি যে ঐক্য এনেছে তা একান্তই বাহিরের। ইংরেজি আফিস-আদালত ও ব্যবসায়ের ভাষা। হৃদয়ের ভাষা নয়। দরিদ্র হলেও আঞ্চলিক ভাষার মধ্যেই দেশের সত্যকার পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে। যাঁরা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে সুশিক্ষিত তাঁরাও মাতৃভাষাকেই হৃদয়ের অনুভূত প্রকাশের বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এবং এইজন্যই, এত দীর্ঘকাল যাবৎ ইংরেজির আধিপত্য সত্ত্বেও, ইংরেজি সাহিত্যে ভারতীয় লেখকের দান উল্লেখযোগ্য নয়।

দেশের হৃদয় আঞ্চলিক সাহিত্যগুলির মধ্যে বিভক্ত হয়ে আছে। জাতীয় সংহতির জন্য দেশকে সমগ্রভাবে জানতে হবে। অপরিচিত ভাষার অন্তরালে দেশের হৃদয়ের যে খণ্ডাংশ আত্মগোপন করে আছে তাকে না জানলে একাত্মবোধ জাগ্রত হওয়া সম্ভব নয়।

জানবার উপায় এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় ব্যাপক অনুবাদ এবং আঞ্চলিক সাহিত্য সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনার ব্যবস্থা। এখনও আমরা বিদ্যালয়ে শেক্সপীয়র মিল্টন শেলী কীটস্ পড়ি। বাঙালি ছাত্র যদি তুলসীদাসের নামও শুনে না থাকে তা হলেও তার প্রথমশ্রেণীতে প্রথম হয়ে সাহিত্যে এম. এ পাস করতে আটকাবে না। ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক পাঠের সুযোগ থাকলে এরূপ অসম্পূর্ণতা দূর করা সম্ভব।

তুলনা ছাড়া আমাদের চলে না। দৈনন্দিন জীবনে প্রতিমুহূর্তে তুলনা করতে হয়। জ্ঞানচর্চার জন্যও তুলনা অত্যাবশ্যক। ম্যাক্সমুলার বলেছেন, "all higher knowledge is gained by

---

১ বাংলা জাতীয় সাহিত্য : 'সাহিত্য'

comparison, and rest on comparison।" কিন্তু সাহিত্যে তুলনামূলক আলোচনার পদ্ধতি এসেছে অনেক পরে।

য়ুরোপের জাতীয়-সাহিত্যগুলি যতদিন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নি ততদিন পর্যন্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনার কথা ওঠে নি। তুলনার জন্য প্রয়োজন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বস্তু বা বিষয়। মধ্যযুগের য়ুরোপীয় সাহিত্যে ল্যাটিন ভাষা, ক্লাসিক রীতি ও ধর্মের প্রাধান্য ছিল। য়ুরোপের প্রায় সকল দেশের উপরে ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রভাব পড়েছে একটি কেন্দ্র থেকে। সুতরাং এইসব প্রভাব অতিক্রম করে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিকাশের সুযোগ ছিল সংকীর্ণ। রোম-সাম্রাজ্য পতনের পর রাজনৈতিক বন্ধন শিথিল হল; নানা কারণে চার্চের কর্তৃত্বেরও জোর রইল না। এর ফলে য়ুরোপের মানচিত্রে দেখা দিল কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য নিয়ে। এতদিন আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য ছিল দৃষ্টির অন্তরালে। গাথা পল্লীগীতি এবং উপকথা ছিল এদের আশ্রয়। স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর আঞ্চলিক সাহিত্য নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দ্রুত বিকাশের পথে এগিয়ে চলল। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই অনেকগুলি আঞ্চলিক সাহিত্য সম্পদশালী হয়ে উঠেছে দেখা যায়।

ভারতের আঞ্চলিক সাহিত্যগুলির মধ্যে বর্তমানে যেমন যোগাযোগ নেই, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে য়ুরোপের সাহিত্যগুলির মধ্যেও তেমনি ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ ছিল সংকীর্ণ।

নতুন সৃষ্টির আনন্দে প্রতিবেশী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করবার বাসনা জেগে উঠল। উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যেও আমরা এই লক্ষণটি দেখতে পাই। বাংলার শেক্সপীয়র, বাংলার মিল্টন, বাংলার শেলী না বললে যেন বাঙালি লেখকের প্রতিভা চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সাহিত্যে তুলনামূলক আলোচনার প্রধান প্রেরণা এসেছে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রসার ও প্রয়োগ থেকে। বিজ্ঞানের তথ্য সকল দেশেই সমান সত্য। সুতরাং তথ্যানুসন্ধান ও সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য তুলনামূলক বিশ্লেষণের প্রয়োজন। বিজ্ঞানে তুলনামূলক রীতির প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ দেখা যায় জর্জ কুভিয়ার (১৭৬৯ - ১৮৩২) 'শারীরবিদ্যা' (১৮০০) গ্রন্থে।

সমাজবিদ্যার ক্রমবর্ধমান চর্চাও সাহিত্যের আলোচনাকে প্রভাবান্বিত করেছে। একটি বইকে বিচ্ছিন্ন শিল্পকীর্তি হিসাবে না দেখে যুগ ও সামাজিক পরিবেশের শিল্পমণ্ডিত প্রতীক হিসাবে দেখাই সমীচীন বলে কেউ কেউ বলেছেন। অর্থাৎ একটি বই শুধু একজন লেখকেরই সৃষ্টি নয়; তার রূপায়ণে সমাজ ও কালেরও অংশ আছে। তখনই প্রশ্ন ওঠে তুলনার। জাতি যুগ ও পরিবেশের তুলনামূলক আলোচনা করলে সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি উপলব্ধি করা যেতে পারে। টেইন[২] তাঁর ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের ভূমিকায় (১৮৬৩) বিস্তৃতরূপে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন।

কোনো জাতির সংস্কৃতি ও সাহিত্য যে দেশের গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ থাকলেই সার্থকতা লাভ করে না, তা যে বিশ্বসংস্কৃতি ও বিশ্বসাহিত্যের অংশমাত্র এবং বিশ্বের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হবার যোগ্যতা লাভ করবার মধ্যেই যে সার্থকতা— তা অকুণ্ঠ ভাবে ঘোষণা করবার কৃতিত্ব হার্ডারের[৩]। তুলনামূলক সাহিত্যের ইতিহাসে হার্ডারের নাম আর-একটি কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শেক্সপীয়র সম্বন্ধে তাঁর একটি মন্তব্য

---

২ Hippolyte Taine (1828-1893).

৩ Johann Gottfried Von Herder (1744-1803).

জার্মান সাহিত্যে নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিল। হার্ডার বলেছিলেন, শেক্সপীয়র লোকগাথা ও লোকসংগীতের উপর ভিত্তি করেই তাঁর অপূর্ব নাটকগুলি রচনা করেছেন। এই উক্তি যথার্থ না হলেও জার্মানিতে শেক্সপীয়রের রচনার নতুন ব্যাখ্যা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করল। আরম্ভ হল লোকগাথা ও লোকসংগীতের চর্চা ও সংকলন। শেক্সপীয়রের মত নাটক রচনা করা যে অসম্ভব নয় এমন আশা নিয়ে অনেক লেখক গাথাসাহিত্য আলোচনা আরম্ভ করলেন। লোকসাহিত্যের ব্যাপক চর্চা শুরু হবার ফলে ফাউস্টের কাহিনী গোটের[৪] মন আকৃষ্ট করতে হয়ত সহায়তা করেছে।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে গোটে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে স্ট্রাসবুর্গে এলেন পড়াশুনা করতে। এখানেই তাঁর পরিচয় হয় হার্ডারের সঙ্গে। হার্ডার তাঁকে শেক্সপীয়র এবং অন্যান্য ইংরেজ লেখকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত করে দেন। হার্ডারের বিশ্বসংস্কৃতির আদর্শও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। পরবর্তী জীবনে গোটে বিশ্বসাহিত্যের আদর্শ ব্যাখ্যা ও প্রচারের জন্য লিখতে এবং বক্তৃতা করতে কখনো ক্লান্তি বোধ করেন নি। বিশ্বসাহিত্যের আদর্শ সুস্পষ্টরূপে প্রথম ব্যাখ্যা করেন গোটে। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি গোটে একারমানকে বলেন: জাতীয় সাহিত্য এখন অনেকটা অর্থহীন হয়ে পড়েছে, বিশ্বসাহিত্যের যুগ আসছে; সেই যুগকে দ্রুত এগিয়ে আনবার জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা কর্তব্য।

গোটে বলতেন, বিশ্বসাহিত্য সাহিত্যের আন্তর্জাতিক বাজার। এ বাজারে বুদ্ধি ও চিন্তার সম্পদগুলি বিনিময়ের জন্য সাজানো থাকে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে নানা বিভেদ আছে; বিশ্বসাহিত্য সেই বিভেদের উপরে মিলনের সেতু। বিশ্বসাহিত্যের প্রাঙ্গণে লেখকেরা জাতির প্রতিনিধি হিসাবে ভাবের আদানপ্রদান করেন। ভাব-সম্পদে কোনো জাতির যদি অভাব থাকে তাহলে পারস্পরিক আলোচনা ও গ্রন্থপাঠ দ্বারা *সেই অভাব পূরণ করা যেতে পারে। অন্য দেশের লেখকের রচনায় আমার দেশের কী ছবি ফুটে উঠেছে তা থেকে নিজেদের যথার্থরূপে জানবার সুযোগ পাওয়া যায়।*

আন্তর্জাতিক ভাববিনিময়ের প্রধান উপায় অনুবাদ। গোটে অনুবাদের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। আদর্শ অনুবাদ দুর্লভ। মোটামুটি ভালো অনুবাদের সাহায্যে এক সাহিত্যের ভাবসম্পদ অন্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে পারে। বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনাও পারস্পরিক মৈত্রীভাবনার সহায়ক। কার্লাইল ইংরেজি ভাষায় জার্মান সাহিত্য নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, গোটে তা বিশেষরূপে উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন জাতির লেখকদের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং চিঠিপত্রের আদানপ্রদানও আন্তর্জাতিক ভাবসম্মিলনকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

গোটের বিশ্বসাহিত্যের আদর্শ শুধু সমসাময়িক লেখকদের রচনার পাঠ ও আলোচনার মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। শাশ্বত মানবতার আদর্শে পৌঁছবার জন্য সাহিত্যের সহায়তা অত্যাবশ্যক। প্রাণিজগতে যেমন আদিরূপ আছে— বিভিন্ন প্রাণী সেই আদিরূপের বিচিত্র প্রকাশ— তেমনি আমাদের শিল্প ও বুদ্ধির জগতেও আরকিটাইপ বা আদিরূপের কল্পনা করা যায়। বিভিন্ন জাতি এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সেই আদিরূপেরই রূপভেদ। আদিরূপকে স্পষ্টতর করে বৃহত্তর মানবতাবোধ উদ্বুদ্ধ করাই বিশ্বসাহিত্যের মুখ্য কর্তব্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক জাতি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে আদিরূপে পৌঁছবার সাধনা

---

৪ Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).

করবে। জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সাহিত্যে পাওয়া গেলে আন্তর্জাতিক মৈত্রীবন্ধন সহজ হবে। কারণ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ উপলব্ধি না করতে পারবার ফলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দেয়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্যেটে বিশ্বসাহিত্য বলতে য়ুরোপীয়ান সাহিত্যই হয়তো বুঝেছেন। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই তিনি য়ুরোপীয়ান ও বিশ্বসাহিত্য সমার্থক রূপে প্রয়োগ করেছেন দেখা যায়। সংস্কৃত ও চীনা সাহিত্যের নানা বই তিনি পড়েছেন; তবু য়ুরোপীয়ান সাহিত্যগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে, অন্য দেশের সাহিত্যের পাঠ ও আলোচনা এমন আর নতুন কথা কি। সভ্য সমাজে সকল যুগেই তা হয়েছে। ভারতীয় সাহিত্য চীন দেশে, শ্যাম জাভা আরব প্রভৃতি দেশে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু সেই পাঠ নিবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের মধ্যে। জনসাধারণ বিদেশী সাহিত্যের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে নি; কারণ, অনুবাদের প্রচার মুদ্রণ-পূর্ব যুগে ছিল খুবই কম।

একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বসাহিত্যের পাঠ ও আলোচনা পাশ্চাত্ত্যের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আরম্ভ হয়েছে মূলতঃ গ্যেটের আদর্শ অনুসরণ করে। ইউনেস্কো বিশ্বসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির অনুবাদের ব্যবস্থা করেছেন। এখন বিদেশী সাহিত্যের আলোচনা অনুবাদের সাহায্যেই করা যেতে পারে; ভাষা না জানলে যে চর্চা বন্ধ রাখতে হবে তেমন অবস্থা আর নেই।

বিদেশী সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে একটি সাহিত্য যে কিরূপ সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে তার আশ্চর্য দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্য। রামমোহন থেকে আরম্ভ করে সকল চিন্তাশীল বাঙালিই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এ দেশে য়ুরোপীয়ান সাহিত্যের প্রচারের জন্য মিলিত ভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বছর অক্টোবর মাসে *দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যচরণ ঘোষাল, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক ক্যালকাটা পাবলিক* লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্যের সাংস্কৃতিক ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ জানাতে বিনামূল্যে বই-পত্র পাঠাবার জন্য। তাঁরা আবেদনে বলেছেন, "One of the great objects of the formation of this Institution [Calcutta Public Library] is the dissemination of European literature and science in this country. As the promotion of the real interests of India, and we may add the happiness of the inhabitants, mainly depend upon the successful prosecution of those efforts which have been made for some years past to foster a taste for the elegant literature and sound knowledge of the west, it may be considered a duty incumbent on every Englishman, whatever be his station, to assist in furthering this object."[৫]

অর্থাৎ, য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্য এ দেশে প্রচার করাই ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির অন্যতম

---

৫ Calcutta Public Library: Annual Report, 1848-49.

প্রধান উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্ত্যের সুরুচিপূর্ণ সাহিত্য এবং প্রগাঢ় জ্ঞান এ দেশে প্রচারের উপরে ভারতবাসীর সুখ ও স্বার্থ অনেকটা নির্ভর করছে।

যে বছর এই আবেদন করা হয় সেই বছর, অর্থাৎ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে, ম্যাথ্যু আর্নল্ড 'বিশ্বসাহিত্য' কথাটি ব্যবহার করেন। আবেদনকারীরা ঐ কথাটি ব্যবহার না করলেও অন্তর্নিহিত ভাবটি তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন।

শুধু এই ক'জন আবেদনকারীর মধ্যেই য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলা দেশের মন বিদেশী সাহিত্যের দান গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত ছিল। ইংরেজ-শাসনের সঙ্গে ভারতের সর্বত্র ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। কিন্তু একমাত্র বাংলা সাহিত্য সেই প্রভাব থেকে নব নব সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছে।

বিশ্বসাহিত্যে আদানপ্রদানের পালা নিত্যই চলছে। নিজের মত করে গ্রহণ করবার জন্য শক্তির প্রয়োজন। বাঙালির তা ছিল; এই জন্যই বাঙালি লেখকরা অনুকরণ করেন নি। সৃষ্টির প্রেরণা হিসাবে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

বিশ্বসাহিত্যের এই মূল তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণরূপেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছেন, "হোমার বর্জিল মিলটন প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য কবিদের কাছ থেকে মাইকেল তাঁর সাধনার পথে উৎসাহ পেয়েছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্রও কথাসাহিত্যের রূপের আদর্শ পাশ্চাত্ত্য লেখকদের কাছ থেকে নিয়েছেন। কিন্তু, এঁরা অনুকরণ করেছিলেন বললে জিনিসটাকে সংকীর্ণ করে বলা হয়। সাহিত্যের কোনো-একটি প্রাণবান রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই রূপটিকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন; সেই রূপটিকে নিজের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনায় তাঁরা সৃষ্টিকর্তার আনন্দ পেয়েছিলেন, সেই আনন্দে তাঁরা বন্ধন ছিন্ন করেছেন, বাধা অতিক্রম করেছেন। এক দিক থেকে এটা অনুকরণ, আর-এক দিক থেকে এটা আত্মীকরণ। অনুকরণ করবার অধিকার আছে কার। যার আছে সৃষ্টি করবার শক্তি। আদানপ্রদানের বাণিজ্য চিরদিনই আর্টের জগতে চলেছে। মূলধন নিজের না হতে পারে, ব্যাঙ্কের থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসা না হয় শুরু হল, তা নিয়ে যতক্ষণ কেউ মুনফা দেখাতে পারে ততক্ষণ সে মূলধন তার আপনারই। যদি ফেল করে তবেই প্রকাশ পায় ধনটা তার নিজের নয়।···অবশ্য, ঋণ-করা ধনে ব্যবসা করবার প্রতিভা সকলের নেই। যার আছে সে ঋণ করলে একটুও দোষের হয় না। সেকালের পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক স্কট বা বুলোয়ার লিটনের কাছ থেকে বঙ্কিম যদি ধার করে থাকেন সেটাতে আশ্চর্যের কথা কিছু নেই। আশ্চর্য এই যে, বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তার থেকে তিনি ফসল ফলিয়ে তুললেন।"[৬]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন, "আমাদের স্বদেশানুভূতি, আমাদের সাহিত্য, য়ুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাংলাদেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা। শরৎ চাটুজ্জের গল্প বেতালপঞ্চবিংশতি, হাতেম-তাই, গোলেব কাওয়ালী অথবা কাদম্বরী-বাসবদত্তার মতো যে-হয় নি, হয়েছে য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যের ছাঁদে, তাতে ক'রে অবাঙালিত্ব বা রজোগুণ প্রমাণ হয় না; তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাণবত্তা। বাতাসে সত্যের যে-প্রভাব ভেসে বেড়ায় তা দূরের থেকেই আসুক বা নিকটের থেকে, তাকে সর্বাগ্রে অনুভব

---

৬ সাহিত্যরূপ : সাহিত্যের পথে

করে এবং স্বীকার করে প্রতিভাসম্পন্ন চিত্ত; যারা নিষ্প্রতিভ তারাই সেটাকে ঠেকাতে চায়, এবং যেহেতু তারা দলে ভারী এবং তাদের অসাড়তা ঘুচতে অনেক দেরি হয় এই কারণেই প্রতিভার ভাগ্যে দীর্ঘকাল দুঃখভোগ থাকে।...সাহিত্যবিচারকালে বিদেশী প্রভাবের বা বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণসংকরতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়।"[৭]

উপরোদ্ধৃত দুটি অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের একটি প্রধান তত্ত্বের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে যে সাহিত্য অন্য জাতির মনে নব-সৃষ্টির প্রেরণা জাগ্রত করে তা সমগ্র বিশ্বের সম্পদ। ভাবের জগতে ঋণ গ্রহণ স্বাভাবিক, এবং সে ঋণ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের ভাবসম্পদ কয়েকজন লেখককে বিশেষ করে উদ্বুদ্ধ করলেও ইংরেজি পাঠক্রমের মাধ্যমে সাধারণ পাঠককেও তা স্পর্শ করেছিল। তা না হলে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে রচিত বাংলাসাহিত্য সমাদর লাভ করত না। মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' শুধু মধুসূদনকেই প্রভাবান্বিত করে নি। সাধারণ পাঠকের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা জানবার একমাত্র উপায় মিলটনের আদর্শে রচিত গ্রন্থের অভ্যর্থনা দেখে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র জনপ্রিয়তা থেকে বাঙালি-পাঠকের মন যে সেদিন কোন্ দিকে ঝুঁকেছিল তা সহজেই বোঝা যায়। অনেক অখ্যাতনামা লেখকও রচনার মধ্যে মিলটনের প্রতি আকর্ষণের ছাপ রেখে গিয়েছেন। যে-বছর 'মেঘনাদবধ' প্রকাশিত হয় সে বছরই বেরিয়েছিল তারিণীচরণ শর্মার 'রাবণের জীবনচরিত'।

১৯০৬-০৮ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের বাংলা বিভাগের পরিচালক ও প্রশ্নকর্তা ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি পরিষদের অনুরোধে সাহিত্য সম্পর্কে চারটি বক্তৃতা দেন। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে যে বক্তৃতা দেন তার বিষয় ছিল 'বিশ্বসাহিত্য'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতার নামকরণ সম্বন্ধে বলেছেন, "আমার উপরে যে আলোচনার ভার দেওয়া হইয়াছে ইংরাজিতে আপনারা তাহাকে Comparative Literature নাম দিয়াছেন। বাংলায় আমি তাহাকে বিশ্বসাহিত্য বলিব।"

বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কি তা প্রবন্ধের সর্বশেষ অনুচ্ছেদে পাওয়া যাবে: "...পৃথিবী যেমন আমার খেত তোমার খেত এবং তাঁহার খেত নহে, পৃথিবীকে তেমন করিয়া জানা অত্যন্ত গ্রাম্যভাবে জানা, তেমনি সাহিত্য আমার রচনা তোমার রচনা এবং তাঁহার রচনা নহে। আমরা সাধারণত সাহিত্যকে এমনি করিয়াই গ্রাম্যভাবেই দেখিয়া থাকি। সেই গ্রাম্য সংকীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্তি দিয়া বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করিব, প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ করিব এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশচেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব, এই সংকল্প স্থির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সম্পর্ক পৃথকভাবে দেখেন নি। তিনি জীবনকে সমগ্ররূপে দেখেছেন। "আমাদের অন্তঃকরণে যত-কিছু বৃত্তি আছে সে কেবল সকলের সঙ্গে যোগ স্থাপনের জন্য। এই যোগের দ্বারাই আমরা সত্য হই, সত্যকে পাই। নহিলে আমি আছি বা কিছু আছে, ইহার অর্থ ই থাকে না।"[৮]

---

৭ সাহিত্যবিচার : সাহিত্যের পথে

৮ বিশ্বসাহিত্য : সাহিত্য

সত্যের সঙ্গে আমাদের যোগ তিন জাতের: বুদ্ধি, প্রয়োজন ও আনন্দের যোগ। "সৌন্দর্যের বা আনন্দের যোগে সমস্ত পার্থক্য ঘুচিয়া যায়…।" আনন্দের যোগ শিল্প ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে স্থাপন করা যেতে পারে। এটা প্রয়োজনের যোগ নয় বলেই স্বার্থের সংঘাত দেখা দেবার আশঙ্কা নেই। "তাই সাহিত্যে মানুষের আত্মপ্রকাশে কোনো বাধা নাই। স্বার্থ সেখান হইতে দূরে। দুঃখ সেখানে আমাদের হৃদয়ের উপর হস্তক্ষেপ করে না; ভয় আমাদের হৃদয়কে দোলা দিতে থাকে, কিন্তু আমাদের শরীরকে আঘাত করে না; সুখ আমাদের হৃদয়ে পুলকস্পর্শ সঞ্চার করে, কিন্তু আমাদের লোভকে নাড়া দিয়া অত্যন্ত জাগাইয়া তোলে না। এইরূপে মানুষ আপনার প্রয়োজনের সংসারের ঠিক পাশেপাশেই একটা প্রয়োজন ছাড়া সাহিত্যের সংসার রচনা করিয়া চলিয়াছে। সেখানে সে নিজের বাস্তব কোনো ক্ষতি না করিয়া নানা রসের দ্বারা আপনার প্রকৃতিকে নানারূপে অনুভব করিবার আনন্দ পায়, আপনার প্রকাশকে বাধাহীন করিয়া দেখে। তেমনি সাহিত্যের মধ্যে মানুষ আপনার আনন্দকে কেমন করিয়া প্রকাশ করিতেছে, এই প্রকাশের বিচিত্রমূর্তির মধ্যে মানুষের আত্মা আপনার কোন্ নিত্যরূপ দেখাইতে চায়, তাহাই বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে যথার্থ দেখিবার জিনিস।"

মানবপ্রকৃতির নিত্যকালীন আদর্শ শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যেই যথার্থরূপে পাওয়া যায়। কেননা, আনন্দের সৃষ্টি স্বার্থকলঙ্কিত নয়। বিশ্বের মানুষকে জানতে হলে, মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে, সাহিত্যই প্রধান উপায়। তাই বর্তমান জগতে বিশ্বসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

সাহিত্য এবং শিল্পের, অর্থাৎ আনন্দ বা সৌন্দর্যের, মাধ্যমে মানুষে-মানুষে উদ্দেশ্যহীন যোগাযোগে লাভ কি? পরস্পরের মঙ্গলকামনাই হবে যোগাযোগের প্রধান লক্ষ্য। "কারণ, মঙ্গলমাত্রেরই সমস্ত জগতের সঙ্গে একটা গভীরতম সামঞ্জস্য আছে, সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহার নিগূঢ় মিল আছে।…সৌন্দর্য-মূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ।"[৯]

সুন্দর ও মঙ্গল যেমন একার্থবোধক, তেমনি সুন্দর ও সত্য অভিন্ন। যা প্রকৃতই সুন্দর তা সত্য এবং মঙ্গলময়। সাহিত্য সত্যোপলব্ধির চিহ্ন। "জগতে সর্বত্রই মানুষ সাহিত্যের দ্বারা হৃদয়ের এই চিহ্নগুলি যদি না কাটিত তবে জগৎ আমাদের কাছে আজ কত সংকীর্ণ হইয়া থাকিত তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। আজ এই চোখে-দেখা কানে-শোনা জগৎ যে বহুলপরিমাণে আমাদের হৃদয়ের জগৎ হইয়া উঠিয়াছে ইহার প্রধান কারণ, মানুষের সাহিত্য হৃদয়ের আবিষ্কার-চিহ্নে জগৎকে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।"[১০]

মহৎ শিল্প-সাহিত্যে সত্যের প্রকাশ ঘটে বলেই তার প্রভাব এড়ানো যায় না। বিশ্বসাহিত্যের জোর সেখানে। মুসলমান-আমলে আমরা সেমিটিক শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছি। আবার বর্তমানে পাশ্চাত্যের ভাবধারা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রভাবকে ঠেকানো সম্ভব নয় এই জন্য যে, এর মধ্যে সত্যের জোর আছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "য়ুরোপ হইতে নূতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে, এ কথা যখন সত্য তখন আমরা হাজার খাঁটি হইবার চেষ্টা

৯ সৌন্দর্যবোধ: সাহিত্য

১০ সৌন্দর্যবোধ: সাহিত্য

করি না কেন, আমাদের সাহিত্য কিছু-না-কিছু নূতন মূর্তি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। ঠিক সেই সাবেক জিনিসের পুনরাবৃত্তি আর কোনো মতেই হইতে পারে না; যদি হয় তবে এ সাহিত্যকে মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিব।"[১১]

নিরন্তর একের প্রভাব অন্যের উপর পড়ে সাহিত্যের সৃষ্টিশীলতা অক্ষুণ্ণ রাখে। বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের পাঠ আলোচনা ও প্রচার এই জন্যই প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিশ্বসাহিত্য ও বিশ্বমানবতা একার্থক। জীবন থেকে পৃথক করে সাহিত্যকে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি উৎসুক নন। মহৎ সাহিত্যে মানুষের সত্য-রূপটি মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই বিশ্বসাহিত্যে ঘটে সত্যের মিলন। যেখানে অসত্য, সংঘাত সেখানেই দেখা দেয়। সকল দেশের সাহিত্যের সমষ্টি রবীন্দ্রনাথের নিকট বিশ্বসাহিত্য নয়। মহৎ সাহিত্যের সামগ্রিক রূপই বিশ্বসাহিত্য। এই সাহিত্য মানুষকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দেয়, তার অনুভূতির প্রসার ঘটায় এবং বিশ্বমানবতাকে এগিয়ে আনে। কিন্তু তাই বলে বিশ্বসাহিত্যই বিশ্বমানবতার একমাত্র পথ নয়। আমাদের শিল্প দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম সবই মানুষকে বৃহত্তর অনুভূতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। 'বিশ্ববোধ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বস্তুত মানুষের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘটছে। তার কাব্য দর্শন বিজ্ঞান কলাবিদ্যা ধর্ম সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুলছে। এমনি করে অনুভূ হয়েই মানুষ বড়ো হয়ে উঠছে প্রভু হয়ে নয়।"[১২]

---

১১ সাহিত্যসৃষ্টি : সাহিত্য

১২ শান্তিনিকেতন, ১০

'শেষ রবিরেখা'

অমিয়কুমার সেন

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর যাঁরা শান্তিনিকেতনে এসেছেন বা শান্তিনিকেতনে বড়ো হয়েছেন তাঁদের কাছে শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী ছিলেন সব সমাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংযোগের মধ্যমণি। গুরুদেবের প্রথমজীবনের এই সবচেয়ে প্রিয় শিষ্যাটি জীবনের প্রায় শেষ পর্বে স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বাস করতে এসেছিলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনের পরিমণ্ডলের মধ্যে দৈহিক ভাবে অবস্থান না করেও সেখানকার আত্মিক পরিবেশটি, হয়তো-বা নিজের অজ্ঞাতেই, তিনি এমন অন্তরঙ্গভাবে আজীবন লালন করছিলেন যে ওখানকার মাটিতে পা দেবা মাত্রই যেন তিনি তাঁর নিজস্ব জায়গাটিতে স্বাভাবিক মহিমায় অধিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। শান্তিনিকেতনেরও তাঁকে অন্তরঙ্গ করে নিতে এক মুহূর্ত দেরি হয় নি। ভারতী - সবুজ পত্রের প্রখ্যাতা সহযোগী কলকাতার বিদগ্ধ সমাজের পুরোগামিনী এই নারী তাঁর সুদীর্ঘ পোশাকী নাম পরিত্যাগ করে আটপৌরে 'বিবিদি' নামে শান্তিনিকেতনের ঘরোয়া ইতিহাসের পাতায় অবলীলাক্রমেই চিরস্থায়ী স্থান করে নিলেন। ('বিবিদি'কে ছাড়া আজকের শান্তিনিকেতনকে ভাবাই যায় না। তাঁর এক প্রিয় ছাত্রী একদিন বলেছিলেন, "গুরুদেবকে আমরা ছোটোরা তো এত কাছাকাছি পাই নি, বিবিদিই আমাদের কাছে গুরুদেবের মতো ছিলেন।" শান্তিনিকেতনের পুরনো যুগের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এ কথার হয়তো তেমন তাৎপর্য নেই। কিন্তু এ যুগের ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরেই বলবে, "হ্যাঁ, ঠিক তাই।")

শান্তিনিকেতনে গুরুদেবকে ঘিরে অনেক জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হয়েছিল। গুরুদেবের শিষ্যা হিসেবে 'বিবিদি' তাঁদের সকলের চেয়েই পুরনো। কিন্তু শান্তিনিকেতনে তাঁর আবির্ভাব সকলের শেষে। গুরুদেবের জীবন এবং সাধনা থেকে তাপ সংগ্রহ করে তাঁর এই শিষ্যেরা দীপশিখার মতো জ্বলে উঠেছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকটি শিখা গুরুদেবের আগেই নিবে গিয়েছিল। তাঁর প্রয়াণের পর কয়টি স্বল্পসংখ্যক শিখা শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে তখনও জ্বলছিল, 'বিবিদি'র ধ্যানের নূতন শিখাটি তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হল। এ শিখার স্বতন্ত্র বর্ণ শান্তিনিকেতনের একটি অধ্যায়কে নূতন উজ্জ্বলতা দিয়েছে।

সমগ্র বিশ্ব শান্তিনিকেতনের উদার ক্ষেত্রে 'একনীড়' হয়ে মিলেছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত-মন স্নেহের কাঙাল হয়ে যে মাতৃস্নেহের নীড় খোঁজে, কবিজায়া মৃণালিনী দেবীর অকালমৃত্যুতে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা বুঝি তার থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের স্নেহশীলা গৃহবধূরা মাতৃস্নেহের এই ধারাটি সযত্নে অব্যাহত রাখার প্রয়াস করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সতীশচন্দ্রের জীবনদীক্ষা, অজিতচন্দ্রের সাহিত্য-সমীক্ষা, আচার্য ক্ষিতিমোহন ও বিধুশেখরের শাস্ত্রানুশীলন, কালীমোহনের লোকসংযোগ, দিনেন্দ্রনাথের আনন্দময়তা এবং নন্দলালের সৃজনীশক্তির মধ্যে শান্তিনিকেতনের মনোজগতের বিভিন্ন ধারাগুলি যে-বৃহৎ এবং মহৎ আশ্রয় পেয়েছিল, শান্তিনিকেতনের মাতৃস্নেহ বুঝি তেমনি ব্যক্তিত্বপূর্ণ একটি মহান্ আশ্রয়ের জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে ছিল। গুরুদেবের মৃত্যুর পর সে আশ্রয় 'বিবিদি'র রূপ ধরে শান্তিনিকেতনে আবির্ভূত

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

জন্ম ২৯ ডিসেম্বর ১৮৭৩ মৃত্যু ১২ অগস্ট ১৯৬০

হলেন। গত পনর বছর ধরে তাঁর এই মাতৃরূপিণী মূর্তিটি অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মতো শান্তিনিকেতনের পরিবেশের মধ্যে চিরজাগ্রত ছিল। মৃণালিনী দেবীর অকালমৃত্যুতে শান্তিনিকেতনের যে অধ্যায়টি অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল, বিবিদির উপস্থিতিতে সে অধ্যায়টি আবার নূতন করে পূর্ণ হল। তবু দুঃখ হয়, গুরুদেবের জীবিতকালে কেন 'বিবিদি' শান্তিনিকেতনে এলেন না।

২

যেমন অবলীলাক্রমে 'বিবিদি' শান্তিনিকেতনের একান্ত নিজস্ব স্থানটিতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তেমনি অবলীলা-ক্রমেই তিনি ঠাকুরপরিবারের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নিজের জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ঠাকুরপরিবার তথা বাংলাদেশের নবজাগরণের অন্যতম শেষ প্রতিনিধি। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাসের একটি যুগ শেষ হয়েছে।

সাহিত্য এবং সংগীত ছিল তাঁর সহজাত প্রতিভার মতো, অভিনয়ে তিনি পারদর্শিনী ছিলেন। পাণ্ডিত্যও তাঁর কম ছিল না। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার বহু শাখায় তাঁর অধিকার নিতান্ত নগণ্য নয়। ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার কোন্‌টিতে তাঁর বেশি দক্ষতা ছিল বলা কঠিন। একবার যখন তিনি গুরুদেবের কয়েকটি গানের ইংরেজি তর্জমা করছিলেন তখন শ্রুতলিপি লিখে নেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কি অনায়াসে তাঁর মুখ থেকে ইংরেজি বেরিয়ে আসে দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য উভয় শ্রেণীর সংগীতেই তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। প্রথম-যুগের রবীন্দ্রসংগীতের তিনিই প্রায় একক ভাণ্ডারী ছিলেন। 'ভানুসিংহের পদাবলী'র সুরগুলি তাঁর শৈশবস্মৃতির মধ্যে বেঁচে ছিল। তা না হলে সেগুলির উদ্ধার হত কিনা সন্দেহ। ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যেও তাঁর অধিকার ছিল। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এবং স্বামী প্রথম চৌধুরীর অনেক লেখার তর্জমাও তিনি সুনিপুণ ভাবেই করেছেন। নিজস্ব মৌলিক রচনাসম্ভারও তাঁর কম নয়; তাঁর অনেকটা এখনও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে; কোনো কৌতূহলী সংগ্রাহকের দৃষ্টি এখনও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় নি।

কিন্তু তাঁর প্রতিভার মহত্তম কীর্তি হল এই যে তিনি বাংলা তথা ভারতের ক্ষুরধার বুদ্ধিদীপ্ত একটি প্রতিভাকে এবং সমগ্র বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্বর আর-একটি প্রতিভাকে লালন করেছেন এবং নানাভাবে উদ্দীপ্ত করেছেন। তন্ময় চিত্তে নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে অবলুপ্ত করে তিনি এই কাজের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বিদেশিনী ভক্তকে 'নিবেদিতা' নাম দিয়েছিলেন, ইন্দিরাদেবীকেও 'নিবেদিতা' নামটি বুঝি এমনি সুন্দরভাবে মানাত। এই আত্মনিবেদনের জন্য তাঁর নিজের প্রতিভার প্রতি তিনি হয়তো-বা কিছু অবিচারও করেছিলেন, কিন্তু আত্মনিবেদনের রূপটি তাতে স্নিগ্ধতায় মধুর হয়ে উঠেছিল। এর ফলে তিনি এক অক্ষয় বরও লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁর প্রসঙ্গ অগণিত, সেখানে তিনি অমর হয়ে আছেন।

৩

রবীন্দ্রনাথের রচনায় 'শিশু'র প্রতি স্নেহ এবং কৌতূহল প্রথমে জাগ্রত হয়েছিল ইন্দিরাদেবী এবং তাঁর অগ্রজ সুরেন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে। তাঁর 'শিশু'-কবিতাগুলির জুড়ি শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় সমগ্র বিশ্বসাহিত্যেও আছে কি না সন্দেহ। এই শ্রেণীর কবিতার প্রথম উদ্দীপনার অন্যতম নায়িকা হিসেবে ইন্দিরাদেবী চিরস্মরণীয়া। ভ্রাতাভগ্নীর শৈশব-লীলাকে কবি সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তাঁদের প্রতি হৃদয়মন্থন করা আশীর্বাদ বর্ষণ করেছিলেন।—

ইহাদের করো আশীর্বাদ!
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি
নন্দনের এনেছে সংবাদ,
ইহাদের করো আশীর্বাদ।

এই আশীর্বাদ ভ্রাতাভগ্নীর জীবনে বিশেষভাবে সফল হয়েছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁরা প্রাণের শুভ্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন, তাঁদের পার্থিব জীবনে নন্দনের সংবাদ কখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

অচলশিখর ছোটো নদীটিরে
চিরদিন রাখে স্মরণে—
যতদূরে যায় স্নেহধারা তার
সাথে যায় দ্রুত চরণে।
তেমনি তুমিও থাক না'ই থাক
মনে কর মনে কর না,
পিছে পিছে তব চলিবে ঝরিয়া
আমার আশিস-ঝরনা।

কবির আশিস-ঝরনাও এঁদের প্রতি নিত্যকালের জন্য বর্ষিত হয়ে চলেছে।

'প্রভাত-সংগীত' কাব্য 'ইন্দিরাদেবী প্রাণাধিকাসু'কে উৎসর্গীকৃত। শৈশবলীলার মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে কবি যাঁর নাম রেখেছিলেন 'বাবলারানী', হেসে যাঁকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে কবির প্রাণের কথাগুলি 'চোখের জলে ভিজে-ভিজে' হয়ে যেত, পরিণত তাকে অবলম্বন করেই রবীন্দ্রপ্রতিভার আর-একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি ছিন্নপত্র' রচিত হয়েছিল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তারিখে ইন্দিরাদেবীকে লেখা একটি চিঠিতে কবি তাঁর মনের মর্মকথা স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করেছেন—

"তোকে আমি যেসব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্রভাব যে-রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয়নি।...তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিম্বা ভুল বুঝবি, কিম্বা বিশ্বাস করবি নে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা, সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেইজন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি।...আমাদের সবচেয়ে যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে নিজের ইচ্ছা-অনুসারে দিতে পারি নে। আমাদের ভিতরে সবচেয়ে যা গভীরতম উচ্চতম অন্তরতম সে আমাদের আয়ত্তের অতীত;...আমরা দৈবক্রমে প্রকাশ হই, আমরা ইচ্ছা করলে চেষ্টা করলেও প্রকাশ হতে পারি নে—চব্বিশ ঘণ্টা যাদের সঙ্গে থাকি তাদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত।...তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে, সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়। সে তোর নিজের গুণে। যদি কোনো লেখকের সবচেয়ে ভালো লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয় তাহলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখবার ক্ষমতা আছে। আমি তো আরও অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারে নি।...তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল স্বচ্ছতা আছে, সত্যের প্রতিবিম্ব তোর ভিতরে বেশ অব্যাহত ভাবে প্রকাশিত হয়।"

এই উদ্‌ধৃতিটিতে কবির আত্মপ্রকাশের প্রেরণা রূপে ইন্দিরাদেবীর যে চিত্র আঁকা হয়েছে তার জন্য চিরকালের মতো তিনি শুধু যে গৌরবান্বিতা হয়েছেন তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের অগণিত ভক্ত পাঠকের তিনি গভীরতম কৃতজ্ঞতাভাজনও হয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রগৌরবে গৌরবান্বিতা, বিশ্বের অগণিত পাঠকের অন্তরতম কৃতজ্ঞতার পাত্রী এই নারীর মনে তাঁর এই অসামান্যতার জন্য কখনও ন্যূনতম অভিমানও ছিল না। এই হয়তো তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব।

রবীন্দ্রপ্রতিভার ঘনিষ্ঠসান্নিধ্যের পরিণত ফল রূপে প্রবীণা ইন্দিরাদেবীকে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। একটি নীরব তপশ্চর্যার মতো তিনি তখন গুরুদেবের উত্তরাধিকার বহন করছিলেন। শান্তিনিকেতনে আসার অল্প কিছুদিন পরে ওঁর স্বামী প্রথম চৌধুরীর মৃত্যু হয়। এই বিয়োগব্যথা বুঝি তাঁর চরিত্রে একটি নিঃসঙ্গতা দান করেছিল। নিয়তির নির্দেশে তাঁর দুটি প্রিয়তম ব্যক্তির একজনের জন্মদিন ও একজনের মৃত্যুদিনের আনন্দ ও বেদনাকে তাঁর একসঙ্গেই বহন করতে হয়েছিল। গুরুদেবের প্রয়াণের দিবস বাইশে শ্রাবণ ছিল প্রথম চৌধুরী মশায়ের জন্মদিন। বাইশে শ্রাবণের মন্দিরের উপাসনা থেকে ফিরে স্বামীর পুষ্পশোভিত প্রতিকৃতির সামনে তাঁকে নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে দেখেছি। আনন্দবেদনার অতীত সেই মূর্তিটি ইন্দিরাদেবীর জীবনের শেষ পরিচয় বহন করছে। ধনীর দুলালী ইন্দিরাদেবীর শেষজীবন দারিদ্র্যের মধ্যেই কেটেছে। কিন্তু অন্তরের প্রসন্নতায় সে দারিদ্র্য মধুর। কবি পূর্বজীবনে তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন 'দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তিনিকেতনে'। কবিহীন শান্তিনিকেতনের অনেকাংশে স্থূল পরিবেশের মধ্যে ইন্দিরাদেবী এই 'অন্তরের শান্তিনিকেন'টিকে বহন করে এনেছিলেন।

রবীন্দ্রসংগীত এবং রবীন্দ্রভাবধারার তন্ময়তায় তাঁর শেষজীবনটি একটি গভীর প্রণতির মতো ফুটে উঠেছিল। 'নটীর পূজা' নাটকের শ্রীমতীর মতো এ তন্ময়তার মধ্যেও কোনো একক অধিকারের অভিমান ছিল না। শ্রীমতীর মতো তিনিও যেন বলতে পেরেছিলেন, 'তিনি যদি আমার অন্তরে পা রাখেন তাতে কি আমার গৌরব, না তাঁরই।' রবীন্দ্রচর্যা তাঁর জীবনধারণের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল বলেই হয়তো বুদ্ধদেব সম্বন্ধে শ্রীমতীর এই উক্তিটিও তাঁর মুখে এমনি মানত : 'তাঁর জন্মে আমরা সবাই জন্মেছি। আজ আমাদের সবারই জন্মোৎসব।'

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর তাঁর প্রতিভার বিচিত্র কিরণজাল বিভিন্ন আশ্রয়কে অবলম্বন করে আমাদের চোখের সামনে সুদূর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে কিছুকাল যেন অপেক্ষা করে ছিল। ইন্দিরাদেবীর বিয়োগে বুঝি 'শেষ রবি-রেখা'টিও অন্তর্হিত হল। কিন্তু একটি অমূল্য উত্তরাধিকার তিনি আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। শ্রীমতীর মৃত্যুর পর রানী লোকেশ্বরী বলেছিলেন, 'তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি। এ আমার।'

ইন্দিরাদেবীকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথ একটি ভূষণের আশীর্বাদ দিয়ে গিয়েছিলেন—

আমার এ গান যেন সুদীর্ঘ-জীবন
তোমার বসন হয়, তোমার ভূষণ।

রবীন্দ্রভাবধারার এই বসনভূষণের উত্তরাধিকার ইন্দিরাদেবী আমাদের হাতেই দিয়ে গিয়েছেন। রানী লোকেশ্বরীর মতো আমরাও যেন বলবার যোগ্য হই, ‘এ আমার’।

মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু : ৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮–১৯৪৬)। মৃত্যুতারিখ ৭ অগস্ট : ২২ শ্রাবণ

অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬ - ১৯.৮)

কালীমোহন ঘোষ (১৮৮২ - ১৯৪০)

ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৭৯ - ১৯৬০)

বিধুশেখর শাস্ত্রী (১৮৭৮ - ১৯৬০)

সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮২ - ১৯০৪)

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭২ - ১৯৪০)

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৪৮, গ্রে ষ্ট্রীট

১

২৪শে ফাল্গুন [১৩০৬]

সুহৃদ্বরেষু,

ছবি কয়েক দিন হইল পাইয়াছি, চিঠি আজ পাইলাম। একখানি নূতন ছবি হইলে ভাল হইত, আপনি কলিকাতায় অত দিন থাকিবেন জানিলে তুলাইয়া লইতাম। কিন্তু আমাদের বড় তাড়া, যাহা পাইয়াছি তাহাতেই চালাইতে হইবে।

নিত্য প্রভাতে রবির উদয় এই ত জানি। যদি সে নিয়মের অন্যথা হয় ত রবির নামের সার্থকতা রহিল কি? প্রভাত নামটা বোধ হয় নানা দিক হইতে অর্থযুক্ত হইয়াছে। গল্প কোথায়? পরীক্ষার ভার আমার উপর নাকি? তাহা হইলে অবিলম্বে পাঠাইবেন। পরীক্ষা নিত্য, নিত্য উত্তীর্ণ হইতে হইবে। আপনার কতকগুলি লেখা পাইলে অনেকটা ভরসা হয়। রমেশ বাবু বোম্বে চলিয়া গিয়াছেন। যাইবার পূর্বে লেখা ও ছবি দুই দিয়া গিয়াছেন।

মাঘ মাসের প্রদীপ আজই পাঠাইতে কার্যাধ্যক্ষকে লিখিয়া দিয়াছি। অন্তঃপুরের আদেশ পালন করিতে কোন মতেই বিলম্ব হইতে পারে না।

কাগজ বাহির হইবার পূর্বে একবার আপনার কাছে যাইব। পাবনায় কুটুম্ব একজন আছেন— সেখানেও একদিন যাইবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু কলিকাতা হইতে বাহির হওয়াই কঠিন।

প্রদীপকে শুধু উস্কান কেন, প্রদীপে নূতন সলিতা দিতে হইবে। দুই চারি মাস বোধ হয় সময় লাগিবে। গল্পটায় পাঠকরা আঘাত পাইয়া থাকিতে পারেন কিন্তু সম্পাদক খুন হইতে হইতে বাঁচিয়াছেন।· ·

আমি শূন্য ঘরে—অঁধেরেমে ঘট্‌তা হয় দিল্ মেরা—যাঁহাকে লইয়া ঘর তিনি ময়মনসিংহে। এই অবস্থায় যেমন কুশলে থাকা যায় সেইরূপ আছি।

আপনার বন্ধুবান্ধবদের চিঠিপত্র লিখিতেছেন ত? যিনি যেটুকু পারেন যেন সহায়তা করেন।

ভবদীয়

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৪৮ গ্রে ষ্ট্রীট

২

সোমবার

প্রিয়বরেষু,

আপনি আমাকে লজ্জা দিয়েছেন। বয়সের হিসাবে অধৈর্য্য দোষের স্বীকার করি। কিন্তু যে দায়গ্রস্ত তাহার ধৈর্য্য কেমন করিয়া থাকিবে? প্রসারিত হাত কিছু না পাইলে চাঞ্চল্য যাইবে না।

প্রদীপে তৈলদান স্বরূপে আপনাকে ডাকিতেছি—পতঙ্গবৎ কেন? অবশেষে নির্বাণোন্মুখ প্রদীপে

কিছু তৈল দানং না হয়। তবে ভারতী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার উপর কোন কথা নাই। অর্ঘ্যভাগের দাবী করিতে পারিনা, কিন্তু দুই চারিটা উড়ো খই প্রদীপকে নমঃ বলিয়া দিবেন না ?

আর একটা অনুরোধ। মাঝে মাঝে প্রদীপ সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে যদি আপনার অভিমত আমাকে লিখিয়া পাঠান ত আমার নিজের বড় উপকার হয়। আমি এ কার্য্যে নবদীক্ষিত, আপনি প্রবীণাচার্য্য।

বিরহের অবস্থা সেইরূপ। একটা গুরুতর রকম বিরহোচ্ছ্বাসের ইচ্ছা প্রবল কিন্তু অবকাশ হয় না।

আপনার তটিনীকলমুখরিত পল্লীভবনের বড় প্রলোভন দেখাইয়াছেন। সে প্রলোভনও আমাকে স্মরণ করিতে হইতেছে।

ভবদীয়
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৩

বান্দোরা
বোম্বাই
২৩শে মার্চ ১৯৩২

প্রিয়বরেষু,

এবার এলাহাবাদে গিয়ে জানতে পারলুম Sheaves তোমাকে পাঠানো হয়নি। একখানি এখন পাঠাই। Sheaves আমেরিকায় ম্যাকমিলানও ছেপেছে। তোমাকে পাঠিয়েছে কি ? না পেয়ে থাক তাহলে আমি পাঠিয়ে দেব।

তোমার আর কতকগুলি কবিতা Lays & Lyrics নাম দিয়ে আমি তর্জমা করেছি। সে সম্বন্ধে ম্যাকমিলানের সঙ্গে লেখালেখি হয়েচে। সেখানিও তারা ছাপছে।

মাস নয় দশ আমি কিছুই করতে পারিনি। প্রথমে আমার অসুখ, তারপর আমার ছোটছেলের কঠিন ব্যারাম। এলাহাবাদ থেকে তাকে পাহাড়ে পাঠিয়ে আমি এখানে ফিরে এসেছি। তোমার নতুন কোন বই যদি তর্জমা না হয়ে থাকে তাহলে আমি না হয় একবার চেষ্টা করি। আমার নিজের লেখা বইও ম্যাকমিলানরা দেখতে চেয়েছে।

এখন তোমার শরীর সুস্থ ত ?

তোমাদের
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পত্র ১ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অবসর-গ্রহণান্তে নগেন্দ্রনাথ 'প্রদীপ'-সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ফাল্গুন ১৩০৬ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭— এই চার মাস নগেন্দ্রনাথ 'প্রদীপ' সম্পাদনা করেন। ১৩০৭ সালের প্রথম দিকে নগেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'প্রভাত' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। —দ্র° সাহিত্যসাধকচরিতমালা ৬৬ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্র ২ ১৩০৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় ও আশ্বিন সংখ্যা 'প্রদীপ 'পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের যথাক্রমে এই দুইটি গল্প প্রকাশিত হয় : 'সদর ও অন্দর' এবং 'শুভদৃষ্টি'। —দ্র° শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর "রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প" গ্রন্থের পরিশিষ্টে শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কৃত তথ্যপঞ্জী।

পত্র ৩ *Sheaves* : Poems and Songs by Rabindranath Tagore, Selected and Translated by Nagendranath Gupta। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থারম্ভে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিত Rabindranath Tagore : the Man and the Poet শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধ সংযুক্ত।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৬১ - ১৯৪০

রথীন্দ্রনাথ রায়

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম বন্ধু ও গুণগ্রাহী সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সাংবাদিকতা ও সাহিত্যসাধনার ইতিহাস আজ একটি বিস্মৃতপ্রায় কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। প্রায় ষাট বছরের সুদীর্ঘ সাহিত্যসাধনায় তিনি বাংলা সাহিত্যকে বিচিত্র রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। সে যুগের পত্রপত্রিকার অন্তরালে নগেন্দ্রনাথের ইংরেজী-বাংলা বহু রচনা আত্মগোপন করে আছে। সেকালে তিনি কথাশিল্পী হিসাবেই প্রধানত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে প্রথম যুগের ছোটগল্প-লেখকদের মধ্যেও নগেন্দ্রনাথ অন্যতম।[১] কথাসাহিত্য ছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও তাঁর স্বচ্ছন্দ-সঞ্চরণ লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যসাধনার প্রথম পর্যায়ে তিনি কবিতাও লিখেছেন। কিন্তু 'স্বপন-সঙ্গীত' (১৮৮২) ছাড়া আর-কোনো কাব্য-সংকলন প্রকাশিত হয় নি। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, সাহিত্যসমালোচনা, সরস লঘু রচনা ও বহু সাময়িক প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁর উৎসাহ ছিল। বিদ্যাপতির পদাবলী ও রামেশ্বরের 'সত্যপীরের কথা' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ইংরেজি রচনাতেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পরিণত বয়সে তিনি নিজের ও সমকালীনদের যে স্মৃতিকাহিনী রচনা করেছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য আজ অবশ্যস্বীকার্য।[২]

নগেন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার ইতিহাস আলোচনা করতে হলে তাঁর জীবনীর দু-একটি সূত্রের সন্ধান নিতে হবে। তাঁর পিতা মথুরানাথ বিহারে সবজজ ছিলেন। তাই তাঁর বাল্য ও কৈশোর কাটে বিহারের বিভিন্ন স্থানে। নগেন্দ্রনাথের কর্মজীবনও বিচিত্র। বাইশ-তেইশ বছর বয়সেই তিনি করাচির 'ফিনিক্স' পত্রিকার সম্পাদক হন। সাত বছর পর তিনি সিন্ধুদেশ পরিত্যাগ করে লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রের সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৯ সালে 'ট্রিবিউন' ছেড়ে তিনি পাঁচ বছর কলকাতায় ছিলেন। এই সময়ে তিনি 'প্রদীপ' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। একই সময়ে তিনি 'প্রভাত' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। ১৯০৫ সালে তিনি এলাহাবাদের 'ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল্' সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদনাভার গ্রহণ করার জন্য আহূত হন। চার বছর পর 'ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল্' যখন দৈনিক 'লীডারে'র সঙ্গে সম্মিলিত হয় তখন তিনি যুগ্মসম্পাদক রূপে পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি

---

১ 'ভারতী' পত্রিকার চল্লিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছিলেন: "ভারতীর অষ্টম বর্ষে অর্থাৎ ১২৯১ সালে রবীন্দ্রনাথের "ঘাটের কথা" বাহির হয়। তাহার ভিতরে ছোটগল্পের যথেষ্ট লক্ষণ আছে। পর বৎসরে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের 'সুলোচনা' একটি চমৎকার ছোট গল্প। তাহার পর অন্য কোন মাসিকপত্রে ছোটগল্প বাহির হইবার আগে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতির ছোটগল্প "ভারতী"তে বাহির হইয়াছে।"— ভারতীর ইতিহাস, বৈশাখ ১৩২৩।

২ রচনাগুলি ১৯২৭-৩০ মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখকের মৃত্যুর সাত বছর পর *'Reflections and Reminiscences'* নাম দিয়ে বোম্বাই থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে বহু অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য আছে।

দ্বিতীয় বার 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় যোগ দেন। কিছুকাল তিনি লাহোরের 'পঞ্জাবী' পত্রেরও সম্পাদক ছিলেন।[৩]

বাংলাদেশের বাইরে সাংবাদিক হিসাবেই নগেন্দ্রনাথের খ্যাতি ছিল, কিন্তু বাংলাদেশে তাঁর খ্যাতি প্রধানত সাহিত্যিক হিসাবেই। অল্পবয়স থেকেই তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা বিকশিত হয়। কবি বিহারীলালের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সতীর্থ। নগেন্দ্রনাথের খুল্লতাত-পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর স্মৃতিকাহিনীতে বলেছেন, "মেজদার সঙ্গে প্রিয়বাবুর বাড়ী অনেকবার গেছি। মেজদা তাঁর কাছ থেকে কত বই যে এনে পড়তেন তার আর ঠিকানা নাই। মেজদার পড়ার বাইটা অসামান্য ছিল।··আর এই সময় অনেকবার জোড়াসাঁকোর রবিবাবুদের বাড়ী যেতেন। আমি প্রায়ই তাঁর সঙ্গে যেতাম। মেজদা ও রবিবাবুর খুব বন্ধুত্ব ছিল।"[৪] রবীন্দ্রনাথের বিবাহে যে কজন বিশিষ্ট বন্ধু উপস্থিত হয়েছিলেন, নগেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম।[৫] 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সে কালে যে সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, নগেন্দ্রনাথ তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সাবিত্রী লাইব্রেরির বিভিন্ন অধিবেশনেও তিনি উপস্থিত থাকতেন। তাঁর রসবোধের উপর রবীন্দ্রনাথের কতখানি আস্থা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নগেন্দ্রনাথেরই একটি উক্তি থেকে :

Rabindranath frequently read out his freshly composed poems to come. Once he brought out one of his best known dramas, which he had just written, and we read it together. The final incident of the play did not seem to me to be in keeping with the spirit of the drama and I told him so. He said his 'Bara Dada' was of the same opinion, and he changed the concluding part before sending the manuscript to the press.[৬]

২

'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকা অবলম্বন করেই নগেন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ফিনিক্স পত্রিকার সম্পাদনাভার নিয়ে যখন তিনি করাচিতে যাত্রা করেন, তখনও পত্রিকা-দুটির সঙ্গে তাঁর সংযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়ে উক্ত দুটি পত্রিকায় তাঁর অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর যে দুখানি চিঠি প্রকাশিত হয় তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথই আলোচনার সূত্রপাত করেন তাঁর 'বর্ষার চিঠি'[৭] চিঠিখানিতে :

---

৩ নগেন্দ্রনাথের জীবনীর মূলসূত্রগুলি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৬৬সংখ্যক গ্রন্থ ও নগেন্দ্রনাথের স্মৃতি-কাহিনী থেকে গৃহীত হয়েছে।

৪ সাহিত্যসাধক-চরিতমালা ৬৬, পৃ: ৬৬-৬৭ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫ "I was present at Rabindranath's marriage. He sent me a characteristic invitation in which he wrote that his intimate relative Rabindranath Tagore was to be married." —*Reflections and Reminiscences*, p. 62. একই চিঠি প্রিয়নাথ সেনও পেয়েছিলেন। ব্লক করা পত্রখানি ১৩৫০ সনের বৈশাখ মাসের বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৬ *Reflections and Reminiscences*, p. 62.

৭ বালক, শ্রাবণ ১২৯২।
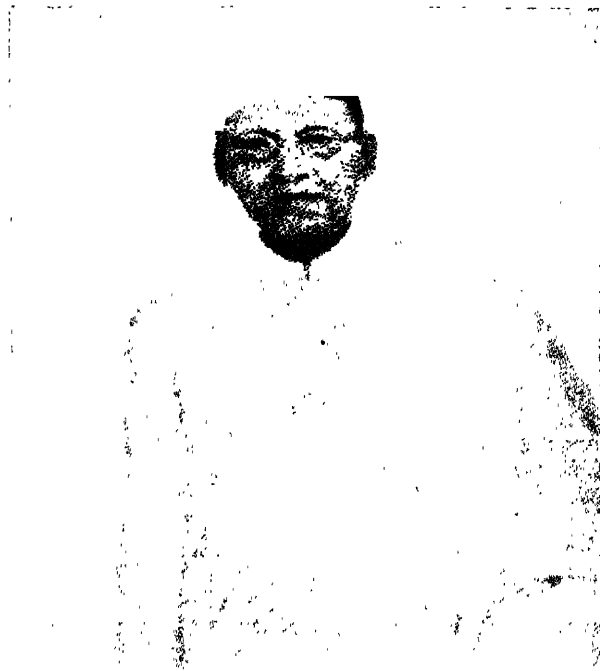
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

"সুহৃদ্বর, আপনি ত সিন্ধুদেশের মরুভূমিতে বাস করচেন। সেই অনাবৃষ্টির দেশে বসে একবার কলকাতার বাদ্‌লাটা কল্পনা করুন।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যময় ভাষায় বাংলাদেশের বর্ষার একটি অপরূপ ছবি এঁকেছেন। পরের মাসেই নগেন্দ্রনাথ চিঠিখানির উত্তর দিয়েছিলেন। তাঁর গদ্যরীতি যে কতখানি সহজ ও স্বচ্ছন্দ তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বন্ধুর জিজ্ঞাসার উত্তরে লিখেছেন, "দেশের বর্ষা মনে পড়ে বই কি! চারিদিকে সব ভিজে ভিজে, মনটার যেন ভিজে ভিজে ভাব। বাড়ীর উঠানে শ্যাওলা, দেওয়ালের রং ধুয়ে আর এক মূর্তি ধারণ করেছে। ঘরের ভিতর জিনিষপত্রগুলতে ছাতা ধরেছে, বাড়ীর ঝি বউ, ছেলেপিলে, দাসদাসী আনাগোনা করতে দুমদাম্ করে আছাড় খাচ্চে, তারপর চুন-হলুদের পালা!"[৮] বাংলাদেশের বর্ষাচিত্রের এই নিপুণ বর্ণনার পর তিনি করাচির সমুদ্রতীরের বর্ণনা দিয়েছেন।

নগেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আছে চিঠিখানির শেষাংশে। কলকাতা ও করাচির দৃশ্যপট বর্ণনার পর তিনি বর্ষার যে ভাবরূপ আবিষ্কার করেছেন, তাতে তাঁর সৌন্দর্যমুগ্ধ গভীরাশ্রয়ী কবিমন এক নিবিড় রসানন্দে উদ্ভাসিত হয়েছে। আলোচ্য পত্রাংশটি উদ্ধৃতির যোগ্য—

"বর্ষার সময়টা সব কিছু ঘরের ভিতর আসে। রূপকথা বর্ষার সময় শুনিতে যেমন ভাল লাগে এমন আর কোন সময় নয়। আপনার যা কিছু আছে বর্ষার কাছে আনিতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে সবাই মিলিয়া ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া ঘরের ভিতর বসিয়া বাহিরে বৃষ্টি দেখি। প্রবাসী বর্ষাপ্রারম্ভে ঘরে ফিরিবে, কতকাল ধরিয়া এ নিয়ম রহিয়াছে। বসন্তের বিচ্ছেদ কবিরা বলেন গুরুতর, কিন্তু বর্ষার বিচ্ছেদ আরও কঠিন। একটা গান আছে: 'সঁইয়া ঘর না আয়ে বরষ গয়ে বদরা'। 'সঁইয়া' কি শুধু প্রণয়ী! আমার তো এমন বোধ হয় না। নইলে সঁইয়া কাছে থাকিলেও বর্ষার সময় ঘরে ফিরিতে ইচ্ছা করে কেন? তা নয় 'মেঘলোকে ভবতি সুখিনোপ্যথাবৃত্তি চেতঃ'। যে যেখানে আপনার কাছে সকলকে একত্রে জড় করিতে ইচ্ছা করে, সকলে বসিয়া ছেলেবেলাকার গল্প করিতে ইচ্ছা করে, কে কয়বার বৃষ্টিতে স্নান করিয়াছিল, কে কয়বার শিল কুড়াইয়া খাইয়াছিল, কে কয়বার আছাড় খাইয়াছিল, তাহার হিসাবে আবার নূতন করিয়া করিতে ইচ্ছা করে।"[৯]

'বালক' পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথের আর-একখানি চিঠি প্রকাশিত হয়। সেই চিঠিতে সিন্ধুদেশের প্রকৃতিচিত্র ও 'লোকাল্ কালার' বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।[১০] নগেন্দ্রনাথ ইংরেজি বাংলায় রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনাও করেছেন। Rabindranath Tagore: The Man and the Poet প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা।[১১] এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটির প্রথমার্ধে তিনি রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে তিনি 'উর্বশী' কবিতা অবলম্বন করে রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি মূলসূত্রের সংকেত দিয়েছেন। উর্বশীর পৌরাণিক উপাখ্যানকে কবি কিভাবে নবরূপ দিয়েছেন, তাও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতার ইংরেজি অনুবাদের মধ্যেও অনুবাদকের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুবাদটি শুধু মূলানুগই নয়, মূল

৮ প্রবাসের চিঠি: বালক ১২৯২ ভাদ্র।

৯ পূর্বোল্লিখিত পত্র।

১০ করাচির চিঠি: বালক ১২৯২ মাঘ।

১১ Modern Review, July, 1927.

বাংলা কবিতার ছন্দ ও ধ্বনিও এখানে অনেকখানি রক্ষিত হয়েছে। কবিতাটির অনুবাদ যে কত স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল তা একটি উদাহরণ থেকেই উপলব্ধি করা যায়:

Like a flower without a stem blooming in itself,
    When didst thou blossom Urvasi?
Out of the churned sea thou didst rise
        in the primal spring-morn
With the chalice of ambrosia in thine right hand,
        the poison cup in thy left ;
Like a serpent charm-stilled the mighty
        ocean wave-tost
Sank at thy feet bending its million having hoods
        In obeisance.
White as the *Kunda* flower, in beauty undraped,
        the lord of the Gods bowing before thee
                Fair Art thou![১২]

নগেন্দ্রনাথ বৈষ্ণবকাব্যের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তিনি বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদনা করেন (১৯০৯)। একাধিক রচনায় তিনি বৈষ্ণবকবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের ভাবসংযোগের কথা আলোচনা করেছেন। একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "কিশোর বয়সে, তাঁহার [রবীন্দ্রনাথের] প্রতিভার উন্মেষের প্রথম অবস্থাতেই তিনি বৈষ্ণব কবিতার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। বটতলার পুঁথি লইয়াই তিনি পদকল্পতরু পড়িতে আরম্ভ করেন। মধুসূদন দত্ত 'মাতৃভাষারূপ খনি পূর্ণ মণিজালে' পাইয়া ইংরেজি রচনার ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যের জহুরি। তিনি চিনিয়াছিলেন খনির সর্বশ্রেষ্ঠ মণি বৈষ্ণব কবিতা।"[১৩]

পরিণতবয়সে নগেন্দ্রনাথ 'প্রভাত' নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই পত্রিকার অন্যতম লেখক ছিলেন।[১৪] এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্প ও দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।[১৫] চন্দ্রনাথ বসু ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যখন বাদানুবাদ শুরু হয় তখন নগেন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথের পক্ষেই লেখনী ধারণ করেছিলেন। ১২৯৯ সালের শ্রাবণ মাসের সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং

১২ 'উর্বশী' কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদ।

১৩ রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতা: প্রবাসী ১৩০৯ আষাঢ়।

১৪ "Among my contributors were Romesh Chandra Dutt and Rabindranath Tagore"

১৫ বন্ধুর আগ্রহে ও অনুরোধে দুটি প্রবন্ধও দিয়াছিলেন— 'তৈলাক্ত শিরে তৈল সেক' (? শ্রাবণ) ও 'চুম্বক কৌশল' (ভাদ্র)। আমাদের মতে এই 'প্রভাত' কাগজে কবির তিনটি গল্পও প্রকাশিত হয়। সেই তিনটি গল্প হইতেছে 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'উলুখড়ের বিপদ' ও 'প্রতিবেশিনী'। — রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড, ১৩৬৭, পৃ ৪৪৯: শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়,

ছট্' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। নগেন্দ্রনাথ এই কবিতাটি সম্পর্কে লিখেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথবাবু কি মনে করিয়া এই কবিতা লিখিয়াছিলেন, জানি না। চন্দ্রনাথবাবু কি বুঝিয়াছিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু অনেকেই বুঝিয়াছে যে, এই বিদ্রূপ ও ঘৃণাপূর্ণ কবিতার লক্ষ্য চন্দ্রনাথবাবু।··এরূপ লেখা তাঁহার উচিত হয় নাই।[১৬] রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের উত্তর দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, "হিং টিং ছট্ নামক কবিতায় আমি যে চন্দ্রনাথবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিয়াছি ইহা কাহারও সরল অথবা অসরল কোন প্রকার বুদ্ধিতে কখন উদিত হইতে পারে, তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।"[১৭]

নগেন্দ্রনাথের রচনাবলীর বৈচিত্র্য কম নয়। কবিতা উপন্যাস ছোটগল্প নাটক রসরচনা ও বিবিধ গন্থরচনা, সাহিত্যের নানা বিভাগেই তিনি স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু সে যুগে তিনি কথাশিল্পী হিসাবেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী বন্ধু হলেও নগেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রযুগের কথাসাহিত্যিক বলা যায় না। চরিত্রধর্মের দিক থেকে তাঁর উপন্যাসগুলি বঙ্কিমপর্বেরই অনুগত। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক রোমান্সের বর্ণবৈচিত্র্যে বাঙালির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে নূতন ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করে তুললেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধানত দুটি লক্ষ্য ছিল। তাঁর ইতিহাস-সচেতন মন সে যুগের স্বল্প ঐতিহাসিক উপকরণের মধ্যেও সত্যানুসন্ধান করেছিল। দ্বিতীয়ত, বাঙালির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে ইতিহাসের চঞ্চল প্রবাহ সঞ্চারিত করে তার মধ্যে বৈচিত্র্য ও গতিবেগ এনেছিলেন। পারিবারিক জীবনের সঙ্গে ঐতিহাসিক রোমান্সের সমন্বয় করে তিনি বাংলা উপন্যাসে এক নূতন সম্ভাবনার সূত্রপাত করেছিলেন। তাঁর সামাজিক উপন্যাসের মধ্যেও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও অন্তর্জীবনচিত্রণ প্রধান স্থান অধিকার করেছে। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের একটি তৃপ্তিদায়ক ফর্ম বঙ্কিমচন্দ্রের কাছেই প্রথম পাওয়া গেল।

বঙ্কিম-অনুবর্তী ঔপন্যাসিকেরা বঙ্কিমচন্দ্রের ধারাকেই প্রধানত মেনে চলার চেষ্টা করেছেন। কদাচিৎ তাঁদের রচনায় মৌলিকতা প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিম-উপন্যাসের অক্ষম অনুকরণ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও প্রায় পঁচিশ বছর অব্যাহত থাকে। বঙ্কিম-অনুবর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, দামোদর মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত— প্রমুখ ঔপন্যাসিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে, কিন্তু সাধারণ ধর্মের দিকে অনেকখানি মিল পাওয়া যায়।

নগেন্দ্রনাথের উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। এই যুগের ঔপন্যাসিকেরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামে সুলভ রোমান্টিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন। অতিরিক্ত রোমান্স-প্রবণতা, আকস্মিকতা, অতিনাটকীয়তা, গোয়েন্দা-কাহিনী-সুলভ ঘটনার অনাবশ্যক জটিলতা এ যুগের উপন্যাসের কয়েকটি দুর্লক্ষণ। সামাজিক উপন্যাসও রেহাই পায় নি। সমাজ-জীবনের সঙ্গে অলৌকিক ও উদ্ভট কাহিনী মিশিয়ে রোমান্স-রস পরিবেশন করা

---

১৬ তর্কবৈচিত্র্য : সাহিত্য ১২৯৯ ফাল্গুন।

১৭ রবীন্দ্রবাবুর পত্র : সাহিত্য বৈশাখ ১৩০০। ১২৯৯ সালে চৈত্র মাসের সাধনায় কবি এ সম্পর্কে আর একবার জবাব দিয়াছিলেন।

হয়েছে। বাস্তবজীবনের সহজ রূপটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে নি। খুন-জখম ও ঘটনাবহুল রোমাঞ্চকর কাহিনী সামাজিক উপন্যাসকে বাস্তবধর্মী ও স্বাভাবিক হতে দেয় নি। তা ছাড়া নীতিধর্ম ও আদর্শ সম্পর্কে সুদীর্ঘ বক্তৃতা অধিকাংশ উপন্যাসকে ভারাক্রান্ত করেছে।

নগেন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস পর্বতবাসিনী (১৮৮৩)। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। সম্ভবত মহারাষ্ট্র অঞ্চলের কোনো জনশ্রুতি অবলম্বন করে কাহিনীটি রচিত হয়েছে। মূল আখ্যায়িকার সঙ্গে ভূমিকা হিসাবে 'আভাস' অংশটি সংযোজিত হয়েছে। পার্বত্য পথে একজন বিদেশী পর্যটককে একজন পর্বতবাসী পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। পর্বতবাসীই বিদেশীকে তারাবাইয়ের প্রেতাত্মা দেখিয়েছে: "আমরা গল্প শুনিয়াছি, সে ঐ পাহাড়ে বাস করিত। অদ্যাবধি তাহার প্রেতাত্মা বিচরণ করে।" কিন্তু মূল কাহিনীর সঙ্গে বিদেশী পথিক বা পর্বতবাসীর কোনো যোগ নেই— এমনকি মূল কাহিনী উত্তমপুরুষেও বর্ণিত হয় নি।

তারাবাই রঘুজী শম্ভুজী ও গোকুলজী— প্রধান চরিত্রগুলির কেউই জীবন্ত হয়ে ওঠে নি। তারাবাই কাহিনীর নায়িকা, কিন্তু তার চরিত্রে সংগতির অভাব আছে। তার পুরুষোচিত দৃপ্তভঙ্গি, নিষ্ঠুরতা, প্রতিহিংসাস্পৃহা ও প্রণয়াবেগের মধ্যে সন্তোষজনক সমন্বয় অনুপস্থিত। রঘুজী-চরিত্র সবচেয়ে অস্বাভাবিক, সে যেন মূর্তিমান নিষ্ঠুরতা। কোনো মানবীয় অনুভূতি তার চরিত্রে নেই। এমনকি একমাত্র মাতৃহারা কন্যা তারার প্রতিও সে একাধিকবার কারণে অকারণে নির্মম ব্যবহার করেছে। এর কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই— নির্মমতার জন্যই নির্মমতা। তারাবাই-গোকুলজীর প্রেমকাহিনীও রোমাঞ্চকর ঘটনাবহুলতায় আচ্ছন্ন। হৃদয়-বিশ্লেষণের চেয়ে বাইরের ঘটনারই প্রাধান্য। মহাদেব ও মায়ীর চরিত্র অপ্রধান হলেও জীবন্ত।

নবম পরিচ্ছেদে তারার স্বপ্নকাহিনী উপন্যাসটিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। নির্বাসিতা তারা নিদ্রিতাবস্থায় তার অশুভ ভাবী জীবনের নির্মম পরিণতি দেখেছে। শৈলশিখরের তুষারচক্ষু জটাধারী মহাকায় পুরুষ ও তুষারনয়না সপ্ত পাষাণসুন্দরীর অমোঘ নির্দেশ নববিবাহিতা তারার জীবনকেও এক রহস্যগূঢ় মৃত্যুশীতল পাষাণতটে নিক্ষেপ করেছে। 'কপালকুণ্ডলা' 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্ন-কাহিনীর অবতারণা করেছেন। কপালকুণ্ডলা ও কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন তাদের ভাবী পরিণতিরই অশুভ ইঙ্গিত দিয়েছে। কিন্তু দু' ক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্নকাহিনীকে শুধু বহির্ঘটনা হিসাবেই স্থাপিত করেন নি, ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে স্বপ্নকাহিনীর একটি নিগূঢ় সংযোগ দেখিয়েছেন।[১৮] কিন্তু তারাবাইয়ের স্বপ্নটি নিতান্তই বাইরের ঘটনা। এর সঙ্গে তার মনোজীবন বা ঘটনাবৃত্তের কোনো যোগ নেই। পর্বতবাসিনী তারার মনোবিকার ও পার্বত্য প্রদেশের ভীষণ-রমণীয় বর্ণনা চন্দ্রশেখর উপন্যাসের শৈবলিনীর নরকদর্শন অধ্যায়গুলির প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত।

---

[১৮] কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনামায় বঙ্কিমচন্দ্র বায়রন থেকে একটি চরণ উদ্ধার করেছেন—
"I had a dream which was not at all a dream."

৪

নগেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস 'অমরসিংহ' (১৮৮৯) সিপাহী-বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে। প্রথম উপন্যাসের চেয়ে দ্বিতীয় উপন্যাসে তিনি অনেকখানি পরিণত শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম উপন্যাসটির আশ্রয় বিশুদ্ধ রোমান্স, চরিত্রগুলি প্রাণহীন কাঠের পুতুল। কিন্তু দ্বিতীয় উপন্যাস সম্পর্কে ঠিক সে কথা বলা যায় না। সে যুগের জনশ্রুতি-কিংবদন্তী-জড়িত ঐতিহাসিক বিবেকবর্জিত রোমান্টিক কাহিনীগুলির তুলনায় 'অমরসিংহ' উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। স্থানীয় জনশ্রুতি ও উপকথা অবলম্বন করে কাহিনীর কোনো কোনো অংশ রচিত হলেও মূল কাহিনীর কাঠামোর সঙ্গে ইতিহাসের খুব বেশি পার্থক্য নেই। নগেন্দ্রনাথ বাল্য-কৈশোরে আরায় যে বাড়িতে ছিলেন, সে বাড়ি ছিল সিপাহী-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা বাবু কুমার সিংহের।[১৯] উপন্যাসটির উপকরণ ও পরিকল্পনা সম্পর্কে লেখক যা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য :

Most enthusiastic were the stories about Amar Singh, a younger brother of Babu Kumar Singh. . . He was in the habit of neglecting his position and family and wandering about in the company of sadhus. But the mutiny made him a hero, and his dash and élan in every fight were recounted with epic fervour. According to every account that I heard, Amar Singh performed prodigies of valour, and escaped to Nepal when the mutiny was suppressed. The exploits of Amar Singh so impressed my youthful imagination that several years later I wrote a story in Bengali of the Mutiny bearing his name.[২০]

উদ্ধৃত অংশটি থেকে 'অমরসিংহ' উপন্যাসের স্বরূপ-ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক সুকৌশলে ঐতিহাসিক ঘটনাবর্তের সঙ্গে জনশ্রুতি ও কাল্পনিক কাহিনীর সমন্বয় করেছেন। সেই প্রবল রাষ্ট্রবিপ্লবের তরঙ্গোচ্ছ্বাস শুধু জগদীশপুরেই নয়, শাহাবাদ জেলায় তথা সমগ্র বিহারে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তার একটি জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। পঞ্চম পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক সিপাহী-বিদ্রোহের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন তাতে সুলভ ভাবোচ্ছ্বাসের লেশমাত্রও নেই। সিপাহী-বিদ্রোহ সম্পর্কে তিনি বিশ্লেষণী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। সিপাহী-বিদ্রোহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "সিপাহী-বিদ্রোহের মূলে স্বদেশানুরাগ বা অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য দেখা যায় না। সিপাহীরা পিশাচের ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল, যুদ্ধধর্ম প্রতিপালন করে নাই। বৃদ্ধ, রমণী, বালক যাহাকে পাইত, তাহাকেই হত্যা করিত; শুধু ফিরিঙ্গী নহে, স্বদেশীয়রাও তাহাদের হাতে নিস্তার পাইত না।" সিপাহীদের কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্যও ছিল না: "যাহারা যুদ্ধ করে, তাহারা কেন যুদ্ধ করে তাহা জানে। সিপাহীরা তাহা জানিত না। তাহারা জানিত যে, ইংরাজ নির্মূলে ধ্বংস হইলে দিল্লীর বাদশাহ পুনরায় ভারতবর্ষের সম্রাট হইবেন। দিল্লীর বাদশাহের নামেই তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহারা জানিত না যে, মোগলের সৌভাগ্যসূর্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়াছে।"

---

১৯ "The house in which we lived at Arrah originally belonged to Babu Kumar Singh, the well-known leader of Indian Mutiny in Bihar."—*Reflections and Reminiscences*, Page 16.

২০ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ১৯।

কমিশনার টেলার সাহেবের দুরভিসন্ধিময় প্রস্তাবে কুমার সিংহের ভীষণ শপথ, অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের রোমাঞ্চকর বর্ণনা, আরার উপকণ্ঠে ইংরেজ সৈন্যের শোচনীয় পরাজয়, বিবিগঞ্জে কৃষ্ণবর্মাবৃত অমরসিংহের দুঃসাহসিকতা, লরার সাহায্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠি থেকে তার পলায়ন, জগদীশপুরের অরণ্যে কুমারসিংহের মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনা লেখকের বর্ণনাকৌশলে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক ঘটনার এই বেগদৃপ্ত প্রবাহের মধ্যে পারিবারিক জীবন সহজেই গৌণ হয়ে পড়ে। কিন্তু অমরসিংহের পারিবারিক জীবনের যেটুকু পরিচয় আছে তা যেমন সুকুমার তেমনি রসোজ্জ্বল। রাণী, লছুমী ও ইংরেজ তরুণী লরা— এই তিনজন নারীর জীবন অমরসিংহকে অবলম্বন করেই আবর্তিত হয়েছে। বিধবা লছুমীর দৈবাহত চরিত্রটি হৃদয়কে স্পর্শ করে। তার চোখের সম্মুখে প্রেমের যে উৎসব চলেছে সেখানে তার প্রবেশাধিকার নেই। অমরসিংহের প্রতি তার মনোভাবকে লেখক বিশ্লেষণ করেন নি, একটি অস্পষ্ট বাসনার মধ্যেই নিবদ্ধ রেখেছেন। লরার নীরব ভালোবাসা প্রেমের সমুন্নত মহিমায় উজ্জ্বল। ফুলশাহের অলৌকিক ক্ষমতা ও বাঁশুরিয়া বাবার রহস্যময় বংশীধ্বনি উপন্যাসটির মধ্যে রোমাঞ্চরস সঞ্চারিত করেছে। অমরসিংহ উপন্যাসে লেখক পরিণত শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

নগেন্দ্রনাথের তৃতীয় উপন্যাস 'লীলা' (১৮৯২) সে যুগে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[২১] উপন্যাসটির মধ্যে কোনো কেন্দ্রসংহতি নেই। লীলার নামানুসারে উপন্যাসের নামকরণ হলেও তাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা যায় না। সুরেশচন্দ্র-কিরণবালার দাম্পত্য জীবন ও ঘরগৃহস্থালীর বর্ণনা উপন্যাসের একটি বিস্তৃত স্থান অধিকার করেছে। গণেশচন্দ্রের উপকাহিনীকে অনাবশ্যক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মূল আখ্যায়িকার সঙ্গে তার কোনো সংযোগ নেই। বিধবা লীলার চরিত্রে কোনো বিশ্লেষণ নেই। লীলার নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলিকে সুদীর্ঘ বর্ণনার সাহায্যে ভরে তোলা হয়েছে। এইসমস্ত অংশ উপন্যাসিকের বিশ্লেষণের চেয়ে কবিকল্পনারই অধিকতর অনুগত। মোটকথা, পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথ যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন 'লীলা' উপন্যাসে তার আভাসমাত্র পাওয়া যায় না।

৫

নগেন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'তমস্বিনী' (১৯০১) উপন্যাসটি নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসে লেখক অবৈধ প্রণয়ের একটি উন্মুক্ত বাস্তব মূর্তি উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন। 'তমস্বিনী' উপন্যাসের ঘটনা জটিল। ঘটনার জটিলাবর্তের মধ্যে কাহিনীর কেন্দ্র নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অনেকগুলি 'এপিসোড' এখানে ভিড় করে এসেছে, কাহিনীর দিক থেকে তাই সমগ্রতার অভাব সহজেই চোখে পড়ে। উপন্যাসটির পটভূমিকা উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা। তখনো সম্পন্ন পরিবারের বিশেষ বিশেষ কক্ষ বেলোয়ারি

---

২১ "ভারতীর মধ্যস্থতায় ও সাহায্যে বঙ্গসাহিত্য যেসকল রত্ন লাভ করিয়াছে এবং যেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া সাহিত্য-সমাজে অল্পবিস্তর আন্দোলনের সূত্রপাত অথবা লেখককে সাধারণের সহিত পরিচিত করিয়াছিল, এখানে তাহার একটি অসম্পূর্ণ (সম্পূর্ণ তালিকার স্থানাভাব) তালিকা দিলাম। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বউঠাকুরাণীর হাট, ভগ্নহৃদয়, ভানুসিংহের পদাবলী, চিরকুমার সভা, নষ্টনীড় ও গদ্যে-পদ্যে বিবিধ রচনা। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রায় সমস্ত উপন্যাসই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'লীলা' ও ছোট গল্প।"— হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ভারতীর ইতিহাস প্রবন্ধের পাদটীকা। ভারতী ১৩২৩ বৈশাখ।

ঝাড়লণ্ঠনে আলোকিত হত, মদ্যপান ও বাইনাচ নৈশবিলাসের অঙ্গীভূত ছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিচিত্র ধর্মসংকট উপস্থিত হয়েছিল উপন্যাসে তার পরিচয়ও পাওয়া যায়—

"হরিচরণবাবুর এক ছেলের ধর্মের প্রতি কিছু অনুরাগ হইয়াছিল। কেহ বলিত ব্রাহ্ম হইবে, কেহ বলিত খৃষ্টান হইবে। তাহা শুনিয়া জাতিভয়ে পরমহিন্দু হরিচরণ ছেলেকে ডাকাইয়া অনেক রকম শাসাইয়াছিলেন, বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবেন পর্যন্ত বলিয়াছিলেন। ছেলে উত্তরে একটি কথাও বলিল না, কিন্তু পিতৃবাক্যও শুনিল না, পূর্বে যেমন যেখানে ইচ্ছা যাওয়া-আসা করিত, সেইরূপ করিতে লাগিল।"

রমানাথের দুষ্ট সংসর্গে রজনীকান্ত যে কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল হল, লেখক তার বিস্তৃত চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু একটি চিত্র ছাড়া এর অন্য-কোনো মূল্য নেই। রজনীকান্ত, নগেন্দ্রনাথ বা গোবিন্দলাল নয়। তার কোনোকালেই যে চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল, কোনো প্রমাণ নেই। তাই পাপের সম্মুখীন হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই সে পাপের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। পিতার কড়া শাসন তার আত্মবিকাশের অন্তরায় হয়েছিল। বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব কোনোটিই তার ছিল না। তাই পাপের প্রবাহে যখন সে গা ভাসিয়ে দিল, তখন তাকে রোধ করার মত কোনো শক্তিই তার ছিল না। নগেন্দ্রনাথের বা গোবিন্দলালের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রবল ছিল অসাধারণ, তাই পাপের বিরুদ্ধে তাঁরা দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের পদস্খলনের প্রতিটি ধাপ ও কার্যকারণ সম্পর্কগুলিকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাই তাঁদের পতনের মধ্যেও একটি ট্র্যাজিক মহিমা আছে। আর উচ্ছৃঙ্খল রজনীকান্তের পরিণতি পাঠকচিত্তে কোনো সহানুভূতিই জাগায় না।

স্বর্ণময়ী ও হেমন্তকুমারের সমাজবিগর্হিত প্রণয়কাহিনীকে লেখক খুব জোরালো করার চেষ্টা করেছেন। হেমন্তকুমারের প্রতি স্বর্ণময়ীর অনতিস্ফুট অনুরাগ স্বামী কান্তিচন্দ্রের উৎপীড়নে ও অত্যাচারে যে কিরূপে প্রণয়াবেগে পরিণত হয়েছে, লেখক তার মোটামুটি সন্তোষজনক চিত্র এঁকেছেন কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেন নি। হেমন্তকুমারের সঙ্গে স্বর্ণময়ী গৃহত্যাগ করেছিল। নগর থেকে বহুদূরে একখানি বাগান-বাড়িতে তাদের বর্তমান বাসস্থান। অবস্থাগত সাদৃশ্যের দিক থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রসাদপুরের কুঠিতে গোবিন্দলালের চিত্তবিকারের যে স্বল্পসংক্ষিপ্ত আভাস দিয়েছেন তা যেমন সংযত, তেমনি সংগত। শীর্ণশরীরা চিত্রা নদী, পুরনো নীলকুঠির গ্লানিময় ইতিহাস, বিলাসিনী রোহিণীর সংগীতশিক্ষা ও অন্যমনস্ক গোবিন্দলালের নভেল পড়া—সব কিছু-মিলে একটি অশুভ ছায়া বিস্তার করেছিল। গোবিন্দলাল ও রোহিণীর প্রেমে যে ভাঁটা পড়েছিল তা উপলব্ধি করতে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু হেমন্তকুমারের পরিবর্তন তুলনায় অনেকখানি আকস্মিক। লেখক অবশ্য একটি কারণ দেখিয়েছেন, "যখন স্বর্ণময়ীকে পায় নাই, তখন সমাজের উপর খড়্গহস্ত। যদি স্বর্ণময়ীকে পাইল ত সমাজের কণ্ঠলগ্ন হইবার জন্য উৎসুক।" গোবিন্দলালের তুলনায় হেমন্তকুমার সুবিধাবাদী ও হৃদয়হীন ক্ষণসুখবিলাসী ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্যামার কাহিনীকে নিয়ে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া চলত। কিন্তু লেখক কিশোর বৈকুণ্ঠ ও শ্যামার সম্পর্ককে আকস্মিকভাবেই শেষ করেছেন। যদি পূর্ণ রূপ দেওয়া লেখকের উদ্দেশ্য না হত, তা হলে এ কাহিনীর অবতারণা করলেন কেন? 'তমস্বিনী' উপন্যাসের মৌলিক দুর্বলতা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি লিখেছেন—

"নগেন্দ্র গুপ্তর তপস্বিনী পড়ে দেখলুম। ঠিক হয়নি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বাঙ্গলা উপন্যাসে তিনি উন্মুক্ত Realismএর অবতারণা করতে চাচ্ছেন। তাতে আমি কিছুই আপত্তি করি নে। কিন্তু সেটা পারা চাই। যেমন নাচতে বসে ঘোমটা সাজে না, তেমনি এরকম বিষয় লিখতে বসে কিছু হাতে রাখা চলে না। সম্পূর্ণ নির্ভীক নগ্নতা ভাল, কিন্তু স্বল্প আবরণ রাখতে গেলেই আব্রু নষ্ট হয়। এ বইয়ে তাই হয়েছে।· · নগেন্দ্রবাবু তাঁর ঘটনা-বিন্যাসের স্বাভাবিক পরিণামের পূর্বেই হঠাৎ থেমে যাওয়াতে বোঝা যাচ্ছে নিঃসঙ্কোচ নিরাবরণ তাঁর লেখনীর পক্ষে সহজ নয়, ওটা তিনি জবরদস্তি ক'রে করেছেন। ফর্ ইন্‌ষ্টান্স, সেই বিধবা মেয়েটার সঙ্গে একজন ছোক্‌রার ঘনিষ্ঠতার কথা যদি উত্থাপন করলেন তবে তার অন্ত্যেষ্টি-সৎকার না করে ছাড়লেন কেন?· ·এসব জিনিষ তিনি ছুঁতে ঘৃণা করেন অথচ নাড়তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেইজন্যে সব কথা ভাল করে প্রকাশ করতেও পারেন নি ভাল ক'রে গোপন করতেও পারেন নি।"[২২]

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। উপন্যাসটিতে লেখক অনেকগুলি উপকাহিনী এনেছেন, কিন্তু তারা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত জেগে আছে। 'তমস্বিনী' উপন্যাস না হয়ে চিত্রসমষ্টিতে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ পরিচ্ছেদে লেখক গোবিন্দচন্দ্রের মুখ দিয়ে নীতিকাহিনী শুনিয়েছেন।

'তমস্বিনী'র প্রায় বিশ বছর পর 'জয়ন্তী' (১৯২৯) উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। প্রথম উপন্যাসের মত এই উপন্যাসখানিও বিশুদ্ধ রোমান্স। বাদশাহের নাম আলমগীর, কিন্তু তিনি ঔরংজেব নন। সম্রাটের মৃত্যুশয্যায় যে দু জন বাদশাজাদা সিংহাসন নিয়ে কলহ করেছেন তাঁদের নাম হাতেম ও রুস্তম। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের ক্ষীণ প্রভাব আছে। প্রজারা যাতে উৎপীড়িত না হয় এজন্য এক গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয় নি। এই সমিতির নেতা গৌরীশংকর সবজান্তা সর্বশক্তিমান পুরুষ, তাকে রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হয় না। জয়ন্তীর উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের শান্তি ও প্রফুল্ল চরিত্রের প্রভাব আছে। বিহারীলালের সহচর পুণ্ডরীক দিগ্বিজয় (মৃণালিনী) ও মাণিকলালের (রাজসিংহ) বিচিত্রমিশ্রণে রচিত হয়েছে। ইতিহাস ও ভূগোলের সীমার বাইরে এ এক উদ্ভট রোমান্স লোকের কাহিনী! 'আরাতামা' (১৯৩০) বিলাতি রোমান্সের অনুসরণে রচিত হয়েছে।

নগেন্দ্রনাথের শেষজীবনের উপন্যাসের মধ্যে 'ব্রজনাথের বিবাহ' (১৯৩১) অনেকখানি সহজ ও স্বাভাবিক। শতাধিক বছর আগের পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। তখনকার দিনে পথঘাট বিপদসংকুল ছিল। জমিদারেরা দিনে জমিদারী ও রাত্রিতে ডাকাতি করতেন। চুরি ডাকাতি ও উত্তেজনাময় দৃশ্য সত্ত্বেও কাহিনীর স্বাচ্ছন্দ্য কোথায়ও ব্যাহত হয় নি—মিলন-মধুর প্রসন্নতায় কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। রাধানাথ ঠাকুর ও হরেরাম সর্দারের চরিত্র উল্লেখযোগ্য। নগেন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস 'স্বাগতা' (প্রবাসী, আষাঢ়-চৈত্র ১৩৩৯) আগাগোড়া রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের মত। গোয়েন্দা-কাহিনী-সুলভ অপরাধীর অনুসন্ধান উপন্যাসের অধিকাংশ স্থান অধিকার করেছে।

৬

নগেন্দ্রনাথ অনেকগুলি ছোটগল্প লিখেছিলেন। বাংলা ছোটগল্পের প্রারম্ভিক লগ্নে তাঁর গল্পগুলির একটি ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প-রচনার সমকালে স্বর্ণকুমারী দেবী ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

---

২২ ১২ আশ্বিন ১৩০৭ তারিখে প্রিয়নাথ সেনের কাছে লেখা চিঠি: পত্রাবলী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০।

ছোটগল্প রচনায় খ্যাতি লাভ করেন। 'ভারতী' পত্রিকাই সর্বপ্রথম বিশেষভাবে ছোটগল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল।[২৩] নগেন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির সঙ্গে ছোটগল্পের আত্মিক সম্পর্ক আছে। উভয়ক্ষেত্রে একই প্রকার দোষগুণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পে তিনি অনেক বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিকায় কাহিনীর শিথিলবিন্যাস ও বহু ভাষণের অসংযম অনেক সময় অতিমাত্রায় উগ্র হয়ে উঠেছে। ছোটগল্পের নির্ধারিত পরিসরে এই শ্রেণীর শিল্প-দৌর্বল্যের অবকাশ কম। রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের আঙ্গিক ও গঠনশৈলী নগেন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোটগল্পেই অনুপস্থিত। তীক্ষ্ণতা ও ব্যঞ্জনাগর্ভ ও নাটকীয় পরিসমাপ্তি এখানে অনুসন্ধান করতে গেলে ব্যর্থ হতে হবে। কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, নগেন্দ্রনাথ যখন গল্পরচনায় হাত দেন তখন বাংলা ছোটগল্পের শৈশবলগ্ন। ছোটগল্পের কোনো ফর্ম বা কলাবিধি তখনো গড়ে ওঠে নি। কাহিনী-রসের চমৎকারিত্ব একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তের মধ্যে সন্নিবেশ করলেই ছোটগল্প নামে চিহ্নিত হত।

নগেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে: বিহার বাংলা আগ্রা অযোধ্যা পাঞ্জাব সিন্ধু ও বোম্বাই। বিস্তৃত অভিজ্ঞতাকে তিনি অনেক সময় তাঁর গল্পগুলির মধ্যে ব্যবহার করেছেন। এইসমস্ত অঞ্চলের দৃশ্যচিত্র ও প্রাকৃতিক বর্ণনাও তাঁর গল্পের পটভূমি রচনা করেছে। তাঁর গল্পগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: ইতিহাসাশ্রিত গল্প, কল্পনাশ্রয়ী রোমান্টিক গল্প, এবং সামাজিক গার্হস্থ্য রসের গল্প। নগেন্দ্রনাথের প্রায় ষাটটি গল্পের মধ্যে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের গল্পের সংখ্যাই সবচেয়ে কম। এর থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তাঁর রোমান্সপ্রবণ মন সামাজিক ও পারিবারিক কাহিনী-রচনায় তেমন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারে নি।

নগেন্দ্রনাথের ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলি অধিকাংশই স্থানীয় জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী অবলম্বন করে লেখা, কোনো প্রামাণিক ঐতিহাসিক ভিত্তি সেখানে নেই। 'ব্রাহ্মণাবাদ' গল্পটির মূল পরিকল্পনা সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথের স্মৃতিকাহিনীর একটি অংশ উল্লেখযোগ্য:

In the desert district of Thar and Paker there are the ruins of an ancient Aryan city known as Brahmanabad. There is complete lack of historical data, but a very old tradition has it that the city in the desert was once, long ago, prosperous and had a large number of Brahman residents. The last king was a young Kshatriya of dissolute habits, who had no regard for Brahmins and no respect for their women. He was cursed by a holy Brahman for his sinfulness, and shortly afterwards the city of Brahmanabad was overwhelmed by a sand-storm which buried the city under mountainous heaps of sand.[২৪]

---

২৩ "পূর্বে তিন-চারটি গল্প বাহির হইয়াছিল, যাহাতে ছোটগল্পের রূপ স্ফুটতর। এই তিনটি গল্প হইতেছে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮০) এবং সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' (ভ্রমর, বৈশাখ ১২৮১) এবং 'দামিনী' (ভ্রমর, জ্যৈষ্ঠ ১২৮১)। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যে-সকল ছোটগল্প লেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে কেবল দামিনী গল্পটিতেই ছোটগল্পের লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।"— শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৫০); পৃ. ২৮১-২৮২

২৪ *Reflections and Reminiscences*, p. 136.

একটি প্রাচীন কিংবদন্তীর ক্ষীণসূত্র ধরে লেখক নিপুণভাবে একটি কাল্পনিক কাহিনী রচনা করেছেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের মরুপ্রদেশের আঞ্চলিক প্রকৃতির ছবি চিত্তাকর্ষক। 'টিকিয়া শাহ' গল্পটিও পাটনা-অঞ্চলের একটি জনশ্রুতি কেন্দ্র করে লিখিত হয়েছে। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে উক্ত অঞ্চলে নানাজাতীয় গল্পগুজব প্রচলিত ছিল— এ গল্পট তারই অন্যতম। টিকিয়া শাহের রহস্যময় ব্যক্তিত্ব ছাড়া গল্পটির মধ্যে আর-কিছুই উল্লেখযোগ্য নয়। 'ইংরাজ ও পাঠান' গল্পটিও পেশোয়ার-অঞ্চলের একটি বাস্তব কাহিনীর উপরে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। 'ভৈরবী' গল্পটিও সিপাহী-বিদ্রোহ-সম্পর্কিত কাহিনী; রানী চন্দার ব্যক্তিত্ব ও গল্পরস কাহিনীটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলির মধ্যে 'সুরজ কওর' গল্পটিই শ্রেষ্ঠ। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখররাজ্যে যে আত্মকলহ, জটিল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে লাহোরের পথঘাট, এমনকি জীবনযাত্রা পর্যন্ত, বিপদসংকুল হয়ে উঠেছিল। লেখক লাহোরের সেই ষড়যন্ত্র-সংকুল শ্বাসরোধকারী বিষাক্ত পরিবেশের একটি নিপুণ ও বাস্তবনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন। ধ্যানসিংহ ও সিদ্ধিয়ানদের বিরোধের সূত্র ধরে রূপসী সুরজ কওর এই সংঘাতময় রাষ্ট্রনৈতিক আবর্তে জড়িয়ে পড়েছিল। আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বহু রূপমুগ্ধ পুরুষকে সে দগ্ধ করেছে। প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছে। পরিণামে নিজেরই অচরিতার্থ কামনাবহ্নি তাকে দগ্ধ করেছে। 'জমাল-জমিল' গল্পটিও রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পর লাহোরের ষড়যন্ত্র-সংকুল পটভূমিকায় রচিত।

'মেহেরজান' 'মিলন' 'রোশিনারা' 'শাহনওয়াজ' প্রভৃতি গল্প মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক রোমান্সের উপরে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। 'মেহেরজান' গল্পে ইসপাহানী বাইজী মেহেরজানের গর্বিত হৃদয়ের চূড়ান্ত পরাজয় দেখানো হয়েছে। মোগল-পাঠান যুগের রোমান্স-রস সে যুগের কথাশিল্পী ও নাট্যকারদের অত্যন্ত প্রিয় উপকরণ ছিল। নগেন্দ্রনাথও একাধিক গল্পে এই রোমান্সলোক থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। 'রোশিনারা' গল্পে উজীর ও নয়নচাঁদের পরনারী-হরণের ব্যর্থতা এক অতি প্রাকৃত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মন্ত্র-তন্ত্র ও ইন্দ্রজাল গল্পটির স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করেছে। 'শাহনওয়াজ' গল্পটিতে বাদশাহী আমলের লক্ষ্ণৌ শহরের পটভূমিকায় এক অভিজাতবংশীয় তরুণ ও এক তরুণী বাইজীর প্রেম-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'মিলন' গল্পে যশল্মীরের এক রাজপুতের সঙ্গে এক মুসলমান দুর্গাধিপতির প্রেম ও শোচনীয় পরিণামের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (১৮৬২) ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) রচনার পর বাংলা সাহিত্যে এই-জাতীয় কাহিনী রচনার একটি জোয়ার এসেছিল। নগেন্দ্রনাথের গল্পটির পটভূমিকা প্রশংসনীয়। তিনি মধ্যযুগীয় রোমান্সকে চিত্ররূপময় করে তুলেছেন— আরব্যরজনীর রহস্যময় মায়াজাল দিয়ে তিনি যুগ-জীবনের প্রাণস্পন্দন সঞ্চার করেছেন।

'মালবিকা' ও 'দৈবরাত ও প্রসেন'— হিন্দু যুগের দুটি বিশেষত্ববিহীন কাহিনী। 'অলকা' গল্পটিতে দুই শক্তিশালী ভূম্যধিকারীর বিরোধকাহিনী ও তার মিলনমধুর উপসংহার বর্ণিত হয়েছে। 'ভৈরব-মন্দির' কাহিনীতে এক রূপসী কুহকিনীর রোমাঞ্চকর জীবনবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের মত মনে হয়। 'মায়াবিনী' 'ছায়া' 'দুইবার' প্রভৃতি কয়েকটি রচনাকে ঠিক গল্প বলা যায় না। কোনো বিষয়ই সেখানে স্পষ্ট হয় নি। কয়েকটি অসাধারণ মুহূর্ত নিয়ে লেখক উচ্ছ্বসিত কাব্যধর্মী বর্ণনা করেছেন। চরিত্র, ঘটনা, কাহিনীর পরিণাম ও লক্ষ্য—সব-কিছুই এখানে অলৌকিকতায় ও কাব্যকুয়াশায় আচ্ছন্ন। নগেন্দ্রনাথের পারিবারিক ও সামাজিক গল্পগুলিতে তেমন বিশেষত্ব নেই। 'ছোটবৌ' ও 'নির্মলা' গল্প

দুটিতে মধ্যবিত্ত পরিবারের গার্হস্থ্য জীবনের ছবি সহজ ও সুন্দর। 'নূতন বাড়ী' গল্পটির অতিপ্রাকৃত রস শেষপর্যন্ত দানা বেঁধে উঠতে পারে নি, বাস্তব কামনার স্থূল পরিণতি ভারসাম্য নষ্ট করেছে।

নগেন্দ্রনাথের গল্পগুলি বিবৃতিপ্রধান, মন্থরগতি 'টেল্'ধর্মী কাহিনী। সূক্ষ্ম কারুকার্য, ক্লাইম্যাক্সের তীক্ষ্ণতা ও ব্যঞ্জনাদীপ্ত অতর্কিত নাটকীয় পরিসমাপ্তি এখানে অনুপস্থিত। চরিত্রসৃষ্টির চেয়ে ঘটনাপ্রধান কাহিনীবিন্যাসের দিকেই লেখকের অধিকতর প্রবণতা। সাধারণ জীবনের সমতলভূমির দিকে কদাচিৎ তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। জীবনের বর্ণবহুল শোভাযাত্রা ও রোমাঞ্চকর মুহূর্তই তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। নগেন্দ্রনাথকে এজন্য অপরাধী করে লাভ নেই। কারণ সে যুগের সাহিত্য কদাচিৎ এই দোষ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তখনো আত্মপ্রতিষ্ঠ হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষম অনুবর্তীরা তখন পূর্বযুগের রোমন্থন করে চলেছেন। রবীন্দ্রানুরাগী নগেন্দ্রনাথ এঁদের মধ্যেই তাঁর স্বক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিলেন।

৭

নগেন্দ্রনাথ কবিতা দিয়েই তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু করেছিলেন। প্রথম যুগের 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় তাঁর অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর একমাত্র কাব্যসংকলন 'স্বপন-সংগীত'(১৮৮২) প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।[২৫] পরবর্তীকালেও তিনি অল্পসংখ্যক কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর কবিতার উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সনেটগুলির মধ্যে 'কড়ি ও কোমল'এর প্রভাব খুবই স্পষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ 'ঘুম' নামক সনেটটি উদ্ধার করা যায়—

> পড়েছে ঘুমের ছায়া ঘুমন্ত আননে,
> ঘুমের আলসে হের শিথিলিত কায় ;
> মুখর নূপুর এবে চরণ ঘুমায়,
> ঘুমায় রতন কাঞ্চী কটি আলিঙ্গনে,
> অধরে ফুটিছে হাসি সুখের স্বপনে ;
> অযতনে শয়নেতে অঞ্চল লুটায়,
> পূর্ণ পীনপয়োধর জড়িত মালায়,
> আঁখিপাতা ঢাকিয়াছে কমলনয়নে ;
> খসেছে কটির বাস, মুক্ত কেশভার
> কোমল চিকণ বাহু ঘুমায় শিথান,
> ললিত কোমল কর বুকের মাঝার
> নিশ্বাসের সাথে সাথে পতন-উত্থান,
> মরি মরি রূপখানি ঘুমন্ত এখন,—
> জাগিলে বুকের মাঝে কে করে গ্রহণ।[২৬]

২৫ "লেখকের হাত পাকে নাই। কিন্তু ইহার অনেকস্থানে যথার্থ কবিতা আছে। অনেকস্থানে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।" —ভারতী ১২৮৯ বৈশাখ

২৬ ঘুম : সাহিত্য ১৩০০ ভাদ্র।

নগেন্দ্রনাথ 'নবনগর' কৌতুকনাট্য ও অনেকগুলি লঘুরসের নক্‌শা লিখেছিলেন। 'চুলের কলপ' ও 'কোঁচার কথা' রচনা-দুটির বিশেষত্ব আছে। 'বিবিধ' নাম দিয়ে এক সময়ে 'সাহিত্য' পত্রিকায় তিনি ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি 'ফিচার' লিখেছিলেন। নগেন্দ্রনাথের অজস্র প্রবন্ধের মধ্যে 'জীবন ও মৃত্যু' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। 'মৃত্যুর পরে' নাম দিয়ে প্রবন্ধটি 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ দার্শনিক প্রবন্ধের সংখ্যা খুব বেশি নয়। 'জীবন ও মৃত্যু' সেই মুষ্টিমেয় রচনাবলীর অন্যতম, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। দুরূহ তত্ত্বকথাকে তিনি উপমার সাহায্যে সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রবন্ধটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র একাধিকবার সপ্রশংস মন্তব্য করেছিলেন।[২৭] 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কিত রচনা পড়ে রোম্যাঁ রলাঁও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।[২৮]

নগেন্দ্রনাথের রচনাবলীর পরিধি ও বৈচিত্র্য দুইই কম নয়। তাঁকে একজন 'প্রলিফিক্‌ রাইটার' বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের মাত্র সাত মাস আগে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে (২৮ ডিসেম্বর ১৯৪০)। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি গবেষণার বিষয় হয়ে পড়েছেন। শ্রমনিষ্ঠ অনুসন্ধান ব্যতীত তাঁর সাহিত্যকৃতিকে আজ উদ্ধার করা কঠিন। এত তাড়াতাড়ি তিনি বিস্মৃত হলেন কেন। মনে হয় এই বিস্মৃতির প্রধান কারণ দুটি।— নগেন্দ্রনাথের পেশা ছিল সাংবাদিকতা, কিন্তু নেশা ছিল সাহিত্য। এই দুইয়ের মধ্যে যে মিল তা অনেকখানি কাকতালীয়বৎ— বরং বিরোধটাই সুস্পষ্ট। পত্রিকার পৃষ্ঠায় তিনি নানাজাতীয় প্রবন্ধ-রসরচনা গল্প-কবিতা-টিপ্পনী লিখেছেন। তাঁর অনেক রচনার মধ্যেই দ্রুতলিখনের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। এই মানসিকতা তাঁর কথাসাহিত্যের মধ্যেও অলক্ষ্যগোচর নয়। সাংবাদিকতা তাঁর শিল্পীসত্তাকে শুধু বিচলিতই করে নি, দ্বিধাগ্রস্তও করেছে। দ্বিতীয়ত, সে যুগে কথাশিল্পী হিসেবেই নগেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রাচীন ধারারই সংরক্ষক। মৃত্যুর অল্পদিন আগেও তিনি গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু কোনো নবীন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতে পারেন নি। শরৎচন্দ্রের পূর্ণপ্রতিষ্ঠার দিনেও তিনি বঙ্কিম-অনুবর্তীদের গণ্ডি ছেড়ে কদাচিৎ অগ্রসর হতে পেরেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যিক-জীবনে সামান্য ভাষাগত পরিবর্তন ছাড়া আর-কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। অথচ বিংশ শতাব্দীর পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই কথাসাহিত্যের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' এবং 'গোরা' প্রকাশিত হয়েছে। সর্বশেষে, প্রভাতকুমার ও শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবে নগেন্দ্রনাথের শেষ আশ্রয়টুকুও লুপ্ত হয়েছে। দেশ কাল ও রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্যসাধনা শ্রুতি ও স্মৃতি থেকে আজ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

---

২৭ "বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'বটব্যালের বৈদিক প্রবন্ধগুলি, নগেন গুপ্তের 'মৃত্যুর পরে' উঁচুদরের লেখা। বঙ্গদর্শনে এরকম প্রবন্ধ ছাপা হয় নাই।' বঙ্কিমবাবু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের 'মৃত্যুর পরে'র বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তিন-চার বার আমার নিকটে উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। নগেনবাবুর style-এরও তিনি প্রশংসা করিতেন।"— সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বঙ্কিম-প্রসঙ্গে, পৃ ৩৪৯।

২৮ *Reflections and Reminiscences.*

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক এস. মুখার্জী, ১২/২ রামতনু বোস লেন, কলিকাতা ৬। সাড়ে পাঁচ টাকা।

কৃত্তিবাস-পরিচয়। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীসুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, রিষড়া, হুগলি। পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

বাংলা আখ্যায়িকা-কাব্য (১৮৭০-১৯০০)। শ্রীপ্রভাময়ী দেবী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সাড়ে ছয় টাকা।

শিবায়ন : রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র -রচিত। সম্পাদক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা ৬। সাত টাকা।

'আমাদের দেশের লোকেরা ইতিহাস সম্বন্ধে চিরদিনই উদাসীন ছিলেন' এবং এই ঔদাসীন্যই অধ্যাপক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের অস্পষ্টতার প্রধান কারণ। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অস্পষ্টতা আছে— এ বিষয়ে লেখকের সহিত কাহারও মতান্তর হইতে পারে না, কিন্তু অস্পষ্টতার কারণ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত তাঁহার গ্রন্থের পাঠকগণের সম্পূর্ণ ঐকমত্য না হইতেও পারে। অন্ততঃ গ্রন্থ-রচয়িতারা ইতিহাস-বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না, তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

প্রথমতঃ, নামভণিতা। কি কাব্য, কি পালাগান, কি গীতিকবিতা নামভণিতা সর্বত্রই আছে। কোন্ চর্যা সরোহপাদের আর কোন্ চর্যা কাহ্নপাদের সেটুকু জানিতে যে বাধা হয় না সেজন্য আমরা কবিদের ইতিহাসবোধের কাছেই ঋণী। প্রথম সোপানটা তাঁহারা উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের কালানুসন্ধানের কথা আজ আমরা চিন্তা করিতে পারিতেছি। এক নামের একাধিক লেখক থাকিতে পারেন, কিন্তু ঐকাধিক্যেরও একটা সীমা আছে, যেমন চণ্ডীদাসের ক্ষেত্রে হইয়াছে। চণ্ডীদাস এক, না দুই, না তিন— সেটা সমস্যা বটে। কিন্তু পদান্তে চণ্ডীদাস নামটা না থাকিলে সে সমস্যা আরও গুরুতর হইতে পারিত।

দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থরচনার তারিখ। গ্রন্থরচনার তারিখ ছোট ছোট পদে থাকে না কিন্তু বড় কাব্যগুলিতে থাকে। কবি যখন গ্রন্থ রচনা করেন তখন সাল-তারিখটি সযত্নে বসাইয়া দেন। পরে লিপিকার সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞানে) তাহা বদলাইয়া ফেলেন। ফলে গবেষকের বিপদ হয়। মূল কবির স্বহস্ত-লিখিত কাব্যগ্রন্থ আদ্যন্ত অক্ষুণ্ণ পাওয়া গেলে কবির কালনির্ণয়ে অসুবিধা হয় না। আমরা মূল কবির হস্তলিখিত পুঁথি কদাচিৎ পাই। আর, কি মূল কি প্রতিলিপি অনেক পুঁথিরই শেষের পাতা এবং প্রথম পাতা নষ্ট হইয়া যায়। ফলে তারিখের অংশটি পাওয়া যায় না। অতিব্যবহার তাহার কারণ। বস্তুতঃ গ্রন্থ-রচনার তারিখ দিতে যাঁহাদের ভুল হইত না তাঁহারা ইতিহাস-সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন এ কথা বলা যায় না।

কারণ যাহাই হউক-না কেন, সাহিত্যের ইতিহাসে সাল-তারিখের গণ্ডগোল কিছু আছে এবং তাহা দূরীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়, সাহিত্য এবং ইতিহাস উভয়ের স্বার্থেই তাহার প্রয়োজন আছে। সুখময়বাবু যে সেই দুরূহ কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহা আনন্দের কথা। তথ্যসন্ধানের কাজ গুরুতর শ্রম এবং অনবচ্ছিন্ন অধ্যবসায় -সাপেক্ষ। সুখময়বাবু ইতিহাসের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাবশতঃ সে কাজে চেষ্টার ত্রুটি

রাখেন নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য বলিলেই যে-নামগুলি আমাদের মনে আসে তাহার প্রায় সবই সুখময়বাবুর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' অষ্টম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সহস্র বৎসরের ইতিহাস। এই সহস্র বৎসরের শেষের প্রান্ত ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ, রামপ্রসাদের মৃত্যুকাল, প্রমাণের দ্বারা পরিচিহ্নিত। প্রথম প্রান্ত, চর্যাগীতি-রচনার প্রারম্ভকাল, ধরা হইয়াছে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ। চর্যাগীতির এই ঊর্ধ্বসীমা প্রতিষ্ঠার জন্য লেখক যে-সকল উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন তাহার মধ্যে নূতন তথ্যও অনেক আছে। সকল তথ্যই প্রমাণসিদ্ধ না হইতে পারে কিন্তু দিগ্‌দর্শনের সহায়ক এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যে তথ্যগুলির উপর সুখময়বাবু চর্যাগীতির প্রারম্ভকালের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন সেগুলি এই :

১. ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের "Sumpa Mkhan-Po-র লেখা Pag-Sam-Jon Zan (রচনাকাল ১৭৪৭ খ্রী.), তারনাথের লেখা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস (রচনাকাল ১৬০৮ খ্রী.) এবং Arthur Green Wedel-এর জার্মান ভাষায় লেখা ৮৪ সিদ্ধার ইতিহাস থেকে তথ্য আহরণ করে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩৫শ বর্ষের ৩য় সংখ্যায় এবং বিহার উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির জার্নালের ১৪শ বর্ষের ২য় সংখ্যায়" লিখিত দুইটি প্রবন্ধ।

২. ভদন্ত রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী' '*Sa-Skya-bka*'-*bum-pha* নামক একটি তিব্বতী গ্রন্থ হইতে যাহার তথ্য সংগৃহীত।

৩. *Deb-ther Snon-Po* নামক বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস-বিষয়ক তিব্বতী গ্রন্থের জর্জ রোরিক কৃত The Blue Annals নামক ইংরাজী অনুবাদ।

৪. *Bu-Ston Rin-po-che* (রচনাকাল ১৩২২ খ্রী.) বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস-বিষয়ক আর-একটি তিব্বতী গ্রন্থের Dr. E. Obermiller কৃত ইংরাজী অনুবাদ।

The Blue Annals -এর বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে উল্লিখিত বহু ঘটনার সন-তারিখ দেওয়া আছে। গ্রন্থের অনুবাদক বলিয়াছেন, "The work is invaluable for its attempt to establish a firm chronology of events of Tibetan history." তিব্বতীয় ইতিহাসের সহিত চর্যাকারদের সম্পর্ক আছে, কাজেই তাঁহাদের কাল-নিরূপণের জন্য স্বভাবতঃই বর্তমান লেখক The Blue Annals -এর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে *Deb-ther Snon-Po* গ্রন্থটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদে রচিত। এই গ্রন্থের সাল-তারিখ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য কিনা তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না, কিন্তু গ্রন্থকার কোনো তথ্যকেই তথ্যান্তরের সহিত না মিলাইয়া নিরস্ত হন নাই। তথ্যপ্রমাণের সহিত অনুমান প্রয়োগের প্রয়োজনও হইয়াছে। যেমন Blue Annals হইতে অতীশ দীপঙ্করের আবির্ভাব-কাল পাওয়া গেল— দশম-একাদশ শতক। সরহ অতীশের ঊর্ধ্বতন দ্বাদশগুরু। সে গুরুপরম্পরাও উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। প্রতি গুরুর ব্যবধান গড়পড়তা ২০ বৎসর ধরিলে "সরহের জীবৎকাল হয় অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ"। পিতৃপুত্রানুক্রমে এক এক পুরুষের যে ব্যবধান ধরা হয় তাহার মধ্যে যতটা শৃঙ্খলা থাকে গুরুশিষ্যানুক্রমে সেটা প্রত্যাশা করা যায় না। তবু এক্ষেত্রে এরূপ অনুমান ছাড়া উপায় নাই— এবং এ-অনুমানকে নিতান্ত অসংগত বলা যায় না।

গ্রন্থকার সরহ-পা শবর-পা লুই-পা দারিক-পা নারো-পা শান্তি-পা ভুসুকু-পা এবং ডোম্বী-পা-র

সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া তাঁহাদের আবির্ভাবকাল প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন সেজন্য প্রাচীন সাহিত্যরসিকদের কৃতজ্ঞতা তাঁহার প্রাপ্য।

চর্যাগীতিকার ছাড়াও জয়দেব, লক্ষ্মণ সংবৎরহস্য, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকরবৃন্দ (যথা, অদ্বৈত, হরিদাস, নিত্যানন্দ, নরহরি সরকার, রঘুনন্দন, বাসুদেব সার্বভৌম, স্বরূপ দামোদর, রূপ সনাতন, জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট) মুরারি গুপ্ত, প্রভৃতি বহু নাম ও বিষয় গ্রন্থের সূচীভুক্ত হইয়াছে।

প্রগাঢ় অনুসন্ধিৎসার ফলে গ্রন্থকার কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে নূতনতর তথ্যের সন্ধান পাইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থের এক বৎসর পরে 'কৃত্তিবাস-পরিচয়' নামে তাঁহার যে পুস্তকটি প্রকাশিত হইয়াছে, কৃত্তিবাস সম্পর্কে তাহা সূক্ষ্মতর অনুসন্ধানের পরিচয় বহন করিতেছে। কৃত্তিবাস সম্পর্কে এযাবৎ আলোচনা কম হয় নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে চণ্ডীদাসের পরেই কৃত্তিবাস পণ্ডিতের আবির্ভাবকাল-সমস্যা ঐতিহাসিকদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। পুরাতন সাহিত্যে কৃত্তিবাস সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশাবলী (১৪৮৫ হইতে ১৫১০ এর মধ্যে রচিত) গ্রন্থে। "কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান্ সৌম্যঃ শান্তো জনপ্রিয়ঃ"—কবি সম্পর্কে ইহার অধিক আর-কিছু বলা হয় নাই। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে (১৬শ শতকের শেষার্ধে রচিত) কবির নামোল্লেখ পাওয়া যায়:

রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি।
পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি॥

ঊনবিংশ শতকের প্রথম হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হয়। তখন হইতেই কৃত্তিবাস সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল বিশেষভাবে উদ্রিক্ত হয়। কিন্তু ১৯শ শতাব্দীর তৃতীয়পাদ অবধি কবির পরিচয়জ্ঞাপক কোনো তথ্য প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র মিত্রের প্রকাশিত 'কৃত্তিবাসের পরিচয়সংগ্রহ' নামক একটি পুস্তিকায় কবির জীবনকথা-প্রসঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ উপকরণ পাওয়া গেল। তাহাতে কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কোনো তথ্য ছিল না। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত (১৮৭০) 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' গ্রন্থে কৃত্তিবাসের জন্ম-সন ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দ বলা হইয়াছে। 'বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে (১৮৭৮) রাজনারায়ণ বসু কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচনার কাল ১৫৩৮ বলিয়া উল্লেখ করেন। কৈলাসচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৪) 'বাঙ্গালা সাহিত্য' গ্রন্থে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ রামায়ণের রচনাকাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। ১৩০৫ (১৮৯৮) সালে 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থে নগেন্দ্রনাথ বসু কৃত্তিবাস-পরিচয়-সূচক পয়ার ছন্দের নয়টি ছত্র প্রকাশ করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ প্রকাশিত হয়। এই আত্মবিবরণই কৃত্তিবাসের কালনির্ণয়ের প্রধান সূত্র। অবশ্য কুলজী গ্রন্থের প্রমাণকে আনুষঙ্গিক তথ্য হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি দীনেশচন্দ্র সেন -কর্তৃক সর্বপ্রথম প্রকাশিত এই আত্মবিবরণকে কেন্দ্র করিয়াই কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে যাবতীয় গবেষণা পরিচালিত হইতেছে। সুখময়বাবুর গবেষণারও প্রধান ভিত্তিভূমি ঐ আত্মবিবরণ। সুখময়বাবু যাঁহাদের শিষ্য বা শিষ্যস্থানীয়, তাঁহাদেরও। সুতরাং 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' গ্রন্থের লেখক তাঁহার 'কৃত্তিবাস-পরিচয়' গ্রন্থে "কৃত্তিবাস সম্বন্ধে গবেষণায় যাঁদের দান সবচেয়ে বেশী" বলিয়া মনে করিয়াছেন

অন্যান্য গবেষক স্বর্গীয় সেন মহাশয়ের দানকে যদি ততোধিক বলিয়া মনে করেন তো তাঁহাদের দোষ দেওয়া যাইবে না।

কিন্তু যে যাহাই হউক, মোট ফল কি দাঁড়াইল? সুখময়বাবু কৃত্তিবাস সম্বন্ধে বহুতর গবেষণা করিয়া যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা এই:

১. (কৃত্তিবাস ও স্বরূপ দামোদরের মধ্যে চার পুরুষের ব্যবধান ধরিয়া) "কৃত্তিবাসের সময় সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করা যাবে না। কেবলমাত্র এইটুকু ধরা যেতে পারে যে কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন এক সময় বর্তমান ছিলেন।"—কৃত্তিবাস-পরিচয়, পৃ ৩০। ২. ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে (১৫শ শতকের শেষার্ধ) কৃত্তিবাসের উল্লেখ আছে এবং বংশবদন বিদ্যারত্নের কুলকারিকায় উদ্ধৃত "সপ্তাকাশ …ব্যবস্থাপক" শ্লোকে বলা হইয়াছে ধ্রুবানন্দ মিশ্র ১৪০৭ শকাব্দে কুলতত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই শ্লোকের "উক্তিটি সত্য হলে কৃত্তিবাস ১৪০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দের আগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন বলতে হবে।"—পৃ ৩২। ৩. জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে কৃত্তিবাসের উল্লেখ-প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন, "জয়ানন্দ যে রকম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর (কৃত্তিবাসের) নাম উল্লেখ করেছেন, তার থেকে মনে হয়, কৃত্তিবাস জয়ানন্দের অনেক আগে, এমনকি চৈতন্যদেবেরও আগে, আবির্ভূত হয়েছিলেন।"—পৃ ৩৩। ৪. ধ্রুবানন্দের মহাবংশে উল্লিখিত কৃত্তিবাসের বংশাবলীতে এক সুষেণ পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেও এক সুষেণের দেখা মিলে। ইনি সম্পর্কে "কৃত্তিবাসের সম্পর্কিত পৌত্র" এবং "১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়ে জীবিত ছিলেন। পিতামহ এবং পৌত্রের স্বভাবিক ব্যবধান ৫০ বছর ধরা যায়। এই হিসাবে কৃত্তিবাস ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দ মত সময়ে জীবিত ছিলেন। মোটের উপর তিনি ১৪৬০ থেকে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন।"—পৃ ৩৬। ৫. কৃত্তিবাসের তিন বিবাহ। তাঁহার এক শ্বশুরের নাম শঙ্কর। শঙ্করের এক ভাইয়ের নাম উৎসাহ। উৎসাহের বৃদ্ধপ্রপৌত্র বিখ্যাত নৈয়ায়িক কণাদ তর্কবাগীশ। ইনি ১৫৫০ হইতে ১৫৮ র মধ্যে জীবিত ছিলেন। এই তথ্যগুলি বিবৃত করিয়া লেখক সিদ্ধান্ত করিতেছেন, "সুতরাং কণাদের প্রপিতামহ-স্থানীয় কৃত্তিবাস তার ৮০-৯০ বছর আগে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর সপ্তম অষ্টম বা নবম দশকে বর্তমান ছিলেন বলতে হয়।"—পৃ ৩৭। শ্বশুরের সূত্রে বয়সের হিসাব বড় বিপজ্জনক। লেখক পিতামহ ও পৌত্রের স্বাভাবিক ব্যবধান একবার ৫০ বৎসর ধরিয়াছেন অর্থাৎ প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর হিসাবে ধরিয়াছেন। এইরূপ ধরিয়া যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, তাহাই সম্পূর্ণ প্রামাণিক হইতে পারে না। তাহার উপর পিতামহর শ্বশুরকে প্রপিতামহর স্থানে বসাইলে গণ্ডগোলের আশঙ্কা আরও বাড়িয়া যায়। শ্বশুর বয়সে পিতার অপেক্ষাও বড় হইতে পারেন, এবং তেমন-তেমন ক্ষেত্রে সমবয়স্ক এমনকি বয়ঃকনিষ্ঠ হইবারও বাধা নাই। প্রপিতামহ-স্থানীয় ধরিলেও ৮০-৯০ বৎসরের ব্যবধান কেন হইবে? লেখক পিতামহ ও পৌত্রের স্বাভাবিক ব্যবধানের যে নিয়ম ধরিয়াছেন সে হিসাবে তো ৭৫ বৎসর ব্যবধান হওয়া উচিত। ৬. "চৈতন্যদেবের অনেক আগেই নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এই নবদ্বীপ কৃত্তিবাসের বাসভূমি, ফুলিয়া থেকে সাত-আট ক্রোশ দূর…। তা সত্ত্বেও কৃত্তিবাস যখন সুদূর বরেন্দ্রভূমে পড়তে গেলেন তখন বোঝা যায় তাঁর সময়ে বিদ্যাকেন্দ্র হিসেবে নবদ্বীপের অভ্যুদয় হয় নি। সুতরাং তিনি চৈতন্যদেবের আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং চৈতন্যদেবের জন্মের অনেক আগেই তাঁর পাঠ সাঙ্গ হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" "অনেক আগে" বলিতে কত আগে বুঝিতে হইবে? অনেক শব্দটা নিতান্তই

আপেক্ষিক। ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া সাল-তারিখ নিরূপণটাই যখন গবেষকের লক্ষ্য তখন অনেক শব্দটি ব্যবহার না করিয়া একটা স্থূল বর্ষসংখ্যা দিলে ভালো হয়। ৭০ বৎসর ৮০ বৎসর ১০০ বৎসর যাহাই হউক একটা সংখ্যা বলা ভালো। যে পাঠক সত্যই বিচার করিতে চান, একটা সংখ্যা বলিলে তাঁহাকে সাহায্য করা হয়। আমি যদি এই "অনেক"কে ৮০ হইতে ১০০ বৎসর ধরি, তাহা হইলে বিদ্যানিধি মহাশয়ের জ্যোতিষিক বিচারে প্রাপ্ত ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ কৃত্তিবাসের জন্ম-বৎসর সমর্থিত হয়। ৭. আরও কয়েকটি প্রমাণ এবং অনুমান -সাহায্যে লেখক স্বীয় মত প্রবলতর ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতেছেন: "সুতরাং আমরা এখন কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। তিনি যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।"—পৃ ৪৪। বস্তুতঃ সাম্প্রতিক কালের মধ্যে কেহ তো এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। সুখময়বাবু নূতন তথ্যের দ্বারা কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে পুরাতন ধারণা খণ্ডন না করিয়া তাহাকে দৃঢ়তর করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ জীবৎকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা গেল না। চরম সিদ্ধান্ত শুধু এইটুকু জানাইলেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে তিনি বর্তমান ছিলেন। অর্থাৎ ১৪৫১ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনো-না-কোনো সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন। ইহা একটা তথ্য বটে, কিন্তু এ তথ্যের সবটা আমাদের অজ্ঞাতপূর্ব নয়, এবং কৃত্তিবাস সম্পর্কে আমাদের পুরাতন জ্ঞানবর্ধনে সহায়ক হয় নাই। বরং দুই-এক ক্ষেত্রে একটু জটিলতা বাড়িয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি। সুখময়বাবু কৃত্তিবাসের কালনিরূপণ -প্রসঙ্গে 'কৃত্তিবাস-পরিচয়ে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "কোন কোন সময়ে আবার পেয়েছি আশার অতিরিক্ত পুরস্কার।" যেমন ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত বই 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা'তে লিখেছেন, "কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল-নির্ণয়ে কতকগুলি বিশেষ পূর্বধারণার প্রভাবে গবেষকদিগকে পরস্পরবিরোধী কাল-পরিস্থিতির মধ্যে কষ্টকল্পনাপ্রসূত সামঞ্জস্যবিধান-প্রয়াসের সম্মুখীন হইতে হওয়ায় মীমাংসা জটিলতর হইয়াছে। শ্রীমান সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম গ্রন্থে এই বিষয় সংক্রান্ত নানা তথ্য ও অনুমান আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন তাহা গ্রহণযোগ্য রূপে স্বীকৃত হইতে পারে।"

সুখময়বাবুর যে সিদ্ধান্তটি ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক গ্রহণযোগ্যরূপে স্বীকৃত হইয়াছে তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার জন্য ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত গ্রন্থের ('বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা') ৫৯ পৃষ্ঠা খুলিলাম। দেখিলাম, উদ্‌ধৃত অংশের পর আছে, "অবশ্য কোন যুক্তিই একেবারে চূড়ান্তরূপে সংশয়নিরসক নহে। তথাপি রাজা ও রাজসভা প্রতিবেশ সম্বন্ধে নানা প্রমাণের বিবিধ আকর হইতে সংগৃহীত তথ্যাদির পরস্পর-পোষকতার জন্য ইহা যে সত্যাভিমুখী তাহা নিঃসংশয়। এই যুক্তিপরম্পরার অনুসরণে আমরা কৃত্তিবাসের জন্ম-সময়কে মোটামুটি ১৪৬০ হইতে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ এই কালপরিধির অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি। ইহাতে ইহার চৈতন্যপূর্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, অথচ তাঁহাকে চতুর্দশ শতকের শেষপাদে স্থাপন করার যে অনুমান আমাদের অতিরিক্ত প্রাচীনত্বপ্রীতির পরিচয় দেয় তাহাও খণ্ডিত হইয়াছে।"

সুখময়বাবুর যে সিদ্ধান্তের সহিত ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একমত সেটি তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে, কৃত্তিবাস ১৪৬০ হইতে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই উক্তি সুখময়বাবুর দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কারণ সুখময়বাবু এই উক্তিরই অব্যবহিত

পূর্ববর্তী কয়েক ছত্র 'কৃত্তিবাস-পরিচয়ে'র গ্রন্থভূমিকায় উদ্‌ধৃত করিয়াছেন। এই উক্তির প্রতিবাদ তিনি করেন নাই এবং মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তির কিয়দংশ তিনি 'আশার অতিরিক্ত' পুরস্কার রূপেই স্বীয় গ্রন্থের ভূমিকায় উদ্‌ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল, ১৪৬০ হইতে ১৪৯০-এর মধ্যে কোনো সময়ে কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়াছিল। সুখময়বাবুর এই সিদ্ধান্ত। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্যরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। এবং তাঁহার এই স্বীকৃতি দেখিয়া সুখময়বাবু সুখী হইয়াছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস সম্পর্কে আমাদের ধারণা অধিকতর অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। যে সমস্যা মীমাংসার আশা করিয়াছিলাম তাহার সম্ভাবনা আরও দূরে চলিয়া গেল।

জটিলতা কি ভাবে বাড়িল বলি। মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন সুখময়বাবুর উপস্থাপিত যুক্তিপরম্পরার সাহায্যে ১৪৬০ হইতে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কৃত্তিবাসের জন্ম-সময় স্থিরীকৃত হইবার ফলে কৃত্তিবাসের "চৈতন্যপূর্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়"।

কেমন করিয়া হয়? চৈতন্যদেবের জন্ম হয় ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪৮৬ হইতে ১৪৯০-এর মধ্যে হইলে চৈতন্যপূর্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় কিভাবে? ১৪৬০ সালে কৃত্তিবাসের জন্ম হইলেও ঐতিহাসিক বিচারে তাঁহাকে চৈতন্যপূর্ব বলা চলে না। আজিকার মধ্যবয়সী সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের রবীন্দ্রসমকালীন বলা হয়।

১৪৬০ হইতে ১৪৯০-এর মধ্যে জন্ম-সময় স্থিরীকৃত হওয়ায় মাননীয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে "তাঁহাকে [কৃত্তিবাস] চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে স্থাপন করার যে অনুমান ··· তাহাও খণ্ডিত হইয়াছে।" ইহা তো নিতান্তই নেতিবাচক সিদ্ধান্ত। এত প্রয়াসের কি নিষ্ফলা সমাপ্তি!

সুখময়বাবু কৃত্তিবাস সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার এবং তৎপূর্বসূরীদের গবেষণালব্ধ তথ্যাবলীকে একত্র সংশ্লিষ্ট করিয়া বিচার করিলে প্রকৃতপক্ষে গ্রহণযোগ্য একটা সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। কেবল নেতিবাচক সিদ্ধান্ত লইয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। আচার্য যোগেশচন্দ্র 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস ধরিয়া যে গণনা করিয়াছেন তাহাতে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দকে কৃত্তিবাসের জন্ম বৎসর ধরা হইয়াছে। এই জন্ম-বৎসরকে খণ্ডিত করার মত কোনো প্রমাণ তো আপাতত দেখা যাইতেছে না। সুখময়বাবুও সেরকম কোনো প্রমাণ উপস্থাপিত করেন নাই। বরং বলিব তাঁহার কোনো কোনো তথ্য এবং মত ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দকে কৃত্তিবাসের জন্ম-বৎসর বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে আনুকূল্যই করিতেছে। যেমন, ক. ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ এবং ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্যবধান অনেক। গৌরাঙ্গদেবের জন্মের কিছুদিন আগে নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ৮৮ বৎসর পূর্বেকার নবদ্বীপ সেরূপ নাও থাকিতে পারে। খ. ধ্রুবানন্দের মহাবংশবলীতে কৃত্তিবাসের উল্লেখ আছে। মহাবংশাবলী পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত। ধরিয়া লইলাম, মহাবংশাবলীর রচনাকাল ১৪৭৫। মহাবংশাবলীতে যখন নাম উঠিয়াছে তখন কৃত্তিবাসের খ্যাতি দেশে বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এবং সে-খ্যাতিও নিশ্চয় রামায়ণের খ্যাতি। সে খ্যাতি অল্পদিনে পরিব্যাপ্ত হয় না; রামায়ণ-রচনার পর ১৫ বা ২০ বা ৩০ বৎসর অন্ততঃ গিয়াছে। সে হিসাবেও জন্মকাল ১৩৯৮ ধরিতে বাধা হয় না। গ. কণাদ ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ-স্থানীয় কৃত্তিবাস (প্রতিপুরুষ ২৫ বৎসর ধরিয়া) ১৪৭৫ বা তাহার কাছাকাছি সময়ে জীবিত ছিলেন। ১৩৯৮ হইতে ১৪৭৫ পর্যন্ত অর্থাৎ ৭৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত

জীবিত থাকা খুবই স্বাভাবিক। ঘ. কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়াছিলেন তিনি যদি রুকনুদ্দিন বারবক শাহই হন তাহা হইলেও ক্ষতি নাই। বারবক শাহের রাজ্যকাল ১৪৫৯ হইতে ১৪৭৪। ধরিয়া লইলাম, রাজত্বের প্রথম ভাগেই কবি তাঁহার সভায় আসিয়াছিলেন। মনে করা যাক্, তিনি ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজসভায় আসেন এবং তাহার পরও কিছুদিন অর্থাৎ দশ-পনরো বৎসর জীবিত ছিলেন। তাহা হইলে ১৩৯৮ হইতে ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দ এই ৭৭ বৎসরকে কৃত্তিবাসের জীবৎকাল ধরিতে পারি। ঊর্ধ্বসীমা ১৩৯৮কে যতক্ষণ না অখণ্ডনীয় প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করা যাইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ সীমার রেখা যেখানে আছে সেখানেই থাক্। নিম্নতম সীমা ১৪৭৫ ধরিয়াছি। ইহাকে দুই-চার বৎসর এদিক ওদিক সরাইবার প্রয়োজন হইলে সরানো যায়, কিন্তু গৌরাঙ্গদেবের অতি সন্নিকট করায় বাধা আছে। আবার ১৪৬০এর ওদিকেও সরানো যায় না। সেই কারণেই ১৪৬০ ও ১৪৮৬র মাঝামাঝি ১৪৭৫ রাখিতেছি। ইহাতে তাঁহার জীবৎকালের নিম্নতম সীমার অনুমান সর্বাধিক যুক্তিসংগত হয়।

আর-একটা কথা বলিয়া রাখি, যে পরিবেশন-কৌশলের পরিপাট্য সাহিত্যের ইতিহাসের একটি অপরিহার্য গুণ বলিয়া তিনি স্বয়ং মনে করেন, তাঁহার গ্রন্থে সে পরিপাট্য ষোল-আনা রক্ষিত হইতে পারে নাই। ছাপার ভুলচুক অনেক আছে, তবে সে সম্পর্কে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং সে কথা আর তুলিব না। কিন্তু এ জাতীয় গ্রন্থে একটা বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট দিবার কথা তাঁহার মত গবেষকের মনেও উদিত হইল না, ইহা বিস্ময়কর বোধ হইতেছে। "এখনকার পাঠকেরা পাদটীকার পক্ষপাতী নন বলে এই বইয়ে পাদটীকা একেবারেই দেওয়া হয় নি।" তিনি তো নাটক উপন্যাস বা স্কুলপাঠ্য শিশুসাহিত্য লিখিতে বসেন নাই; কে কিসের পক্ষপাতী তাহার বিচার না করিয়া তাঁহার আলোচনার পক্ষে তাঁহার মতপ্রতিষ্ঠার পক্ষে যাহা-কিছু আবশ্যক তাহাই দেওয়া উচিত। পাদটীকা যেখানে দেওয়া আবশ্যক সেখানে অবশ্যই দিতে হইবে। যে পাঠক দেখিতে চান না তিনি দেখিবেন না, কিন্তু যাঁহার দেখা প্রয়োজন তাঁহাকে লেখক বঞ্চিত করিবেন কেন? নির্ঘণ্ট না থাকাতে এই প্রয়োজন আরও বেশি করিয়া অনুভূত হইবে, অন্ততঃ বর্তমান সমালোচক অনুভব করিয়াছেন।

সুখময়বাবু কৃত্তিবাস সম্পর্কে নূতনতর প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠকদিগের সুপ্তপ্রায় ঐতিহাসিক বিচারবুদ্ধিকে যে ভাবে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন তাহার জন্য আবার তাঁহাকে সাধুবাদ জানাই। লেখক পূর্বসূরীদের কাহারও কাহারও প্রতি কোনো কোনো স্থলে কিছু রূঢ় কথা বলিয়াছেন। যেমন, অধ্যাপক সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' সম্বন্ধে লেখকের উক্তি: "আদর্শ এবং পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে শুধুমাত্র বিভিন্ন যুগের রচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকে না, সেই সঙ্গে থাকে সাহিত্যের রসগ্রাহী আলোচনা, তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ যুগের সাহিত্যের গঠন তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের প্রভাব সূক্ষ্মভাবে নিরূপিত হয়; তার ভাষা ও পরিবেশনকৌশলেও পারিপাট্য থাকা চাই, সাহিত্যের ইতিহাস নীরস তালিকামাত্র হলে চলবে না, তাকে সাহিত্যপদবাচ্যও হতে হবে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' দেখা যায় না।" —প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃ ৩০৭। কয়েকজন কবির আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ডক্টর সুকুমার সেনের মতের বিচার প্রসঙ্গে সুখময়বাবু এই উক্তি করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত যথার্থ কি অযথার্থ সে আলোচনা নিষ্ফল, কিন্তু এই উক্তি যে এস্থলে অবান্তর তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

সুখময়বাবুর ক্ষেত্র সাহিত্যরসবিচারের ক্ষেত্র নয়। এবং এই রসবিচারের অবান্তর প্রসঙ্গ বাদ দিলেও তাঁহার গবেষণার মূল্য ও মর্যাদা তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইত না, এ কথা তিনি যদি এখনও বুঝিয়া না থাকেন তো সেজন্য তাঁহার দোষ দিব না, দোষ দিব তাঁর তরুণবয়সের। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সে বয়স উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই সাহিত্য-ইতিহাসের যেসকল সমস্যা এখনও সমাধানের প্রতীক্ষা করিতেছে তাঁহার হাতে সেগুলির সদ্‌গতি হউক।

শ্রীমতী প্রভাময়ী দেবীর 'বাংলা আখ্যায়িকা-কাব্য' বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের অর্ধশতাব্দীব্যাপী একটি অধ্যায়ের আংশিক ইতিহাস। "প্রস্তুত নিবন্ধে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত ও প্রকাশিত কাহিনীকাব্যগুলি আলোচিত হইয়াছে। ইহার আরম্ভে মাইকেল মধুসূদন, সমাপ্তিতে কিশোর রবীন্দ্রনাথ। এই দুই মহাকবির নাম হইতেই আলোচিত কাব্যধারার আদ্যন্ত সীমা ও বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট— বাংলা কাব্যসাহিত্যে ইহা পরিবর্তনের যুগ।" এই বলিয়া গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার আলোচনার পরিধি নির্দেশ করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে আখ্যায়িকা-কাব্য অনেক লেখা হইয়াছিল। এই শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত গ্রন্থগুলিই লেখিকার আলোচনার বিষয়। সাহিত্যিক বিচারে এই কাব্যগুলির বিশেষ কোনো মূল্য নাই। গ্রন্থের মুখবন্ধ-লেখক এবং গ্রন্থকর্ত্রীর গবেষণা-পরিচালক অধ্যাপক সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "আলোচিত কাব্যগুলি অর্থাৎ পদ্যে লেখা আখ্যায়িকাগুলি অধিকাংশই সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে অকিঞ্চিৎকর।" তথাপি অধ্যাপক-মহাশয় শ্রীমতী প্রভাময়ী দেবীকে "এই লুপ্ত আখ্যায়িকা কাব্যগুলির পরিচয় উদ্ধারকার্যে নিযুক্ত" করেন। কেন করেন? "একদা সাধারণ পাঠকের ও সাধারণ লেখকের রুচি ও প্রবণতা কোন্ পথে ধাবিত হয়েছিল তার একটা অব্যর্থ ইঙ্গিত এগুলিতে" পাওয়া যায় বলিয়া।

লেখিকাও সবিনয়ে স্বীকার করিয়াছেন "আলোচিত আখ্যায়িকা-কাব্যগুলির মধ্যে অধিকাংশেরই কোনো রকম স্থায়ী মূল্য নাই" এবং বর্তমান কালের পাঠকসমাজের নিকট সেগুলি যে উপেক্ষিত তাহাতেও বিস্মিত হইবার কিছু নাই। "কিন্তু একদা যে প্রচেষ্টার ফলে এই আখ্যায়িকা-কাব্যগুলি উদ্ভূত হইয়াছিল সেই প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক মূল্য আছে।" আর "সেই ঐতিহাসিক মূল্য যাচাই করিবার উপাদান" হিসাবেই এই নিবন্ধ গ্রন্থের অবতারণা। "যে বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থগুলি একদা বাঙ্গালী পাঠকের অল্পবিস্তর মনোরঞ্জন করিয়াছিল, সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান, তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক নির্ণয় এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের পূর্বাপর ইতিহাসের সহিত তাহাদের সংযোগসূত্র আবিষ্কার" করিবার জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। সর্বশুদ্ধ ৬৮জন লেখক এবং ৯৬খানি পুস্তকের আলোচনা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

এই ৬৮জন লেখকের সব কয়জনই এবং ৯৬খানি পুস্তকের সব কয়টিই যে আমাদের অপরিচিত তাহা যেন কেহ না মনে করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণ; রবীন্দ্রনাথের কবিকাহিনী, ভগ্নতরী; নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ, রঙ্গমতী, রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস; রঙ্গলালের পদ্মিনীউপাখ্যান প্রভৃতি কাব্য আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীকে আমরা অল্পস্বল্প জানি— যাঁহার সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম ও অপর্যাপ্ত উৎসাহ কবির 'সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত'। ইহার লিখিত 'উদাসিনী' নামক

একটি কাব্য আছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে ইহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। প্রভাময়ী দেবী তাঁহার গ্রন্থে সেই কাব্যটিরও পরিচয় দিয়াছেন। লেখিকার ভাষা পরিচ্ছন্ন এবং বিষয়বিন্যাস সুশৃঙ্খল। একটি বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট, এসব গ্রন্থে যাহা একান্ত আবশ্যক, গ্রন্থশেষে দেওয়া হইয়াছে।

শিব বিষয়ক উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালা কাব্যগুলির মধ্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন যে শ্রেষ্ঠতম এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় এ বিষয়ে মতান্তর নাই বলিলেই হয়।

চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর।

বর্তমান কালের অধিকতর সন্নিহিত বলিয়াও বটে এবং 'ভদ্রকাব্য' বলিয়াও বটে রামেশ্বরের শিবায়ন যে পরিমাণ প্রচার লাভ করিয়াছে আর কোনো শিব-বিষয়ক কাব্য তেমন করে নাই। রামেশ্বরের শিবায়নের রচনাকাল ১৬৩২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ একখানি সুবৃহৎ শিবায়ন-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থটি সেই কাব্যেরই মুদ্রিত সংস্করণ। এই কাব্যের দুইটিমাত্র পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এখন হইতে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে প্রথম পুঁথি সংগৃহীত হয়। ষষ্ঠ বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ বসু ও মৃণালকান্তি ঘোষ তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছিলেন। শিবায়নের দ্বিতীয় পুঁথির বিবরণ বাহির হয় ১৩৪৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়। প্রকাশ করেন কবির বংশধর শ্রীপাঁচুগোপাল রায়। 'তাঁহার সযত্নরক্ষিত পুথি' পরিষদে দান করার ফলেই এই মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের মুদ্রিত গ্রন্থভাণ্ডারে যে একটি নবরত্ন সংযোজিত হইল সেজন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং সুযোগ্য সম্পাদকদ্বয়ের নিকট বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমাজ অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ রহিলেন।

রামকৃষ্ণ রচিত শিবায়নের মূল্যবত্তা নানা দিক দিয়া বিচার্য। গ্রন্থটি সুবৃহৎ— ২৬টি পালায় বিভক্ত। প্রত্যেকটি পালাই পৌরাণিক কাহিনীতে পূর্ণ। পুরাণ-বিষয়ে কবির যে গভীর জ্ঞান ছিল এবং তিনি যে বিবিধ পুরাণকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাব্য রচনায় ব্রতী হইয়াছেন অনেকগুলি ভণিতার মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

আপনার মনোরথে নানা পুরাণের মতে
বিরচিল পাঁচালি প্রবন্ধ। পৃ ৮
কবিচন্দ্র রচে গীত পুরাণের দৃষ্টে। পৃ ১৫
কবিচন্দ্র ভণে শুদ্ধ পুরাণপ্রমাণ। পৃ ২১
রামকৃষ্ণ দাস গায় পুরাণপ্রমাণ। পৃ ৩৯
রামকৃষ্ণ দাস রচে কাশীখণ্ড মতে। পৃ ৪৫
রামকৃষ্ণ দাস গায় কাশীখণ্ড মতে। পৃ ৫৪
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবায়ন গীতে।
তারকময়ের গীত হরিবংশ মতে॥ পৃ ৬৬

গৌরী শঙ্করের পায়ে রামকৃষ্ণ দাস গায়ে
পণ্ডিত ক্ষমিবে কাব্যদোষ।
নানা পুরাণের কথা প্রবন্ধে গিয়াছে গাঁথা
শুনিঞা পাইবে পরিতোষ ॥ পৃ ১৬৯
ভস্মের সমান নহে চন্দনের গন্ধ
রামকৃষ্ণ দাস গায় পুরাণ প্রবন্ধ ॥ পৃ ১৭৯
কবিচন্দ্র রচে গীত শিবের মঙ্গল।
শুনহ পুরাণকথা সর্বতীর্থফল ॥ পৃ ২০৬
মহাভারতের কথা এই বনপর্বে।
গ্রন্থগৌরবভয় রচিল সংক্ষেপে ॥
এখনে রচিব বৃহন্নরাদির[1] মতে।
শিবের কুশলে রামকৃষ্ণ বিরচিতে ॥ পৃ ২১৩
রচে রামকৃষ্ণ দাস পুরাণ প্রমাণ ॥ পৃ ২২৬
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবায়ন গীতে।
কুমারের জন্মকথা শান্তিপর্ব মতে। পৃ ২২৯
নানা পুরাণের কথা প্রবন্ধে গিয়াছে গাঁথা
শুনিলে সভার হয় প্রীত ॥ পৃ ২৩৭
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের মঙ্গল।
ইতিহাসকথা গঙ্গা গৌরীর কন্দল। পৃ ২৪০
অন্ধকবধের কথা গাই এই ক্রমে।
হরিবংশ মতে তাহা রচিব প্রথমে ॥ পৃ ২৪৫

পয়ার ত্রিপদী ছাড়াও কয়েকটি ছন্দের প্রয়োগ এই কাব্যে দেখা যায়। মাত্রাবৃত্ত। যেমন, কৃষ্ণের বন্দনায়,—

নীপ সমীপ নীল নব নীরদ তড়িত লতা তহি সাঙ্গ।
রাধা অঙ্গে অঙ্গ অবলম্বন পীতাম্বর তিরিভঙ্গ ॥
বন্দহুঁ বৃন্দাবনে ব্রজবেশ।
নয়ন ইন্দীবর মুখশশী সুন্দর
চন্দ্রক চুম্বিত কেশ ॥ ধ্রু ॥
কুণ্ডল মণিময় অঙ্গদ সুবলয়
তনুচিত্রিত ঘনসার।
দ্বিভুজ মনোহর বর মুরলীধর
উরে কৌস্তুভ বনমাল ॥ পৃ ৩

১. এইরূপই মুদ্রিত আছে এবং 'পাঠান্তর ও পাঠশুদ্ধি' নির্দেশের মধ্যে বা অন্য কোথাও এই শব্দ সম্পর্কে উল্লেখ নাই।

এ ছন্দ গীতগোবিন্দকে স্মরণ করাইয়া দেয়। মহাকালী-বন্দনার জন্যও কবি মামুলী ছন্দের ব্যবহার না করিয়া মাত্রাবৃত্তের আশ্রয় লইয়াছেন—

যুকত জটা মদ ঘূর্ণিত নয়না।
রুধিরপান পরিপূর্ণিত বদনা॥· ·
ভীম ভবার্ণব ভীষিত শরণা
রামকৃষ্ণ কবি সেবিত চরণা॥ পৃ ৬

একটি শিববন্দনার পদে এক 'দশাক্ষর' ছন্দের প্রয়োগ দেখা গেল। পদের আরম্ভে, সুরের সংকেত হিসাবেই বোধ হয় লেখা আছে 'গীত দশাক্ষরা'। নিদর্শন দিতেছি—

রজত অচল কলেবরে।
আধ শশী মুকুট উপরে॥
বিশদ জটাজুট ভারা
তাহে উরধ জলধারা॥· ·
সকল গুণাকর শীলে।
গণবর জলধর নীলে॥
ভূত ভবিষ্যতি নীতে।
বিষধরবর উপবীতে॥ পৃ ১৩

অথবা—

তনু ডোর যেন কাঁচ লুনি।
রৌদ্রে মিলাবে হেন জানি॥
স্বভাবে তুমি সে কমলিনী
হিমপাতে হারাবে পরাণী॥ পৃ ৮০

এ ছন্দ আমাদের অজ্ঞাত নহে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার অসদ্ভাব নাই। কৃষ্ণকীর্তনের এই পদ তুলনীয়—

ষোল শত রাধার সঙ্গিণী।
তার থান চলহ আপুণী॥
একেঁ একেঁ কর যোড়হাথে
তবে বাঁশী পাইবেঁ জগন্নাথে।

খাঁটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্লোকের নিদর্শনও এই গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন—

হরি হরাত্মনে নমো হরয়ে হরয়ে।
পার্বতীপতয়ে নমো কমলাপতয়ে॥
ধরণীধরায় নমো গঙ্গাধরায়।
কনকবাসসে নমো দিগম্বরায়॥

ইহা হইতে কবির সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য সপ্রমাণ হয়।

'সভাসদ পণ্ডিতেরে আমার ভকতি' (পৃ ৭) এই ছত্রটি অবলম্বন করিয়া সম্পাদক মহাশয়দ্বয় বলিতে চান, "নিজ সভাপণ্ডিতের নিকটই তিনি পুরাণ শ্রবণকালে সকল শাস্ত্রের সারভাগ জ্ঞাত হইয়াছিলেন।" সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, স্বয়ং পুরাণপাঠ করিয়া জ্ঞানসঞ্চয় করার পক্ষে তাঁহার তো কোনো বাধা ছিল না। তিনি নিজে শাস্ত্রাদি সযত্নে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এই অনুমানই তো স্বাভাবিক এবং সংগত। তিনি কায়স্থ বলিয়া শাস্ত্র পাঠ করেন নাই এমন মনে করিবার কি হেতু আছে? কায়স্থের পক্ষে কি সকল শাস্ত্র অধ্যয়নই নিষিদ্ধ ছিল?

রামকৃষ্ণের শিবায়নে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস -বিষয়ে একটি বিশিষ্ট উপকরণ আছে। সম্পাদক-মহাশয়দ্বয় গ্রন্থপরিচায়ক ভূমিকায় সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না করায় একটু বিস্ময়বোধ করিতেছি। আমি পুরাতন বাঙ্গালা গদ্যের নমুনার কথা বলেতেছি।

এই কাব্যের কয়েক স্থলে দুই চার ছত্র গদ্য আছে। যেমন—

"ভাই রে নারদের পরিহাসে মেনকা রোদন করিতেছেন, এমত সময়ে কেমন স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা সকল আসিতেছেন, অবধান করহ।" পৃ ১২৫

"অতঃপর তারা প্রভৃতি দেবতারা সকল শিবের তরে প্রহেলিকা প্রবন্ধে গৌরীকে সমর্পণ করিয়া কথোপকাল পালন করি বা হবেক ইঙ্গিত করিতেছেন অবধান করহ।" পৃঃ ১৪৬।

"শুক্রাচার্য বলি রাজাকে কহিতেছেন।" পৃ ২০৩

"পার্বতী ভাগীরথী স্নান করিতে গেলেন এমত সময়ে শঙ্কর মনের দুঃখ নারদকে কহিতেছেন অবধান করহ।" পৃ ২৩৬

সম্পাদকদ্বয় গ্রন্থটি পাঠকসমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং আলোচনারও সূত্রপাত করিয়া দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আলোচনার যেটুকু বাকী আছে সেজন্য তাঁহাদের দায়ী করা অন্যায়। তবে আমাদের স্বভাবের এই এক দোষ, আমরা যাহার কাছে কিছু পাই, তাহার কাছেই আরও পাইতে চাই।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

রূপসী বাংলা। জীবনানন্দ দাশ। সিগনেট প্রেস, কলকাতা ২০। তিন টাকা।

বেলা অবেলা কালবেলা। জীবনানন্দ দাশ। নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা ১২। তিন টাকা।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য, একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে, জীবনানন্দের কাব্য যে কোথাও সংকীর্ণ দেশ-ভাবনার দ্বারা আক্রান্ত নয়, এই সহজ কথাটাকে বোঝাতে গিয়ে সেদিন বিশিষ্ট একজন বক্তা সেখানে একটি চমকপ্রদ প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "তাঁর কাব্যে কোথাও বাংলাদেশের উল্লেখ পর্যন্ত নেই।" তার কিছুকাল বাদেই প্রকাশিত হল 'রূপসী বাংলা', বাংলাদেশের নাম যে-বইয়ের বিভিন্ন কবিতায় অন্তত একবার, এবং কোনও-কোনও কবিতায় একাধিকবার, উচ্চারিত হয়েছে।

না-হলেও ক্ষতি ছিল না। কেননা, 'রূপসী বাংলা' যদি না-ও প্রকাশিত হত, তাঁর অন্যান্য বইয়ের কবিতা

থেকেই স্পষ্ট করে চিনে নেওয়া সম্ভব ছিল যে, জীবনানন্দ এই বাংলাদেশেরই কবি। গ্রাম-বাংলার জল মাটি মানুষ মাঠ অরণ্য আকাশ শীত শরৎ আর হেমন্ত— বিশেষ করে সেই হেমন্তকাল, বাংলা দেশের বাইরে যাকে স্পষ্ট করে চিনতে পারাই অতি কঠিন কর্ম— তাঁর কবিতায় বারবার ছায়া ফেলেছে। বলা বাহুল্য, বিশ্বমানবের বিপন্ন যন্ত্রণা তাঁর কবিতায় একটি অমোঘ ভাষা পেয়েছিল ; কিন্তু তার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, কবিতার বাতাবরণ— রচনার ব্যাপারে তাঁর জন্মভূমির সঙ্গে তিনি কোনও যোগ রাখেন নি।

যোগ না-রাখবার দরকারই বা হবে কেন। দেশভাবনা কি বিশ্বভাবনার পরিপন্থী ? অবশ্যই নয়। সৎ একজন কবির ক্ষেত্রে তো নয়ই। দেশকে ভালোবেসেও তিনি বিশ্বপৃথিবীকে ভালোবাসতে পারেন। এমনকি দেশকে ভালোবাসেন বলেই হয়তো বিদেশকে ভালোবাসা তাঁর পক্ষে কঠিন হয় না। কথাটা কি স্বয়ংবিরোধী শোনাল ? শোনানো উচিত নয়। কেননা, ভালোবাসার সীমানা যতই বড় হোক, তার একটা প্রত্যক্ষ অবলম্বন দরকার। নিজের দেশ নিজের কাল ইত্যাদিই সেই প্রত্যক্ষ অবলম্বন— চোখের সামনে যাকে দেখা যায়, হাত বাড়িয়ে যাকে ছোঁয়া যায়, রক্তে যাকে অনুভব করা যায়। সেই প্রত্যক্ষ অবলম্বনকে উপেক্ষা করে কেউ কখনও মহাপৃথিবী কিংবা মহাকালের প্রেমিক হতে পেরেছেন, এমন কথা মেনে নেওয়া একটু শক্ত ব্যাপার।

এক্ষেত্রে আরও শক্ত হচ্ছে। তার কারণ, জীবনানন্দের দৃষ্টি যে কখনও ভৌমিক কিংবা কালগত কোনও সংকীর্ণতার দ্বারা আক্রান্ত হয় নি, সে তো তাঁর কবিতা পড়েই আমরা জানতে পারি। অথচ, যেমন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কিংবা 'বনলতা সেন'এ, ঠিক তেমনি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত এই সংকলন-দুটিতেও দেখতে পাচ্ছি যে, স্বভূমি এবং সমকাল সম্পর্কে তাঁর মমতা ছিল অতিমাত্রায় গভীর। তা নইলে কি সেই ভূমি এবং সেই কালের চিত্রগুলি তাঁর কবিতায় এইভাবে ফিরে-ফিরে আসত ?— তাঁর সমগ্র সত্তাকে এত প্রবলভাবে এসে নাড়া দিয়ে যেত ? আবারও বলি, জীবনানন্দ এই মহাপৃথিবীর কবি। কিন্তু, পৃথিবীর যে অংশে তিনি লালিত হয়েছিলেন, যার হাওয়ায় তিনি নিশ্বাস নিয়েছিলেন, যার শ্যামল সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, সেই অংশটুকুর প্রতিও তাঁর আসক্তি ছিল দুর্নিবার। তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে সেই খণ্ডপৃথিবীকে— অর্থাৎ তাঁর জন্মভূমিকে— তিনি ভালোবেসেছিলেন।

ভালোবাসলে বেদনা পেতে হয়। 'রূপসী বাংলা'য় কি সেই বেদনা আছে ? অথবা 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় ? তা ছাড়া আর কী আছে, জানা নেই। বেদনা, বেদনা, বেদনা। বিশাল ব্যাপ্ত একটি বেদনাই এই বই-দুখানিকে অধিকার করে আছে। বিশাল, তবু তীব্র। ব্যাপ্ত, তবু সূচীমুখ। এতই সূচীমুখ যে, তার সঙ্গে পরিচিত হবার পরমুহূর্তেই যেন হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি হঠাৎ ঝনঝন করে ওঠে। নিতান্ত অদীক্ষিত পাঠকের পক্ষেও তখন সেই বেদনার হাতে নিজেকে সঁপে না দিয়ে উপায় থাকে না। সঁপে দিয়ে মনে হয়, যেন আরও শুদ্ধ, আরও পবিত্র হওয়া গেল।

আলোচনার পরিধি আরও বাড়ানো যায়। বলা যায় যে, আধুনিক জীবনের সংশয় বুদ্ধির বিপন্নতা সভ্যতার অবক্ষয় ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর অনেক মৌল চিন্তা ছিল। বলা যায় যে, 'রূপসী বাংলা'য় না হোক, 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় সেই চিন্তার স্বাক্ষর সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। তা ছাড়া, জীবনের চূড়ান্ত জয় সম্পর্কে যে প্রগাঢ় প্রত্যয় তিনি লালন করতেন— যা তাঁর আর্তিকে কখনও আর্তনাদে পর্যবসিত হতে দেয় নি— সেই প্রত্যয়ের সম্পর্কেও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা এখানে বলা যায়। কিন্তু আপাতত আলোচনার মধ্যে আমরা

যাব না। আপাতত শুধু এইটুকুই বলব যে, অন্তহীন বেদনাই ছিল তাঁর কবিসত্তার সবচাইতে নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞান; এবং সেই অভিজ্ঞান তাঁর এই বই-দুখানির মধ্যে স্পষ্ট এবং প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছে।—

'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?'

স্বয়ং জীবনানন্দই বাসতেন। কিন্তু কী মহৎ সেই বেদনা, 'রূপসী বাংলা' এবং 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় আমরা আরও একবার তার প্রমাণ পেলাম।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

স্বী কৃ তি

রাজশেখর বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র শ্রীআশা বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের চিঠি রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত পারাবত চিত্রের ব্লক রবীন্দ্র-ভারতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

স্বরলিপি

আমার আপন গান আমার অগোচরে আমার মন হরণ করে,
নিয়ে সে যায় ভাসায়ে সকল সীমারই পারে ॥
ওই-যে দূরে কূলে কূলে ফাগুন উচ্ছ্বসিত ফুলে ফুলে—
সেথা হতে আসে দুরন্ত হাওয়া, লাগে আমার পালে ॥
কোথায় তুমি মম অজানা সাথি
কাটাও বিজনে বিরহরাতি,
এসো এসো উধাও পথের যাত্রী—
তরী আমার টলোমলো ভরা জোয়ারে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

মধ্যলয়ে গেয়। গানটির বিশেষ গীতরূপ অবশ্যরক্ষণীয়

II সা -া রা -সা । -রা -সা -রা -সা I -রা -পা^ধ -মপা ^প-মা । -মা -জ্ঞা -া -মা I
আ • মা • • • • • • • •• • • • • র্

I মা -া পা -মা । -পা -মা মণা ^ধ-ণা I মা -া -জ্ঞা -া । -া -া -রজ্ঞা -মপা I
আ • প • • • ন• • গা • • • • • •• •ন্

I সা -া রা -সা । -রা -সা -রা -সা I -রা -পা^ধ -মপা ^প-মা । -মা -জ্ঞা -া -মা I
আ • মা • • • • • • • •• • • • • র্

I মা -পা পা -া । -পা -ধা -ণা^র -র্সা I র্সধা -র্সা ^র্সণা ^প-ধপা । পমা -ধপা মা -জ্ঞা I
আ • মা • • • • র্ অ• • গো •• চ• ••রে •

I -া -া -া -া । -া -া -মা -পা I সা -া রা -সা । -রা -সা -রা -সা I
• • • • • • • • আ • মা • • • • •

I -রা -পা^ধ -মপা -মা^প । -মা -জ্ঞা -া -মা I মা -পা পা -া । -া -া পা ধা I
• • •• • • • • র্ আ • মা • • র্ ম ন

I ণা^হ -র্সা র্সা -না । ^নর্সা -ণা ণা -ধা I ধা -ণা -পা -া । -া -া পা ধা I
হ • র • ণ • ক • রে • • • • • নি য়ে

I না -া র্সা -া । র্রা -া র্রা -া I -া ^র্স-র্রা র্রা -র্মা । -র্জ্ঞা -া -া -া I
গে • যা য়্ ভা • সা • • • য়ে • • • • •

I র্জ্ঞা -া র্জ্ঞর্মা ^র্জ্ঞর্মা । র্রা -র্সা ^নর্সা -ধা I ^ধণা -পা মপা -ধপা । মা -জ্ঞা -া -া I
স • ক• ল সী • মা • রি • পা• •• রে • • •

I রা -সা রা -সা । -রা -সা -রা -সা I -রা -পা^ধ -মপা ^প-মা । -মা -জ্ঞা -া -মা I
আ • মা • • • • • • • •• • • • • র্

I মা -া ^মণা -ধা । ধা -া ধা -না I না -া র্সা -র্রা । র্সনা -া র্সা -া I
ও ই যে • দূ • রে • কূ • লে • কূ• • লে •

I না -া র্সা না । ^নর্সা -না র্সা র্সর্রা I না -র্সা -ণা^হ -ধা । ধা -ণপা পা -ধমা I
ফা ল্ গু ন উ চ্ ছ্ব সি• ত • • • ফু •• লে ••

I মপা -ধপা মা -জ্ঞা । মা -া ^মণা -ধা I ধা -া ধা -না । না -া র্সা -র্রা I
ফু• •• লে • ও ই যে • দূ • রে • কূ • লে •

I র্সনা -া র্সা -া । না -া র্সা না I ^নর্সা -না র্সা র্সর্রা । না -র্সা -ণা^হ -ধা I
কূ• • লে • ফা ল্ গু ন উ চ্ ছ্ব সি• ত • • •

I ধা -ণপা পা -ধমা । মপা -ধপা মা -জ্ঞা I র্সনা র্সা র্রা র্রা । র্রা -া র্রা -া I
ফু ·· লে ·· ফু· ·· লে · সে· থা হ তে আ · সে ·

I -া -া র্রা -া । র্মা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্মা -র্মা -র্রা -র্সা । -র্রা -না -র্সা -া I
· · ভু · র ন্ ত হাও য়া · · · · · · ·

I র্সনা র্সর্রা র্সা -ধা । ণা -পা মপা -ধপা I মা -জ্ঞা -া -া । -া -া -া -া I
লা· গে· আ · মা য্ পা· ·· লে · · · · · · ·

I রা -সা রা -সা । -রা -সা -রা -সা I -রা -পা -মপা -মা । -মা -জ্ঞা -া -মা I
আ · মা · · · · · · · ·· · · · · য্

I মা -া মা -পা । পা পা পা পা I পা পা পা -া । পা -পা ণা -দা I
কো · থা · তু মি ম ম অ জা না · সা · থি ·

I -া -া -া -ণা । -পা -া -া -দা I মা -পা মা -ণা । ধা ধপা পণা -মা I
· · · · · · · · কা · টা ও বি জ· নে· ·

I মা পা পণা -মা । মপধপা -মপা মা-জ্ঞা I মা -া মা -পা । পা পা পা পা I
বি র হ· · রা·· · ·· তি · কো · থা · তু মি ম ম

I পা পা পা -া । পা -পা পা -র্সা I -ণা -া -া -া । -া -া -া -ধা I
অ জা না · সা · থী · · · · · · · · ·

I ধা -া ধা -ণা । ধা ধপা পণা -মা I মা পা পণা -মা । মপধপা-মপা মা-জ্ঞা I
কা · টা ও বি জ· নে· · বি র হ· · রা····· তি ·

I মা -া পা -া । পণা -পা না -া I না -া র্সা -র্রা । নপা -পা না না I
এ • সো • এ• • সো • উ • ধা ও প• • থে র্

I না -া র্সা -া । -া -া -া -া I র্সনা র্সা র্রা -া । র্রা -া -া -া I
যা • ত্রী • • • • • ত• রী আ • মা • • র্

I র্রা -া র্রা -র্সা । র্রা -র্সর্রা র্রা -র্মা I -র্জ্জা -া -া -া । -া -া -া -া I
ট • লো • ম • • লো • • • • • • • • •

I র্জ্জা র্জ্জর্মা র্জ্জর্মা -র্রা । র্সর্রা -না -নর্সা -ধা I -ধণা -পা -ধমপা -ধপা । মা -জ্জা -া -া II II
ভ রা• জো • যা • • • • • • • • • রে • • •

—

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৮ সংখ্যা ২ কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮ · ১৮৮৩ শক

চিঠিপত্র মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু,

মণিলাল, আমি "শিশু"র গোটাকতক কবিতা তর্জ্জমা করেছি, সেগুলো এঁদের খুব ভাল লেগেছে। Rothensteinএর ইচ্ছা অবন কিম্বা নন্দলাল যদি গোটা তিন চার ছবি করে দিতে পারেন তাহলে একটি ছোট বই করে ছাপতে দেন। অবনের হাত থেকে চটপট ছবি বের করা শক্ত অতএব নন্দলাল যদি শীঘ্র গোটাকয়েক ছবি করে পাঠাতে পারেন তবে ভাল হয়। অক্টোবরের মধ্যে আমাদের পাওয়া চাই। Reproduction খুবই ভাল হবে। নিম্নলিখিত কবিতাগুলি তর্জ্জমা করা হয়েছে :— ১ জগৎ পারাবারের তীরে, ২ জন্মকথা, ৩ খোকা, ৪ অপযশ, ৫ বিচার, ৬ চাকুরী, ৭ নির্লিপ্ত, ৮ কেন মধুর, ৯ ভিতরে ও বাহিরে, ১০ প্রশ্ন, ১১ সমব্যথী, ১২ বিজ্ঞ, ১৩ ব্যাকুল, ১৪ সমালোচক, ১৫ বীরপুরুষ, ১৬ রাজার বাড়ি, ১৭ নৌকাযাত্রা, ১৮ জ্যোতিষশাস্ত্র, ১৯ মাতৃবৎসল, ২০ লুকাচুরি, ২১ বিদায়, ২২ কাগজের নৌকা। এর মধ্যে থেকে যে কটা খুসি চেষ্টা করে দেখ্‌তে বোলো। গগন যদি করতে পারেন তা তাহলে আমি আরো খুসি হই। যদি চেষ্টা করতে গিয়ে একবার তার হাত খুলে যায় তাহলে আর দেরি হবে না। যেমন যেমন একটা একটা হবে অম্‌নি যদি পাঠিয়ে দেন তাহলেই ভাল হয়— সবগুলো শেষ করে পাঠাতে হলে দেরি হবে। তোমাদের চারিদিকে ষষ্ঠীর প্রসাদে খোকাখুকির ত অভাব নেই অতএব ছবির জন্য আদর্শ খুঁজতে হবে না।

আমি তর্জ্জমার কাজে লেগেই আছি। এদের সকলেরই খুব ভাল লাগ্‌চে। আমার ইংরেজি যে কোনো সভ্য দেশে চল্‌তে পারে সে কথা আমি মনেও করতে পারতুম না কিন্তু দেখা যাচ্চে একেবারে হুহুঃ শব্দে চল্‌চে। ক্রমশ তার পরিচয় পাবে। চিত্রাঙ্গদা আমি সেরে ফেলেছি। আরো অনেকগুলো শেষ হয়ে গেছে।

সত্যেন্দ্রকে বোলো সে যদি আমার কতকগুলো লেখা ইংরেজি গদ্যে (পদ্যে নয়) তর্জ্জমা করে দিতে পারে আমি খুব খুসি হব। সে অনেকের কবিতা বাংলায় তর্জ্জমা করেছে কিন্তু আমার কবিতা বাংলায় তর্জ্জমা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলেই আমি বঞ্চিত হয়েছি. একবার ইংরেজিতে চেষ্টা করে দেখ্‌তে বোলো।

শনিবারে লণ্ডনে যাচ্চি। অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত তোমরা যেদিন ইচ্ছা কর সেখানে এলে আমার সঙ্গে দেখা হবে। ইতি ৫ই ভাদ্র ১৩১৯

তোমার
রবিদাদা

২

508 W High Street
Urbana. Illinois

কল্যাণীয়েষু,

মণিলাল— বেশ দেখা যাচ্চে এই জগৎ সংসারে ডাকঘর বিভাগের কর্ত্তা মনোযোগপূর্ব্বক কাজ দেখেন না। আমার শুভ পরিণয়ের খবর এবং নিমন্ত্রণপত্র যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা ধন্য— কিন্তু বর এখনো পান নি— এবং যদি বধূ কেউ থাকেন তাহলে তাঁরও হস্তগত হয় নি। সুতরাং আমার নাৎনী এবং নাৎজামাইদের এখনো সম্পূর্ণ হতাশ হবার সময় আসে নি। একটা কাজ করতে পার— যাঁরা আগেভাগে সংবাদ পেয়েছেন তাঁদের জানাতে পার যে তাঁরা যদি এই ঠিকানায় আইবুড় ভাত পাঠান তাহলে সেটা একেবারে নষ্ট হবে না।

তোমার বইগুলি পেয়েছি। এখনো দেখ্‌তে সময় পাই নি— শীঘ্র যে সময় পাব তারও সম্ভাবনা নেই।

Yeats ডাকঘর পড়ে খুব খুসি হয়েছেন— তিনি লিখেছেন most beautiful!! কাল Rothensteinএর চিঠি পেয়েছি তাতে তিনি জানিয়েছেন Yeats thinks the Post Office a masterpiece and would like the Dublin Theatre people to produce it. He is talking the matter over with the Irish Theatre people.

আমি ত ভেবে পাইনে ডাকঘরের দইওয়ালা, ঠাকুরদাদা, মোড়ল প্রভৃতি ব্যাপার এদেশের লোকের কেমন করে ভাল লাগবে। সম্ভবত আগামী গ্রীষ্মের সময় ওটার অভিনয় হবে তখন আমরা ইংলণ্ডে গিয়ে হয়ত দেখতে পাব।

জীবনস্মৃতির বাঁধানো বই এখনো আমার হাতে আসে নি। আলগা অবস্থায় যখন এসেছিল তখনই ওর ছবিগুলো দেখেছি। যাঁরা দেখেছেন সকলেরই খুব ভাল লেগেছে। এখানকার একজন অধ্যাপককে দেখাচ্ছিলুম তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। গগনের এই ছবিগুলি যে আমার জীবনস্মৃতির সঙ্গে এমন সুন্দরভাবে জড়িত হয়ে রইল এতে আমি ভারি আনন্দ বোধ করচি। ছিন্নপত্রটা সাধারণ পাঠকদের কি রকম লাগ্‌চে? আমার ভয় হয় পাছে ওটাকে নিয়ে কেউ কোনোরূপ বিদ্রূপ করে। করা খুব সহজ— কেননা ওটা অত্যন্ত ঘরের জিনিষ— নিষ্ঠুরতায় অনেকের বিশেষ আনন্দ আছে। তোমার ঝাঁপি নিশ্চয় পেয়েছি— পড়েওছি— ওগুলি ত প্রায় সবই আমার পড়া ছিল। তোমার এই রেশমের উপরে ফিকে রঙের জাপানী তুলির কাজ— এর একটা বিশেষ বাহার আছে— এ যেন দিবানিদ্রার তীরে বসে সুগন্ধি অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া দিয়ে গড়ে তুলেছ। ইতি ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩১৯

তোমার
রবিদাদা

৩

Santiniketan
Bolpur
July 8, 1914

কল্যাণীয়েষু,

ভাই মণিলাল, বিহারীকে দিয়ে যদি পাঠিয়ে থাক তবে নিশ্চয় রথীরা সবুজপত্র পেয়েছে। ডাকে আসে নি দেখে মনে করেছিলুম ওরা পায় নি। আমাকে খানপাঁচেক গীতিমাল্য পাঠিয়ো— বিলাতে পাঠাতে হবে।

বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হতে সম্মত হয়েছি আশা করি এমনতর অদ্ভুত গুজব তোমরা বিশ্বাস কর নি।···

গল্প লিখ্‌তে বসেছি কিন্তু লেখবার বাধা এখানে বড় বেশি। মন দেওয়া অসম্ভব। অথচ গল্প লেখার পক্ষে মন দেওয়াটা বোধ হয় বিশেষ দরকার। যখন রামগড়ে ছিলুম তখন যদি ১২ মাসের জন্যে বারোটা গল্প লিখে আনতুম তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

আশা করি বাংলাসাহিত্যসেবীরা তোমাদের সবুজপত্রের মাথা মুড়িয়ে খাচ্চে। সবুজপত্রের গুণ এই যে জীবেরা যতই তাকে মুড়বে ততই আরো বেশি তেজের সঙ্গে সে বেড়ে উঠ্‌বে। কিন্তু প্রমথ লোকের কথায় বড় বেশি টলে। তাকে উৎসাহিত রেখো। তার ভারতবর্ষের ঐক্য লেখাটা আমার ত খুব ভাল লাগল। লোকে কি বল্‌চে!

রবিদাদা

বাইরের থেকে লেখা যোগাড় করতে পারচ?

রথীকে বোলো আমার নাম করে যামিনীকে দিয়ে বাবামশায়ের ছবি কপি করিয়ে নেবার জন্যে চেষ্টা করে।

যাই বল মন থেকে থেকে উদাসী হয়— কলমের খোঁটা উপ্‌ড়ে ফেলে কল্পনার পক্ষীরাজ ঘোড়া একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে দৌড় দিতে চায়। তোমাদের সম্পাদকী আস্তাবলে আর কতকাল তাকে বেঁধে রাখবে?

পারিবারিক পরিচয়ে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮ - ১৯২৯) অবনীন্দ্রনাথের জামাতা। বিভিন্ন ধরণের রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল। বড়দের জন্যে যেমন, ছোটদের জন্যেও তেমনি তিনি অনেক রচনা করেছেন। তার লিখিত নাটক এককালে সাধারণ রঙ্গালয়ে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। 'ভারতী' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন (১৩২২ -৩০)।

ভোরের পাখি

দ্বিতীয় পর্যায় : প্রকৃতির খেদ

প্রবোধচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'অভিলাষ'। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালের শেষভাগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (শক ১৭৯৬ অগ্রহায়ণ)। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স সাড়ে তেরো বৎসর।[১] তিনি প্রথম বিলাতযাত্রা করেন প্রায় সতেরো বৎসর বয়সের সময় (১৮৭৮ সেপ্‌টেম্বর)। সেখানে বৎসরাধিক কাল বাস করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৮০ সালের ফেব্রুআরি মাসে। তখন তাঁর বয়স আঠারো বৎসর অতিক্রম করে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার বলেন, 'তিনি গিয়াছিলেন লাজুক বালক, ফিরিলেন প্রগল্‌ভ যুবক'।[২] সুতরাং বলা যায় এখানেই তাঁর জীবনের আদিপর্বের সমাপ্তি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর 'ছেলেবেলা'র শেষসীমা টেনেছেন তাঁর বিলাতবাসকালের অন্তে। তা ছাড়া তিনি তাঁর তেরো থেকে আঠারো বৎসর বয়সের রচনাগুলিকে প্রকাশ করেন 'শৈশব-সংগীত' নামে (১৮৮৪)। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রকাশিত 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে (১৮৯৬) এই কালের রচনাগুলি সংকলিত হয় 'কৈশোরক' নামে। অতএব রবীন্দ্রনাথের তেরো থেকে আঠারো বৎসর পর্যন্ত রচনাকালকে তাঁর কবিজীবনের আদিপর্ব বলা অসংগত নয়।

কবিজীবনের এই আলো-আঁধারি উষাকালটা পরিণত বয়সে কবির স্মৃতিতেও অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল। তার প্রমাণ জীবনস্মৃতি গ্রন্থ। এই গ্রন্থে এই সময়কার অনেক রচনাই উল্লিখিত হয় নি। অবশ্য এমনও হতে পারে যে অনেক রচনাকেই তিনি উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করেন নি। কিন্তু বিস্মরণও যে অংশতঃ সত্য তার প্রমাণ এই যে, পরবর্তী কালে স্মরণ করিয়ে দেবার পর অনেক রচনার কথা তাঁর মনে পড়েছে।[৩] সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের এই অস্পষ্ট ও বিস্মৃতপ্রায় উন্মেষপর্বের রচনাধারা সম্বন্ধে আলোচনার গুরুত্ব যে সমধিক তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ রবীন্দ্রসাহিত্যের এই আদিপর্বের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার এখনও যথেষ্ট অবকাশ আছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব সম্বন্ধে সামগ্রিক আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের অভিপ্রায় নয়। এই সময়কার একটিমাত্র কবিতা সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র তথ্য উত্থাপন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১

'অভিলাষ' কবিতা প্রকাশের (১৮৭৪। শক ১৭৯৬ অগ্রহায়ণ) কয়েক মাস মাত্র পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই 'প্রকৃতির খেদ' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয় (১৮৭৫॥ শক ১৭৯৭ আষাঢ়)।

---

১ লেখকের 'ভোরের পাখি' [প্রথম পর্যায়] প্রবন্ধ, 'শতবার্ষিক জয়ন্তী-উৎসর্গ' গ্রন্থ (১৯৬১), পৃ ৩৩৫-৬১

২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড (১৩৬৭ পৌষ) পৃ ৯৪

৩ দৃষ্টান্তস্বরূপ 'অভিলাষ' ও 'প্রকৃতির খেদ' উল্লেখযোগ্য। দ্রষ্টব্য সজনীকান্ত দাস-প্রণীত 'রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭), পৃ ১১২, ২০২

'অভিলাষ'এর মতো এটিও বেনামী। 'অভিলাষ' প্রকাশিত হয় 'দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত' বলে, আর 'প্রকৃতির খেদ' প্রকাশিত হয় 'বালকের রচিত' বলে। এই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রপ্রতিভার লালনকর্তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'প্রকৃতির খেদ' যে-বালককবির রচনা বলে বর্ণিত হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, সে-বালক কবি যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে দীর্ঘকাল পরে।—

> রবীন্দ্রনাথের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা কবিতাটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন ইহা রবীন্দ্রনাথের রচনা। আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতেই তিনি ইহার কয়েক পংক্তি মুখস্থ বলিতে পারিলেন, যদিও দীর্ঘ চৌষট্টি বৎসরের পূর্বেকার কথা।
>
> —'রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী', শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ

অতঃপর 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা' নামে এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বনামে প্রকাশিত প্রথম কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার' (অমৃতবাজার পত্রিকা ১৮৭৫ ফেব্রুআরি ২৫) রচনাটির সঙ্গে 'প্রকৃতির খেদ' রচনাটির তুলনা করে আমি বলি—

> ভাবগত সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ করলে এ দুটি কবিতাই যে একজনের রচনা, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। দুটি কবিতাতেই হেমচন্দ্রের 'ভারতসংগীত' কবিতার (এডুকেশন গেজেট, ১২৭৭ শ্রাবণ ১৭) প্রভাব সুস্পষ্ট।
>
> —বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫০ বৈশাখ, পৃ ৬৫৯

সুখের বিষয়, কবির স্মৃতি ও স্বীকৃতি তথা আভ্যন্তরীণ তুলনা ও সাদৃশ্যগত পরোক্ষ প্রমাণের উপরে দীর্ঘকাল নির্ভর করে থাকতে হয় নি। 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা' প্রকাশের অল্পকাল পরেই এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার হস্তগত হয় যে 'প্রকৃতির খেদ' যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা সে বিষয়ে সংশয়ের আর কোনো অবকাশ রইল না। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সাপ্তাহিক 'সাধারণী'র এক সংখ্যায় কলকাতার তৎকালীন অন্যতম পত্রিকা 'সাপ্তাহিক' থেকে ঠাকুরবাড়ির 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' সম্বন্ধে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হয়। তার প্রাসঙ্গিক অংশটি এই।—

> গত রবিবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে "বিদ্বজ্জন-সমাগম" সভা হইয়াছিল। প্রায় একশত গ্রন্থকার ও বিদ্বান্ ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।
>
> ··· বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "প্রকৃতির খেদ" নামে স্বরচিত একটি পদ্য প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ পদ্য অতি মনোহর। পাঠকালে সকলের মনে ভারতভূমির বর্তমান হীনাবস্থা স্মরণ হওয়াতে নেত্র হইতে অশ্রুপাত হইয়াছিল।···
>
> —সাধারণী, ১২৮২ জ্যৈষ্ঠ ৩ (১৮৭৫ মে ১৬) রবিবার

'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা' নামে দ্বিতীয় এক প্রবন্ধে[৪] আমি সাধারণীর সংবাদটুকু সমগ্রভাবে উদ্ধৃত করে 'প্রকৃতির খেদ' তথা 'বিদ্বজ্জনসমাগম' সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করি। তাতে 'প্রকৃতির খেদ'

---

৪ দেশ, ১৩৫২ চৈত্র ১৬ শনিবার, পৃ ৩৭৫-৭৬

ও 'বিদ্বজ্জনসমাগম' সম্বন্ধে যে সব নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়, অতঃপর তা সুধীসমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে।[৫] এ স্থলে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

অতঃপর 'প্রকৃতির খেদ' সম্বন্ধে আর-একটি তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস।—

> ওই বৎসরের (১২৮২) ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে শিলাইদহ হইতে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এক চিঠিতে পাইতেছি—
>
> "গুণু দাদা
>
> বিদ্বজ্জনের Card ও রবির কবিতা পাঠাচ্ছি— কর্ত্তা-মহাশয় [মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ] কবিতাটি পাঠ করিয়া ভাল বলিলেন।···
>
> সাপ্তাহিক সমাচারে বিদ্বজ্জনসমাগমের একটা Graphic description দিয়াছে। তাহা কি দেখ নাই?"
>
> 'রবির কবিতা'টি এই 'প্রকৃতির খেদ'।
>
> —রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য (১৩৬৭), পৃ ২০৭

বলা বাহুল্য উল্লিখিত 'সাপ্তাহিক সমাচার'ই সাধারণীতে শুধু 'সাপ্তাহিক' নামে অভিহিত হয়েছে। বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রচারই ছিল এই পত্রিকার বিশেষ উদ্দেশ্য।—

> যে যে অনুষ্ঠান দ্বারা বাঙ্গালিরা জাতিগত মহত্ত্ব লাভ করিতে পারিবেন; শুদ্ধ সেই সমস্ত অনুষ্ঠান এবং পত্র সম্পাদকদিগের অনুমোদনীয়।
>
> —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বাংলা সাময়িক-পত্র দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১১, ১০২-সংখ্যক পত্র

এই 'সাপ্তাহিক সমাচারে' যে বিদ্বজ্জন-সমাগমের graphic description প্রকাশিত হয়েছিল, এটা খুবই স্বাভাবিক।[৬]

আমার 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা'-বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশের (দেশ, ১৩৫২ চৈত্র) কয়েক বৎসর পরে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি পুনরায় উল্লিখিত হয় ব্রজেন্দ্রনাথের 'বাংলা সাময়িক-পত্র' দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩৫৮ মাঘ)। এই গ্রন্থভুক্ত ১৬২-সংখ্যক সাময়িক পত্রখানির পরিচয় এই।—

> ১৬২। প্রতিবিম্ব (মাসিক); বৈশাখ ১২৮২। সম্পাদক— রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ, ভূতপূর্ব 'কল্পলতিকা' সম্পাদক, মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটিউশনের অধ্যাপক ও রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতশিক্ষক। 'প্রতিবিম্ব' একখানি উৎকৃষ্ট পত্রিকা। প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনা 'প্রকৃতির খেদ' কবিতা ও দ্বিতীয় সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের 'পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র' প্রকাশিত হইয়াছিল।[৭] পরবর্তী অগ্রহায়ণ মাস হইতে পত্রিকাখানি 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নাম ধারণ করে।
>
> —বাংলা সাময়িক-পত্র দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৮

---

৫ জীবনস্মৃতি (১৩৬৩ মাঘ), গ্রন্থপরিচয় পৃ ১৮৯; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী' প্রথম খণ্ড (১৩৫৩ বৈশাখ), পৃ ৩৯৩ এবং চতুর্থ খণ্ড (১৩৬৩ শ্রাবণ), পৃ ২৫৯; সজনীকান্ত দাস, 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭), পৃ ২০৭

৬ এই সাপ্তাহিক সমাচারেই (১৮৮১ ভাদ্র ৭) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম নাটকের (শক ১৭৯৬।১৮৭৪ জুলাই ৯) বিশেষ অনুকূল সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই সমালোচনার সারাংশ সংকলিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৯৬ শক কার্তিক সংখ্যায়।

৭ সাহিত্যসাধকচরিতমালা ৬৬, 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ ১৪ এবং ৩৬

এতদিন জানা ছিল 'প্রকৃতির খেদ' প্রকাশিত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৮৭৫। শক ১৭৯৭ আষাঢ়)। এখন জানা গেল কবিতাটি তারও পূর্বে প্রকাশিত হয় 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় (১৮৭৫।১২৮২ বৈশাখ)। একই কবিতা অল্পকালের ব্যবধানে দুই পত্রিকায় প্রকাশিত হবার কারণ কি, ব্রজেন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেন নি।

অতঃপর এ সম্বন্ধে শেষ উল্লেখ পাই প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ডের শেষ সংস্করণে (১৩৬৭ পৌষ)। এই গ্রন্থের 'নির্দেশিকা'য় (পৃ ৪৮৩) এবং 'সংশোধন ও সংযোজন' বিভাগে (পৃ ৫০০) বলা হয়েছে যে, 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশের পূর্বে 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় (প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হয়, কিন্তু 'আংশিক' ভাবে।

তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে প্রতিবিম্ব পত্রিকার পাঠ মিলিয়ে দেখলে প্রথমে ধরা পড়বে যে, প্রতিবিম্ব পত্রিকায় 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি 'আংশিক' ভাবে প্রকাশিত হয়নি, হয়েছিল সমগ্রভাবেই।[*] বরং প্রতিবিম্ব পত্রিকাতেই কয়েক লাইন বেশি আছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশের সময় কয়েক লাইন পরিত্যক্ত হয়েছিল। প্রতিবিম্বে প্রকাশিত 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার শেষে লেখা আছে 'ক্রমশঃ'। আর, ওই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় (১২৮২ জ্যৈষ্ঠ) 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার শেষাংশ প্রকাশিত হয় নি। সম্ভবতঃ সেইজন্যই প্রভাতবাবুর ধারণা হয়েছিল যে, প্রতিবিম্বে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার প্রকাশ 'আংশিক', সার্মগ্রিক নয়। বোধ করি তিনি দুই পত্রিকার পাঠ মিলিয়ে দেখেন নি, দেখলে তাঁর মনে ওরকম ধারণা হতে পারত না।

স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, প্রতিবিম্বে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার শেষে 'ক্রমশঃ' লেখা হয়েছিল কেন। ওই পত্রিকার তৃতীয় বা তৎপরবর্তী কোনো সংখ্যায় কবিতাটির অবশিষ্টাংশ প্রকাশিত হয়েছিল কি না জানি না। সম্ভবতঃ হয় নি। মনে হয় কবির প্রথম সংকল্প ছিল বিষয়বস্তুকে আরও অনুসরণ করে দীর্ঘতর কবিতা রচনা করবেন। তাই প্রতিবিম্ব পত্রিকায় 'ক্রমশঃ' লিখে সে সংকল্পের আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু বোধ করি অচিরেই কবি সে সংকল্প ত্যাগ করেন, তাই তত্ত্ববোধিনাতে পুনঃপ্রকাশের সময় 'ক্রমশঃ' কথাটি পরিত্যক্ত হয়।

২

এখানে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটির মর্মকথা সংক্ষেপে বিবৃত করা অনুচিত হবে না। 'প্রকৃতির খেদ' হচ্ছে আসলে ভারতের দুর্ভাগ্যগীতি। ভারতবর্ষের শিয়রে হিমালয়ের কোলে গোমুখীর অদূরে বসে প্রকৃতিদেবী ভারতবর্ষের অতীত গৌরব ও বর্তমান দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে খেদ করছেন। এই ভারতবিলাপই 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার মর্মকথা। 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতায় (১৮৭৫ ফেব্রুআরি) যেমন হেমচন্দ্রের 'ভারতসংগীত' কবিতার প্রভাব সুস্পষ্ট, 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাতেও তেমনি হেমচন্দ্রের 'ভারতবিলাপ' কবিতার ছায়া দেখা যায়। 'ভারতসংগীত' ও 'ভারতবিলাপ' এই দুটি কবিতাই 'কবিতাবলী' কাব্যগ্রন্থে (১৮৭০ নবেম্বর) সংকলিত হয়। 'কবিতাবলী'র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭১) 'ভারতসংগীত' বর্জিত হয়, কিন্তু 'ভারতবিলাপ' থাকে। 'প্রকৃতির খেদ' কবিতায় যে 'ভারতবিলাপ'-এর কিছু ছায়া পড়েছে, আশা করি নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলিতেই তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে। 'ভারতবিলাপে' কবির খেদ এই।—

রূপে অনুপম নিখিল ধরায়
করিয়া বিধাতা সৃজিলা তোমায়
দিলা সাজাইয়া অতুল ভূষায়—
তোর আজি কিনা এ হেন দশা!
হায়রে বিধাতা, কেন দিয়াছিলি
হেন অলঙ্কার? কেন না গঠিলি
মরুভূমি ক'রে, অরণ্যে রাখিলি
দাসত্ব-যাতনা হত না তায়।
পাঠান, মোগল, ব্রিটনবাসী
তা হলে এখানে বার বার আসি
দিত না যাতনা গলে দিয়া ফাঁসী
পড়িতে হত না কাহার পায়।[৮]

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতির খেদ এই।—

অভাগী ভারত! হায়, জানিতাম যদি,
বিধবা হইবি শেষে
তা হলে কি এত ক্লেশে
তোর তরে অলঙ্কার করি নিরমাণ?…

তা হ'লে কি শতদলে
তোর সরোবর-জলে
হাসিত অমল শোভা করিয়া বিকাশ?
কাননে কুসুমরাশি
বিকাশি মধুর হাসি,
প্রদান করিত কি লো অমন সুবাস?

তা হ'লে ভারত! তোরে
সৃজিতাম মরু ক'রে,
তরুলতা-জন-শূন্য প্রান্তর ভীষণ।

একটু মনোযোগ দিয়ে তুলনা করলেই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির খেদ' কোনো কোনো অংশে হেমচন্দ্রের 'ভারতবিলাপ'-এর বিস্তৃতরূপে ভাষ্যরূপে কল্পিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, হেমচন্দ্রের 'দিলা সাজাইয়া অতুল ভূষায়' লাইনটি 'প্রকৃতির খেদ' কবিতায় পরিস্ফুট হয়েছে তেরো লাইনের দুইটি শ্লোকে, তার মধ্যে দ্বিতীয়টি উপরে উদ্ধৃত হল। 'কেন না গঠিলি মরুভূমি ক'রে' অংশটিও ব্যাখ্যাত হয়েছে একটি শ্লোকে। হেমচন্দ্রের 'অলঙ্কার' ও 'মরুভূমি' শব্দ-দুটিকে অবলম্বন করে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার আরও কোনো কোনো

৮ প্রথম সংস্করণের পাঠ। দ্রষ্টব্য হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী (সাহিত্যপরিষৎ), কবিতাবলী, পৃ ২৪-২৫

অংশ রচিত হয়েছে। এ স্থলে উদ্‌ধৃতি অনাবশ্যক। 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতাতেও আছে 'মরু হয়ে থাক ভারতকানন'।

এ কথা অবশ্য বলা প্রয়োজন যে, 'প্রকৃতির খেদ' হেমচন্দ্রের 'ভারতসংগীত' বা 'ভারতবিলাপ' কবিতার হুবহু অনুসরণ নয়। তথাপি এ কথাও স্বীকার্য যে, এই দুই কবিতার কেন্দ্রগত ভাবটিকে আশ্রয় করেই বালক-কবি রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির খেদ' রচনা করেছেন স্বীয় প্রতিভা ও কল্পনার বিশিষ্ট পথ অবলম্বন করে।

'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটির মর্মকথা বিশ্লেষণে ফিরে আসা যাক। 'অভাগী' ভারতের অতীত সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করে বর্তমান দুর্ভাগ্যের বেদনাই এই কবিতাটির মূলকথা। বর্তমান দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ ক'রে

ভাগ্য কি অনন্তকাল রবে এইরূপে,
তোর ভাগ্যচক্র শেষে
থামিল কি হেতা এসে
বিধাতার নিয়মের করি ব্যভিচার ?

এই আকুল প্রশ্নই এই কবিতাটির শেষকথা। বলা বাহুল্য, কবির এই প্রশ্ন ভারতভাগ্যবিধাতার কাছেই। আবার কবে 'ভাগ্যচক্রের আবর্তনে' ভারতের বর্তমান দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটবে, এই প্রতীক্ষাময় বেদনাই কবির হৃদয়কে ব্যাকুল করে তুলেছিল।

কিন্তু ভারতের ভাগ্য তো চিরকাল এ রকম ছিল না। এক সময়ে ভারত স্বাধীন ছিল, গৌরবমণ্ডিত ছিল। সে কথার স্মরণেও সান্ত্বনা আছে। তাই কবি ভারতের অতীত-ইতিহাসের গতি অনুসরণে প্রবৃত্ত হলেন। সেই ইতিহাসের চিরন্তন সাক্ষী হচ্ছে 'উচ্চশির হিমালয়' (অন্যত্র আছে 'গর্বে-ভরা হিমালয়') ···

চিরকাল দেখেছে যে ভারতের গতি।[১]

তাই কবি বলেছেন—

অতীত কালের চিত্র দেখাউক স্মৃতি।

কেননা, অতীতের সমস্ত কথাই

স্মৃতির আলেখ্যপটে রহেছে চিত্রিত।

অনুরূপ উক্তি আছে 'হিন্দুমেলার উপহার' (১৮৭৫ ফেব্রুআরি) কবিতাতেও।—

সেদিনের কথা জাগি স্মৃতিপটে
ভাসে না নয়ন বিষাদ-জলে ?

এই সব উক্তির মধ্যে যেন 'কথা কও, কথা কও, অনাদি অতীত', এই অবিস্মরণীয় বাণীটির পূর্বাভাষ শোনা যাচ্ছে।

---

১ অনুরূপ ভাবের প্রকাশ দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যদীক্ষাদাতা' অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর (১৮৫০-৯৮) 'উদাসীনী' কাব্যের (১৮৭৪ ফেব্রুআরি) অষ্টম সর্গে হিমালয় প্রদেশের বর্ণনাপ্রসঙ্গে। এই কাব্যখানি বঙ্গদর্শনে (১২৮১ জ্যৈষ্ঠ) যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছিল। অক্ষয়চন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণীয়।—

ইঁহার সদ্য রচনাগুলি সর্বদাই পড়িয়া শুনিয়া আলোচনা করিয়া আমার তখনকার রচনারীতি লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ইঁহার লেখার অনুসরণ করিয়াছিল।

—জীবনস্মৃতি (১৩৬৩), তথ্যপঞ্জী, পৃ ২৪০

অতঃপর কবি একে একে ভারতের অতীত চিত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন। ভারতের অতীত চিত্র উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস 'ভারতসংগীত' এবং 'ভারতবিলাপে'ও আছে।—

যখন ভারতে অমৃতের কণা
হতো বরিষণ, বাজাইত বীণা
ব্যাস-বাল্মীকি,— বিপুল বাসনা
ভারত-হৃদয়ে আছিল ভরা॥
যখন ক্ষত্রিয় অতীব সাহসে
ধাইত সমরে মাতি বীররসে
হিমালয়-চূড়া গগন-পরশে
গাইত যখন ভারত-নাম।

—ভারতবিলাপ

এ হচ্ছে অতীত চিত্রের আভাসমাত্র। ভারতসংগীতেও এ রকম আভাস আছে। কিন্তু প্রকৃতির খেদে আভাসমাত্র নয়, অতীত ভারতের ধারাবাহিক চিত্র উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস সুস্পষ্ট। অতীত ভারতের প্রথম চিত্র এই।—

দেখিয়াছি তোর আমি সেই এক বেশ
অজ্ঞাত আছিলি[১০] যবে মানব-নয়নে
নিবিড় অরণ্য ছিল এ বিস্তৃত দেশ,
বিজন ছায়ায় নিদ্রা যেত পশুগণে।

তার পরেই বলা হয়েছে—

সেইরূপ রহিলি[১১] না কেন চিরকাল।…
তা হলে ত ঘটিত না এ সব জঞ্জাল।
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল?
সৌভাগ্যে হানিল বাজ
তা হলে ত তোরে আজ
অনাথা ভিখারী বেশে কাঁদিতে হ'ত না।
পদাঘাতে উপহাসে,
তা হ'লে ত কারাবাসে
সহিতে হ'ত না শেষে এ ঘোর যাতনা॥

আমরা পূর্বেই দেখেছি ভারতবিলাপ কবিতায় হেমচন্দ্র বলেছেন বিধাতা যদি ভারতকে অরণ্যময় করেই রাখতেন 'দাসত্ব-যাতনা হত না তায়' এবং 'পড়িতে হ'তো না কাহার পায়'।

---

১০ তত্ত্ববোধিনীর সংশোধিত পাঠ। প্রতিবিম্বে আছে 'আছিল'।

১১ তত্ত্ববোধিনীর সংশোধিত পাঠ। প্রতিবিম্বে আছে 'রহিল'।

কিন্তু ভারতবর্ষ চিরকাল অরণ্যময় রইল না। তাই 'প্রকৃতি' বলছেন—

আইল হিন্দুরা শেষে
তোর এ বিজন দেশে
নগরেতে পরিণত হল তোর বন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'হিন্দুরা' শব্দের স্থলে আছে 'আর্যরা'। এই আর্যদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই উদ্‌ঘাটিত হল বৈদিক যুগের চিত্র।—

ঋষিগণ সমস্বরে
অই সামগান করে
চমকি উঠিছে আহা! হিমালয় গিরি।
ওদিকে ধনুর ধ্বনি,
কাঁপায় অরণ্যভূমি
নিদ্রাগত মৃগগণে চমকিত করি॥
সরস্বতী নদীকূলে
কবিরা হৃদয় খুল্যে
গাইছে হরষে আহা সুমধুর গীত।
বীণাপাণি কুতূহলে
মানসের শতদলে
গাহেন সরসী বারি করি উথলিত॥

চৌদ্দ বছরের বালক কবির পক্ষে এ রকম অপূর্ব চিত্র অঙ্কন সত্যই বিস্ময়কর। তখনকার দিনে এ রকম চিত্র অঙ্কন অভিজ্ঞ কবিদের পক্ষেও শ্লাঘার বিষয় বলে গণ্য হতে পারত। এমনকি, বিহারীলালের পাকা হাতের পক্ষেও এই চিত্র রচনা অযোগ্য বলে গণ্য হত না।

কবিতাটির পূর্বাংশেও প্রাচীন ভারতের সাধারণ অবস্থা বর্ণনা উপলক্ষে এই ধরণের একটি চিত্রের অবতারণা করা হয়েছে।—

দেখ্, আর্য্য সিংহাসনে
স্বাধীন নৃপতিগণে,
স্মৃতির আলেখ্যপটে রহেছে চিত্রিত।
দেখ্ দেখি তপোবনে
ঋষিরা স্বাধীন মনে
কেমন ঈশ্বরধ্যানে রয়েছে ব্যাপৃত॥

মনে হয় প্রাচীন ভারতের এই চিত্র রবীন্দ্রনাথের বালকচিত্তে চিরকালের জন্যই গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। তপোবনের প্রথম উল্লেখ তথা তপোবন-আদর্শের প্রতি তাঁর আবেগময় আগ্রহ দেখা যায় তাঁর প্রথম-প্রকাশিত 'অভিলাষ' কবিতাটিতেই। কিন্তু এক দিকে ক্ষত্রিয় রাজাদের বীরত্বগৌরব এবং অপর দিকে

তপোবনবাসী ঋষি বা ব্রাহ্মণের অধ্যাত্মমহিমার যে চিত্র উত্তরকালে রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল, তার প্রথম সুস্পষ্ট নিদর্শন ফুটে উঠেছে এই 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটিতেই।—

ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার,
নির্বাক্ গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।
হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়গরিমা
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।

—'প্রাচীন ভারত' (১৮৯৬), চৈতালি

চৈতালি কাব্যের এই চিত্রটি প্রকৃতির খেদের উদ্ধৃত চিত্রটির পরিণত ও সংহত রূপ।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি যে 'সরস্বতীনদীকূলে' উদ্‌ভূত ও বিকশিত হয়েছিল, এই ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কবিহৃদয় যে তাঁর বালকবয়সেই আকৃষ্ট হয়েছিল; তার নিদর্শনও রয়েছে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটিতে। একটু পূর্বেই তা উদ্ধৃত হয়েছে। সরস্বতীনদীর প্রতি কবিহৃদয়ের এই আকর্ষণের প্রমাণ আছে তাঁর হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতাটিতেও (১৮৭৭)।—

তুমি শুনিয়াছ সরস্বতীকূলে
আর্য ঋষি গায় মন প্রাণ খুলে।

সরস্বতীনদীকূলের প্রতি তাঁর হৃদয়ের টানের পরিচয় আছে তাঁর পরিণত বয়সের রচনাতেও।—

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম মাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি আহরণ
বনান্তর হতে; ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবন-গোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে; করি সমাপন
সন্ধ্যাস্নান, সবে মিলি লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটীরপ্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি-আলোকে।

—'ব্রাহ্মণ' (১৮৯৫), চিত্রা

যে তপোবনের উল্লেখমাত্র পাই 'অভিলাষ' কবিতায় এবং যার ঈষৎ-বিকশিত রূপ ফুটে উঠেছে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতায়, তারই পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে এই 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটিতে। শুধু তাই নয়। যে সরস্বতীতীর আর্যসংস্কৃতির উৎসভূমিরূপে আভাসিত হয়েছে 'প্রকৃতির খেদে' ও হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতাটিতে, সেই সরস্বতীতীরকে তপোবন-আদর্শের পীঠস্থানরূপে পূর্ণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটিতে।

বালক-রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির খেদ' রচনাটিতে পরিণত রবীন্দ্রচিত্তের যে পূর্বাভাস পাওয়া যায় তার অধিকতর পরিচয় দেওয়া বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে অনাবশ্যক।

'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি একটু মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যায় 'স্মৃতির আলেখ্যপট' উন্মোচন করে ভারত-ইতিহাস থেকে এক-এক যুগ ধরে 'অতীতকালের চিত্র' দেখানোই ছিল কবির অভিপ্রায়।[১২] যে আকারে আমরা কবিতাটি পেয়েছি তাতে ভূমিকা-অংশটুকু বাদে দুটিমাত্র চিত্র দেখানো হয়েছে— এক, ইতিহাসপূর্ব যুগ, যখন 'নিবিড় অরণ্য ছিল এ বিস্তৃত দেশ' এবং 'অজ্ঞাত আছিল যবে মানব-নয়নে' ; দুই, বৈদিক যুগ, যখন রাজন্যদের ধনুর টঙ্কার অরণ্যভূমি কাঁপিয়ে নিদ্রাগত মৃগগণকে চকিত করত আর ঋষিদের সামগানে হিমালয়-গিরি তথা সরস্বতীনদীকূল মুখরিত হত। কবিতাটির প্রথম একুশটি স্তবক হচ্ছে এর ভূমিকাংশ এবং তার পরে পাঁচটি দীর্ঘ স্তবকে উক্ত দুটি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। অতঃপর স্বভাবতঃই আশা জাগে বেদোত্তর যুগের চিত্রাবলী অঙ্কিত হবে পরবর্তী অংশে। 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় কবিতাটির শেষে 'ক্রমশঃ' লেখা থাকায় সে ধারণা দৃঢ়তর হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে-কোনো কারণেই হোক 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার কবিসংকল্পিত শেষাংশ অলিখিতই থেকে গেল এবং বালক রবীন্দ্রনাথের লেখনী-অঙ্কিত বেদোত্তর যুগের ঐতিহাসিক চিত্রাবলী থেকে আমরা চিরকালের মত বঞ্চিত হলাম। 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার পিছনের মলাটে লিখিত আছে—

> গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন :—আমাদের প্রতিবিম্বের কলেবর অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়া এবারে "প্রকৃতির খেদ"···পূর্বখণ্ড-প্রকাশিত এই কয়টী বিষয়ের পরিশিষ্টভাগ প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের ক্ষোভ নিবৃত্তি করিতে পারিলাম না।··· —সম্পাদক

শুধু তখনকার পাঠকবর্গের নয়, আধুনিককালের পাঠকদেরও ক্ষোভনিবৃত্তি হল না।

রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার 'পরিশিষ্ট ভাগ' সমাপ্ত' করলেন না কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এ বিষয়ে পরোক্ষ অনুমানের কিছু সূত্র পাওয়া যায়। এবার তারই কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

৩

'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় 'প্রকৃতির খেদ' যে পৃষ্ঠাগুলিতে (১৩-১৭) মুদ্রিত হয়, তার প্রথম পৃষ্ঠাতেই একটি সম্পাদকীয় পাদটীকা আছে সেটির অবিকল প্রতিরূপ এই।—

> আমাদিগের সম্ভ্রান্ত[১৩] লেখক প্রথমে এই পদ্যটির কাপি যেরূপ প্রেরণ করেন, প্রুফ সংশোধনের সময় তাহার অনেক পরিবর্ত্ত করিয়া দেন। গত রবিবারের"বিদ্বজ্জন-সমাগম"সভায় কতিপয় মান্য বন্ধুর অনুরোধে রচয়িতাকে সাধারণ সম্মুখে এই কবিতাটি পাঠ করিতে হয়। লেখকের সংশোধিত পদ্যটি তৎকালে আমাদিগের নিকট থাকায় অসংশোধিত কাপিখানি দেখিয়া অর্দ্ধাংশ মাত্র মুদ্রিত করিয়া "বিদ্বজ্জনসমাগম" সভায় প্রদান করা হয়। এজন্য রচয়িতার এই সংশোধিত রচনার সহিত সভার মুদ্রিত রচনার স্থানে স্থানে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হইবে [।]

—প্রতিবিম্ব, ১২৮২ বৈশাখ, পৃ ১৩ পাদটীকা

এই পাদটীকাটি থেকে বহু তথ্য জানা বা অনুমান করা যায়। একে একে এই তথ্যগুলির একটু আলোচনা করা যাক।—

---

১২ এই প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'ভারতগাথা' কাব্যের (১৮৯৫) পরিকল্পনা স্মরণীয়।

১৩ প্রতিবিম্বে এ রকমই মুদ্রিত আছে।

এক। 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার 'সম্ভ্রান্ত লেখক'টি কে, তার কোনো উল্লেখ প্রতিবিম্ব পত্রিকার কোথাও নেই সূচীপত্রে বা কবিতাটির উপরে বা নীচেও না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কবিতাটি 'বালকের রচিত' বলে বর্ণিত হয়েছে। 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় সে-রকম কোনো বর্ণনাও নেই। বস্তুতঃ লেখকের নাম প্রকাশ না করাই ছিল 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতি। পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতেই শ্যামাচরণ শ্রীমানী নামক অন্যতম লেখকের মৃত্যুসংবাদ দিতে গিয়ে তাঁর নামপ্রসঙ্গে সম্পাদক লিখেছেন—

আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল প্রতিবিম্বের কোনো লেখকের নাম প্রকাশ করিব না।

—'শোচনীয়' : প্রতিবিম্ব', ১২৮২ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ২৫

সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'সাপ্তাহিক সমাচার' থেকে সংকলিত 'সাধারণী'র সংবাদটুকু পাওয়া না গেলে 'প্রকৃতির খেদ' যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা সে সম্বন্ধে কবির স্বীকৃতি-নিরপেক্ষ সংশয়াতীত প্রমাণের অভাব আজও থেকে যেত।

দুই। 'বিদ্বজ্জনসমাগম' সভার যে অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি পাঠ করেছিলেন, সে অধিবেশন কোন্ তারিখে হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা কঠিন। এই অধিবেশনের বিশদ বিবরণ (graphic description) প্রকাশিত হয় 'সাপ্তাহিক সমাচার' পত্রিকায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত পত্র (১২৮২ জ্যৈষ্ঠ ২) এবং সাপ্তাহিক 'সাধারণী' (১২৮২ জ্যৈষ্ঠ ৩।।১৮৭৫ মে ১৬ রবিবার), উভয়েরই নির্ভর 'সাপ্তাহিক সমাচারে'র উক্ত বিববণের উপরে। কিন্তু 'সাপ্তাহিক সমাচারে'র কোন্ সংখ্যায় এই বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল তার উল্লেখ নেই কোনোটিতেই। 'সাপ্তাহিক সমাচারে' বলা হয়েছে বিদ্বজ্জনসমাগম-সভার উক্ত অধিবেশন হয়েছিল 'গত রবিবার রাত্রিতে'। 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকার (১২৮২ বৈশাখ) সম্পাদকীয় মন্তব্যেও বলা হয়েছে 'প্রকৃতির খেদ' পঠিত হয়েছিল 'গত রবিবারের বিদ্বজ্জনসমাগম সভায়'। কিন্তু সে কোন্ রবিবার, কোন্ তারিখ ?

সাপ্তাহিক 'সাধারণী' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮০ কার্তিক ১১ (১৮৭৩ অক্টোবর ২৬) তারিখে। সেদিন ছিল রবিবার। সুতরাং পত্রিকাটি প্রতি রবিবার প্রকাশিত হত বলে অনুমান করা যায়। বস্তুতঃ প্রথম প্রকাশের প্রায় দুই বৎসর পরে সাধারণীর যে সংখ্যায় বিদ্বজ্জনসমাগমের উক্ত বিবরণটি সংকলিত হয় তার তারিখটিও (১২৮২ জ্যৈষ্ঠ ৩) ছিল রবিবার। পক্ষান্তরে 'সাপ্তাহিক সমাচার' যে তারিখে (১২৮০ শ্রাবণ ৫। ১৮৭৩ জুলাই ১৯) প্রথম প্রকাশিত হয়, সেটি ছিল শনিবার। আমরা ধরে নিতে পারি যে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রতি শনিবারেই প্রকাশিত হত। যদি তাই হয় তবে যে রবিবারে সাধারণীতে বিদ্বজ্জনসমাগম সভায় 'প্রকৃতির খেদ' কবিতা পাঠের বিবরণ সংকলিত হয়েছিল তার আগের দিনও (১২৮২ জ্যৈষ্ঠ ২ শনিবার) সাপ্তাহিক সমাচারের একটি সংখ্যা বেরিয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। কিন্তু আগের দিনের (শনিবারের) সাপ্তাহিক সমাচার থেকে কোনো বিবরণ পরের দিনই চুঁচুড়ায় সাধারণীতে সংকলিত হয়েছিল বলে মনে করা কঠিন। তা ছাড়া, উক্ত শনিবার দিনই (১২৮২ জ্যৈষ্ঠ ২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে গুণেন্দ্রনাথকে সাপ্তাহিক সমাচারের প্রকাশিত বিদ্বজ্জনসমাগমের graphic description এর সংবাদ দেন। সুতরাং এই অনুমান করাই সমীচীন মনে হয় যে, সাপ্তাহিক সমাচারের বিদ্বজ্জনসমাগমের বিবরণ বেরিয়েছিল উক্ত শনিবারের আগের শনিবারে

অর্থাৎ ১২৮২ বৈশাখ ২৬॥১৮৭৫ মে ৮ তারিখে। তা হলে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে বিদ্বজ্জনসমাগম সভার আলোচ্যমান অধিবেশন হয়েছিল ১২৮২ বৈশাখ ২০। ১৮৭৫ মে ২ রবিবার তারিখে।

এই অনুমানের পক্ষে অন্য যুক্তিও আছে। ১২৮২ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রতিবিম্ব পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যেও সাপ্তাহিক সমাচারের ন্যায় বিদ্বজ্জনসমাগমকে 'গত রবিবারে'র অনুষ্ঠান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি উক্ত অনুষ্ঠানের তারিখ ১২৮২ বৈশাখ ২০ রবিবার না হয়ে পরবর্তী ২৭ বৈশাখ রবিবার বলে ধরা হয় তা হলে প্রতিবিম্ব পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা বৈশাখ মাসে না বেরিয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসে বেরিয়েছিল বলে ধরে নিতে হয়। কিন্তু প্রতিবিম্বের বৈশাখ সংখ্যা যে বৈশাখ মাসেই বেরিয়েছিল তার সংশয়াতীত প্রমাণ আছে। এই পত্রিকা প্রকাশ-উপলক্ষে পত্রিকার গোড়াতেই যে সম্পাদকীয় মন্তব্য ('সূচনা') সন্নিবিষ্ট হয় তার প্রথমাংশ এই—

আমরা সর্বশক্তিমান্ সর্বফল-দাতা জগদীশ্বরকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া বর্তমান বৈশাখ মাসের শেষ হইতেই এই 'প্রতিবিম্ব' নামক মাসিক-পত্র ও সমালোচন প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই পত্রিকা অদ্য হইতে প্রতি মাসের শেষেই প্রকাশিত হইবে।— সূচনা প্রতিবিম্ব ১২৮২ বৈশাখ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা পৃ ১

'মাসের শেষ' বলতে এখানে মাসের সর্বশেষ দিনটি বোঝাচ্ছে বলে মনে হয় না। মাসের শেষাংশ বোঝাচ্ছে বলেই মনে হয়। সে বৎসর বৈশাখ মাস শেষ হয়েছিল ৩১ দিনে এবং শেষ দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। তার আগের রবিবার ছিল ২৭ তারিখ। 'প্রকৃতির খেদের' উক্ত সম্পাদকীয় পাদটীকাটি মুদ্রিত হয় পত্রিকার ১৩ সংখ্যক পৃষ্ঠায়। পত্রিকার বাকি অংশ (১৪-২৪ পৃষ্ঠা) মাত্র চারদিনের (২৮-৩১ বৈশাখ) মধ্যে ছেপে বৈশাখ মাসের মধ্যেই পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব বলে মনে করা যায় না। অতএব সিদ্ধান্ত করতে হয় যে 'প্রকৃতির খেদ' বিদ্বজ্জনসমাগমে পঠিত হয়েছিল ২৭ বৈশাখের পূর্ববর্তী রবিবারে অর্থাৎ ২০ বৈশাখ তারিখে এবং উক্ত সম্পাদকীয় পাদটীকাটি রচিত হয় ওই তারিখের পরে, একান্ত পক্ষে ২৭ তারিখ রবিবারে, কিন্তু তার পরে নয়।

সব দিক বিবেচনায় ১২৮২ সালের ২০ বৈশাখ দিনটিকেই বিদ্বজ্জনসমাগম সভার তথা 'প্রকৃতির খেদ' কবিতা পাঠের তারিখ বলে স্বীকার করা সমীচীন মনে হয়।[১৪]

বিদ্বজ্জনসমাগমের এই অধিবেশনটি হল দ্বিতীয় অধিবেশন। প্রথম অধিবেশন হয় ১২৮১ বৈশাখ ৬॥ ১৮৭৪ এপ্রিল ১৮ শনিবার দিন। সেটি ছিল বৎসরের প্রথম শনিবার। ১৮৭৫ সালের অধিবেশন হয় রবিবারে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখেই অধিবেশন করা হত শনিবারে, তাতে সন্দেহ নেই। আরও মনে হয় যে, প্রতি বৎসর বৈশাখের গোড়াতেই (শনি-রবিবারে) অধিবেশন করা ছিল অনুষ্ঠাতাদের অভিপ্রায়। প্রথম বৎসরে অনুষ্ঠান হয় প্রথম শনিবারে (৬ বৈশাখ)। দ্বিতীয় বৎসরের অনুষ্ঠান হয় বৈশাখের তৃতীয় রবিবারে। প্রথম ও দ্বিতীয় শনি-রবিবারে তা সম্ভব হয় নি।

বিদ্বজ্জনসমাগমের প্রথম অধিবেশনের বিবরণ প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ভারত-সংস্কারক' পত্রিকায়

---

১৪ বিদ্বজ্জনসমাগমের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছিল ১২৮২ সালের বৈশাখ মাসে, তাতে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। রবীন্দ্র-জীবনীকারও প্রথমে তাই মেনে নিয়েছিলেন (দ্রষ্টব্য: প্রথম খণ্ড ১৩৫৩ সংস্করণ পৃ ৩৯ এবং চতুর্থ খণ্ড ১৩৬৩ সংকরণ, পৃ ২৫৯)। কিন্তু পরে উক্ত অধিবেশনটি স্থাপনা করা হয়েছে ১২৮২ সালের 'জ্যৈষ্ঠ' মাসে (দ্রষ্টব্য: প্রথম খণ্ড ১৩৬৭-সংস্করণ পৃ ৪৪)। বোধ করি অনবধানতাই এর কারণ।

(১২৮১ বৈশাখ ১২)।[১৫] তার থেকে জানা যায়, বাংলা গ্রন্থকার, সংবাদপত্রের সম্পাদক ও অন্যান্য বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়ে জোড়াসাঁকো ভবনে সমবেত হয়েছিলেন। 'সর্বসুদ্ধ ন্যূনাধিক ১০০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।' দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয় জানা গিয়েছে সাধারণীতে সংকলিত সাপ্তাহিক বিবরণ থেকে। এই অধিবেশনেও 'প্রায় একশত গ্রন্থকার ও বিদ্বান্ ব্যক্তি' উপস্থিত হয়েছিলেন। মনে হয় অন্ততঃ একশত বিদ্বজ্জনের সমাবেশই ছিল নিমন্ত্রয়িতাদের অভিপ্রায়।

প্রথম অধিবেশন হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের আহ্বানে তাঁদের জোড়াসাঁকোর ভবনে। দ্বিতীয় অধিবেশন হয় 'গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরে বাটীতে'। কিন্তু এই অধিবেশনে স্বয়ং গুণেন্দ্রনাথই কি উপস্থিত ছিলেন না? তাঁকে লেখা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত পত্রখানি থেকে তাই মনে হয়। নতুবা তাকে বিদ্বজ্জনের card ও রবির কবিতা পাঠাবার কোনো অর্থ হয় না। সে সময় গুণেন্দ্রনাথ কোথায় ছিলেন জানি না।

বিদ্বজ্জনসমাগমের আলোচনাটা দীর্ঘ হয়ে গেল। এবার 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার পাদটীকাটির আলোচনায় ফিরে আসা যাক।

তিন। বিদ্বজ্জনসমাগমের এই দ্বিতীয় অধিবেশনে বালক রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি 'পাঠ' করেছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস মাত্র পূর্বে হিন্দুমেলায় একটি দীর্ঘ কবিতা ('হিন্দুমেলার উপহার') স্খলিত কণ্ঠে স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করেছিলেন (delivered from memory)[১৬]। 'প্রকৃতির খেদ' তিনি পাঠ করেছিলেন— সম্ভবতঃ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি দেখে নয়, মুদ্রিত কাগজ দেখে। প্রতিবিম্বের সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে জানা যায়, কবিতাটি 'মুদ্রিত করিয়া বিদ্বজ্জনসমাগম সভায় প্রদান করা হয়'। অর্থাৎ কবিতাটি মুদ্রিত করে আমন্ত্রিত বিদ্বজ্জনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ ও-রকম মুদ্রিত কপিই 'কর্তামহাশয়'কে (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে) পড়তে দিয়েছিলেন এবং আর এক কপি পাঠিয়েছিলেন গুণেন্দ্রনাথকে।

চার। উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে আরও জানা যায় যে বিদ্বজ্জনসমাগম-সভায় বিতরণের জন্য 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটির 'অর্ধাংশ মাত্র' মুদ্রিত হয়েছিল। অর্ধাংশ বলতে কি বোঝায় এবং অর্ধাংশমাত্র মুদ্রিত হল কেন, তাও বিবেচনা করে দেখা যাক। স্বভাবতঃই অনুমান হয় যে প্রতিবিম্ব পত্রিকায় 'প্রকৃতির খেদ' যতখানি মুদ্রিত হয়েছিল তারই অর্ধাংশ মুদ্রিত হয়েছিল বিদ্বজ্জনদের মধ্যে বিতরণের জন্য, এ কথা বলাই সম্পাদকের অভিপ্রায়। আর এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, ওই অর্ধাংশের মধ্যেই একটা ভাবগত পূর্ণতা ছিল; নতুবা অর্ধাংশমাত্র মুদ্রিত ও পঠিত হতে পারত না।

প্রতিবিম্ব পত্রিকায় মুদ্রিত 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি মোট সাতাশটি অসমান স্তবকে বিভক্ত, শেষ দিকের স্তবকগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। প্রথম ষোলোটি স্তবকে (১-১৬) আছে একশত লাইন, শেষ দশ স্তবকেও (১৮-২৭) তাই। আর এই দুই ভাগের মধ্যবর্তী সতেরো-সংখ্যক স্তবকটিতে আছে এগারো লাইন; কিন্তু এই লাইনগুলি সাতাশ-সংখ্যক স্তবকটির শেষ অংশে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই পুনরুক্ত হয়েছে। বস্তুতঃ এই

---

১৫ সাহিত্যসাধকচরিতমালা ৬৮ (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর), পৃ ২০-২২

১৬ The Indian Daily News (১৮৭৫ ফেব্রুআরি ১৫)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'রবীন্দ্রগ্রন্থপরিচয়' পুস্তকে (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫০ মাঘ, পৃ ৭৫) উদ্ধৃত।

লাইনগুলি হচ্ছে সমগ্র কবিতাটির ধুয়াস্থানীয়। যদি কবির প্রাথমিক সংকল্প অনুসারে কবিতাটির শেষাংশে ভারত-ইতিহাসের ধারা অনুসৃত হত তা হলে এই ধুয়াটি ভাবের পর্যায়ে পর্যায়ে বারবার দেখা দিত, কবিতাটি পড়লে এ অনুমান অসংগত মনে হয় না।

প্রতিবিম্বে মুদ্রিত কবিতাটির দুটি ভাবপর্যায় সুস্পষ্ট। প্রথম ভাবপর্যায়টি শেষ হয়েছে ষোলো-সংখ্যক স্তবকের শেষে। এই ষোলো-স্তবকের লাইন সংখ্যা একশো। তার পরেই সপ্তদশ স্তবকে ধুয়াটির প্রথম আবির্ভাব। অতএব এই অনুমান প্রায় অনিবার্য যে, প্রথম ষোলো স্তবকের এক শো লাইন এবং সতেরো-সংখ্যক স্তবকের এগারো লাইন, কবিতাটির এই অংশটুকুই মুদ্রিত হয়ে বিদ্বজ্জন সভায় বিতরিত হয়েছিল। এই সতেরো স্তবকেই কবিতাটির একটি ভাবপর্যায়ের সমাপ্তি। আয়তনের দিক থেকেও এই অংশটুকু সমগ্র কবিতাটির প্রায় অর্ধাংশ। কবিতাটির অর্ধাংশ মাত্র মুদ্রিত হয়েছিল। প্রতিবিম্ব-সম্পাদকের এই উক্তির সঙ্গে উক্ত সিদ্ধান্তের কোনো বিরোধ নেই। যদি কোনো কালে বিদ্বজ্জনসভায় বিতরিত মুদ্রিত কবিতাটির কোনো কপি আবিষ্কৃত হয় তা হলেই এই সিদ্ধান্তের সত্যতা সংশয়াতীতরূপে নিরূপিত হতে পারবে।

বিদ্বজ্জনসমাগমের এই অধিবেশনের অনুষ্ঠানসূচী লঘু ছিল না। বক্তৃতা, প্রাচীন ও আধুনিক কবিতা বা গদ্য ও নাট্যাংশ পাঠ। তা ছাড়া নানারকম বাজনা ও গানে উক্ত কার্যক্রম ঠাসা ছিল। এই অবস্থায় দীর্ঘ কবিতা পাঠ করলে শুধু যে সময়ে টানাটানি হত তা নয়, সমগ্র কার্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্যও রক্ষিত হত না। তার পর দুই বৎসরের কার্যক্রম দেখলে ধারণা হয় যে, কাব্য, নাটক ও গদ্যগ্রন্থ থেকে নাতিদীর্ঘ অংশ পাঠ করাই ছিল বিদ্বজ্জনসভার সাধারণ রীতি। এই অবস্থায় 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার অংশবিশেষ পাঠ করাই ছিল উক্ত অধিবেশনের পক্ষে যথেষ্ট। তা ছাড়া, এমনও হতে পারে যে, একশো বিদ্বজ্জনের সভায় একশো লাইনের কবিতা পড়াই বালক কবির অভিপ্রায় এবং সে অভিপ্রায়ে ওই অংশটুকুই বিদ্বজ্জনসভার জন্য রচিত হয়েছিল এবং ভাবের সম্পূর্ণতার খাতিরে এগারো লাইনের ধুয়াটিও যুক্ত হয়। কিন্তু কল্পনার বেগ কবিকে আরও রচনায় প্রবৃত্ত করে এবং কবির মনে তার পরেও কবিতাটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার সংকল্প জাগায়। তারই ফলে প্রতিবিম্বে প্রকাশিত দুই পর্যায়ের পরেও 'ক্রমশঃ' কথাটি লিখিত হয়। কিন্তু বিদ্বজ্জনসভার পক্ষে কবিতাটির প্রথম পর্যায়টিই যথেষ্ট বিবেচনায় ওই অংশটুকুই মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়।

পাঁচ। এক দিকে বিদ্বজ্জনসমাগমের আসন্ন অধিবেশন আর অন্য দিকে প্রতিবিম্বের আসন্ন প্রকাশ, এই উভয় তাগিদেই 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি রচিত হয়। কবিতাটির দুই পর্যায় রচিত হবার পরেই ওটি দীর্ঘতর রচনার প্রথম কিস্তি হিসাবে প্রতিবিম্ব পত্রিকায় মুদ্রণের জন্য প্রেরিত হয়। তার পরে কবি 'এই পদ্যটির যেরূপ কাপি প্রেরণ করেন, প্রুফ সংশোধনের সময় তাহার অনেক পরিবর্ত করিয়া দেন'। ইতিমধ্যে বিদ্বজ্জনসমাগমের জন্য কবিতাটি মুদ্রণের প্রয়োজন হওয়ায় এবং লেখকের কাছে সংশোধিত কপি না থাকায় 'অসংশোধিত কাপিখানি দেখিয়া অর্ধাংশ মাত্র মুদ্রিত করিয়া বিদ্বজ্জনসমাগম সভায় প্রদান করা হয়'। এইজন্য সভার জন্য মুদ্রিত পাঠ ও প্রতিবিম্বে মুদ্রিত পাঠ, এই উভয় পাঠের মধ্যে 'স্থানে স্থানে অনেক প্রভেদ লক্ষিত' হয়েছিল। অতঃপর কবিতাটি পূর্বসংকল্পিত শেষাংশ রচনার অভিপ্রায় কবি ত্যাগ করেন এবং প্রতিবিম্বে প্রকাশিত পর্যায় দুটিকে আরও পরিমার্জিত করার প্রয়োজন বোধ করেন। এই পরিমার্জিত রূপটি পরে প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৮৭৫। শক ১৭৯৭ আষাঢ়)। এই দুই পাঠের মধ্যেও 'স্থানে স্থানে অনেক প্রভেদ লক্ষিত' হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি তিনবার মুদ্রিত হয়েছিল।

প্রতিবিম্ব ও তত্ত্ববোধিনীর দুটি পাঠ আমাদের হস্তগত হয়েছে। প্রথম মুদ্রিত পাঠ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। নিজের রচনার পুনঃ পুনঃ পাঠসংস্কার করার যে অভ্যাস রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনেই লক্ষিত হয়, দেখা যায় 'প্রকৃতির খেদ' রচনার সময়েও (১৮৭৫) তাঁর এই অভ্যাস ছিল। উন্নতিবিধান ও সংস্কার সাধনের অক্লান্ত প্রয়াস প্রতিভা বিকাশের অন্যতম অব্যর্থ উপায়। রবীন্দ্রপ্রতিভা এই অক্লান্ত প্রয়াস থেকে কখনও বিরত হয় নি।

৪

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা স্মরণীয়। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> এ পর্যন্ত যাহা কিছু লিখিতেছিলাম তাহার প্রচার আপনা-আপনির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। এমন সময় জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন। কালের দরবারে আমার সুকৃতি-দুষ্কৃতি বিচারের সময় কোন্ দিন তাহাদের তলব পড়িবে এবং কোন্ উৎসাহী পেয়াদা তাহাদিগকে বিস্মৃত কাগজের অন্দরমহল হইতে নির্লজ্জভাবে লোকসমাজে টানিয়া বাহির করিয়া আনিবে, জেনানার দোহাই মানিবে না, এ ভয় আমার মনের মধ্যে আছে। — রচনা প্রকাশ, 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২)

এখানে জ্ঞানাঙ্কুর সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তা বস্তুতঃ প্রতিবিম্ব সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, জ্ঞানাঙ্কুর সম্বন্ধে নয়। জ্ঞানাঙ্কুরের জীবনারম্ভ হয় ১২৭৯ সালের আশ্বিন মাসে শ্রীকৃষ্ণ দাসের সম্পাদকতায়। চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা (১৮৭৫।১২৮২ অগ্রহায়ণ) থেকে এই পত্রিকাটির সঙ্গে প্রতিবিম্ব পত্রিকা যুক্ত হয় এবং এই দুয়ের মিলিত রূপের নাম হয় 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব'।[১৭] রবীন্দ্রকথিত 'জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক কাগজ' আসলে এই যুক্ত পত্রিকা, স্বতন্ত্র জ্ঞানাঙ্কুর নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন'। এই কর্তৃপক্ষ যে জ্ঞানাঙ্কুরের কর্তৃপক্ষ নয়, তা সহজেই অনুমেয়। প্রতিবিম্বের সঙ্গে যুক্ত হবার পূর্বে দীর্ঘ তিন বৎসর আয়ুষ্কালের মধ্যে জ্ঞানাঙ্কুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো যোগই ছিল না। এই পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ দাস বা কর্তৃপক্ষস্থানীয় আর কারও সঙ্গে এই অঙ্কুরোদ্গত কবির কোনো পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা ছিল, তারও প্রমাণাভাব। তা ছাড়া প্রতিবিম্বের সঙ্গে যুক্ত হবার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ ওই দ্বৈতনামা পত্রিকার নিয়মিত লেখক বলে গণ্য হলেন, এটাও তাৎপর্যহীন নয়। প্রতিবিম্বের জন্মকাল থেকেই তিনি তার 'সম্ভ্রান্ত লেখক' বলে সাদরে স্বীকৃত ছিলেন। অর্থাৎ প্রতিবিম্বের কর্তৃপক্ষেরাই এই অঙ্কুরোদ্গত কবিকে সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন। সুতরাং জ্ঞানাঙ্কুরের সঙ্গে যুক্ত হবার পর থেকেই তিনি মিলিত পত্রিকার নিয়মিত লেখকরূপে গণ্য হবেন, সেটা বিচিত্র নয়।

প্রতিবিম্ব পত্রিকার কর্তৃপক্ষস্থানীয় যিনি এই নবীন কবিকে সংগ্রহ করে নিলেন, তাঁর পরিচয়টাও জানা প্রয়োজন। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রামসর্বস্ব (ভট্টাচার্য) বিদ্যাভূষণ (১৮৪৩-১৯১২)[১৮]। তাঁর

---

১৭ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বাংলা সাময়িক পত্র' দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৫৮ মাঘ), পৃ ৯

১৮ জীবনস্মৃতি (১৩৬৩ সং): গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৩৯

কিছু পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। এ স্থলে আরও একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ১২৭৫ সালের ১৫ পৌষ তারিখে রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণের সম্পাদকতায় 'কল্প লতিকা' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তখন তিনি পটোলডাঙা ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউশনের পণ্ডিত।[১৯] অতঃপর যখন (১৮৭৫।১২৮২ বৈশাখ) তিনি মাসিক 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন তখন তিনি মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনের অধ্যাপক (হেড পণ্ডিত) ও রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি এই—

রামসর্বস্ব পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি আমার সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার ছিল। অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় ভঙ্গ দিয়া তিনি আমাকে অর্থ করিয়া শকুন্তলা পড়াইতেন। তিনি একদিন আমার ম্যাক্‌বেথের তর্জমা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শুনাইতে হইবে বলিয়া আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন।...ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগরেরর মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই; অতএব এখান হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল ছিল। বোধ করি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম।

— ঘরের পড়া, 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২)

রামসর্বস্ব ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিচালিত মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনের সংস্কৃত শিক্ষক। সুতরাং বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা থাকাই স্বাভাবিক।

রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি উক্তিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।—

রবীন্দ্রনাথ তখন বাড়িতে রামসর্বস্ব পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। আমি ও রামসর্বস্ব দুইজনে রবির পড়ার ঘরে বসিয়াই 'সরোজিনী'র প্রুফ সংশোধন করিতাম। রামসর্বস্ব খুব জোরে জোরে পড়িতেন। পাশের ঘর হইতে রবি শুনিতেন, ও মাঝে মাঝে পণ্ডিত মহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া, কোন্ স্থানে কি করিলে ভালো হয়, সেই মতামত প্রকাশ করিতেন।...তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।

— জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি (১৩২৬) পৃ ১৪৭

এটা ১৮৭৫ সালের শেষভাগের কথা। সরোজিনী নাটক প্রকাশিত হয় ওই সালের ৩০শে নবেম্বর তারিখে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে প্রতিবিম্বের দ্বিতীয় সংখ্যায় (১২৮২ জ্যৈষ্ঠ) 'পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র' নামে দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দেখা যাচ্ছে রামসর্বস্ব মেট্রোপলিটানের হেড পণ্ডিত ও রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক মাত্র ছিলেন না। তিনি এক দিকে ছিলেন একটি 'উৎকৃষ্ট পত্রিকা'র সম্পাদক ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এবং অপর দিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ তথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্য-সহায়ক, বয়সে উভয়ের মধ্যবর্তী।[২০] তাঁর সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথের মধুর সম্পর্কটি বিশেষভাবে মনকে মুগ্ধ করে। সরোজিনীর প্রুফ সংশোধনের সামান্য কাহিনীটি এই গুরুশিষ্যের সম্পর্কের উপরে অতি অপূর্ব আলোকপাত করে। এই দিক্ থেকে 'প্রকৃতির খেদ' সম্পর্কে প্রতিবিম্বের সম্পাদকীয় মন্তব্যটি স্মরণীয়। রামসর্বস্ব

১৯ পূর্বোক্ত 'বাংলা সাময়িক পত্র' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২

২০ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সহপাঠী বন্ধু' এবং রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য দীক্ষাদাতা' অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীও (১৮৫০-৯৮) রামসর্বস্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন বলে মনে করা যায়। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। 'মাধবমালতী' নামে তাঁর একটি কাব্য প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায় (১২৮২ পৌষ)।

ছিলেন একাধারে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত শিক্ষক তথা সাহিত্যের প্রেরণাদাতা। মানতেই হবে যে তাঁর সংস্কৃত শিক্ষা তথা সাহিত্যের প্রেরণা ব্যর্থ হয় নি। 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাতেই তার পরিচয় রয়েছে। রামসর্বস্বের মত গুরু পাওয়া দুর্লভ সৌভাগ্য, আর রবীন্দ্রনাথের মত শিষ্য পাওয়া দুর্লভতর সৌভাগ্য। রামসর্বস্ব নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে তাঁর এই অসাধারণ শিষ্যের সাহিত্যকীর্তির ইতিহাস পরম গর্বের সহিত লক্ষ করেছিলেন। মৃত্যুকালে (১৯১২) তিনি তাঁর এই শিষ্যটিকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত দেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু শিষ্যের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির গৌরবে গর্বানুভব করবার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি।

যা হক রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা তথা সাহিত্যসাধনার ইতিহাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ন্যায় রামসর্বস্বের নামটিও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। আর স্মরণীয় প্রতিবিম্ব পত্রিকার নামটি। রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রথম প্রকাশের গৌরব প্রাপ্য জ্যোতিরিন্দ্র-সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার— 'অভিলাষ' কবিতা প্রকাশের তারিখ ১৮৭৪। শক ১৭৯৬ অগ্রহায়ণ। এই গৌরবের দ্বিতীয় অধিকারী তৎকালীন দ্বৈভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকা— 'হিন্দুমেলার উপহার' প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ ফেব্রুআরি ২৫ তারিখে। তৃতীয় অধিকারী এই 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকা— 'প্রকৃতির খেদ' প্রকাশিত হয় ১৮৭৫। ১২৮২ বৈশাখ সংখ্যায়। আমরা দেখেছি এই কবিতাটিকেই প্রতিবিম্ব পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সংকল্প ছিল কবির তাই কবিতাটির শেষে লেখা ছিল 'ক্রমশঃ'। কিন্তু পরে সে সংকল্প পরিত্যক্ত হয় এবং কবিতাটি পুনঃ সংস্কৃত হয়ে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয় (১৮৭৫। শক ১৭৯৭ আষাঢ়)। প্রতিবিম্বের আষাঢ়-কার্তিক সংখ্যাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনা প্রকাশিত হয়েছিল কি না জানতে পারি নি। প্রকাশিত হওয়া বিচিত্র নয়। এ বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্ররচনা-প্রকাশের ইতিহাসে 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার স্থান চতুর্থ। এই পত্রিকাতেই 'বনফুল' কাব্যের আট সর্গ এবং 'প্রলাপ' কবিতার তিন পর্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় (১৮৭৫।১৮৮২ অগ্রহায়ণ — ১৮৭৬।১২৮৩ কার্তিক)[২১]। তারও মূলে রয়েছে রামসর্বস্ব-সম্পাদিত প্রতিবিম্ব পত্রিকার প্রেরণা। প্রতিবিম্বে প্রকাশিত রচনার সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। বস্তুতঃ রামসর্বস্ব তথা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' ছিল 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকারই অনুবৃত্তি মাত্র। প্রতিবিম্বে যে রচনাধারা প্রকাশের সংকল্প রবীন্দ্রনাথের মনে দেখা দেয়, তাই কার্যে পরিণত হয় 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার যোগে।

৫

'প্রকৃতির খেদ' কবিতার পাঠবিশ্লেষণের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। পূর্বে এক প্রবন্ধে[২২] দেখিয়েছি যে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতায় কোনো কোনো স্থলে মেঘনাদবধকাব্যের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু 'হিন্দুমেলায় উপহারে'র ন্যায় 'প্রকৃতির খেদে' হেমচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্টতর। এ বিষয়ে বর্তমান প্রবন্ধের গোড়াতেই কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এ স্থলে আরও দু-একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন প্রয়োজন। কবিতার ভাব বা বিষয়বস্তুর দিক্ থেকে 'হিন্দুমেলায় উপহার' ও 'প্রকৃতির খেদ' একই পর্যায়ভুক্ত। দুটিই হেমচন্দ্রের 'ভারত-

২১ পূর্বোক্ত রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড পৃ ৫২ পাদটীকা ২, পৃ ৫৬ পাদটীকা ২; পূর্বোক্ত 'রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য', পৃ ৯; জীবনস্মৃতি (১৩৬৩): গ্রন্থপরিচয়, পৃ ১৮৫

২২ 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা', বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ বৈশাখ পৃ ৬৫৯

সংগীত' কবিতার (১৮৭০) অনুবর্তী। ভারত-সংগীতের ন্যায় এই দুটি কবিতাও বস্তুতঃ ভারতের বর্তমান হীনাবস্থার জন্য পরের জবানিতে কবির খেদোক্তি। ভারত-সংগীতে আছে—

এই কথা বলি মুখে শিঙ্গা তুলি
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন জ্যোতিতে হানিয়ে বিজুলী
গায়িতে লাগিল জনেক যুবা।

'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতায় আছে—

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন পরি
গান ব্যাস ঋষি বীণা হাতে করি
কাঁপায়ে পর্বত-শিখর কানন
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়।

প্রকৃতির খেদের প্রথমেই আছে গোমুখীর অদূরবর্তী মানসসরসী বর্ণনা এবং উক্ত সরসীর নলিনীদলে অবস্থিত প্রকৃতিদেবীর বর্ণনা। তার পরেই আছে—

বিজনে খুলিয়া প্রাণ
নিখাদে চড়ায়ে তান
শোভনা প্রকৃতি দেবী গান ধীরে ধীরে।

অর্থাৎ কবিতা তিনটি যথাক্রমে জনেক যুবা, ব্যাস-ঋষি ও প্রকৃতি দেবীর জবানিতে কবির আক্ষেপ।

'হিন্দুমেলায় উপহার' এবং 'প্রকৃতির খেদ' কবিতা দুটির মধ্যে প্রকাশভঙ্গিগত একটা বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতাটিতে আছে—

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক ভারত-কানন,
চন্দ্র সূর্য হোক মেঘে নিমগণ
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক।
যাক ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক।[২৩]

এই লাইনগুলির ভাষা ও রচনার ভঙ্গি যে হেমচন্দ্রের ভারতসংগীতের ছাঁচে গড়া, আশা করি এ কথা বলার অপেক্ষাও রাখে না। যা হক্ এই দুই স্তবকের সঙ্গে প্রকৃতির খেদের নিম্নোদ্ধৃত লাইনগুলির ভাবগত সাদৃশ্য সহজেই ধরা পড়ে।—

---

২৩ এই দুটি স্তবক হচ্ছে 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতার ধুয়া। ধুয়াটি দ্বিরুক্ত হয়েছে একবার কবিতার মধ্যে এবং আর একবার শেষের দিকে। 'প্রকৃতির খেদে'র ধুয়াটিও অনুরূপভাবে দ্বিরুক্ত হয়েছে।

আয়রে প্রলয়-ঝড়,
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ কর,
ধূর্জটি, সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার।
প্রভঞ্জন ভীমবল
খুলে দাও বায়ু দল,
ছিন্ন ভিন্ন করে দিক ভারতের বেশ।
ভারত-সাগর রুষি,
উগর বালুকা রাশি
মরুভূমি হয়ে থাক সমস্ত প্রদেশ॥

হিন্দুমেলায় উপহারের উদ্ধৃত অংশটির সঙ্গে এই লাইনগুলির ভাবগত সাদৃশ্য যেমন সুস্পষ্ট, এই দুটি অংশের রচনাদর্শগত পার্থক্যও তেমনি সুস্পষ্ট। একটু পরেই এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা করা যাবে।

এ স্থলে শুধু এটুকু বলা প্রয়োজন যে, 'প্রকৃতির খেদে'র এই লাইনগুলিই হচ্ছে এই কবিতাটির ধুয়া। কবিতাটির প্রথম ভাবপর্যায়ের পরে একবার এবং দ্বিতীয় ভাবপর্যায়ের পরে আবার এই ধুয়াটির আবৃত্তি ঘটেছে। এ ক্ষেত্রেও ভারত-সংগীত কবিতার অনুকৃতি লক্ষিতব্য। ভারত-সংগীত কবিতাটিরও একটি ধুয়া আছে। সেটি এই—

বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

ভারত-সংগীত কবিতায় এই ধুয়াটির দুইবার আবৃত্তি ঘটেছে (ঈষৎ পরিবর্তনসহ) এবং এই ধুয়া দিয়েই কবিতা শেষ হয়েছে। 'প্রকৃতির খেদে'ও তাই। 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতার ধুয়াটির দ্বিরাবর্তনের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

৬

এবার ভারত-সংগীত ও 'প্রকৃতির খেদ' এই দুটি কবিতার পার্থক্যের বিষয়টা ভেবে দেখা যাক। আমরা দেখেছি 'হিন্দুমেলায় উপহার' ভাবাদর্শ ও রচনাদর্শ এই উভয় দিক্ থেকেই ভারত-সংগীতের অনুবর্তী, কিন্তু 'প্রকৃতির খেদ' ভাবাদর্শে ভারত-সংগীতের অনুবর্তী হলেও রচনাদর্শে পৃথক্। এর কারণ কি, আর এই নূতন রচনাদর্শ রবীন্দ্রনাথ পেলেন কোথায়, তাও অনুসন্ধানের বিষয়।

বিদ্বজ্জনসমাগমের প্রথম অধিবেশন হয় ১২৮১ বৈশাখ ৬। ১৮৭৫ এপ্রিল ১৮ তারিখে। তখনও ঠাকুরবাড়িতে হেমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক কবিতার প্রচুর প্রভাব। সাপ্তাহিক 'ভারত-সংস্কারক' পত্রিকায় (১২৮১ বৈশাখ ১২) এই অধিবেশনের যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাতে আছে—

> সভাস্থলে একটি যুবা প্রথমে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দীপনী কবিতামালা উচ্চ গম্ভীর স্বরে ও উপযুক্ত ভাবভঙ্গীর সহিত অনর্গল আবৃত্তি করিলেন, তাহাতে আসর বেশ গরম হইয়া উঠিল।

আমরা বহুদিনবিস্মৃত একটি জাতীয় ভাব অনুভব করিলাম, এবং ইংরেজাধীনে বা স্বাধীন রাজ্যে বাস করিতেছি বোধগম্য করিতে পারিলাম না। —জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (সাহিত্যসাধক ৬৮) পৃ ২১

পরের বৎসর বিদ্বজ্জনসমাগমের দ্বিতীয় অধিবেশনের (১৮৭৫ মে ২।১২৮২ বৈশাখ ২০) সময়েও যে ঠাকুরবাড়িতে হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম উদ্দীপনার প্রভাব অব্যাহত ছিল তার প্রমাণ রয়েছে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার ভাবাদর্শের মধ্যেই, সে কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু হেমচন্দ্রের রচনাদর্শ পরিত্যক্ত হল কেন?

বিদ্বজ্জনসমাগমের প্রথম অধিবেশনের সমকালেই (১২৮১ বৈশাখ) প্রকাশিত হয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত 'আর্যদর্শন' নামক মাসিক পত্রিকাটি[২৪] আর এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় বিহারীলালের সুবিখ্যাত সারদামঙ্গল কাব্য। এই কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি এস্থলে বিবেচ্য।—

তখন বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল সংগীত আর্যদর্শনে বাহির হইতেছিল এবং আমরা তাহাই লইয়া মাতিয়া ছিলাম। —গ্রন্থপরিচয় (গীতচর্চা), জীবনস্মৃতি

এই 'আমরা' কারা এবং রবীন্দ্রনাথ এই কাব্য নিয়ে কি ভাবে মেতেছিলেন, তা স্পষ্ট হবে পরবর্তী উক্তি থেকে।—

এই সময় বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল সংগীত আর্যদর্শন পত্রে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বউঠাকুরাণী[২৫] এই কাব্যের মাধুর্যে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। ইহার অনেকটা অংশই তাঁহার একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল।…বিহারীবাবুর মতো কাব্য লিখিব, আমার মনের আকাঙ্ক্ষাটা তখন এই পর্যন্ত দৌড়িত। হয়তো কোনোদিন বা মনে করিয়া বসিতে পারিতাম যে, তাঁহার মতোই কাব্য লিখিতেছি।
—সাহিত্যের সঙ্গী 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২)

এই শেষ উক্তিটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে স্থাপন করেছেন 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে রচনাপ্রকাশ-কাহিনীর অব্যবহিত পূর্বে। অর্থাৎ উক্ত পত্রিকায় ধারাবাহিক রচনা প্রকাশের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের মনে বিহারীলালের মত কাব্য লেখার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সারদামঙ্গলের আদর্শ তিনি কোনো রচনায় অনুসরণ করেছিলেন কি না, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নীরব। অথচ তিনি একাধিকবার স্বীকার করেছেন যে বঙ্গসুন্দরীর 'তিনমাত্রামূলক' ছন্দটা তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।[২৬] তা ছাড়া তাঁর এই 'কাব্যগুরু'র কাছে আর একটি ঋণের কথাও একাধিকবার স্বীকার করেছেন। সেটি এই যে, তাঁর ভাষা পর্যন্ত সারদামঙ্গলের আরম্ভভাগ থেকে গৃহীত হয়েছিল।[২৭] তা ছাড়া সারদামঙ্গলের কোনো অনুকৃতিরই উল্লেখ তিনি করেন নি।

---

২৪ পূর্বোক্ত 'বাংলা সাময়িক পত্র' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৩।

২৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী [কাদম্বিনী] দেবী (১৮৫৯-৮৪)। বিবাহ ১৮৬৮। ১২৭৫ আষাঢ় ২৩; মৃত্যু ১৮৮৪ এপ্রিল ১৯। ১২৯১ বৈশাখ ৮। দ্রষ্টব্য জীবনস্মৃতি (১৩৬১), পৃ ২৩৮; রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড (১৩৬৭) পৃ ১৭৮ পাদটীকা ১।

২৬ সন্ধ্যাসংগীত 'জীবনস্মৃতি' (১৩১৩), পৃ ১১২। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্য 'আদৌ ১২৭৪ এবং ৭৬ সালের অবোধবন্ধু নামক অতীত মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল'। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১২৭৬ সালে (১৮৭০ জানুআরি ১)।

২৭ বিহারীলাল (১৩০১), 'আধুনিক সাহিত্য'; বাল্মীকিপ্রতিভা, 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২)।

'বিহারীলাল' প্রবন্ধে (আধুনিক সাহিত্য) রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষাতেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি 'এককালে বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গলের কবির নিকট হইতে কাব্যশিক্ষার চেষ্টা' করেছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বঙ্গসুন্দরীর 'তিনমাত্রামূলক' ছন্দ তাঁর অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তার প্রমাণ আছে তাঁর অল্প বয়সের অনেক রচনাতেই। এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি।[২৮] উক্ত বিহারীলাল প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> সারদামঙ্গল এক অপরূপ কাব্য। প্রথম যখন তাহার পরিচয় পাইলাম তখন তাহার ভাষায় ভাবে এবং সংগীতে নিরাতিশয় মুগ্ধ হইতাম।

দেখা যাচ্ছে প্রথমে বঙ্গসুন্দরীর 'তিনমাত্রামূলক' ছন্দের প্রতি আকৃষ্ট হলেও আর্যদর্শনে প্রকাশকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ (তথা তাঁর সাহিত্যের সঙ্গী কাদম্বরী দেবী) সারদামঙ্গল কাব্য নিয়ে খুবই মেতে উঠেছিলেন, কেননা তাঁরা ওই কাব্যের 'ভাষায় ভাবে এবং সংগীতে [অর্থাৎ ছন্দে] নিরতিশয় মুগ্ধ' হতেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

> আর্যদর্শনে বিহারীলালের সারদামঙ্গলসঙ্গীত যখন প্রথম বাহির হইল তখন ছন্দের প্রভেদ মুহূর্তেই প্রতীয়মান হইল।…বঙ্গসুন্দরীর ছন্দোলালিত্য অনুকরণ করা সহজ, সেই মিষ্টতা একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহার বন্ধন ছেদন করা কঠিন, কিন্তু সারদামঙ্গলের গীতসৌন্দর্য অনুকরণসাধ্য নহে।
>
> — বিহারীলাল (১৮৯৪), 'আধুনিক সাহিত্য'

সারদামঙ্গলের ছন্দসৌন্দর্য 'অনুকরণসাধ্য' নয়, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির গুরুত্ব কতখানি বিচার করে দেখা প্রয়োজন। বঙ্গসুন্দরীর 'তিনমাত্রামূলক' ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

> এ ছন্দের প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে যুক্ত অক্ষরের স্থান নাই।…কবিও এই কারণে বঙ্গসুন্দরীতে যথাসাধ্য যুক্ত অক্ষর বর্জন করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু বাংলা যে ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ ছন্দের ঝঙ্কার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য যুক্ত অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা নাই, তার উপরে যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে। তাহা শীঘ্রই শ্রান্তিজনক তন্দ্রাকর্ষক হইয়া উঠে এবং হৃদয়কে আঘাতপূর্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। — বিহারীলাল, 'আধুনিক সাহিত্য'

বঙ্গসুন্দরীর ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি হেমচন্দ্রের 'ভারতবিলাপ' এবং 'ভারতসংগীত' সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কেননা, এই দুটি কবিতার ছন্দও 'তিনমাত্রামূলক'। তবে বঙ্গসুন্দরীর সঙ্গে ভারতসংগীতের ছন্দের বাঁধুনিগত কিছু পার্থক্য আছে— বঙ্গসুন্দরীর ছন্দ দ্বিপদী এবং ভারতসংগীতের ছন্দ চৌপদী। আর-এক পার্থক্য এই যে, লালিত্যের প্রয়োজনে বিহারীলাল যুক্তাক্ষর বর্জনে যেমন সচেষ্ট হেমচন্দ্র তা নয়; কারণ হেমচন্দ্রের প্রয়োজন ভাবের ও ভাষার দৃঢ়তাবিধান। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই যুক্তাক্ষর ছন্দোভঙ্গ ঘটায় অথচ যুক্তাক্ষর বর্জন করে চললে ছন্দ শ্রান্তিজনক ও তন্দ্রাকর্ষক হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের প্রারম্ভে বঙ্গসুন্দরী ও ভারতসংগীত এই দুই রচনার ছন্দেই অভ্যস্ত হয়েছিলেন। তার প্রমাণ আছে তাঁর প্রথম যুগের

---

২৮ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'রবি-প্রদক্ষিণ' গ্রন্থে (১৩৬৮ আষাঢ়) লেখকের 'ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ।

অনেক রচনায়। দু একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 'শৈশবসংগীত' কাব্যের (কবির তেরো থেকে আঠারো বৎসর বয়সের রচনা) প্রথম কবিতার প্রথম চারটি লাইন এই।—

তরল জলদে বিমল চাঁদিমা
সুধার ঝরণা দিতেছে ঢালি।
মলয় ঢালিয়া কুসুমের কোলে
নীরবে লইছে সুরভি ডালি।

— ফুলবালা 'শৈশবসংগীত' (১৮৮৪)

এ ছন্দ বঙ্গসুন্দরীর আদর্শে রচিত। এর যুক্তাক্ষরহীন ধ্বনিলালিত্য লক্ষণীয়। এ ছন্দ তিনমাত্রামূলক, বন্ধ দ্বিপদী।

এবার 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতাটি থেকে চারটি লাইন উদ্‌ধৃত করি।—

দেখেছি সেদিন যবে পৃথ্বিরাজ
সমরে সাধিয়া ক্ষত্রিয়ের কাজ,
সমরে সাধিয়া পুরুষের কাজ
আশ্রয় নিলেন কৃতান্তের কোলে।

—হিন্দুমেলায় উপহার (১৮৭৫ ফেব্রুআরি)

এ ছন্দ ভারতসংগীতের আদর্শে রচিত। এর যুক্তাক্ষরবহুল ধ্বনিকাঠিন্য লক্ষণীয়। এ ছন্দও তিনমাত্রামূলক, বন্ধ চৌপদী। প্রসঙ্গান্তরে বলা যায় যে হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতায় এই উভয় বন্ধের (দ্বিপদী ও চৌপদী) সমাবেশ ঘটানো হয়েছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের যুক্তাক্ষরজাত বন্ধুরতা বালক কবির শ্রুতিরুচিকে পীড়িত করেছে পক্ষান্তরে প্রথম দৃষ্টান্তের যুক্তাক্ষরহীন ধ্বনির অতিলালিত্য তাঁর কাছে 'শ্রান্তিজনক' মনে হয়েছে। তাই তিনি এই উভয়সংকট থেকে মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। এমন সময় সারদামঙ্গল কাব্যের পাঁচ সর্গ পাঁচ মাসে আর্যদর্শন পত্রিকায় (১৮৭৪। ১২৮১ ভাদ্র-পৌষ) প্রকাশিত হল।[২৯] বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে বঙ্গসুন্দরীর ছন্দ থেকে এই ছন্দের 'প্রভেদ মুহূর্তেই প্রতীয়মান' হল এবং এই ছন্দের সৌন্দর্যে 'নিরতিশয় মুগ্ধ' হলেন। বঙ্গসুন্দরীর ছন্দের 'শ্রান্তিজনক' অতিলালিত্য থেকে মুক্তিলাভের উপায় তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হল। কিন্তু সারদামঙ্গলের ছন্দ তাঁর কাছে 'অনুকরণসাধ্য' বলে মনে হল না। যে সময়ে সারদামঙ্গল কাব্য আর্যদর্শনে প্রকাশিত হতে থাকে সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'অভিলাষ' প্রকাশিত হয় (১৮৭৪। ১২৮১ অগ্রহায়ণ)। এই কবিতার ছন্দের বিষয় অন্যত্র আলোচনা করেছি।[৩০] এ স্থলে শুধু এ কথা বলাই যথেষ্ট যে 'অভিলাষ' কবিতায় বঙ্গসুন্দরী বা ভারতসংগীত কোনোটির ছন্দই অনুসৃত হয় নি। এটির ছন্দস্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় মুদ্রিত কবিতা 'হিন্দুমেলায় উপহার' যখন রচিত হয় (১৮৭৫ ফেব্রুআরি) তখন আর্যদর্শনে সারদামঙ্গলের প্রকাশ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই কবিতাটিতে হেমচন্দ্রের ভারতসংগীতের অনুকৃতি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ সারদামঙ্গলের ছন্দসৌন্দর্যে 'নিরতিশয় মুগ্ধ' হওয়া সত্ত্বেও বালক রবীন্দ্রনাথ 'অভিলাষ' ও

২৯ শ্রীসুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৫০) পৃ ৪৮৭ পাদটীকা ১

৩০ 'ভোরের পাখি' প্রবন্ধ 'শতবার্ষিক জয়ন্তী-উৎসর্গ' গ্রন্থ (১৯৬১) পৃ ৩৩৫-৬১

'হিন্দুমেলায় উপহার' এই ছুটি কবিতায় সারদামঙ্গলের ছন্দঅনুসরণে সাহসী বা সচেষ্ট হন নি। বোধ করি তৎকালে তাঁর কাছে ঐ ছন্দ অনুকরণসাধ্য নয় বলেই বোধ হয়েছিল। কিন্তু বালককবি এই লোভনীয় ছন্দের অনুকরণে দীর্ঘকাল নিরস্ত থাকেন নি। আর্যদর্শনে সারদামঙ্গলের প্রকাশ সমাপ্ত হয় ১৮৭৪।১২৮১ সালের পৌষ মাসে। পরের মাঘমাসের রচিত 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতাতেও সারদামঙ্গলের ছন্দের কোনো ছায়াপাত ঘটে নি। কিন্তু তার কিঞ্চিৎ অধিক ছুই মাস মাত্র পরে রচিত 'প্রকৃতির খেদ' কবিতায় সারদামঙ্গলের ছন্দসৌন্দর্যের অনুকরণ অতি সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতা আবৃত্তি করেন হিন্দুমেলার অধিবেশনে (১৮৭৫।১২৮১ সালের মাঘ মাসে), আর 'প্রকৃতির খেদ' পঠিত হয় বিদ্বজ্জন-সমাগম সভায় (১৮৭৫।১২৮২ সালের বৈশাখ মাসে)। ছুটিরই উদ্দেশ্য ও প্রেরণা-উৎস স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা। ছুটিরই ভাব ও ভঙ্গিগত আদর্শ হেমচন্দ্রের ভারত-সংগীত। 'হিন্দুমেলায় উপহারে'র ছন্দ ও রচনাদর্শও তাই। কিন্তু 'প্রকৃতির খেদ'-এর ছন্দ তথা রচনার আদর্শ বিহারীলালের সারদামঙ্গল কাব্য। এ ছুটি কবিতার রচনাদর্শগত এই বিপুল পার্থক্য রবীন্দ্রসাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান লক্ষণীয় বিষয় বলেই মনে করি। এই পার্থক্যটুকুর গুরুত্ব উপলব্ধি না করলে রবীন্দ্ররচনারীতি-বিবর্তনের একটি মুখ্য বিষয়ই অজ্ঞাত থেকে যাবে।

৭

যে সারদামঙ্গল কাব্য রবীন্দ্রপ্রতিভাবিকাশের অন্যতম প্রধান প্রেরণাস্থল বলে কবি নিজেও স্বীকার করেছেন, সাহিত্যজগতেও স্বীকৃতি লাভ করেছে, রবীন্দ্রসাহিত্যে তার প্রথম ছাপ লক্ষিত হয় এই 'প্রকৃতির খেদ' কবিতায়। এটাও কবিতাটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের অন্যতম মুখ্য হেতু।

এবার বিবেচনা করে দেখা যাক, সারদামঙ্গল কাব্য ও প্রকৃতির খেদ কবিতার রচনাদর্শগত সাদৃশ্য কোথায়।

এক। রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'অভিলাষ' প্রচলিত পয়ারবন্ধে রচিত। তাতে ঈশ্বরগুপ্তের রচনার ছায়াপাত লক্ষিত হয়। তবে এই কবিতার ছন্দ সংস্কৃত শ্লোকের আদর্শেই রচিত বলে মনে হয়। রচনাটি সংস্কৃত কাব্যের ভঙ্গিতে চার-চারটি পঙ্‌ক্তি নিয়ে গঠিত অনেকগুলি শ্লোকে বিভক্ত এবং সংস্কৃতের মতোই পঙ্‌ক্তিপ্রান্তে কোনো মিল নেই। শ্লোকগুলিও সংখ্যানুক্রমে চিহ্নিত। সব দিক্ থেকে বিচার করলে রচনাদর্শের বৈশিষ্ট্যে এ কবিতাটির স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হল।—

হৃদয়ের উচ্চাসনে বসি অভিলাষ
মানবদিগকে লয়ে ক্রীড়া কর তুমি
কাহারে বা তুলে দাও সিদ্ধির সোপানে
কারে ফেল নৈরাশ্যের নিষ্ঠুর কবলে।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় মুদ্রিত কবিতা 'হিন্দুমেলায় উপহার' কিন্তু পয়ারবর্গের ছন্দে রচিত নয়। পয়ারের প্রতিপর্বে থাকে চারমাত্রা কিন্তু এই কবিতাটির প্রতিপর্বে আছে ছয় মাত্রা, প্রতি উপপর্বে তিন মাত্রা—তাই রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় ছন্দকে বলেন 'তিনমাত্রামূলক'। 'হিন্দুমেলায় উপহার' এই ছয় মাত্রা পর্বের চৌপদীবন্ধে রচিত। যেমন—

শুনেছি আবার শুনেছি আবার,
রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্য ভার
শাসিতেন হায় এ ভারতভূমি,
হায় কি সেদিন আসিবে ফিরে ?

এ রকম এক-একটি চৌপদী পঙ্‌ক্তি নিয়ে এর এক-একটি স্তবক গঠিত এবং স্তবকগুলি সংখ্যানুক্রমে চিহ্নিত। এই বন্ধের আদর্শ হেমচন্দ্রের 'ভারত-সংগীত'। পার্থক্য এই যে, হিন্দুমেলায় উপহারে ভারত-সংগীতের ন্যায় পঙ্‌ক্তিতে-পঙ্‌ক্তিতে মিল নেই, প্রতি পঙ্‌ক্তির তিন পদেও মিল নেই। শুধু প্রথম দুই পদে মিল আছে— উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটিতেই তা প্রতীয়মান।

তৃতীয় মুদ্রিত কবিতা 'প্রকৃতির খেদে'র ছন্দোবন্ধ সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। এই ছন্দোবন্ধের মূল উপাদান চার মাত্রার পর্ব, ছয় মাত্রার পর্ব নয়। অর্থাৎ পর্বায়তনের হিসাবে 'প্রকৃতির খেদ' 'হিন্দুমেলায় উপহারে'র সগোত্র নয়, 'অভিলাষের'ই সগোত্র। কিন্তু এটি অভিলাষের ন্যায় পয়ারবন্ধে রচিত নয়, এটি রচিত চার-মাত্রাপর্বের চৌপদী বন্ধে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রকৃতির খেদের প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত করি।—

বিস্তারিয়া ঊর্মিমালা
বিধির মানস-বালা
মানস-সরসী ওই নাচিছে হরষে।
প্রদীপ্ত তুষাররাশি
শুভ্র বিভা পরকাশি,
ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে হিমাদ্রি-উরসে।

এই বন্ধকে আপাতদৃষ্টিতে ত্রিপদী বলে মনে হতে পারে ; রবীন্দ্রনাথও তাই বলেছেন।[৩১] বস্তুতঃ এটি তা নয়। এর প্রথম দুই পদের সঙ্গে তৃতীয় পদের মিল নেই। তাই তৃতীয় ও চতুর্থ পদ এক লাইনে স্থাপিত হয়েছে। ফলে এটিকে হঠাৎ ত্রিপদী বলে ভ্রম হয়। সারদামঙ্গলও অবিকল এই বন্ধে রচিত। একটি স্তবক উদ্ধৃত করলেই প্রকৃতির খেদের সঙ্গে এর সাদৃশ্য সুস্পষ্ট হবে।—

নাহি চন্দ্র সূর্য তারা
অনল হিল্লোল-ধারা
বিচিত্র বিদ্যুৎ-দাম-দ্যুতি ঝলমল।
তিমিরে নিমগ্ন ভব,
নীরব নিস্তব্ধ সব,
কেবল মরুতরাশি করে কোলাহল।

— সারদামঙ্গল, প্রথম সর্গ।৫

আশা করি সারদামঙ্গলের সঙ্গে প্রকৃতির খেদের ছন্দোবন্ধগত সাদৃশ্য সম্বন্ধে সংশয়ের আর কোনো অবকাশ নেই। সমগ্র সারদামঙ্গল ও সমগ্র প্রকৃতির খেদ এই একই বন্ধে রচিত।

---

৩১ বিহারীলাল (১৩০১), 'আধুনিক সাহিত্য'

এই দুই কাব্যের আর-এক সাদৃশ্য এই যে, দুই কাব্যেই শ্লোকগুলি সংখ্যানুক্রমে চিহ্নিত। অবশ্য প্রকৃতির খেদ এ বিষয়ে সারদামঙ্গলের কাছে ঋণী বলে গণ্য নাও হতে পারে। কেননা প্রকৃতির খেদের অগ্রবর্তী 'অভিলাষ' ও 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতা দুটিতেও শ্লোকগুলি সংখ্যানুক্রমে চিহ্নিত।

আর একটি লক্ষণীয় সাদৃশ্য এই যে, সারদামঙ্গল কাব্যের (বিশেষতঃ তার প্রথম সর্গের) ন্যায় 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার স্তবকগুলিও সমায়তন নয়, কবির ভাবগত প্রয়োজন অনুসারে ছোট বা বড়। একটু তলিয়ে দেখলে মনে হয় 'প্রকৃতির খেদ' সারদামঙ্গলের প্রথম সর্গের আদর্শেই গঠিত। এই সর্গের শেষের দিকের স্তবকগুলি (বিশেষতঃ শেষ স্তবকটি) প্রথম দিকের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড়। 'প্রকৃতির খেদের'ও তাই। সারদামঙ্গলের প্রথম সর্গের শেষ স্তবকের গঠনটি কিশোরকবির চিত্তকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, এ কথা মনে করবার হেতু আছে। এ স্থলে সে আলোচনা বা এই দুই কাব্যের আরও খুঁটিনাটি সাদৃশ্য দেখানো বর্তমান প্রসঙ্গের পক্ষে অনাবশ্যক।

শুধু ছন্দোবন্ধ-নির্বাচনে এবং স্তবক-গঠনে নয়, 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার ভাবপরিবেশ-রচনাতেও সারদামঙ্গল প্রথম সর্গের গোড়ার দিকের কয়েকটি স্তবকের কিছু ছায়াপাত ঘটেছে। দুটি রচনাকে পাশাপাশি রেখে পড়লে এ কথা স্বভাবতঃই মনে হয় যে, একটা আর-একটার সোজাসুজি অনুকরণ না হলেও সারদামঙ্গলের ভাবকল্পনার আদর্শেই 'প্রকৃতির খেদে'র ভাবপরিবেশ উদ্‌ভাবিত হয়েছে। এমনকি, 'প্রকৃতি দেবী'র কল্পনাটিও সম্ভবতঃ কবির মনে জেগেছে সারদামঙ্গলের প্রথম স্তবকটি থেকে। ওই স্তবকের গোড়াতেই আছে—

ওই কে অমরবালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে
ঘুমন্ত প্রকৃতি পানে চেয়ে আছে কুতূহলে!

এখানে শুধু 'প্রকৃতি' নয়, 'বালা' শব্দটিও লক্ষণীয়। প্রকৃতির খেদের গোড়াতেই আছে—

বিস্তারিয়া ঊর্মিমালা
বিধির মানস-বালা।

এ বিষয়ে অধিকতর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পূর্বে বলেছি, 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি যে আকারে আমরা পেয়েছি তা কবির অভিপ্রেত সমগ্র রচনার একাংশ মাত্র। মনে হয় কিশোরকবির অভিপ্রায় ছিল 'প্রকৃতির খেদ' রচনাটিকে সারদামঙ্গলের মত কয়েক সর্গে সমাপ্ত করা এবং সেইজন্যই এটিতে ছন্দোবন্ধ ও স্তবকগঠনে তথা ভাবপরিবেশ-কল্পনায় সারদা-মঙ্গলকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। পরে যে-কোনো কারণেই হক, এই অভিপ্রায় ত্যাগ করেন।

ভাবপরিবেশ-কল্পনায় সারদামঙ্গলকে অনুসরণ করলেও 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার ভাববস্তু কল্পনায় ও স্বদেশপ্রীতির প্রকাশভঙ্গিতে কবি আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন হেমচন্দ্রের ভারতসংগীত কবিতাটিকে, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এক দিকে সারদামঙ্গল এবং আর-এক দিকে ভারতসংগীত, এই দুই আদর্শের সমন্বয়-সাধন, এটাও 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার অন্যতম ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ একাধিক স্থানে বলেছেন যে তাঁর অল্প বয়সের প্রথম রচনাগুলিতে বঙ্গসুন্দরীর (তিনমাত্রামূলক অর্থাৎ ছয়মাত্রাপর্বের) ছন্দই প্রধানতঃ অনুসৃত হয়েছিল, এবং এই ছন্দ রচনার অভ্যাস কাটাতে তাঁর সময় লেগেছিল। তার পর তিনি আকৃষ্ট হন সারদামঙ্গলের ছন্দসৌন্দর্যের প্রতি, কিন্তু সে ছন্দ তখন তাঁর কাছে

'অনুকরণসাধ্য' বলে মনে হয় নি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত রচনাগুলি বিশ্লেষণ করলে কিন্তু তাঁর এই উক্তি স্বীকার্য বলে মনে হয় না। বরং দেখা যায় যে, আর্যদর্শনে সারদামঙ্গল-প্রকাশ সমাপ্ত হবার (১২৮১ পৌষ) কয়েক মাস পরেই 'প্রকৃতির খেদ' ওই কাব্যের ছন্দের আদর্শেই রচিত হয় (১২৮২ বৈশাখ)। বালক রবীন্দ্রনাথের যে সব প্রকাশিত কবিতার কালনির্ণয় করা যায়, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি বঙ্গসুন্দরীর পূর্বেই সারদামঙ্গলের ছন্দ ও গঠনপ্রণালীর অনুসরণে ব্রতী হন। 'শৈশবসংগীত' কাব্যের প্রথম রচনা 'ফুলবালা'তে অবশ্য বঙ্গসুন্দরীর ছন্দ-অনুসরণের কিছু কিছু নিদর্শন আছে। কিন্তু তা অল্পই। তা ছাড়া, 'ফুলবালা'র রচনাকালও জানা যায় নি, প্রকাশকাল (ভারতী ১২৮৫ কার্তিক) প্রকৃতির খেদের পরবর্তী।

'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটির ছন্দোবন্ধ ও স্তবক-গঠন যে সারদামঙ্গল কাব্যের অনুবর্তী তা 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত রূপটির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ মাত্রই প্রতীয়মান হয়। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত সংস্করণটি থেকে তা হয় না। কারণ, প্রথমতঃ এই সংস্করণে সারদামঙ্গলের পঙ্ক্তিবিন্যাসপদ্ধতি অনুসৃত হয় নি, দ্বিতীয়তঃ সমগ্র কবিতাটির স্তবকবিভাগ তুলে দিয়ে এটিকে একাকার করে দেওয়া হয়েছে। বোধ করি স্থানসংক্ষেপের জন্যই এই দুটি উপায় অবলম্বিত হয়েছিল। কিন্তু তার ফলে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটির মূলরূপটিই প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

৮

'শৈশব-সংগীত' কাব্যের (১৮৮৪) ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে, এই গ্রন্থের কবিতাগুলি তাঁর তেরো থেকে আঠারো বৎসর বয়সের (১৮৭৪-৭৯) রচনা। সে হিসাবে 'অভিলাষ', 'হিন্দুমেলায় উপহার' এবং 'প্রকৃতির খেদ'ও শৈশব-সংগীতের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবার যোগ্য। কিন্তু এই তিনটি কবিতা উক্ত গ্রন্থে স্থান পায় নি। তার কারণ কি? রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের সব রচনাই নির্বিচারে শৈশব-সংগীতে গৃহীত হয় নি। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলেছেন 'আমি যাহার বিশেষ কিছু-না-কিছু গুণ না দেখিতে পাইয়াছি তাহা ছাপাই নাই'। উক্ত তিনটি কবিতা বাদ পড়েছে হয় অনবধানতাবশতঃ না হয় উক্ত গুণবিচার-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে নি বলে। উক্ত তিনটি কবিতা নিছক কবিত্বের প্রেরণায় রচিত নয়, ওগুলির মূলে রয়েছে বিশেষ উপলক্ষের তথা যুগধর্মের অর্থাৎ তৎকালীন স্বদেশপ্রীতির উত্তেজনা। মনে হয়, এইজন্যই এগুলি রবীন্দ্রনাথের নির্মম বাছাই-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে নি। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের মনে নিজের অল্পবয়সের রচনার প্রতি যে কঠিন নির্মমতা দেখা যায়, তার সূত্রপাত দেখা যায় শৈশব-সংগীত প্রকাশের সময় বা তৎপূর্ব থেকেই। তেইশ বৎসরের কবি তাঁর তেরো থেকে আঠারো বৎসর বয়সের রচনাকে কিরূপ নির্মমভাবে ছাঁটাই করেছেন তার প্রমাণ আছে শৈশব-সংগীতের ভূমিকায় এবং 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' কাব্যের 'উৎসর্গ'-পত্রে। দ্বিতীয় কাব্যটির প্রকাশকের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, একটি শৈশব-সংগীতের 'আনুষঙ্গিক স্বরূপে' প্রকাশিত হয়েছিল। এই 'আনুষঙ্গিক' কথাটার তাৎপর্য এই। এই কাব্য দুখানি শুধু যে একই বৎসরে (১৮৮৪) মাত্র একমাসের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়েছিল তা নয়, এই দুই গ্রন্থের কবিতাগুলির রচনাকাল (১৩ থেকে ১৮ বৎসর বয়স) এবং ভারতীতে প্রকাশকালও (১২৮৪-৮৮) মোটামুটি একই। দুটি কাব্যেরই রচনাগুলির প্রেরণাদাত্রী ছিলেন একই ব্যক্তি—

কিশোরকবির বউঠাকুরাণী ও 'সাহিত্যের সঙ্গী' কাদম্বরী দেবী[৩২]। তাই কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর (১৮৮৪ এপ্রিল ১৯) পরে ব্যাথাহত কবি এই কাব্য দুখানি আড়াই মাসের মধ্যেই প্রকাশ করেন (২৯ মে এবং ১ জুলাই) এবং দুখানি কাব্যই তাঁর নামে উৎসর্গ করেন। শিশুজীবনের আশ্রয়স্থল ও কবিজীবনের প্রেরণাদাত্রীর প্রতি এই তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি। এই উৎসর্গপত্র দুটি এই।—

> এই কবিতাগুলিও[৩৩] তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখতাম তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে।…
>
> —উপহার, 'শৈশব-সংগীত'

> ভানুসিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাইয়াছি, আজ তুমি দেখিতে পাইলে না।
>
> —উৎসর্গ, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'

এই কাব্য দুখানি যেমন পরস্পরের 'আনুষঙ্গিক', এই উৎসর্গপত্র-দুটিও তেমনি পরস্পরের পরিপূরক। অর্থাৎ দুটি উৎসর্গপত্রই প্রত্যেকটি কাব্যের পক্ষে প্রযোজ্য। কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যু না ঘটলে এই বই-দুখানি হয়তো কখনোই প্রকাশিত হত না। যে-বয়সে নিজের রচনার প্রতি মমতা থাকে সবচেয়ে বেশি সে বয়সে এবং সবচেয়ে বেশি উৎসাহদাত্রীর অনুরোধ সত্ত্বেও যে-বই ছাপানো হয় নি, নিদারুণতম শোকের আঘাতে আহত হয়েই সে বই প্রকাশে সম্মত হয়েছিলেন। শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহের পদাবলী'কে সাহিত্যে 'অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত' বলে বর্ণনা করেছেন। দেখা যাচ্ছে অল্প বয়সেও তাঁর মনোভাব ও-রকমই ছিল। শৈশব-সংগীতের রচনাগুলি সম্বন্ধেও তিনি সমভাবেই অনাসক্ত ছিলেন। তাই, যাঁর স্নেহে তিনি পালিত এবং যাঁর প্রেরণায় তিনি উৎসাহিত তাঁর কাছে বসে লেখা এবং তাঁকে শোনানো কবিতাগুলিও তিনি প্রকাশ করতে বিরত ছিলেন সেই অল্প বয়সেও। যখন প্রকাশ করলেন তখনও অনেক রচনাই খণ্ডিত বা বর্জিত হল। নিজের বাল্য-রচনার প্রতি এরকম অনাসক্তি বা নিরপেক্ষতা রবীন্দ্রচরিত্রে দেখা দেয় তাঁর যৌবনকালেই।

এই কাব্যের উপেক্ষিতদের দলে পড়ে 'অভিলাষ', 'হিন্দুমেলায় উপহার', 'প্রকৃতির খেদ', 'প্রলাপ' প্রভৃতি অনেক রচনা। নিরপেক্ষ সাহিত্যবিচারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে নি বলে এগুলি শৈশব-সংগীতে স্থান পায় নি। তবু মনে হয় অভিলাষ প্রভৃতি উপেক্ষিতদের দলে ফেলে প্রকৃতির খেদের প্রতি কিছু অবিচার করা হয়েছে। এই কবিতাটির প্রধান অপরাধ দুটি। এক, এটি উপলক্ষ্য বিশেষের জন্য এবং তৎকালীন দেশপ্রেমের উত্তেজনায় রচিত; আর দুই, এটি অনেকাংশে আর্যদর্শনে প্রকাশিত সারদামঙ্গলের ভাবপরিবেশে ও রচনাদর্শে গঠিত অর্থাৎ অনুকরণ-দোষে দুষ্ট। তথাপি স্বীকার করতে হবে যে, কাব্যোৎকর্ষের বিচারেও

---

৩২ 'ইনি ছিলেন তরুণ কবির নবীন সাহিত্যজীবনের নিত্যসহচর শ্রোতা সমালোচক বন্ধু।'

'শিশুকাল থেকে আমার জীবনের পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি।'—রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড (১৩৬৭) পৃ ১৭৮ এবং পাদটীকা ৪

৩৩ তৎপূর্বে ১৮৮৪ সালেই (১২৯০ ফাল্গুন) 'ছবি ও গান' এর কবিতাগুলি কাদম্বরী দেবীকে উৎসর্গ করা হয়।—

গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার বসন্তে মালা গাঁথিলাম। যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তাঁহার চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম। —উৎসর্গ, 'ছবি ও গান'

অতঃপর 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যটিও (১৮৮৪ এপ্রিল) তাঁকেই উৎসর্গ করা হয়। —পূর্বোক্ত রবীন্দ্রজীবনী, পৃ ১৮০

এটি শৈশব-সংগীত তথা বনফুলের অনেক রচনার চেয়ে অপকৃষ্ট নয় এবং শৈশব-সংগীত বা বনফুলে অনুকরণ-চিহ্নেরও অভাব নেই।

সর্বশেষ বক্তব্য এই যে, কাদম্বরী দেবীর যে 'স্নেহের স্মৃতি' বিরাজ করছে বলে রবীন্দ্রনাথ শৈশবসংগীতের কবিতাগুলি তাঁকেই উপহার দিলেন সেই স্নেহের স্মৃতি বোধ করি সবচেয়ে বেশি বিরাজ করছে এই প্রকৃতির খেদ কবিতাটিতে। পূর্বে দেখেছি রবীন্দ্রনাথ আর্যদর্শন পত্রিকায় বিহারীলালের সারদামঙ্গল প্রকাশ-প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আমরা তাহাই লইয়া মাতিয়াছিলাম'। এই 'আমরা' যে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বউঠাকুরাণী কাদম্বরী দেবী, সে কথা জীবনস্মৃতিতে 'সাহিত্যের সঙ্গী' প্রসঙ্গে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। আর, সে সময় সারদামঙ্গল রচয়িতার মত কবি হবার যে বাসনা রবীন্দ্রনাথের মনে জেগেছিল, তারই ফল এই প্রকৃতির খেদ। শুধু তাই নয়, সারদামঙ্গল কাব্যের মাধুর্যে মুগ্ধ বউঠাকুরানীর হৃদয়রঞ্জন তথা তাঁর কাছে বিহারীলালের মত শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকৃতিলাভের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাও প্রকৃতির খেদ রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছিল। বস্তুতঃ যে কবিতাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> বহুকাল হইল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে।

সেই কবিতাগুলির মধ্যে 'প্রকৃতির খেদ' যে একটি শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী তাতে সন্দেহ নেই। অথচ এই রচনাটিই যে ওই কবিতাশ্রেণীর মধ্যে স্থান পেল না ; এটা শুধু বিস্ময়ের বিষয় নয়, আক্ষেপেরও বিষয়।

'প্রকৃতির খেদ' সম্পর্কে রামসর্বস্ব, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবী এই তিনজনের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ও সাহিত্যের উৎসাহদাতা রামসর্বস্বই এই কবিতাটির প্রথম প্রকাশক। সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। রবীন্দ্রচিত্তে স্বদেশপ্রেমের উদ্‌বোধক ও তাঁর সর্বকর্মের সহায়ক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই 'প্রকৃতির খেদ' বিদ্বজ্জনসমাগম সভায় পঠিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কবিতাটির দ্বিতীয় প্রকাশকও তিনি। 'অভিলাষ' প্রকাশের মূলেও ছিল তাঁরই প্রেরণা। কিন্তু 'প্রকৃতির খেদ' রচনায় সবচেয়ে গভীর প্রেরণা ও প্রভাব ছিল বোধ করি কাদম্বরী দেবীর। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিশুকালের সুহৃদ্‌। এক দিকে সস্নেহ কাব্যচর্চার আলোকে রবীন্দ্রনাথের শিশুমনকে বিকশিত করে তুলেছিলেন তিনি, আর অপর দিকে প্রচ্ছন্ন তরুমূলের মত নিজেকে সর্বজনের অগোচরে রেখে তাঁর কবি-চিত্তে রসসঞ্চারও করেছিলেন তিনিই। তারই নিঃসন্দেহ পরিচয় বহন করছে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি। তাই মনে হয়, এই কবিতা রচনার মূল উৎস হিসাবে সর্বাধিক স্মরণীয় এই মহীয়সী মহিলার নামটি।

৯

'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার মূলরূপটি এ স্থানে পুনর্মুদ্রিত হল। তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশের সময় যে-সমস্ত পাঠসংস্কার করা হয়েছিল, পাদটীকায় তাও নির্দেশ করা গেল। প্রতিবিম্বে প্রকাশিত মূলরূপটির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করলে শুধু যে সারদামঙ্গলের সঙ্গে এটির সাদৃশ্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে তা নয়, বালক রবীন্দ্রনাথের মনোজীবনের একটি বিস্তৃত ক্ষেত্রেও নূতন আলোকপাতে উদ্‌ভাসিত হবে। তা ছাড়া—

> কাব্যরসের দিক্ দিয়া কবিতাটি পাসমার্কা পাইবে ; একজন চতুর্দশবর্ষীয় বালকের পক্ষে এরূপ রচনা Miracle-পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে।
>
> — শ্রীসজনীকান্ত দাস : রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য, পৃ ২০২।

রবীন্দ্রসাহিত্যরসিক অভিজ্ঞ সমালোচকের এই উক্তিটিও সত্য বলে স্বীকৃতি পাবে।

প্রকৃতির খেদ।*

(১)

বিস্তারিয়া উর্মিমালা,
বিধির মানস-বালা,[৩৪]
মানস-সরসী ওই নাচিছে হরষে[৩৫]
প্রদীপ্ত তুষার রাশি,
শুভ্র বিভা পরকাশি,
ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে হিমাদ্রি উরসে[৩৬]।

(২)[৩৭]

অদূরেতে দেখা যায়,
উজল রজত কায়,
গোমুখী হইতে গঙ্গা ওই বহে যায়।
ঢালিয়া পবিত্র ধারা,
ভূমি করি উরবরা,
চঞ্চল চরণে সতী সিন্ধুপানে ধায়॥

(৩)

ফুটেছে কনক-পদ্ম অরুণ কিরণে[৩৮]॥
অমল সরসী পরে,[৩৯]
কমল[৪০], তরঙ্গ ভরে,
ঢুলে ঢুলে পড়ে জলে প্রভাত পবনে॥

---

* আমাদিগের সম্ভ্রান্ত ['যদ্দৃষ্টম্'] লেখক প্রথমে এই পদ্যটির কাপি যেরূপ প্রেরণ করেন প্রুফ সংশোধনের সময় তাহার অনেক পরিবর্ত্ত করিয়া দেন। গত রবিবারের "বিদ্বজ্জন-সমাগম" সভায়, কতিপয় মান্য বন্ধুর অনুরোধে রচয়িতাকে সাধারণ সম্মুখে এই কবিতাটি পাঠ করিতে হয়। লেখকের সংশোধিত পদ্যটি তৎকালে আমাদিগের নিকট থাকায়, অসংশোধিত কাপি খানি দেখিয়া অর্দ্ধাংশমাত্র মুদ্রিত করিয়া "বিদ্বজ্জন সমাগম" সভায় প্রদান করা হয়। এজন্য রচয়িতার এই সংশোধিত রচনার সহিত সভার মুদ্রিত রচনার স্থানে স্থানে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হইবে [।]

৩৪ সুকুমারী শৈলবালা ৩৫ অমল সলিলা গঙ্গা অই বহি যায় রে ৩৬ 'হিমাদ্রি উরসে'-স্থলে 'গোমুখীর শিখরে' ৩৭ তত্ত্ববোধিনীর পাঠে এই স্তবকটি (ছয় লাইন) বর্জিত হয়েছে।

৩৮ ফুটিয়াছে কমলিনী অরুণের কিরণে॥ এখানে একমাত্রা বেশি হয়েছে। ছন্দের বিচারে প্রতিবিম্বের পাঠ নির্দোষ। 'ফুটেছে কনক-পদ্ম' কথাটিতে মেঘদূতের 'হেমাম্ভোজ-প্রসবি সলিলং মানসস্য' উক্তিটির ছায়াপাত ঘটেছে।

৩৯ নির্ঝরের একধারে ৪০ দুলিছে

(৪)

হেলিয়া নলিনী দলে,
প্রকৃতি কৌতুকে দোলে,
সরসী-লহরী[৪১] ধায় ধুইয়া চরণ ;
ধীরে ধীরে বায়ু আসি,
দুলায়ে[৪২] অলকা রাশি
কবরী[৪৩]-কুসুম-গন্ধ করিছে হরণ ॥

(৫)

বিজনে খুলিয়া প্রাণ,
নিখাদে চড়ায়ে[৪৪] তান,
শোভনা প্রকৃতি দেবী গান ধীরে ধীরে।
নলিন[৪৫]নয়ন দ্বয়,
প্রশান্ত বিষাদ ময়,
ঘন ঘন[৪৬] দীর্ঘশ্বাস বহিল গভীরে ॥

(৬)

"অভাগী ভারত ! হায়, জানিতাম যদি,
বিধবা হইবি শেষে
তাহলে কি এত ক্লেশে,
তোর তরে অলঙ্কার করি নিরমান ?
তা হ'লে কি পূতধারা মন্দাকিনী নদী
তোর উপত্যকা পরে হ'তো বহমান[৪৭] ?
তাহ'লে কি হিমালয়,
গর্ব্বে ভরা হিমালয়
দাঁড়াইয়া[৪৮] তোর পাশে
পৃথিবীরে উপহাসে,
তুষার-মুকুট শিরে করি পরিধান।

(৭)

তাহ'লে কি শতদলে,
তোর সরোবর-জলে,
হাসিত অমন শোভা করিয়া বিকাশ ?

---

৪১ গঙ্গার প্রবাহ ৪২ দুলায়ো ৪৩ কবরি ৪৪ সপ্তমে চড়ায়ো ৪৫ নলিনী ৪৬ মাঝে মাঝে।

৪৭ 'তা হ'লে কি···হ'তো বহমান ?'— তত্ত্ববোধিনীর পাঠে এই দুই লাইন বর্জিত।

৪৮ দাঁড়াইয়া

কাননে কুসুম রাশি,
বিকাশি মধুর হাসি,
প্রদান করিত কিলো অমন সুবাস ?

(৮)

তাহলে ভারত ! তোরে,
সৃজিতাম মরু ক'রে[৪৯]
তরুলতা-জন-শূন্য প্রান্তর ভীষণ ;
প্রজ্জ্বলন্ত দিবাকর,
বর্ষিত জ্বলন্ত কর,
মরীচিকা পান্থদের[৫০] করিত ছলন !"
থামিল প্রকৃতি করি অশ্রু বরিষণ ॥

(৯)

গলিল তুষার মালা,
তরুণী সরসী বালা,
ফেলিল নীহার-নীর[৫১] সরসীর[৫২] জলে
কাঁপিল পাদ-পদল[৫৩] ;
উথলে গঙ্গার জল,
তরু-স্কন্ধ ছাড়ি লতা লুঠিল[৫৪] ভূতলে ॥

(১০)

ঈষৎ আঁধার রাশি,
গোমুখী-শিখর গ্রাসি,
আটক করিয়া দিল[৫৫] অরুণের কর।
মেঘরাশি উপজিয়া,
আঁধারে প্রশ্রয় দিয়া,
ঢাকিয়া ফেলিল ক্রমে পর্বত-শিখর ॥

(১১)

আবার ধরিয়া ধীরে সুমধুর তান।
প্রকৃতি বিষাদে দুঃখে আরম্ভিল গান[৫৬] ॥
কাঁদ্ ! কাঁদ্ ! আরো কাঁদ্ অভাগী ভারত

---

৪৯ করে্য

৫০ পান্থগণে ৫১ বিন্দু ৫২ নির্ঝরিণী ৫৩ পাদপ-দল ৫৪ লুটায় ৫৫ করিল নব ৫৬ "আবার ধরিয়া···গান।"—এই লাইনের পরিবর্তে তত্ত্বোধিনীর পাঠে আছে, "আবার গাইল ধীরে প্রকৃতি-সুন্দরী।—"

হায় ! দুঃখ[৫৭]-নিশা তোর,
হলোনা হলোনা[৫৮] ভোর,
হাসিবার দিন তোর হলোনা[৫৯] আগত ?

(১২)

লজ্জাহীনা ! কেন আর,
ফেলে[৬০] দেনা অলঙ্কার,
প্রশান্ত গভীর ওই[৬১] সাগরের তলে ?
পূতধারা মন্দাকিনী,
ছাড়িয়া মরত ভূমি,
আবদ্ধ হউক পুনঃ[৬২] ব্রহ্ম-কমণ্ডলে ॥

(১৩)

উচ্চশির হিমালয়,
প্রলয়ে পাউক লয়,
চিরকাল দেখেছে যে ভারতের গতি।[৬৩]
কাঁদ তুই তার পরে,
অসহ্য বিষাদ ভরে,
অতীত কালের চিত্র দেখাউক স্মৃতি ॥

(১৪)

দেখ্‌, আর্য সিংহাসনে,
স্বাধীন নৃপতিগণে,[৬৪]
স্মৃতির আলেখ্য-পটে রহেছে[৬৫] চিত্রিত ![৬৬]
দেখ্‌ দেখি তপোবনে,
ঋষিরা স্বাধীন মনে,
কেমন ঈশ্বর ধ্যানে রহেছে[৬৭] ব্যাপৃত ॥

---

৫৭ দুখ ৫৮ হ'ল না হ'ল না ৫৯ হ'ল না ৬০ ফেল্যে ৬১ অই ৬২ পুন

৬৩ তুলনীয়— কহ হে নগেন্দ্র !...
এত দেখে এত সয়ে— এ কি চমৎকার,
সরমে আনত মুখ হ'ল না তোমার।
এই যে ভারত ভুমি—বৈজয়ন্ত ধাম,
আজন্ম তোমার পদে রয়েছে শয়নে। —অক্ষয় চৌধুরী -কৃত 'উদাসিনী' (১৮৭৪), অষ্টম সর্গ

৬৪ তুলনীয়— রাজা যুধিষ্ঠির (দেখেছি নয়নে)
স্বাধীন নৃপতি আর্য্য সিংহাসনে। —হিন্দুমেলায় উপহার

৬৫ রয়্যেছে

৬৬ তুলনীয়— সে দিনের কথা জাগি স্মৃতি পটে
ভাসে না নয়ন বিষাদ জলে ? —হিন্দুমেলায় উপহার

৬৭ রয়্যেছে

(১৫)

কেমন স্বাধীন মনে,
গাহিছে[৬৮] বিহঙ্গগণে,
স্বাধীন শোভায় শোভে প্রসূন[৬৯] নিকর।
সূর্য উঠি প্রাতঃকালে,
তাড়ায় আঁধার জালে,
কেমন স্বাধীনভাবে বিস্তারিয়া কর!

(১৬)

তখন কি মনে পড়ে—
ভারতী-মানস-সরে,
কেমন মধুর স্বরে বীণা ঝঙ্কারিত!
শুনিয়ে[৭০] ভারত-পাখী
গাহিত[৭১] শাখায় থাকি
আকাশ পাতাল পৃথ্বী করিয়া মোহিত?

(১৭)

সে সব স্মরণ ক'রে[৭২] কাঁদলো[৭৩] আবার॥
"আয়রে প্রলয় ঝড়
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ কর
ধূর্জ্জটি! সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার!
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল হোক্ একাকার॥[৭৪]

(১৮)

প্রভঞ্জন ভীম-বল!
খুলে দাও,[৭৫] বায়ু দল![৭৬]
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে[৭৭] যা'ক ভারতের বেশ।

---

৬৮ গাইছে ৬৯ কুসুম ৭০ শুনিয়া ৭১ গাইত ৭২ কর্য়ো ৭৩ কাঁদ্‌লো ৭৪ "স্বর্গমর্ত্ত্য· ·একাকার॥" তত্ত্ববোধিনীর পাঠে এই লাইনটি বর্জিত।

৭৫ খুল্যে দেও

৭৬ "প্রভঞ্জন· ·বায়ুদল!" এই দুই লাইনের সঙ্গে তুলনীয়—

তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্জনে
কহিলা, "প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি; শীঘ্র দেহ ছাড়ি
কারারুদ্ধ বায়ুদলে· ·"। —মেঘনাদবধ, দ্বিতীয় সর্গ, পঙ্‌ক্তি ৫৫০-৫৩

৭৭ মধুসূদনের 'প্রলয়-ঝড়' কথাটির ব্যবহারও (১৭-সংখ্যক স্তবক) লক্ষণীয়।

ভারত সাগর রুষি
উগর বালুকা রাশি
মরুভূমি হয়ে[৭৮] যাক সমস্ত প্রদেশ ॥

(১৯)

বলিতে নারিল আর প্রকৃতি-সুন্দরী।
ধ্বনিয়া আকাশ ভূমি,
গরজিল প্রতিধ্বনি,
কাঁপিয়া উঠিল বেগে ক্ষুব্ধ হিমগিরি ॥

(২০)

জাহ্নবী উন্মত্ত পারা,
নির্ঝর চঞ্চল ধারা,
বহিল প্রচণ্ড-বেগে ভেদিয়া প্রস্তর।
মানস সরস-পরে,[৭৯]
পদ্ম কাঁপে থর থরে
ঢুলিল[৮০] প্রকৃতি সতী আসন উপর।

(২১)

সুচঞ্চল সমীরণে,
উড়াইল মেঘগণে,
সুতীব্র রবির ছটা হলো[৮১] বিকীরিত
আবার প্রকৃতি সতী আরম্ভিল গীত ॥

(২২)

'দেখিয়াছি তোর আমি সেই এক বেশ,
অজ্ঞাত আছিল[৮২] যবে মানব নয়নে।
নিবিড় অরণ্য ছিল এ বিস্তৃত দেশ,
বিজন ছায়ায় নিদ্রা যে'ত পশু-গণে,
কুমারী অবস্থা তোর সে কি পড়ে মনে?
সম্পদ বিপদ সুখ,
হরষ বিষাদ দুখ,
কিছুই না জানিতিস্ সে কি পড়ে মনে?
সে এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ,

---

৭৮ হয়ো ৭৯ প্রবল তরঙ্গ ভরে ৮০ টলিল
৮১ হ'ল ৮২ আছিলি

যখন মানব গণ,
করে নাই নিরীক্ষণ,
তোর সেই সুদুর্গম অরণ্য প্রদেশ ॥
না বিতরি গন্ধ হায়,
মানবের নাশিকায়
বিজনে অরণ্য-ফুল, যাইত শুকায়ে
তপন-কিরণ তপ্ত, মধ্যাহ্নের বায়ে।
সে এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ ॥

(২৩)

সেইরূপ রহিল[৮৩] না কেন চিরকাল!
না দেখি মনুষ্য-মুখ
না জানিয়া দুঃখ সুখ
না করিয়া অনুভব মান অপমান।
অজ্ঞান শিশুর মত,
আনন্দে দিবস যে'ত,
সংসারের গোলমালে থাকিয়া অজ্ঞান ॥
তা'হলে ত ঘটিত না এসব জঞ্জাল!
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল?
সৌভাগ্যে হানিল[৮৪] বাজ
তা' হলে ত তোরে আজ
অনাথা ভিখারীবেশে কাঁদিতে হ'ত না?
পদাঘাতে উপহাসে,
তা হ'লে ত কারাবাসে
সহিতে হ'ত না শেষে এ ঘোর যাতনা ॥

(২৪)

অরণ্যেতে নিরিবিলি,
সে যে তুই ভাল ছিলি,
কি-কুক্ষণে করিলি রে সুখের কামনা!
দেখি মরীচিকা হায়!
আনন্দে বিহ্বল প্রায়!
না জানি নৈরাশ্য শেষে করিবে তাড়না ॥

৮৩ রহিলি ৮৪ হানিয়া

(২৫)

আইল হিন্দুরা[৮৫] শেষে,
তোর এ বিজন দেশে
নগরেতে পরিণত হ'ল তোর বন।
হরিষে[৮৬] প্রফুল্ল মুখে,
হাসিলি সরলা! সুখে,
আশার দর্পণে মুখ দেখিলি আপন ॥

(২৬)

ঋষিগণ সমস্বরে
অই সামগান করে
চমকি উঠিছে আহা! হিমালয় গিরি।
ও দিকে ধনুর ধ্বনি,[৮৭]
কাঁপায় অরণ্যভূমি
নিদ্রাগত মৃগগণে চমকিত করি ॥
সরস্বতী-নদী-কূলে,
কবিরা হৃদয় খুলে
গাইছে হরষে আহা সুমধুর গীত।[৮৮]
বীণাপাণি কুতূহলে,
মানসের শতদলে
গাহেন সরসী বারি করি উথলিত ॥

(২৭)

সেই এক অভিনব
মধুর সৌন্দর্য তব,
আজিও অঙ্কিত তাহা রয়েছে[৮৯] মানসে।

৮৫ আর্য্যরা আইল ৮৬ হরষে

৮৭ তুলনীয়— তুমি শুনিয়াছ, হে গিরি অমর,
অর্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর।
—হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতা (১৮৭৭)

৮৮ তুলনীয়— (১) তুমি শুনিয়াছ সরস্বতী-কূলে
আর্য্য কবি গায় মন প্রাণ খুলে।
—হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতা (১৮৭৭)

(২) অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য। —ব্রাহ্মণ (১৮৯৫), চিত্রা

৮৯ রয়েছে

আঁধার সাগর তলে
একটী[২০] রতন জ্বলে
একটি নক্ষত্র শোভে মেঘান্ধ আকাশে।
সুবিস্তৃত অন্ধকূপে,
একটি প্রদীপ-রূপে
জ্বলিতিস্ তুই আহা, নাহি পড়ে মনে ?
কে নিভা'লে সেই ভাতি
ভারতে আঁধার রাতি
হাতড়ি বেড়ায় আজি সেই হিন্দুগণে।
এই অমানিশা তোর,
আরকি হবেনা ভোর
কাঁদিবি কি চিরকাল ঘোর অন্ধকূপে।
অনন্ত কালের মত,
সুখ-সূর্য অস্তগত,
ভাগ্য কি অনন্ত কাল র'বে এই রূপে ॥
তোর ভাগ্যচক্র শেষে,
থামিল কি হেতা এসে,
বিধাতার[২১] নিয়মের করি ব্যভিচার [?]

আয় রে প্রলয় ঝড়,
গিরি শৃঙ্গ চূর্ণ কর,
ধূর্জটি ! সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার ॥
প্রভঞ্জন ভীমবল,
খুল্যে দেও বায়ু-দল,
ছিন্ন ভিন্ন কর্য়ে দি'ক্ ভারতের বেশ।
ভারত সাগর রুষি,
উগর বালুকা-রাশি
মরুভূমি হয়্যে যাক্ সমস্ত প্রদেশ ॥

ক্রমশঃ।

॥ প্রতিবিম্ব (১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা), ১২৮২ বৈশাখ, পৃ ১৩-১৭ ॥

প্রতিবিম্ব ও তত্ত্ববোধিনীর পাঠে যে-সব ভাষাগত প্রভেদ লক্ষিত হয়, পাদটীকায় প্রধানতঃ সেগুলিই দেখানো হল। হাইফেন, কমা প্রভৃতি চিহ্নগত বা অন্যবিধ যে-সমস্ত খুঁটিনাটি প্রভেদ দেখা যায়, অনাবশ্যক-

---

২০ একটি

২১ 'ভারতভাগ্যবিধাতা'র প্রথম আভাস পাওয়া যায় এই তিন লাইনে

বোধে পাদটীকায় সেগুলি ধরা হয় নি। তবে ও-সব খুঁটিনাটি বিষয়েও উপরে-মুদ্রিত পাঠটি যাতে যথাসম্ভব প্রতিবিম্বের পাঠের অনুরূপ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রতিবিম্বে মুদ্রিত কৃ-বর্ণটি অসমীয়ার অনুরূপ অর্থাৎ বিন্দুহীন ও পেটকাটা। উকার-হীন র কিন্তু বাংলার মতোই। এ স্থলে এই পার্থক্যও দেখানো হয় নি।

স্বীকৃতি

বহরমপুরে ডক্টর রামদাস সেনের (১৮৪৫ - ৮৭) বিখ্যাত গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় এই কবিতাটি পাওয়া গিয়েছে। এই গ্রন্থাগারের প্রায় সমস্ত বই জাতীয় গ্রন্থাগারে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রতিবিম্বের দুই সংখ্যা (১২৮২ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ) এখনও তাঁর পৌত্র শ্রীঅনুত্তম সেন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত আছে। আমার অনুরোধে তিনি আমাকে কবিতাটির প্রতিলিপি পাঠান। অতঃপর আমার প্রশ্নের উত্তরে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতা ও প্রতিবিম্ব পত্রিকা সম্বন্ধে আরও কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি আমাকে লিখে পাঠান। অবশেষে অনুত্তমবাবুর সাদর আহ্বানে বহরমপুরে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে প্রতিবিম্বে প্রকাশিত 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার পাঠ নিজে মিলিয়ে দেখেছি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ও সংগ্রহ করেছি।

'প্রকৃতির খেদ' কবিতার যে প্রতিলিপি অনুত্তমবাবু আমাকে পাঠিয়েছেন, তা তাঁর পত্নী শ্রীমতী বিভা সেনের কৃত। মূলের সঙ্গে প্রতিলিপির পাঠ মেলাতে গিয়ে বিস্মিত হয়েছি। 'যদ্‌দৃষ্টং তল্লিখিতম্' নীতি অনুসারে মুদ্রণঘটিত অতি তুচ্ছ ত্রুটিবিচ্যুতিসহ প্রতিবিম্ব পত্রিকার কয়েকটি পৃষ্ঠার নিখুঁত প্রতিলিপি রচনায় তিনি যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যই প্রশংসনীয়।

শ্রীমতী বিভা সেন কৃত প্রতিলিপি ও শ্রীযুক্ত অনুত্তম সেনের পত্রগুলি বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত হল। তাঁদের উভয়কেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁদের সহৃদয় আনুকূল্যেই এই প্রবন্ধরচনা ও কবিতাটির পুনঃপ্রকাশ সম্ভব হল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৪

বাঙ্কক, ১১ অক্টোবর ১৯২৭, মঙ্গলবার।

আজ সকালে প্রাতরাশ সেরে কবির সঙ্গে বাঙ্ককের প্রত্নবস্তু-সংগ্রহ— মিউজিয়ম— দেখতে গেলুম। প্রাচীন রাজপ্রাসাদগুলির হাতার মধ্যে, একটী সাবেক চালের শ্যামী বাস্তুরীতি অনুসারে গঠিত প্রাসাদে এই মিউজিয়ম বাড়ীটী স্থাপিত। প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের সামনে এক প্রশস্ত অলিন্দ বা বারান্দায় একটী সুদৃশ্য ব্রঞ্জে ঢালা মানবাকার রামচন্দ্রের মূর্তি, হাতে ধনুক নিয়ে বীরদর্পে দাঁড়িয়ে। আধুনিক শ্যামী কাজ। এই মিউজিয়মটী গড়ে তুলেছেন বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত, সংস্কৃত ও অন্য ভারতীয় ভাষায়, আর তা ছাড়া শ্যামী, মোন্, খমের প্রভৃতি ইন্দোচীন দেশের নানা ভাষায়, ও স্থানীয় ইতিহাস শিল্প সাহিত্য প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অদ্বিতীয় পণ্ডিত Dr. Coedès সেদেস্। এঁর সঙ্গে আলাপ হল। মিউজিয়মের দুটী জিনিসের সংগ্রহ লক্ষণীয়— এক, প্রাচীন শ্যামী বৌদ্ধ আর ব্রাহ্মণ্য কাংস্য-মূর্তি— ব্রঞ্জে-ঢালা বুদ্ধদেব আর নানা দেবতার মূর্তি। বিগত ৫।৬ শ' বছরের মধ্যে এই-সব মূর্তি তৈরী হ'য়েছে। শিল্পকার্যে অতুলনীয়— একটা এমন সরল সুন্দর গম্ভীর ভাবের দ্যোতনা এই-সব বুদ্ধমূর্তি, আর শিব, উমা, বিষ্ণু শ্রী এঁদের মূর্তিগুলি প্রকাশ করছে যে তার বর্ণনা করা কঠিন। আমি তো দুটী শিব আর পার্বতীর মূর্তি আর বিষ্ণুমূর্তি দেখে অদ্ভুত আনন্দের অধিকারী হবার সৌভাগ্য পেলুম। মূর্তিগুলি ঋজুভাবে দণ্ডায়মান, দেহে অলংকারের প্রাচুর্য্য নেই, অতি সংক্ষিপ্ত অলংকরণ, মহীশূরের হোয়সালা শিল্পের মত চোখ আর মনকে পীড়া দেয় না। দেবতাদের মুখের ভাবও অদ্ভুত সৌন্দর্য্য শান্তি শ্রীতে ভরপুর। শিবের মূর্তি দুরকম— এক শ্মশ্রুমান্, অন্য তরুণকান্তি। আমি এই মূর্তিগুলির ফোটোগ্রাফ পোষ্টকার্ড সংগ্রহ করতে পেরেছিলুম, পরে ভালো ছবিও যোগাড় করতে পারি। অনেকগুলি প্রাচীন প্রস্তরলিপি আর তাম্রপট্টও আছে। এই সংগ্রহের অন্যতম প্রধান ঐশ্বর্য্য— শ্যামী ভাষায় লেখা সর্বপ্রাচীন শিলালেখ। সুখোযাই বা সুখোদয় রাজ্যে থাই জাতির প্রথম নামী রাজা ইন্দ্রাদিত্য থাই জাতিকে খমেরদের অধীন থেকে মুক্ত করেন। ইন্দ্রাদিত্যের দ্বিতীয় পুত্র রাজা রাম গম্‌হেঙ্ (বা খম্‌হেঙ্) খৃষ্টীয় তেরোর শতকের চতুর্থ পাদে প্রকট হন। ইনি অদ্ভুতকর্মা ব্যক্তি ছিলেন, নানামুখী ছিল এঁর প্রতিভা আর কৃতকারিতা। যুদ্ধে অল্পবয়সেই বিশেষ সাহস শৌর্য্য ও পরিচালন-শক্তির পরিচয় দেন। পিতৃলব্ধ রাজ্যের পরিসর আরও বাড়াতে সমর্থ হন, এঁর অধীনেই থাই জাতির অধিকার শ্যামদেশের অনেকটা জুড়ে প্রসারিত হয়। সুশাসক ছিলেন, প্রজার সুখের প্রতি অতন্দ্র দৃষ্টি এঁর ছিল। ইনি নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ ছিলেন। শ্যামী ভাষায় পূর্ণ লিপি ইনিই প্রবর্তিত করেন। নিজের ইতিহাস আর আশা আকাঙ্ক্ষার কথা নিয়ে ইনি একখানি বড় চৌকা প্রস্তরখণ্ডের চারিপৃষ্ঠে শ্যামী ভাষায় খৃষ্টীয় ১২৯২ সালে এক অনুশাসন খোদাই করান। এই লেখ পাঠ ক'রে রাজা রাম গম্‌হেঙের সবিশেষ পরিচয় আমরা পাই। এর প্রাচীন শ্যামী ভাষা এখন সাধারণ শ্যামী মানুষ প'ড়ে সবটা বুঝে উঠতে পারেন না— ভাষা অনেক বদলে' গিয়েছে এই ৬।৭ শ' বছরের মধ্যে। ফরাসী অধ্যাপক সেদেস্ ফরাসী ভাষায় এই

লেখটার অনুবাদ করে দিয়েছেন। তা থেকে এই রাজার মহত্ত্ব বুঝতে পারা যায়। প্রাচীন পারস্যের ইতিহাসে হখামনীষীয় বা Achæmenian সম্রাট্দের প্রাচীন পারসীক ভাষায় উৎকীর্ণ অনুশাসন; প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অশোক অনুশাসন; প্রাচীন তুর্কী জাতির ইতিহাসে খৃষ্টীয় ৭৪০ সালের দিক উৎকীর্ণ ওর্‌খোন (Orkhon) নদীর তীরে প্রাপ্ত শিলাফলক— তাতে তুর্কীরাজা ক্যুল্-তেগিন্ আর তাঁর ভাইয়ের শৌর্য্যের ইতিহাস লেখা আছে— এঁরা তুর্কী জাতির প্রাথমিক সাম্রাজ্যের আর গৌরবের পত্তন করেন; আর শ্যামদেশের এই রাজা রাম গম্‌হেঙের লিপি— এগুলি একই পর্য্যায়ের মূল্যবান্ দলিল, যার অন্তর্নিহিত মানবিক আর সাহিত্যিক মূল্যও অসামান্য।

প্রত্নমূর্তি প্রভৃতি ছাড়া, এই সংগ্রহে আর একটি লক্ষণীয় জিনিস হ'চ্ছে, কতকগুলি বই রাখবার প্রাচীন শ্যামী আলমারী— সমস্ত আলমারীর কাঠের উপরে সোনালী গালার কাজ করা, তার উপরে কালো কালিতে ছবি আঁকা আর নক্‌শা কাটা। ছবিগুলি প্রাচীন শ্যামী ঢঙে আঁকা, বুদ্ধদেব, রামায়ণ আর হিন্দুপুরাণের পাত্রপাত্রীদের ছবি; নক্‌শাগুলি নানারকম ফুলের, লতাপাতা বেল-বুটীর, ধানের শীষের, আর আগুনের হল্‌কার। শিল্পজগতে একটা বিশিষ্ট জিনিস। এই কালো আর সোনার সমাবেশে উজ্জ্বল নক্‌শাদার এই আলমারীগুলি কবির বড়ই ভালো লেগেছিল। স্থরেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে, পরে কবির ইচ্ছা অনুসারে ব্যবস্থা হ'ল— কতকগুলি এইরকম আলমারী তাঁর জন্য সংগ্রহ ক'রে বিশ্বভারতীতে পাঠিয়ে দেন এঁরা— বিশ্বভারতীর কলাভবনে আর অন্যত্র এগুলি এখন রক্ষিত হয়ে আছে। 'বজিরঞাণ' (Vajiranana) বা 'বজ্রজ্ঞান' গ্রন্থাগারটি এই মিউজিয়মের লাগাও। এটার সংগঠনেও ডাক্তার সেদেস্ অনেক সাহায্য করেছেন। সেটারও পরিদর্শন কবি ক'রে এলেন।

কবি এর পরে হোটেলে ফিরে গেলেন। স্থরেনবাবু আর আমি গেলুম কতকগুলি বিভিন্ন ৱাৎ Wat বা বুদ্ধমন্দির ও বিহার দেখতে। প্রথমটায় Wat Mahathad মহাথাদ্ অর্থাৎ মহাধাতু মন্দির। এখানে একটা উচ্চশ্রেণীর বৌদ্ধমহাবিদ্যালয় আছে; প্রায় ২৫০ ছাত্র (শ্রামণের) এখানে পড়ে। বৌদ্ধ দর্শন ইতিহাস ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে পালিভাষারও অধ্যয়ন অধ্যাপনা হয়। এখানকার মহাথেরো— প্রধান অধ্যাপক ও ধর্মগুরু— তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। আমার পালির জ্ঞান খুবই কম, তবুও কষ্টেস্থষ্টে এঁর সঙ্গে পালিতেই সামান্য আলাপ হ'ল। এঁদের পালির উচ্চারণ দেখলুম খুবই ভালো; বর্মী ভিক্ষুদের মুখে পালির আর সংস্কৃতের যে অভাবনীয় বিকৃতি দেখা যায় সেরকমটা এঁদের মধ্যে একেবারেই নেই। "নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো-সম্মা-সম্বুদ্ধস্‌স"— বর্মী ফুঙ্গীদের মুখে হয়ে যায় "নামো টাথা বাগাও আদো আয়াহাদো থামা-থাম্বুডাথা"; "বুদ্ধ ধর্ম সংঘ" হয়ে যায় "বুডা, ডামা, থিঙ্গা," "সব্বঞ্‌ঞু (= সর্বজ্ঞ)" হয়ে যায় "থার্ট্‌পিনয়্যু," "শক্ররাজা"-র বর্মীরূপ "থাজ্যা-মিন্,"— এরকম মোটেই হয় না। নীল ফানুস আর সাদা গলা-আঁটা কোটপরা একটা শ্যামীযুবকের সঙ্গে পালিতেই কথা হ'ল। এর পালির জ্ঞানও খুব ভালো দেখলুম। শ্যামীরা আধুনিক হ'লেও প্রাচীন বিদ্যাকে বর্জন করে নি।

তার পরে Wat Jetuban ৱাৎ জেতুবন— প্রাচীন ভারতের শ্রাবস্তীর 'জেতবন'-এর নাম অনুসারে। এই ৱাৎটা একটু ভগ্নদশায় প'ড়ে আছে। এখানে একটা বিশাল শয়ান বুদ্ধমূর্তি আছে— ইট চূন স্থরখীর তৈরী, উপরে পঙ্খের কাজ। এই মন্দিরের হাতার মধ্যে নানা আঙিনা আর বাড়ী।

Wat Bovornivet "ৱাৎ বভরনিৱেৎ" অর্থাৎ "প্রবর নিবেশ" মন্দির এর পরে দেখে এলুম। এই

ব্লাতের কাছেই এক শ্যামী মণিহারী আর প্রাচীন জিনিসের দোকানে প্রত্নদ্রব্য কিছু দেখলুম। দোকানী বেশ যত্ন ক'রে অনেক কিছু দেখালে। সুরেনবাবু শান্তিনিকেতন কলাভবনের জন্য দুই-একটী মূর্তি নিলেন। দোকানীর নিজের অসাবধানতায় তার হাতেই এক প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগুরুর প্রতিকৃতি মূর্তি, মোমে তৈরী, ভেঙে গেল।

শ্রীরাজধর্ম নির্দেশ, বীর যাঁর ব্যক্তিগত নাম, আমাদের সব দেখাবার জন্য যিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁকে মনে হ'ল আমাদের মতন শিল্পপাগল বিদেশীর সঙ্গে ঘোরা একটু কষ্টকর হচ্ছিল।

হোটেলে ফিরে এসে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিলুম। বিশ্রামের জন্য সময় কোথায়? সুরেনবাবু আর আমি বা'র হলুম— ব্যাঙ্কে যেতে হ'ল, তার পরে চীনা শিল্প-দ্রব্য-ভাণ্ডারে ঘোরা। সিংহলী ডাক্তার ক্রিশ্চান-এর ইংলিশ ফারমাসি নামে ডাক্তারখানায়, সৈয়দ মোহম্মদ আলীকে তুলে নিলুম। ইনি আমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবেন।

সৈয়দ আলী বাঙালীর ছেলে, মুর্শিদাবাদে বাড়ী। লুয়াঙ্ ওয়াহেদ আলীর আত্মীয়। ইনি ভাগ্যের সন্ধানে শ্যামে এসে কয় বছর ধ'রে আছেন। সাহিত্যিক প্রকৃতির মানুষ। অন্য কাজকর্মের চেষ্টায় ছিলেন, তেমন সুবিধা ক'রতে পারেন নি। কিন্তু শ্যামী ভাষাটা বেশ ভালো ক'রে শিখে নিয়েছেন। এখন একটী নোতুন পথ বা'র ক'রে অর্থোপার্জন ক'রছেন— বাঙলা উপন্যাস সাহিত্যের শ্যামী অনুবাদ। এই কাজে নেমে অল্প সময়ের মধ্যে, সামান্য চাকরীর উপরে, পসার-প্রতিপত্তিও ক'রে নিয়েছেন, অর্থলাভও কিঞ্চিৎ হ'চ্ছে। এঁকে শ্যামীদের মধ্যে প্রতিপত্তির জন্য একটী শ্যামী নামও নিতে হয়েছে— সৈয়দ আলীর শ্যামী নাম হ'চ্ছে 'মহাচরিদবং আরি' Mahacharidavong Ari— "সৈয়দ" অর্থাৎ নবী মোহম্মদের বংশে উৎপন্ন— সেটী শ্যামীতে হ'ল "মহাচরিত" অর্থাৎ 'পুণ্যচরিত' মোহম্মদের বংশধর— পালি Mahacarita-vansa শ্যামীতে হ'য়ে যায় Mahacarida-Vong। আমাদের শ্যামে অবস্থানকালে এই ভদ্রলোক নানাভাবে আমাদের সহায়তা ক'রেছিলেন।

বিকাল চারটের আগেই ফিরে এলুম। পরে কবির সঙ্গে চান্তাবুন্ (? শান্তপুরী) নগরের রাজকুমারের বাড়ী গেলুম। কবির সঙ্গে আলাপে বিশেষ সম্মানিত ও আনন্দিত। শ্যামদেশে একটা নিয়ম দাঁড়াচ্ছে, প্রত্যেক রাজার অভিষেকের পরে সমগ্র পালি ত্রিপিটক গ্রন্থের শ্যামী অক্ষরে একটী ক'রে সংস্করণ ছাপানো হয়, আর সেটী স্বদেশ আর বিদেশের পণ্ডিতদের মধ্যে বিতরিত হয়। এবার রাজা প্রজাধিপকের অভিষেকের সময়ে যে ত্রিপিটক ছাপানো হ'য়েছে, তাঁর একটী সম্পূর্ণ গ্রন্থমালা কবির আগ্রহে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের জন্য পাঠাবেন অঙ্গীকার ক'রলেন। আর তা ছাড়া, কবিকে অনুরোধ করলেন, ভারতে আর ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে কোন্ কোন্ বৌদ্ধধর্মানুরাগী পণ্ডিত আর সংস্থার কাছে এই ত্রিপিটক পাঠানো উচিত, তাঁদের নাম যেন তিনি সংগ্রহ ক'রে পাঠিয়ে দেন।

হোটেলে ফিরে এসে, ৫-৩০ থেকে ৬-৩০ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত এক ভারতীয়দের সংবর্ধনা সভায় কবিকে থাকতে হ'ল। গুজরাটী বণিক শ্রীযুক্ত নানা, সেচবিভাগের বাঙালী কর্মচারী যিনি শ্যামী রাষ্ট্রিকতা গ্রহণ করেছেন শ্রীলুআং ওয়াহেদ আলী, আর অন্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এসেছিলেন। অনেক শিখ আর গুরুদ্বারার প্রতিনিধি, ভোজপুরিয়া সাধারণ লোক দরওয়ান প্রভৃতি, আর কিছু শ্যামী আর ইউরোপীয় লোকও ছিলেন।

শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ আলীর বাড়ী মুর্শিদাবাদ জেলায়। সামান্য আমিনের কাজ নিয়ে তিনি শ্যামদেশে যান,

সেখানকার Irrigation Department বা সেচ-বিভাগে চাকরী পান। পরে নিজের গুণে আর চেষ্টায় কাজে খুব উন্নতি করেন, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। শ্যামী জাতীয়তা গ্রহণ ক'রে শ্যাম দেশের প্রজা বা নাগরিক হ'য়ে গিয়েছেন, রাজকীয় খেতাব Luang 'লুআঙ' পেয়েছেন। এখন এঁর অধিকার বা চাকরীর নাম ধরে এঁর নাম হচ্ছে Phra Warisimajhaks "বরঃ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা শ্রীযুক্ত বারিসীমাধ্যক্ষ"। দেশে বাঙালী পত্নী আর সংসারও আছে, দেশের সঙ্গে সংযোগ একেবারে কেটে ফেলেন নি। এদেশেও শুনলুম আরও তিনটী সংসার করেছেন। এঁর এক শ্যামী স্ত্রীর পুত্র শ্রীমান সাদির আলীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। প্রিয়দর্শন যুবক, কলকাতায় গিয়ে, Y. M. C. A. বাঙালী হোস্টেলে থেকে, দন্ত-চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষালাভ ক'রে আসেন। ইনি আমায় বললেন, এঁর নিজের দেশ দুটী, শ্যাম, আর বাঙলা। কলকাতায় গিয়ে বাঙলা ভালো ক'রে শিখেছেন। শ্রীওয়াহেদ আলীকে আমাদের বেশ ভালো লাগ্‌ল। কবিরও এঁকে বেশ লেগেছিল। দিলখোলা hearty sort of a man। এদেশে বিয়ে ক'রেছেন, তার জন্য লজ্জার কিছু নেই। একটী বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে এঁর চরিত্র আর আদর্শগত বিরোধ আমাদের চোখে বিশেষ ক'রে লেগেছিল। হিন্দু ভদ্রলোকটীও ঐদেশে 'থিতু' অর্থাৎ স্থায়ী বাসিন্দা হ'য়ে যান। আর একটী শ্যামী মহিলাকে বিবাহ করেন— পুত্রকন্যাও হ'য়েছে। কিন্তু এই কথা ওয়াহেদ আলী ফুর্তি ক'রে কবির কাছে জানানোতে ইনি যেন লজ্জায় ম্রিয়মাণ হ'য়ে গেলেন। কবি তাঁকে বললেন, বেশ তো, এদেশে বিয়ে করেছ, আগেকার কালে ভারতীয় ঋষিরাও এসে এদেশে বিয়ে করে ঘর-সংসারী হয়েছিলেন, যেমন, কম্বু, যেমন কৌণ্ডিল্য, এতো ভালো কথা। সুবিধা ক'রে তোমার ছেলে-মেয়েদের শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দাও, আমরা দেখব, যাতে তারা ভারত আর শ্যামের মধ্যে একটী সংযোগ-সূত্র হতে পারে, আর ভারতের আদর্শ নিয়ে আস্‌তে পারে।

সন্ধ্যার পরে, এখানকার বিদেশ-রাষ্ট্র-মন্ত্রী রাজকুমার ত্রৈদশের বাড়ীতে কবির আর আমাদের নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। এখানে কতকগুলি শ্যামী সজ্জন ছাড়া উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত মানা, মিষ্টার Ardton আর্টন ব'লে একটী ইংরেজ ভদ্রলোক এখানেই বাস ক'রছেন, আগে শ্যাম জাতীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন, আর Sir Edward Cook স্যার এডওয়ার্ড কুক, শ্যাম দেশের সরকারের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা।

রাত্রি সাড়ে দশটার পরে আমরা হোটেলে ফিরে এলুম। ইতিমধ্যে কবি সিয়ামের উপরে একটী কবিতা লিখেছিলেন[১] সেটী আমাদের শোনালেন। পরে এই কবিতার ইংরেজী অনুবাদ যা কবি নিজে ক'রেছিলেন সেটী এখানেই ছাপিয়ে শ্যামের রাজদরবারে অন্য বিদেশী সমঝদারদের মহলে বিতরিত হয়।

---

১ সিয়াম, জাভা-যাত্রীর পত্র, পৃ ১২৬

রবীন্দ্রকাব্যে ইন্দ্রিয়চেতনার মিশ্রণ ও রূপান্তর

অশোকবিজয় রাহা

রবীন্দ্রকাব্যে ইন্দ্রিয়চেতনা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পাঞ্চভৌতিক জগৎ সম্বন্ধে অন্যত্র[১] আলোচনা করেছি। এইবার ইন্দ্রিচেতনার এলেকাতেই আরো সূক্ষ্ম একটি জগতের সঙ্গে পরিচয় করা যাক। এর সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের আটপৌরে জীবনের চিরাভ্যস্ত বস্তুপরিবেশের সব জায়গায় হুবহু মিল না-হলেও মানবমনের সূক্ষ্ম অনুভূতির কাছে সে-জগৎ আরো সত্য, আরো বিচিত্র হয়ে দেখা দেয়। বক্তব্যটি সংক্ষেপে বিশদ করছি :

আমাদের পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় তাদের বিশিষ্ট চেতনাকে শেষ পর্যন্ত আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় মনের দরবারে পৌঁছে দেয়, এবং সেখানে সেগুলি আমাদের চিত্তগত সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানস-উপাদানে রূপান্তরিত হয়। তাই দৃষ্টি, শ্রুতি, স্পর্শ, ঘ্রাণ ও স্বাদ— এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়চেতনা প্রাথমিক অবস্থায় তাদের নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা নিয়ে এলেও, এরা মানস-উপাদানে রূপান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এদের মধ্যে নানারকম মেলামেশা চলতে থাকে। আবার একটু পরেই এরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকে স'রে গিয়ে স্মৃতির ঈষৎ অস্পষ্টতায় মিশে একটি পেলব কমনীয়তা লাভ করে। এইখানে এদের প্রাথমিক লক্ষণগুলি সূক্ষ্মভাবে আরো খানিকটা বদলে যায়, এবং ততক্ষণে আমাদের চিত্তগত 'মানস-সংস্কার' এদের সম্পূর্ণভাবে অধিকার ক'রে আপন রঙে রাঙিয়ে দেয়। ক্রমে এমন হয় যে, এদের কতকগুলি স্মৃতি অচেতন মনে চ'লে গিয়ে 'প্রমুষ্টতত্তাক স্মৃতি'র সঙ্গে জড়িয়ে চিত্তগত 'বাসনা'র অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, এবং ইন্দ্রিয়চেতনার পরবর্তী অভিজ্ঞতাগুলিকে সেখান থেকে তাদের মিশ্র-আস্বাদের সংযোগে নূতনভাবে স্বাদযুক্ত ক'রে তোলে। এদের সূক্ষ্ম রেশ বা আবেশের সঙ্গে মিশে গিয়ে নূতন ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি নিছক ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা না-হয়ে খানিকটা মানস-সৌরভে ভ'রে ওঠে। সেই সঙ্গে সাদৃশ্যসূত্রে প্রায়ই ছুটে আসে আরো-কতকগুলি প্রাসঙ্গিক অস্ফুট স্মৃতি বা ভাবকল্পনা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এর বর্ণনা করতে হলে বলতে হয় :

> তাই যা দেখিছ তারে ঘিরেছে নিবিড়
> যাহা দেখিছ না তারি ভিড়। —র ১২/৬৭

এবার এই অদৃশ্য মানস-উপাদানগুলির সঙ্গে মিশে প্রত্যেকটি নূতন অভিজ্ঞতাই নূতন ব্যঞ্জনায় অনুরঞ্জিত হয়ে ওঠে। এমনি ক'রেই প্রতিমুহূর্তের অভিজ্ঞতায় তিলে তিলে গ'ড়ে ওঠে—

> প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ। —র ৮/২৮

অবশ্য এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। একই জগৎ হাজার মনের অনুভূতিতে এই অর্থে হাজারখানা হতে কোনোই বাধা নেই, বরং না-হওয়াটাই আশ্চর্য। কেননা তা হলে বুঝতে হবে আমাদের মন

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রকাব্য থেকে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলির উল্লেখ-সংকেত এইরূপ—

র— রবীন্দ্র-রচনাবলী : বিশ্বভারতী সংস্করণ/খণ্ড/পৃষ্ঠা

গী— গীতবিতান : অখণ্ড সংস্করণ, ১৩৬৪/পৃষ্ঠা/গান-সংখ্যা

১. রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ : হিরণকুমার বসু বক্তৃতামালা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮

ফোটোগ্রাফের ক্যামেরা হয়ে গেছে। অবশ্য সব ক্যামেরারও যান্ত্রিক কলাকৌশল এক নয়, এবং তাদের চিত্রগ্রহণ শক্তিরও তারতম্য আছে। সকল মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রামও অবিকল একভাবে কাজ করে না। এর সঙ্গে প্রত্যেকের চিত্তগত বিশিষ্ট সংস্কারগুলি যুক্ত হলে ইন্দ্রিয়ানুভূতির বৈচিত্র্য আরো বহুগুণিত হওয়াই স্বাভাবিক। বাইরের জগৎ বস্তুগতভাবে যে-রূপ নিয়েই জেগে থাক, আমাদের চিত্তের ঐসব সংস্কার কিংবা 'বাসনা'র সঙ্গে মিশে তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি, আমাদের প্রতিদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও, প্রত্যেকের কাছে বিশিষ্ট আকারে আকারিত হতে থাকে। একটি অভিজ্ঞতার সঙ্গে আরো কয়েকটি অনুরূপ অভিজ্ঞতার স্মৃতি মনে ভিড় করে আসে। ঠিক এই কারণেই কাব্যে ইন্দ্রিয়চেতনার রসরূপায়ণিক প্রক্রিয়ায় সাদৃশ্যমূলক অলংকারগুলি কোন্ অলক্ষ্য পথে এসে জুড়ে গিয়ে কবির এক-একটি বিশেষ অনুভবকে তাঁর মানসরাগে রঞ্জিত ক'রে সম্পূর্ণ নূতনভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত করে। রবীন্দ্রনাথের মতো শ্রেষ্ঠ গীতিকবির রচনায় এ-ঘটনা যে সব সময় অতি বিচিত্রভাবেই ঘটছে, তা বলাই বাহুল্য। বেশি দূরে না-গিয়ে একটি অতি সামান্য দৃষ্টান্ত ধরা যাক :

ঘন সবুজ অবিচ্ছিন্ন বন পাহাড়ের ঢালু ও নীচের উপত্যকা ছেয়ে আছে। এই ছবিটিকে ধরতে গিয়ে কবি বলছেন—

> অরণ্য যেতেছে নেমে উপত্যকা বেয়ে
> নিশ্চল সবুজ বন্যা। —র ২৫/৮৪

কবির এই ছোটো একটি কথার আড়ালে আশ্চর্য সুন্দর একটি সাদৃশ্যের ইঙ্গিত উঁকি দিচ্ছে। এর পিছনে কবির মন কিভাবে কাজ করছে একটুখানি ভেবে দেখা যাক। গোড়াতেই দেখছি, কবির দৃষ্টি পাহাড়ের উপর থেকে বনের রেখা ধ'রে ঢালু বেয়ে উপত্যকার দিকে নেমে যাচ্ছে, এবং তাঁর দৃষ্টি চালনার এই বিশেষ গতিটিই প্রথম পঙ্ক্তিতে অরণ্যে আরোপিত হয়েছে। তাই স্বভাবতই কবির মনে হচ্ছে, 'অরণ্য যেতেছে নেমে উপত্যকা বেয়ে।'— এর থেকেই আবার বনের বর্ণনা করতে গিয়ে 'সবুজ বন্যা' কথাটি এল। বন্যার জলে ঢল নামে, এখানেও বনের সবুজে ঢল নেমেছে। রাশি রাশি ঘন সবুজ পাতার উচ্ছ্বাসে ভরা উপত্যকাবাহী বনটিকে দেখেই রূপসাদৃশ্য-হেতু কবির চিত্তে বন্যার মানসচিত্র জেগে উঠেছে। প্রবল উচ্ছ্বাস, প্রাচুর্য ও প্রবহমান নিম্নগতি এই কয়টি বিশেষ ভাবকল্পনা থেকেই এখানে 'সবুজ বন্যা' কথাটির জন্ম হয়েছে। অথচ, এদিকে কবির চোখের সামনে যে-বস্তুটি একেবারে স্থিরভাবে জেগে আছে সে শুধু ঐ নিবিড় বনের ঘন সবুজ রঙ। কবি তাকে যতই 'যেতেছে নেমে' বলুন, কিংবা 'বন্যা' বলুন, সে আসলে কিন্তু 'নিশ্চল'। এই একটুখানি বিরোধের ভাব এসে 'বন'কে 'বন্যা' ক'রে দিয়েও আবার 'বন্যা'কে 'বনে'র গায়েই মিলিয়ে রেখে গেল ; যার ফলে ঐ অবিচ্ছিন্ন স্থির বনের মধ্যে একটা প্রবল উচ্ছ্বাস ও দুর্বার গতিবেগ সব সময়ের জন্য বাঁধা প'ড়ে রইল। যতবারই পঙ্ক্তি দুটি পড়া যাবে ততবারই আমরা এটা অনুভব করব। কবি বাইরের ঐ দৃশ্যমান বনটাকে ঠিক যেভাবে অনুভব করেছেন তা পাঠককে অনুভব করাবার জন্য এই রসরূপায়ণিক প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ অনিবার্য ছিল। একে অলংকার নাম দিলেই কি, আর না-দিলেই কি, আসলে এটি শিল্পপ্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত প্রকাশব্যঞ্জনারই একটি বিশিষ্ট 'রূপ'। তা ছাড়া সব সময় মনে রাখতে হবে, অনুভবের এ-ধরনের সার্থক প্রকাশে কবিকে কখনই চিন্তাভাবনা করে আলাদাভাবে চেষ্টা করতে হয় না, কবির দিক থেকে তা একেবারে 'অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য'।

ঠিক এমনি ক'রেই বলতে পারি—

নুড়িগুলি
বনের ছায়ার মধ্যে অস্থিসার প্রেতের অঙ্গুলি
নির্দেশ করিছে তারে যাহা নিরর্থক,
নি ´রিণী সর্পিণীর দেহচ্যুত ত্বক্‌। —র ২৪/৮৬

এখানে কবির চোখের সামনে, অর্থাৎ নিছক দৃষ্টিচেতনায়, বনের ছায়ায় কতকগুলো খটখটে নুড়ি আর শুকিয়ে-যাওয়া ঝরনার আঁকাবাঁকা গতি[illegible]খের একটুখানি চিহ্ন ছাড়া আর কী আছে? অথচ কেবল এইটুকুতে এ-ছবি এত স্পষ্ট হত কি? কবি যা চোখে দেখছেন না, অথচ এই দৃশ্যটি চোখে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই যা তাঁর মনে জাগছে তাই তো তাঁর ছবিটিকে এমন জীবন্ত ক'রে তুলেছে। অর্থাৎ যা তিনি চোখে না-দেখে মনে দেখছেন, তাই তো তাঁর চোখের দেখাকে আরো সত্য ক'রে তুলেছে। 'অস্থিসার প্রেতের অঙ্গুলি' এই ছবিটি এখানে মূল দৃশ্যের ইঙ্গিতে ভেসে-ওঠা অনুরূপ একটি কল্পচিত্র মাত্র, এবং 'সর্পিণীর দেহচ্যুত ত্বক্‌'ও তাই। অথচ এখানে এ-দুটি কল্পচিত্রের অভিব্যঞ্জনায় কবি যেন আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিকেই আরো তীক্ষ্ণ, আরো জীবন্ত ক'রে তুলেছেন। চিরাভ্যস্ত চোখে আমরা যা কিছুতেই দেখতে পেতাম না, তাই অতি স্পষ্টভাবে দেখা গেল। এর ফলে ছবিটি আমাদের কাছে এক সম্পূর্ণ নূতন তাৎপর্য নিয়ে এল। কবির কাব্যে জীবন ও জগৎ এইভাবেই জন্মান্তর লাভ করে।

অবশ্য মনে রাখতে হবে, এখানে আমরা শুধু একই ইন্দ্রিয়চেতনার এলেকায় একাধিক সমধর্মী অনুভবের সাদৃশ্যের কথা বলছি। রূপের সঙ্গে রূপের— যেমন, 'মুখখানি তার/নতবৃন্ত পদ্মসম'[২] ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির —যেমন, 'ঝংকৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর'[৩], স্পর্শের সঙ্গে স্পর্শের— যেমন, 'ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো'[৪], ঘ্রাণের সঙ্গে ঘ্রাণের— যেমন, 'কমলগন্ধ কোমল দু-পায়'[৫], কিংবা স্বাদের সঙ্গে স্বাদের— যেমন, 'সুধা হতে সুধাময়/দুগ্ধ তার'[৬],— এ-রকম সাদৃশ্য বা সাদৃশ্যমূলক ব্যঞ্জনা কবির কাব্যে খুবই সাধারণ ঘটনা। তবে মহৎ কবির কব্যে এর উৎকর্ষও কম বিস্ময়কর নয়। ইতিপূর্বে উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত দুটিই মন্দ কী? বস্তুত রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'জ্বালি দিল অরণ্যবীথিকা/শ্যাম বহ্নিশিখা'[৭], কিংবা 'বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল/কালো শ্যেনপাখির মতো তোমার ঝড়'[৮], অথবা 'ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর/নৃত্য হোক তবে'[৯], কিংবা 'ঝঞ্ঝামদরসে-মত্ত তোমাদের পাখা/রাশিরাশি আনন্দের অট্টহাসে/বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে'[১০]— তখন কবির অভিনব সাদৃশ্যব্যঞ্জনা আমাদের সত্যই বিস্মিত করে। এই প্রসঙ্গে 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার প্রথম মহাকাব্যিক উপমাটির কথাও স্বভাবতই মনে আসে: 'মহানদ ব্রহ্মপুত্রে'র 'তরঙ্গের ডম্বরু'-নাদের সঙ্গে মহাকবি বাল্মীকির গাঢ়কণ্ঠে 'আবর্তিত' 'নবছন্দে'র সুগম্ভীর ধ্বনিতরঙ্গের তুলনা সত্যই অপূর্ব।[১১] তুলনার এ-রকম মহাকাব্যিক ঐশ্বর্য তাঁর বহু কবিতায়, এমন-কি গানেও ধরা পড়েছে: 'ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায়'[১২], কিংবা 'চেতনাসিন্ধুর ক্ষুব্ধ মৃদঙ্গের তরঙ্গগর্জনে'[১৩], কিংবা 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু'[১৪], কিংবা 'হোক জটানিঃসৃত

২. র ৭/১২৮; ৩. গী ৪৪৯/৫৫; ৪. র ২/৭৫; ৫. র ৩/১২৮; ৬. র ৪/১২৬; ৭. র ১৪/২২; ৮. র ২০/১৪; ৯. র ৭/১৮৫; ১০. র ১২/৫৮; ১১. র ৫/৯৩-৯৪। ১২. র ১৪/১৫; ১৩. র ১৫/১৬২; ১৪. গী ৪৬৬/১০৩;

অগ্নিভুজঙ্গম'[১৫]— এ-ধরনের বহু পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। বেশি দূরে যাবার দরকার নেই, 'উর্বশী'র মতো গীতিকবিতাতেও যখন দেখি—

তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি অবনত— —র ৪/৮২

কিংবা 'মৃত্যুঞ্জয়ে'র মতো একটি ছোটো কবিতাতেও যখন মৃত্যুশোক-জনিত আঘাতের সঙ্গে শেল ও বজ্রের আঘাতের তুলনা দিতে গিয়ে কবি বলেন—

দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘ-পানে,
সেথা হতে বজ্র টেনে আনে,— —র ১৫/২৪৮

তখন সত্যই অবাক লাগে। এ-রকম বলিষ্ঠ উপমার এমন আশ্চর্য, অব্যর্থ প্রয়োগ মহাকবির পক্ষেই সম্ভব। আমরা জানি, এ-ধরনের মহাকাব্যিক তুলনায় তাঁর হাত বহু আগে থেকেই এসে গিয়েছে। কড়ি ও কোমলের ত্রয়োদশ পঙ্‌ক্তির 'রাত্রি' কবিতাটিকে তো প্রায় আগাগোড়াই এ-রকম তুলনার একটি সুগ্রথিত মালা বলতে পারি। প্রথমেই দেখতে পাই :

জগতেরে জড়াইয়া শত পাকে যামিনী নাগিনী
আকাশ-পাতাল জুড়ি ছিল প'ড়ে নিদ্রায় মগনা। —র ২/৯২

সে তার হিম দেহে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে, এবং—

মিটিমিটি তারকায় জ্বলে তার অন্ধকার ফণা। —র ২/৯২

তারপর উষা এসে যেই মন্ত্র পড়ে 'ললিত রাগিনী' শোনাল, অমনি—

রাঙা আঁখি পাকালিয়া সাপিনী উঠিল তাই জাগি,
একে একে খুলে পাক, আঁকি বাঁকি কোথা যায় ভাগি। —র ২/৯২

এর পর এই বিরাট সর্পিণী কোথায় আত্মগোপন করতে যাচ্ছে তাই দেখানো হচ্ছে :

পশ্চিম সাগরতলে আছে বুঝি বিরাট গহ্বর
সেথায় ঘুমাবে ব'লে ডুবিতেছে বাসুকিভগিনী
মাথায় বহিয়া তার শত লক্ষ রতনের কণা। —র ২/৯৩

উদ্ধৃত আটটি পঙ্‌ক্তিই দৃষ্টিচেতনাময়। যেন এক অবাক্ চলচ্চিত্র। একটি বৃহৎ নাগিনী পাকে পাকে কুণ্ডলী খুলে মন্থরগতিতে এঁকে বেঁকে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু কেবল 'ভীষণ সুন্দর' নয়, 'স্নিগ্ধ সুন্দর'কেও রবীন্দ্রনাথ একই ভাবে তুলনার অপূর্ব ঐশ্বর্যমণ্ডিত ক'রে প্রকাশ করেছেন। চিত্রাঙ্গদার কয়েকটি বর্ণনা তো এই মুহূর্তেই চোখে ভাসছে :

উষার কনক মেঘ দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায় পূর্ব পর্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি

১৫. গী. ১০২/২৩৩

করি বিকশিত, তেমনি বসন তার
মিলাতে চাহিয়াছিল অঙ্গের লাবণ্যে
সুখাবেশে। —র ৩/১৬৯

কিংবা—

শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁর
প্রভাতের চন্দ্রকলা-সম, রজনীর আনন্দের
শীর্ণ অবশেষ· · —র ৩/১৭৮

কিংবা—

তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি
যেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা-অন্ধকার। —র ৩/১৭৩

প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, এ-সব বর্ণনায় ‘কবির বাণী তার চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে’[১৬] ; সেই সঙ্গে এ-কথাও নিশ্চয়ই বলতে হবে যে, এদের ছবিগুলিও কম বিস্ময়কর নয়। তা ছাড়া ‘চিত্রাঙ্গদা যেদিন তার সদ্যঃপ্রস্ফুটিত অলোকসামান্য রূপের প্রথম সাক্ষাৎ’ পেল—

সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেত শতদল যেন কোরক-বয়স
যাপিল নয়ন মুদি ; যেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেইদিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবর-জলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে। —র ৩/১৭০

এ ছবির তুলনা কোথায় ? প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলব, “এই শব্দচিত্রের দিকে সহৃদয় ব্যক্তি চিরকাল ‘রহিবে চাহিয়া সবিস্ময়ে’।”[১৭] কিন্তু এ-প্রসঙ্গ এখানেই থাক। এবার বিষয়টি অন্যদিক থেকে আলোচনা করা প্রয়োজন।

২

কাব্যে একই ইন্দ্রিয়চেতনার এলেকায় একাধিক সমধর্মী অনুভবের স্বাভাবিক সাদৃশ্যব্যঞ্জনার কথা পূর্বের পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বলা হয়েছে, এবং শেষের দৃষ্টান্তগুলি মুখ্যত দৃশ্যরূপের দিক থেকে, অর্থাৎ দৃষ্টিচেতনার এলেকা থেকে নেওয়া হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, ঐ সমধর্মী অনুভবগুলি প্রত্যক্ষত একই ইন্দ্রিয়-চেতনার অধিকারে এলেও সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণে এরা বিভিন্ন পর্যায়ের অনুভূতির স্বাদযুক্ত হতে পারে। অবশ্য কবির রূপায়ণিক-প্রক্রিয়ায় সংঘটিত আন্তর-সমন্বয়ের ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এরা অভিন্ন এক হয়ে ওঠে। লক্ষ্য করলে পূর্বের পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত অনেকগুলি দৃষ্টান্তে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। সাধারণত দৃষ্টিচেতনার

১৬. প্রবন্ধসংগ্রহ ১ : পুনর্মুদ্রণ অগস্ট ১৯৫৭ : পৃ ২৩৪ ; ১৭, প্রবন্ধসংগ্রহ ১ : ঐ : পৃ ২৩৩

ক্ষেত্রেই এটি সবচেয়ে বেশি ঘ'টে থাকে। কেননা দৃশ্যজগৎ বলতে আমরা যা বুঝি, তাতে সমগ্র স্পর্শ-জগতের দৃশ্যমান সব কিছুই এর এলেকায় এসে পড়ে, এবং এদের বিভিন্ন পর্যায়ের স্পর্শানুভূতির তির্যক্ ব্যঞ্জনা দৃষ্টিচেতনার অভিজ্ঞতাকেও সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটি বিশদ করা যাক। ধরা যাক সাদা রঙের অনুভূতি। এটি নিতান্তই দৃষ্টিচেতনার ব্যাপার। কিন্তু তা হলেও আমাদের চোখে মেঘের শুভ্রতা, দুধের শুভ্রতা, হাঁসের শুভ্রতা আর শঙ্খের শুভ্রতা এক নয়। শিল্পী মাত্রেই জানেন, এদের প্রত্যেকটির স্পৃশ্যগুণ (texture) আলাদা। এরা যথাক্রমে বাষ্পের, তরলের, কোমলের ও কঠিনের শুভ্রতা। এ ছাড়া আছে আলোর শুভ্রতা কিংবা আকাশের শুভ্রতা। শিল্পীর তুলি সে-বিষয়েও সম্পূর্ণ সচেতন। তাই আমরা যখন বলি, 'দুধ-সাদা আকাশ' কিংবা 'দুধ-সাদা রাজহাঁস', তখন আমাদের অজান্তেই আমাদের চেতনায় একাধিক ধরনের শুভ্রতার মিশ্রণ ঘটে, কেননা দুধের তরল স্পৃশ্যগুণটি তখন সাদা আলোর স্বচ্ছতা কিংবা হাঁসের পালকের কোমলতার সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়। বস্তুত এই রকমের মিশ্রণক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়ানুভূতির একটি সূক্ষ্ম রূপান্তর ঘটে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

শয্যা শুভ্রফেননিভ স্বহস্তে পাতিয়া দিব — র ৭/১৩৮

তখন ফেনার স্বচ্ছতরল শুভ্রতা শয্যার স্পর্শকোমল শুভ্রতায় রূপান্তরিত হয়। কিংবা তিনি যখন বলেন—

হংসশুভ্র মেঘের ঝালর
দোলে তার চন্দ্রাতপতলে — র ১৪/১৯

তখন সূক্ষ্মভাবে পরপর দু-বারই ইন্দ্রিয়ানুভূতির রূপান্তর ঘটে। প্রথমে 'হংসশুভ্রমেঘ' বলতে হাঁসের পালকের কোমল শুভ্রতা মেঘের বাষ্পলঘু শুভ্রতায় মিশে যায়; এবং 'মেঘের ঝালর' কথাটিতে ঐটিই আবার কোমল হয়ে উঠে কুঞ্চিত ঝালরের পেলব শুভ্রতায়, তার সূক্ষ্ম তন্তুজালের শুভ্র চারুতায় রূপান্তরিত হয়।

কিন্তু কেবল রঙের কথাই বলছি কেন? কাব্যে দৃষ্টিচেতনার অন্তর্ভুক্ত সবকিছুরই এ ভাবে রূপান্তর ঘটতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

আলোকের এই ঝরনাধারায় ধুইয়ে দাও — গী ৪২/৯২

তখন আলো দেখতে দেখতে ঝরনার তরল স্রোতের মতো তরতর ক'রে বইতে থাকে। অথবা, যখন তিনি বলেন—

আকাশতলে উঠল ফুটে আলোর শতদল
পাপড়িগুলি থরে থরে ছড়াল দিক্-দিগন্তরে,
ঢেকে গেল অন্ধকারের নিবিড় কালো জল, — র ১১/৩৯

তখন এই স্বচ্ছ 'আলো'ই এক মুহূর্তে শতদল পদ্মের মত চার দিকে থরে থরে কোমল পাপড়ি মেলে দেয়। এ দিকে আবার, রাত্রিশেষের অন্ধকারটি হয়ে যায় স্বচ্ছতরল। এতক্ষণ তা সরোবরের কালো জলের মতই চোখের উপর টলমল করছিল, এখন ঐ উন্মীলিত শতদলের রাশি রাশি পাপড়িতে দেখতে দেখতে ঢেকে গেল। অন্ধকারের সরোবর জুড়ে আলোর বিরাট শতদল পদ্মটি কী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে,— ছবিটি একেবারে সম্পূর্ণ। অথচ এখানে আলো ও অন্ধকার— দুটির বেলাই ইন্দ্রিয়ানুভূতির আশ্চর্য রূপান্তর ঘটল। আবার, আলো কোমল হয়ে 'পুঞ্জীভূত' হতে কিংবা জমাট বেঁধে 'কঠিন' হতেও খুব বেশি সময় লাগে না—

সন্ধ্যামেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায় — র ১৪/৩৬

কিংবা—

সোনার মুকুট ভাসাইয়া দাও সন্ধ্যামেঘের তরীতে — র ১৪/১৭৫

এ-ধরনের পঙ্‌ক্তিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম উদ্ধৃতিতে সূর্যাস্তের সোনালি আলো সন্ধ্যার মেঘে থোকা-থোকা হয়ে জমাট বেঁধেছে, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে তা একেবারে স্পর্শকাঠিন্যযুক্ত 'সোনার মুকুট' হয়ে উঠেছে।

এবার আসা যাক বিচিত্র স্পর্শানুভূতিময় পরিচিত পৃথিবীর চার দিকের দৃশ্যজগতে। এখানেও রবীন্দ্রনাথ আমাদের চোখে এই আশ্চর্য জাদুর খেলাটি অনুক্ষণই দেখিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যখন বলেন—

তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা — র ১২/৫৯

কিংবা—

কখন বাদল ছোঁয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি সবুজ মেঘে মেঘে — গী ৪৫৩/৬৪

তখন দেখতে দেখতে মাটি তার কাঠিন্য হারিয়ে একেবারে শূন্য আকাশ হয়ে যায়। তা ছাড়া প্রথম উদ্ধৃতিতে ঘাস যদি-বা পাখি হয়ে গিয়েও এখনো স্পর্শের কোমলতার সুরেই ডানা ঝাপটাচ্ছে, দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে তা একেবারে বদলে গিয়ে হয়ে উঠেছে পুঞ্জ পুঞ্জ বাষ্পমেঘ। আবার যখন দেখি—

মেঘ সে বাষ্পগিরি,
গিরি সে বাষ্পমেঘ,
কালের স্বপ্নে যুগে যুগে ফিরি ফিরি
এ কিসের ভাবাবেগ, — র ১৪/১৬২

তখন মেঘের লঘু বাষ্প হঠাৎ জমাট বেঁধে পাহাড় হয়ে যায়, এ দিকে সঙ্গে সঙ্গেই দিগন্তের পাথর-পাহাড় তার সমস্ত স্থূলতা হারিয়ে আমাদের অলক্ষ্যে কখন একরাশি স্তূপীকৃত বাষ্পমেঘ হয়ে উঠেছে। আবার তা-ও যে সব সময় পাহাড়ের মত মাটির সঙ্গে শিকলে-বাঁধা থাকতে চাইবে, তারই-বা নিশ্চয়তা কী? হঠাৎ হয়তো দেখা যায়—

পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ — র ১২/৫৮

তখন ঐ পুঞ্জ মেঘরাশি হঠাৎ লঘুভার হয়ে বৈশাখী ঝড়ের মুখে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে।

পাহাড়ের মত একটা জমাট পাথরে-ঠাসা অতিকায় নিরেট বাস্তব যেখানে চক্ষের পলকে বাষ্প হয়ে উবে যায়, চার দিকের সবুজ গাছপালা, লতাপাতাফুল তো সেখানে যে-কোনো মুহূর্তেই তরল প্রবাহে বয়ে যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে পূর্বের পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত 'নিশ্চল সবুজ বন্যা'র ছবিটি স্বভাবতই মনে আসে। তা ছাড়া—

ডালগুলি তার সবুজ ঝরনা ধরার পানে ঝুঁকে — র ১৫/২০৭

কিংবা—

উঠিতেছে ধারা
পুষ্পের ফোয়ারা
তৃণের লহরী —র ১৪/১০৩

এ-রকম অসংখ্য পঙ্‌ক্তিতে তার আভাস মেলে। এদের রঙ কিংবা রূপ শুধু বাইরের জগতে নয়, কবির অন্তরেও অনেক সময় তরল ধারায় প্রবাহিত হয়—

রূপের ঝোরা বইবে আমার বুকের পাহাড় বেয়ে। — র ১৪/১২১

আবার এক-এক সময় কবির চার দিকে পৃথিবীর নিসর্গপ্রকৃতিতে রঙের ও রূপের রীতিমত ঝড় বইতে থাকে—

রঙের ঝড় উচ্ছৃসিল গগনে — র ১৮/২৪৫

কিংবা—

সে বিস্ময় পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে
প্রাণের দুরন্ত ঝড়ে — র ১৪/৫৫

এ-সব পঙ্‌ক্তিতে তা একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া এরাই-যে আবার হঠাৎ কখন দপ্‌ ক'রে আগুনের শিখার মত জ্ব'লে ওঠে, তার প্রমাণ তো পূর্বের পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত 'জ্বালি দিল অরণ্যবীথিকা/শ্যাম বহ্নিশিখা'-তেই পেয়েছি। সেই সঙ্গে 'নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল'[১৮], অথবা 'পলাশের কুঁড়ি/এক রাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি'[১৯], কিংবা 'তার মঞ্জরীদীপশিখা/নীল অম্বরে রাখে ধরি'[২০]—এ-রকম আরো বহু দৃষ্টান্তই মনে ভিড় ক'রে আসে।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা অনেক সময়ে বর্ষার কবি ব'লে থাকি। কিন্তু তাঁর কাব্যে বসন্তও কিছু কম যায় না। গানের সংখ্যার দিক দিয়ে বর্ষার পরেই বসন্তের স্থান,— তাও খুব বেশি পিছনে নয়। তা ছাড়া যৌবনের প্রতীক বসন্তকে নিয়ে চিরতারুণ্যের কবি রবীন্দ্রনাথ বহু উল্লেখযোগ্য কবিতা রচনা করেছেন। ঋতুনাট্যগুলির মধ্যে ফাল্গুনীর একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। চিত্রাঙ্গদায় বসন্ত ও বসন্তসখার ভূমিকা তো এক হিসাবে সবচেয়ে প্রধান। 'তপোভঙ্গ' কবিতাতেও কবি নিজেই বসন্তসখার পক্ষ নিয়ে বসন্তরূপী যৌবনকে জয়ী করে দিয়েছেন। সত্যি বলতে, এক-এক সময় রবীন্দ্রনাথকে 'বসন্তপ্রতিম' কবি বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যাক সে কথা। আমরা বলছিলাম এই বসন্তও তাঁর কবিতায় কখনো বন্যা-স্রোতে বয়ে যাচ্ছে—

বসন্তের বন্যাস্রোতে সন্ন্যাসের হল অবসান —র ১৪/২২

কখনো ঝড়ের মতো ছুটে চলেছে—

যৌবনেরি ঝড় উঠেছে আকাশ পাতালে, —গী৫১০/২০৯

কখনো অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করছে—

আগ্নেয়বাণ বনশাখা তলে জ্বলিছে শ্যামল শীতল অনলে
সকল তেজের বাড়া। —র ১৫/১১

আবার, কতকাংশে দৃষ্টিচেতনার এলেকায় রেখেই বসন্তের স্পর্শের সম্মোহকেও কবি নানাভাবে প্রকাশ করেছেন : 'পূর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলসে লালসে'[২১], কিংবা 'বসন্তের চুম্বনেতে বিবশ দশ দিক্'[২২], কিংবা—

---

১৮. গী ৫৩১/২৬২ ; ১৯. র ১৫/২০ ; ২০. গী ২০৯/৫৩০ ; ২১. র ৪/৯৮
২২. র ৩/২১

আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে, ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্না-প্রবাহ সর্বশরীরে পশে, —র ২/২১৬

অথবা—

ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভুবনমোহিনী মায়া
যৌবনভরা বাহুপাশে তার বেষ্টন করে কায়া, —র ২/২১৬

এ-রকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। তবে এরা দৃষ্টিচেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও মুখ্যত স্পর্শচেতনার অধিকারে চলে যায় ব'লে এদের সম্বন্ধে এখানে এর বেশি বলতে চাই নে। তা হলেও এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে স্পর্শচেতনার ব্যঞ্জনায় আমাদের দৃষ্টিচেতনাও অনেকাংশে প্রভাবিত হচ্ছে: বসন্তের বনভূমির দৃশ্যরূপটিও আমাদের চোখে এমনি 'আলসে লালসে' জড়িয়ে মদির হয়ে আসে; 'বসন্তের চুম্বনে' 'দশ দিক' আমাদের চোখে 'বিবশ', শিথিল, বিস্রস্ত হয়ে এলিয়ে পড়ে; 'আকাশ', ও 'জ্যোৎস্না', যা একান্তভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য, তাও স্পর্শগম্য হয়ে আমাদের চোখে আরো কমনীয় ও স্বপ্নময় হয়ে ওঠে; এবং সবশেষে, বসন্তের জ্যোৎস্নারাতে যৌবনময়ী বিশ্বপ্রকৃতি তার অপরূপ সৌন্দর্যমায়ায় আমাদের সর্বদেহে মুগ্ধ আলিঙ্গনের কোমল কবোষ্ণ দেহস্পর্শ সঞ্চারিত ক'রে আমাদের আবিষ্ট চোখে এক আশ্চর্য মোহিনীমূর্তিতে দেখা দেয়।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা মনে আসছে: রবীন্দ্রনাথ নদীমাতৃক দেশের কবি ব'লেই হোক (তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্যসাধনায় গঙ্গা ও পদ্মার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব স্মরণীয়), অথবা জয়দেব থেকে উৎসারিত কল্লোলগীতিসমুচ্ছল প্রবহমান কাব্যধারার 'সলিলতত্ত্বে'র সাধক ব'লেই হোক, আমরা লক্ষ্য করি, তাঁর শত শত কবিতা ও গানে—উৎস, নির্ঝর, ঝরনা, নদী, তরঙ্গিনী, স্রোতস্বিনী, ধারা, স্রোত, প্রবাহ, বন্যা, প্লাবন, তরঙ্গ, ঢেউ প্রভৃতি কথা বারবার ফিরে ফিরে আসে। এদের বিচিত্র রূপ ও রূপকল্পের সাদৃশ্যব্যঞ্জনা তাঁর কাব্যকে প্রতিনিয়ত গতিশীল ও জীবন্ত ক'রে প্রাণলীলার অফুরন্ত ঐশ্বর্যে পূর্ণ ক'রে তুলেছে। অবশ্য জগতের সবকিছুতে এই গতিবেগ ও তরঙ্গস্পন্দন অনুভব করার পিছনে তাঁর ক্ষেত্রে সম্ভবত আরো একটি কারণ আছে, সেটি তাঁর ভারতীয় তত্ত্বদৃষ্টির উপলব্ধি। ভারতীয় তত্ত্বদৃষ্টিতে জগৎ গতিশীল, এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জীবন থেকেই জগতের এই গতিধর্ম সম্বন্ধে একান্তভাবে অবহিত। সত্যি বলতে, বলাকায় এসে তিনি যে 'বিরাট নদী'র মুখোমুখি হয়েছেন[২৩] তার সঙ্গে প্রভাত-সংগীতের 'স্রোত' কবিতাতে বহু পূর্বেই তাঁর পরিচয় ঘটেছে[২৪], এবং শেষ লেখায় এই বিশ্বরূপের ধারাই হয়ে উঠেছে 'রূপনারায়ণ'[২৫]। জগতের সবকিছুর এই 'গতিরূপ', এই 'প্রবাহ-রূপ'টি রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনাকে সব চেয়ে উদ্দীপিত করে। তাই তাঁর চোখে 'আলো' যেমন 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত' হয়[২৬], 'অন্ধকার'ও তেমনি 'অবিচ্ছিন্ন অবিরল' 'স্রোতে' 'ধাবমান' হতে থাকে[২৭], এবং সমস্ত জগতের দিকে চেয়ে তিনি দেখেন—

আকাশ হতে আকাশপথে হাজার স্রোতে
ঝরছে জগৎ ঝরনাধারার মতো। —গী ৫৫৯/৩৬

২৩. বলাকা ৮: র ১২/২০-২৩; ২৪. র ১/৯২-৯৩; ২৫. র ২৬/৪৮; ২৬. গী ১৪৭/৩৫৪; ২৭. র ১২/২০

কিন্তু এ-আলোচনায় এর বেশি দার্শনিকতার স্থান নেই। বস্তুত রবীন্দ্রকাব্যে দৃশ্যমান জগৎ স্পর্শানুভূতির সঙ্গে কীভাবে সম্পৃক্ত, এবং স্পর্শানুভূতির ব্যঞ্জনায় দৃষ্টিচেতনা কীভাবে প্রভাবিত, কেবল সেইটুকু দেখাবার জন্যই এ-পরিচ্ছেদের অবতারণা। কাজেই এ-প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করছি। এর পর আমরা রবীন্দ্রকাব্যে একাধিক ইন্দ্রিয়চেতনার সংযোজনা, সংমিশ্রণ ও রূপান্তর সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনায় অগ্রসর হব।

৩

একই ইন্দ্রিয়চেতনাগত বিভিন্ন বস্তুর অনুভব যে আমাদের মনে অনেক সময় একসঙ্গেই জেগে ওঠে, প্রথম পরিচ্ছেদে তা দৃষ্টান্তযোগে আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'সবুজ সোনা নীলের মায়া ঘিরল তাকে'[২৮], কিংবা 'বেণীতে তার লাল সুতোর ঝালর,/চোলি তার বাদামি রঙের,/শাড়ি তার আসমানি'[২৯], তিনি যখন বলেন, 'পাতার শব্দে, জলের শব্দে, পাখির ডাকে'[৩০], কিংবা 'এঞ্জিনের ধস ধস, বাঁশির আওয়াজ,/··· কুলি হাঁকাহাঁকি'[৩১], অথবা যখন বলেন, 'চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে মিলে'[৩২], কিংবা 'সে গন্ধ চুলের, না শুকনো ফুলের,/না শূন্য ঘরে সঞ্চিত বিজড়িত স্মৃতির,/বিছানায়, চৌকিতে, পর্দায়'[৩৩],— তখন আমরা বিভিন্ন উদ্ধৃতি অনুযায়ী এক-একটি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়চেতনার একাধিক বিষয়— অর্থাৎ একাধিক রঙ, একাধিক শব্দ কিংবা একাধিক ঘ্রাণ— একসঙ্গেই অনুভব করি, আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাতেও এমনটি ঘটে থাকে। কিন্তু তা হলেও বলব, প্রতিদিনের জীবনে আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একাধিক ইন্দ্রিয়চেতনার মিশ্রস্বাদ অনুভব করি : যে মুহূর্তে সকালের সূর্যকে দেখছি, সেই মুহূর্তেই পাখির গান শুনছি, এবং ফুলের ঘ্রাণ ও হাওয়ার স্পর্শ পাচ্ছি। কাব্যেও ঠিক তাই। রবীন্দ্রকাব্যে একসঙ্গে দুটি ইন্দ্রিয়চেতনার সংযোজনের তো ছড়াছড়ি বললেই হয়। এতটুকু চিন্তা না করেও এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এখানে কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করছি :

দৃষ্টি ও শ্রুতি ॥ অঙ্গে আঁচল সুনীল বরন,
রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ; —র ৭/২৮

শ্রুতি ও দৃষ্টি ॥ অতি দূর হতে আসিছে পবনে বাঁশির মদির মন্দ্র।
জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে,
শূন্য নগরী নিরখি নীরবে হাসিছে পূর্ণ চন্দ্র। —র ৭/২৯

দৃষ্টি ও স্পর্শ ॥ পদ্মের কলিকা-সম
ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি করে ধরি মম
আপনি পরায়ে দিব, এই পুরস্কার। —র ৪/৮.

স্পর্শ ও দৃষ্টি ॥ দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে, —র ২/১৩২

দৃষ্টি ও ঘ্রাণ ॥ পূর্ণ দেহখানি হতে উঠিছে সুবাস। — র ২/৮২

ঘ্রাণ ও দৃষ্টি ॥ চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে। — র ১৪/৬৮

২৮, র ১৯/৩০ ; ২৯, র ১৬/১০৪ ; ৩০, র ১৯/৩০ ; ৩১. র ১৬/৮৫ ; ৩২, র ১৯/১৪ ; ৩৩, র ১৬/৬১ ;

দৃষ্টি ও স্বাদ ॥	দ্বিতীয় বার মিষ্ট হাতের মিষ্ট অন্নে — র ২৩/৫০
স্বাদ ও দৃষ্টি ॥	সরস চুম্বন এক হাসিস্তরে-স্তরে — র ৩/৬৬
শ্রুতি ও স্পর্শ ॥	কাহার নূপুরশিঞ্জিত পদ সহসা লাগিল বক্ষে। — র ৭/২৮
স্পর্শ ও শ্রুতি ॥	সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি, উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি উরসে গলে। ঘুরে ফিরে চারি পাশে কভু কাঁদে কভু হাসে কুলুকুলু কলভাষে কত কী ছলে। — র ৩/৯৮
শ্রুতি ও ঘ্রাণ ॥	মর্মরিয়া কাঁপে পাতা, কোকিল কোথা ডাকে, বাবলা ফুলের গন্ধ ওঠে পল্লীপথের বাঁকে। — র ১০/১৩৩
ঘ্রাণ ও শ্রুতি ॥	কিসের গন্ধ কাহার বাঁশি হঠাৎ আসে প্রাণে। — র ১০/১৮২
শ্রুতি ও স্বাদ ॥	চাটুবচনের মিষ্টি রচন জানে; ক্ষীরে সরে কেউ মিষ্টি বানিয়ে আনে। — র ২৩/২২
স্বাদ ও শ্রুতি ॥	আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলী দলি সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে— হাপুস হুপুস শব্দ··· — র ১৭/২৯২
স্পর্শ ও ঘ্রাণ ॥	বন্যার তরঙ্গসম দিল আবরিয়া আলিঙ্গনে কেশপাশে স্রস্ত বেশবাসে আঘ্রাণে চুম্বনে স্পর্শে সঘন নিশ্বাসে সর্ব অঙ্গ তার। — র ৭/৩৭
ঘ্রাণ ও স্পর্শ ॥	পড়েছে অবাধে উন্মুক্ত সুগন্ধ কেশরাশি, সুকোমল তরঙ্গিত তমোজালে ছেয়ে বক্ষতল··· — র ৭/৩৫
স্পর্শ ও স্বাদ ॥	করিয়াছ পান চুম্বনভরা সরস বিম্বাধরে। — র ৪/১০৮
স্বাদ ও স্পর্শ ॥	ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা ধরেছি তোমার মুখে। — র ৪/১০৮
ঘ্রাণ ও স্বাদ ॥	সুধাগন্ধে মধুবিন্দুভারে — র ৩/১৩২
স্বাদ ও ঘ্রাণ ॥	মত্ত মধুপ মিষ্ট রসের গন্ধে সে। — র ২৩/৪৮

— আর দরকার নেই। একসঙ্গে তিনটি কিংবা তার বেশি ইন্দ্রিয়চেতনার বেলাও ঐ একই কথা। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল, যামিনী জোছনামত্তা — র ৭/৩০

তখন এতে মুকুলবৃষ্টির স্পর্শ, কোকিলের গান এবং জ্যোৎস্নারাতের রূপ— অর্থাৎ স্পর্শ শ্রুতি ও দৃষ্টি— এই তিনটি ইন্দ্রিয়চেতনাকেই একসঙ্গে অনুভব করা যায়। ঠিক তেমনি বলতে পারি—

শিউলি-সুরভি রাতে বিকশিত জ্যোৎস্নাতে

মৃদু মর্মরছন্দে— — গী ৪৯১/১৬২

এখানে ঘ্রাণ দৃষ্টি ও শ্রুতি -চেতনার মিলন ঘটেছে। কিংবা—

শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ, শুধু কানে আসে জলকলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব কেশের রাশি, — র ৩/১৫৩

এখানে ঘ্রাণ শ্রুতি ও স্পর্শ -চেতনাকে একই সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। আবার—

এনেছি বসন্তের অঞ্জলি গন্ধের,
পলাশের কুঙ্কুম চাঁদিনীর চন্দন
পারুলের হিল্লোল, শিরীষের হিন্দোল,
মঞ্জুল বল্লীর বঙ্কিম কঙ্কণ
উল্লাস-উতরোল বেণুবন-কল্লোল,
কম্পিত কিশলয়ে মলয়ের চুম্বন। —গী ৫০৫-'৬/১৯৯

এখানে একসঙ্গে ঘ্রাণ দৃষ্টি শ্রুতি ও স্পর্শ—এই চারটি ইন্দ্রিয়চেতনাই ধরা পড়েছে। 'আজি শরত-তপনে' গানটির প্রথম চার পঙ্‌ক্তির প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে পৃথক ইন্দ্রিয়চেতনার ব্যঞ্জনা রয়েছে :

দৃষ্টি ॥ 'আজি শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে'
শ্রুতি ॥ 'ওই বিহগ-বিহগী কী যে গায়'
স্পর্শ ॥ 'আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে'
ঘ্রাণ ॥ 'কোন্ কুসুমের আশে কোন্ ফুলবাসে' —গী ৪৮১-'৮২/১৪১

এই প্রসঙ্গে গীতাঞ্জলির একটি অতি পরিচিত গানের শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি স্বভাবতই মনে আসছে—

আজি আম্রমুকুলসৌগন্ধ্যে নব পল্লবমর্মরছন্দে,
চন্দ্রকিরণসুধাসিঞ্চিত অম্বরে অশ্রুসরস মহানন্দে,
আমি পুলকিত কার পরশনে— —গী ৫২৭/২৫২

এখানে 'সুধা'কে আস্বাদের পর্যায়ে ধ'রে নিলে একেবারে পাঁচটি ইন্দ্রিয় চেতনাকেই একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের হাজার হাজার কবিতা ও গান থেকে এ-রকম অজস্র দৃষ্টান্ত বেছে নেওয়া যায়, এখানে শুধু একটুখানি আভাস দেওয়া গেল। তবে মনে রাখতে হবে, এ-সব ক্ষেত্রে একাধিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়পথে এলেও আমাদের মনের মধ্যে তারা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু পঙ্‌ক্তিতে এই মিশ্রণক্রিয়াটিরও ইঙ্গিত করেছেন—

বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায় —র ২/৬৮

কিংবা—

আমার গান যে তোমার গন্ধে মিশে দিশে দিশে
ফিরে ফিরে ফেরে গুঞ্জরি, —গী ৫০৩/১৯২

কিংবা—

পূর্ণিমাচাঁদ তোমার শাখায় শাখায়
তোমার গন্ধ-সাথে আপন আলো মাখায়, —গী ৫০৩/১৯২

এ-ধরনের পঙ্‌ক্তিতে তার আভাস মেলে। আবার কখনো কখনো এই মিশ্রণক্রিয়াটিকে দুটি-একটি বিশেষণের তির্যক্‌ প্রয়োগে সূক্ষ্মভাবে ধরিয়ে দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে উদ্ধৃত 'কমলগন্ধ কোমল দু-পায়' কথাটিই মন্দ কী? এতে শুধু পদ্মগন্ধ ও দেহসৌরভের কথাই বলা হচ্ছে না, সেই সঙ্গে পা দুটির কোমল স্পর্শেরও ব্যঞ্জনা এসেছে, এবং তার সঙ্গে পদ্মের কোমলতার অস্ফুট চেতনাটুকুও মিশে আছে। চিত্রার 'বিজয়িনী' কবিতায় সুন্দরীর দেহচ্যুত বসনের বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ/এখনো জড়িত তাহে'[৩৪]—এখানে উত্তাপের স্পর্শচেতনা ও সৌরভের ঘ্রাণচেতনা নিবিড় আশ্লেষে এক হয়ে আছে। ঠিক তেমনি বলতে পারি, 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার 'দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে'[৩৫] পঙ্‌ক্তিটিতে 'বনগন্ধে'র সঙ্গে হাওয়ার 'তপ্ত' স্পর্শের এক রাসায়ণিক সংমিশ্রণ ঘটেছে; আবার 'দুঃসময়' কবিতায় 'এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে'[৩৬] কথাটিতে তরঙ্গিত সমুদ্রের রূপ ও গর্জন অবিচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা প'ড়ে আছে।

কিন্তু এ-আলোচনা আপাতত এইখানেই থাক্‌। এবার, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়চেতনার সূক্ষ্মতর সংমিশ্রণে রবীন্দ্রকাব্যে যে আরেকটি ভিন্ন ধরনের ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে, সংক্ষেপে তার আলোচনা করছি। তাঁর সৃষ্টি সেখানে সব চেয়ে বিচিত্র ও বর্ণময় হয়ে উঠেছে, এবং আমাদের এই পরিচিত জগৎ সেখানে এক অপরূপ শোভার নির্ঝর হয়ে দেখা দিয়েছে।

৪

কবির ইন্দ্রিয়ানুভূতি স্বভাবতই সূক্ষ্ম। কবিচিত্তে অনেক সময় একাধিক ইন্দ্রিয়চেতনা সূক্ষ্মতর সাদৃশ্য-ব্যঞ্জনায় পরস্পর এমন একাত্ম হয়ে ওঠে যে একটি অন্যটির বাহ্যলক্ষণাক্রান্ত হয়। ফলে ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি ঘাটে বাঁধা বিভিন্ন পর্যায়ের অনুভূতি তখন ঘাট পালটাতে থাকে। একে এক-কথায় ইন্দ্রিয়ানুভূতির রূপান্তর বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এর এত অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে যে এক-একবার মনে হয় তিনি বুঝি মুখ্যত এই রহস্যলোকেরই অধিবাসী। এখানে আলোর গান শোনা যায়, সুরের ঘ্রাণ পাওয়া যায়, ঘ্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায়, আবার স্পর্শের স্বাদ পাওয়া যায়।

তবে শুনতে যতই বিস্ময়কর হোক, এ জগৎ মোটেই সৃষ্টিছাড়া বা অবাস্তব নয়। এও আমাদের পরিচিত জগতেরই একটি অনুভববেদ্য রূপ। এমনকি প্রাত্যহিক জীবনেও এর সঙ্গে আমাদের প্রায়ই খানিকটা পরিচয় ঘটে। বেশি দূরে যাবার দরকার নেই, আমরা যখন বলি, 'চেহারাটি ভারি মিষ্টি' 'সুরটি বড়ো কোমল' 'স্পর্শ টুকু কী মধুর'—তখন খেয়ালই হয় না যে কথাগুলির মধ্যে কোনো অসংগতি আছে। 'চেহারা' 'মিষ্টি' হতে গেলে যে দৃষ্টিচেতনাকে স্বাদে পরিণত হতে হয়, 'সুর' 'কোমল' হতে গেলে যে শ্রুতিচেতনাকে স্পর্শলক্ষণযুক্ত হতে হয়, কিংবা 'স্পর্শ টুকু' 'মধুর' হতে গেলে যে তাকে আস্বাদময় হতে হয়— এত-সব ভাববার সময় কোথায়? কথাগুলি শোনামাত্রই তো আমাদের কাছে তারা প্রত্যক্ষবৎ সত্য হয়ে ওঠে। এর থেকে বোঝা যায়, আমাদের অনুভূতিতে বাহ্যজগতের রূপ ইন্দ্রিয়ের নির্দিষ্ট ঘাটগুলিতে সব সময় বাঁধা থাকে না, আর এইটিই স্বাভাবিক। আমাদের কণ্ঠস্বরের শ্রুতিলক্ষণগুলি পর্যন্ত আমাদের কাছে কত বিভিন্ন ইন্দ্রিয়চেতনার ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়: কারো স্বর কর্কশ, কারো মসৃণ; কারো গলার সুর সরু, কারো মোটা, কারো মাঝারি, কারো-বা সরু-মোটায় ভাঙা; কারো গলা উঁচুতে চড়ে, কারো খাদে প'ড়ে

---

৩৪ র ৪/৯৫; ৩৫ র ৪/৩২; ৩৬ র ৭/১২১

থাকে ; কারো গলা মিষ্টি, কারো নীরস, কারো ঝাঁঝালো ; কারো স্বর হালকা, কারো ভারী, কারো কঠিন, কারো দানা-বাঁধা। আগে শুনতুম কিনা জানি নে, কিন্তু আজকাল তো আমরা হঠাৎ-হঠাৎ 'রুপোলি কণ্ঠে'রও আভাস পাই। ঠিক তেমনি, হাসিও কম বিচিত্র নয় : হালকা হাসি, মিষ্টি হাসি, তরল হাসি থেকে শুরু ক'রে শুষ্ক হাসি, রুক্ষ হাসি, কঠিন হাসি, বক্র হাসি, কাষ্ঠহাসি পর্যন্ত কত রকম হাসি আমাদের চার দিক থেকে ভেসে আসে। আবার এক ঘর লোকের এক পসলা হাসির বৃষ্টি শেষ হতেই হঠাৎ শুনি পাশের ঘরে হাসির ঝিলিক খেলে গেল। কিন্তু আর দৃষ্টান্তের দরকার নেই। ইংরেজিতে যখন বলি, loud colour, deep blue, sweet smell, sharp note, soft tune, high pitch—তখন আসলে আমাদের এই ধরনের অভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। ব্যাকরণের দিক থেকে এই বিশেষণগুলিকে 'বিশিষ্টার্থক' বলা যায়, তবে এর মূল কারণটি আমাদের অনুভবের মধ্যেই নিহিত।

কেন এ হয়, এ-সম্বন্ধে খানিকটা ইঙ্গিত প্রথম পরিচ্ছেদের সূচনাতেই করা হয়েছে। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতি বাইরের জগৎ থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে এলেও আমাদের চিত্তে তাদের ভাবরূপগুলি স্বভাবতই পরস্পর মিশ্রিত হয়ে পড়ে। ধূপদানির পাঁচ রকম গন্ধের ধূপকাঠি থেকে উত্থিত পাঁচটি স্বতন্ত্র ধোঁয়ার রেখা যেমন পরস্পর জড়িয়ে গিয়ে একটি সূক্ষ্ম বাষ্পজাল রচনা করে এবং তার থেকে এদের আর পৃথক্ ক'রে ছাড়িয়ে নেওয়া যায় না— কিংবা এমন এক মিশ্রসৌরভ সৃষ্টি করে যার থেকে এদের বিশেষ একটির গন্ধকে আলাদা ক'রে চেনা যায় না, অথবা দৈবাৎ এক-আধটু আঁচ করতে পারলেও নির্দিষ্ট ক'রে বলা যায় না— এও ঠিক সেই রকম। তবে মনে রাখতে হবে, এ নেহাত-ই বাহ্য তুলনা মাত্র। নইলে, আমাদের চেতনায় বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতির সংমিশ্রণক্রিয়া আরো বহু সূক্ষ্ম ও জটিল। এই অনুভূতিগুলি আমাদের চিত্তে কতকগুলি 'ভাবরূপ' নিয়ে বিরাজ করে, আমাদের চিত্তগত 'বাসনা'র সঙ্গে মিশে আস্বাদময় হয়, পূর্বানুভূত অনুভবপুঞ্জের স্মৃতি-বিজড়িত সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বর্ণময় হয়ে ওঠে, এবং বিচিত্র ভাবনা-কল্পনার সঙ্গে অন্বিত হয়ে এরা নানাভাবে মিলিত মিশ্রিত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। এতগুলি মানসিক ব্যাপারকে শুধু ঐ বিভিন্ন ধরনের ধূপবাষ্প-রচিত সূক্ষ্ম রেখাজাল কিংবা তাদের মিশ্রসৌরভ দিয়ে বোঝানো অসম্ভব। কিন্তু যাক সে কথা। যা বলছিলাম। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতির এই ধরনের মিশ্রণ ও পরিবর্তনের ফলেই আমাদের কাছে গান কিংবা গন্ধ কিংবা শিশুর কচিমুখের হাসি 'মিষ্টি' হতে কোনোই বাধা হয় না, ঘ্রাণ কিংবা কণ্ঠস্বর স্বচ্ছন্দে 'ঝাঁঝালো' হতে পারে, এবং কটাক্ষ কিংবা হাসি দুই-ই 'তীক্ষ্ণ' হয়ে দুটি অব্যর্থ তীরের মত যথাস্থানে একই সঙ্গে লক্ষ্যভেদ করতে পারে।

অবশ্য সাধারণত কোনো একটি সূক্ষ্ম সাদৃশ্যসূত্রেই একাধিক অনুভূতি এ ভাবে মিশ্রিত হয়ে থাকে। তবে কখনো কখনো এদের সহভাব (co-existence) কিংবা সামীপ্য থেকেও এমনটি ঘটতে পারে, আবার কদাচিৎ বৈপরীত্যের আকর্ষণেও এদের ঘনিষ্ঠ হতে দেখা যায়। তা হলেও, এরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতর সাদৃশ্যব্যঞ্জনাতে পরস্পর মিলিত হয় ব'লে, এদের জন্য কাব্যে সচরাচর উপমা উৎপ্রেক্ষা রূপক প্রতিবস্তূপমা প্রভৃতি তুলনামূলক অলংকার অথবা উল্লিখিত ধরনের বিশিষ্টার্থক বিশেষণের প্রয়োগ একরকম অনিবার্য হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রকাব্যে ইন্দ্রিয়চেতনার এই মিশ্রণ ও রূপান্তর -ক্রিয়াটি ভালো ক'রে লক্ষ করতে হলে সেই সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত একই ইন্দ্রিয়চেতনার এলেকায় একাধিক বস্তুর সমন্বয়-কৌশলটিও

মনে রাখতে হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারের প্রয়োজন আছে। আলোচনার সুবিধার জন্য এখানে দুই ধরনের সাদৃশ্যগত একীকরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি। প্রথমে একই ইন্দ্রিয়চেতনার অধিকারেই দেখা যাক।

অনেক সময় কবি একাধিক বস্তুর একীকরণের কেবলমাত্র ইঙ্গিতটুকু ধরিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

নদী হতে লতা হতে আনি তব গতি
অঙ্গে অঙ্গে নানা ভঙ্গে দিবে হিল্লোলিয়া
বাহুতে বাঁকিয়া পড়ি গ্রীবায় হেলিয়া
ভাবের বিকাশভরে, —র ৩/৭৩

কিংবা—

শ্রাবণে দিগন্তপারে
যে গভীর স্নিগ্ধদৃষ্টি ঘন মেঘভারে
দেখা দেয়, নবনীল অতি সুকুমার,
সে দৃষ্টি না জানি ধরে কেমন আকার
নারী চক্ষে, —র ৩/৭৪

তখন পাঠকের পক্ষে ঐ আভাসটুকুই যথেষ্ট। তা ছাড়া যেখানে তিনি আরো নির্দিষ্টভাবে তুলনামূলক অলংকার প্রয়োগ করেন সেখানে তো কথাই নেই। অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ তাঁর কাব্যকে যে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করেছে, এগুলিতে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়—

বাহ্লীকরাজের মেয়ে রূপসী বটে,
যেন সাদা গোলাপের পুষ্পবৃষ্টি। —র ২৬/১৫৭

কিংবা—

অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য ফেটে পড়ছে,
যেন দ্রাক্ষালতায় আঙুরের গুচ্ছ। —র ২৬/১৫৭

কিংবা—

ভোরবেলাকার দিগন্তরেখাটির মতো বাঁকা চোখের পল্লব,
শিশিরে স্নিগ্ধ, আলোতে উজ্জ্বল। —র ২৬/১৫৭

তাঁর এ-ধরনের পঙ্‌ক্তিগুলি সত্যই তুলনাহীন। তবে এ হল একই ইন্দ্রিয়চেতনার অধিকারে একাধিক বস্তুর সাদৃশ্যের কথা। আর যেখানে তিনি একাধিক ইন্দ্রিয়চেতনার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন, সেখানে তাঁর কাব্যের স্বাদ আরো অপূর্ব—

তার গলায় সুর ওঠে ঝলক দিয়ে,
নটীর কঙ্কণে আলোর মতো। —র ১৬/২৮

কিংবা

তার কালো চোখের চাহনিতে
মেঘমল্লারের সব মিড়গুলি আর্ত হয়ে উঠুক। —র ২৬/৯৯

কিংবা
বুকের মধ্যে অমন ক'রে
কেন লাগায় চোখের জলের মিড়। —র ১৬/৩৫

এ-রকম অসংখ্য পঙ্‌ক্তিতে তার আভাস মেলে।

এবার রবীন্দ্রকাব্য থেকে কয়েকটি অতি সাধারণ তুলনামূলক অলংকারের একটি ক'রে দৃষ্টান্ত দিয়ে 'এক' এবং 'একাধিক' ইন্দ্রিয়চেতনার অধিকারে যথাক্রমে 'সম' এবং 'বিষম' বস্তুর সাদৃশ্যের একটুখানি আভাস দেওয়া যাক। এতে ক'রে এই দুই ধরনের রূপায়ণের তফাতটুকু পাশাপাশি চোখে পড়বে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও রূপক— এই তিনটি অলংকারই ধরা যাক, আর সেই সঙ্গে উল্লিখিত উভয় ধরনের একটি ক'রে সাদৃশ্যবোধক বিশেষণের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক :

উপমা

সম ॥
দুটি স্বচ্ছ নেত্র হতে
কাঁপিত আলোক, নির্মল নির্ঝর-স্রোতে
চূর্ণরশ্মিসম। —র ৩/৬৮

বিষম ॥
পুষ্পের মতো সংগীতগুলি ফুটাই আকাশ-ভালে। —র ৩/১২৬

উৎপ্রেক্ষা

সম ॥
সংশয়ময় ঘননীল নীর কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন। —র ৩/১৫১

বিষম ॥
একটি গান উঠল জেগে
নীরব সময়ের বুকের মাঝখানে
একটি মাত্র নীলকান্তমণি,— —র ১৬/১৯

রূপক

সম ॥
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা। —র ১২/৫৯

বিষম ॥
পথপাশে মল্লিকা দাঁড়ালো আসি, বাতাসে সুগন্ধের বাজালো বাঁশি।
—র ১৫/১২

সাদৃশ্যবোধক বিশেষণ

সম ॥
লজ্জামুকুলিত মুখে। —র ৩/৬৯

বিষম ॥
বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে। —র ১২/৪৫

আর দরকার নেই। একাধিক ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্রুত মিশ্রণ ও রূপান্তরের ব্যাপারে রূপক ও সাদৃশ্যবোধক বিশেষণের উপযোগিতা স্বভাবতই সব চেয়ে বেশি। রবীন্দ্রকাব্যে দুটির বৈচিত্র্যই বিস্ময়কর।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আগেই বলেছি, কখনো কখনো বৈপরীত্যের আকর্ষণেও আমাদের চিত্তে একাধিক অনুভূতির সংমিশ্রণ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় অনেক সময় একটি অনুভূতিকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত ও মিশ্রিত ক'রে এক বিশেষ ধরনের ভাব-কল্পনার সৃষ্টি করেন। এতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর অসামান্য স্বকীয়তা ধরা পড়ে। এগুলি শুধুই 'ভীষণ

মধুর' 'ভয়ংকর সুন্দর' 'ভীম আনন্দ' কিংবা 'রুদ্র আনন্দ' জাতীয় সাধারণ সংমিশ্রণ নয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

স্থিতি—গতি

চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে। —র ৭/১০৭

কিংবা

এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়। —র ১২/৫৯

নিঃশব্দ—শব্দ

চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি। —র ২৫/৮৩

কিংবা

ওই শোন বাজে
নিঃশব্দ গম্ভীর মন্দ্রে অনন্তের মাঝে
শঙ্খঘণ্টাধ্বনি। —র ৪/৩০

অবস্তু—বস্তু

স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
রাশি রাশি বস্তুফেনা ওঠে জেগে। —র ১২/২০

কিংবা

যেথা তব বিরহিনী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ আভাসে
ক্লান্ত সন্ধ্যাদিগন্তের করুণ নিশ্বাসে
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাসে— —র ১২/১৭

কিন্তু এ-পথে আর এগোতে চাই নে, কেননা এর পরেই রূপ-অরূপের ঘাট। তার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র।

৫

এবার আমরা রবীন্দ্রকাব্যে ইন্দ্রিয় চেতনার কয়েকটি বিশেষ পর্যায়ের মিশ্রণ ও রূপান্তরের একটুখানি আভাস দিচ্ছি। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় চেতনার মধ্যে প্রত্যেক দুটিকে নিয়ে গাণিতিক 'বিন্যাস' (permutation) ও 'সমবায়ে'র (combination) হিসাবে এ-ধরনের রূপান্তরের সবশুদ্ধ বিশটি 'প্রকার-ভেদ'[৩৭] হতে পারে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রকাব্যে এদের সবগুলিরই দৃষ্টান্ত রয়েছে। অন্যত্র[৩৮] সবগুলিরই মোটামুটি আলোচনা করেছি। এখানে মুখ্যত তিনটি ইন্দ্রিয়চেতনা বেছে নিচ্ছি : দৃষ্টি শ্রুতি ও স্পর্শ। গাণিতিক হিসাবে এদের মধ্যে ছয় রকম রূপান্তর হতে পারে : দৃষ্টি ও শ্রুতির মধ্যে 'রূপের ধ্বনি' ও 'ধ্বনির রূপ'; দৃষ্টি ও স্পর্শের মধ্যে 'রূপের স্পর্শ' ও 'স্পর্শের রূপ'; এবং শ্রুতি ও স্পর্শের মধ্যে 'ধ্বনির স্পর্শ' ও 'স্পর্শের ধ্বনি'। অবশ্য এখানে 'ধ্বনি' কথাটি 'আলংকারিক' অর্থে নয়, সাধারণ 'লৌকিক' অর্থেই ব্যবহার করছি। প্রথমে দৃষ্টি ও শ্রুতি-চেতনা দিয়েই শুরু করি :

---

৩৭. দৃষ্টি > শ্রুতি ; শ্রুতি > দৃষ্টি ; দৃষ্টি > স্পর্শ ; স্পর্শ > দৃষ্টি ; দৃষ্টি > ঘ্রাণ ; ঘ্রাণ > দৃষ্টি ইত্যাদি।

৩৮. রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ : হিরণকুমার বসু বক্তৃতামালা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৫৮

দৃষ্টি>শ্রুতি

যে-কবি বলেন—

সামনে চেয়ে এই যা দেখি, চোখে আমার বীণা বাজায় —গী ৫৫০/১৫

তাঁর দৃষ্টিচেতনা কত বিচিত্র সুরে বাজছে তাই খানিকটা শোনা যাক। এক 'আলো'রই কত রকম ধ্বনি :

পদধ্বনি ॥	প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠল বেজে যেই,	—গী ১৪২/৩৪২
কাঁকনধ্বনি ॥	তারি সোনার কাঁকন বাজে আজি প্রভাত-কিরণ মাঝে।	—গী ৪৮৭/১৫১
কিঙ্কিণীধ্বনি ॥	তারায় কাঁপে রিনিঝিনি যে কিঙ্কিণী,	—গী ৪২৯/৪
মঞ্জীরধ্বনি ॥	পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে বাজিল চন্দ্রভানু	—র ১৮/২০০
রব ॥	তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে।	—গী ২২/৩৯
ক্রন্দন ॥	আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন।	—র ১৫/৯৯
ভাষা ॥	প্রভাতের শুভ্র ভাষা,	—র ৫/৯৫
গান ॥	আলো যে···গান করে মোর প্রাণে গো।	—গী ২০৪/৫১৮
সুর ॥	বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে,	—গী ৪৬/৯৯
বাঁশির তান ॥	হে রবি, প্রাঙ্গণে তব শরতের সোনার বাঁশিতে/জাগিল মূর্ছনা।	—র ১৪/৪৫
বীণাঝংকার ॥	উষা একা একা আঁধারের পারে ঝংকারে বীণাখানি।	—র ১৪/১৭০
ঐকতান ॥	পূর্ণিমাচাঁদ কারে চেয়ে একতানে দেয় আকাশ ছেয়ে।	—গী ৩৩২/১৫৫
তূর্যধ্বনি ॥	বাজল তূর্য আকাশপথে— সূর্য আসে অগ্নিরথে।	—গী ৫৬০/৩৯
শঙ্খধ্বনি ॥	উদয়দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে	—র ১৪/১২
ঘণ্টাধ্বনি ॥	প্রভাতে সোনার ঘণ্টা বাজে ঢঙ্ ঢঙ্	—র ২৫/৮৪

—তবু এ তো হল কেবল আলোর ধ্বনি। তাঁর কাব্যে বিশাল দৃশ্যজগতের বিচিত্র রূপের অন্তহীন ধ্বনিতরঙ্গকে একসঙ্গে কল্পনায় আনাও অসম্ভব। তাঁর চার দিক থেকেই তো উঠছে—

'রূপের শঙ্খে অসংখ্য জয় জয়।' —র ১৪/২৭

এখানে আমরা সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এর খানিকটা আভাস দিচ্ছি। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করবার জন্য এবার আমরা জগতের কতকগুলি বিশেষ ধরনের রূপময় প্রকাশকে একান্তভাবে বেছে নিচ্ছি, এবং দৃষ্টান্তগুলি সেই অনুসারেই সাজানো হচ্ছে :

আকাশের ॥	আকাশবীণার তারে তারে জাগে তোমার আগমনী।	—গী ৪৮৪/১৪৬
দিগন্তের ॥	সুদূর দিগন্তের সকরুণ সংগীত লাগে মম চিন্তায় কাজে।	—গী ৫২৭/২৫২
সুদূরের ॥	ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।	—র ১০/১৭
মাঠের ॥	মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল।	—গী ৪৯৭/১৭৯
খেতের ॥	শস্য-খেতের সোনার গানে যোগ দে রে আজ সমান তানে।	—গী ৪৮৫/১৪৮
জলস্থলের ॥	স্থলে জলে আর গগনে গগনে বাঁশি বাজে যেন মধুর লগনে।	—র ৭/১৪৪
পাহাড়ের ॥	হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সংগীত	—র ১০/৪১
পথের ॥	বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,	—র ১২/৭৬

বনের ॥ বনের বীণায় বীণায় ছন্দ জাগে বসন্ত পঞ্চমের রাগে, —গী ৫২৯/২৫৮

তরুর ॥ বনের মন্দির-মাঝে তরুর তম্বুরা বাজে, —র ১৫/৩০

তৃণের ॥ সেথায় তরু-তৃণ যত/মাঠের বাঁশি হতে ওঠে গানের মতো। —গী ১২/১৭

বিভিন্ন ফুলের ॥ চাঁপার কাঞ্চন-আভা সে যে কার কণ্ঠস্বরে সাধা। —র ১৫/১২৫

করবীর রাঙা রঙ কঙ্কণ-ঝংকার-স্বরে মাখা। —র ১৫/১২৫

ফাল্গুনমাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে

নীলমণিমঞ্জরির গুঞ্জন বাজায়ে দিল কি রে। —র ১৫/১২৪

তব নীললাবণ্যের বংশীধ্বনি দূর শূন্যে বাজে। —র ১৫/১২৭

কলহাস্য তুলে/দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে। —র ১২/৪৭

কণ্টিকারীর নীল-সোনালি বাণী। —র ১৫/২০৭

ঝুমকোলতা জমায় কথা রঙিন রাগিণীতে। —র ১৫/২৮

রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা ও গান থেকে এ-রকম আরো অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বস্তুত, তিনি চার দিকে যা-কিছু দেখেন তাই যখন তাঁর 'চোখে' কেবলি 'বীণা বাজায়', তখন তাঁর কাছে জগতের সব রূপ-রঙই তো সুরে ভ'রে ওঠে। এই প্রসঙ্গে পূর্বে উদ্ধৃত আরো একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে, যেখানে তিনি প্রিয়ার চোখের চাওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, 'তার কালো চোখের চাহনিতে মেঘমল্লারের সব মিড়গুলি আর্ত হয়ে উঠুক।' সত্যি বলতে, এমন সুর-ভরা মন ও সুর-ভরা দৃষ্টি আর কোন্ কবির আছে জানি নে। তিনি যথার্থই বলেছেন—

আমার উন্মনা আঁখি এ দেখার গূঢ় গান গাহে। —র ১৫/৩০

কিন্তু তাঁর কাছে কেবল চোখ থেকে নয়, সমস্ত দেহ থেকেই ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে—

দেহের ॥ আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি। —গী ৪০২/৩৩১

কিংবা, আমারে করো তোমার বীণা লহ গো লহ তুলে

উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে। —গী ২৮৩/৩৩

দেহগতির ॥ গতিরাগের সে ছিল গান। —গী ৫৬৯/৫৭

কিংবা, চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী। —র ১২/২০

নৃত্যের ॥ সকল দেহের আকুল রবে মন্ত্রহারা তোমার স্তবে

ডাহিনে বামে ছন্দ নামে নবজনমের মাঝে।

বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ সংগীতে বিরাজে ॥ —গী ৫৪৩/১

তাঁর চোখে বসন্তের ফুল-ফোটানোও বাণীতে বেজে ওঠে—

বসন্ত-সমীরে তোমার ফুল-ফোটানো বাণী —গী ১১৭/২৭২

কিন্তু আর নয়। কেবল একটি কথা। তাঁর চোখে 'আলো'র মতো 'ছায়া' থেকেও সুর বাজে—

কাঁঠালতলার ঘন ছায়া/তপ্ত মাঠের ধারে

দূরের বাঁশি বাজায়/অশ্রুত মুলতানে। —র ১৬/২৬

কিংবা,
চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জমাঝে
চারু চরণের ছায়ামঞ্জীর বাজে। —র ১৪/৩৫

এ-সব পঙ্‌ক্তিতে তার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু থাক্ এদিকের কথা। এবার অন্যদিক থেকে দৃষ্টি ও শ্রুতি-চেতনার মিশ্রণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাক।

শ্রুতি > দৃষ্টি

রবীন্দ্রকাব্যে 'চোখের দেখা' যেমন গান হয়ে ওঠে, উলটো দিক থেকে ধ্বনিও তেমনি রূপ ধ'রে দেখা দেয়, শ্রুতিচেতনার বিষয় দৃষ্টিচেতনায় চলে আসে। এর দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই, তবে জগতে দৃশ্যরূপের বৈচিত্র্য স্বভাবতই বেশি ব'লে প্রথমটির ক্ষেত্রে যেমন অফুরন্ত দৃষ্টান্ত সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়, দ্বিতীয়টির বেলা ঠিক তা নয়। তবু এক্ষেত্রেও অন্য রকমের বিস্ময়কর বৈচিত্র্য রয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বক্তব্যটি বিশদ করা যাক :

সুরের আলো ॥ সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে। —গী ৬/৪

শব্দের বিদ্যুৎ ॥ শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে। —র ১২/৫৭

গানের বিদ্যুৎ ॥ বেদনা-বিদ্যুৎ গানে গানে। —র ১৪/৪৬

সুরের রঙ ॥ সুরের আবির হানব হাওয়ায় —গী ৫০৮/২০৫
আমার মনের রাগরাগিণী রাঙা হল রঙিন তানে। —গী ৫০৯/২০৫
সাহানা রাগিণী এর রাঙা রঙে রঞ্জিত। —গী ৫৩৪/২৭১
দাও আমারে সোনার বরন সুরের ধারা ঢেলে। —গী ১৭/৩০

সুরের ফুল ॥ দিশাহারা আকাশ ভরা সুরের ফুলে। —গী ১২/১৬
বিশ্বগীত-পদ্মদলে, —র ১৪/৭৬
তোমার গানের পদ্মবনে/আবার ডাকো নিমন্ত্রণে। —গী ৫৫২/২০
তোমার ফাগুনদিনের বকুল চাঁপা শ্রাবণদিনের কেয়া
তাই দেখে তো শুনি তোমার কেমন সে তান দে'য়া। —গী ১৬/২৮

কথার কোরক ॥ মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে। —র ১৫/১৮

সুরের রেণু ॥ তোমার সুর অশোকবনে রঙিন রেণুরাগে। —গী ৮/৭

সুরের গীতলেখা ॥ যেমন তোমার বসন্ত-বায় গীতলেখা যায় লিখে
বর্ণে বর্ণে পুষ্পে পর্ণে বনে বনে দিকে দিকে। —গী ৯/৯
সুরগুলি তার নানা ভাগে রেখে যাব পুষ্পরাগে
মিড়গুলি তার মেঘের রেখায় স্বর্ণলেখায় করব বিলীন। —গী ২৭৮/১৯

সুরের ফসল ॥ ঋতুতে ঋতুতে সুরের ফসল কত। —র ১৯/১৫

গানের সাজি ও ডালা ॥ গানের সাজি এনেছি আজি, ঢাকাটি তার লও গো খুলে। —র ১৪/৩৩
তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা। —গী ৫/১

গানের আলপনা ॥ এঁকে যাব আমার গানের আলপনা। —র ১৪/৬৫

সুরের আসন ॥	গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে। —গী ১৫/২৪
সুরের কর্ণাভরণ ॥	মেঘরাগিণী-রচিত কী সুর দুলালো কর্ণমূলে। —গী৪৬৯/১১০
সুরের পর্দা ॥	আমার সুরের পর্দাটি আজ হঠাৎ গেল উড়ে। —র ১২/৫৬
সুরের তরী ॥	তোমার সুরের তরী আমার রঙিন ফুলে কূল নিল। —গী ৩৬৮/২৪৪
	এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী। —র ১৪/৪৪
	কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে। —গী ১২/১৬
সুরের সেতু ॥	কত আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে। —গী ৬২/১৩৪
বাণীর পতঙ্গ ॥	আমার বাণীর পতঙ্গ গুহাচর/···হারিয়ে যা পাখা মেলে। —র ১৪/১৬১
সুরের পাখি ॥	কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর, সাতটি যেন পোষা পাখি। —র ৭/৯৩
	আমার প্রাণের গানের পাখির দল তোমার কণ্ঠে বাসা খুঁজিবারে হল তারা চঞ্চল। —র ১৪/১৬৯
গানের পাখা ॥	গানের পাখা যখন খুলি বাধা-বেদন যাই যে ভুলি। —গী ৫১৪/২১৮
সুরের মূর্তি ॥	তব বীণাতারে···ধরিবে গানের মূর্তি। —র ১৪/৭৬
	শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ বীণার স্পন্দন। —র ১৪/৭৬
সুরের দেহগতি ॥	আমার রাগিণী ধেয়ে চলে অন্যমনে হয়ে বিবাগিনী/লয়ে তার ডালি। —র ১৪/৪৫
সুরের দেহচ্ছন্দ ॥	আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে ললিতগীত-কলিত-কল্লোলে। —র ১৫/৪৯

রবীন্দ্রকাব্যে শ্রুতিচেতনা কত বিচিত্রভাবে দৃষ্টিচেতনায় রূপান্তরিত হচ্ছে, এর থেকেই তার খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে। এবার আমরা তাঁর কাব্যে দৃষ্টি ও স্পর্শচেতনার পারস্পরিক মিশ্রণ ও রূপান্তর সম্বন্ধে একটুখানি ধারণা করতে চেষ্টা করব।

দৃষ্টি>স্পর্শ

দৃষ্টি ও স্পর্শ -চেতনা পরস্পরের সঙ্গে কতখানি সম্পৃক্ত এ বিষয়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। বস্তুত দৃশ্যজগতের একটি বিরাট অংশই স্পর্শময়, তা ছাড়া স্পর্শচেতনার তির্যক্ দ্যোতনায় আমাদের দৃষ্টিচেতনা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। ছবির স্পৃশ্যগুণ বা texture-এর উল্লেখ করে এ-কথাও পূর্বে বলা হয়েছে। কাজেই ঐ পরিচ্ছেদটি স্মরণে রেখেই এবার আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

যে-কবির—

আঁখির দেখায় আঁচল ঠেকায় অধরা স্বপন যে —র ১৪/৪০

তাঁর দৃষ্টিচেতনায় স্পর্শগুণ জেগে উঠবে, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। সত্যি বলতে, তাঁর কাব্যে এর দৃষ্টান্ত এত বেশি ছড়িয়ে আছে, যে চোখ বুজে মুঠো ক'রে আনলেও কেবল এই নিয়েই একখানা বই লেখা যায়। এবারেও আমরা প্রথমে দৃষ্টিচেতনার প্রধান উপাদান 'আলো' নিয়েই শুরু করছি, এবং কোনো ক্ষেত্রেই একটির বেশি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি নে।

আলোর ছোঁওয়া ॥ সোনার প্রভাত দিয়েছে ওর সর্বদেহ ছুঁয়ে। —র ১৪/১২১

আলোর রাখীবন্ধন ॥ সূর্য যেমন ধরার করে আলোক-রাখী জড়ায় প্রাতে। —গী ১৪২/৩৪৩

আলোর চুম্বন ॥ মোর জন্মকালে
প্রথম প্রত্যুষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি
আমার কপালে। —র ১৪/৪৩

আলোর আলিঙ্গন ॥ আলোক আমার তনুতে— কেমনে
মিশে গেছে মোর তনুতে ;—···
এ গগন-ভরা প্রভাত পশিল
আমার অণুতে অণুতে। —র ১০/১৪২

আলোর দেহপ্রবেশ ॥ সোনার আলো কেমনে হে রক্তে নাচে সকল দেহে। —গী ২৭/৫২

আলোর অঞ্জলি ॥ শরৎ, তোমার অরুণ-আলোর অঞ্জলি— —গী ৪৮৭/১৫৩

আলোর ধৌত করা ॥ ধৌত কর মম মুগ্ধ লোচন···নবীন নির্মল বিভাতে। —গী ১৫৩/৩৬৮

আলোর দহন ॥ সে-চুম্বনে উচ্ছলিল জ্বালার তরঙ্গ মোর প্রাণে/অগ্নির প্রবাহ। —র ১৪/৪৩

আলোর মৃদু আঘাত ॥ জাগাও তারে ঐ নয়নের আলোক হানি। —গী ২২/৪০

আলোর অঙ্গুলিপীড়ন ॥ বিজুলি তার বীণার তারে আঘাত করে বারে বারে। —গী ৪৬৫/১০০

আলোর কঠিন আঘাত ॥ তোমার খড়্গ আঁধার-মহিষে দু'খানা করিল কাটিয়া। —'সুপ্রভাত'

আলোর বিচ্ছুরণ ॥ শেফালির শিশিরচ্ছুরিত/উৎসুক আলোক। —র ১৪/৪৪

আলোর বিদারণ ॥ বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে··· —র ৭/১৮৪

আলোয় ভেদন ॥ রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি এসেছে তিমির ভেদিয়া। 'সুপ্রভাত'

আলোর দংশন ॥ বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে। —র ১৪/২৩

কিন্তু পৃথকৃভাবে কেবল 'আলো'র স্পর্শের দৃষ্টান্ত আর বাড়াতে চাই নে। এবার সব মিলিয়ে সাধারণ-ভাবে সকল বস্তুতে দৃষ্টিচেতনার বিভিন্ন রকমের স্পর্শলক্ষণ বা স্পর্শগুণ তাঁর কাব্যে কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তাই খানিকটা দেখা যাক :

বায়ব্যগুণ : দৃষ্টির ॥ চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন। —গী ৩২৮/১৪৬

রঙের ॥ রঙের ঝড় উচ্ছ্বসিল গগনে। —র ১৮/২৪৫

বাষ্পগুণ : রঙের ॥ সন্ধ্যা মেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়। —র ১৪/৩৬

তরলগুণ : আকাশের ॥ ঝাঁপ দিয়েছি আকাশরাশিতে। —র ১২/৪১

আলোর ॥ আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি। —র ১১/৩৬৪

রঙের ॥ ঝরো-ঝরো ঝরো-ঝরো ঝরে রঙের ঝরনা। —গী ৫২৯/২৫৮

কোমলের ॥ শিউলি ফুলের তিন বছরের পরশ দিয়ে ধোওয়া। —র ১৪/১২১

দেহরূপের ॥ তোমার রূপে মরুক ডুবে আমার দুটি আঁখিতারা —গী ৩১/৬২

দেহের ॥ সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন। —র ২/৮২

বিশ্বরূপের ॥ রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি —গী ২৩৮/৬০৭

কোমলগুণ : আকাশের ॥ গগন ভরা পরশখানি লাগে সকল গায়। —র ১১/৩৯

আলোর ॥ চাঁপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়া
অরুণকিরণ কোমল করিয়া। —র ২/১২০

ছায়ার ॥ এমনি ক'রে কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমালবনে। —র ৭/২৯৮

আলো-ছায়ার ॥ ঝিকিমিকি আলোছায়া লয়ে
কম্পিত অঙ্গুলি দিয়ে বিকাল বেলায়
বসন বয়ন কর বকুলতলায়। —র ৩/৭২

অন্ধকারের ॥ পুঞ্জ পুঞ্জ ভারে ভারে নিবিড় নীল অন্ধকারে —র ১১/৫৮

তরলের ॥ ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে। —র ৩/৫৫-৫৬

কঠিনের ॥ পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে। —র ২৫/৮৩

এ ছাড়া 'চোখের-দেখা'র কোমল স্পৃশ্যগুণটিও তাঁর বহু পঙ্‌ক্তিতে আশ্চর্যভাবে ধরা পড়েছে :

গাঢ়স্নেহ/চক্ষু দিয়ে লেহন করেছে মোর দেহ। —র ৪/১২৭

কিংবা দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে হাজারখানা চোখ। —র ২২/৫২

অথবা যেন কার মুগ্ধ নয়নের দৃষ্টিপাত
দশ অঙ্গুলির মতো পরশ করিছে
রভস-লালসে মোর নিদ্রালস তনু। —র ৩/১৭৭

কিন্তু 'কোমলে'র অনুভূতির দৃষ্টান্ত এইখানেই শেষ করা যাক।
এবার 'কঠিনে'র গুণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই পরবর্তী আলোচনায় যাচ্ছি।

কাঠিন্য গুণ : আলোর ॥ বাহিরিল রবি নবীন আলোকে দীপ্ত মুকুট মাজি —গী ২০০/৫০৫

বাষ্পের ॥ ইন্দ্রের অপ্সরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি লীলানৃত্যে করিছে বর্ষণ
যৌবন-অমৃতরস। —র ১৫/১১৬

তরলের ॥ ভরা নদী ক্ষুরধারা খর-পরশা —র ৩/৭

কোমলের কাঠিন্যগুণ আনা সহজ কথা নয়, তবু যিনি ইন্দ্রের অপ্সরীর করকঙ্কণের আঘাতে মেঘের 'বাষ্পপাত্র' 'চূর্ণ' করাতে পারেন, তির্যক্ ব্যঞ্জনার সাহায্যে তিনি 'কোমলে'র মধ্যেও খানিকটা কাঠিন্য সঞ্চার করেন—

জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া— —র ৭/১৮৬

কিংবা গেছে উড়ে জটাভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নভিন্ন দল
কক্ষচ্যুত ধূমকেতু লক্ষ্যহারা প্রলয় উজ্জ্বল
আত্মঘাত-মদমত্ত আপনারে দীর্ণ কীর্ণ করি
নির্মম উল্লাসবেগে— —র ১৪/২০

এসব পঙ্‌ক্তিতে তার আভাস পাওয়া যায়। এ ছাড়া—

সাধ্বী জননীর দৃষ্টি সমুদ্যত বাজ —র ৫/৭২

কিংবা চেয়ে রহে আড়ষ্ট কঠিন/পাষাণ পুত্তলি —র ৭/৩৬

এ-ধরনের পঙ্‌ক্তিতে 'দৃষ্টিকাঠিন্যে'র ইঙ্গিতও স্পষ্টই ফুটে ওঠে।

কিন্তু এ-প্রসঙ্গ আর নয়। দৃশ্যজগৎ বহুলবিচিত্র এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্পর্শানুভূতিসম্পৃক্ত বলেই এই পর্যায়ের দৃষ্টান্ত-সংখ্যা কিছুটা বেশি উদ্ধৃত করতে হল। তা ছাড়া আগেই বলেছি, এর সঙ্গে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত দৃষ্টান্তগুলিও— যেমন পর্বতের বাষ্পীভবন (গিরি সে বাষ্পমেঘ) কিংবা বাষ্পের পর্বতরূপ (মেঘ সে বাষ্পগিরি) কিংবা আগুনের শীতলতা (জলিছে শ্যামল শীতল অনলে) প্রভৃতির দৃষ্টান্ত অবশ্যই স্মরণীয়। এবার, এর বিপরীত ধরনের রূপান্তরের একটুখানি আভাস দেওয়া যাক্। বলা বাহুল্য, এই পর্যায়ের তুলনায় তাতে দৃষ্টান্তের 'প্রকার-ভেদ' স্বভাবতই কম হবে। আমরাও দৃষ্টান্তসংখ্যা একেবারে ন্যূনতম ক'রে নিচ্ছি।

স্পর্শ > দৃষ্টি

কল্পনা করলেই বুঝতে পারি, স্পর্শচেতনাকে চোখে দেখানো এমনিতে মোটেই সম্ভব নয়। তবু এই অসম্ভবকেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে বহু স্থানেই সম্ভব ক'রে তুলেছেন। এতে তাঁর আশ্চর্য রূপায়ণ-কৌশলগুলি লক্ষ্য করবার মতো। সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

স্পর্শের আলো ॥ পরশমণির প্রদীপ তোমার অচপল তার জ্যোতি —গী ৪৯/১০৬

স্পর্শের রঙ ॥ এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত। —গী ২০৪/৫১৬

স্পর্শের হাওয়ার রঙ ॥ ফাগুন-হাওয়ায় রঙে রঙে পাগল ঝোরা লুকিয়ে ঝরে। —গী ৫৩৯/২৮২

স্পর্শের তরল রূপ ॥ এ বিশ্বের স্পর্শের সাগর
আজ মোর সর্ব অঙ্গ করেছে মগন। —র ১৪/১০৩

কিংবা, তিমিরে তোমার পরশলহরী দোলে, —র ১৪/৩৮

স্পর্শের কোমল রূপ ॥ আকুল অঙ্গুলিগুলি করি কোলাকুলি
রচিছে সর্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ। —র ২/৮৭

কিংবা, ছন্দে আমার পাতি নাচের ফাঁদ। —র ১৪/১২১

সেই সঙ্গে এ-রকম তির্যক্ প্রতিরূপ অনেক স্থানেই চোখে পড়ে—

দিগন্তের ঐ নীল নয়নের ছায়াতে
কুসুম আজি বিকাশে মোর কায়াতে। —গী ২০৪/৫১৮

কিংবা ॥ তব নিকুঞ্জের মঞ্জরি যত আমারি অঙ্গে বিকাশে। —গী ৩৩/৬৬

কিংবা ॥ সেই প্রদোষের অন্ধকারে এল আমার অধরপারে
ক্লান্ত ভীরু পাখির মতো কম্পিত চুম্বন। —র ১৪/১০১

স্পর্শের কঠিন রূপ ॥ তোমার পরশরতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে। —গী ২০/৩৬

থাক্ এই পর্যন্ত। আগেই বলেছি, এ-পর্যায়ের রূপান্তর সাধারণত অভাবনীয়। তাহলেও রবীন্দ্রকাব্যে এর দৃষ্টান্ত নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নয়। এবার আসা যাক শ্রুতি ও স্পর্শ -চেতনায়।

শ্রুতি > স্পর্শ

শ্রুতিচেতনার সঙ্গে স্পর্শের যোগ এক হিসাবে খুবই স্বাভাবিক। কৃষ্ণের 'নাম' রাধার 'কানের ভিতর' দিয়ে 'মরমে' প্রবেশ করেছিল। গান শুনলে আমাদেরও খানিকটা অনুরূপ অভিজ্ঞতা ঘটে: গান আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। তবে শ্রুতিচেতনার স্বাভাবিক পরিণতি স্পর্শময় হলেও তাকে স্পর্শময় ক'রে দেখানো সহজ নয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সাদৃশ্যব্যঞ্জনার সাহায্যে বহু স্থানে তা দেখিয়েছেন। এখানে সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত বেছে নিচ্ছি:

সুরের শিহরণ: আকাশে ॥ আকাশ যবে শিহরি ওঠে গানে —গী ৭/৭

সুরের নিশ্বাস: আকাশে ॥ আকাশে যে-গান ঘুমাইছে নিস্পন্দ
তারাদীপগুলি কাঁপিছে তাহারি শ্বাসে। —র ১১/২৯২

সুরের হাওয়া ॥ সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে। — গী ৬/৪

সুরের স্পর্শ: তরলের: বৃষ্টি ॥ শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝ'রে পড়ুক ঝ'রে
তোমারি সুরটি আমার মুখের 'পরে বুকের 'পরে। —গী ৪৫/৯৮

: ঝরনা ॥ গানের ঝরনাতলায়, —গী ১৭/৩০

: প্রবাহ ॥ পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী। —গী ৬/৪

: তরঙ্গ ॥ আমার অঙ্গে সুর-তরঙ্গে ডেকেছে বান। —গী ৪৭৩/১২০

: কোমলের: তার অন্ত নাই গো যে-আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ···
কত সুরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন। —গী ১৩১/৩১২

: জাল ॥ চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি। —গী ৬/৪

: রেণু ॥ মৌমাছিরা ধ্বনি ওড়ায় বাতাস 'পরে। —গী ৫২২/২৪০

: গাঁথুনি ॥ ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে। —র ১৪/৬৫

: বাঁধন ॥ আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ
সুরের বাঁধনে। —গী ৩৫৯/২২২

শব্দের স্পর্শ : কঠিনের : তীর ॥ তীরের মতন পিপাসিত বেগে ক্রন্দনধ্বনি ছুটিয়া
হৃদয় হইতে হৃদয়ে পশিত, মর্মে রহিত ফুটিয়া। —র ২/২৪৬

: উত্তপ্ত ধারাল : বহ্নিশলা ॥ বিদ্ধিল বহ্নির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি
নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক। —র ৭/১০৬

সুরের স্পর্শ : শিশিরসিক্ততা ॥ শরৎ-শিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে। —গী ৩৭১/২৪৯

: দহনজ্বালা : তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে
সে-আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে। —গী ৭/৬

কিংবা নিত্য রবে প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা —গী ৫/১

আপাতত এই থাক্। এর পর আসা যাক এর বিপরীত পর্যায়ের রূপান্তরে।

স্পর্শ > শ্রুতি

কতকগুলি বিশেষ ধরনের স্পর্শের ফলে ধ্বনির জন্ম হলেও স্পর্শ চেতনাকেই আমরা ধ্বনিরূপে অনুভব করি নে। 'স্পর্শ' ধ্বনির কারণ হতে পারে, কিন্তু নিজে সে ধ্বনি নয়। এর দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রকাব্যেও সব সময় খুব বেশি পাওয়া যাবে না; কয়েকটি উদ্ধৃত করছি :

চুম্বনের ভাষা ॥ অধরের কানে যেন অধরের ভাষা —র ২/৭৮

দেহস্পর্শের সুর ॥ ওদের নীরব নিখিলে এখনি উঠছে কি
স্পর্শে স্পর্শে সুর··· মুখে মুখে অশ্রুত আলাপ। —র ১৬/৬২

কিংবা, তোমার পরশ আমার মাঝে সুরে সুরে বুকে বাজে। —গী ৩১/৬১

আলিঙ্গনের ঝংকার ॥ তোমার হৃদয়কম্প অঙ্গুলির মতো
আমার হৃদয়তন্ত্রী করিবে প্রহত
সংগীততরঙ্গধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি
সমস্ত জীবন ব্যাপি থরথর করি। —র ৩/৭১

রক্তধারায় ঝংকার ॥ রক্তধারার ছন্দে আমার দেহবীণার তার
বাজাক আনন্দে তোমার নামেরি ঝংকার। —গী ৫০/১০৮

তীক্ষ্ণ স্পর্শের ঝংকার ॥ ঝংকারি উঠিল মোর চিত্ত আচম্বিতে/কাঁটার সংগীতে। —র ১৫/৩৯

আবার কখনো কখনো ঘাসের উপর শিউলি-ঝরা থেকেও তির্যক্ ব্যঞ্জনায় সুর কিংবা ঝংকার উঠতে থাকে—

ললিত রাগে সুর ঝরে তাই শিউলিতলে। —গী ৪৯২/১৬৭

কিংবা, ভোরের বাতাসে/শেফালি ঝরিয়া পড়ে ঘাসে,
তারাহারা রাত্রির বীণার/চরম ঝংকার। —র ১৪/৮৬

আপাতত এইখানেই শেষ করা যাক। তাহলে আমরা ইন্দ্রিয়চেতনার ছয়টি বিভিন্ন পর্যায়ের রূপান্তরের খানিকটা আভাস পেলাম। এর আরো চোদ্দ রকমের 'প্রকার-ভেদে'র কথা আগেই বলেছি। অন্যত্র এদের বিস্তৃত আলোচনা করেছি ব'লে এখানে প্রত্যেক 'প্রকার-ভেদে'র কেবলমাত্র একটি ক'রে দৃষ্টান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হব :

দৃষ্টি>ঘ্রাণ ॥ আঁধার কুঁড়ির বাঁধন টুটে   চাঁদের ফুল উঠেছে ফুটে
তার···গন্ধ আমার গভীর ব্যথায় হৃদয়-মাঝে লুটে। —গী ৪২৯/৫

ঘ্রাণ>দৃষ্টি ॥ তোমার বুকের খসা গন্ধ-আঁচল রইল পাতা সে। —গী ৪৯০/১৬০

দৃষ্টি>স্বাদ ॥ কেবল আঁখি দিয়ে   আঁখির সুধা পিয়ে, —র ২/২৪৯

স্বাদ>দৃষ্টি ॥ শ্যামল রসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহ টানি। —গী ২০৯/৫২৮

শ্রুতি>ঘ্রাণ ॥ তুমি তাই পরালে মালা/সুরের গন্ধ-ঢালা। —গী ৫/১

ঘ্রাণ>শ্রুতি ॥ হঠাৎ যেন বাজল কোথায় ফুলের বুকের বেণু। —র ১৪/১৩২

শ্রুতি>স্বাদ ॥ শেষের পেয়ালা ভ'রে দাও হে আমার/সুরের সুরার সাকী। —র ১৪/৪২

স্বাদ>শ্রুতি ॥ মাধুরীর মঞ্জীরের গুঞ্জরিত ধ্বনি। —র ১৮/২০৭

স্পর্শ>ঘ্রাণ ॥ শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ/এখনো জড়িত তাহে। —র ৪/৯৫

ঘ্রাণ>স্পর্শ ॥ অঙ্গের কুঙ্কুম গন্ধ কেশধূপবাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস। —র ৭/১২৮

স্পর্শ>স্বাদ ॥ চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান। —র ২/৮৭

স্বাদ>স্পর্শ ॥ দেয়   সুধারস ধারে ধারে/মম   অঞ্জলি ভরি ভরি। —গী ২০৯/৫৩০

ঘ্রাণ>স্বাদ ॥ সৌরভ-সুধায় করে পরান পাগল। —র ২/৭৭

স্বাদ>ঘ্রাণ ॥ তোমার মদির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে। —র ৪/৮৩

এবারে আমাদের আলোচনা গুটিয়ে আনবার সময় হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যে বিভিন্ন পর্যায়ের যুগ্ম-ইন্দ্রিয়-চেতনার পারস্পরিক রূপান্তরের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের বক্তব্য যথাসম্ভব বিশদ করতে চেষ্টা করেছি। আর সামান্য কয়েকটি কথা বলেই বিদায় নেব। আমরা যেন এ-কথা মনে না-করি যে এতেই তাঁর কাব্যে ইন্দ্রিয়চেতনার সব রকম রূপান্তরের আলোচনা নিঃশেষিত হয়েছে। দুটির বেশি ইন্দ্রিয়চেতনার মিশ্রণ ও পর-পর রূপান্তরের অজস্র দৃষ্টান্ত তাঁর বহু পঙ্‌ক্তিতেই ছড়িয়ে আছে। তিনটির : যেমন—

দৃষ্টি>শ্রুতি>স্পর্শ ॥ অরুণ-আলোর ঝংকার মোর লাগল গায়ে। —র ১৫/১৫

কিংবা, ঘ্রাণ>শ্রুতি>স্পর্শ ॥ যে-সুর চাঁপার পেয়ালা ভরে/দেয় আপনায় উজাড় ক'রে। —গী ১৭/৩০

চারটির : যেমন—

দৃষ্টি>শ্রুতি>স্বাদ>স্পর্শ ॥ কিরণসংগীতে সুধা বরষে। —গী ১৩৪/৩২০

কিংবা, শ্রুতি>দৃষ্টি>ঘ্রাণ>স্পর্শ ॥ সুরের ফুলে গন্ধখানি ছন্দে বাঁধি গিয়াছে। —র ১৪/৩৩

এমন-কি পাঁচটির : যেমন—

দৃষ্টি>ঘ্রাণ>স্বাদ>স্পর্শ>শ্রুতি ॥ বর্ণে গন্ধে রূপে রসে তরঙ্গিত সংগীত-উৎসাহে। —র ১৫/৯১

—এ-ধরনের বহু বিচিত্র প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কখনো-বা একটি ইন্দ্রিয়চেতনা অপরটিতে গিয়ে, আবার দ্বিতীয়টি প্রথমটিতে ফিরে আসে—

দৃষ্টি>শ্রুতি ; শ্রুতি>দৃষ্টি ॥ বর্ণে বর্ণে আমি তাই ছন্দ রচিবারে চাই
সুরে সুরে গীতচিত্র করি। —র ১৫/১৪০

কিংবা, দৃষ্টি>শ্রুতি ; দৃষ্টি>শ্রুতি>দৃষ্টি ॥ সেদিন উষার নববীণাঝংকারে

মেঘে মেঘে ঝরে সোনার সুরের কণা। —র ১৫/২৩২

—এ-রকম দৃষ্টান্তও প্রচুর পাওয়া যাবে। কিন্তু আর দরকার নেই। আমাদের আলোচনা এইখানেই শেষ করছি, কেননা এই হচ্ছে এর যোগ্য উপসংহার। যে-কবি বলেন—

কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর, —গী ৩২-৩৩/৬৫

যিনি বলেন—

বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে, —র ১১/১১১

এ তাঁরই কাব্যলোকের রূপরসগন্ধস্পর্শসংগীতের বিচিত্র প্রকাশলীলার শেষ পর্যায়ের কথা, এ তাঁরই 'প্রকাশানন্দ চমৎকার'। 'বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ ক'রে তাকে বাইরে লীলায়িত' করতে গিয়েই তাঁর বিপুলবিস্তৃত সৃষ্টিধারা। বলাকায় কবি নিজের সত্তার বিবর্তন সম্বন্ধে বলেছেন—

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে— —র ১২/২২

তাঁর কাব্যলোকের ইন্দ্রিয়চেতনার জগৎ সম্বন্ধেও এ-কথা সত্য। সে-জগৎও অনুক্ষণ 'চুপে চুপে রূপ হতে রূপে, নানাভাবে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। বিচিত্র তরঙ্গমালায় প্রবাহিত এ যেন সত্যই এক 'বিরাট নদী'। এর তীরে হঠাৎ এক মুহূর্তে পরম বিস্ময়ে জেগে উঠে আমরাও বলি—

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়। —র ২৬/৪৮

এ আমাদের অন্তরের গভীর রসচেতনার প্রত্যয়।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৮৬১ - ১৯০৭

ফাদার পিয়ের ফালোঁ

"আগে আত্মীয় হবেন তার পরে সংশোধক হবেন— নইলে আপনার মুখের ভালো কথাতেও আমাদের অনিষ্ট হবে।"
"এখন আমাদের একমাত্র কাজ এই যে, যা-কিছু স্বদেশের তারই প্রতি সংকোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দেশের অবিশ্বাসীদের মনে সেই শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দেওয়া।"—'গোরা'

'সন্ধ্যা' সিডিশান মামলা ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের আদালতে শুরু হয়েছিল। তিন জন আসামীর মধ্যে প্রধান আসামী ছিলেন দৈনিক 'সন্ধ্যা' ও সাপ্তাহিক 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। জনগণের মনে সরকারের প্রতি বিক্ষোভ ও ঘৃণা সঞ্চার করার অভিযোগে ব্রহ্মবান্ধব অভিযুক্ত হলেন। মামলার কাজ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে প'ড়ে ক্যাম্বেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত হলেন এবং ২৭শে অক্টোবর তিনি অসমাপ্ত বিচারের মাঝখানে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে 'স্বরাজ' পত্রের প্রথম সংখ্যায় ব্রহ্মবান্ধব লিখেছিলেন :

"আমার ঘর নাই— পুত্রকলত্র কেহই নাই। আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া মনে করিয়াছিলাম যে নর্মদাতীরে এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া— সেই নিভৃতস্থানে ধ্যানধারণায় জীবন অতিবাহিত করিব। কিন্তু প্রাণে প্রাণে কি এক কথা শুনিলাম। কত চেষ্টা করিলাম— কথাটি ভুলিয়া যাইতে— কিন্তু যত ভুলিতে যাই তত ঐ কথাটি প্রাণে প্রাণে বাজিয়া উঠিতে লাগিল।

"কথাটি কি। ভারত আবার স্বাধীন হইবে— এখন নির্জনে ধ্যানধারণার সময় নয়— সংসারের রণরঙ্গে মাতিতে হইবে· ·

"শুনেছি মুক্তির সংবাদ। আমার জপতপ বাঁধন-ছাঁদন সব ঘুচিয়া গিয়াছে— আকুল পাগলপারা উধাও হইয়া বেড়াইতেছি। আর গোলাম-গড়ে থাকিতে চাই না— ঐ স্বরাজ-গড় গড়িতে— স্বরাজ-তন্ত্রের প্রজা হইতে আমার প্রাণ সদাই আনচান।

"এস তোমরাও এস— যদি মুক্ত হইতে চাও— যদি স্বাধীন হইতে চাও ত এস। পুরানো বাঁধন ছিঁড়িয়া এস— নূতন স্বরাজ-গড়ে আসিয়া নূতন তন্ত্র গ্রহণ করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হও।

"আর সংশয় করিও না— সন্দেহ করিও না— সংবাদ আসিয়াছে— ভারত স্বাধীন হইবে— বিলম্ব আর নাই।"

ব্রহ্মবান্ধব ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দৈনিক 'সন্ধ্যা' প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিলেন। তিন বৎসর ধরে সহজ ও সরস ভাষায় তাঁর সেই স্বদেশ-স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন অসংখ্য প্রবন্ধে। দেশের জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে নূতন আত্মীয়তার ভাব তিনি সঞ্চার করতে সচেষ্ট হলেন জনসাধারণের মনে। বাংলার পাল-পার্বণ[১] ও শিল্পসাহিত্য, জাতীয় সংস্কৃতি ও সমাজনীতির কথা 'সন্ধ্যা'য় আলোচিত হত।

১ 'ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা' পুস্তকে ব্রহ্মবান্ধবের যে রচনাগুলি সংকলিত হয়েছে তাতে 'বাংলার পাল-পার্বণ'-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী স্থান পেয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার নকলকারী শহুরে বাঙালীদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে তাদের স্বদেশবিমুখতা কশাঘাত করতেন ব্রহ্মবান্ধব।

"আমরা কলিকাতার লোকে বন্দেমাতরম্‌ বলি, কিন্তু মা বঙ্গলক্ষ্মী যে কি বস্তু তাহা জানি না। যাহারা দেশকে ভাল না বাসে— দেশের ইতিহাস শিক্ষা দীক্ষায় যাহাদের কোন শ্রদ্ধা নাই— তাহাদের আত্মমর্য্যাদা হয় না— আর মর্য্যাদা না হইলে সকলই বৃথা।"—৩রা জানুয়ারি ১৯০৬এ লিখিত পত্র থেকে

অনেক ভারতবাসীর মনে ইংরেজ শাসকদের প্রতি যে ভীরুতা ও দুর্বলতা-প্রসূত আনুগত্যের ভাব তখনও ছিল, ব্রহ্মবান্ধব সেটা দূর করতে ব্রতবদ্ধ হয়ে ইংরেজ-শাসনের মনুষ্যত্ববিনাশক ও সমাজধ্বংসী রূপ রূঢ় কঠোরতার সঙ্গে উদ্‌ঘাটন করতে লাগলেন। উগ্র জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র ব্রহ্মবান্ধব[২] নিরস্ত্র বিপ্লবের বার্তা ঘোষণা করে সর্বশ্রেণীর বাঙালী পাঠকের মনকে স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আদর্শে অনুপ্রাণিত করে চললেন। 'সন্ধ্যা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকাপন্থার সূচনা।" উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের চরিতকার প্রবোধচন্দ্র সিংহ 'সন্ধ্যা'র বিপুল জনপ্রিয়তা ও প্রভাব বর্ণনা করে বলেছেন: "দোকানের দোকানী-পশারী, জমিদারের সরকার, গোমস্তা, পাঠশালার গুরু-শিষ্য, রাস্তার মুটে, গাড়োয়ান সকলেই হাসিত কাঁদিত। জমিদার, গৃহস্থ, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, পুরনারী, বালক-বালিকা, যুবকবৃদ্ধ সকলেই কখন আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িত, কখন বা ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিত। কখন 'সন্ধ্যা' আসিবে, আজ 'সন্ধ্যা'য় কি লিখিয়াছে, এই জানিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া থাকিত।"

স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই নির্ভীক যোদ্ধা কে ছিলেন? ক্যাম্বেল হাসপাতালের সেই রোগশয্যায় ব্রহ্মবান্ধব তাঁর একজন সিন্ধী শিষ্য-বন্ধুকে একদিন বলেছিলেন: "Wonderful have been the vicissitudes of my life: wonderful has been my faith"। তাঁর জীবনসাধনার বিচিত্র রূপ এবং সেই মহৎ সাধনার মূলে তাঁর প্রেরণাদায়ী বিশ্বাসাদর্শ কী যে ছিল, এই প্রশ্ন করার বিশেষ প্রয়োজন আছে এই বৎসরে— ব্রহ্মবান্ধব ১৮৬১ সনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর শতবার্ষিকী এই বৎসরেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর-একটি কারণে তিনি এই বৎসরে খুব বিশেষভাবে স্মরণীয়— কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী -রূপে ব্রহ্মবান্ধব সংযুক্ত হয়েছিলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথকে 'বিশ্বকবি'[৩] আখ্যা দিয়েছিলেন, তিনিও বোলপুরের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কবির প্রথম সহযোগী হয়ে আশ্রমবাসীদের শিখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' নামে ডাকতে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের (১৩৪১) ভূমিকায় ব্রহ্মবান্ধবের কথা লিখেছেন:

"তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী; অপর পক্ষে, বৈদান্তিক, তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্যপ্রভাবশালী। অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।

---

২ শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায় 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' নামক গ্রন্থে স্বদেশী আন্দোলনে ব্রহ্মবান্ধবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

৩ এই সংখ্যার পৃ ১৯৪-৫ দ্রষ্টব্য।

"শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রথম সহযোগী পাই। এই উপলক্ষ্যে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে-সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।"

'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৪০ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধব প্রসঙ্গে লিখে সেই ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার কথা আর-একবার উল্লেখ করেছিলেন :

"তিনি জানতে পেরেছিলেন আমার সংকল্প, এবং খবর পেয়েছিলেন যে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই সংকল্পকে কার্যে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন।· ·অধ্যাপনার অধিকাংশ ভার যদি উপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদ — তাঁর এখনকার উপাধি অণিমানন্দ— বহন না করতেন তাহলে কাজ চালানো একেবারে অসম্ভব হত। তখন উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্চে।· ·শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সূচনার মূল কথাটা বিস্তারিত করে জানালুম। এই সঙ্গে উপাধ্যায়ের কাছে আমার অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।"

পরবর্তীকালে দু জন বন্ধুর মধ্যে মতান্তর হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্রহ্মবান্ধবের জাতীয়তাবাদী উগ্রতা এবং বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ ও রাজনৈতিক কর্মোন্মাদনা অপ্রিয় ও অবাঞ্ছনীয় লেগেছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের নাম অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সংযুক্ত হয়ে থাকবে দু জনের ক্ষণস্থায়ী তবু গভীর ও আন্তরিক বন্ধুত্বের কারণে। রবীন্দ্রসাহিত্যে সেই বন্ধুত্বের প্রভাব কয়েকটি স্থানে বিশেষ লক্ষণীয় বলে অনুমানও করা যেতে পারে।

ব্রহ্মবান্ধবের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি হুগলী জেলার খন্নান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। কলেজের পড়াশুনা বন্ধ করে সৈনিক হওয়ার মানসে তিনি গোয়ালিয়র যেতে চেয়েছিলেন দেশীয় রাজার অধীনে সামরিক শিক্ষা লাভ করতে। 'আমার ভারত-উদ্ধার' প্রবন্ধে তিনি পরবর্তীকালে তাঁর তরুণ বয়সের সেই স্বপ্ন ও দুঃসাহসিক অভিযান বর্ণনা করেছেন—

"অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া জল্পনাকল্পনা করিয়া স্থির করিলাম, গোয়ালিয়রে গিয়া সৈনিক হইব, যুদ্ধবিদ্যা শিখিব, ফিরিঙ্গি তাড়াইব। চারিজন বন্ধু ছুটিলাম। আমার টাকাকড়ি কিছুই ছিল না। দুই মাসের কলেজের মাহিনা মাত্র দশ টাকা সম্বল। আর তিনজন বন্ধুরও তথৈবচ, তবে আমার অপেক্ষা কিছু ভাল। ঐ অল্প টাকা লইয়া, বাড়ি হইতে পলাইয়া রেলে উঠিলাম।· ·"

অবশ্যই চারটি নাবালক বন্ধুকে গোয়ালিয়র থেকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হল। ভবানীচরণ কলিকাতার একটি কলেজে আবার পড়াশুনায় মন দিতে লাগলেন। তিনি তখন কেশবচন্দ্রের প্রতি প্রবল উৎসাহে আকৃষ্ট হয়ে তাঁরই প্রবর্তিত 'নববিধানে'র আদর্শে প্রভাবিত হন। কেশবের মাধ্যমে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসকে শ্রদ্ধা করতে শিখলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য পেলেন—

শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

"We were, for a long time, in personal contact with Paramahansa Ramkrishna. We admired him and loved him, and it is no exaggeration to say that we were loved in return. The sense of sin was very acute in him. Often and often we heard him earnestly supplicating God for forgiveness and mercy. . . His was a good and great soul. . ."—'Sophia', Vol. IV, October 1897.

কেশবচন্দ্রের ভক্ত-শিষ্য হয়ে তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন ধর্মচর্চা ও দেশসেবার প্রতি। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের পর প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে ধর্মগুরু-রূপে মেনে নিয়ে তিনি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। কেশব ও প্রতাপচন্দ্র দুজনেই তাঁকে যীশুখ্রীষ্টের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিলেন। ভবানীচরণ কেশবের 'বাইবেল ক্লাসে' যোগ দিয়েছিলেন। প্রতাপচন্দ্রও খ্রীষ্টকে একজন মহামানব বলে স্বীকার করতেন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর '*The Oriental Christ*' বইখানি ভবানীচরণের মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ইতিমধ্যে ভবানীচরণ কলেজের পড়া শেষ হলে শিক্ষকতা করতে শুরু করেছিলেন। সেই সময়ে নানান সভা-সমিতির কার্যে এবং কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদনায় তিনি প্রবল উৎসাহ নিয়ে আত্মনিয়োগ করলেন। 'কংকর্ড ক্লাব' ও 'কংকর্ড' পত্রিকা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—ক্লাবের উদ্যোগে দর্শন সাহিত্য ধর্মতত্ত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্কের ব্যবস্থা ছিল। অক্সফোর্ড মিশনের ধর্মপ্রাণ ও সুপণ্ডিত ফাদার টাউনসেণ্ড্ 'কংকর্ড ক্লাবে'র এক পাঠচক্রে বাইবেল ব্যাখ্যা করতেন এবং ভবানীচরণের আত্মীয় রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কংকর্ড' পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ধর্মজিজ্ঞাসু ও চিন্তাশীল ভবানীচরণ এই-সকল সাধক ও মনীষীর সংস্পর্শে এসে ব্যক্তিগত সাধনায় ও সত্যসন্ধানে মনোনিবেশ করতেন। দক্ষিণেশ্বরে ব্রাহ্মমন্দিরে, বাইবেল পাঠচক্রে তিনি যে-সব শিক্ষা লাভ করতেন, তাতে তাঁর মন গড়ে উঠছিল এক উদার সমন্বয়ের প্রাণপণ প্রচেষ্টায়। হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণ, সমাজ ও ধর্ম-সংস্করণের উদ্যোক্তা ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দ এবং খ্রীষ্টবাণী-প্রচারকের মিলিত প্রভাবে ভবানীচরণ তাঁর নিজের জীবনে বাংলা দেশের সেই উনবিংশ শতাব্দীর নানাবিধ প্রভাবশালী চিন্তাধারা ও আধ্যাত্মিক শক্তির সুষ্ঠু মিলনসাধনে প্রয়াসী ছিলেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে একজন সিন্ধী বন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি সিন্ধুদেশের অন্তর্গত হায়দ্রাবাদে একটি নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে সংস্কৃত-শিক্ষক-রূপে কাজ করতে গেলেন। এগারো বৎসর ধ'রে তিনি সেই সুদূর সিন্ধুদেশে থাকলেন, তাঁর জীবনে সেই সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল।

হায়দ্রাবাদে তিনি ব্রাহ্মমন্দিরে বক্তৃতা করতেন, শিখদের গুরুদ্বারে নানকের ধর্মমত বুঝতে চেষ্টা করতেন, সিন্ধী মুসলমান কবি শাহ আব্দুল লতিফের ধর্মমূলক কবিতাও পাঠ করতেন। খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর আকর্ষণ গভীরতর হওয়াতে তিনি খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বের অনুশীলনে নূতন আগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে the Harmony নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে ভবানীচরণ কেশবচন্দ্রের আদর্শানুসারে বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে সমন্বয়-সম্ভাবনা আলোচনা করতে লাগলেন। অবশেষে ভবানীচরণ মুক্তিদাতা খ্রীষ্টে পূর্ণ ও একান্ত বিশ্বাস রেখে অ্যাংলিকান চার্চে খ্রীষ্টীয় দীক্ষা গ্রহণ করলেন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি। ঐ বৎসরে ১লা সেপ্টেম্বর তিনি কাথলিক মণ্ডলীতে যোগদান করে তাঁর পূর্ব নাম ও উপাধি ত্যাগ ক'রে কাথলিক প্রথা অনুযায়ী একটি দীক্ষানাম গ্রহণ করলেন, খ্রীষ্টীয় দার্শনিক ও সাধুপুরুষ

সন্ত থিওফিলাসের নামটিকে সংস্কৃত রূপ দিয়ে তিনি হলেন ব্রহ্মবান্ধব (থিও=ব্রহ্ম, ও ফিলাস=বন্ধু বা বান্ধব)। উপাধি হিসাবে তিনি 'উপাধ্যায়' রাখলেন।

ব্রহ্মবান্ধবের খ্রীষ্টীয় সাধনা ও তাঁর দশবৎসরব্যাপী অকুণ্ঠ খ্রীষ্টনামপ্রচারের কথা ইতিপূর্বে অনেকে আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনিমানন্দ স্বামী নামে পরিচিত ব্রহ্মবান্ধবের একজন সিন্ধী শিষ্য *The Blade* নামক একটি পুস্তকে তাঁর গুরুর জীবনের সেই দিকটির বিস্তারিত বর্ণনা রেখে গিয়েছেন। 'সোফিয়া' ও 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী' নামে পর পর দুটি পত্রিকার সম্পাদনা করে এবং ভারতবর্ষের নানা শহরে বক্তৃতা করে তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করলেন অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে। তিনি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করে গেরুয়া পরতে লাগলেন। এই ঈশাপন্থী সন্ন্যাসী খ্রীষ্টবিশ্বাসী হলেও তাঁর ভারতপ্রীতি ও প্রগাঢ় দেশাত্মবোধ একটুও শিথিল হল না। তা সত্ত্বেও তাঁর অনেক ব্রাহ্ম ও হিন্দু বন্ধু তাঁর ধর্মান্তরগ্রহণে ও খ্রীষ্টধর্মপ্রচারে ক্ষুব্ধ হয়ে ব্রহ্মবান্ধবকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। তা ছাড়া খ্রীষ্টীয় দীক্ষা গ্রহণের পরে প্রথম কয়েকটি বৎসর ধরে ব্রহ্মবান্ধব নিজেই কতকটা অনুদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তর্কবিতর্কের দ্বারা তিনি তাঁর নবলব্ধ ধর্মাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়ে বহু বাগ্‌যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। তাঁর ভারতীয় ঐতিহ্য ও তাঁর নবীন খ্রীষ্টবিশ্বাস তখনও পূর্ণমাত্রায় সমন্বিত হয় নি। তবুও ব্রহ্মবান্ধবের খ্রীষ্টভক্তি যে কত গভীর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল সিন্ধুদেশে প্লেগের ভীষণ প্রকোপের সময়ে। তিনি তখন রোগীদের সেবাশুশ্রূষায় অপূর্ব বীরত্ব ও কৃচ্ছ্রসাধনার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করতে দ্বিধা করলেন না।

ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মবান্ধব এই কথা বুঝতে পারলেন যে, খ্রীষ্টীয় ধর্মকে তার বিদেশী আবরণ থেকে বিমুক্ত না করলে এবং ভারতীয় শিক্ষা সাধনা ও সংস্কৃতির মূল ভিত্তির উপর সেই বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম সুষ্ঠুভাবে বিকাশলাভ করতে পারবে না। তিনি বেদান্তদর্শন নূতন উৎসাহে অধ্যয়ন ক'রে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ ও ঔপনিষদ অধ্যাত্মবিদ্যার সারমর্ম উপলব্ধি করবার জন্য সাধনা করলেন। পাশ্চাত্ত্য জগতে গ্রীক দর্শন ও খ্রীষ্টবিশ্বাসের যেরূপ সম্মিলন ঘটেছে সেইরূপ সম্মিলন ঘটাতে হবে প্রাচীন হিন্দু দর্শন ও খ্রীষ্টীয় ধর্মের মধ্যে, এই বিশ্বাস তাঁর মনে বদ্ধমূল হতে লাগল।

সেই খ্রীষ্টীয় ধর্মের ভারতীয়করণ-প্রচেষ্টা তাঁর কাছে কেবলমাত্র হিন্দু ভারতবাসীদের আকৃষ্ট করবার policy হিসাবে বাঞ্ছনীয় বলে মনে হল না। খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রকৃত বিশ্বজনীনতা তিনি সম্যক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বলেই এইরূপ ভারতীয়করণ ভারতীয় খ্রীষ্টবিশ্বাসীর গুরুতর কর্তব্যরূপে ব্রহ্মবান্ধবের কাম্য ছিল।

> "ভারতবর্ষকে খৃষ্টধর্মের দিকে আকর্ষণ করতে হলে ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কার ও সাধনার মধ্য দিয়েই করতে হবে, তাদের উৎপাটিত করে তো নয়ই, তাদের সঙ্গে বিরোধ ঘটিয়েও নয়। মাটিকে অস্বীকার করে আকাশে ওড়ার কল্পনাতে তিনি সায় দেন নি। ভূমির প্রাণরস থেকে বিচ্ছিন্ন বা বঞ্চিত হলে বীজ কখনো মহীরুহতে পরিণত হয় না। অতীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে নাড়ীর সংযোগ না থাকলে কোনো ভাবাদর্শ স্থায়িত্ব লাভ করে না। এই গভীর দূরদৃষ্টি, এই অসাধারণ বাস্তবজ্ঞানের ধারক ও বাহক ছিলেন উপাধ্যায়।" —'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ', পৃ. ৫১

ব্রহ্মবান্ধব স্পষ্টভাবে দার্শনিক চিন্তাপ্রণালী ও ধর্মীয় মতবিশ্বাসের পার্থক্য নির্ণয় করতেন। ভারতীয়

দর্শনচিন্তার বিশেষত্ব কোনো ধর্মমতের উপর নির্ভর করে না, এই বিশেষত্ব হচ্ছে হিন্দু দর্শনের একনিষ্ঠতা। যে একনিষ্ঠ চিন্তাপ্রবণতা শুদ্ধাদ্বৈতবাদে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে, আরও সকল ভারতীয় দর্শনসম্প্রদায়ে তার লক্ষণ দেখা যায়। হিন্দুর হিন্দুত্ব এই ভিন্নকে অভিন্ন করার প্রবণতা ও বহুত্বের অতীত একত্বের উপলব্ধি করার সাধনার উপর নির্ভর করে। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব জৈন শিখ যেমন হিন্দু তেমনি সাংখ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ শাঙ্কর অদ্বৈত প্রভৃতি সর্বপ্রকার ভারতীয় দর্শনে সেই একই হিন্দুত্বের প্রকাশ ও বিকাশ হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ও রূপে।

"অনেকে হিন্দুচিন্তার সহিত হিন্দুধর্মমতসমূহ মিশাইয়া ফেলেন। তদ্রূপ য়ুরোপীয় চিন্তা বলিতে য়ুরোপে প্রচলিত ধর্মমত বোঝেন। এইরূপ অন্যান্য ধর্মারোপ ঘোর প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। য়ুরোপীয় চিন্তাপ্রণালীর প্রভাবস্থান পুরাতন গ্রীকদেশ। কিন্তু বর্তমান য়ুরোপীয় ও প্রাচীন গ্রীক ধর্মে আকাশপাতাল প্রভেদ। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, চিন্তাপ্রণালী ধর্মমত হইতে পৃথক। হিন্দুস্থানে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত হইয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছে; বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্য্যস্য মতং ন ভিন্নং— কিন্তু সমাহিত হইয়া দেখিলে সম্যক্ রূপে বুঝিতে পারা যায় যে একই চিন্তাস্রোত, সকল বিভিন্নতার নিম্নদেশে ধারাবাহিকক্রমে চলিয়া আসিতেছে। সেই একনিষ্ঠ চিন্তার গতি নির্ধারণ করা যাউক।" —'বঙ্গদর্শন' (১৩০৮), 'হিন্দু জাতির একনিষ্ঠতা'

চিন্তাক্ষেত্রে অভেদদর্শন যেরূপে ভারতীয় একনিষ্ঠতা থেকে সম্ভূত, সেইরূপে সমাজক্ষেত্রেও বর্ণাশ্রমধর্মে সেই হিন্দু জাতির একনিষ্ঠতা প্রকটিত হয়েছে বিপ্লব ও বিরোধ বর্জন করে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টিসমূহের অঙ্গাঙ্গি সম্বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করে।

"বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া বিয়োগদৃষ্টির বশীভূত হইয়া ঐ অচল অটল অমর হিন্দু সমাজকে যে দেখে— সে উহার অভেদ-মহিমা দেখিতে পায় না। কিন্তু যোগদৃষ্টিতে দেখ তো বুঝিতে পারিবে যে উহার অচলতায় সকল বিপ্লবচাঞ্চল্য বিলীন হইবে— উহার উদারতায় সকল ভেদ-বিরোধের সমন্বয় হইবে— উহার পূর্ণতায় বৈষম্য সুষমায় পর্যবসিত হইবে— উহার যোগমহিমায় সকল সংঘর্ষ ভূমানন্দের শান্তিলাভ করিবে।"

— 'স্বরাজ', ফাল্গুন ১৩১৩, অনুষ্ঠান-পত্র

ব্রহ্মবান্ধব একসময়ে আশা করেছিলেন যে, তিনি নর্মদাতীরে একটি আশ্রম স্থাপন করে এমন একদল ঈশাপন্থী সন্ন্যাসী গড়ে তুলতে পারবেন যাঁরা ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে গৃহীতদেহ ভগবান যীশুর একান্ত উপাসক হয়ে তাঁদের আচার-ব্যবহার বেশভূষা প্রভৃতির দিক থেকে হিন্দু হয়ে থাকবেন। বেদান্তদর্শন ও বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতি আস্থাবান হয়ে তাঁরা খ্রীষ্টের নাম প্রচার করবেন ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে।

কাথলিক মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষস্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি এবং অনেক ভারতীয় খ্রীষ্টধর্মী ব্রহ্মবান্ধবের এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য সঠিকরূপে বুঝতে না পেরে তাঁর প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠলেন। তিনি শেষপর্যন্ত তাঁর মঠ-স্থাপনের সংকল্প পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। নর্মদাতীরের শান্ত পরিবেশ ছেড়ে তিনি বাংলা দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাঁর খ্রীষ্টবিশ্বাস ক্রমে ক্রমে গভীরতর হয়েছিল, তাঁর বেদান্ত-দর্শনের উপলব্ধিও স্পষ্টতর হয়ে উঠল। তিনি সেই সময়ে অপূর্ব মানসতীক্ষ্ণতার সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের বিষয়ে ও শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের বিষয়ে বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন। তিনি খ্রীষ্টধর্মের নিগূঢ়তম তত্ত্ব অর্থাৎ ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের অখণ্ড একতায় অভিন্নস্বরূপ

তিনজন পরম পুরুষের সেই রহস্যাবৃত অস্তিত্বের কথা এবং খ্রীষ্টীয় দেহগ্রহণ-তত্ত্বের কথা বৈদান্তিক ভাষায় আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর রচিত কয়েকটি সংস্কৃত স্তোত্র আজও বাংলা দেশের গির্জায় গির্জায় গীত হয়ে থাকে।—

বন্দে সচ্চিদানন্দম্
ভোগিলাঞ্ছিত-যোগিবাঞ্ছিত চরমপদম্
পরমপুরাণপরাৎপরম্
পূর্ণম্ অখণ্ডপরাবরম্
ত্রিসঙ্গশুদ্ধম্ অসঙ্গবুদ্ধদুর্বেদম্ ॥
পিতৃসবিতৃপরমেশম্ অজম্
ভববৃক্ষবীজম্ অবীজম্।
অখিল-কারণম্ ঈক্ষণসৃজন-গোবিন্দম্ ॥
অনাহতশব্দম্ অনন্তম্
প্রসূত-পুরুষসুমহান্তম্
পিতৃস্বরূপ-চিন্ময়রূপ-সুমুকুন্দম্ ॥
সচ্চিদো মেলনসরণম্
শুভ শ্বসিতানন্দ ঘনম্।
পাবনজবন-বাণীবদন-জীবনদম্ ॥

ব্রহ্মবান্ধব ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-কলিকাতায় একটি ক্ষুদ্র বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর আদর্শ ছিল প্রাচীন আর্য গুরুকুলের অনুযায়ী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়াতে ব্রহ্মবান্ধব তাঁর সহকর্মী রেবাচাঁদ ও তাঁর কয়েকটি ছাত্র নিয়ে বোলপুরে গেলেন 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' স্থাপনের কার্যে সহযোগিতা করতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়' পুস্তকে লিখেছেন—

"এই সময়েই আমি বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করি। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তখন আমার সহায় ছিলেন, তখন তাঁহার মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক উৎসাহের অঙ্কুরমাত্রও কোনোদিন দেখি নাই— তিনি তখন এক দিকে বেদান্ত অন্য দিকে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানধর্মের মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন। কোনোকালেই বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা আমার না থাকাতে উপাধ্যায়ের সহায়তা আমার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল।" — ২৮শে ভাদ্র ১৩১৭

ব্রহ্মবান্ধব কয়েক মাস মাত্র বোলপুরে ছিলেন। তিনি ৫ই অক্টোবর ১৯০২ সনে ইংল্যাণ্ডের অভিমুখে রওনা হলেন। স্বামী বিবেকানন্দের অকালমৃত্যুতে বিচলিত হয়ে তিনি স্থির করেছিলেন যে, স্বামীজীর আরব্ধ কার্যের কিছুটা ভার নিজের স্কন্ধে নিয়ে তিনি পাশ্চাত্য জগতে বেদান্তের সত্যকার বাণী প্রচার করতে যাবেন। তা ছাড়া ভারতবর্ষে তাঁর বেদান্তদর্শনের খ্রীষ্টীয় ব্যাখ্যা ও তাঁর খ্রীষ্টীয় ধর্মকে ভারতীয় রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা স্থানীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর সমর্থন না পাওয়াতে তিনি আশা করেছিলেন যে, পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টীয়ানেরা তাঁর যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন এবং কাথলিক মণ্ডলীর পরমগুরু পোপ মহোদয় তাঁর সঙ্কল্পকে মঞ্জুর করে আশীর্বাদ করবেন। লণ্ডনে উপাধ্যায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন 'ভারতে খৃষ্টান ধর্ম' সম্বন্ধে।

বিদেশী খ্রীষ্টীয়ান ধর্মপ্রচারকদের প্রচারপ্রণালীর সমালোচনা ক'রে তিনি তাঁর নিজের আদর্শ বর্ণনা করলেন। খ্রীষ্টের নাম ও বাণী প্রচার করে ভারতকে কাথলিক মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করতে তিনি একান্তভাবে চাইছেন কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্য ও ভারতীয় সমাজের 'হিন্দুত্ব' বিসর্জন দিতে তিনি একেবারে নারাজ। উপাধ্যায় লণ্ডনে অক্স্‌ফোর্ডে ও কেম্ব্রিজে বেদান্ত সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তা সাদরে গৃহীত হয়েছিল এবং বহু পণ্ডিতব্যক্তি ভারতীয় দর্শনের বিষয়ে আরও জানতে ইচ্ছুক হয়ে পাশ্চাত্ত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদর্শন অধ্যাপনার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন।

উপাধ্যায় কিন্তু ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। বিলাতে থাকার সময়ে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর মাতৃভূমির পরাধীনতার গ্লানি, এবং ভোগলিপ্সু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতীয় সংস্কৃতির মহিমা নূতন উদ্দীপনার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।

ব্রহ্মবান্ধবের জীবন ও সাধনার শেষ চারটি বৎসর বাংলা দেশের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতমরূপে জড়িত। রাজনীতির বাত্যাবিক্ষুব্ধ স্রোতে গা ভাসিয়ে তিনি বাংলার জনগণকে স্বদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ভারতবর্ষ পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠ না হলে খ্রীষ্টীয় ধর্মের বিকাশ এই দেশে সম্ভবপর হবে না, তিনি এই দৃঢ়বিশ্বাসের প্রেরণায় বিপ্লবী হলেন।

'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' গ্রন্থখানির রচয়িতারা বিপ্লবী সন্ন্যাসীর এই আশ্চর্য সংগ্রাম ও সাধনা সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। 'স্বরাজ' ও 'সন্ধ্যা' কাগজ দুটির সম্পাদনা, 'ডন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে ব্রহ্মবান্ধবের সহযোগিতা, 'সোনার বাংলা' পুস্তিকার প্রকাশ, শিবাজী-উৎসবের আয়োজন ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা ঐ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

দু-একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' সম্বন্ধে দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কয়েকজন বিদেশী মিশনারীর অসঙ্গত ও ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করতে গিয়ে ব্রহ্মবান্ধব সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছিলেন যে, বৈদান্তিক ঐতিহ্যের অবতারতত্ত্ব ও খ্রীষ্টীয় ধর্মের দেহগ্রহণতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। ব্রহ্মবান্ধবের মতে যীশুকে অবতার বলা উচিত নয়, কারণ মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য গৃহীতদেহ ও উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ভগবান সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস এবং ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে 'গীতা'র শিক্ষা একেবারে পৃথক।

তাঁর মৃত্যুর দু মাস আগে ব্রহ্মবান্ধব তাঁর বর্ণাশ্রমবিধিলঙ্ঘনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেন। সেই প্রায়শ্চিত্ত-সাধনের ব্যাপারে তাঁর অনেক খ্রীষ্টায়ান বন্ধু বিস্মিত হয়েছিলেন, তাঁর অনেক হিন্দু বন্ধু ভুল করে ভেবেছিলেন যে তিনি খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করেছেন। ব্রহ্মবান্ধবের প্রায়শ্চিত্ত ছিল একটি নিছক সমাজগত কর্তব্যপালন; তিনি পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নকে প্রায়শ্চিত্তক্রিয়ার আগে জানিয়েছিলেন যে, যীশুখ্রীষ্টে পূর্ণ বিশ্বাস রেখেই তাঁর বিলাতযাত্রার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন।

ব্রহ্মবান্ধব তাঁর জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর খ্রীষ্টবিশ্বাস অম্লান ও অবিচলিতভাবে রক্ষা করেছেন। গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত যে বাড়িতে তিনি মাঝে মাঝে উপাসনা করতে যেতেন, আমি বহুদিন আগে সেই বেলিয়াঘাটার বন্ধুগৃহে তীর্থ করতে গিয়েছিলাম। উপরতলায় একটি সাধারণ ঘরে তখনও ব্রহ্মবান্ধবের উপাসিত ক্রুশ-মূর্তি দেওয়ালে টাঙানো ছিল। শুনলাম, হিন্দু রীতি অনুসারে তিনি চন্দন দিয়ে ক্রুশ-মূর্তিখানি ভূষিত করতেন। তাঁর নীরব ধ্যানে তিনি ক্রুশবিদ্ধ মুক্তিদাতার কাছ থেকে প্রাচীন ভারতের ত্যাগাদর্শ তাঁর

জীবনে বাস্তব করে তুলবার শক্তি প্রার্থনা করতেন। হিন্দু-ভারতের অধ্যাত্মবিদ্যা খ্রীষ্টের কৃপায় সমগ্র দেশ ও জাতির জীবনে বিকশিত হবে, ভারতীয় ঐতিহ্য ও খ্রীষ্টভক্তি সম্মিলিত হবে জীবনপ্রদ নূতন একটি স্রোতোধারায়, এটি ছিল ভারতীয় বীরসন্ন্যাসী ঈশাপন্থী বৈদান্তিক ব্রহ্মবান্ধবের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা।[৪] তাঁর মৃত্যুশয্যায় তিনি খ্রীষ্টকেই ডাকতে ডাকতে প্রাণত্যাগ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধবকে বিস্মৃত হন নি। রবীন্দ্রনাথীয় সাহিত্যে ব্রহ্মবান্ধবের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব দুটি বিশেষ স্থানে লক্ষণীয়।

'চার অধ্যায়' উপন্যাসে বিপ্লবপন্থী ইন্দ্রনাথের দুর্বোধ্য ও কঠিন ব্যক্তিত্বের যে রূপ রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়েছেন, তার অঙ্কনে তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধি ব্রহ্মবান্ধবকে স্মরণ করেছেন। ইন্দ্রনাথের তার্কিক তীক্ষ্ণতা ও চারিত্রিক কঠোরতা, বিপ্লব-নেশায় ইন্দ্রনাথের উদ্দীপ্ত নায়কত্ব এবং শক্তিপরীক্ষায় তাঁহার দুঃসাহস ও একান্ত দ্বিধাহীন মোহমুক্ত মনোনিবেশ ব্রহ্মবান্ধবের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সন্দেহ নেই। তাতে ব্রহ্মবান্ধবের প্রতি অবিচার করা হয়েছে এবং ইন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের পূর্ণাঙ্গীণ সাদৃশ্য না থাকলেও সেই সাদৃশ্যের যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তা সমীচীন হয় নি, অনেকে এই অভিযোগ একদিন করেছিলেন। তা হলেও এই কথাটি তর্কের অতীত বলে মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট এই ইন্দ্রনাথ-চরিত্র ব্রহ্মবান্ধবের অদ্ভুত চরিত্রের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছে।

'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যুর দীর্ঘ সাতাশ বৎসরের পরে রচিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যে উৎকৃষ্টতর উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন, সেই 'গোরা' উপন্যাসটি ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যুর পর থেকেই দুটি বৎসর ধরে ধারাবাহিক ভাবে 'প্রবাসী' পত্রিকার জন্য রচিত হয়েছিল। গোরা-চরিত্রই ইন্দ্রনাথ-চরিত্রের চেয়ে ব্রহ্মবান্ধবের অনেকাংশে সদৃশ।

অবশ্যই সৃষ্টিধর্মী ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ যে বাস্তব মানুষটিকে অবলম্বন করে কিংবা উপলক্ষ্য করে গোরা-চরিত্র উদ্‌ভাবন করেছেন সেটিকে তিনি শিল্পী-সুলভ স্বাধীনতায় সম্পূর্ণরূপে পুনঃসৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। 'শা-জাহান' কবিতাটির প্রেমবিহ্বল সম্রাট যেমন ঐতিহাসিক দিল্লীশ্বর থেকে স্বতন্ত্র, তেমনিও 'গোরা' উপন্যাসের নায়ক গৌরমোহন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ব্রহ্মবান্ধব থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু গোরা-চরিত্র কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি-বিশেষের হুবহু প্রতিচ্ছবি না হলেও কল্পিত গোরা ও বাস্তব ব্রহ্মবান্ধবের অপূর্ব সহধর্মিতা অবশ্যস্বীকার্য বলে বিশ্বাস করি।

পরেশবাবুর চরিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ কতক পরিমাণে নিজের আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রকাশ করেছেন। বিনয়-চরিত্রটির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথেরই কোমল হৃদয়ের আবেগপূর্ণ অনুভূতিশীলতার কিছুটা আভাস লক্ষিত হয়। পরেশবাবুর সঙ্গে ও বিনয়ের সঙ্গে গোরার যেসব আলোচনা ও তর্কের কথা উপন্যাসটির মধ্যে স্থান পেয়েছে তাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বোলপুর আশ্রমের পথে পথে ব্রহ্মবান্ধবের আন্তরিকতাপূর্ণ কথাবার্তার প্রতিধ্বনি

---

৪ কেউ কেউ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, ব্রহ্মবান্ধব মণ্ডলীচ্যুত (excommunicated) হয়েছিলেন। কথাটি ভুল। তিনি কোনোদিন কাথলিক মণ্ডলীর প্রতি তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ আনুগত্য পরিত্যাগ করেন নি এবং যদিও খ্রীষ্টমণ্ডলীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে তুলনামূলক ধর্মালোচনা পত্রিকায় প্রকাশ করতে এক সময় তাঁকে নিষেধ করেছিলেন তা হলেও তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও তাঁর প্রকাশিত রচনাগুলিকে কোনোকালেই ভ্রান্ত এবং খ্রীষ্টধর্মবিরোধী বলে বিচার করা হয় নি। excommunicationএর কথা ভিত্তিহীন।

শোনা যায় বলে মনে করি। বিনয় গোরার কথা শুনে বন্ধুর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার দ্বারা অভিভূত হন, পরেশবাবু গোরার নানান ধর্মসমস্যার সমাধানে এক প্রশান্ত ও উদার আধ্যাত্মিকতার ভাব প্রকাশ করেন এবং সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে গোরাকে দেখিয়ে থাকেন তাঁর সাত্ত্বিক ও বিরোধাতীত সহিষ্ণুতা ও পূর্ণতার আদর্শ। এই দুটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধবের প্রতি তাঁর মনোভাবের দুটি ভিন্ন অবস্থা যেন রূপায়িত করেছেন— তাঁর প্রতি যে অলঙ্ঘ্য আকর্ষণ তিনি প্রথম আলাপ-পরিচয়ের সময় অনুভব করেছিলেন এবং পরিণততর অভিজ্ঞতা ও সাধনাগুণে পূর্ণতর জ্ঞানোপলব্ধির আলোকে তাঁর মতামত ও কর্মপদ্ধতির তিনি যে বিচার ও সমালোচনা করেছিলেন কিংবা প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে ব্রহ্মবান্ধব ও তাঁর আদর্শের প্রতি যে আকর্ষণ ও বিরোধিতা -জাতীয় বিপরীত ভাব দুটির সংঘর্ষ হয়েছিল তার প্রকাশ পাই বিনয় ও পরেশবাবুর সঙ্গে গোরার বন্ধুত্ব ও সম্বন্ধ -বর্ণনায়।

গোরার চরিত্রটি বড় অদ্ভুত। ব্যাকুল ও একনিষ্ঠ সাধনায় অনমনীয় কঠোরতার সঙ্গে তিনি যে দেশভক্তির পথ অনুসরণ করেন, সেই পথে তিনি এগিয়ে চলেন সংগ্রামরত সৈনিকের মত। তিনি কিন্তু গভীর চিন্তাশীলতা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের বহুবিধ প্রমাণ দিয়ে থাকেন। তর্কের উদ্দীপনায় তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির শাণিত অস্ত্র তিনি নির্মমভাবে চালান কিন্তু ধ্যানীর ন্যায় তিনি তাঁর দেশ ও জাতির স্বপ্নময় মূর্তির অবলোকনে মগ্ন হয়ে পড়েন। হিন্দু ভারতের সনাতন ধর্মের আদর্শ তিনি তাঁর স্বদেশী লোকদের মনে-প্রাণে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ব্রতবদ্ধ হয়ে অসহিষ্ণু উৎসাহে ও প্রচণ্ড উগ্রতায় বর্ণাশ্রমধর্মের মহিমা প্রচার করেন। অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে হিন্দুধর্মের নিয়ম ও আনুষ্ঠানিক আচার পালন করেন, কিন্তু তিনি যে প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টীয়ান, তাঁর সেই জন্মরহস্য নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে উপন্যাসের শেষে উদ্‌ঘাটিত হয়। বার বার গোরার কথা শুনেই ব্রহ্মবান্ধবের সেই 'সন্ধ্যা' ও 'স্বরাজ' -এর স্মৃতি মনে জাগে। গোরার গ্রেফতার এবং বিদেশী বিচারকের সামনে তাঁর উদ্ধত ও বীরত্বপূর্ণ মনোভাবের প্রকাশ, গঙ্গার তীরে গোরার প্রায়শ্চিত্ত-ক্রিয়ার সম্পাদন, প্রাচীন ভারতের অতীত গৌরবের প্রতি গোরার আবেগপূর্ণ আকর্ষণ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবনব্রত ও তাঁর গভীর দেশভক্তির কথা বাঙালি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয়।—

"'একটি সত্য ভারতবর্ষ আছে— পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ, সেইখানে স্থিতি না হলে আমরা কি বুদ্ধিতে কি হৃদয়ে যথার্থ প্রাণরসটা টেনে নিতে পারব না।· ·সাধে আমি ভারতবর্ষের সত্য মূর্তি, পূর্ণ মূর্তি কোনোদিন ভুলতে পারি নে!'

"বিনয়। এ-সব কেবল উত্তেজনার কথা নয়? এ তুমি সত্য বলছ?

"গোরা মেঘের মতো গর্জিয়া কহিল, 'সত্যই বলছি।'

"বিনয়। যারা তোমার মতো দেখতে পাচ্ছে না?

"গোরা মুঠা বাঁধিয়া কহিল, 'তাদের দেখিয়ে দিতে হবে। এই তো আমাদের কাজ। সত্যের ছবি স্পষ্ট না দেখতে পেলে লোকে আত্মসমর্পণ করবে কোন্ উপছায়ার কাছে? ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ মূর্তিটা সবার কাছে তুলে ধরো— লোকে তা হলে পাগল হয়ে যাবে। তখন কি দ্বারে দ্বারে চাঁদা সেধে বেড়াতে হবে? প্রাণ দেবার জন্য ঠেলাঠেলি পড়ে যাবে।' "

'বিশ্বকবি'

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মনেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। এখন তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু তাঁকে এখনও মনে হয় সদ্য ফোটা চাঁপা ফুলের মত যুবক বলে। তাঁর কোকিলের মত কালো চুল, পদ্মের মত চোখ, শিল্পীর আঁকা ভ্রূ-যুগল, তীক্ষ্ণ নাক, হাঁসের মত গলা এবং সোনার বর্ণে রঞ্জিত উন্নত দেহের মহিমা রাফেল কিংবা এঞ্জেলোর ছবির উপকরণ হবার উপযুক্ত।

কিন্তু তাঁর দেহসৌষ্ঠবের তুলনায় তাঁর কবিতা অনেক বেশি মহৎ, অনেক বেশি সুন্দর, অনেক বেশি উচ্চাঙ্গের। তিনি যৌবনে প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সুমিষ্টস্বর ছোট পাখির মত প্রেমের গান গেয়েছেন। তিনি শিশিরে ভেজা ভরত পাখির মত প্রভাতের আলোকপ্লাবনে বিচরণ করতে চেয়েছেন। চাতকের মত তিনি জলভারাবনত মেঘের জন্য তৃষ্ণাতুর হয়ে আকাশে উড়তে প্রয়াসী। জ্যোৎস্নালোকের প্লাবনে যখন পৃথিবী রজতশুভ্র তখন চকোরের মতই তিনি চন্দ্রালোকের দিকে ধাবিত। নানারঙের পাখির সুমিষ্ট কলকাকলিতে মুখরিত গোলাপকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণ করেছেন। ছোট নদীর উজ্জ্বল নুড়ির সঙ্গে তিনি খেলা করেছেন এবং সূর্যের সোনালিরেখা নদীর বুকে যে রামধনুর লুকোচুরি আঁকে তার দিকে চেয়ে থাকতে তাঁর দৃষ্টির বিরাম ছিল না। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির এমন কোনো সৌন্দর্য নেই যার সঙ্গে তাঁর যৌবনচেতনা মন মেলায় নি, অথবা তিনি যার মন পান নি। কিন্তু গোলাপকুঞ্জে ভ্রমণ করলেও কিংবা কুমুদ ফুল -শোভিত সরোবরে বিলসিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে একটি বিষণ্ণ অনুভূতি ছিল যা আনন্দের আতিশয্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, ইন্দ্রিয়কামনার উত্তাপকে শুচি করেছে, এবং তাঁর ভাবাতুর গীতিকবিতাগুলির প্রাণকেন্দ্রে যে আলোকের প্লাবন প্রবাহিত ছিল এই বিষণ্ণ অনুভূতি একটা আড়াল রচনা করে কবিতাগুলিকে পরিণামরমণীয় করে তুলেছে। তাঁর গানের সুর মধ্যাকাশকে বিদীর্ণ করে দিত এবং তা স্বর্গলোকের দ্বারে অভিঘাত রচনা করে অবশেষে পৃথিবীর বুকে বেদনার্ত বিকম্প অশ্রুর মত ঝরে পড়ত। অরণ্যপ্রান্তর মুখরিত কোকিলের স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ঐশ্বর্যবিমণ্ডিত কুহুধ্বনির চেয়ে তাঁর সংগীত নিঃসঙ্গ ঘুঘুর বিরহ-মূর্ছনার সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর এই বিষণ্ণতাই মানুষের সুখদুঃখ বিরহানুভূতির প্রবক্তা রূপে তাঁকে পরিচিত করেছিল। যিনি তাঁর প্রকৃতির প্রতিশোধে ভাগ্যহত বালিকার প্রতি পিতৃস্নেহ বঞ্চিত হতে দেখেছেন তিনি চোখের জল না ফেলে থাকতে পারবেন না। একটি সদ্য প্রস্ফুটিত বাঙালি বালিকার দিব্যমহিমায় আকৃষ্ট হয়ে বলিষ্ঠ ফলবিক্রেতা কাবুলিওয়ালার করুণার প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার দৃশ্য দেখে এমন কি কেউ নিষ্ঠুরহৃদয় আছেন যিনি করুণায় বিগলিত হবেন না? টেনিসনের 'ইন মেমোরিয়াম' এবং শেলির 'এপিসাইকিডিয়ন' ছেড়ে দিয়ে এই চরিত্রের [কাবুলিওয়ালা] তীক্ষ্ণতম বেদনা ও অতৃপ্ত ভালোবাসার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে সকলেই চরিত্রটির সঙ্গে সহানুভূতি বোধ করবে।

রবীন্দ্রনাথ কেবল প্রকৃতির ও প্রেমের কবি নন, তিনি অরূপের রূপকার। দিব্যদর্শনের কথা বাদ দিলে, কাণ্ট টেনিসন এবং নিউম্যান এই তিনজনকেই অপ্রাকৃত জগতের আধুনিক রূপকার বলা যেতে পারে। দুঃখিনী বঙ্গমাতা আর-এক জনকে জন্ম দিয়েছেন— তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ।

আমরা যখন যৌবনে নিবিড় প্রেম ও উত্তাপে ভরপুর তখন একদা আমরা তাঁর 'স্রোত'[১] কবিতাটি পড়ছিলাম। কবিতাটির বেগের আবেগ আমাদের নিয়ত ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল এবং পরিণামে এসে পৌছলাম প্রেম ও সৌন্দর্যের অসীম সাগরে। আমাদের প্রাত্যহিকতার তুচ্ছ খণ্ডাংশগুলি চিরন্তনের ধূসর বক্ষে বুদ্বুদের মত ক্ষণিক মনে হবে। আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তার নিঃসঙ্গতা পরিত্যাগ করে সমগ্রের সঙ্গে মিলিত হয়। আমরা বিচ্ছিন্ন থাকতে পারি নি। সমগ্রের অংশ হয়ে থাকতেই আমাদের সুখ। চরাচরের ঐকতানের আমরাও অংশভাক্ হয়েছিলাম। মধুলোভী ভ্রমরের মত আমরা ফুলে ফুলে বিচরণ করেছিলাম। আমরা কখনও সুখে গান গেয়েছি, কখনও বা দুঃখে অভিভূত হয়েছি।

আমরা জননীহৃদয়ের সুধা পান করেছি এবং স্নেহের টানে শিশুদের সঙ্গে খেলা করেছি। আমরা বুঝেছিলাম যে আমরা নিজেকে নিয়ে বিব্রত থাকতে আসিনি, বরং সকলের সঙ্গে আমরা আছি। আর এই ছোট 'স্রোত' কবিতাটি লেখা হয়েছিল এক অনায়াস মুহূর্তে। চরাচরব্যাপী সৌন্দর্যানুভূতিরই হোক অথবা অধ্যাত্মলোকমুখী ভালোবাসার প্রেরণাই হোক যখনই তিনি গেয়েছেন তখনই তিনি আমাদের অসীমলোকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। সৌরমণ্ডলের দীপ্ত আভায় আলোকিত আকাশ নিসর্গ ও জীবন নিয়ে এই পৃথিবী, প্রেম ও যুক্তিতে গড়া মানুষ তার সোনার কাঠির স্পর্শে অসীম পারাবারে শাশ্বত সৌন্দর্যসাগরের পরিব্যাপ্ত স্থির ও সমাহিত তরঙ্গকণায় রূপান্তরিত হয়েছে। তিনিই অরূপলোকের মিষ্টিক কবি। যদি কোনও বিদেশী বাংলাভাষার পাঠক হন তবে তিনি রবীন্দ্রনাথের জন্যই তা হবেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। তিনি যেন একটি দেবদারু বৃক্ষ, যার মূল মৃত্তিকার গভীর অন্ধকারে ব্যাপ্ত, আর তার উত্তুঙ্গ চূড়ায় আকাশকে বিদ্ধ করার শাসন—এমনই সেই বিশালতা। আকুলতা ও বেদনার মধ্য দিয়ে যাঁরা সৌন্দর্যানুভূতির সারটুকু পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ সেইসমস্ত দ্রষ্টার পংক্তিতে আসন পাবেন।

সাপ্তাহিক Sophia পত্রিকার ১ সেপ্টেম্বর ১৯০০ সংখ্যায় 'The World-Poet of Bengal' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। শ্রীসজনীকান্ত দাসের 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে মূল রচনা উদ্‌ধৃত আছে।

অনুবাদ শ্রীবিজিতকুমার দত্ত

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ব্রহ্মবান্ধবের পত্র

১

Calcutta : 20/1 Madan Mitra's Lane
Simla P.O. : 5th July, 1901.

My dear Sir,

I owe you an apology for not duly acknowledging receipt of your "Naivedya"[২]. I have roughly analysed it and found in it your divisions : (1) personal, (2) human, (3) national and (4) transcendental. I have not been able to discover a single

---

১ দ্র° প্রভাতসংগীত। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১

২ The Twentieth Centuryর জুলাই ১৯০১ সংখ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 'নৈবেদ্য' গ্রন্থের দীর্ঘ আলোচনা করেন। মূল প্রবন্ধটি শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীউমা মুখোপাধ্যায় -কৃত 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' গ্রন্থে উদ্‌ধৃত আছে।

theological flaw in the book. Its Theism is sound to the core. It is an embodiment of the essence of Bhakti made compatible with transcendence. I am tempted to write, not a critique, but certain reflections which may serve as a key to readers not initiated into the mysteries of the Infinite.

I am fated, as it were, to deal in hard metaphysics. Hence, my delight knows no bound when I find the highest truths of philosophy clothed in poetry. In olden times man was ruled by might ; now, by right. In heaven love will rule, and poetry is the flesh-and-blood countenance of Love. I do not exaggerate when I say that I have never seen—though it must be admitted that my experience is poor—Love, Union and Beauty, so nobly and sweetly expressed as they are—in "Naivedya."

My habits are very irregular and I am an inveterate rambler. Moreover, I am distracted with ten thousand engagements. To crown all, Nagen Babu has fallen ill—thank God, he is better to-day. All these circumstances have combined to stand in the way of my writing articles. To-morrow I shall finish writing for the 'Century', and I shall take up my unfinished article on the Vedanta to-morrow night. I hope to send it to your address by Monday next.

I wish I could retire for one or two months and elaborate certain ideas which have dawned upon me. But I am pinned down here. There are souls who look up to me and I cannot leave them. Let me sing then with you :

"Make me forgetful in the world but let me not forget Thee."

With every form of good wish

Yours sincerely
B. Upadhyay.

২

The Twentieth Century
20/1 Madan Mitra's Lane,
Calcutta, 8th August, 1901.

My dear Sir,

I have great pleasure in sending for your perusal two proof sheets of the "Twentieth Century". They contain a few reflections on your *Naivedya.* I have been only able to give a few hints. I hope they will be helpful in giving people some idea of the thoughts contained in the poem. I have given copious extracts for they will explain your mind better than my observations.

I have been thinking of seeing you one of these days but pressure of work comes in the way.

I owe you an apology for not being able to write for the "Bangadarsan" of *Bhadra*. I had to write out almost the whole of the "Century" this time on account of Nogen Babu's illness. I hope not to play the truant next time.

With best regards and every form of good wish

Yours sincerely
B. UPADHYAY.

৩

The Twentieth Century
39, Simla Street,
Calcutta, 5th December, 1901.

My dear Sir,

I have not heard from you for a week or so. Hope the building is progressing. My constant prayer is that the noble idea of restoring the ancient national *locus standi* may be carried out to a crowning success. How incapacitated am I not, because of my love towards One who is the concrete manifestation of Divine Compassion, to stand by your side and fight out the battle and shed the blood of life drop by drop, if necessary. They suspect me, they try to avoid me. However my whole heart is with you and I shall do whatever lies in my power but I shall zealously check my zeal from being demonstrative lest it prejudices the sacred cause before the eyes of the public. I really do want direction in this matter and I hope it will be forthcoming when necessary.

I shall confess that I was not very particular about friends in the beginning. It seems now that Thanwardas is very dear and so is Chittatosh Babu. I hope Thanwardas will make up the deficiency by quality. I should not have been so hasty in regard to Chittatosh Babu. But your complaint that there was no provision for technical education fired me up. I wish I could have got Thanwardas cheaper but bargaining any more would have been stultifying our position. All this I confess to let you know that I am always ready to receive your unreserved advice.

Do you intend coming here before the Bolpur anniversary takes place?

With kind regards

Yours sincerely
B. UPADHYAY.

বাংলার নবজাগরণের প্রত্যূষ-'সন্ধ্যা'

শ্রীসজনীকান্ত দাস

'সন্ধ্যা' দৈনিকের "অনুষ্ঠান-পত্রে" সম্পাদক-প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্বয়ং যদিও ইহাকে "কলির সন্ধ্যা অর্থাৎ কালরাত্রির কেবলমাত্র আরম্ভে"র দ্যোতক বলিয়াছিলেন, পরবর্তী কালের ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে 'সন্ধ্যা' বাঙালীর নবজাগরণের প্রত্যূষেরই সূচনা করিয়াছে। এই নবজাগরণ, যাহাকে "স্বদেশী আন্দোলন" আখ্যা দেওয়া হয়, পরমুখাপেক্ষী ও বিদেশী ভাবাপন্ন জাতিকে আত্মস্থ আত্মনির্ভরশীল ও স্বদেশপ্রেমিক করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ-পরাধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বরাট্ ও স্বাধীন হইবার প্রবল ইচ্ছা জাতির যুবশক্তিকে এই কার্যে সশস্ত্র ও বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এই সময়ে যে সকল সাময়িক পত্র বিপ্লব ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দেশবাসীকে দীক্ষিত করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল 'সন্ধ্যা' ছিল তাহাদের অগ্রদূত। লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হইবার পূর্বেই ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর, ১৩১১ বঙ্গাব্দের ১লা পৌষ, শুক্রবার সন্ধ্যায় 'সন্ধ্যা'র আবির্ভাব ঘটে। বাংলা ভাষায় 'যুগান্তর' 'নবশক্তি' 'ধর্ম' এবং ইংরেজী ভাষায় 'বন্দেমাতরম্' ও 'কর্মযোগিন্' প্রত্যেকটিই 'সন্ধ্যা'র অনুজ এবং 'সন্ধ্যা'কে অনুসরণ করিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। 'সন্ধ্যা'কে আমাদের জাতীয় জাগরণে ভোরের পাখি ও প্রত্যূষের শুকতারাও বলা যায়।

রাজশক্তির প্রবল শাসনে 'সন্ধ্যা' সমসাময়িককালেই লোকলোচনের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছিল। পুলিশের ভয়ে 'সন্ধ্যা'র সংখ্যাগুলি সাধারণ গ্রন্থাগারে তো রক্ষিত হয়ই নাই, ব্যক্তিগত সংগ্রহেও কেহ ইহা রাখিতে সাহস করেন নাই। ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ভূতপূর্ব ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি বা বর্তমানের জাতীয় গ্রন্থাগার কোথায়ও 'সন্ধ্যা'র একটি পৃষ্ঠাও রক্ষিত হয় নাই। এমনকি পুলিশের গোপন বিভাগেও 'সন্ধ্যা'র একটি পাতাও নাই। নমুনার অভাবে 'সন্ধ্যা' ও 'সন্ধ্যা'র অপূর্ব ভাষা কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল।

আমি প্রায় চব্বিশ বৎসর পূর্বে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যে দান সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাঁহার রচিত ও প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থগুলি ও তাঁহার সম্পাদিত 'স্বরাজ' সাপ্তাহিক পত্র তখনই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু 'সন্ধ্যা' অনেক চেষ্টা করিয়াও পাই নাই। প্রবোধচন্দ্র সিংহের 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব' নামক জীবনীতে এবং কয়েকটি দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকায় "সন্ধ্যা হইতে উদ্ধৃত" বলিয়া প্রবন্ধ বা প্রবন্ধের খণ্ডাংশ চোখে পড়িয়াছে, এবং ইংরেজী অনুবাদে সরকারী দপ্তরে 'সন্ধ্যা'র রাজদ্রোহকর রচনার উদ্ধৃতিও দেখিয়াছি, কিন্তু মূল 'সন্ধ্যা' দেখিতে পাই নাই। অনেক সন্ধান করিয়া শেষপর্যন্ত সৌভাগ্যক্রমে ইহার কয়েকটি সম্পূর্ণ সংখ্যা ও কর্তিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি আমি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছি। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র পাঠকদের তৃপ্ত্যর্থে 'সন্ধ্যা'র আকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি বুঝাইবার জন্য একটি সংখ্যার মলাট ও সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার প্রতিলিপি প্রকাশ করিতেছি। ব্রহ্মবান্ধবের জন্মশতবার্ষিক তর্পণে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'সন্ধ্যা'র সঙ্গে বাঙালীর একটা চাক্ষুষ পরিচয়ও যে সাধন করিতে পারিতেছি, ইহাও কম আনন্দের কথা নয়। এই নূতন আবিষ্কারে

Reg. No. C 326.

দৈনিক পত্রিকা।

Reg. No. C. 326.

Edited by B. UPADHYAYA.

মূল্য ৴ এক পয়সা।

২য় বর্ষ। ১৪ই পৌষ শুক্রবার সন ১৩১২ সাল। FRIDAY, DECEMBER 29, 1905. মফস্বল ১২ সংখ্যা

শ্রীহরয়ে নমঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পৌষ মাসের লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে জন্য আমাদের কার্য্যালয়ের সকল বিভাগ বন্ধ থাকিবে তাই আগামী কল্যকার সন্ধ্যা প্রকাশিত হইবে না।

জাতীয় মহাসমিতির একবিংশ অধিবেশন।

বারাণসী, ২৭শে ডিসেম্বর।

আজ বেলা ১টা সময় কংগ্রেসের কার্য্য আরম্ভ হয়। ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই বহুসংখ্যক প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছেন। মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যাও প্রায় এক হাজার হইয়াছে। আজিও মুসলমান প্রতিনিধিগণ আসিতেছেন। সভাপতির আসনের সম্মুখে "ব" চিহ্নিত অংশে দক্ষিণ দেশ হইতে আগত প্রতিনিধিগণের স্থান হইয়াছিল, বামপার্শ্বে বঙ্গীয় প্রতিনিধিগণের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—দক্ষিণে যুক্তদেশের প্রতিনিধিগণ বসিয়াছিলেন। উত্তর পার্শ্বে সম্মিলিত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের প্রতিনিধিগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল অন্যান্য প্রদেশের ডেলিগেটগণ পরে কংগ্রেস মণ্ডপে প্রবেশ করাতে নানা স্থানে উপবেশন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কংগ্রেসের পূর্ব্বতন প্রতিনিধিগণের পূর্ব্বগামী হইয়া সভাপতি গোখেল মহোদয় কংগ্রেস মণ্ডপে প্রবেশ করেন। তখন উচ্চ উল্লাসধ্বনি হইয়াছিল। মাননীয় মাধোলাল প্রথমতঃ সমাগত সভ্যমণ্ডলী ও প্রতিনিধিগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ প্রস্তাব করেন মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখলে মহোদয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হউন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন! তাহার পর পঞ্জাবের সর্দ্দার গুলচাঁদ সিংহ মিঃ মুধলকার এবং মিঃ জি সুব্রা মিনিয়া এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। গোখেল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বক্তৃতা করেন।

সভাপতির বক্তৃতার পর বিষয়নির্ব্বাচন কমিটি

বাসীর প্রতি ন্যায় দয়া ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা প্রজাগণের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। আমরা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মহা ঘোষণা কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না, উহাই আমাদের বিধিসঙ্গত প্রতিবাদাদের অবলম্বন। ভারতবর্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে কিরূপভাবে শাসিত হওয়া উচিত, উহা সে সম্বন্ধে তাঁহার স্বীয় মতের অভিব্যক্তি। আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট শাসনমত বিষয়ে জননীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ভারতশাসনে যাহাতে ন্যায়ের মর্য্যাদা পরিরক্ষিত হয়, আশা করি যুবরাজও সেরূপ উচ্চাভিলাষ দ্বারা প্রণোদিত হইবেন। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও বর্ত্তমান অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অভিজ্ঞতালাভের জন্য যুবরাজ ও যুবরাজ মহিষী আজ আমাদের মধ্যে সমুপস্থিত, ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে। কংগ্রেসের আন্তরিক অভিলাষ যুবরাজ ও যুবরাজ মহিষীর ভারত ভ্রমণ নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হউক। এবং কংগ্রেসের বিশ্বাস যুবরাজ ভারত ভ্রমণ করিয়া যে অভিজ্ঞতালাভ করিবেন ও যে স্মৃতি লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইবেন তাহা হইতে ইংলণ্ডের রাজপরিবার যুবরাজ ও ভারতের প্রজাসাধারণের মধ্যে একটী নব সহানুভূতি ও অনুরাগের সুদৃঢ় সূত্র গঠিত হইবে।

নবরাজ প্রতিনিধি।

কংগ্রেস মহামান্য লাট মিণ্টো ও লেডী মিণ্টোকে সসম্মান ও ঐকান্তিক আবাহন বিজ্ঞাপিত করিতেছে। রাজপ্রতিনিধি বড় সঙ্কট সময়ে তাঁহার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। গত তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে ভারতের প্রজাসাধারণের মনোভাব যেরূপ বুঝা গিয়াছে তাহাতে শাসন কর্ত্তৃগণের বিজ্ঞ ও সুবিবেচকেরমত সহানুভূতিপূর্ণ শান্তি সংস্থাপনপ্রয়াসই শাসক ও শাসিতের মধ্যে পরিবর্দ্ধমান অসন্তোষ দূর করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া মনে হয়। আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস রাজপ্রতিনিধি এইরূপ সভ্য ও সহানুভূতিপূর্ণ শাসননীতি পরিচালনে যত্নবান হইবেন। এখন আমাদের কর্ত্তব্য লাট বাহাদুরের সম্মুখে যে কর্ত্তব্য উপস্থিত, তাহা যেন আরও কঠিনতর না হয় সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করা এখন যে সঙ্কট সময় উপস্থিত লাট মিণ্টো তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা নন। এই সঙ্কট সময় নিরাপদে অতিক্রম করিবার জন্য তিনি ভারতের প্রজা সাধারণও রাজপুরুষগণের সাহায্য ও সহানুভূতি আশা করিতে পারেন। বর্ত্তমান অবস্থা হইতে বড় শোচনীয় ফল ফলিয়াছে এবং যদি অচিরে ইহার প্রতীকার না করা হয় তাহা হইলে দেশের মঙ্গল ব্যাহত হইবে।

যিনি ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "শিক্ষিত সাধারণের অভিমত উপেক্ষা করা ও তাচ্ছল্য করা সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ পুরুষের কাজ নয় তিনিই পরিশেষে অন্যান্য রাজপ্রতিনিধি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ক্রমাগত শিক্ষিত সাধারণের অভিমত পদদলিত করিয়া গেলেন। এবং তাঁহার আপনার ও কতিপয় সহযোগী রাজপুরুষের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া একরূপ স্বীকার করিয়া গেলেন। তাঁহার মতে ভারতে সমস্ত শক্তি একমাত্র ফিরিঙ্গির করায়ত্ত হওয়া উচিত এবং ফিরিঙ্গি সকল সময়েই কেবল কর্ত্তব্যের কথা বলিবেন। আর একমাত্র শাসিত হওয়াই ভারতবাসীর কাজ। ইহা ছাড়া অন্য কোন উচ্চাভিলাষ প্রকাশ তাহাদের পক্ষে গুরুতর অপরাধ ও আস্পর্দ্ধার কথা। লাট কুর্জ্জন কিরূপ প্রণালীতে কাজ করিবেন বিলাত হইতেই সে মতলব আঁটিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা কল্পনায় দেশের শিক্ষিত সাধারণের স্থান নাই। শেষকালে বৃথা বাগাড়ম্বরে আর শিক্ষিত সাধারণকে ভুলাইতে না পারিয়া তিনি তাহাদিগকে দমন করিতে আরম্ভ করেন। যদি লাট কুর্জ্জন এত আত্মম্ভরী না হইতেন যদি তাঁহার চরিত্রে বিনয়ের নামগন্ধ ও থাকিত তাহা হইলে অনেক পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিতেন। তাহা হইলে গত দুই বৎসরের শাসনে প্রজাগণ এত বিরক্ত ও ব্যথিত হইত না। শাসনের সুপ্রতিষ্ঠাই লাটকুর্জ্জনের রাজনৈতিক উচ্চ আদর্শ। গ্ল্যাডষ্টোনের মত তিনি স্বাধীনতা মানবীয়উন্নতির প্রধান সাধন বলিয়া মনে করেন না। জনসাধারণের উচ্চাশার সহিত তাঁহার কোন সহানুভূতি ছিল না। আর শাসিত লোকে এ উচ্চাশা দেখিলে তিনি তাহার দমন করিয়া তাহাদের উপকারই করিতেছেন বলিয়া মনে করিতেন। লাট কুর্জ্জন তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই। লাট কুর্জ্জনের শাসন সমাপ্তির সময় ভারতময় যেরূপ অসন্তোষানল জলিয়া উঠিয়াছিল এরূপ আর কখন জ্বলে নাই। লাট কুর্জ্জন তাঁহার বজেট বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, যদিও শিক্ষিত সাধারণকে তিনি অসন্তুষ্ট করিয়াছেন কিন্তু চাষাভূষার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার জন্য তাহারা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইবে। শিক্ষিত সাধারণ ও চাষাভূষার স্বার্থে প্রভেদ করা জনসাধারণের উচ্চাশাকে ব্যাহত করিবার একটী কূটবুদ্ধিপ্রসূত প্রকৃষ্ট উপায়। বলা বাহুল্য এ প্রভেদ যথার্থ নয়। লবণ শুল্কের হ্রাস, নিম্নশিক্ষায় দানবৃদ্ধি, পুলিশ সংস্কার প্রভৃতি অনুষ্ঠানের কথা বলিয়া তিনি এই কৃতজ্ঞতা

ব্রহ্মবান্ধবের যে নির্ভীক স্বদেশবান্ধব মূর্তি এবং বাংলাভাষায় নূতন শক্তি সঞ্চারের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইতেছে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। স্থানাভাবে এবারে তাহা প্রকটিত করা গেল না।

যে সংখ্যাটির প্রতিলিপি দেওয়া হইল সেটি সম্বন্ধে দুইটি লক্ষ্যণীয় বস্তু এই যে, ইহা দ্বিতীয় বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যা এবং ইহার প্রকাশের তারিখ ১৪ই পৌষ ১৩১২ সাল, ২৯ ডিসেম্বর ১৯০৫। 'সন্ধ্যা'র প্রথম প্রকাশের যে তারিখ (১৬ ডিসেম্বর ১৯০৪) আমি আবিষ্কার করিয়াছি এই সংখ্যাটির দ্বারা তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে। দ্বিতীয় লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই যে ব্রহ্মবান্ধব নিজেকে "বি. উপাধ্যায়" বা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ই বলিতেন; "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব" বলিতেন না।

সংশোধন। বর্ষ ১৮ সংখ্যা ১ পৃ ৭৬ : প্রমথ চৌধুরী মৃত্যুতারিখ ৭ অগস্ট স্থলে জন্মতারিখ ৭ অগস্ট।

স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ। হরিদাস মুখোপাধ্যায়, উমা মুখোপাধ্যায়। সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা। ৬৲ টাকা।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। হরিদাস মুখোপাধ্যায়, উমা মুখোপাধ্যায়। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা। ৭৲ টাকা।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। শ্রীবলাই দেবশর্মা। প্রবর্তক পাবলিশার্স, কলিকাতা। ৫৲ টাকা।

ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, প্রা. লি., কলিকাতা। ২.৫০ ন. প।

বাংলার জাতীয়-জীবনে স্বদেশীযুগ (১৯০৫-১১) কতকটা যেন ব্যক্তির জীবনে বয়ঃসন্ধিকালের মতন বিপুল পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল। সত্যকার স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি ছিল তার প্রেরণার প্রধান উৎস। কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রত্যক্ষভাবে সে যুগের আন্দোলনকে প্ররোচিত করেছিল বটে, কিন্তু তার ব্যাপক তরঙ্গবিক্ষোভকে কেবল রাজনীতির চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারে নি। রাজনীতি অর্থনীতি শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি জাতীয়-জীবনের সর্বক্ষেত্রে আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাত দেখা গিয়েছিল। 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ' গ্রন্থের লেখকদ্বয় স্বদেশীযুগের এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যকে পর্যাপ্ত উপকরণ-সমর্থিত আলোচনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন।

প্রথমে স্বদেশী আন্দোলনের দেশী-বিদেশী বহুমুখী প্রেরণার উৎসগুলি নির্দেশ করা হয়েছে। পরে তার আদর্শ, কর্মসূচী, জাতীয় শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে, রবীন্দ্রনাথ বিপিনচন্দ্র অরবিন্দ প্রমুখ মনীষী ও নায়কদের বিশিষ্ট দানের কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৎকালের বিভিন্ন পত্রিকার এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ভূমিকাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শেষে বিচার করা হয়েছে আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি। পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ আমাদের স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্যবোধ সজাগ করেছে, এবং ইংরেজী ভাষা ও শিক্ষা প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ গণ্ডী ভেদ করে সমগ্র ভারতের এক অখণ্ড মূর্তির রূপায়ণে সাহায্য করেছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে— রামমোহন, ইয়ংবেঙ্গল, বিদ্যাসাগরের কালে— জাতীয়তাবোধের যে প্রভাতী কাকলি শোনা যায়, দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম প্রহরে তারই সশব্দ জাগরণ ও চঞ্চলতা ধ্বনিত হতে থাকে। সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, একাধিক কৃষক বিক্ষোভ, হিন্দু মেলা, ইণ্ডিয়ান লীগ, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইলবার্ট বিল ইত্যাদির আন্দোলন-আলোড়ন এই জাগরণের ইন্ধন জোগায়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাও (১৮৮৫) এই সময় স্বদেশী ভাবধারাকে নানাদিক দিয়ে পরিপুষ্ট করে। শিখ মারাঠা রাজপুত প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন জাতির অভ্যুত্থান ও অতীত বীরত্বের কাহিনী লোকচিত্তে আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। বৈদেশিক রাষ্ট্রের জাতীয়-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও আমাদের জাতীয়তাবোধের প্রেরণা সঞ্চার করে, তার মধ্যে উল্লেখ্য হল— আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয়-আদর্শ, ইটালির ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, কাভুর, কার্বোনারি আন্দোলন, জার্মানির বিসমার্কের জাতীয়-ঐক্যের সংগ্রাম, ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম, জারের বিরুদ্ধে রুশ জনগণের বিদ্রোহ, বুয়র যুদ্ধে সাম্রাজ্যলিপ্সু ইংরেজের ভাগ্য-বিপর্যয়, এশিয়ায়

চীনের সংগ্রাম ও জাপানের বিস্ময়কর উত্থান। জাতীয়তার যজ্ঞে সকল দেশের আহুতি তখন সাদরে গ্রহণ করা হয়েছে। এইভাবে দেশবাসীর মনে যখন দেশের দুঃখদুর্দশা ও পরাধীনতার বেদনা-প্রতিকারের সংকল্প ক্রমে বিদ্রোহোন্মুখ হয়ে উঠেছে তখন ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব করে সহস্র শিখায় তাকে প্রজ্বলিত করে তুলেছেন।

১৯০১ সনে বাংলা-বিভাগের প্রস্তাব উপস্থাপনের সময় থেকে ১৯০৫ সনের জুলাই মাসে ভারত-সরকার কর্তৃক এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরে, সারা বাংলাদেশে, এবং ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষে কিভাবে স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ ও বাণী বিস্তারলাভ করে, তার বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'বয়কট' 'স্বদেশী' 'জাতীয় শিক্ষা' 'স্বরাজ' প্রভৃতি কথার অর্থ ও ভাবধারা ব্যাখ্যাত হয়েছে। সে যুগের অন্যতম নায়ক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন, "The Swadeshi Movement is···patriotic in the first instance and only economic or industrial in the second." গ্রন্থকারদ্বয় এই অভিমত সমর্থন করেন বলে মনে হয়। সতীশচন্দ্রের উক্তি নিঃসন্দেহে ঠিক, এবং অরবিন্দের ভাষায় বলা যায়, স্বদেশী আন্দোলন আমাদের মতন উন্মার্গ লক্ষ্যভ্রষ্ট জাতির "return to ourselves"-চেতনার একটা প্রবল আলোড়ন। বিপিনচন্দ্র একেই 'আত্মিক' আন্দোলন বলতে চেয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থে স্বদেশী আন্দোলনের এই আদর্শবাদী রূপটিকে তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস আছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, স্বদেশী আন্দোলনের যেমন একটা ঐতিহাসিক ইন্ধন ছিল (বঙ্গবিভাগ), বিশুদ্ধ দেশপ্রেমের প্রেরণা ছিল, তেমনি তার কোনো বাস্তব জাতীয়-অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কি না? অবশ্যই ছিল। দেশপ্রেম তার মুকুটমণি, এবং সেই মণির জ্যোতিতে এই অর্থনৈতিক অভীপ্সা ম্লান হয়ে থাকলেও ঐতিহাসিকের কাছে তার গুরুত্ব যথেষ্ট। এই অর্থনৈতিক গুরুত্ব প্রসঙ্গে অবাঙালি ও বাঙালি দুজন দেশনেতার বক্তব্য এখানে নিবেদন করছি। মহামতি গোখ্‌লে স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃতি ও লক্ষ্য প্রসঙ্গে এক ভাষণে বলেছিলেন (Lucknow, 9th February 1907), "Whoever tries to spread in the country a correct knowledge of the industrial conditions of the world and points out how we may ourselves advance, is a promoter of the Swadeshi cause. Whoever again contributes capital to be applied to the industrial development of the country must be regarded as a benefactor of the country and a valued supporter of the Swadeshi movement. Then those who organise funds for sending Indian students to foreign countries for acquiring industrial or scientific education— and in our present state we must, for some time to come, depend upon foreign countries for such education—or those who proceed to foreign countries for snch education and try to start new industries on their return, or those who promote technical, industrial and scientific education in the country itself— all these are noble workers in the Swadeshi field. These three ways of serving the Swadeshi cause are, however, open to a limited number of persons only. But there is a fourth way, which is

open to all of us, and in the case of most, it is perhaps, the only way in which they can help forward the Swadeshi movement. It is to use ourselves, as far as possible, Swadeshi articles only and to preach to others that they should do the same. The mass of the people...can all render a most important and a most necessary service to the Swadeshi cause by undergoing a little sacrifice to extend a kind of voluntary protection to Swadeshi industries in their early days of stress and struggle."

গোখ্‌লের এই ভাষণে স্বদেশী আন্দোলনের অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিস্তারিত করা হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য শিল্পবাণিজ্যোন্নত দেশের দিকে চেয়ে যাঁরা স্বদেশের অনুরূপ শিল্পসমৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হবেন তাঁরা স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃত সমর্থক বুঝতে হবে। যাঁরা ভারতীয় ছাত্রদের শিল্পশিক্ষা ও বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য বিদেশে অর্থব্যয় করে পাঠাতে কুন্ঠিত হবেন না, এবং যাঁরা বিদেশ থেকে বৈজ্ঞানিক শৈল্পিক ও ব্যবহারিক টেকনিক্যাল বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে স্বদেশে ফিরে স্বদেশী শিল্পের প্রতিষ্ঠায় ও প্রসারে উদ্‌যোগী হবেন, তাঁদের স্বদেশী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ কর্মী বলে শ্রদ্ধা করতে হবে। যাঁরা নিজেদের সঞ্চিত মূলধন (capital) শিল্পপ্রতিষ্ঠায় প্রয়োগ করবেন, তাঁদেরও স্বদেশী আন্দোলনের ভাবাদর্শে উদ্‌বুদ্ধ বলতে হবে। স্বদেশসেবার এই তিনটি পথ দেশের স্বল্পসংখ্যক লোকের জন্য উন্মুক্ত। এ ছাড়া আরও একটি চতুর্থ পথ আছে, যা সর্বসাধারণের সহজগম্য। সেই পথটি হল, বিদেশী পণ্যদ্রব্য বয়কট বা বর্জন করে যতদূর সম্ভব কিছু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেও, স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করা। তাতে স্বদেশেই শিল্পোদ্যমকে উৎসাহিত করা হবে, এবং বাল্যাবস্থায় দেশীয় শিল্প দেশীয় সাধারণের পোষকতায় প্রতিপালিত হবে। তৎকালের অর্থতত্ত্বের সংরক্ষণ-নীতির সমর্থন ও প্রয়োগ যখন বৈদেশিক শাসনাধীনে স্বদেশের শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে আদৌ সম্ভব ছিল না, তখন দেশপ্রেমের আদর্শ সম্মুখে তুলে ধরে বিদেশী পণ্য 'বয়কট' ও স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের নীতি প্রচারের ভিতর দিয়ে দেশবাসীর পক্ষে তার ফললাভের চেষ্টা করা স্বাভাবিক। এই ভাষণের মধ্যেই গোখ্‌লে তাই বলেছেন, "The German Economist—List—whose work on Political Economy is the best that Indian students can consult". মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের অর্থনৈতিক প্রবন্ধাবলী (*Essays on Indian Economics* গ্রন্থে সংকলিত) পাঠ করলেও জাতীয়তাবোধের বিকাশে অর্থনৈতিক চেতনার এই স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম হোতা রাসবিহারী ঘোষ বলেছিলেন (Welcome Address to the Calcutta Congress 1906), "The Swadeshi movement is only a prelude to our determination to enter into the great brotherhood of *the trading nations of the West*··· And if you want, come with me to the exhibition on the other side of the street, which I hope you have not boycotted, and I will show you what this movement, *the implication of which with politics is a mere accident in Bengal* from which many of us would gladly dissociate it, has already done for us [emphasis added]". এই ভাষণেই তিনি বলেছিলেন, "The Swadeshi movement

has been the principal motive power in the industrial development of the country, and I would remind those who say that Bengal can only talk that in the course of the present year more than ten lakhs of rupees have been given by Bengalees for the encouragement of technical education."

স্বদেশীযুগে দেশপ্রেমের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের অন্তরালে, লোকচক্ষুর বাইরে আরও গভীরে, দেশের মধ্যবিত্ত ও ধনিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার অভীপ্সা যে কত প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল, তা কেবল গোখ্‌লে ও রাসবিহারী ঘোষের নয়, তৎকালের আরও বহু বিশিষ্ট নেতার উক্তি থেকে নির্দেশ করা যায়। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে বাংলার ও ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তির বিস্তার থেকেও তার আভাস পাওয়া যেতে পারে। এ কথাও মনে রাখা দরকার যে এই অর্থনৈতিক প্রেরণাই মূলতঃ স্বদেশীযুগে জাতীয় শিক্ষাদর্শের রূপায়ণে ক্রিয়াশীল ছিল। লেখকরা প্রসঙ্গত এই অর্থনৈতিক দিকের কথা আলোচনা করেছেন বটে, কিন্তু বিষয় অনুপাতে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তার কারণ মনে হয় তাঁদের আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। ইতিহাসের বাস্তবব্যাখ্যা বলতে যা বোঝায় (যদিও তার মধ্যে আদর্শবাদেরও যথাযথ স্থান আছে) তাতে লেখকরা বিশ্বাসী নন, এ কথা তাঁরা স্পষ্টই স্বীকার করেছেন। বর্তমান সমালোচক 'ইতিহাস' সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করেন, এবং তার বাস্তবব্যাখ্যাতেও বিশ্বাসী। তা সত্ত্বেও লেখকদের মত, যুক্তি, তথ্য-পরিবেশন ও বিন্যাস-পদ্ধতি শ্রদ্ধা ও সমাদরের যোগ্য, এ কথা স্বীকার করতে তাঁর কুণ্ঠা নেই। স্বদেশী আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে লেখকরা হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গে তা পুরোপুরি রক্ষণশীল ছিল না বলে যে বক্তব্য নিবেদন করেছেন, তাও বিলক্ষণ তর্কসাপেক্ষ এবং সকলের কাছে গ্রাহ্য বিবেচিত হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। প্রত্যেক লেখকেরই দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যের অধিকার আছে, আলোচ্য গ্রন্থের লেখকদেরও তা পূর্ণমাত্রায় আছে। তাই বলে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীকে তা নিন্দনীয় ও অপাংক্তেয় বলে বর্জন করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। লেখকদের যে একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে, এইটাই বড় কথা। সাধারণতঃ আমাদের দেশে ইতিহাস-রচনায় তা থাকে না, এবং না থাকার জন্য বিস্তর বিক্ষিপ্ত তথ্যের কঙ্কালসমাকীর্ণ গোরস্থানে ইতিহাস-পাঠকদের বিভ্রান্তের মতন ঘুরে বেড়াতে হয়। স্বদেশী আন্দোলনের আলোচ্য ইতিহাস-রচয়িতারা সেই জাতীয় তথ্য-শবাকীর্ণ কোনো ইতিহাসের শ্মশান রচনা করেন নি বলে ধন্যবাদের পাত্র। তাঁদের আদর্শবাদী সুর আগাগোড়া বইখানির মধ্যে তথ্যস্তূপের ভিতর দিয়েও ঝংকৃত হয়ে উঠেছে এবং তার ফলে রচনা ভাবসংহতি লাভ করেছে। বাংলা ইতিহাস-সাহিত্যে বইখানি এই কারণে যোগ্য মর্যাদা লাভ করবে।

স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নায়ক ছিলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। এটি তাঁর সন্ন্যাস-জীবনের নাম, আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৬১ সনের ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার পশ্চিমে মাইল পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ দূরে খন্নান গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথের মতন ১৯৬১ সন ব্রহ্মবান্ধবেরও জন্মশতবর্ষ বলে স্মরণীয়। ১৯০৭ সনে মাত্র ৪৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ষোল-সতের বছর বয়সে কলেজের পড়াশুনো বন্ধ করে কয়েকজন বন্ধু মিলে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে ভারত-উদ্ধারের বাসনায় গোয়ালিয়র

অভিমুখে যাত্রা করার সময় থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিরিশটা বছর তাঁর উপর দিয়ে ঝড়ের বেগে কেটে গেছে। এই তিরিশটা বছরের অন্ততঃ তিরিশটা দিন হয়তো তিনি প্রাত্যহিক কর্ম থেকে বিশ্রাম নিয়েছেন, কিন্তু পুরো একটি দিনও চিন্তা থেকে বিরত হয়েছেন কিনা সন্দেহ। অর্থচিন্তা নয়, স্বার্থচিন্তাও নয়, পরাধীন দেশের স্বরাজচিন্তা এবং দশের মুক্তিচিন্তা। কৈশোরের গোড়া থেকে যৌবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এই চিন্তা যেন তাঁর সমগ্র চিত্তকে আচ্ছন্ন করে ছিল। কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনই যদি তাঁর জীবনের চরম কাম্য হত তা হলে ব্রহ্মবান্ধব আরও অনেক লোকপ্রিয় দেশকর্মীর মতন আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয় হয়ে থাকতেন। কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শ ছাড়াও ব্রহ্মবান্ধব আরও একটা 'সত্য' ও 'আদর্শে'র সন্ধানে জীবনটাকে উৎসর্গ করেছিলেন। জীবনের 'সত্য' কি, এক-একটা জাতি ও সমাজকে যুগ যুগ ধরে ধারণ করে আছে যে 'ধর্ম' তারই বা স্বরূপ কি, 'ব্যক্তি' ও 'বিশ্ব', 'সৃষ্টি' ও 'স্রষ্টার' মধ্যে সম্পর্ক কি— এও তাঁর জীবনের একটা বড় জিজ্ঞাসা ছিল। স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীর সৈনিক ছিলেন তিনি, এইটাই তাঁর একমাত্র শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়। তাঁর মধ্যে যে 'ব্যক্তিটি', যে 'আদত মানুষটি' রাজনীতির অন্তরালেও আত্মগোপন করে ছিল, তার পরিচয় ছাড়া যে-কোনো ব্রহ্মবান্ধবচরিত বিকলাঙ্গ বলে মনে হবে।

পূর্বে প্রকাশিত অণিমানন্দের *The Blade* ও প্রবোধচন্দ্র সিংহের 'উপাধ্যায়' নামে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় লেখা দুখানি ভালো জীবনচরিত আছে। প্রবোধচন্দ্রের লেখা জীবনী অধুনা দুষ্প্রাপ্য। এই কারণে শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় -রচিত জীবনী বহুদিনের একটা বড় অভাব পূরণ করবে। পূর্বে স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে লেখকদের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছি। ব্রহ্মবান্ধবের জীবনের রাজনৈতিক পশ্চাদ্‌পট উভয়ের করতলগত। 'স্বরাজ' 'বন্দে মাতরম্‌' প্রভৃতি অতীব দুষ্প্রাপ্য পত্রিকারও সন্ধান করে তাঁরা পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং তার আলোকে উপাধ্যায়ের জীবনের সর্বদিক সুকৌশলে পাঠকদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের এ রকম বিস্তারিত জীবনবৃত্তান্ত, আবশ্যকীয় পটভূমিসহ, পূর্বে আর প্রকাশিত হয় নি। তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি পর্ব, ব্রাহ্মধর্ম ক্যাথলিকধর্ম হিন্দুধর্ম প্রভৃতির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এবং তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাঁর জীবনের স্বপ্ন, ধ্যান-ধারণা ও জপ-তপ-চিন্তা স্বরাজসাধনার কাহিনী এই চরিতকথার মধ্যে বিবৃত হয়েছে। বোলপুরে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় গঠনে রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধবের মধ্যে যোগাযোগ সম্পর্কে পূর্বে যে তর্কবিতর্ক হয়েছে, লেখকরা নথিপত্রাদির সাহায্যে তারও অবসান ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়া একাধিক দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা ও পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগের গোপন রিপোর্ট থেকে এমন অনেক তথ্য বইখানিতে পরিবেশিত হয়েছে যা পাঠকদের অনুসন্ধিৎসা নতুন পথে পরিচালিত করবে।

দ্বিতীয় জীবনীগ্রন্থের লেখক শ্রীবলাই দেবশর্মা বর্ধমানের একজন প্রবীণ দেশকর্মী। তাঁর সৌভাগ্য, রাজনৈতিক জীবনে তিনি ব্রহ্মবান্ধবের সান্নিধ্য ও প্রত্যক্ষ প্রেরণা লাভ করেছিলেন। 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় উপাধ্যায় যে তাঁকে রাজনৈতিক সৎসাহসের জন্য 'ধানী লঙ্কা' বলে বিশেষিত করেছিলেন, সে কথা লেখক আজও ভুলতে পারেন নি। কলকাতায় 'সন্ধ্যা' পত্রিকার আফিসে উপাধ্যায়ের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়। সে আজ চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা, যখন কলকাতা শহর থেকে বর্ধমানের 'দূরত্ব' আরও অনেক বেশি ছিল, এবং গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে কিশোর-যুবকদের গতায়াতও ছিল অনেক কম।

শ্রীবলাই দেবশর্মা তাঁর যৌবনের সেইসব রাজনৈতিক স্মৃতিকথা ব্রহ্মবান্ধবের চরিতাবৃত্তি প্রসঙ্গে বিবৃত করেছেন। তার ফলে বইখানির আস্বাদই আলাদা হয়েছে। ঠিক জীবনচরিত একে বলা যায় না। লেখক নিজেও তা বলতে চান নি। 'গ্রন্থকারের নিবেদনে' তিনি বলেছেন, "ইহাতে উপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের ঘটনাবলীর ইতিবৃত্ত দেওয়া হয় নাই, দিবার চেষ্টাও করি নাই। তাঁহার জীবন অপেক্ষা মহৎ ও বৃহৎ ছিল ব্রহ্মবান্ধবের ভাবাদর্শ। কলির অন্ধকারাবৃত সন্ধ্যায় তিনি যে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়াছিলেন, তাহারই রশ্মিরেখা এই গ্রন্থের উপজীব্য।" তিনি এ কথাও বলেছেন, " 'সন্ধ্যা' পত্রিকা কিছু কিছু পুলিশের অবিশ্রান্ত উপদ্রবের কবল হইতে অদ্যাবধি রক্ষা করিয়া আসিতেছি। আচার্যের স্মৃতির অভিজ্ঞান স্বরূপে ঐগুলি রক্ষা করিতেছি।" এ-বইয়ের একজন কৌতূহলী পাঠক হিসেবে প্রত্যেকেই তাই প্রত্যাশা করবেন 'সন্ধ্যা' পত্রিকার দু-একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। যে-পত্রিকা অধিকাংশ বাঙালীরই স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয়নি, এবং প্রধানতঃ যে পত্রিকার উপাদান অবলম্বন করে ব্রহ্মবান্ধব-চরিতকথা বর্ণিত হয়েছে, তার কপি লেখকের নিজের কাছে থাকা সত্ত্বেও কেন তার প্রতিলিপি বইতে সন্নিবেশিত করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেছেন তা বোঝা কঠিন। সমালোচকের ধারণা, এই প্রতিলিপি দিলে এবং 'সন্ধ্যা' পত্রিকার নির্বাচিত কিছু রচনা পরিশিষ্টে সংযোজন করলে বইখানির মর্যাদা বৃদ্ধি পেত। তৎসত্ত্বেও রচনার ভিন্ন স্বাদের জন্য উপাধ্যায়ের এই জীবনকথা পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে। আদর্শবাদী ব্রহ্মবান্ধবের ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাঠকরা এ-বই থেকে কিছুটা পাবেন।

কিন্তু ব্রহ্মবান্ধবের এই দু-খানি জীবনচরিত পাঠ করে বর্তমান সমালোচকের মতন অন্য পাঠকরা উপকৃত হলেও তৃপ্ত হবেন কি না সন্দেহ। তার কারণ, ব্রহ্মবান্ধবের জীবনের বেগবান ধারা ও জীবনজিজ্ঞাসার কথা স্মরণ করলে মনে হয় 'ব্যক্তি' হিসেবে তিনি দুর্জ্ঞেয়। তাঁর এই ব্যক্তিত্বের দুর্জ্ঞেয়তার দ্বার উদ্ঘাটন করার দায়িত্ব কোনো জীবনীকারই গ্রহণ করেন নি। এই ব্যক্তিত্বের জন্যই, এবং মানুষ হিসেবে এই এককত্বের জন্যই তিনি, কেবল বাঙালি জাতির নন, সমগ্র ভারতবাসীর বিস্ময়ের পাত্র। ব্রহ্মবান্ধবের কথা যত চিন্তা করা যায় তত মনে হয় যে দু'য়ে-দু'য়ে ঠিক চারের মতন তাঁর জীবনটাকে সরল পাটীগণিতের সূত্রে বিশ্লেষ করা যায় না। তা অনেক মেহনত করে করার পরেও আরও কিছু অব্যক্ত থেকে যায়। তাঁর জীবন কেবল একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী দেশসেবকের জীবন নয়, একটা বিরাট মনের দুরন্ত অভিযান। স্বরাজসাধনা সেই দুর্গম যাত্রাপথের একটি বিশিষ্ট, এবং নিঃসন্দেহে গৌরবমণ্ডিত, সুকর্ম। চঞ্চল প্রাণের অফুরন্ত স্ফূর্তি এই রক্তমাংসে গঠিত মানুষের বুদ্ধি, মন ও আত্মাকে জীবনসত্যের সন্ধানে কতখানি অস্থির ও অতৃপ্ত করতে পারে, ব্রহ্মবান্ধব তার মূর্ত প্রতীক। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' যেমন, ব্রহ্মবান্ধবও তেমনি জীবনজিজ্ঞাসায় সতত অস্থির ও চঞ্চল— ব্রাহ্ম, ক্যাথলিক, হিন্দু কোনো দ্বীপেই তিনি কূলের সন্ধান পান নি, সর্বদাই তাঁর মনে হয়েছে "হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে!" কিন্তু কেন?

বাংলা সাহিত্যেও ব্রহ্মবান্ধবের একটা বিশিষ্ট দান আছে যা তাঁর অন্যান্য জনপ্রিয় কর্মকীর্তির তলায় চাপা পড়ে আছে বলে আমরা স্মরণ করি না। কিন্তু তাঁর সাহিত্যকীর্তিরও এমনই একটি বিশিষ্টতা আছে যা বাস্তবিকই প্রকৃত কোনো সাহিত্যানুরাগীর পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সন্ধ্যা, স্বরাজ, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর যে রচনাবলী বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে তা একত্রে সংকলিত হলে বাংলা সাহিত্যের

একটা লুপ্তসম্পদ পুনরুদ্ধৃত হতে পারে। আশার কথা, এদিকে বিচক্ষণ প্রকাশকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং তার প্রথম প্রচেষ্টা 'ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা'। 'বিলাত-যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি' 'বাংলার পাল-পার্বণ,' ও 'আমার ভারত উদ্ধার' নামে উপাধ্যায়ের তিনটি রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা'। দু-একটি উদ্ধৃতি ছাড়া আসল রচনার স্বাদ বোঝানো সম্ভব নয় বলে উপাধ্যায়ের নানাজাতের রচনা থেকে দু-চারটি করে লাইন এখানে তুলে দেওয়া হল—

"আমি একজন ইংরেজি-পড়া সন্ন্যাসী। আজকাল অনেকানেক সন্ন্যাসী বিলাতে গিয়ে শাস্ত্রের বুকনি-মিশানো-বক্তৃতা কোরে খুব হাততালি খায়। আমারও একদিন শখ হোলো যে বিলাতের হাততালি খাবো। কলিকাতা বুম্বই ও মান্দ্রাজের হাততালি খুব খেয়েছি— এখন দেখি একবার চম্পকবরণ হাতের হাততালি কেমন মিষ্টি। সন্ন্যাসীর মন যেমনি খেয়াল অমনি উঠা।" — বিলাত-যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি

"আগামী শুক্রবার জামাইষষ্ঠী। এই জামাইষষ্ঠীর কথা মনে হইলে আমার মনে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হয়।

"জামাই হওয়া আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। পাতানো সম্পর্কেও কেহ কখন আমাকে জামাই বলিয়া ডাকে নাই। আর এ কাঠামোয় যে জামাই হইব সে আশাও নাই। চুল সাদা হইয়া আসিয়াছে— গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে— দাঁতগুলি হল হল করিয়া নড়িতেছে। দেহটি রসবিহীন পল্লববিরহিত পাদপের ন্যায় কোন প্রকারে তিষ্ঠিয়া আছে। বসন্তের মলয়ানিলে অঙ্গ আর শিহরিয়া উঠে না। এখন প্রাণে যা মাঝে মাঝে সাড় হয় তাহা কেবল কাঠঠোকরার ঠকঠকানির জ্বালা বই আর কিছু নয়।" —বাংলার পাল-পার্বণ

"যখন আমার বয়স চৌদ্দ পনরো, তখন স্বরেন বাঁড়ুজ্যে একটা নূতন আন্দোলন আরম্ভ করেন। কালী বাঁড়ুজ্যে, আনন্দমোহন বসুও ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। লেকচারে লেকচারে দেশ মাতিয়া উঠিল। আমার ত খাওয়া-দাওয়া নাই; শ্যামের বাঁশী শুনিয়া যেমন গোপীজন উন্মত্ত— আমিও তদ্বৎ। আমার পিতামহী বলিতেন— নেকচারই দেশটাকে খেলে।

"লেকচার না শুনিলে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত— কিন্তু লেকচার শুনিয়া হাততালি দিয়া যখন বাড়ি ফিরিতাম তখন মনে হইত— প্রাণটা যেন খালি খালি— ভরে নাই। এই রকমে বৎসর দুই কাটিয়া গেল— এন্ট্রেন্স পাস করিয়া কলেজে উঠিলাম। তখন বয়স সতরো বৎসর। ঐ কাঁচা বয়সে প্রাণটা কেমন উড়ু উড়ু করিতে লাগিল। স্বরেন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে ভারত উদ্ধার করা কিছুতেই পোষাইবে না— মনে হইতে লাগিল।"— আমার ভারত উদ্ধার

বিশ শতকের গোড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েও যিনি বাংলা গদ্য রচনায় এরকম অনুপম প্রসাদগুণের সঙ্গে অবলীলাক্রমে শ্লেষ হাস্যরস এবং ওজস্বিতার মিশ্রণ ঘটাতে পারেন, তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার স্বকীয়তা অস্বীকার করা অসম্ভব। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে তাঁর রচনায় হুতোমী বাক্‌ভঙ্গির প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর চল্‌তিভাষার রচনা ও রঙ্গরসিকতার মধ্যে হুতোমের ছায়া-সঞ্চরণ সম্ভব হলেও, সাধুভাষার রচনায় তার প্রেতাত্মার সন্ধান করা হাস্যকর। ব্রহ্মবান্ধবের বাংলা রচনা

নিজস্ব ওজস্বিতায়, সারল্যে ও মাধুর্যে সমুজ্জ্বল, এবং তার চেয়েও বিস্ময়কর হল যে বঙ্কিম-রবীন্দ্রযুগের মধ্যাহ্নেও তা দুই মহারথীর প্রভাবমুক্ত। 'ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা'য় উপাধ্যায়ের তিনটি দুষ্প্রাপ্য ও উৎকৃষ্ট রচনা প্রকাশ করে, বাঙালি পাঠকদের তার অপূর্ব রসাস্বাদনের সুযোগ দিয়ে, প্রকাশকরা সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। তাঁরা যে পথনির্দেশ করেছেন, সেই পথ ধরে যদি কেউ ব্রহ্মবান্ধবের আরও অন্যান্য বাংলা রচনা, যা বিভিন্ন সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, সেগুলি সংকলন করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন তা হলে বাংলাদেশের বহু সাহিত্য-ইতিহাস-পাঠক যে বিশেষ উপকৃত হবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য এ কাজ বেশ দুরূহ ও আয়াসসাধ্য, কারণ উপাধ্যায়ের অনেক রচনা তাঁর যে 'সন্ধ্যা' ও 'স্বরাজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল আজ তা অতীব দুষ্প্রাপ্য। তবু রত্নোদ্ধারের সম্ভাবনায় ক্লেশ স্বীকার করলে তা ব্যর্থ হবে না। বাংলা রচনার সঙ্গে যদি তাঁর যৌবনের ইংরেজি রচনাগুলি *The Sophia, The Twentieth Century* প্রভৃতি পত্রিকা থেকে উদ্ধার করে গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত করা যায় তা হলে উনিশ শতকের শেষ পর্বের বাংলা তথা ভারতের সামাজিক ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ অনুসন্ধিৎসুদের আয়ত্তে আসতে পারে। কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর পরবর্তী ব্রাহ্ম আন্দোলন, খ্রীষ্টধর্মান্দোলন, বেসান্তের থিওসফিস্ট আন্দোলন এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি ব্রহ্মবান্ধবের এই ইংরেজি রচনাবলী থেকে নির্ণয় করা সহজ হবে। আশা করি, দূরদর্শী প্রকাশকরা একাজে অগ্রণী হবেন।

বিনয় ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য। শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ। মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম আট টাকা।

রবীন্দ্রকাব্যের একটি পর্বান্ত ধরা হয়ে থাকে 'পূরবী'তে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সেই 'পূরবী' বইখানির পরে 'মহুয়া' (১৯২৯) তার পর ১৯৩২এ প্রকাশিত 'পরিশেষ' (ভাদ্র ১৩৩৯) আর 'পুনশ্চ' (আশ্বিন ১৩৩৯) থেকে শুরু করে একে একে 'বিচিত্রিতা' (শ্রাবণ ১৩৪০), 'শেষ সপ্তক' (বৈশাখ ১৩৪২), 'বীথিকা' (ভাদ্র ১৩৪২), 'পত্রপুট' (বৈশাখ ১৩৪৩), 'শ্যামলী' (ভাদ্র ১৩৪৩) —এই হল ১৯৩৬এর মধ্যে প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন কবিতাসংগ্রহ। কিন্তু 'পূরবী'র পর থেকে তাঁর শেষপর্বের কাব্যের পর্যালোচনায় এগিয়ে যেতে হলে ১৯৩৬এর বই 'পত্রপুট'-'শ্যামলী'তে সম্ভবত থেমে যাওয়া যায় না তাঁর শেষপর্ব ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়নি ; আর, ১৯৩৮এর বই 'প্রান্তিক' (পৌষ ১৩৪৪) বা 'সেঁজুতি' (ভাদ্র ১৩৪৫) থেকে তা নতুন করে শুরুও হয় নি। বরং 'সেঁজুতি'র পরে 'আকাশপ্রদীপ' (বৈশাখ ১৩৪৬), 'প্রহাসিনী' (পৌষ ১৩৪৫), 'নবজাতক' (বৈশাখ ১৩৪৭), 'সানাই' (আষাঢ় ১৩৪৭), 'রোগশয্যায়' (পৌষ ১৩৪৭), 'আরোগ্য' (ফাল্গুন ১৩৪৭), 'জন্মদিনে' (বৈশাখ ১৩৪৮) এবং কবির তিরোধানের পরে প্রকাশিত তাঁর 'শেষ লেখা' (ভাদ্র ১৩৪৮) বইগুলির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কাব্যধারা ব্যক্ত হয়েছে বলা দরকার। এই শেষপর্ব সম্বন্ধে বাংলায় ইতিপূর্বে যে আলোচনা একেবারে না হয়েছে, তা নয়। তবে, এ বিষয়ে একখানি এত বড় বই প্রকাশিত

হওয়া খুবই আশার কথা। অধ্যাপক শিশিরকুমার ঘোষের এই বইখানিতে 'প্রান্তিক' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যধারার আলোচনা জায়গা পেয়েছে এবং শিশিরকুমার অনুসন্ধিৎসু পাঠক হিসেবে সমুচিত অধ্যবসায়েরই পরিচয় দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম-শতবার্ষিকীতে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখে রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকমাত্রেরই খুশি হবার কথা। মনে পড়ে, ররীন্দ্রসংগীতের কথা আলোচনা করতে বসে শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ শান্তিনিকেতনের ছাত্রদলের উদ্দেশে উচ্চারিত রবীন্দ্রনাথের নিজের কয়েকটি কথা তুলে দিয়েছিলেন। এখানে আদিতেই সেই কথাগুলি স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সৃষ্টির বীণা তো ওস্তাদজি বাজিয়ে চলেছেন, কিন্তু আমাদের নিজের চিত্তের বীণাও যদি সুরে না বাজে তা হলে আমাদের হৃদয়বীণার ওস্তার্দজিকে চিনব কী করে? তাঁর আনন্দরূপ দেখব কী করে? না যদি দেখি তা হলে কেবল বেসুর, কেবল ঝগড়াবিবাদ, কেবল ঈর্ষাবিদ্বেষ, কেবল কৃপণতা-স্বার্থপরতা, কেবল লোভ এবং ভোগের লালসা।'

রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচনার আদর্শ সম্বন্ধেও এ সতর্কবাণী প্রযোজ্য। কবির নিজের সৃষ্টিতে ওস্তাদজির নিজের হাতের বাজনা তো বেজেইছে। কিন্তু সেই সৃষ্টির সমালোচক যাঁরা, তাঁদের চিত্তবীণা যদি না বেজে থাকে, কেবল অর্জিত বিদ্যার সমারোহ ব্যতীত তাঁদের অনুভূতির বিশিষ্টতা না থাকে তা হলে রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচনা তো উদ্‌ধৃতি-কণ্টকিত তত্ত্বাড়ম্বরসর্বস্ব বিশ্লেষণ-বাহুল্যে পর্যবসিত হতে বাধ্য। অতএব রবীন্দ্রচর্চায় অধিকারীভেদের প্রসঙ্গ উপেক্ষা করে চলতে পারে না। বলা বাহুল্য, এ পথ আস্বাদনের পথ।

অধ্যাপক শিশিরকুমার ঘোষের আলোচ্য গ্রন্থ সম্বন্ধে পাঠকের প্রত্যাশা অনুমান করা শক্ত নয়। এ বিষয়ে আরো আলোচনা হওয়া উচিত।

বইখানির প্রথম অধ্যায় 'অবতরণিকা'র প্রথম বাক্যটিই হয়তো কিঞ্চিৎ আকস্মিক বলে মনে হতে পারে। তিনি লিখেছেন, 'রবীন্দ্রকাব্যের শেষ অধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিনে নেবার আশ্চর্য সুযোগ'। এই বাক্যাংশের ঠিক আগেই এ বাক্যের অবশিষ্ট যে অংশ সেটি রবীন্দ্ররচনা বিশেষেরই উদ্‌ধৃতি—"অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়"। তাতেও কিন্তু মানেটা স্পষ্ট হয় না। লেখকের রচনার মধ্য দিয়েই লেখককে চেনা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শুধু শেষপর্বের রচনা সম্বন্ধেই এ কথা বিশেষভাবে ধর্তব্য, অন্য পর্বের সম্বন্ধে নয়? আর, যদি 'অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলা'র উপরেই জোর দিতে হয় তা হলে পাঠক তো এ ধারণাও করতে পারেন যে, রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বটা বুঝি-বা অবসাদেই পুরোপুরি ছায়াচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু যিনি 'নবজাতক' 'প্রান্তিক' 'শেষ সপ্তক' 'সানাই' ইত্যাদি লিখে গেছেন, তিনি যে সর্বপ্রকারে অবসাদবিজয়ী কবি ছিলেন, এ কথা কে না জানেন?

শিশিরকুমার জানিয়েছেন, 'রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সের লেখার মধ্য থেকে যে অংশটিকে আমরা উত্তরকাব্য বলে বর্ণনা করেছি প্রথম দৃষ্টিতে সেই নির্বাচনের সপক্ষে কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে নাও মনে হতে পারে।' দ্বিতীয়ত তিনি এ কথাও জানিয়েছেন, 'এ সময়কার সমস্ত লেখাই কিন্তু আমাদের প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।' তৃতীয়ত, তাঁর আরো কথা, 'উত্তরকাব্যের প্রতি অতিরিক্ত অভিনিবেশের ফলে রবীন্দ্রনাথের পূর্বরচনার সঙ্গে এর যোগাযোগের দিকটি অবহেলিত হয়েছে সন্দেহ নেই।' চতুর্থত, 'এ প্রবন্ধ পূর্ণাঙ্গ

আলোচনা নয়, উত্তরকাব্যের কয়েকটি বিশেষ সম্ভাবনার, সত্য বলিতে কি, একটি বিশেষ সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য।'

তাঁর এ আলোচনার ভাষাগত এবং অন্যান্য প্রকার বন্ধুরতার কারণগুলি অধ্যাপক ঘোষের এইসব উক্তিতেই সূচিত। তা ছাড়া তিনি আরো জানিয়েছেন, 'প্রবন্ধটি [আমাদের প্রশ্ন: পুরো বইখানিই কি?] মুখ্যত অবাঙালী পাঠকদের, অর্থাৎ যাঁরা ইংরাজী অনুবাদের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে জেনেছেন তাঁদের জন্য বক্তৃতার আকারে ইংরাজীতে লিখিত হয়েছিল। আঙ্গিক বা কাব্যদেহের আলোচনায় বিরত থাকার প্রধান কারণ তাই।'

'ভূমিকা'-অধ্যায়ে নানা কথা তিনি বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কবিতায় কবি তাঁর নিজের ভাবরাজ্যের জমি জরীপ করেছেন, কিংবা তাঁর সেরা কবিতাগুলিতে সচেতনতা ও স্বতঃস্ফূরণের চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে, 'মারিতাঁর ভাষায় বলতে গেলে, রবীন্দ্রকাব্য অনেক সময়ই কাব্যের শেষ সীমানায় পৌঁছে গিয়েছে' ইত্যাদি উক্তি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। এই 'ভূমিকা' অধ্যায়টি সুবিস্তীর্ণ। এতে পর পর দু বার 'গদ্যকবিতা' শিরোনামে আলোচনা উত্থাপিত হয়েছে, অথচ গদ্যকবিতার আঙ্গিক সম্বন্ধে লেখক বিশেষ কিছু বলেন নি। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতা থেকে বড় বড় উদ্ধৃতির ব্যবহার এবং সেইসঙ্গে একরকম সটীক সারার্থ প্রকাশ করতে করতে আলোচক এগিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের ভাব ভাষা ও অভিজ্ঞতা বৈদিক কাব্যের গাম্ভীর্য ও রহস্য বা তার পূর্ণতা পায় নি বটে, কিন্তু নানা অসংগতির মধ্যেও সেই নিরঙ্কুশ সিদ্ধির দিকেই যে তার গতি পরিচালিত, সে বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না।' বলা বাহুল্য, এসব উক্তি দীর্ঘ আলোচনার প্রস্তাব। পরে কোনো সময়ে তিনি প্রস্তাবিত আলোচনা শেষ করবেন বলে আশা করা যায়।

'প্রান্তিক' 'সেঁজুতি'-'আকাশপ্রদীপ' 'নবজাতক'-'সানাই' 'রোগশয্যায়'-'আরোগ্য' 'জন্মদিনে'-'শেষ লেখা', দীর্ঘ ভূমিকা আর উপসংহারের মধ্যবর্তী এই হল বইখানির আসল অধ্যায়ক্রম। মাঝেমাঝে, তিনি দু-একটি এমন মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যেগুলির পূর্ণতর ব্যাখ্যার দরকার ছিল— যেমন 'প্রকৃতিই রাবীন্দ্রিক অভিজ্ঞার ভিৎ, আজ [অর্থাৎ 'নবজাতক' স্তরে] তার সঙ্গে, বা পরিবর্তে, এসেছে মহামানব-স্বীকৃতি।' পৃ ২২০। 'অভিজ্ঞার ভিৎ' কথার অর্থ পরিষ্কার করে বললে ভালো হত।

এতৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে অধ্যাপক শিশিরকুমার ঘোষের এই বইখানি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

হরপ্রসাদ মিত্র

স্বরলিপি

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।
গোষ্ঠে যবে নামে সন্ধ্যা শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল লজ্জিত বাসরশয্যাতে
অর্ধরাতে।
উষার উদয়-সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি[১] : শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

II {সা সা সা -া । সরা -া রা সা I রা -মা মা -জ্ঞা । -া -া -া -া I
ন হ মা ০ তা ০ ন হ ক ন্ না ০ ০ ০ ০ ০

I (মা মপা পা পা । পা -া পা ধণা I পধা ধা পা -া । -া -া পা -ধা I
ন হ ব ধূ সু ন্ দ রী০ রূ০ প সী ০ ০ ০ হে ০

I মা -াপ পা পা । পমা-ণা ধা ধপা I মা -পা -ধা পধপা । মা-জ্ঞা -া -া)} I
ন ন্ দ ন বা ০ সি নী উ ০ র্ ব০ শী ০ ০ ০

I মা-পা পা পা । পা -া ধা পধঃপঃ I মা-পা পা -া । -া -া -া -া I
গো ষ্ ঠে য বে ০ না মে০০ স ন্ ধ্যা ০ ০ ০ ০ ০

I পা -ণা ণা ণা । ণা -া ণা -া I ণা -র্সা র্সা র্সা । র্সা -ণা ণা -া I
শ্রা ন্ ত দে হে ০ স্ব র্ ণা ন্ চ ল টা ০ নি ০

I ণা র্সা র্সা র্সা । র্সা সা ণা -া I ধঃর্সণঃ -ধণঃ-ঃ ধা পা। মা মপা পা -া I
তু মি কো নো গৃ হ প্রা ন্ তে০০ ০০ ০ না হি জ্বা লো০ স ন্

I মা-ণা ণা ণা । পধা -া পা -া I -া -া -া -া । মা-পা পা পা I
ধা ০ দী প খা ০ নি ০ ০ ০ ০ ০ গো ষ্ ঠে য

I পা -া ধা পধঃপঃ । মা-পা পা -া I -া -া -া -া । পা-ণা ণা ণা I
বে ০ না মে০০ স ন্ ধা ০ ০ ০ ০ ০ শ্রা ন্ ত দে

I ণা -া ণা -া । ণা-র্সা র্সা র্সা I র্সা-ণা ণা -া । ণা র্সা র্সা র্সা I
হে ০ স্ব র্ না ন্ চ ল টা ০ নি ০ তু মি কো নো

I র্সা র্সা ণা -া । ধঃর্সণঃ ধণঃ-ঃ ধা পা I মা মপা পা -া । মা-ণা ণা ণা I
গৃ হ প্রা ন্ তে০০ ০০ ০ না হি জ্বা লো০ স ন্ ধা ০ দী প

I পধা -া পা -া । -া -া -া -া I র্সা র্সা -া র্সা । র্সা র্সা র্সা -া I
খা ০ নি ০ ০ ০ ০ ০ দ্বি ধা য়্ জ ড়ি ত প ০

I র্সা -া -া -া । -া -া -া -া I র্সা -া -া র্রসা । র্সা -া -ণা ণা I
দে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ক ০ ম্ প্র০ বো ০ ক্ ষে

I ণা -া -া র্সণা । ণা -দা ণদা দা I পা -া -া -া । -া -া -া -া I
ন ০ ০ ত্র০ নে ০ ত্র০ পা তে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I {ণা ণা ণা -া । ণা -া ণা ণা I ণা -ধা ধঃর্সণঃ -ধণঃ-ঃ । -া -া -দা -পা I
স্মি ত হা স্ সে ০ না হি চ ০ লো০০ ০০০ ০ ০ ০ ০

I পা -দা দা দা । দা -া দা পা I মা -পা পণা -ণদা । পা -া -া -দা I
ল জ্ জি ত বা ০ স র শ য্ যা০ ০ তে ০ ০ ০

I মা -পা পদা দা । পা -া -া -া} I {র্রা র্রা -া র্রা । র্রা র্রা র্রা -র্সর্রা I
অ ব্ ধ০ রা তে ০ ০ ০ উ ষা র্ উ দ য় স ০০

I র্রা -া -র্জ্ঞা -া । -া -া -া -া I র্রার্রর্মা র্মা র্জ্ঞর্মঃর্জ্ঞঃ । -া র্রা র্সা -া I
ম ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ অ ন০ ব গু০ ০ ণ্ ঠি তা ০

I -া -া -া -া । র্সা র্রা র্রর্সা ণা I -দণা দা পা -া । -া -া -া -া} II II
০ ০ ০ ০ তু মি অ কু ০ণ্ ঠি তা ০ ০ ০ ০ ০

১ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ -কর্তৃক গীত রেকর্ড অবলম্বনে

সম্পাদকের নিবেদন

বিশ্বভারতী পত্রিকার এই সংখ্যায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্বন্ধে কয়েকটি রচনা, এবং ব্রহ্মবান্ধব-সম্পাদিত, বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য, 'সন্ধ্যা' পত্রিকার একটি পাতার প্রতিলিপি প্রকাশ করা হল। যে বৎসর রবীন্দ্রনাথের জন্ম, সেই বৎসরে ব্রহ্মবান্ধবও জন্মগ্রহণ করেন— ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি-উৎসবের মধ্যে আমরা রবীন্দ্রসমসাময়িক ও রবীন্দ্রসুহৃৎ ব্রহ্মবান্ধবকে স্মরণ করার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের ঘনিষ্ঠতার কথা রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেছেন— এই সংখ্যায় সেসব তথ্য বিভিন্ন প্রবন্ধে পরিবেশিত হয়েছে। তার মধ্য থেকে আমরা দু-একটি বিষয় উল্লেখ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চা র অ ধ্যা য় গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে গ্রন্থারম্ভে বলেছেন যে, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত টুয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী মাসিক পত্রে রবীন্দ্রনাথের নৈ বে দ্য গ্রন্থের যে দীর্ঘ আলোচনা করেন তার আগে তাঁর কাব্যের এমন অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ তিনি কোথাও দেখেন নি, এবং শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মবান্ধবকেই তিনি প্রথম সহযোগী পান। এই সময়ে ব্রহ্মবান্ধব রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব উপাধি দেন।

কেবল সমবয়সী না, এর দ্বারা বোঝা যায় যে ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সহমর্মী ও সহকর্মী।

আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। বিশ্বকবি রূপে রবীন্দ্রনাথ বন্দিত ও নন্দিত; রবীন্দ্রনাথকে এই আখ্যায় সর্বপ্রথম ভূষিত ক'রে প্রবন্ধ রচনা করেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। এই সংখ্যায় আমরা উক্ত রচনার অনুবাদ প্রকাশ করেছি।

গত সংখ্যায় আমরা অনুরূপ ভাবে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সমবয়সী বন্ধু ও গুণগ্রাহী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশ করে তাঁর শতবার্ষিক পালন করেছি। এবং, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তির প্রাক্কালে লোকান্তরিতা রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীকে (১৮৭৩-১৯৬০) স্মরণ করার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি।

স্বীকৃতি

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র এবং রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ব্রহ্মবান্ধবের পত্র রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত সুরুদ্দিনের শাদি চিত্রের ব্লক রবীন্দ্রভারতীর সৌজন্যে, 'সন্ধ্যা' পত্রিকা শ্রীসজনীকান্ত দাসের সৌজন্যে, এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ব্লক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

তুষারগিরি
শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮ · ১৮৮৩-৪ শক

চিঠিপত্র

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আজকাল চিঠি লেখা আমার বিরল হইয়া আসিতেছে ইহা হইতে বুঝিবেন আমার বয়স হইয়াছে। এখন শক্তির পুঁজি অল্প তাই টানাটানি করিয়া চালাইতে হয়। কাজকর্মের অতিরিক্ত যে উদ্যমটুকু বাকি থাকে ভবিষ্যতের দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে ব্যাঙ্কে safe deposit-এ চালান করিয়া দিই।

আপনার লেখাগুলি যে আমার মনের মত হইতেছে তাহা আপনাকে জানাই নাই তাহার কারণ আমি নিশ্চয় জানি যে তাহা আপনি নিশ্চয় জানেন। আপনার লেখার জন্য আমি কত উৎসুক হইয়া থাকি তাহা শৈলেশ জানে। আমি বঙ্গদর্শন হাতে লইয়া অবধি বলিতেছি, ভারতবর্ষের পরিচয় লাভ করিতে হইবে ইহাই ভারতবাসীর সর্বপ্রধান কাজ। সেই পরিচয় লাভে আপনি আমাদের সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। গতমাসের 'যবন' প্রবন্ধে ভারতবর্ষের পরিধি যে কিরূপ বিস্তৃত ছিল তাহা আপনি দেখাইয়াছেন। য়ুরোপ জয় করিতে জানে কিন্তু ভারতবর্ষ গ্রহণ করিতে পারিত, একসময়ে ভারতবর্ষ বিনা সৈন্যবলে এশিয়ার অধিকাংশই আপনার করিয়া লইয়াছিল। আপনার 'যবন' প্রবন্ধে তাহারই আভাস পাইয়া আমি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছি। এখন আমাদের প্রাণ নাই বলিয়া গ্রহণশক্তি নাই এখন আমরা কেবল বিশ্বের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া উত্তরোত্তর কৃশ হইতেছি। আবার যখন আমরা সকলকে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারিব, যবন যখন আমাদের সমাজের অন্তর্গত হইবে, তখনই ভারতবর্ষ আপনার চিরদিনের শক্তিকে সার্থক করিবে।

প্রবাসীতে প্রাচীন সংস্কৃত নাটক হইতে আপনি যে ইতিহাস সংকলন করিতেছেন তাহা আমার কাছে বিশেষ উৎসুকজনক বোধ হইয়াছে। এইগুলিই ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাসের উপকরণ। আপনি যদি অনন্যমনা হইয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস সংকলনে প্রবৃত্ত হন তবে আমরা আশ্বস্ত হইতে পারি।

যদি কোন সুযোগে দেখা হয় তবে আপনাকে ইহা লইয়া অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিব। আপনি ওকালতিটা ছাড়ুন। চুপচাপ বসিয়া পড়ুন। মাঠের কোণে আসিয়া একটি কুটীর বাঁধুন। তারপরে হবিষ্যান্ন খাইয়া খাগড়ার কলম ধরিয়া তালপাতে ভারতবর্ষের ইতিহাসকথা লিপিবদ্ধ করুন, ত্রিশকোটি নরনারীর আশীর্বাদভাজন হইবেন। ইতি ১৬ই ভাদ্র ১৩০৯

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ কলিকাতা

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্বক নিবেদন

আপনার সম্পাদিত গৌড়বিবরণ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড কাল পাইয়াছি এবং সকল কাজ ফেলিয়া কালই তাহার অনেকটা অংশ পড়িয়াছি। পড়িয়া বিপুল আনন্দ পাইলাম। গহনের মধ্যে অদৃশ্য গৌড় পুরাবৃত্তের লুপ্তপ্রায় রথচক্ররেখার অনুসরণ করিয়া আপনারা আমাদের দেশের ইতিহাসের যে সুপ্রশস্ত রাজপথ উদ্ঘাটনে ব্রতী হইয়াছেন আপনাদের সেই উদ্যোগ সার্থক হইল। আপনাদের এই তপস্যার পুণ্যফল বঙ্গদেশের সৌভাগ্যরূপে চিরন্তন হইয়া থাকিবে ইহা নিশ্চিতরূপে অনুভব করিয়া আমি আপনাদের জয় কীর্তন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়কে আমার সকৃতজ্ঞ অভিবাদন জানাইবেন। ইতি ৩রা পৌষ ১৩২০

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র ১ এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন-সম্পাদনায় রত। পত্রে উল্লিখিত শৈলেশ = শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

রবীন্দ্র-সুহৃৎ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের (১৮৬০-১৯০৮) উক্তি এখানে উদ্ধারযোগ্য, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন ১৩০৮ বৈশাখ সংখ্যার 'নিবেদন'এ তিনি লেখেন, "বঙ্গদর্শন পুনর্জ্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল।· ·সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি।· ·এক্ষণে রাজকার্য্যোপলক্ষে আমি কলিকাতা হইতে বহুদূরে [ডালটনগঞ্জ : পালামৌ] অবস্থিতি করিতেছি, পূর্ব্ববৎ স্বয়ং ইহার তত্ত্বাবধান করিতে পারিব না। সেইজন্য অনুজ শ্রীমান্ শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিলাম।"— দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শ্রীশচন্দ্র মজুমদার', বিশ্বভারতী পত্রিকা : শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮।

'যবন' প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শন ১৩০৯ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

প্রবাসী'র ১৩০৮ অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্র ও ১৩০৯ জ্যৈষ্ঠ থেকে আষাঢ় সংখ্যায় 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ' শিরোনামায় অক্ষয়কুমারের রচনাবলী প্রকাশিত হয়, 'প্রাচীন সংস্কৃত নাটক হইতে· · ইতিহাস সংকলন' সেই প্রসঙ্গে উক্ত মনে হয়।

রাজশাহী থেকে প্রকাশিত 'হিন্দুরঞ্জিকা'র ৬ অগস্ট ১৯৪১ সংখ্যায় পত্রটি মুদ্রিত।

পত্র ২ অক্ষয়কুমার-সম্পাদিত গৌড়লেখমালা (প্রকাশ ১৩১৯ : ১ সেপ্টেম্বর ১৯১২) ও অক্ষয়কুমারের ভূমিকা সংবলিত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত গৌড়রাজমালা (প্রকাশ ১৩১৯ : ১ জুন ১৯১২) গ্রন্থদ্বয়ের প্রাপ্তিপ্রসঙ্গ হওয়া সম্ভব।

পত্রটি শরৎকুমার রায় রচিত রবীন্দ্রস্মৃতি (১৩৩৮) গ্রন্থে মুদ্রিত।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অক্ষয়কুমারের কয়েকটি পত্র বিশ্বভারতী পত্রিকার দ্বাদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় মুদ্রিত আছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৫

বুধবার, ১২ অক্টোবর, ১৯২৭ সাল।—এখানে একটি বিদ্যালয় আছে, সেটী মুখ্যতঃ বৌদ্ধধর্ম এবং শাস্ত্র পড়াবার জন্য। কিন্তু ইংরেজী আর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাও সেখানে আছে। স্কুলটীর নাম—Vajiravudh School—শ্যামদেশের রাজা বজ্রায়ুধ ষষ্ঠ রামের নামে এই স্কুল। আজ সকাল দশটায় কবির সঙ্গে শ্যাম গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থানুসারে আমরা এই স্কুল দেখ্‌তে গেলুম। প্রথমে এই বিদ্যালয়ে গিয়ে, রাজা বজ্রায়ুধের মূর্তির সামনে একটী বেদির মতন, তাতে কবিকে বাতি আর ধূপ জেলে রাজার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাতে হ'ল। ঐ বিদ্যালয়ের কতকগুলি বৌদ্ধ-ভিক্ষু এবং অন্যান্য অধ্যাপক কবিকে অনুরোধ ক'রলেন, যাঁরা ধর্ম-বিষয়ে উপদেশ দেন, তাঁদের জন্য সিংহাসনের মতন একটী বিশিষ্ট আসন আছে, সেই আসনের উপর ব'স্‌তে। এই আসনকে ওরা পালিতে আর শ্যামীতে 'ধম্মাসন' বলে। কবিকে যথারীতি উপবেশন ক'রতে হ'ল। প্রথমটায় স্কুলের জন-দুই ছাত্রের বক্তৃতা, ইংরেজীতে, হ'ল। তার পর কবিকেও দু-কথা ব'লতে হ'ল। আর শেষে শিক্ষকদের একে একে কবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে' দেওয়া হ'ল।

এর পর আমরা গেলুম এখানকার একটী নূতন বৌদ্ধ মন্দিরে। এই মন্দিরটীর নাম হচ্ছে—Wat Benchama-bophitr অর্থাৎ 'পঞ্চম-পবিত্র মন্দির'। এই মন্দিরের বাড়ীটী হালে তৈরী, সাদা ইটালিয়ান মর্মর প্রস্তরে গঠিত, বাস্তুরীতি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পুরাতন শ্যামদেশীয়। এই অতি সুন্দর মন্দিরটী যেন প্রাচীন আর আধুনিকের সুন্দর সমন্বয়ের চেষ্টায় হ'য়েছে। ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ ক'রছে, আর এর চারি দিক খুব পরিষ্কার ক'রে রাখা হয়েছে। এই মন্দিরের সংলগ্ন একটী গ্যালারী বা লম্বা বারান্দায় নানা দেশ থেকে আনা বিভিন্ন প্রকারের ব্রোঞ্জে-ঢালা বুদ্ধ-মূর্তির সংগ্রহ আছে। আর প্রাচীন বৌদ্ধ-শিল্পের একটী সংগ্রহ-শালাও আছে। এই মন্দিরের সংলগ্ন দু-চারটী ছোটো-খাটো বাড়ী আছে, গড়ন ঠিক মন্দিরেরই মত, শ্যামী পদ্ধতির ঢালু ছাত, তাতেও বুদ্ধ-মূর্তি আছে। এ রকম একটী ছোটো মন্দিরের মাথায়, একটী প্রাচীন শ্যামী লোক-কাহিনীর চিত্র উৎকীর্ণ আছে, কাপড় বোনবার তাঁতের কাছে উপবিষ্ট একটী শ্যামী তরুণীর ছবি—এক রাজকুমার এই মেয়েটীর প্রেমে প'ড়ে তাকে বিয়ে করে—গল্পটী তখন বেশ চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছিল। এ-ছাড়া, বুদ্ধদেবের জীবনীর কতকগুলি সুন্দর খোদাই-চিত্র আছে, যেমন বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগের সময়ে নিজের তলওয়ার দিয়ে মাথার লম্বা চুল কাটছেন, পাশে তাঁর ঘোড়া কণ্টক আর সহিস ছন্দক।

কবির সঙ্গে পরে হোটেলে ফিরে এলুম। তার পরে সুরেন-বাবু আর আমি চ'ল্‌লুম শান্তিনিকেতনের সংগ্রহ-শালার জন্য প্রাচীন মূর্তি কিন্‌তে। সঙ্গে সৈয়দ মোবারক আলীকে তাঁর আপিস থেকে তুলে নিলুম। (গত বার এ নামটী ভুল ক'রে 'সৈয়দ মোহম্মদ আলী' রূপে ছাপা হয়েছিল)। শ্যামের বাজার থেকে আধুনিক শ্যামী ব্রোঞ্জের কতকগুলি মূর্তি আমি নিজে নিলুম—ব্রোঞ্জের উপরেতে সোনার মোলম্বা বা গিল্‌টী করা। দুটী ছোটো-ছোটো বসুধারা বা লক্ষ্মী মূর্তি, হাঁটু গেড়ে শ্যামী ধরণের শাড়ী বা

ফাহুম্ বা লুঙ্গি প'রে আর মাথায় মুকুট প'রে আমাদের মা-লক্ষ্মী ব'সে আছেন ; ডান হাতে ধানের শিষ্ তুলে ধ'রে আছেন। হাঁটু-গেড়ে বসা, মাথায় মুকুট, রাম আর লক্ষ্মণের মূর্তি, রামের গায়ের রঙ ঘন সবুজ ক'রে চিত্রিত ; আর একটী অষ্টভুজা দুর্গামূর্তি— একটী ষাঁড়ের পিঠের উপরে আলীঢ় ভঙ্গিতে ব'সে আছেন— ভঙ্গিটী ঠিক ব'সে থাকা নয়— যেন ষাঁড়ের পিঠে কসরৎ করা, আর মূর্তিটীর দুই-পায়ে এক-জোড়া শুঁড়ওয়ালা নাগরা জুতা পরানো। দেবতার পায়ে জুতা— ভারতীয় দেব-মূর্তির রূপায়ণে এই জিনিসটী প্রায় অজ্ঞাত। খড়ম-পায়ে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি দেখেছি, প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্যে খড়ম-পায়ে নায়িকা বা নর্তকীর মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু দেবতার মধ্যে খালি এক সূর্য্যদেব— আর তাঁর আনুষঙ্গিক পার্শ্বদেবতা ছাড়া আর কারো পায়ে পাদত্রাণ পাওয়া যায় না, সবাই খালি পায়ে। ভারতবর্ষে সূর্য্যদেবের দুইটী রূপ কল্পিত হয়েছে— এক, ব্রাহ্মণ্য বা বৈদিক রূপ, তাতে সূর্য্য চার ঘোড়ার রথে চ'ড়ে র'য়েছেন, তাঁর দুই পাশে তাঁর দুই স্ত্রী— উষা আর শরণ্যু ; আর সঙ্গে দুই ঘোড়ায় চেপে দুই অশ্বিদেব— বা অশ্বিনীকুমার দেবতাদ্বয়। কিন্তু খ্রীষ্ট-জন্মের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের মধ্যে পারস্য দেশ থেকে ওদেশের 'মগ'-পুরোহিতরা— যাঁদের ভারতবর্ষে 'মগ-ব্রাহ্মণ' বা 'শাকদ্বীপী' অথবা 'দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ' বলা হয়— তাঁরা নোতুন ক'রে সূর্য্যের পূজা আনেন ভারতবর্ষে। তাঁরা সূর্য্যদেবের যে মূর্তি ভারতবর্ষে এনে স্থাপিত করেন, সেটী হ'চ্ছে ইরানী পোশাক পরা সূর্য্য, হিন্দু দেবতার মত খালি গায়ে খালি পায়ে নন্। এই নোতুন বা বিদেশী পরিকল্পনার সূর্য্যের মাথায় ইরানী টুপি, গায়ে আঙরাখা, আর পায়ে 'মোচক' বা 'মোজা', অর্থাৎ হাঁটু-পর্য্যন্ত জুতা। কেবল মিত্র বা মিহির বা সূর্য্যদেব যে এই সাজে ভারতে এলেন তা নয়, সূর্য্যের পুত্র, শিকারের দেবতা Raevant 'রএবন্ত' বা রেবন্ত ; আর তাঁর এক অনুচর পিন্দোল— এঁদেরও পায়ে হাঁটু-পর্য্যন্ত জুতা। এই ইরানী মিত্র বা সূর্য্যের প্রভাবে উত্তর-ভারতের প্রায় সর্বত্রই সূর্য্যের মূর্তিতে হাঁটু-পর্য্যন্ত জুতা দেখানোর রীতি এসে গিয়েছিল। দেবতার খালি গা, অন্য হিন্দু দেবতার মত গায়ে প্রচুর গহনা। কিন্তু পা দুটীতে হাঁটু-পর্য্যন্ত জুতা। ইন্দোনেসিয়ায় যবদ্বীপে বলিদ্বীপে (এবং অন্যত্র), এবং বর্মায় আর ইন্দোচীনে (শ্যাম দেশে এবং অন্যত্র) দেবতার পায়ে যে জুতার রেওয়াজ দেখা যায়, তার অন্য কারণ আছে। ভারতবর্ষের ধারণা অনুসারে, দেবতাদের পা কখনো মাটি ছোঁয় না। তাঁরা যদি পৃথিবীতে অবতরণ করেন, শূন্যেই তাঁদের পা থাকে। আর তাঁদের চোখে পলক পড়ে না। আর তাঁদের ফুলের মালা কখনো শুখায় না। দেবতাদের পা যে মাটিতে ঠেকে না— এই ভাবটী বোঝাবার জন্য, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে ভারতীয় দেবতার মূর্তিতে দেখেছি—তাঁদের পায়ে জুতা আঁকা হয়। শ্যাম-দেশেতেও সেই কারণে মা-দুর্গার বৃষভারূঢ় মূর্তিতে পায়ে বেশ শুঁড়-ওয়ালা নাগরা জুতা।

এই মূর্তিগুলি এখন আমার সংগ্রহে আছে। এ-ছাড়া, পরে আর একটী বোধিসত্ত্ব মূর্তি সংগ্রহ করি, এটী ও মোলম্বা-করা ব্রোঞ্জের, শ্যাম-দেশের রাজকুমারের পরিচ্ছদ প'রে দণ্ডায়মান সিদ্ধার্থের মূর্তি, এটীর প্রশংসা আমার শিল্পরসিক বন্ধুরা সকলেই ক'রেছেন।

আগামীকাল সন্ধ্যার পর শ্যামের মহারাজার সঙ্গে আমাদের দেখা করবার কথা। রবীন্দ্রনাথ যাবেন— জরি-পাড় সাদা গরদের জোড়, আর সাদা রেশমের পাঞ্জাবী প'রে। এই পোশাকে তাঁকে যে অদ্ভুত সুন্দর মানাত'— তা আর কি ব'লবো। আমাদের বেলায় অন্য ব্যবস্থা হবে ঠিক হ'ল। শ্যামের লোকেরা, আমাদের ধুতির বদলে, সেলাই-করা লুঙ্গি মালকোঁচা মেরে পরে! এই ভাবে পরা লুঙ্গিকে তারা 'ফাহুম্' বলে,—

মালকোঁচা দেবার দরুন এই ফানুম্ হাঁটুর নীচে নামে না। মহারাজ বজ্রায়ুধের সময় এই ফানুম— যা রাজ-দরবারে প'রে আস্তে হ'ত, তার রঙ্ ছিল নীল— এমনকি শ্যাম সরকারের বেতনভুক্ ইংরেজ অফিসারদেরও রাজ-সভায় এই ফানুম্ প'রে আস্তে হ'ত। মহারাজ বজ্রায়ুধের জন্ম হয়েছিল শনিবার দিন। শনিগ্রহের রঙ্ ব'লে, রাজ-দরবারে ফানুমের জন্য এই নীল রঙের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু উপস্থিত শ্যামদেশের মহারাজার এক বিমাতার মৃত্যুর জন্য রাজ-পরিবারে অশৌচ ছিল— the Court was in mourning. কতকটা ইউরোপীয় রীতি মিশিয়ে রাজসভার জন্য এই অশৌচের পোশাক ঠিক করেছিল এইভাবে— কালো রেশমের ফানুম্, তার উপর সাদা গলা-আঁটা জিনের কোটের আস্তিনে কনুই-এর উপরে কালো রেশমের পট্টী। বিদেশী হ'লেও, আমরা যখন রাজ-দরবারে আনুষ্ঠানিক-ভাবে যাচ্ছি, তখন আমাদের-ও এরকম পোশাক প'রে যাওয়া উচিত হবে— এ রকম একটা প্রস্তাব শ্যামদেশের সরকার পক্ষ থেকে এসেছিল। রবীন্দ্রনাথের কথা আলাদা। আমাদের জন্য— অর্থাৎ সুরেনবাবু, আরিয়াম আর আমার জন্য ঠিক হ'ল যে, আমরা কালো সিল্কের ধুতি প'রে যাবো, আর তার উপর সাদা পাঞ্জাবী থাকবে। এখন কালো সিল্কের ধুতি পাই কোথায়? শেষটায় বাজারে গিয়ে ধুতির অভাবে প্রমাণ মাপের কালো সিল্কের কাপড় কিনে নিয়ে এসে, তাকে ধুতির আকারে কেটে নিয়ে পরবার ব্যবস্থা হ'ল। তার পাড়ের কোন বালাই রইল না— তবে যদি রঙীন ফুল পাতার নকশা-কাটা সাটিনের ফিতা লাগানো যেত, পাড়ের জন্য, তা হলে অতি সুন্দর 'পার্শী শাড়ী' হ'ত, যে 'পার্শী শাড়ী' আমাদের শিশুকালে অর্থাৎ ৬০.৬৫ বছর আগে বাঙলাদেশের মেয়েদের খুব প্রিয় ছিল। বাজারে গিয়ে আমরা আজ সকালে প্রমাণ-সই সিল্ক-এর থান কিনে দরজির দোকানে ধুতির মত ক'রে কেটে তৈরী ক'রতে দিয়ে এলুম।

দুপুরের আহার সেরে দুটোর সময় সুরেনবাবু এবং আমি চ'ল্‌লুম ভারতীয়দের কেন্দ্রে, English Pharmacy-র দোকানে। এখানে শ্রীযুক্ত ওহায়েদ আলী আর তাঁর আত্মীয় ২।১ জন এসেছিলেন। এঁরা ব'লেছিলেন যে, এখানকার ভারতীয় ব'লতে ভোজপুরিয়া দরওয়ান আর দুধের ব্যবসায়ী, আর পাঞ্জাবী দোকানদার আর ঠিকাদার, এরাই সংখ্যায় বেশী। এদের অনেকের টাকা আছে, কাজেই এদের ব'ললে বিশ্বভারতীর জন্য কিছু চাঁদা এরা তুলে দিতে পারবে। সৈয়দ মোবারক আলী আর ওয়াহেদ আলীর কথা-মতন আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল স্থানীয় বিষ্ণু মন্দিরের পূজারী শ্রীযুক্ত সুন্দরলালের কাছে। এখানকার হিন্দুরা অর্থাৎ বেশীর ভাগই ভোজপুরিয়ারা চেষ্টা ক'রে বাঙ্কক্ শহরের একটী শহরতলী অঞ্চলে শস্তায় জমি সংগ্রহ ক'রে একটী বিষ্ণু-মন্দির ক'রেছেন। শ্যামদেশের বৌদ্ধদের মধ্যে বিষ্ণুর সম্মান এখনও খুব বেশী রকম দেখা যায়। এই মন্দিরে হিন্দী পড়াবার ব্যবস্থা আছে। শ্রীযুক্ত সুন্দরলালের বাড়ী ছিল পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে, আজ প্রায় ১৮ বছর সপরিবারে এখানে আছেন। লোকটীকে খুব ভালো লাগ্‌ল। উদার-হৃদয় মানুষ, আর সব বিষয়ে এঁর খুব উৎসাহ। একটী ছোটো কাপড়ের দোকান ওখানে করেছিলেন, সে দোকান অনেক দিন হ'ল তুলে দিয়েছেন। এই ১৮ বছরেব মধ্যে মাত্র ৪ বার দেশে গিয়েছিলেন। ইনি যতটুকু সাহায্য ক'রতে পারেন ক'রবেন ব'ললেন। এঁদের এখানে ভারতীয় ভাষা আর ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দেবার জন্য শিখ, আর্য্য-সমাজী আর সনাতনী হিন্দু, এই তিন দলের তরফ থেকে আলাদা-আলাদা ব্যবস্থা আছে, তিনজন ওস্তাদ বা উপ্‌দেশক বা গুরু আছেন এই তিন সমাজের ছেলেদের 'দেখ্‌-ভাল্' কর্‌বার জন্য। এই শিক্ষকদের ৬০।৬৫ টিকল ক'রে মাইনে দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত সুন্দরলালের কাছ থেকে, আমাদের এখানকার

একজন গুজরাটী ব্যবসায়ীর বাড়ীতে নিয়ে গেল। এঁর নাম অম্বালাল, ইনিও সপরিবারে আছেন। তবে বোঝা গেল, এঁরা কেউই ধনকুবের নন, সাধারণ ব্যবসায়ী মাত্র।

এর পর আমরা খানিকটা শহরের মধ্যে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ালুম, কতক পথ গাড়ীতে ক'রে, আর কতক পথ পায়ে হেঁটে। বাঙ্কক্ শহরের প্রাণের একটা স্পন্দন অনুভব করা গেল। সন্ধ্যার পর কবিকে ওঁরা নিয়ে গেলেন লঞ্চে ক'রে বাঙ্কক্-এর নদীতে একটু ঘুরিয়ে' আনবার জন্য— ওঁর ফিরতে একটু দেরি হ'য়ে গেল।

আজকে রাত্তের আহারের পর আমার একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল— ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে, ব্যবস্থা হ'য়েছিল এখানকার টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন বা শিক্ষকদের সমিতির তরফ থেকে। বক্তৃতা হ'য়েছিল এখানকার সরকারী শিল্প-কলা-বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয় বাড়ীটার সাজসজ্জা বেশ একটু লক্ষণীয়। শিল্প-কলা-বিদ্যালয়— তাই এর প্রধান প্রবেশদ্বারের মাথায় একটী উপবিষ্ট বিশ্বকর্মা দেবতার ব্রোঞ্জ-এর মূর্তি স্থাপিত আছে। মূর্তিটি হিন্দু দেবতার মত, কিন্তু হাঁটু পর্যন্ত আঁটা চিত্রবিচিত্র নকশা-কাটা পায়জামা পরা, মাথায় মুকুট, গলায় হার, একহাতে একটী ওলন আর অন্য হাতে একটী মাপের দণ্ড। শিল্পকলা বিদ্যালয়ের পক্ষে এই মূর্তির একটা উপযোগিতা আছে। আমার বেশ লাগ্‌ল। আমার শ্রোতা হিসেবে অনেকগুলি ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন। এখানকার রাজপরিবারের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, শ্যামের মহারাজার এক পিতৃব্য, রাজকুমার ধনিনিবাৎ, শিক্ষামন্ত্রী, স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। আর অন্য একজন রাজকুমার। স্যার এডওয়ার্ড কুক এবং তাঁর পত্নী, আর ২।১ জন অন্য ইউরোপীয় মহিলা। বিস্তর শ্যামী মহিলা। আর ভারতবাসীও অনেকগুলি ছিলেন। এ-ছাড়া এখানকার বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত, প্রাচীন ইন্দোচীনের ইতিহাস-বিষয়ে একজন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ Dr. Coedes সেদেস্‌-ও উপস্থিত ছিলেন। আমার বক্তৃতা সওয়া ন-টা থেকে প্রায় সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত চলেছিল। বক্তৃতার সময় আমি প্রায় ৬০খানি ভারতীয় চিত্রের স্লাইড দেখালুম— এই স্লাইডগুলি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয় আমার এই দ্বীপময় ভারত যাত্রার জন্য ব্যবহার ক'রতে দিয়েছিলেন। ছবিগুলি থাকায়, অজন্টা থেকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস কতকটা চাক্ষুষ করিয়ে দেখানো গিয়েছিল। বক্তৃতা হ'য়ে যাবার পরে, এঁদের সরকারী শিল্প-কলা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্লাইডগুলি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন— সেগুলি থেকে তাঁর ইস্কুলের কাজের জন্য এক সেট্ ফোটো-প্রিন্ট করিয়ে' নেবেন, আর এক সেট্ আমাকেও দেবেন। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে এঁদের এই আগ্রহ দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল। শ্যামের শিল্প, ইন্দোচীনের অন্য দেশের, ইন্দোনেশিয়ার, আর আফগানিস্থানের এবং তিব্বতের প্রাচীন শিল্পের মত, ভারতীয় শিল্পেরই একটা অংশ মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাহিনীর কালপারম্পর্য ও স্থানপটভূমি

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বর্ণিত ঘটনাগুলির সংঘটন-কাল কবি বহু জায়গায় স্পষ্ট অথবা অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এই উল্লেখগুলি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এই বিক্ষিপ্ত উল্লেখগুলি এক জায়গায় সংগ্রহ করলে রাধাকৃষ্ণ-কেলিকথার কাল-পটভূমি কবি কিভাবে বিন্যস্ত করেছেন তার আভাস পাওয়া যাবে। কাব্যের কাহিনীর প্রতিটি স্তর স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে গেলে এই উল্লেখগুলির প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয়ত, এই নির্দেশগুলির মধ্যে কোনোপ্রকার অসঙ্গতি আছে কিনা সেটা অনুধাবনযোগ্য। সমগ্র কাব্যখানি যদি এক কবির রচনা হয় তাহলে বর্ণিত ঘটনার কাল-নির্দেশে সঙ্গতি থাকা স্বাভাবিক। সে সঙ্গতি পদাবলী-সাহিত্যে না থাকতে পারে; কারণ, পদাবলীতে ঘটনাংশ গৌণ। যেটুকু ঘটনা আছে তার সূত্রও বিভিন্ন কবির রচনার মধ্যে, একজন কবির হাতে নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঘটনাবহুল কাব্য এবং প্রচলিত ধারণানুযায়ী এই কাব্যের রচয়িতা একজন। সে ক্ষেত্রে কাব্যের ঘটনার কাল-নির্দেশে অসঙ্গতি থাকলে তা উপেক্ষণীয় নয়। অসঙ্গতি থাকলেই অবশ্য প্রমাণ হয় না কাব্যের রচয়িতা একাধিক। তবে কাব্যের একাধিক রচয়িতার সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে গেলে অন্য আরও প্রমাণের সঙ্গে এই অসঙ্গতিগুলিও অন্যতম প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে। সেদিক থেকে নির্দেশগুলি মূল্যবান্ এবং এগুলিকে একত্র সংগ্রহ করবার সার্থকতা আছে।[১]

২

কালের পারম্পর্য অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাহিনীর ঘটনার ধারা অনুসরণ করতে গেলে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় যে কাহিনীর মধ্যে দুটি স্তর আছে। তাম্বূলখণ্ড থেকে ছত্রখণ্ড পর্যন্ত একটি স্তর এবং বৃন্দাবনখণ্ড থেকে রাধাবিরহ পর্যন্ত আর-একটি স্তর। এই স্তরভাগের যুক্তি প্রধানত দুটি। প্রথমত, তাম্বূল- থেকে ছত্র-পর্যন্ত ঘটনাগুলি যথাক্রমে বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ কালের ঘটনা। বৃন্দাবনখণ্ডে দ্বিতীয়বার বসন্ত এসেছে সুতরাং বৃন্দাবনখণ্ড থেকে যে-কাহিনী বিবৃত হয়েছে তা নূতন আর-এক বছরের ঘটনা। দ্বিতীয়ত, ছত্রখণ্ডের পর কাহিনীতে কিছুকালের ছেদ পড়েছে। ছত্রখণ্ড শেষ হয়ে বৃন্দাবনখণ্ড শুরু হওয়ার মধ্যে সম্ভবত এক বছরের কালগত ব্যবধান ছিল। ছত্রখণ্ড পর্যন্ত রাধার বয়স এগারো।[২] বাণখণ্ডে রাধার বয়স চৌদ্দ—

দশ চারি বরিষের হওঁ মো গোআলী পৃ. ১০৭

---

১ জন্মখণ্ড এ আলোচনায় বাদ দেওয়া হয়েছে। মূল কাব্যের সঙ্গে জন্মখণ্ডের অনেক অমিল আছে। প্রসঙ্গান্তরে সে অমিলগুলি দেখানো যাবে। এখানে যে লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে কাহিনীর কালক্রমটি অনুসরণ করেছি তাতে জন্মখণ্ড আমাদের প্রয়োজনে আসে নি। উদ্ধৃতিতে যে পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া আছে সেগুলি বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত চতুর্থ সংস্করণের (১৩৫৬) পৃষ্ঠাসংখ্যা।

২ দানখণ্ডে রাধার দুইরকম বয়সের উল্লেখ আছে— এগারো এবং বারো। বয়স সম্পর্কে রাধার নিজের কথায়ও সঙ্গতি নেই। কৃষ্ণ কিন্তু রাধাকে বরাবর বারো বছরের বলে মনে করেছে। রাধার বয়সের ইঙ্গিত দানখণ্ডে এই কয়েকটি জায়গায় পাওয়া যায়। —

১. এগার বৎসরের বালী।
যেহ্ নলিনীদল কোঁঅলী॥ পৃ. ১৪

বাণখণ্ডের আগেও যমুনাখণ্ডেই রাধা 'ভরযুবতী'।

এত কাল রাধা তোর গেল শিশুভাবে।
তেঁসি না জাণিলি নিজ আপণ লাভে ॥
এবেঁ তোহ্মে আসি ভৈলা এ ভর যুবতী।
তভোঁ কি কারণে তোঞ করসি বিমতী ॥ পৃ. ৯৯

তাম্বুল- দান- নৌকা- ভার- ও ছত্র -খণ্ডের 'আবালী রাধা' যমুনাখণ্ডে 'ভরযুবতী'। তাম্বুলখণ্ডের একাদশী রাধা বাণখণ্ডে চতুর্দশী। রাধার কৈশোর থেকে যৌবনপ্রাপ্তি ঘটেছে সম্ভবত বৃন্দাবনখণ্ডের আগে। কারণ, বৃন্দাবনখণ্ড থেকে বাণখণ্ড পর্যন্ত কাহিনীর ধারাবাহিকতা কোথায়ও ক্ষুন্ন হয় নি। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে কাহিনী কালের দিক থেকে এগিয়ে বা পিছিয়ে যায় নি। সুতরাং রাধার এই পরিবর্তন একমাত্র বৃন্দাবন-খণ্ডের আগেই হওয়া সম্ভব। রাধার বয়সের দিক থেকেও এই অনুমানের সপক্ষে যুক্তি আছে। তাম্বুলখণ্ডে রাধার এগারো বছর বয়সই ঠিক। তাম্বুলখণ্ড বসন্তকালের ঘটনা এই সময় যদি রাধার বয়স এগারো বছর হয় তাহলে বৃন্দাবনখণ্ডের বসন্তকালে বারো হওয়া উচিত কিন্তু কাব্যের নেপথ্যে একটি বছর কেটে গেছে তাই বৃন্দাবনখণ্ডে রাধার বয়স তেরো। বাণখণ্ড আর-একটি বসন্তের ঘটনা (কাব্য শুরু হওয়ার পর চতুর্থ বসন্ত) সুতরাং এই সময় রাধার বয়স চৌদ্দ। সেই কারণে স্বীকার করতে হবে যে ছত্রখণ্ডের শেষে এবং বৃন্দাবনখণ্ডের আগে কাহিনীতে একবছরের ছেদ পড়েছে। এই যুক্তিতে বৃন্দাবনখণ্ডের আগের ঘটনাগুলি প্রথম স্তরের, বৃন্দাবনখণ্ড থেকে কাহিনীর দ্বিতীয় স্তরের শুরু।

৩

তাম্বুল- দান- নৌকা- ভার- ছত্র -খণ্ড যথাক্রমে বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ কালের ঘটনা। তাম্বুলখণ্ডে বসন্তকালেই বড়াইর কাছে রাধার রূপবর্ণনা শুনে কৃষ্ণ মদন-শরাহত হয়।

কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ।
তাত মধুকর মধু পীএ ॥
সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে।
তেকারণে থীর নহে মনে ॥ পৃ. ৫

২. বারহ বরিষেকের মোর মাহাদান। পৃ. ১৭
৩. সকল বএসে মোর এগার বরিষে।
বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে ॥ পৃ. ১৮
৪. বারহ বরিষের দান সুনহ মুগধী। পৃ. ১৭
৫. এগারো বরিষে কাহ্নাঞি বারো নাহি পূরে। পৃ. ২৩
৬. এ বার বরিষ মোর তের নাহিঁ পূরে। পৃ. ২৮
৭. দধি বিকে জাইএ বড়ায়ি বারহ বৎসর। পৃ. ৩৮
৮. বার বৎসরের তোএঁ সি বালী। পৃ. ২৪
৯. বার বরিষের আহ্মার দান। পৃ. ৩৫
১০. বার বরিষের মোর মাহাদান। পৃ. ৪৩

দানখণ্ডে স্পষ্টত কালের উল্লেখ নেই। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। নৌকাখণ্ড বর্ষাকালের ঘটনা। কৃষ্ণকে বড়াই বলেছে :

উপসন্ন হৈল হের বরিষা সমএ ॥
আহ্মে রাধা লআঁ যাইব মথুরার হাটে।
নাঅ লআঁ থাক তোহ্মে যমুনার ঘাটে ॥ পৃ. ৫৫

ভার- ও ছত্র- খণ্ড শরৎকালের ঘটনা।

উপস্থিত ভৈল বড়ায়ি শরত সমএ।
তড়পথে এবেঁ লোক মথুরাক জাএ ॥ পৃ. ৬৬

স্পষ্ট নির্দেশ না থাকলেও বুঝতে হবে দানখণ্ড গ্রীষ্মকালের ঘটনা। কারণ, দান-এর আগে তাম্বুল ও পরে নৌকা- যথাক্রমে বসন্ত ও বর্ষার ঘটনা। বসন্ত ও বর্ষার মাঝে অবশ্যই গ্রীষ্ম ; যদি অবশ্য কাহিনী দু-এক বছর এগিয়ে পিছিয়ে না গিয়ে থাকে। কিন্তু তেমন ইঙ্গিত এই পাঁচটি খণ্ডের মধ্যে নেই। সুতরাং এমন অনুমান অপরিহায যে তাম্বুল-দান-নৌকা-ভার-ছত্রখণ্ডে একই বছরের বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ও শরৎ কালের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এইটি কাহিনীর প্রথম স্তর। এই স্তরের ঘটনাগুলির কালপারম্পর্য এবং সময়ের ক্রমটি কবি সযত্নে রক্ষা করেছেন। ঘটনার সূত্রগুলি জট পাকিয়ে যায় নি। এক-এক দিনের ঘটনা কবি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে বিবৃত করেছেন।

তাম্বুলখণ্ড প্রত্যূষের ঘটনা। গোপীরা 'বড়ই বিহানে'[৩] মথুরা যাত্রা করে। মথুরা যাওয়ার পথেই তাম্বুলখণ্ডে বড়াই রাধাকে হারিয়ে ফেলেছিল। সুতরাং তাম্বুলখণ্ডের মূল ঘটনা সকাল বেলাকার।[৪]

দানখণ্ড সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটি গোটা দিনের ঘটনা। ঘটনা শুরু হয়েছে সকালেই ; কারণ, মথুরা যাওয়ার পথেই কৃষ্ণ রাধাকে আটকেছে। বেলা যখন দ্বিপ্রহর তখনও রাধা-কৃষ্ণের কথা-কাটাকাটি চলছে :

ঘৃত দধি দুধ নঠ কইলি আরে র কাহ্নাঞিঁ ল
আম্বল কৈলোঁ দহী ॥
কি আরে কাহ্ন
পুবের সুরুজ পশ্চিমে আথ জাএ ল। পৃ. ৩১

বেলা যখন তিনটে তখনও রাধা কৃষ্ণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি :

বিহাণ আইলাহোঁ ভৈল তিঅজ পহর। পৃ. ৩০

---

৩ 'বড়ই বিহাণে' অর্থে যে ভোর পাঁচটা তা পরের আলোচনায় স্পষ্ট হবে।

৪ তাম্বুলখণ্ডে কাহিনীতে সামান্য কয়েকদিনের ছেদ থাকতে পারে। বড়াই ও কৃষ্ণের চুক্তির (পৃ. ১১) পর কয়েকদিন বড়াই রাধাকে নির্বিঘ্নে মথুরা থেকে ফিরিয়ে এনেছে। কৃষ্ণ-রাধার সাক্ষাৎ হয় নি।

হেনমতে নিতি নিতি মথুরা নগরে।
দুধ বিকনিআঁ রাধা আইসে ঘরে। পৃ. ১২

'কালক্ষেপাসহঃ' কৃষ্ণ বড়াইকে বলেছে 'এতদিন গেল বড়ায়ি তোর আশোআসে' (পৃ. ১২) এই 'এতদিন' খুব বেশী দিন হতে পারে না। বড় জোর দু চার দিন।

সন্ধ্যার কিছু আগে পর্যন্ত কৃষ্ণ 'কুতঘাটে' রাধাকে আটক রেখেছে :

সাজ ভৈল আইলোঁ বিহাণে। পৃ. ৩৩

এর পর সূর্য যখন অস্তে যাচ্ছে তখন 'একসরী' রাধা 'মাঝ বৃন্দাবনে' কৃষ্ণের হাতে পর্যুদস্ত :

এড় কাহ্নাঞি যাইব দূর অস্ত যাএ সুর। পৃ. ৫০

নৌকাখণ্ডও সকালবেলাকার ঘটনা। তবে প্রত্যূষের নয়। 'ঘাটোআল' কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের সাক্ষাতের আগে বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে :

বিহাণ আইলাহোঁ এথা বেলা আপার। পৃ. ৫৭

এর পর কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার যখন কথা-কাটাকাটি চলছে তখন বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে, হাট প্রায় শেষ হওয়ার মুখে :

হাট উখুড়িবে প্রচুর ভৈল বেলা। পৃ. ৬২
সাত ঘটি গেল হএ দুঅজ পহর।
গোঠে হৈতেঁ আসিবে গোআল মোর ঘর॥ পৃ. ৬৩

'সাতঘটি' সময় যদি কেটে গিয়ে থাকে এবং এখন যদি দ্বিপ্রহর অর্থাৎ বেলা বারোটা হয় তাহলে বুঝতে হবে গোপীরা ভোর পাঁচটায় বাড়ি থেকে রওনা হত এবং বারোটার আগেই গোকুল ফিরে গিয়ে স্বামী-সজ্জনদের পরিচর্যা করত।[৫]

ভার- ও ছত্র- খণ্ড একই দিনের ঘটনা। ভার- মথুরা যাওয়ার পথের ঘটনা সুতরাং পূর্বাহ্নে ঘটেছিল, ছত্র- মথুরা থেকে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা সুতরাং দ্বিপ্রহরে ঘটেছিল।

৪

কাহিনীর দ্বিতীয় স্তরে কালের পারম্পর্যে কিছু গোলমাল আছে। কিন্তু কালের ক্রম ঠিক করবার আগে ঘটনার এবং সময়ের ক্রমটি ঠিক করে নেওয়া দরকার।

---

৫ রাধার সব উক্তিকে সমান গুরুত্ব দেওয়া যায় না। তার কোন্ উক্তি ছলনা কোন্‌টা সত্যভাষণ তা বোঝা কিছু শক্ত। নৌকাখণ্ডে রাধা বলেছে 'হাট উখুড়িবে প্রচুর ভৈল বেলা' (পৃ. ৬২)। এতে মনে হয় মথুরার হাট সকালে বসে দ্বিপ্রহরের আগে উঠে যায়। এটা যে ঠিক তার প্রমাণ ছত্রখণ্ডে মথুরা থেকে দ্বিপ্রহরের সময়ই গোপীরা হাট করে বাড়ি ফিরছিল। তবু তাম্বুলখণ্ডে যখন সূর্য অস্তে যাচ্ছে তখন রাধা মথুরার হাটে যেতে উৎসুক কেন? বড়াই বাড়ি ফিরে যেতে চায়—'না জাইব আল রাধা মথুরা নগর'। রাধা বলেছে—'আন পথে যাইব বিকে মথুরার হাটে'। তাছাড়া খাশুড়ীকে রাধার প্রচণ্ড ভয়। পাছে শাশুড়ী চিন্তিত হয় (এবং সখীরা খাশুড়ীর কাছে রাধার বিরুদ্ধে কিছু লাগায়) সেই কারণে রাধা ছত্রখণ্ডে সখীদের দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছে—'রৌদ পাড়িআঁ আহ্মে জাইব ঘর। বুলিহ খাশুড়ী থানে এসব উত্তর' (পৃ. ৭৫)। নৌকাখণ্ডেও রাধা বলেছে দুপুর বেলায় তার স্বামী বাড়ি ফিরে আসে। সে-সময় রাধাকে বাড়ি না পেলে বড় 'খঙ্গাইবে।' এগুলি যদি ছলনা না হয় তাহলে দানখণ্ডে সন্ধ্যে পর্যন্ত রাধা কিভাবে মাঝবৃন্দাবনে সময় কাটিয়েছিল? বিকাল বেলায়ও হাটে যাওয়ার জন্য (বড়াইর অসম্মতি সত্ত্বেও) রাধার ঔৎসুক্য ছিল কেন? এর একমাত্র ব্যাখ্যা এই—কৃষ্ণের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে রাধার মনেও রতি ইচ্ছা জেগেছিল। তবে লজ্জা নির্মূল হয় নি, তাই সন্ধ্যে পযন্ত অপেক্ষা। এর স্বপক্ষে আরও একটি যুক্তি এই যে রতি-সম্ভোগে রাধার সম্মতি ছিল।

রাধার বচন পাআঁ হরষিত মনে।
কিশলয় শয়নে সুরতী কৈল কাহ্নে। পৃ. ৬৩

বৃন্দাবন- এবং কালিয়দমনখণ্ড একই দিনের ঘটনা কিনা সে-সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া শক্ত। বৃন্দাবনখণ্ডে বনবিলাসের পর কৃষ্ণ গোপীদের বিদায় দিল 'মথুরা নগর যাইতেঁ', এবং ঠিক করল 'জলকেলি করিবারেঁ'। সেই উদ্দেশ্যে কালীনাগকে দমন করবার জন্যে কৃষ্ণ কালিদহে ঝাঁপ দিল।[৬] কালীদহে কালীনাগের বিষে কৃষ্ণ যখন অচৈতন্য এমন সময় 'গোপযুবতী বৃন্দাবন দিআঁ মথুরাক কৈল গতী'। এখন প্রশ্ন, কৃষ্ণ গোপীদের বিদায় দিয়ে সেই দিনই কি কালীদহে ঝাঁপ দিয়েছিল ? এবং গোপীরা কি মাঝবৃন্দাবনে কৃষ্ণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেইদিনই মথুরায় যাওয়ার পথে কালীদহে কৃষ্ণকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখেছিল ? বিবরণ দেখে মনে হয় একই দিনের ঘটনা। অর্থাৎ কৃষ্ণ গোপীদের বিদায় দিয়ে সেই দিনই কালীদহে ঝাঁপ দিয়েছিল। তবে কাব্যের মধ্যে এমন ইঙ্গিত নেই যাতে নিঃসংশয় হওয়া যায়। নিঃসংশয় হতে গেলে প্রমাণ হওয়া দরকার যে 'মাঝবৃন্দাবন' (যেখানে কৃষ্ণ কুঞ্জ তৈরী করেছে) থেকে মথুরায় যাওয়ার পথে কালীদহ পড়ে না। কিন্তু স্থানের উল্লেখে কবি তেমন সতর্ক নন, বিশেষত কাহিনীর দ্বিতীয় স্তরে। বৃন্দাবনের 'বন-বিলাস' এবং 'কালিয়দমন' একদিনের ঘটনা যদি নাও হয় ঘটনা দুটির মধ্যে কালের ব্যবধান খুব বেশি না হওয়াই সম্ভব।

যমুনাখণ্ডের চারটি প্রসঙ্গ — ১. জল-শোধন অর্থাৎ কালিয়দমন (সম্ভবত পৌরাণিক গুরুত্বের জন্য এটি স্বতন্ত্র খণ্ডের মর্যাদা পেয়েছে), ২. জলাকর্ষণ ৩. স্নান-লীলা ৪. বস্ত্রহরণ।

বৃন্দাবন- ও কালীয়দমন খণ্ড একই দিনের ঘটনা বলে ধরছি। জলাকর্ষণ প্রসঙ্গের সময় অথবা কালের উল্লেখ নেই। স্নানলীলা সন্ধ্যার ঘটনা। বস্ত্রহরণ স্নানলীলার পরের দিনের সকালের ঘটনা।

জলাকর্ষণ—স্নান-লীলা—বস্ত্রহরণ সম্ভবত পরপর তিনটি দিনের ঘটনা।

বাণখণ্ড সকালবেলার ব্যাপার। তবে রাধাকে পুনর্জীবিত করতে বেলা দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল—'বিহাণ আইলাহোঁ হৈল দুঅজ পহর'।

. বংশীখণ্ডে চার দিনের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। ১. একদিন যমুনার ঘাট থেকে রাধা বংশীধ্বনি শুনে 'জল লআঁ ঘর আয়িলী আইহনের রাণী' (পৃ. ১১৬), ২. আর একদিন সকালে (খুব সম্ভব পরের দিন) বংশীর ধ্বনি অনুসরণ করে কৃষ্ণকে খুঁজতে বড়াইকে সঙ্গে করে রাধা যমুনাতীরে এসেছে। এইদিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কৃষ্ণের অনুসন্ধান চলেছিল—'বিহাণ আইলাহোঁ হৈল সাঁঝ উপসন' (পৃ. ১২১)। কৃষ্ণকে পাওয়া গেল না। ঠিক হল, 'কালী পরভাতে আসি চাহিব কাহ্নাঞিঁ' (পৃ. ১২১)। সেইদিন রাত্রে রাধা চার প্রহরে চারটি স্বপ্ন দেখে প্রভাতে কৃষ্ণের বিরহে মূর্ছা গেল। ৩. তার পরের দিন বড়াইর পরামর্শে রাধা যমুনার ঘাট থেকে নিদ্রিত কৃষ্ণের বাঁশি চুরি করে ঘরে নিয়ে এলো।[৭] ৪. চতুর্থ দিনে গোপীরা নিয়মমত মথুরায়

---

৬ কালিয়দমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও কবি মনস্থির করতে পারেন নি। কৃষ্ণ একবার বলেছে 'কালী দলিআঁ জল করিআঁ নির্মল। তাহাত করিবোঁ জলকেলি ॥' (পৃ. ৯১); পরে আছে 'এহার পানী খায়িতেঁ সব জনে। এ কারণে কৈলোঁ কালীদমনে ॥' পৃ. ৯৪। এই অসঙ্গতির ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের কেলি গোপন ব্যাপার। তাই কালীদমনের গুহ্য উদ্দেশ্য 'জলকেলি'। কিন্তু নন্দযশোদার সামনে অন্য উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। এখানেও কবি কাহিনীর পৌরাণিক এবং লৌকিক ধারাকে একত্রে মিশিয়ে দিয়েছেন।

৭ রাধা নিশ্চয়ই ঘরে এসে বাঁশি রেখে আবার যমুনার ঘাটে গিয়েছিল নতুবা ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কাছে জোড়হাত করে কি করে ?

যাচ্ছে তখন কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার ‘তণ্ডী’ শুরু হল। সেইদিনই বাঁশি ফেরত দিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা আপোষ চুক্তি করল।

রাধাবিরহে প্রথমে দুই দিনের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। রাধার বিরহ শুরু হয়েছে চৈত্রমাসে। রাধা তখন কদমতরুতলে বাস করছে। কদমতলায় শুয়ে রাধা একদিন রাত্রিতে স্বপ্নে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনলো। সেই কথা পরের দিন সকালে বড়াইকে বলা হলে বড়াই বলল ওটা স্বপ্ন নয়—‘বাঁশী বাইআঁ প্রভাতে গেলাস্তি গদাধর’ (পৃ. ১৩৯)। সেইদিনই রাধাকৃষ্ণের মিলন এবং মিলনান্তে সুপ্ত রাধাকে পরিত্যাগ করে কৃষ্ণের মথুরা প্রস্থান। পরে দুটি পদে রাধার জেঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদর-আশিন মাসের বিরহের দশা বর্ণিত হয়েছে।

৫

কালের দিক থেকে বৃন্দাবনখণ্ড বসন্তকালের ঘটনা। বসন্তের স্পষ্ট উল্লেখ অবশ্য নেই তবে বর্ণনা দেখে অনুমান করা যায় কালটা বসন্ত। যেমন,

এবেঁ মলয় পবন ধীরে বহে ল।
মনমথক জাগাএ ॥ ল ॥
সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ।’ পৃ. ৭৮

বৃন্দাবন ও কালীয়দমন খণ্ড একই দিনের ব্যাপার সুতরাং ‘কালীয়দমন’ও বসন্তকালের ঘটনা।

স্নান-লীলা গ্রীষ্মকালের ঘটনা—

‘উপস্থিত হৈল হের গিরীশ সমএ।
শীতল গম্ভীর জলে রহিতে সুখাএ ॥ পৃ. ১০০

জলাকর্ষণ, স্নানলীলা এবং বস্ত্রহরণ সম্ভবত পর পর তিনটি দিনের ঘটনা। এ অনুমান ঠিক হলে এই তিনটি ঘটনাই ঘটেছিল গ্রীষ্মকালে।

বাণখণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বসন্তকালে—

শীতল সমীর জনমনোহর
কোকিল পঞ্চম গাএ।
সব তরুগণ বিকাস কুসুম
ভ্রমর কাঢ়এ রাএ ॥ পৃ. ১০৬

বংশীখণ্ড বসন্তকালের ঘটনা—

চারিদিগে তরু পুষ্প মুকুলিল বহে বসন্তের বাএ। পৃ. ১১৭

বংশীখণ্ড যদি প্রকৃতই বসন্তকালের ঘটনা হয় তাহলে বড়াইর এই উক্তিটি অসঙ্গত—

‘যমুনা নদীতে মো কেমনে হৈবোঁ পার। ঘড়িয়াল কুম্ভীর তাহাত আপার ॥ পৃ. ১১৭

ভারখণ্ডে আছে—

উপস্থিত ভৈল বড়ায়ি শরত সমএ।
তড়পথেঁ এবেঁ লোক মথুরাক জাএ॥ পৃ. ৬৬

'তড়পথে' শব্দটির অর্থ কি? গোপীরা বরাবরই ত তড়পথে অর্থাৎ পায় হাটা পথে মথুরা যায়। সুতরাং তড়পথে অর্থে বুঝতে হবে শরৎকালে যমুনা নদী শুকিয়ে যায় এবং পায় হেঁটে জলহীন যমুনা পেরিয়ে মথুরা যাওয়া যায়। আসল কথা, এই সময় যমুনা পার হওয়ার জন্য ঘাটিয়ালের শরণাপন্ন হতে হয় না। এই অর্থ যদি ঠিক হয় অর্থাৎ যমুনা যদি প্রকৃতই শরৎকালে শুকিয়ে যায় তাহলে বসন্তকালেও যমুনা জলহীন থাকে। সম্পূর্ণ জলহীন না হক 'ঘড়িয়াল-কুম্ভীরের' প্রাচুর্য একেবারেই অসম্ভব। তাহলে বড়াই কি মিথ্যে কথা বলেছে? মিথ্যে কথা বলা বড়াইর পক্ষে অসম্ভব নয়, তবে এমন মিথ্যে বড়াই বলবে না যা রাধা মিথ্যে বলে ধরতে পারবে। বসন্তকালে যমুনায় জল থাকে কি থাকে না সে-বিষয়ে রাধার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বড়াইর চেয়ে কম নয়। সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়ায় কবি কালের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন সেটা কি ঠিক নয়? সমস্যা আরও গুরুতর হয় যখন দেখি একই পদের মধ্যে বসন্তকালের ইঙ্গিত আছে ('বহে বসন্তের বাএ' পৃ. ১১৬) আবার একথাও আছে যে কৃষ্ণের বাঁশীর ধ্বনি শুনে রাধা যমুনা সাতার দিয়ে পার হয়ে এসেছে—

শোভন কলসী করে ধরিআঁ
পারিলোঁ যমুনানীরে ॥ পৃ. ১১৭

এ-রকমের অসঙ্গতি বিভ্রান্তিকর। ঠিক এই রকমের অসঙ্গতি রাধাবিরহেও আছে। রাধাবিরহ বসন্তকালের ঘটনা কিন্তু বড়াই বলছে এখন 'যমুনা বহে খরতর ধার'। আবার সেইপদে আছে 'বসন্ত কালে কোকিল রাএ'।

রাধাবিরহ'ও বসন্তকালের ঘটনা।

মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ। পৃ. ১৩৮

রাধা বিরহের একটি পদে 'মেঘ-আন্ধারী নিশি' এবং 'বসন্ত সমএ'র কথা একসঙ্গে আছে—

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী ॥
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ। পৃ. ১৩৮
বিকশিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএ ॥

পদাবলী সাহিত্যে কৃষ্ণপ্রেমের জন্য রাধার কৃচ্ছ্রসাধনের ইঙ্গিত বহু পদে একটু অতি পল্লবিতভাবে আছে। 'মেঘ-যামিনী' ও 'পৌখলী রজনী'তে রাধা কৃষ্ণের জন্য কুঞ্জে অপেক্ষা করছে। 'হিমঋতু যামিনী'তে যমুনার তীরে ঘাসের বেড়া দেওয়া কুঞ্জে রাধা শীতে কাঁপছে এবং কৃষ্ণের পথ চেয়ে বসে আছে। 'মাথহিঁ তপন তপত পথ বালুক' রাধার কোমল পদপল্লব পুড়িয়ে দিচ্ছে তথাপি কৃষ্ণ-প্রেমের জন্য সমস্ত অগ্রাহ্য করে রাধা অভিসারে বেরিয়ে পড়েছে। রাধার কষ্টের দিকটি যত বড় হয়ে উঠেছে তার কৃষ্ণ-প্রেম ততই আমাদের কাছে গভীর এবং প্রগাঢ় বলে মনে হয়েছে। পদাবলীতে রাধার এই কৃচ্ছ্রসাধনের একটা অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার এই কৃচ্ছ্রসাধনা একেবারেই নেই। থাকলেও কাব্যের মূল কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি থাকতো না।

• বংশীখণ্ড এবং রাধাবিরহের দুই এক জায়গায় (দ্র. 'শোভন কলসী করে ধরিআঁ পারিলোঁ যমুনানীরে ॥' পৃ. ১১৭। অথবা, 'মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী। একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী ॥' পৃ. ১৩৮। রাধার কৃচ্ছ্রসাধনার যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তা সম্ভবত পরবর্তী কালের পদাবলী সাহিত্যের প্রভাবে।

কাহিনীর সময় এবং কাল সম্পর্কে সচেতন কবি এইভাবে কালের ক্রম উল্লঙ্ঘন করে কেবলমাত্র অ্যাধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা আরোপ করবার জন্য 'বসন্তকাল' এবং 'মেঘ আন্ধার ভয়ঙ্কর নিশী'কে একই পদে পাশাপাশি রাখতেন না। এই রকমের অসঙ্গতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাহিনীর প্রথম স্তরে যদি পাওয়া যেত তাহলে কবির কাল-সচেতনা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করার সুযোগ থাকত। কিন্তু কালের ক্রম উল্লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত কেবলমাত্র কাহিনীর দ্বিতীয় স্তরেই পাওয়া যাচ্ছে।

৬

দ্বিতীয় স্তরের ঘটনাগুলি কালের পারম্পর্য অনুসারে সুসজ্জিত নয়। কবি কালের ক্রমটি স্বয়ই উল্লঙ্ঘন করেছেন এবং ঘটনা বসন্ত থেকে গ্রীষ্মে এবং গ্রীষ্ম থেকে আবার বসন্তে ফিরে গিয়েছে। বৃন্দাবন ও কালীয়দমনখণ্ড বসন্তের ঘটনা, যমুনাখণ্ড গ্রীষ্মের।[৮] তারপরেই বাণ- বংশী- ও রাধাবিরহ বসন্তের ঘটনা। এই তিনটি ঘটনা বসন্তকালে ঘটতে বাধা নেই। কিন্তু অন্য প্রকার অসঙ্গতি আছে। বসন্ত —> গ্রীষ্ম —> বসন্ত কালের এই ক্রম যদি ঠিক হয় তাহলে বুঝতে হবে প্রথম বসন্ত থেকে দ্বিতীয় বসন্তের মধ্যে কমপক্ষে একবছরের কালগত ব্যবধান। কিন্তু যমুনা- ও বাণখণ্ডের মধ্যে একবছরের ব্যবধান থাকা প্রায় অসম্ভব। কেন অসম্ভব তার একটু বিস্তারিত আলোচনা দরকার।

দ্বিতীয় স্তরের ঘটনাগুলি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। বৃন্দাবন- থেকে বংশী- খণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত ঘটনাগুলির প্রত্যেকটি—বনবিলাস —> পানীশোধন —> জলাকর্ষণ —> স্নানলীলা —> বস্ত্রহরণ —> হারচুরির অভিযোগ —> বাণাঘাত— একটি বৃহৎ ঘটনাচক্রের খণ্ডাংশ। এর কোনো একটি ঘটনা স্বাধীন, সম্পূর্ণ এবং অন্যনিরপেক্ষ নয়। একটি ঘটনার সূত্র অন্যটির সঙ্গে জড়িত। এই দিক থেকে দেখলে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের ঘটনাগুলির মধ্যে আর একটা মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম স্তরের প্রত্যেকটি ঘটনা পৃথক। একটি ঘটনা সম্পূর্ণ হলে নূতনভাবে ভূমিকা করে, নূতন পরিস্থিতির মধ্যে কবি আর একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। কাহিনীকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করার মধ্যেও ঘটনার সম্পূর্ণতা ও স্বাতন্ত্র্য কবি বজায় রেখেছেন। দুইটি সম্পূর্ণ ঘটনার মধ্যে যে কালগত ব্যবধানটুকু আছে তাও কবি ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছেন। অন্যভাবে বলতে পারি, দুটি সম্পূর্ণ ঘটনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার জন্যেই প্রথম স্তরে কবি ঘটনার সময় এবং কাল সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সুতরাং এই স্তরে সময় এবং কালের যে ইঙ্গিতগুলি আছে তা কাব্যের পক্ষে অতিরিক্ত বা অবান্তর নয়। কাহিনীতে এই ইঙ্গিতগুলির গুরুতর প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন হল একটি ঘটনা থেকে আর একটি ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করা। এইভাবে কালের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন বলে প্রথম স্তরের ঘটনাগুলি স্বতন্ত্রভাবে নাটকের এক একটি দৃশ্যের আকার ধারণ করেছে।

---

৮ একমাত্র যমুনাখণ্ডের ঘটনা ছাড়া দ্বিতীয় স্তরে সব ঘটনাই ঘটেছে বসন্তকালে। স্থানের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে যে কাহিনীর দ্বিতীয় স্তরে রাধাকৃষ্ণ কেলিবিলাসের সঙ্গে 'কদমতলা-যমুনাতীর-বৃন্দাবন'— এই পরিবেশটি অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত হয়ে আছে। কালের দিক থেকেও দেখছি বসন্ত ঋতু রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নরূপে সংযুক্ত। সুতরাং দ্বিতীয় স্তরের কবির একটা বৈশিষ্ট্য এর দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে। বৈশিষ্ট্যটি এই— কবি রাধাকৃষ্ণ-লীলার স্থানপটভূমি হিসাবে 'কদমতলা-যমুনাতীর-বৃন্দাবন' এই পরিবেশটির গুরুত্ব স্বীকার করেন, এবং কাল হিসাবে বসন্ত ঋতুকেই কৃষ্ণ-লীলার প্রকৃষ্ট সময় বলে মনে করেন।

এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের ঘটনার একটি তুলনামূলক আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথম স্তরের অধিকাংশ ঘটনার শুরু প্রত্যূষে, সমাপ্তি সন্ধ্যায়। প্রত্যূষে রাধা-বড়াই এবং সখীদের মথুরাযাত্রা দিয়ে ঘটনার শুরু, রাধা গোকুলে ফিরে এলে তবে সেদিনকার মত ঘটনার সমাপ্তি। ছত্রখণ্ড খণ্ডিত বলে রাধার বাড়ি পৌছবার কথা নেই। দ্বিতীয় স্তরের ঘটনাগুলি এরকম সুবিন্যস্ত নয়। কাহিনীর আরম্ভ ও সমাপ্তির কোনো নির্দিষ্ট সময় বা স্থান নেই।

প্রথম স্তরে দুইটি খণ্ডের মধ্যে যে সংস্কৃত শ্লোকগুলি আছে সেগুলি লক্ষণীয়। দানখণ্ডের শুরুতে আছে :

অত্রান্তরে তত্র কলিন্দকন্যা-
তটোপকণ্ঠং সরণৌ বিষণ্ণঃ।
চিরায় রাধামধুরাধরোষ্ঠে
কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো জরতীঞ্জগাদ ॥ পৃ. ১৩

এখানে 'অত্রান্তরে' এবং 'কলিন্দকন্যাতটোপকণ্ঠং সরনৌ নিষণ্ণঃ' লক্ষ্য করতে বলি। এর দ্বারাই কবি পূব ও বর্তমান ঘটনার স্থান কাল ও পরিবেশের পার্থক্যটি সুস্পষ্ট করেছেন। খণ্ডভাগের দ্বারাহ পার্থক্য সূচিত হয়েছে বটে কিন্তু সংস্কৃত শ্লোকটি পার্থক্যকে আরও স্পষ্ট করেছে। খণ্ডভাগ পাঠকের সুবিধার জন্য, শ্লোকটি দর্শক ও শ্রোতার সুবিধার জন্য। নৌকাখণ্ডের শুরুতে একটি দীর্ঘ সংস্কৃত শ্লোক আছে। সেই শ্লোকের সবটুকু এবং বিশেষভাবে 'সংবিহায় মথুরাপুরীগতিং সা চিরাৎ স্ববসতৌ তদাবসৎ' ॥ লক্ষণীয়। এই শ্লোকটি নাটকের স্থান-কালের নির্দেশের অনুরূপ। এই শ্লোকগুলি এবং কাব্যের স্থানকালের নির্দেশগুলির সাহায্যে দর্শক-শ্রোতা ঘটনার গতিবিধি অনুধাবন করত। পুথিতে কোথায় কোন্ খণ্ড শেষ হয়ে কোন্ খণ্ড শুরু হয়েছে তা দর্শক শ্রোতার জানবার কথা নয়। সুতরাং এই শ্লোকগুলি ঘটনার এক-একটি পতাকাস্থান। প্রথমস্তরের এই শ্লোকগুলির সঙ্গে তুলনায় দ্বিতীয় স্তরে হারখণ্ডের প্রথম শ্লোকটি—'কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।··· এই শ্লোকে ঘটনার স্থান-কাল-পরিবেশের পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত নেই। ঘটনার ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। এখানে একটি খণ্ডের মধ্যে যে উপখণ্ড ভাগ (যমুনাখণ্ডান্তর্গত হারখণ্ড) তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ভাগ করাটাই অনুচিত হয়েছে। বাণখণ্ডের সূচনার শ্লোকটিও 'রাধাকুচরিতং শ্রুত্বা প্রকুপ্য মধুসূদনঃ'। পূর্ব ঘটনারই জের টেনেছে। রাধার 'কুচরিত' কি তার উল্লেখ আগের খণ্ডে আছে।

দ্বিতীয় স্তরের প্রত্যেকটি খণ্ডের প্রথম লাইনটি প্রকারান্তরে হয় পূর্ব ঘটনার সারসংকলন, উপসংহার অথবা অনুবৃত্তি। যেমন কালীয়দমনখণ্ডের প্রথম লাইন—

গোপীগণ মন তোষিল দেব চক্রপাণী।
মথুরা নগর যাইর্তে দিলান্ত মেলানী ॥ পৃ. ৯১

ইহা বৃন্দাবনখণ্ডে বর্ণিত ঘটনার উপসংহার। যমুনাখণ্ডের প্রথম লাইন, 'যাই যমুনার পাণিকে আইস সখি মোর সঙ্গে'। ইহা পূর্ববর্তী যমুনাখণ্ডের 'এহার পাণী খাইতেঁ সবজনে'। এই উক্তির অনুবৃত্তি। হারখণ্ডের প্রথম লাইন 'যে বেলাএ পাটোল মোর নিলে গদাধরে'। এই উক্তির সূত্র আছে পূর্ববর্তী যমুনাখণ্ডে 'হার লুকায়িআঁ রাধাক দিল বাস'।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের ঘটনাগুলির মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা আছে। ঘটনাগুলি এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে একটির সূত্র আর-একটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ঘটনাগুলি পরস্পর-

নিরপেক্ষ নয়। তাই এই স্তরের কোনো একটি ঘটনার সঙ্গে আর-একটি ঘটনার কালগত ব্যবধান খুব বেশি হওয়া সম্ভব নয়। সেইকারণেই যমুনা- ও বাণ- খণ্ডের মধ্যে একবছরের ব্যবধান অসম্ভব। তাই এ-অনুমান অসঙ্গত নয় যে দ্বিতীয় স্তরে কবি কালের ক্রম উল্লঙ্ঘন করেছেন। এবং স্থানে স্থানে কবি কালের যে নির্দেশ দিয়েছেন মূল ঘটনার সঙ্গে তার সংযোগ কম। তার ফলে কিছু কিছু অসঙ্গতিও দেখা যাচ্ছে। এর কারণ কি? প্রথম স্তরে কবি কালক্রম সযত্নে অনুসরণ করেছেন দ্বিতীয় স্তরে করেন নি কেন?

৭

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানি অবশ্যই গেয়। কিন্তু কাব্যখানির অভিনয়যোগ্যতাও ছিল। গীত ও অভিনয় সংযুক্ত যে রচনারীতি তাকে বলতে পারি নাটগীতের রীতি। এই রীতিটি প্রাচীন। কাব্যখানি যাঁরা মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে এই প্রাচীন রীতিটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে ছত্রখণ্ড পর্যন্ত। বৃন্দাবনখণ্ড থেকে কাব্যের রীতি ভিন্ন রকমের। একে বলতে পারি পালাগানের রীতি। কাব্যের এই দ্বিতীয় অংশ গীতের পক্ষে যতখানি উপযুক্ত অভিনয়ের পক্ষে ততখানি নয়। দ্বিতীয় স্তরের ঘটনাগুলি গীতের পদ্ধতিতে রচিত বলে এই স্তরে ঘটনাগুলি জটপাকানো, সময় এবং কালের নির্দেশ খুব অল্প, যৎসামান্য যে নির্দেশ আছে তার সঙ্গে ঘটনার কোনো সংযোগ নেই।

•একই কাব্যে এই দ্বিবিধ রচনারীতি একই কবির দ্বারা অবলম্বিত হওয়া সম্ভব কিনা স্বভাবতই সে প্রশ্ন এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে। কিন্তু একটি ক্ষীণ সূত্রের উপর নির্ভর করে সে সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছান সঙ্গত নয়। কাহিনীর যে স্তরভাগের কথা উপরে বলেছি সেই স্তরভাগটি আরও যুক্তিপ্রমাণের সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। তারপর যদি দেখা যায় যে এই দুটি স্তরের পার্থক্য এমন দুর্লঙ্ঘ্য যে একজন কবির পক্ষে কাব্যের দুটি স্তর রচনা করা সম্ভব নয় তাহলে কাব্যের একাধিক রচয়িতার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে।•

এবার দেখা যাক কাব্যের স্থান নির্দেশ থেকে এই স্তরভাগের সপক্ষে কি যুক্তি পাওয়া যায়।

• সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাল-পটভূমি এই রকম :

ঘটনা	কাল	সময়	রাধার বয়স
তাম্বুলখণ্ড	বসন্ত	পূর্বাহ্ণ	১১
দানখণ্ড	গ্রীষ্ম	সকাল থেকে সন্ধ্যা	
নৌকাখণ্ড	বর্ষা	সকাল থেকে দুপুর	
ভারখণ্ড	শরৎ	পূর্বাহ্ণ } একই দিনে	
ছত্রখণ্ড	শরৎ	পরাহ্ণ	
কাহিনীতে একবছরের ছেদ			১২
বৃন্দাবনখণ্ড	বসন্ত	পূর্বাহ্ণ } সম্ভবত একই দিনে	১৩
কালিয়দমন (জলশোধন)	বসন্ত	পরাহ্ণ	
জলাকর্ষণ	গ্রীষ্ম	পরাহ্ণ (সম্ভবত)	
স্নানলীলা	গ্রীষ্ম	সন্ধ্যা	
বস্ত্রহরণ	গ্রীষ্ম	পরদিন প্রত্যুষ	
বাণখণ্ড	বসন্ত	সকাল থেকে দুপুর	১৪
বংশীখণ্ড	বসন্ত	চার দিনের ঘটনা	
রাধাবিরহ	বসন্ত	প্রথমে দুই দিনের বিরহ পরে পাঁচ মাসের বিরহ	

৮

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ঘটনাবলীর সংঘটনস্থল স্থলভাগে গোকুল মথুরা-পথ বৃন্দাবন মথুরা, জলভাগে যমুনানদী। জলেস্থলে বিভক্ত এই ভূখণ্ডটির স্পষ্ট পরিচয় কাব্যের মধ্যে নেই, তবে কাব্যের বিভিন্ন জায়গার ইঙ্গিতগুলির সাহায্যে এই ভূখণ্ডের একটি সাধারণ চিত্র দাঁড় করান সম্ভব। বর্তমান আলোচনায় সেই চেষ্টা করব। আশা করা যায় সেই প্রচেষ্টার ফলে কাহিনীর সূত্রগুলি স্পষ্টতর হবে। আলোচনার আর-একটি লক্ষ্য প্রবন্ধের সূচনায় ব্যক্ত করেছি। কাব্যের প্রারম্ভে স্থান-পটভূমির ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে তা সমগ্র কাব্যের মধ্যে অনুসৃত হয়েছে কিনা সে-বিচারও এ আলোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রথমেই বলা দরকার এ আলোচনার ভৌগোলিক গুরুত্ব কিছুমাত্র নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-যুগের ব্রজমণ্ডলের ভূগোল পুনর্গঠন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। ব্রজমণ্ডলের ভূগোল সম্পর্কে সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। তাতে কিছু ক্ষতি হয় নি। কবির সম্বল ছিল গোটাকয়েক স্থাননাম। সেই নামাবলী দিয়ে কবি একটি ভূখণ্ড সৃষ্টি করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রাধাকৃষ্ণ সেই ভূখণ্ডের অধিবাসী। এই ভূখণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থানটি আমার লক্ষ্য। পৌরাণিক ব্রজভূমি এবং কবির ব্রজভূমির মধ্যে ভৌগোলিক পার্থক্য থাকতে পারে। থাকা স্বাভাবিক, কারণ বড়ু চণ্ডীদাস কাব্য লিখেছেন, ভূগোল লেখেন নি। কিন্তু সে পার্থক্য আমার চোখে এ আলোচনায় অবান্তর। আমার চোখ কবির ব্রজভূমিতে নিবদ্ধ। এ ব্রজভূমির অস্তিত্ব বড়ু চণ্ডীদাসের কল্পনায় ছিল, আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে আছে। কবিকল্পনা এবং কাব্যের বাইরে সে ভূখণ্ড আর কোথায়ও নেই। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মধ্যে স্থানের উল্লেখে যদি কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়ে তাহলে প্রাচীন বা আধুনিক ব্রজভূমির মানচিত্রের নজিরে সে অসঙ্গতি সংশোধন করা চলবে না।

৯

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রকৃত সূচনা তাম্বূলখণ্ডে। তাম্বূলখণ্ডের ঘটনাস্থল বৃন্দাবন। আরও সংক্ষেপে বলতে পারি তাম্বূলখণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বৃন্দাবনের দুটি প্রদেশে। একটি প্রদেশের নাম 'বকুলতলা', অপরটি নামহীন। আমাদের সুবিধার জন্য এই নামহীন জায়গাটির নামকরণ করছি 'মাঝ-বৃন্দাবন'[১০]।

[১০] বৃন্দাবনের যে-জায়গাটিতে বড়াই 'নাতিআ কাহ্নাঞিঁর' সাক্ষাৎ পেয়েছিল সে-জায়গাটিকে কবি বলেছেন 'বৃন্দাবন-মাঝ'।

কথো দুর পথ গিআঁ দেখিল বড়ায়ি।

বৃন্দাবন মাঝে চরে শতসংখ্য গাই। পৃ. ৪

কৃষ্ণের গোচারণক্ষেত্র যে 'মাঝ-বৃন্দাবন' সে-কথা দানখণ্ডেও আছে—

গরু রাখি বুল তোহ্মে মাঝ বৃন্দাবনে। পৃ. ৪১

সুতরাং বড়াই রাধিকাকে হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে যে 'মাঝ-বৃন্দাবনে' উপস্থিত হয়েছিল সে অনুমান অসঙ্গত নয়। রাধা সঙ্গীভ্রষ্ট হয়ে 'বকুলতলায়' বসে আছে, কৃষ্ণ 'মাঝ-বৃন্দাবনে'। তাম্বূলখণ্ডে বড়াই বৃন্দাবনের এই দুটি প্রদেশের মধ্যে—'বকুলতলা' ও 'মাঝ-বৃন্দাবন'—আটবার যাতায়াত করেছে।—

১. 'শুভ তিথি বার শুভক্ষণে' পৃ. ৬। এই পদে বড়াই কৃষ্ণের প্রেম-বার্তা নিয়ে 'মাঝ-বৃন্দাবন' ত্যাগ করল।

২. 'তোহ্মে মোর বড়ায়ি' পৃ. ৭। এই পদে বড়াই 'বকুলতলায়'

কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই কাব্যের এই তিনটি প্রধান পাত্রপাত্রীর নিবাস গোকুলে।[১১]

'গোঠে হৈতেঁ আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী' বড়াইর উক্তি, পৃ. ৫

'গোকুল থাকোঁ মো গোআল জাতী' রাধার উক্তি, পৃ. ১৪

'থাকোঁ মো গোকুলে নান্দযশোদার ঘরে' কৃষ্ণের উক্তি। পৃ. ৪৪

গোকুল থেকে বড়াইর তত্ত্বাবধানে রাধা এবং গোপীরা 'বনপথ' দিয়ে নিত্য মথুরার হাটে যায় দুধ-দই বিক্রী করতে।

নিতি জাএ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।
বনপথে মথুরা নগরী॥ পৃ. ৪

এই 'বনপথের' '-বন' অবশ্যই বৃন্দাবন। কারণ, এই 'বনপথে' মথুরা যাওয়ার সময়ই বড়াই বৃন্দাবনের মধ্যে রাধিকাকে হারিয়ে ফেলেছিল।

দধি বিকে জাইতেঁ সঙ্গে মথুরা নগরী।
বৃন্দাবনে হারাইলোঁ ত্রৈলোক্যসুন্দরী॥ পৃ. ৫

সঙ্গীভ্রষ্ঠ রাধিকা 'বকুলতলায়' অপেক্ষমান। বড়াইও রাধিকার খোঁজে 'বৃন্দাবন মাঝে' গিয়ে উপস্থিত। সেখানে গোচারণরত কৃষ্ণের সঙ্গে বড়াইর সাক্ষাৎ। কৃষ্ণের কাছে বড়াই রাধিকার সংবাদ পেল—

বকুলতলাত আছে সে সুন্দরী। পৃ. ৬

এই উদ্দেশ পেয়ে বড়াই—

চারি পাশে চাহী বৃন্দাবনে।
পাইল রাধার দরশনে॥ পৃ. ৬

বড়াই রাধিকাকে বৃন্দাবনের মধ্যে হারিয়ে আবার বৃন্দাবনের মধ্যেই পুনরুদ্ধার করল। সুতরাং বড়াই-রাধা যে 'বনপথ' দিয়ে মথুরা যাচ্ছিল সে 'বনপথ' যে 'বৃন্দাবন-পথ' অর্থাৎ বৃন্দাবনের ভিতর দিয়ে গিয়েছে সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

---

৩. 'তোর মুখে শুনি রাধিকার রূপ' পৃ. ৭। এই পদে বড়াই আবার 'মাঝ-বৃন্দাবনে'
৪. 'কথা খানি খানি' পৃ. ৮। এই পদে বড়াই আবার 'বকুলতলায়'
৫. 'লবলীদল কোঁমল' পৃ. ৯। এই পদে বড়াই আবার 'মাঝ-বৃন্দাবনে'
৬. 'নিশিত স্বপন দেখিল' পৃ. ৯। এই পদে বড়াই আবার 'বকুলতলায়'
৭. 'কোপে কভোঁ মোকে' পৃ. ১০। এই পদে বড়াই আবার 'মাঝ-বৃন্দাবনে'
৮. 'কপটে কহিল বড়ায়ি' পৃ. ১২। এই পদে বড়াই 'বকুলতলায়' উপস্থিত হয়েছে।

বৃদ্ধা বড়াই যদি এই জায়গাদুটির মধ্যে আটবার যাতায়াত করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে 'বকুলতলা' ও 'মাঝ-বৃন্দাবন' বৃন্দাবনের এই দুটি প্রদেশের মধ্যে স্থানগত ব্যবধান অল্প।

১১ 'গোঠ' গোকুলের নামান্তর। 'গোঠ-গোকুল' এই নামও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥ পৃ. ১১৬

রাধা যে মথুরার হাট থেকে গোকুলে ফিরে যায় তার প্রমাণ ভারখণ্ডেও আছে।

রাধার বুঝি গোকুলগতী।
কৃষ্ণ ভৈলা বেআকুলমতী॥ পৃ. ৭৪

তাম্বুলখণ্ডের শেষে কৃষ্ণ-বড়াইর পরামর্শ হল যে 'কদমের তলে যমুনার তীরে' দানছলে কৃষ্ণ রাধাকে কিছু শাস্তি দেবে— রাধার ক্ষীর ছড়াবে, কাঞ্চুলী ছিঁড়বে, তনে হাত দেবে, পরিশেষে বলপ্রয়োগে রাধাকে মাঝ-বৃন্দাবনে নিয়ে যাবে—

তোর আনুমতী লঅাঁ বলে রাধাকে ধরিঅাঁ
লঅাঁ যাইবোঁ মাঝ বৃন্দাবনে। পৃ. ১১

কাহিনীর এই বিবরণ থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে গোকুল থেকে মথুরাগামী পথটি বৃন্দাবনের ভিতর দিয়ে গিয়েছে। বৃন্দাবন সম্ভবত একটি বৃহৎ বনস্থলী। এর একাংশের নাম 'বকুলতলা'। অন্য আর-একটি অংশ যেটি যমুনা তীরবর্তী তার নাম 'কদমতলা'। এর বেশি স্থান-পরিচয় তাম্বুলখণ্ডে নেই।[১২] এই সংবাদগুলির সঙ্গে দানখণ্ডের সংবাদ যুক্ত করলে ভূখণ্ডের একটি সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়।

দানখণ্ডে জানা গেল রাধা ও গোপীরা যমুনা পেরিয়ে মথুরার হাটে পসার বিক্রী করতে যায়—

ঘৃত দুধে সজাঅাঁ পসার।
বিকি জাইএ যমুনার পার॥ পৃ. ২৫

নৌকাখণ্ডেও আছে—

ও কুলে মথুরা মাঝে যমুনার নদী। পৃ. ৫৯

সুতরাং গোকুল থেকে মথুরায় যেতে গেলে যমুনা নদী পেরিয়ে যেতে হয়। যমুনার একপারে গোকুল-বৃন্দাবন, অপর পারে মথুরা। গোকুল থেকে বৃন্দাবনের ভিতর দিয়ে যে পথটি মথুরার দিকে গিয়েছে সেটি যমুনার পাড়ে এসে শেষ হয়েছে। এই যমুনার পাড়ে 'কদমতলা' এবং 'কুতঘাট'। দান-নৌকাখণ্ডের প্রায় যাবতীয় ঘটনা ঘটেছে এইখানে। যমুনার দুই পারে দুটি ঘাট আছে। এ-পারে অর্থাৎ মথুরার বিপরীত পারের ঘাটটির নাম 'কুতঘাট'। ও-পারের অর্থাৎ মথুরার পারের ঘাটটিকে বলা যায় 'মথুরা ঘাট'। এটিকে 'যমুনার পার'[১৩]ও বলা হয়েছে। 'মথুরা ঘাট' থেকে 'মথুরা হাট' বেশ কিছু দূরে—

এভোঁ বড় দূর আছে মথুরা নগরী। পৃ. ৬৭

ভার-ছত্রখণ্ডের ঘটনা ঘটেছে 'মথুরা ঘাট' থেকে 'মথুরা নগরী' অর্থাৎ মথুরার হাটে যাওয়ার পথে। গোকুল থেকে 'কুতঘাটে' যাওয়ার পথে নয়।[১৪]

---

১২ 'মাঝ-বৃন্দাবন' স্থাননাম কিনা সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া শক্ত।

১৩ যেমন, 'হরিষে পাইল রাধা যমুনার পার' (পৃ ৬৭)। অর্থাৎ রাধা নির্বিবাদে যমুনা অতিক্রম করেছে।

'যমুনার পার' অর্থে মথুরাও বোঝায়। যেমন, বিকি জাইএ যমুনার পার। পৃ. ২৫

এখানে 'যমুনার পার' অর্থে 'মথুরা নগরী' বা 'মথুরা হাট'। কিন্তু 'হরিষে পাইল রাধা যমুনার পার' (পৃ. ৬৭), এখানে 'যমুনার পার' অর্থে 'মথুরা ঘাট'। কারণ রাধা তখনও 'হাট' পর্যন্ত পৌঁছয় নি, কেবল নদী পার হয়েছে মাত্র।

১৪ এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে তাম্বুল-দান-নৌকা-ভার-ছত্রখণ্ডে কাহিনীর ঘটনাস্থল ক্রমশ মথুরার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। প্রথম, তাম্বুলখণ্ডের ঘটনাস্থল 'বৃন্দাবন' (যমুনার ওপারে=গোকুলের পারে)। দ্বিতীয়, দানখণ্ডের ঘটনা 'কদমতলা' বা 'কুতঘাট' (যমুনার ওপারে=গোকুলের পারে)। তৃতীয়, নৌকাখণ্ডের ঘটনাস্থল 'যমুনা নদী' এপার ওপারের মাঝামাঝি জায়গায়। চতুর্থ, ভার-ছত্রখণ্ডের ঘটনাস্থল যমুনা পেরিয়ে মথুরার রাস্তায়। ঘটনাস্থলগুলি ক্রমশ গোকুল থেকে দূরবর্তী হয়েছে এবং মথরার নিকটবর্তী হয়েছে। এই পারম্পর্যের সঙ্গে তুলনীয় ছত্রখণ্ড-পরবর্তী ঘটনাস্থলগুলি। এর কোনো তাৎপর্য আছে কিনা জানিনা।

ছত্রখণ্ড পর্যন্ত কাহিনীর ভূখণ্ডের যে পরিচয় পাওয়া গেছে তাকে মানচিত্রে রূপ দিলে এইরকম হবে।—
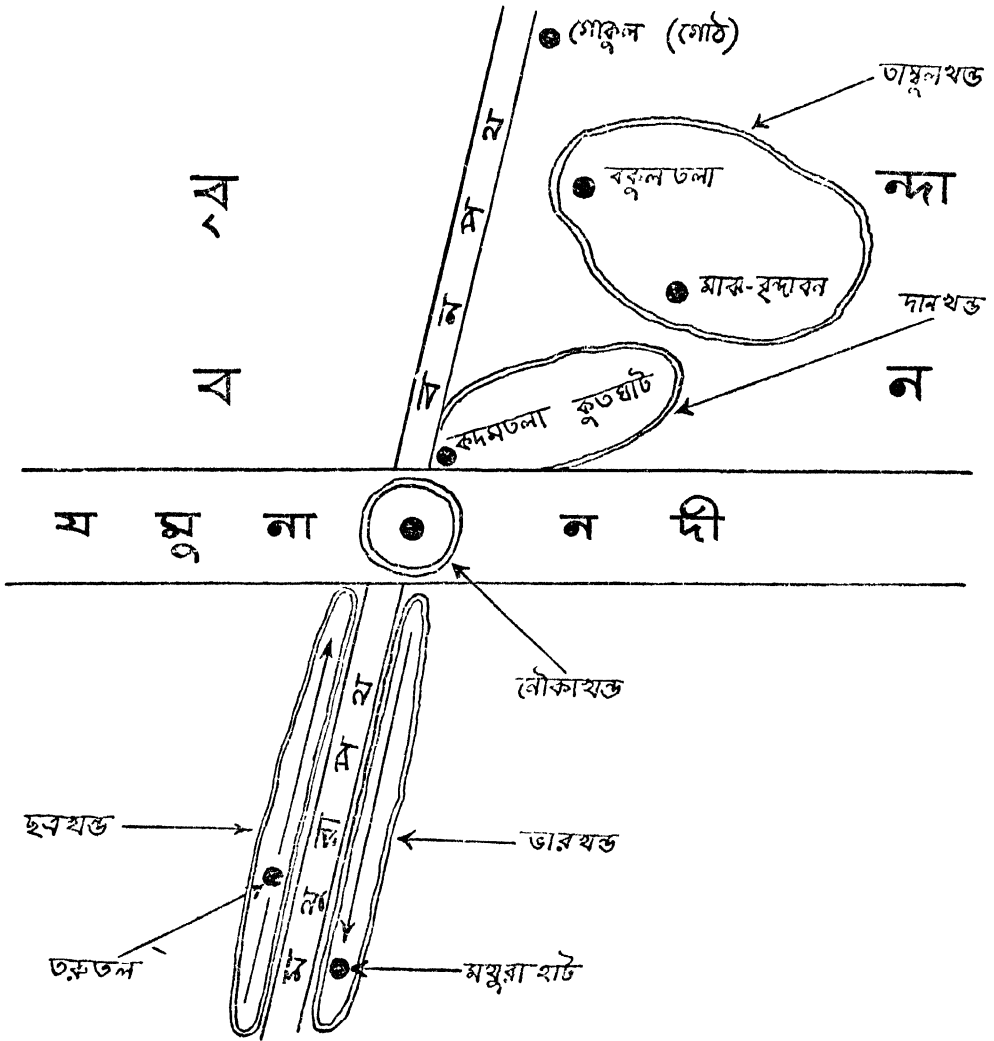
১০

ছত্রখণ্ড পর্যন্ত ভূখণ্ডের যে চিত্র পাওয়া গেল সেই চিত্রটি মনে রেখে ছত্রখণ্ড-পরবর্তী ভূখণ্ডের অবস্থানটি লক্ষ্য করা যাক।

ঘটনার কালপারম্পর্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাহিনীকে দুটি স্তরে ভাগ করা সম্ভব, সে কথা আগে বলেছি। এই স্তরভাগ সংঘটনস্থলগুলির দ্বারাও সমর্থিত হচ্ছে। এবং সেই কারণেই ছত্রখণ্ড পর্যন্ত ভূখণ্ডের মানচিত্র

স্বতন্ত্রভাবে দিয়েছি। বস্তুতই ছত্রখণ্ড পর্যন্ত কবি যে ভূখণ্ড রচনা করেছেন তার অবস্থান এক রকম, ছত্রখণ্ড-পরবর্তী ভূখণ্ডের অবস্থান ভিন্ন রকম। এই দুই ভূখণ্ডকে কোনো সূত্রে সংযুক্ত করে একই মানচিত্রের মধ্যে স্থাপনা করা অসম্ভব। স্থাননামগুলি কাহিনীর দুই স্তরে একই আছে তবে তাদের অবস্থান সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। ছত্রখণ্ড পর্যন্ত ভূখণ্ডের যে মানচিত্র পাওয়া গেছে তাতে দেখি যমুনানদী বৃন্দাবনের উপান্তে প্রবাহিত। আসলে বৃন্দাবনের একটি সীমা যমুনানদী। যমুনার একপারে গোকুল-বৃন্দাবন, অপরপারে মথুরা নগরী। এটা অবশ্য অনুমান। প্রমাণাভাবে অনুমানই গ্রাহ্য। এবং কাব্যের স্থান-নির্দেশ এই অনুমানের সমর্থক। দ্বিতীয় কোনো অনুমান সম্ভব নয়।

ছত্রখণ্ড-পরবর্তী স্তরে দেখছি যমুনা নদী বৃন্দাবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।

বৃন্দাবন মাঝে যমুনানদী বহে। পৃ. ৯১

যমুনানদীর যে অংশটি বৃন্দাবনের মধ্যে সেই অংশে একটি 'দহ' আছে। এই দহটির নাম 'কালীদহ'। এই কালীদহের কূলে একটি কদম্ববৃক্ষ আছে। সেইটি 'কদমতলা'।

কালীদহের কূল কদম্বের তল। পৃ. ৯১

দ্বিতীয় স্তরে যে 'কদমতলার' কথা কবি বলেছেন যমুনা পেরিয়ে সে 'কদমতলায়' পৌছতে হয়।

আগু বড়ায়ি জাএ পাছে জাএ রাধা।
মথুরাক জাইতেঁ কেহো না কৈল বিরোধা॥
কথো দূর গিআঁ যমুনাত পার হআঁ।
বৃন্দাবনের পাশে মিলিলা গিআঁ॥
দেখিল কদমতলে বসে কাহ্নাঞিঁ।
ধীরেঁ বড়ায়ি মেলিলী তার ঠাই॥ পৃ. ১০৭

যমুনার দুই পারে বৃন্দাবন। 'কদমতলা' যমুনার ওপারে অর্থাৎ গোকুল থেকে 'কদমতলা'য় যেতে যমুনা উত্তরণের প্রয়োজন হয়। এবং বৃন্দাবনের প্রধান অংশটি যমুনার ওপারে অর্থাৎ গোকুলের বিপরীত পারে। গোকুল থেকে বৃন্দাবন ('মাঝ-বৃন্দাবন') ও 'কদমতলা'য় যেতে যমুনা-উত্তরণের ইঙ্গিত কাহিনীর দ্বিতীয় স্তরে বহু জায়গায় আছে।[১৫]

---

১৫ রাধা বড়াইকে অনুনয় করছে এই বলে, 'আহ্মা নিআঁ যাহ সেই বৃন্দাবনে।' পৃ. ১৩৩
বড়াই উত্তরে বলছে,

যমুনা বহে খরতর ধার।
কেমতেঁ তাহাত হইবেঁ পার॥ পৃ. ১৩৩

বংশীখণ্ডে রাধা যমুনা পেরিয়ে বৃন্দাবনে এসেছে—

সুসর বাঁশীর নাদ সুনী আইলোঁ
মো যমুনাতীরে।
শোভন কলসী করে ধরিআঁ
পারিলোঁ যমুনানীরে॥ পৃ. ১১৬

কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছে সুতরাং যমুনা পেরিয়ে বড়াই কেমন করে তার কাছে যাবে ?

যমুনা নদীতে মো কেমনে হৈবোঁ পার। পৃ. ১১৭

দ্বিতীয়স্তরের স্থাননির্দেশ অনুসারে এই ভূখণ্ডের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা সম্ভবত নিম্নরূপ।—

১১

প্রথম মানচিত্রটির পাশে দ্বিতীয় মানচিত্রটি রাখলে দুটির মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা স্পষ্ট হয়। প্রথম, 'কদমতলা'র অবস্থান। যদি ধরা যায় 'কদমতলা' দুটি ছিল: একটি যমুনার ওপারে, আর-একটি এপারে। তাতেও সমস্যার সমাধান হয় না। প্রথম মানচিত্রে যমুনার ওপারে মথুরা। দ্বিতীয় মানচিত্রে যমুনার ও-পারে বৃন্দাবন। দ্বিতীয় মানচিত্রে মথুরার অবস্থান কোথায়? অবশ্যই বৃন্দাবন পেরিয়ে। তা সম্ভব কি অসম্ভব সে-প্রশ্ন অবান্তর। এইটুকু শুধু লক্ষণীয় যে প্রথম মানচিত্রে মথুরার অবস্থান বৃন্দাবন পেরিয়ে নয়। কাহিনীর প্রথম স্তরে যমুনা পেরিয়ে রাধা মথুরার হাটে আসে, দ্বিতীয় স্তরে যমুনা পেরিয়ে রাধা বৃন্দাবনে আসে। দ্বিতীয় স্তরে 'বকুলতলা'র উল্লেখ আছে বটে তবে তার অবস্থান অজ্ঞাত।

এই মানচিত্রে গোকুল থেকে মথুরার পথ কালীদহের কূলে এসে শেষ হয়েছে। এবং 'কদমতলা'র পাশ দিয়ে সে-পথ মথুরার দিকে গিয়েছে।

মথুরার পথে বড়ায়ি এহি কদমের তলে
ধীরেঁ ধীরেঁ বহে বসন্তের বাএ॥ পৃ. ১৩৮

প্রথম মানচিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে এ-অনুমান করা চলে না যে এই 'কদমতল'ায় গোপীরা মথুরা যাওয়ার জন্য যমুনা পার হত। অর্থাৎ প্রথম স্তরে যে 'কুতঘাটের' কথা আছে সে 'কুতঘাট' এখানে এই 'কদমতলা'র কূলে এ অনুমান অচল। প্রথমত, কালীদহের কূল একটি নির্জন জায়গা।

তাহাত অধিক নাহি বিজন থান। পৃ. ৯১

জায়গাটি নির্জন না হলে গোপীরা বিবস্ত্র হয়ে এখানে স্নানে নামত না। দ্বিতীয়ত, কালীদহে কালীনাগের বাস তার ফলে

জলে মাছ কুলে গাছ মৈল তার বিষে॥ পৃ. ৯১

এ-হেন জায়গায় 'কুতঘাট' হওয়া সম্ভব নয়। এবং গোপীরা এই জায়গায় যমুনা পার হয়ে (কালীনাগ দমনের আগে) মথুরায় যেত এমন কল্পনা অমূলক। সুতরাং প্রথম স্তরে গোপীদের যমুনা-উত্তরণের যে-কথা আছে তা নিশ্চয়ই অন্য জায়গা এবং অন্য কদমতলা।

সুতরাং কাহিনীর ভূখণ্ড নির্দেশে স্পষ্টতই প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে কিছু অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে।[১৬]

১৬ ছোটোখাটো অসঙ্গতি আরও বহু আছে। যেমন,

এড় কাহ্নাঞিঁ যাইবোঁ ঘর মথুরা নগরী। পৃ. ৪৯

রাধার নিবাস গোকুলে। তাছাড়া এখন সে যাচ্ছে মথুরার হাটে। সুতরাং এখানে 'ঘর' অবশ্যই পাঠবিভ্রাট কিম্বা লিপি-প্রমাদ। খাঁটি পাঠ হওয়া উচিত

এড় কাহ্নাঞিঁ যাইবোঁ হাট মথুরা নগরী।

খুঁটিয়ে পড়লে কাব্যের মধ্যে এরকম অসঙ্গতি প্রচুর পাওয়া যায়।

রাধাবিরহের একটি পদে আছে—

বাছা রাখিবারে কাহ্ন জাএ সে গোকুলে॥ পৃ. ১৩৪

কৃষ্ণ গরু রাখে 'মাঝ বৃন্দাবনে', গোকুলে নয়—

গরু রাখি বুল তোহ্মে মাঝ বৃন্দাবনে।

এই কাব্যে কৃষ্ণের ক্রিয়াকলাপের জায়গাগুলি মধ্যে গোকুলের গুরুত্ব বেশি নয়। কৃষ্ণ বলেছে বটে তার নিবাস গোকুলে। কিন্তু আসলে সে 'মাঝ-বৃন্দাবনবাসী'। 'বৃন্দাবন-যমুনাতীর' ছেড়ে কৃষ্ণ যে লোকালয়ের দিকে এসেছে সে-কথা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাঠক স্বীকার করবেন না। সেই কারণে 'শতপল সোনা বড়ায়ি লইআঁ সে মেল' (পৃ. ১৩৩-৩৪) এই গানটিকে আমার মনে হয় খুব সন্দেহের চোখে দেখা উচিত। এই পদটি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হওয়ার অন্য কারণও আছে। কিন্তু সে আলোচনা এখানে অবান্তর।

এখন প্রশ্ন, কাব্যের এই অসঙ্গতির কারণ কি? একই কাব্যে কাহিনীর এক অংশে স্থাননির্দেশ একরূপ, অপরাংশে ভিন্নরূপ। এর কারণ কি কবির অসতর্কতা? শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানি যিনি মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন তিনিই জানেন এই কাব্যের কবি অসতর্ক নন। তবে কি কাব্যের স্থাননির্দেশ বুঝতে আমার ভুল হয়েছে? আমার সুবিধার জন্য আমি যে দুখানি মানচিত্র দিয়েছি সেই দুটিকেই কি কাব্যের স্থাননির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একখানি মানচিত্রে রূপান্তরিত করা সম্ভব? সম্ভব নয় বলেই আমার ধারণা। তাই প্রবন্ধের সূচনায় কাহিনীর যে দুটি স্তরভাগ কল্পনা করেছি তার উপর আর-একটু জোর দিতে চাই। কাহিনীর স্থাননির্দেশে সেই জোরের সমর্থন পাচ্ছি। কালের দিক থেকে যেমন, স্থানের দিক থেকেও তেমনি, ছত্রখণ্ড পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের একটি স্তর, ছত্রখণ্ড-পরবর্তী কাহিনী আর একটি স্তর। আমার বক্তব্য এই নয় যে এই দুই স্তরের রচয়িতা দুইজন কবি। আমার বক্তব্য এইটুকু যে কাব্যখানিকে আমরা এতদিন নিটোল, সম্পূর্ণ এবং homogeneous বলে মনে করতুম, আসলে তা ততখানি homogeneous নয়। এই গোটা বস্তুটির মধ্যেও একটি চিড়রেখা আছে যা কাব্যখানিকে দুটি অংশে ভাগ করেছে।

১২

এবার কাহিনীর প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর মিলিয়ে সংঘটনস্থলগুলির পরিচয় নেওয়া যাক। কাব্যের মধ্যে 'বকুলতলা'র গুরুত্ব যৎসামান্য। তাম্বুলখণ্ডে কিছুক্ষণের জন্য রাধিকা 'বকুলতলা'য় অপেক্ষা করেছিল। তাছাড়া কাহিনী আর কখনও বকুলতলায় যায় নি। তবে দ্বিতীয় স্তরেও কবি 'বকুলতলা'র কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন নি। 'রাধাবিরহে' বড়াই রাধিকাকে জিজ্ঞাসা করেছিল কোথায় কোথায় সে কৃষ্ণের অন্বেষণ করবে। উত্তরে রাধা অনেক জায়গার নাম করেছিল। তার মধ্যে 'বকুলতলা'ও ছিল।

বকুলতলাত চাহা চাহা একচীতে। পৃ. ১৫৩

যমুনায় কৃষ্ণকে না পেয়ে বড়াই

পুন গেলী বকুলের তলে। পৃ. ১৫৩

কাব্যে 'কদমতলা' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাধাকৃষ্ণের রহঃকেলির সঙ্গে 'কদমতলা'র সংযোগ কবে থেকে এবং কেমন করে জানি না। ভাগবতে 'কদমতলা'র উল্লেখ আছে 'কালীয়দমন' ও 'বস্ত্রহরণ' প্রসঙ্গে।[১৭]

---

১৭ 'কালীয়দমন' প্রসঙ্গে আছে—

কৃষ্ণঃ কদম্বমধিরুহ্য ততোঽতিতুঙ্গমাস্ফোট্য গাঢ়রশনো ন্যপতদ্বিপেদে। বসুমতী সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬

'বস্ত্রহরণ' প্রসঙ্গে আছে—

তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ।

হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হ। ঐ, পৃ. ১৭৩

গীতগোবিন্দেও[১৮] আছে; তবে সাধারণভাবে। 'কদমতলা' পদাবলী-সাহিত্যে পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। কালীনাগকে দমন করবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষ থেকে যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। সম্ভবত তখন থেকে কদম্ববৃক্ষের গৌরব বৈষ্ণব কবিদের দ্বারা স্বীকৃত হয়ে আসছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের দানখণ্ডের প্রায় যাবতীয় ঘটনা ঘটেছে 'কদমতলা'য়। কাহিনীর দ্বিতীয় স্তরে 'কদমতলা'র গুরুত্ব আরও বেশি। এই স্তরে কাহিনী 'যমুনা-কদমতলা-বৃন্দাবন' এই পরিবেশের মধ্যেই ঘোরাফেরা করেছে।

আগের আলোচনায় স্পষ্টই দেখা গেছে যে দুটি 'কদমতলা'র কল্পনা অপরিহার্য। প্রথম স্তরের 'কদমতলা' কুতঘাটে। দ্বিতীয় স্তরের 'কদমতলা' কালীদহের কূলে। আমার ধারণা 'কদমতলা' একটিই ছিল। সেটি কালীদহের কূলে। কবি ভ্রমবশেই হোক অথবা যে-কারণেই হোক 'কুতঘাট'কেও 'কদমতলা'য় পরিণত করেছেন। দানখণ্ডের কয়েকটি গানে এমন ইঙ্গিত আছে যে 'কদমতলা' আসলে কালীদহের কূলে। সেই 'কদমতলা'য় কৃষ্ণের আস্তানা। দানী সেজে কৃষ্ণ 'কুতঘাটে' এসেছে। যেমন,

বসিআঁ থাক কদমের তলে।
দান সাধসি যমুনার কূলে ॥ পৃ. ৪৫

এর অর্থ কি এইভাবে করা যায় না যে কৃষ্ণ বৃন্দাবনের মধ্যে 'কদমতলা'য় থাকে। সেই 'কদমতলা'বাসী কৃষ্ণের পক্ষে যমুনার কূলে দান চাইতে আসার মধ্যে কিছু অসঙ্গতি আছে। এই অসঙ্গতি রাধার চোখে ধরা পড়েছে। সেই কারণে আশ্চর্য হয়ে রাধা পুনপুন জিজ্ঞাসা করেছে যে 'কদমতলা' ছেড়ে দানীর বেশে কৃষ্ণ তুমি 'কুতঘাটে' কেন?

দানখণ্ডের একটি পদে আছে—

কদমতলাত বসিআঁ কাহ্নাঞিঁ।
নাকে মুখে বাঁশী বাএ ॥ পৃ. ৩২

---

১৮ গীতগোবিন্দে আছে—

বিশাদকদম্বতলে মিলিতং কলিকলুষভয়ং শময়ন্তম্ (দ্বিতীয় সর্গ) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৬। কালিয়দমনের পৌরাণিক ব্যাখ্যা যাই হক, পদাবলী-সাহিত্যে এই দিনটির গুরুত্ব অন্য কারণে। এইদিন রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রথম অনুরাগ সঞ্চার হয়। অর্থাৎ এই দিন কৃষ্ণের পূর্বরাগের দিন। গোবিন্দদাস কবিরাজের একটি পদে আছে—

কালি দমন দিন মাহ।
কালিন্দিকূল কদম্বক ছাহ ॥
কত শত ব্রজ-নব-বালা।
পেখলুঁ জনু থির বিজুরিক মালা ॥
তোহে কহো সুবল সাঙ্গাতি।
তব ধরি হাম না জানি দিন রাতি ॥

পুরাণে কালীয়দমনের একটা স্পষ্ট লক্ষ্য হয়ত ছিল। কিন্তু বৈষ্ণব কবি এই ঘটনাটিকে অবলম্বন করে অন্য আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। সে-প্রসঙ্গটি—রাধাকৃষ্ণ-প্রেম। রাধাকৃষ্ণ প্রণয়ের প্রথম সূত্রপাত যেখানে সেই জায়গাটি 'কালিন্দিকূল কদম্বক ছাহ' অনিবার্য কারণেই বৈষ্ণব পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু দানখণ্ডে বংশীবাদক কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। দানখণ্ডে পাই দানী কৃষ্ণকে। সেই দানী কৃষ্ণ—

নাকড়িতলাত বসিআঁ কাহ্নাঞি
বলে কাঢ়ী খাএ খীরে। পৃ. ৩২

'নাকড়িতলা' কোন্ জায়গা? অবশ্যই 'কুতঘাট'। কারণ এখানেই কৃষ্ণ রাধার খীর কেড়ে খেয়েছিল। তবে কি কবি 'নাকড়িতলা' ও 'কদমতলা'র মধ্যে গোলমাল করেছেন?[১৯]

পদাবলী-সাহিত্যের মাধ্যমে 'কদমতলা' রাধাকৃষ্ণ লীলাক্ষেত্রের একটি পীঠস্থান। কদমতলার বিশেষ মাহাত্ম্য পাওয়া যাচ্ছে পদাবলী-সাহিত্যে। তবে কি এ-অনুমান সঙ্গত যে কদমতলার মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাধাকৃষ্ণ কেলিবিলাস এবং 'কদমতলা' অচ্ছেদ্য সূত্রে একত্র বাঁধা পড়েছে এবং তাই রাধাকৃষ্ণের কথাকাটাকাটি বিবাদ মিলন যেখানেই ঘটেছে তা 'নাকড়িতলা' হয়েও কবির কাছে 'কদমতলা'? অথবা 'নাকড়িতলা' সংস্কর্তার কলমে 'কদমতলা'য় রূপান্তরিত হয়ে ভক্তকে তুষ্ট করেছে?

'কদমতলা' যেমন একটি বিশিষ্ট জায়গা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তেমনি আর একটি বিশিষ্ট জায়গা 'মাঝ-বৃন্দাবন'। 'মাঝ-বৃন্দাবন' আমার সুবিধার জন্য স্থাননাম হিসাবে মেনে নিয়েছি। আসলে এটি স্থাননাম কিনা বলা শক্ত। 'মাঝ-বৃন্দাবনে'র উল্লেখ কাব্যের মধ্যে বহু জায়গায় আছে কিন্তু কোথায়ও এমন ইঙ্গিত নেই যার দ্বারা একে স্থাননাম রূপে সনাক্ত করা যেতে পারে। এটি যে স্থাননাম নয় সে-সম্বন্ধে একটি অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। 'রাধাবিরহে' রাধা বড়াইকে কৃষ্ণ-অন্বেষণে পাঠাচ্ছে এবং যে যে জায়গায় কৃষ্ণকে পাওয়ার সম্ভাবনা সেইসব জায়গার একটি তালিকাও দিচ্ছে। এই তালিকায় এমন অনেক নাম আছে যার উল্লেখ কাব্যের অন্যত্র কোথায়ও নেই; এই তালিকার মধ্যে 'মাঝ-বৃন্দাবন' নেই। 'মাঝ-বৃন্দাবন' যদি প্রকৃতই স্থাননাম হত তাহলে হয়তো এই তালিকায় উল্লেখ থাকত।

স্থাননাম না হলেও 'মাঝ-বৃন্দাবন' এই শব্দটি দিয়ে বৃহৎ বনস্থলী বৃন্দাবনের একটি বিশিষ্ট জায়গাকে বোঝানো হয়েছে। কাব্যের বহু জায়গায় 'বৃন্দাবন' 'মাঝ-বন' এই শব্দগুলি 'মাঝ-বৃন্দাবন' নামীয় বৃন্দাবনের

১৯ দানখণ্ডে 'কুতঘাটে' বা 'নাকড়িতলা'য় কৃষ্ণ রাধাকে বিব্রত করেছে—খীর ছড়িয়েছে, কাঁচুলি ছিঁড়েছে। কিন্তু তার বেশি নয়। কেলি করবার জন্য কৃষ্ণ বৃন্দাবনের ভিতর যেতে চায়, সম্ভবত গোপনতার জন্য। যেমন—

কেলি করি জাই বৃন্দাবনে, পৃ. ৩৪

এখানে 'জাই' অর্থে 'গিয়ে' ধরতে হবে। 'করি জাই' এখানে Verbal phrase নয়।

পরে আছে— আইস রাধা যাই বৃন্দাবন, পৃ. ৪৩

কারণ, কদমতলের থিতী তোর মোর হৈব রতী
এহা ভালেঁ জাণে দেবলোকে। পৃ. ২৮

এই 'কদমতলের থিতী' বৃন্দাবনের ভিতর। যে বৃন্দাবন
··· মোর থানে।
বংশ বাজাওঁ গানে॥ পৃ. ১৯

বৃন্দাবনের এই অংশ অনুমান করি 'মাঝ-বৃন্দাবন'। এটি নির্জন জায়গা। সুতরাং 'কদমতলা'র প্রকৃত অবস্থান এখানে হওয়াই স্বাভাবিক।

সেই বিশেষ স্থানটি বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সেই বিশেষ জায়গাটির অন্য কোন নাম না থাকায় আমরা 'মাঝ-বৃন্দাবন' শব্দটিই স্থাননাম হিসাবে ব্যবহার করছি।

'মাঝ-বৃন্দাবনে' কৃষ্ণ একটি কুঞ্জ তৈরী করেছে। ফুলফলের গাছ লাগিয়েছে। এখানে কৃষ্ণ বাঁশি বাজায়, গান গায়[২০], গরু রাখে[২১]।

বৃন্দাবনখণ্ডের সমস্ত ঘটনা ঘটেছে 'মাঝ-বৃন্দাবনে'। ফুলের প্রলোভন দেখিয়ে বড়াই রাধা ও গোপীদের 'মাঝ-বৃন্দাবনে' নিয়ে গিয়েছিল—

নানা ফুল ফুটিলছে মাঝ-বৃন্দাবনে।
তাক পিন্ধি মথুরাক করিউ গমনে॥ পৃ. ৮০

কৃষ্ণ রাধার জন্য বৃন্দাবনের এই অংশে ফুল-ফলের গাছ লাগিয়েছে। কেলিকুঞ্জ তৈরী করেছে।

তোহ্মার আন্তরে কৈলোঁ এ বৃন্দাবনে। পৃ. ৮২
নিজ ধন দিআঁ সুন্দরী রাধা নির্মায়িলোঁ এ বৃন্দাবনে॥ পৃ. ৮৭

সুতরাং বৃন্দাবনের বন প্রাকৃতিক, কিন্তু মাঝ-বৃন্দাবনের ফুল-ফলের গাছ এবং কেলিকুঞ্জ কৃষ্ণের স্বহস্তে তৈরী। এই কেলিকুঞ্জের জন্য কাহিনীর দ্বিতীয় স্তরে রাধার প্রাণ আঁকুপাঁকু করেছে। প্রথম স্তরেও এই কেলিকুঞ্জের ইঙ্গিত বহু জায়গায় আছে।[২২]

১৩

দ্বিতীয় স্তরে কাহিনীর ভূখণ্ডের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। স্থানের উল্লেখ আছে প্রচুর। তবে তার মধ্যে কোনোটিরই স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায় নি। দ্বিতীয় স্তরে ঘটনাস্থলের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য সীমাবদ্ধ। যমুনাতীর বৃন্দাবন এবং কদমতলা—এই নামগুলি দিয়ে কবি একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন এবং কাহিনীকে এই পরিবেশের মধ্যে বেঁধে রেখেছেন। এই পরিবেশের মধ্যে 'যমুনাতীর' 'বৃন্দাবন' বা 'কদমতলা' এদের কোনোটিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। সবগুলি মিলিয়ে একটা কিছু। যেমন আমরা দেখি পদাবলী-সাহিত্যে। পদাবলী-সাহিত্যে বহু স্থাননাম আছে কিন্তু সেগুলি শুধু নামই। সম্ভবত সিদ্ধ নাম। সাধারণ নাম সিদ্ধ নামে পরিণত হতে পারে তখনই যখন সেই নামগুলির সঙ্গে সুপরিচিত ঐতিহ্য জড়িত থাকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীর দ্বিতীয় স্তরের স্থাননামগুলি 'যমুনাতীর' 'কদমতলা' 'বৃন্দাবন' ঐতিহ্যমণ্ডিত, কিছুটা সাংকেতিক নাম। প্রথম স্তরের নামগুলি 'নাকড়িতলা' 'বকুলতলা'র ঐতিহ্য নেই। যমুনা-মথুরার ঐতিহ্য

---

২০ বৃন্দাবন মোর থানে।
বংশ বাজাওঁ গানে। পৃ. ১৯

২১ গরু রাখি বুল তোহ্মে মাঝ বৃন্দাবনে, পৃ. ৪১

ছত্রখণ্ডে আছে—
ছাতী ধরিআঁ' তার তোষিআঁ মনে।
আপনার সুখে তাক নেহ কুঞ্জবনে॥ পৃ. ৭৭

২২ ধরি লআঁ জাএ কুঞ্জতলে।
আর সুরতি চাহে বলে॥ পৃ. ৪৩

দানখণ্ডেও পূর্ববচন পালন করে বড়াই 'মাঝ-বনে' অর্থাৎ 'মাঝ-বৃন্দাবনে' অর্থাৎ কৃষ্ণের কেলিকুঞ্জে রাধিকাকে 'একসরী' রেখে অন্তর্হিত হয়েছিল। এই গোপন নির্জন স্থানে রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন হয়। প্রথম স্তরে কৃষ্ণ রাধাকে কুঞ্জে নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে। দ্বিতীয় স্তরে রাধা কুঞ্জে যাওয়ার জন্য ছটফট করেছে —'আহ্মা লআঁ যাহ কুঞ্জবনে' পৃ. ১৪৬

আছে কিন্তু কবি সে ঐতিহ্য স্বীকার করেন নি। এ নামগুলি সেখানে সাংকেতিক নয়। কাহিনীর দুটি স্তরে স্থাননামের এই পার্থক্য আমার মনে হয় অতিশয় স্পষ্ট।

স্থান এবং কাল মিলিয়ে নিলে কাহিনীর প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের পার্থক্য সুস্পষ্ট হবে।

প্রথম স্তরে কালের পারম্পর্য সুরক্ষিত। সংঘটনস্থলগুলিও এই স্তরে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। ঘটনাগুলি পর পর যেন ধাপ ফেলে ফেলে মথুরাগামী হয়েছে। মথুরা যাওয়া উদ্দেশ্য কিনা জানি না তবে গিয়েছে সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। প্রথম স্তরে দুটি ঘটনা এক জায়গায় ঘটে নি। এই স্তরে দুটি ঘটনাও একই ঋতুতে ঘটে নি। বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ এই পারম্পর্যটি কবি সযত্নে অনুসরণ করেছেন। সে তুলনায় দ্বিতীয় স্তরে স্থান এবং কাল জট পাকিয়ে গিয়েছে। কালের দিক থেকে দেখা গিয়েছে এই স্তরের প্রায় যাবতীয় ঘটনা ঘটেছে বসন্তকালে। স্থানের দিক থেকেও এই স্তরের যাবতীয় ঘটনা ঘটেছে 'যমুনাতীর-কদমতলা-বৃন্দাবন' এই পরিবেশে। কালেরও যেমন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় থাকে নি ঘটনাস্থলেরও ঠিক তেমনি। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের এই যে পার্থক্য এটা রচনারীতির পার্থক্য। প্রথম স্তরের রীতি নাটগীত, দ্বিতীয় স্তরের রীতি পালাগান। নাটগীতে কিছুটা নাট্যগুণ আছে, তাই স্থানকালের গুরুত্বও আছে। পালাগান প্রধানত লিরিক্-ধর্মী। লিরিকে স্থানকালের গুরুত্ব অপ্রয়োজনীয়।

১৪

পরিশেষে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। মনে হতে পারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ঘটনার স্থানকালের উপর আমি একটু বেশি গুরুত্ব আরোপ করছি। স্থানকালের অসঙ্গতির উপর নির্ভর করে আমি যে সিদ্ধান্তগুলিতে পৌঁছতে চেষ্টা করেছি সে সিদ্ধান্তগুলি কিছুটা হালকা মনে হতে পারে এই কারণে যে এই সিদ্ধান্তের ভিতটি হালকা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অসতর্ক রচনা নয় ঠিক, কিন্তু এমন সতর্ক রচনাও নয় যাতে ঘটনার স্থানকালের উপর নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যেতে পারে। এ-প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, স্থানকালের এই অসঙ্গতিগুলি যদি একটি সুনির্দিষ্ট pattern অনুযায়ী না হত তাহলে খুব সম্ভব এগুলিকে উপেক্ষা করাই সঙ্গত হত। কিন্তু আসলে তা তো নয়। তাম্বুল থেকে ছত্র খণ্ড পর্যন্ত এবং বৃন্দাবন-থেকে রাধাবিরহ পর্যন্ত কাহিনীর এই দুটি স্তর তো প্রকৃতই নিজস্ব সঙ্গতি-অসঙ্গতি নিয়ে একা একটা বৈশিষ্ট্য প্রকট করেছে। তেমন অসঙ্গতি উপেক্ষনীয় যা নিতান্তই খাপছাড়া, কোনো নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে যা ধরা পড়ে না। এই কাব্যের অসঙ্গতি সে রকম নয় বলেই এগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চাশত্তম বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে

রবীন্দ্রশতপূর্তির বৎসরে কবির অর্ধশতপূর্তি উপলক্ষ্যে সংবর্ধনার কথা আমরা স্মরণ করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের ‘পঞ্চাশত্তম বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে’ ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি ১৯১২) তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক কলকাতার টাউন-হলে কবি সংবর্ধিত হন।

সাহিত্য-পরিষদের তৎকালীন সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পরিষদের পক্ষ থেকে যে আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করেন তার একটি সংগ্রহ করা গিয়েছে, এখানে তার প্রতিলিপি মুদ্রিত হল—

সবিনয় নিবেদন—

আগামী ১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) রবিবার অপরাহ্ণ চারিটার সময় কলিকাতা টাউন-হলে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চাশত্তম বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কবিবরকে অভিনন্দন করিবেন। মহাশয় যথাসময়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া কবিসম্বর্দ্ধনায় যোগ দান করিলে অনুগৃহীত হইব।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা
বঙ্গাব্দ ১৩১৮ তারিখ ৩রা মাঘ

বশংবদ
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক
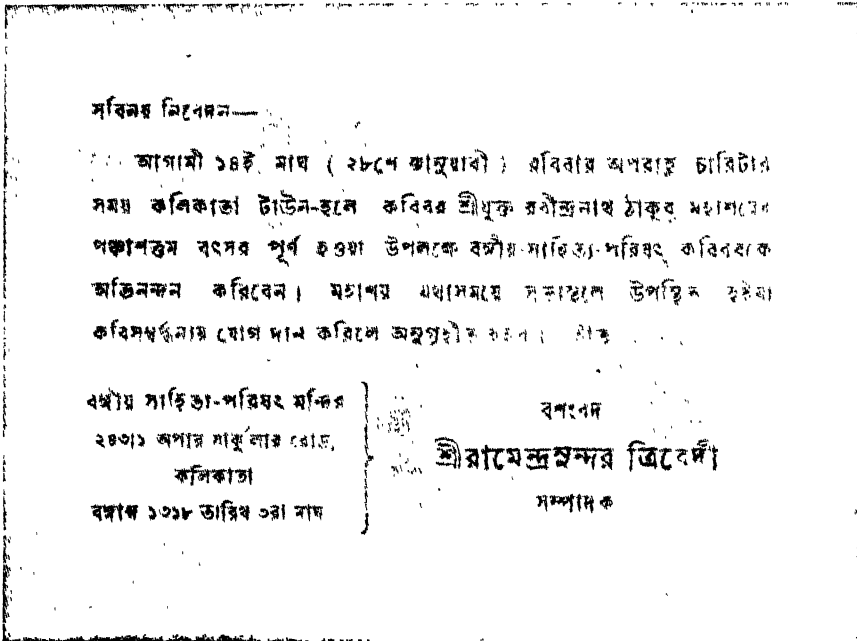
এই সংবর্ধনার পূর্ণ বিবরণ এবং রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ ভারতী ১৩১৮ ফাল্গুন সংখ্যায় মুদ্রিত আছে। আমরা এখানে কিয়দংশ উদ্ধৃত করি—

‘সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যখন পুঁথির আকারে হস্তীদন্তের পত্রে উৎকীর্ণ অভিনন্দন পাঠ করিতে উঠিলেন, তখন স্পষ্টই দেখা গেল বৃদ্ধ সাহিত্যরথী নিতান্তই অভিভূত হইয়াছেন। তাঁহার অভিনন্দনের ছত্রে ছত্রে বর্ণে বর্ণে সত্যের হস্তচিহ্ন দেখাইতে দেখাইতেই যেন তাঁর কণ্ঠস্বর বিগলিত হইতে লাগিল, দেহ কম্পায়মান হইল। তিনি গদগদকণ্ঠে কহিলেন— “কবিবর, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বর্দ্ধন করিয়া বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নবজীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্দ্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত

করিয়াছিল; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণজীবন স্পন্দিত হইল; সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসুমসম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইল।· ·বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ুঃ কামনা করিতেছেন।" '

অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে অভিভাষণ দান করেন, তার কিয়দংশ এই—

"· ·আজ চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল সাহিত্যের সাধনা করিয়া আসিয়াছি— ভুলচুক যে অনেক করিয়াছি এবং আঘাতও যে বারম্বার দিয়াছি তাহাতে কোনোই সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমার সেই সমস্ত অপূর্ণতা, আমার সেই সমস্ত কঠোরতা বিরুদ্ধতার উর্দ্ধে দাঁড়াইয়া আপনারা আমাকে যে মাল্য দান করিয়াছেন তাহা প্রীতির মাল্য ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। এই দানেই আপনাদের যথার্থ গৌরব এবং সেই গৌরবেই আমি গৌরবান্বিত।

"যেখানে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়ম প্রবল, সেখানে প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন আছে। যেখানে অনেক জন্মে, সেখানে মরেও বেশী— তাহার মধ্য হইতে কিছু টিঁকিয়া যায়। কবিদের মধ্যে যাঁহারা কলানিপুণ, যাঁহারা আর্টিষ্ট, তাঁহারা মানসিক নির্ব্বাচনের নিয়মে সৃষ্টি করেন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে কাছে ঘেঁসিতে দেন না। তাঁহারা যাহা কিছু প্রকাশ করেন তাহা সমস্তটাই একেবারে সার্থক হইয়া উঠে।· ·

"কিন্তু আমি কারুকরের মত সংহত অথচ মূল্যবান গহনা গড়িয়া দিতে পারি নাই। আমি, যখন যাহা জুটিয়াছে তাহা লইয়া, কেবল মোট বাঁধিয়া দিয়াছি, তাহার দামের চেয়ে তাহার ভার বেশি। অপব্যয় বলিয়া যেমন একটা ব্যাপার আছে, অপসঞ্চয়ও তেমনি একটি উৎপাত। সাহিত্যে এই অপরাধ আমার ঘটিয়াছে। যেখানে মাল-চালানের পরীক্ষাশালা সেই কষ্টম্ হৌসের হাত হইতে ইহার সমস্তগুলি পার হইতে পারিবে না। কিন্তু সেই লোকসানের আশঙ্কা লইয়া ক্ষোভ করিতে চাই না। যেমন একদিকে চিরকালটা আছে তেমনি আর-একদিকে ক্ষণকালটাও আছে। সেই ক্ষণকালের প্রয়োজনে, ক্ষণকালের উৎসবে, এমন কি, ক্ষণকালের অনাবশ্যক ফেলাছড়ার ব্যাপারেও যাহা জোগান্ দেওয়া গেছে, তাহার স্থায়িত্ব নাই বলিয়া যে তাহার কোন ফল নাই তাহা বলিতে পারি না। একটা ফল ত এই দেখিতেছি, অন্ততঃ প্রাচুর্য্যের দ্বারাতেও বর্ত্তমানকালের হৃদয়টিকে আমার কবিত্ব-চেষ্টা কিছু পরিমাণে জুড়িয়া বসিয়াছে এবং আমার পাঠকদের হৃদয়ের তরফ হইতে আজ যাহা পাইলাম তাহা যে অনেকটা পরিমাণে সেই দানের প্রতিদান তাহাতে সন্দেহ নাই।· ·

"সম্মান যেখানে মহৎ যেখানে সত্য সেখানে নম্রতায় আপন মন নত হয়। অতএব আজ আপনাদের কাছ হইতে বিদায় হইবার পূর্ব্বে এ কথা অন্তরের সহিত আপনাদিগকে জানাইয়া যাইতে পারিব যে, আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মানের উপহার আমি দেশের আশীর্ব্বাদের মত মাথায় করিয়া লইলাম— ইহা পবিত্র সামগ্রী, ইহা আমার ভোগের পদার্থ নহে, ইহা আমার চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবে, আমার অহঙ্কারকে আলোড়িত করিয়া তুলিবে না।"

এবং, সেই সময়ে, উক্ত সংখ্যা ভারতীতে এই দুটি রবীন্দ্রপ্রশস্তি প্রকাশিত হয়।—

কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রতি

১

এ মোহিনী বীণা কোথায় পাইলে ?
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে প্রাণ কেড়ে নিলে !
হেন স্বর্ণবীণা নাই রে নিখিলে,
স্থধাভরা ক্ষুধাহরা !
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে উছলিছে স্বর
পদ্মমধু জিনি' মধুর, মধুর ;
এ যেন রতির চরণ-নূপুর,
পরশে শিহরে ধরা !

২

বাজে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী ;
উর্ব্বশীর যেন বীণা বিমোহিনী !
সৌন্দর্য্য-নন্দনে স্থধা-প্রবাহিনী
লীলায় উছলে চলে ।
এ যেন গোলাপে শিশির পতন,
পূর্ণিমা রাতির উছল কিরণ !
শেফালির যেন নিশান্ত-স্বপন,
সৌরভ-হিল্লোল ছলে !

৩

ওহে কবিবর, ধন্য তব শিক্ষা !
ওহে যোগিবর, ধন্য তব দীক্ষা !
প্রতিভা তোমার অনল-পরীক্ষা
দিয়া আজি দীপ্তিময়ী !
সীতাসতী সমা হাসে বরাননী
অনলের ক্রোড়ে কাঞ্চন-বরণী,
কাঞ্চনের সমা ! সূর্য্যকান্ত মণি,
তেজে যেন বিশ্বজয়ী !

৪

বহুদিন ছিল অহল্যা পাষাণী ;
রামচন্দ্র আসি, চরণ দুখানি
রাখিলা যেমতি, হাসি ঋষিরাণী
চমকিলা নিদ্রাভঙ্গে !

পাষাণের সম ছিল যেন জড়
এই বঙ্গভাষা ! বহুদিন পর
তোমার পরশে কাঁপি থর-থর
জাগিয়াছে লীলারঙ্গে !

৫

ভাগবতে যার অপূর্ব্ব ভারতী
ত্রিবক্রা কুবুজা পাইলা যেমতি
অপরূপ রূপ, অপূর্ব্ব সদ্গতি,
গোবিন্দের আগমনে ;
ওহে যাদুকর তেমতি, তেমতি,
শ্রীহীনা এ ভাষা লভিয়াছে গতি,
কুবুজা হয়েছে অতি রূপবতী,
তব কর-পরশনে !

৬

পূর্ব্বকালে যথা, সঙ্গীতে সঙ্গীতে
সৌধময়ী ট্রয় উরি আচম্বিতে
রাজিল সহসা, কিরণরাজিতে
উষা যথা হিরণ্ময়ী ;
ওহে যাদুকর, তোমার সঙ্গীতে
স্বর্ণ হর্ম্ম্যময়ী হাসিতে হাসিতে
এ কোন্ অলকা ভাতিল প্রাচীতে
কিরণে কিরণময়ী ?

৭

পূর্ব্বকালে যথা অযুত তরঙ্গে,
কল্লোলে, হিল্লোলে, লীলারঙ্গ ভঙ্গে
ত্রিদিব হইতে ভগীরথ সঙ্গে
এসেছিলা মন্দাকিনী,
ওহে যাদুকর, তোমার সঙ্গীতে
নব মন্দাকিনী নেমেছে মহীতে !
চলেছে সাগরে কি লীলা-গতিতে,
কলকল-প্রবাহিনী !

৮

এ জাহ্নবী-তটে এ কি গো নেহারি!
মোহিনী নগরী শোভে সারি সারি,
যেন হাস্যময়ী রূপসী এ নারী
নব হরিদ্বার, কাশী!
সদা লীলাময়ী, বিলাস-বিভ্রমে,
পড়ে সুধানদী অতুল বিক্রমে,
ক্ষীর-সাগরের পবিত্র সঙ্গমে,
হাসিয়া ফেনিল হাসি!

৯

বাণী-বরপুত্র! সুধামকরন্দ
বিভোর হইয়ে বাণী বক্ষে পিয়ে
হইয়া অমর, আনন্দের কন্দ
আনিয়াছ বঙ্গে তুমি!
ভগবানে আজি করিয়া আহ্বান,
তাই এ প্রার্থনা,— হয়ে আয়ুষ্মান,
থাক জননীর দুলাল সন্তান,
মহিমা-ছটায় বালার্ক সমান,
উজলিয়া বঙ্গভূমি!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

বরণ

তোমারে বরি হে কবিসম্রাট
কবিস্থয় মহাযজ্ঞে কবি!
বঙ্গবাণীর হে বরপুত্র!
প্রতিভা-প্রতিমা অনুপ রবি!
কবি হোতা কবি উদ্গাতা হেথা
মিলিয়াছে কবি-কুঞ্জ-ধামে;
যজ্ঞ-নিপুণ বুধ-মণ্ডলী
আজি একত্র তোমার নামে।
বঙ্গদেশের ইঙ্গিতে মোরা
হে কবি! তোমায় বরি হে আজি,—

বঙ্গের ফুলে মাল্য রচিয়া
বঙ্গের ফুলে ভরিয়া সাজি।
অযুত আঁখির উজল আলোকে
হে কবি! তোমায় আরতি করি,
অযুত হিয়ার শুভ-কামনার
শুভ্র-শোভন চাঁদোয়া ধরি।
গান গেয়ে তুষি গানের রাজারে
গঙ্গারে পূজি গঙ্গাজলে;
পঞ্চাশতের পান্থশালায়
সাজাই তোমারে পুষ্পদলে।
বঙ্গের কবি-মনীষীরা আজি
ব্যাপৃত নূতন সবন-কাজে,
কবি-নৃপমণি! তব আগমনী
ধ্বনিছে লক্ষ হৃদয় মাঝে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ষষ্টিতম বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে

'রবীন্দ্রমঙ্গল'

দশ বৎসর পরে, রবীন্দ্রনাথের ষাট বৎসর পূর্তিতে, ১৯ ভাদ্র ১৩২৮ (৪ সেপ্টেম্বর ১৯২১) তারিখে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কবিকে পুনরায় সংবর্ধিত করেন। কিছুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বিদেশ-সফরের পর দেশে ফিরেছেন।

তাঁর বিদেশযাত্রার কারণ সম্পর্কে ভারতী (১৩২৮ ভাদ্র) 'য়ুরোপে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক নিবন্ধে লেখেন— "নোবেল প্রাইজ পাওয়ার [১৯১৩] পর মাঝে মাঝে ঐ প্রাইজের সর্ত্ত অনুসারে নোবেল-বক্তৃতা দিবার জন্য কবির নিমন্ত্রণ আসিত। পরে য়ুরোপের অন্যান্য দেশ হইতেও নিমন্ত্রণলিপি আসিতে লাগিল। যতদিন য়ুরোপের মহাযুদ্ধের [প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪-১৯১৯] অবসান না হয় ততদিন এই সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করা দুরূহ ছিল। তদনন্তর কেবলই যে এই সকল য়ুরোপীয় ভক্তবৃন্দের কামনা পূর্ণ করার সুযোগ আসিল তাহা নহে, কবিবর সমর-শ্মশানভূমি য়ুরোপে নব-নির্ম্মাণ কার্য্য কেমন চলিতেছে তাহা দেখিবারও সুবিধা পাইলেন।··

"··এ বৎসর য়ুরোপে থাকিতেই কবির ষষ্টিতম জন্মদিন সমাগত হইল। জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণ এই উপলক্ষে তাঁহাকে গ্রন্থরাজি উপহার দিবার মানস করিলেন,··গেটের বাসস্থান উঈমার-নগরীতে জার্ম্মাণ ন্যাশনাল থিয়েটারে গান ও তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে আবৃত্তির বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কবি যখন সুইজারল্যাণ্ডের লুসার্ণ নগরে, তখন তাঁহার জন্মদিন আসিল।··"

১৯২০ সালের ১২ মে (২৯ বৈশাখ ১৩২৭) রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ও আমেরিকা সফরে যাত্রা করেন, এবং ১৯২১ সালের ১৬ জুলাই (৩২ আষাঢ় ১৩২৮) শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন।

কবিসংবর্ধনার এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে 'রবীন্দ্রমঙ্গল' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটি এখন দুষ্প্রাপ্য। আমরা এখানে সেটি মুদ্রিত করলাম।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে

কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে

প্রীতি-সম্মিলন

সভাপতি—মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

১৯ ভাদ্র, ১৩২৮

কার্য্যসূচী—

১। গান— শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
২। আশীর্বচন—শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সভাপতি, বঃ-সাঃ-পরিষদ
৩। মাল্য ও চন্দন দান—কুমারী শ্রীমতী লীলা ও ইলা দেবী
৪। গান— ,, ,,
৫। কবিতা—
রবি-প্রশস্তি—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী
নমস্কার— শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
রবীন্দ্র-মঙ্গল— শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের প্রতি—মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায়
৬। গান— শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী
৭। কবিতা—
রবীন্দ্রনাথের প্রতি—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী
আবাহন— শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক
৮। গান— শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
৯। কবিতা—
বরণ— শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়
স্বাগত— শ্রীমতী মানকুমারী
১০। পরিষদের পক্ষ হইতে উপহার প্রদান—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১১। সভাপতির অভিভাষণ
১২। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভিভাষণ
১৩। গান— শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

—o—

'রবীন্দ্রমঙ্গল' পুস্তিকার অনুষ্ঠান-সূচী

রবীন্দ্র-মঙ্গল

গান

সাত সাগরের ঢেউয়ের মেলায় খুশীর কোলাহল!
(আমরা) জয়ধ্বনি কর্‌ব কি, বল্, চোখের কূলে জল!
দিগ্বিজয়ী ফির্‌ল ঘরে
হেম-অরোরার মাল্য প'রে,
মাথায় দধি-পাত্র করে বরণ হিমাচল!
নিমেষ-হারা থির-দামিনী
পূজ্‌ল ওরে দিন-যামিনী
অরুণ-বাণী আপন খোঁপার সঁপ্‌ল চাঁপার দল!
'নৈশ-ভানু'—অবাক্ ছবি—
তারেও অবাক্ কর্‌লে কবি
নুইয়ে শাখা পাইয়ে দিলে কল্পতরুর ফল!
ধ্রুব-তারার তিলক ভালে
অমর-তিলক কে পরালে,
(আজ) কাঙাল-দেশের মন্-মাণিকে ভুবন সমুজ্জ্বল!
প্রাণের পরাগ ছন্দে ঢেলে
বিশ্ব-কবিচ্ছত্র পেলে,
আমরা ওরে কি দেব, বল্, কি আছে সম্বল!
স্বদেশ, কবির বালাই নিয়ে,
ষাট বছরের 'ষাট' বানিয়ে
পথের ধুলায় স্নেহের আসন পেতেছে আঁচল!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আশীর্বচন

শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ,

তুমি যখন নিতান্ত বালক, তখন হইতেই তোমার কবিতায় বাঙ্গালী মুগ্ধ। তোমার যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তোমার প্রতিভা বিকাশ হইতে লাগিল। সে প্রতিভা যেমন একদিকে দেশ হইতে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তেমনি সাহিত্যেরও সকল মূর্ত্তিই আয়ত্ত করিতে লাগিল। সে প্রতিভা প্রথম প্রথম কবিতায় আবদ্ধ ছিল, ক্রমে গদ্য, নাটক, নবেল-রচনা, ছোট গল্প, বড় গল্প, সমালোচনা, রাজনীতি, সমাজনীতি, কর্ম্মনীতি, এইরূপে সমস্ত সাহিত্য-সংসারে ছড়াইয়া পড়িল। তুমি সাহিত্যের যে মূর্ত্তিতেই হাত দিয়াছ, তাহাকে উদ্ভাসিত ও সজীব করিয়া তুলিয়াছ। কারণ, তোমার প্রাণ আছে, সে প্রাণে যেমন মধুরতা আছে, তেমনি তেজ আছে— যেমন মোহিনীশক্তি আছে, তেমনি উন্মাদিনীশক্তি

আছে— যেমন সূক্ষ্ম-দৃষ্টি আছে— তেমনি দূরদৃষ্টি আছে। তোমার প্রতিভা যেমন গড়িতে পারে, তেমনই ভাঙ্গিতে পারে— যেমন মাতাইতে পারে— তেমনই ঠাণ্ডা করিতে পারে— যেমন কাঁদাইতে পারে, তেমনই হাসাইতে পারে। কিমধিকং, তোমার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী, সর্ব্বতঃপ্রসারী এবং সর্ব্বতোমুগ্ধকারী। সঙ্গীতের সহিত সাহিত্যের মিলনে তোমার হাতে উভয়েরই গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে; তোমাকেও যশোমন্দিরের উচ্চ চূড়ায় তুলিয়া দিয়াছে।

ইংরাজ-রাজত্ব হইয়া অবধি তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ ধনে মানে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, সদ্‌গুণে সাহসে বাঙ্গালায় অতি উচ্চ আসন অধিকার করিয়া আসিতেছেন। তোমার প্রতিভায় সেই বংশের গৌরব উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর— উজ্জ্বলতম হইয়া উঠিয়াছে। তোমার গুণে বাঙ্গালা ত চিরদিনই মুগ্ধ— ভারত গৌরবান্বিত, এখন পূর্ব্ব ও পশ্চিম, নূতন ও পুরাতন সকল মহাদেশই তোমার প্রতিভায় উদ্ভাসিত। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সমস্ত পৃথিবী আরও উদ্ভাসিত কর। তোমার বংশই দীর্ঘজীবীর বংশ, তুমি শতায়ু হও, সহস্রায়ু হও। তোমার বয়স যতই পাকিতেছে, অভিজ্ঞতা বাড়িতেছে, ততই মানুষের ব্যথায় তোমার মন গলিতেছে, তোমার বীণার ঝঙ্কার গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে। মানবের মঙ্গলের জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ যতই বাড়িতেছে, ততই তুমি ব্যাকুল হইয়া মঙ্গলময়ের মঙ্গলাসনের সমীপবর্ত্তী হইতেছ। তোমার মঙ্গলবাসনা চরিতার্থ হউক, তোমার নাম অক্ষয় হউক, তুমি অমর হইয়া ভারতের মঙ্গলকামনা করিতে থাক। তুমি দিগ্বিজয় করিয়া, বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়া, আবার সোনার বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়াছ; তুমি আমাদের ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও স্নেহের উপহার স্বরূপ এই পুষ্পমাল্য গ্রহণ কর। বিধাতার সৃষ্টিতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুরভি, সব এই পুষ্পেই আছে। আমাদেরও যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুরভি, তাহা তোমাতেই আছে। আইস, উভয়ের মিলন করিয়া দিয়া আমরা কৃতার্থ হই।—ইতি

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি

রবি-প্রশস্তি

রঞ্জিত করি পশ্চিমতট দীপ্ত প্রতিভাজালে
সূর্য্য আজিকে উদিল পূর্ব্ব উদয়গিরির ভালে;
পুণ্য পরশ লভি' আজি তারি জাগ্ ও-রে তোরা জাগ্—
বিশ্ব-সবিতা সেই রবি-করে দে রে দে যজ্ঞভাগ!
সহস্রদল বাণীর কমল মুদিত মানস সরে
দিক্‌দিগন্ত মুগ্ধ করিয়া ফুটিল যাহার বরে,
অমৃতগন্ধ আনন্দরূপে দান করি' যে বা লোকে
নবজীবনের দীপ্তি আনিল মৃত্যু-আহত চোখে,
তাহারি মুক্ত মিলনাঙ্গনে জাগ্ ও-রে তোরা জাগ্—
বিশ্ববিজয়ী সেই রবি-করে দে রে দে যজ্ঞভাগ।

খণ্ডিত নয় এ মহাযজ্ঞ, অনন্ত অফুরণ,—
এই বিশ্বের লোকে লোকে আজ আলোক-নিমন্ত্রণ ;
শক্তির মোহ মিথ্যার মায়া সবলে করিয়া দূর
ভুবনধন্যা জীবনবন্যা বহে আজি ভরপুর ;
আয় রে পূর্ব্ব আয় পশ্চিম, আয় তোরা সবে আয়
বিশ্বভারতী-মন্দির-তলে মিলন-মধুচ্ছায় ।
যা-কিছু যাহার কলঙ্ককালি, যাহা 'অচলায়তন',
সত্য-আলোকে ধুয়ে নে রে লভি' সে দীপ্ত বরিষণ ।
মর্ম্মপুটের মণির মুকুর উচ্চে তুলিয়া ধর্—
সবার ঊর্দ্ধে জ্বলুক সে আজি শাশ্বত ভাস্বর ।

জগৎ-সভায় রবি তুমি আজ নহ শুধু আর কবি,
অমৃত-প্রতিভা ভাণ্ডার-ভরা তুমি আলো-করা রবি ;
তোমারি প্রভায় উজল সপ্ত সাগর, সাগর-পার,
পূর্ব্বোত্তর দক্ষিণদিশি উজ্জ্বল চারিধার ;
কুরুক্ষেত্র-কালরাত্রির তমসার অবসানে
তোমারি কিরণ দূর পশ্চিমে নব জাগরণ হানে ।
বিশ্ব-সভায় মহা-রাজসূয়ে তুমি পুরুষোত্তম,
কর্ম্মের রথী ধর্ম্ম-সারথি জ্ঞানে মানে অনুপম ;
শিশুপাল ছাড়া তোমারে সকলে বরিষ্ঠ সম্মানে
অর্পিছে আজি প্রাণের ভক্তি শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যদানে ।

লহ ওগো লহ আজি এ অর্ঘ্য ঊর্দ্ধ আকাশপথে
যেথা তব মহাবিজয়যাত্রা শুভ্র আলোকরথে ;
চন্দ্র যেথায় অতন্দ্র চোখে সাজায় বরণডালা,
কাতারে কাতারে শোভিছে লক্ষ নক্ষত্রের মালা,
জ্যোৎস্না বিছায় অঞ্চলবাস ছায়া-পথখানি পরে,
মেঘেরা মিলিয়া চরণের তলে শঙ্খধ্বনি করে,
সঙ্গীতে মাতি গ্রহেরা ফিরিছে অনুগ্রহের লাগি',
নাচে ছয় ঋতু মোহন নৃত্যে চির দিনরাত জাগি ;
জানিনা সেথায় পঁহুছিবে কি না এ ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—
জানি শুধু দীন যাত্রী জনের তুমি চিরনির্ভর ।

কেন দীন বলি ? আমারি কণ্ঠে স্বাগত জানায় মাতা,
সাত কোটি নিজ সন্তান সাথে উন্নত যার মাথা ;

যাহার যশের কীর্ত্তি আজিকে ঘোষিছে জগৎময়,
ভিক্ষুক যে-বা শিক্ষক হয়ে ভুবন করিল জয়—
সে যে সেই রাণী বঙ্গবাণীরই বুক-আলো-করা ধন,
বিশ্বভুবন নন্দিত করা বন্দিত নন্দন।
সেই বাণী আজি আমারি কণ্ঠে পাঠায় তাহার বাণী
অক্ষম হোক্, তবু তোমা তরে গাঁথা এ মাল্যখানি ;—
পর আজি গলে— দেখুক বিশ্বসাহিত্য-পরিষৎ
বঙ্গবাণীরই কোলে দোলে আজ ভুবন-ভবিষ্যৎ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

নমস্কার

নমস্কার! করি নমস্কার!
কবিতা-কমল-কুঞ্জ উল্লসিত আবির্ভাবে যার,—
আনন্দের ইন্দ্রধনু মোহে মন যাহার ইঙ্গিতে,—
আত্মার সৌরভে যার স্বর্গনদী বহে তরঙ্গিতে,—
কূজনে গুঞ্জনে গানে মর্ত্ত্য হ'ল স্ফূর্তি পারাবার,—
অন্তরের মূর্ত্তিমন্ত ঋতুরাজ বসন্ত সাকার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

ফটিক জলের তৃষ্ণা যে চাতক জাগাইল প্রাণে,—
অমর করিল বঙ্গে মৃত্যু-হরা মৃত্যুহারা তানে ;
ছাতারে মুখর যুগে গাহিল যে চকোরের গান,—
করিল যে করা'ল যে জনে জনে চন্দ্র সুধা পান ;
তত্ত্বের নিথরে যেবা বিথারিল রসের পাথার
নমস্কার! করি নমস্কার!

চন্দন-তরুর বনে বাঁধিল যে বাণীর বসতি,—
দুর্লভ চন্দন-কাঠে কুঁড়ে বাঁধা শিখেছে সম্প্রতি—
অকিঞ্চন কবিজন গৌড়ে বঙ্গে আশীর্ব্বাদে যার
বেণু-বীণা জিনি মিঠা বাণী যার খনি সুষমার
চিত্ত-প্রসাধনী পরী দিল যারে নিজ কণ্ঠহার
নমস্কার! করি নমস্কার!

প্রতিভা-প্রভায় যার ভিন্ন-তমঃ অভিচার নিশি,
আবেদনে-আস্থাহীন, 'আত্মশক্তি'-মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি,

অর্ধশতপূর্তিতে কবিসংবর্ধনার উদ্যোগীবর্গ -সহ রবীন্দ্রনাথ

উপবিষ্ট । বাঁ দিক থেকে : করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

দণ্ডায়মান । বাঁ দিক থেকে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ভীরুতার চিরশত্রু, ভিক্ষুতার আজন্ম-অরাতি,
শোণিত নিষেক-শূন্য নৈযুজ্যের নিত্য-পক্ষপাতী,
বঙ্গের মাথার মণি ভারতের বৈজয়ন্ত-হার
নমস্কার ! করি নমস্কার !

রুদ্ধকণ্ঠ পঞ্জাবের লাঞ্ছনার মৌনী অমারাতে
নির্ভয়ে দাঁড়াল একা বাণী যার পাঞ্চজন্য হাতে
ঘোষিল আত্মার জয় কামানের গর্জ্জন ছাপায়ে
অতিচারী ফিরিঙ্গীর ঘাঁটা-পড়া কলিজা কাঁপায়ে
তুচ্ছ করি' রাজরোষ উপরাজে দিল যে ধিক্কার
নমস্কার ! তারে নমস্কার !

দাঁড়ায়ে প্রতীচ্য-ভূমে যে ঘোষে অপ্রিয় সত্য কথা,—
"জঘন্য জন্তুর যোগ্য পশ্চিমের দন্তুর সভ্যতা !"
ছিন্নমস্তা ইয়োরোপা শোনে বাণী স্বপ্নহত পারা,—
ছিন্নমুণ্ডে শিবনেত্র,—ত্যাখে নিজ রক্তের ফোয়ারা,—
শিহরি কবন্ধ মাগে যার আগে শান্তিবারি ধার,—
নমস্কার ! তারে নমস্কার !

স্বদেশে যে সর্ব্বপূজ্য বিদেশে যে রাজারও অধিক,
মুখরিত যার গানে সপ্তসিন্ধু আর দশদিক,—
বিশ্বকবিচ্ছত্রপতি, ছন্দরণী, নিত্য-বন্দনীয়,—
বিতরে যে বিশ্বে বোধি,—বিশ্ববোধিসত্ত্ব জগৎপ্রিয়,—
নিত্য-তারুণ্যের টীকা ভালে যার চিত্ত-চমৎকার
নমস্কার ! তারে নমস্কার !

যাটের পাটনে এসে দেশে দেশে বরযাত্রা যার
নিশীথে মশাল জ্বেলে যার আগে নাচে দিনেমার,
ওলন্দাজ খুলি' তাজ যার লাগি কাতারে কাতার
শীতে হিমে রাজপথে দাঁড়াইয়া ছবি প্রতীক্ষার,
দ্বন্দ্ব ভুলি' 'হূন্' 'গল' যার লাগি রচে অর্ঘ্যভার,
নমস্কার ! তারে নমস্কার !

নয়নে শান্তির কান্তি হাস্যে যার স্বর্গের মন্দার
পক্ককেশে যে লভিল বরমাল্য রম্যা অরোরার ;
বুদ্ধের মতন যার 'আনন্দ' সে নিত্য সহচর
সর্ব্ব ক্ষুদ্রতার ঊর্দ্ধে মেলে পাখা যাহার অন্তর

বিশ্বযোগে যুক্ত যে গো "বাণীমূর্তি স্বদেশ-আত্মার"
বারম্বার তারে নমস্কার !

চারি মহাদেশ যার ভক্ত,—করে ভক্তি নিবেদন ;
গুরু বলি' শ্রদ্ধা সঁপে উদ্বোধিত আত্মা অগণন ;
ভাবের ভুবনে যার চারি যুগে আসন অক্ষয়,
যার দেহে মূর্ত্তি ধরে ঋষিদের অমূর্ত্ত অভয়,
অমৃতের সন্ধানী যে ধ্যানী যে নির্দ্বন্দ্ব সাধনার
নমস্কার ! নমস্কার ! বারম্বার তারে নমস্কার !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

রবীন্দ্রমঙ্গল

জগতের কবীশ্বর, হে বঙ্গের রবি,
জয়-মঙ্গলের তপে অমৃতত্ব লভি'
নন্দিত করেছ গুণী দেশ-পরদেশ,
জাগিছে নিখিল-ব্যাপী স্বাগতের রেশ।
হে গীষ্পতি, সারদার পূজার প্রভাতে,
লিখেছ সোনার পুঁথি নব ভূর্জ্জ-পাতে,—
মানব-আত্মার ভাষা কি দিব্য কাকলি ;
অপরাজেয়ার লাগি' চিত্ত-গীতাঞ্জলি !
স্ফূর্ত্তি তব বিশ্ববোধ-আগমনী-সুর,
ভুলায় সুধার রসে নিকট-সুদূর।
কুন্দ-জ্যোৎস্না-যশোভাতি ক্ষীরোদ-সাগরে,
তোমার সোনার তরী ধায় যুগান্তরে।
যত দিন রাজে ধ্রুব বৃদ্ধ হিমালয়,
কীর্ত্তি তব সার্ব্বভৌম, জয় তব জয়।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতি

সুপ্ত বঙ্গে কে তুমি বন্ধু গাহিলে অমরা গান ;
নিত্য-নূতন মায়া বিরচিলে বিস্তারি কলতান।
ছন্দে তোমার নাচিয়া উঠিল সিন্ধুর বীচিমালা,
স্পর্শে তোমার চেতনা লভিল সুপ্ত অমরা-বালা।

সাগরে সলিলে বনে কান্তারে গ্রহ তারা উপগ্রহে—
নন্দিত করি নিখিল-চিত্ত করুণার ধারা বহে!

যেথায় আরতি করিছে সূর্য্য, মরুৎ দৌত্য করে
চন্দ্রের হিয়া অমিয় ছানিয়া বিগলিত নির্ঝরে।
আদি-যুগ হতে যেথায় বাজিছে কবির মোহন তন্ত্রী,
তোমার কাহিনী পশিছে সেথায় দৈন্য-দহন-হন্ত্রী।
অমরার সাথে বসুধার ধারা মিলাইল তব ছন্দে—
সাত-সমুদ্র তাইতো আজিকে তোমার চরণ বন্দে!

তাই দেখি আজ, মুকুটের সাথে মহামানবের মেলা—
রাজার মহিমা তুচ্ছ মানিছে কমলার দেওয়া ঢেলা।
আমাদের এই ধরা-মা'র বুকে, নবজীবনের পালা;
বাণীর দুয়ার হ'ল যে রে আজ লক্ষ্মী-দুলাল-শালা!
চিত্তের ক্ষুধা সুধায় ভরিল, বিত্ত পাইল নিঃস্বে,
রবির রশ্মি লুটায়ে পড়িল আঁধার-জড়ান বিশ্বে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়

গান

সপ্ত সুরের সপ্ত ঘোড়া চালায় যে জন ইঙ্গিতে
তারে কে আর সুর শোনাবে সঙ্গীতে!
রাগ-রাগিণীর রশ্মিটানে
বাণী নিজে বশ্য মানে
সুরের রাজা— যার অপরূপ ভঙ্গীতে—
তারে কে আর সুর শোনাবে সঙ্গীতে!
যাহার করের পরশ পেয়ে কমল ফুটে আনন্দে,
ভুবন ভরে নূতন বাণীর সুগন্ধে;
বঙ্গদেশের সেই কবিরে
বিশ্বাকাশের সেই রবিরে
কে পারে আর কথার রঙে রঙ্গিতে—
তারে কে আর কথা শোনায় সঙ্গীতে!

সুর ও কথা অবাক্ হয়ে হার মেনে তাই তার কাছে
চোখের জলে প্রসাদ-সুধা-ধার যাচে;

ঐ চরণের যোগ্য করি'
অর্পিতে আজ অর্ঘ্য ভরি'
চিত্ত-সাগর রয় শুধু তরঙ্গিতে—
কথা ও সুর তাই ভেসে যায় সঙ্গীতে!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

এ কি অপরূপ দৃশ্য! এ কি অভিনব!
এ কি গো সত্যই রবি পশ্চিমে উদয়?
কাল যারা শক্তি-দম্ভে প্রচণ্ড দানব
জাগায়ে তুলিয়াছিল ভীষণ প্রলয়,
আজ তারা ওগো কবি, শ্রীচরণে তব
অবাক্ শিষ্যের মতো শুনিছে তন্ময়
পরম প্রেমের বাণী— নিখিল মানব
যে সত্য-বন্ধনে বাঁধা সারা বিশ্বময়।
তারা একচক্ষু গুরু শুক্রাচার্য্যে বরে
বাহিরের শক্তি-রাজ্য করিয়াছে জয়
তোমার কৃপায় আজি দেখিল অন্তরে
আত্মার অনন্ত শক্তি সম্পদ্ অক্ষয়।
তাই তারা হেন পূজা পূজিল তোমারে
যে মহাসম্মান কভু অর্পে নাই কারে।

মিথ্যা বৈরাগ্যের মন্ত্রে মোহমুগ্ধ প্রাণ
আমরা দেখিনি হায়! বহু বহু দিন
বাহিরে শক্তির রাজ্য শাশ্বত বিধান,
সত্যভ্রষ্ট তাই মোরা ভয়াতুর দীন।
মৃত্যু তাই শতরূপে নিত্য বর্ত্তমান
এই হতভাগ্য দেশে—গৌরব-বিহীন
সঙ্কীর্ণ জীবন মৃত্যু-ভয়ে কম্পমান,
ক্ষুদ্র আশা, ক্ষুদ্র কাজ, তুচ্ছতায় লীন।
অবিদ্যা তো মিথ্যা নয়, নয় শুধু ফাঁকি,
সে যে একমাত্র গতি মৃত্যু তরিবারে;

তাই সুরগুরু তুমি বলিতেছ ডাকি
সুদূর পশ্চিমে যাও শুক্রাচার্য্য-দ্বারে,
মৈত্রেয়ীর মহাবাক্য নিত্ত চিত্তে রাখি
নিষ্ঠাভরে সঞ্জীবনী বিদ্যা লভিবারে।

এ কথা না ভুলি যেন তিলেকের তরে
এই দল বেঁধে পূজা উচ্চ কোলাহলে
এই গান, এই স্তব উচ্ছ্বাসের ভরে
এই উপহার-দান তব করতলে—
এই বাহ্য—তব পূজা নহে নহে নহে।
চির মানবের লাগি বিধাতার দান
যে নির্ম্মল শিখারূপে তব চিত্তে দহে
তার জ্যোতি মোরা যেন রাখি অনির্ব্বাণ।
জ্ঞানে বাধা, প্রেমে বাধা, কর্ম্মপথে বাধা
যেখানে যা-কিছু সব করি দিয়া দূর,
ঘুচাইয়া যুগান্তের কুহেলিকা— আঁধা
জাগাইয়া তুলি মহামিলনের সুর!
যে পরম সত্য তব চিত্তে মূর্ত্তিমান
তাহারি সাধনা দেব, তোমার সম্মান।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

আবাহন

তব জয় জয় রবে নন্দিত বিশ্ব,
এলো কবি, এলো রাজা, হে বাউল নিঃস্ব।
দানবের ভীতি এসো, মানবের গৌরব,
ধরণীর সম্পদ, ত্রিদিবের সৌরভ।
পুণ্যের শুভ্রতা, মুক্তার কান্তি,
ভারতের সান্ত্বনা, জগতের শান্তি।
এসো প্রেম, এসো প্রীতি, এসো গীতি, গন্ধ
বিশ্ব-মধুপ এসো, লয়ে মকরন্দ।

২

তুমি বুঝি দূর যুগে বীণা লয়ে বক্ষে,
কেঁদেছিলে শরাহত ক্রৌঞ্চের দুঃখে।

হেরি বুঝি জানকীর ম্লান মুখ-ইন্দু,
শ্লোকে গেঁথে রেখেছিলে অশ্রুর বিন্দু।
শুনি তব বীণাধ্বনি সম্ভ্রমে অগ্রে,
বসেছিল মেষ মৃগ সিংহ ও ব্যাঘ্রে।
আজি সেই গমকের সাড়া পাই কর্ণে
নব রস লভে ধরা গন্ধে ও বর্ণে।

৩

হে কিশোর, হে অমর, চির-সুধাসিক্ত
অফুরান ভাণ্ডার হবে না'ক রিক্ত।
স্বরগের গোধূলির ছায়া নামে অঙ্গে,
যুগে যুগে পরিচয় নাই জরা সঙ্গে।
এ রবির রবি কাছে আসিবে না সন্ধ্যা
কেন্দ্রীয় উষা উঠে, ফুটে নিশিগন্ধা।
তুমি পিতা তুমি নেতা, মুনিগণ গণ্য,
তব অভিনন্দনে নিজে হই ধন্য।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

গান

উঠলো ভরে সারা গগন যার সুরে গো যার গানে
তার তরে আজ গান খুঁজে পাই কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে!
অবাক্ দেখি এ মোর হৃদয়,
ভাষাও সে যে হলো নিদয়,
হতাশ হয়ে চাইতে গিয়ে চাই যে কেবল তার পানে—
উঠলো ভরে সারা গগন যার সুরে গো যার গানে।
তোমার ছাড়া গান কি আছে!
গাইব কি আর তোমার কাছে!
তোমার সুরে যাই যে ভেসে, মন উতলা সেই টানে—
তোমার তরে গান খুঁজে পাই কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে।
বিশ্বহৃদয় জয় করেছ জগৎজয়ী হে কবি!
পূর্ণ হলো শূন্য জীবন সে গৌরবে গৌরবী।

জগৎ জুড়ে তাইতো শুনি
তোমার গুণের গান যে গুণী !
সেই স্বরে আজ স্বর মিলিয়ে গাইতে হবে মন মানে
নইলে কোথায় স্বর খুঁজে পাই, কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বরণ

আমাদের এই খেলার ঘরে গুরু তোমায় বরণ করি,
বনশেফালির অঞ্জলি আজ রাখি তোমার চরণ 'পরি।
পূজোপচার পাইনা খুঁজি,
গঙ্গাজলেই গঙ্গা পূজি,
নিঃস্ব মোরা, তোমার মাঝেই ডুবল মোদের জীবন-তরী
প্রজাপতি, তোমার করেই মোদের মানস-জীবন গড়া,
তোমার সৃজন মূর্চ্ছনাতে মোদের পরাণ শ্রবণ ভরা।
তোমার স্নেহ-বাপীর বুকে
মীনের মত বেড়াই সুখে,
তোমার চরণ-কমলদলে মজ্‌ল মোদের মন-ভোমরা।
অস্বাদিত রসের বিলাস বিলালে এই জীবন ভরি,
নবশ্রীরূপ সঞ্চারিলে নিসর্গেরে শোভন করি ;
কলির প্রাণে নবীন গন্ধ,
অলির পানে নূতন ছন্দ
তোমার সভায় এলো সবাই নয়নমোহন ভূষণ পরি'।
অনাদৃত হীন হেয় যা' নয়নে তা'ও লাগ্‌ল ভালো,
জীর্ণ কুঁড়ের ছিদ্রগুলোও ঝরণা হয়ে ঢাল্লো আলো।
ইন্দ্রধনুর কান্ত রাগে
তোমার তুলির টানটি জাগে।
তোমার চরণাঙ্ক লভি তৃণাঙ্কুর-ও মন ভুলালো।
কল্পলতা লক্ষ পাকে জড়াল ঐ বৃক্ষটিরে
কল্পগরুড় স্বপন দেখে তোমার গহন ধ্যানের নীড়ে।
ছুটে ত্রিলোক সীমার শেষে
দৃষ্টিশায়ক অসীম দেশে।
অনন্তদেব ছায়া যোগায় হাজার ফণায় তোমায় ঘিরে।

সুপ্ত অভিশপ্ত দেশের ঘুমে তুমিই আশার স্বপন,
তোমার বাণীর অন্তরালে, সুপ্ত মোচন-মন্ত্র গোপন।
চিত্ত-কারার বাঁধনগুলি
আগেই তুমি নিলে খুলি।
জীবন-মরুর বালুর তলে জয়ের বীচন করছ রোপণ।
আজ নিখিলে ওতপ্রোত তোমার মুখের মন্ত্রবাণী,
করছে সাগর তরঙ্গেরা দিগ্‌বিদিকে কানাকানি;
বার্ত্তা চলে সূর্য্য সোমে
ঢেউ উঠেছে ব্যোমে ব্যোমে

পুলক জাগে রোমে রোমে, অবাক্ ধরা যুক্তপাণি।
হিমাদ্রির ঐ শুভ্র শিরে উড়ছে তোমার জৈত্রী কেতু
রচলে তুমি পারাবারের এ-পার-ও-পার মৈত্রী-সেতু।
দীক্ষা দিয়া প্রেমের বেদে
মিলাইছ সকল ভেদে।

গড়লে তুমি মিলন-ত্রিদিব এই ভারতের মোক্ষ হেতু।
আলোক-বীণা বাজাও কবি নীল আকাশের পদ্মাসনে
সুরের আগুন ছড়িয়ে পড়ুক পশ্চিমেরি দিগঙ্গনে।
দগ্ধ করুক ঐহিকতার
ধূম্র ধূসর বিশাল প্রসার

ভস্ম হ'তে জাগাও পুন শাশ্বত সেই সত্য ধনে।
মিলন-গুরু! এই ভারতের মহামানব-সাগর-তীরে
উচ্চার' হে উচ্চরবে বিশ্ববেদের মন্ত্রটিরে।
ধর্ম্ম জাতি নির্ব্বিশেষে
মিল্‌বে তথায় সবাই এসে

বিশ্বভারতীর দেউলে জুটবে নিখিল নম্র শিরে।
পূব গগনে আবার রবি নবীন হ'য়ে উদয় হ'লে
মানস সরের কমলগুলি তোমার পানে হৃদয় খোলে।
গন্ধবহ ঢুলায় চামর
কাব্যকানন কূজন-মুখর,

আবার মোদের কুলায়গুলি আনন্দ-হিল্লোলে দোলে
কল্পলোকের হে সবিতা, মোদের মাঝে তোমায় বরি,
ধন্য জীবন তোমার কিরণ আশিষ্-ধারা মাথায় ধরি।

কর প্রাণের আঁধার মোচন
বিশ্ব কর জ্ঞান-বিলোচন।
প্রণাম করি হে দেবতা, সহস্রবার প্রণাম করি।

শ্রীকালিদাস রায়

স্বাগত

স্বাগত দেশের আকাঙ্ক্ষিত!
চেয়ে আছে মাতৃভূমি,
কখন আসিবে তুমি,
লইয়া ভরসা, বল, মধুর সঙ্গীত,
কবির আহ্বানে কবে,
গাহিবে আনন্দ-রবে,
মৌন বন-বিহঙ্গেরা হয়ে পুলকিত!
মহাসিন্ধু হ'য়ে পার,
কবে আসি কোলে মা'র,
জুড়াইবে তপ্ত হিয়া— অমৃত-সিঞ্চিত?
চতুর্দ্দশ বর্ষ শেষে
রামচন্দ্র যথা এসে
অভাগী কৌশল্যা মা'রে করিলা নন্দিত!

স্বাগত দেশের আকাঙ্ক্ষিত!
কি বলিব— ভয়দাত্রী,
এসেছিল কাল রাত্রি
শব্দময়ী ধরা ছিল দারুণ স্তম্ভিত,
মানব খোলেনি আঁখি,
ডাকেনি একটি পাখী,
ঝিঁঝি, ভেক সব ছিল হইয়া মূৰ্চ্ছিত।
সহসা দেবের বর
দেখিনু অরুণ-কর,
অমনি সুমেরু-শিরে রবি সমুদিত!
অমনি আকাশ ধরা
হইল আলোক-ভরা,
সঞ্জীবনী মন্ত্রে যেন বিশ্ব জাগরিত।

জাগিল উত্তম আশা,
উদ্বোধিত ভাব ভাষা,
জড়তার অবসান জগত জীবিত !

স্বাগত দেশের আকাঙ্ক্ষিত !
এস নিয়ে পরাক্রম,
দীপ্ত নিদাঘের সম,
উজ্জ্বল রবির আলো হোক উদ্ভাসিত ;

এস বরষার মত,
দৈন্য দুঃখ আছে যত,
বরষি করুণা প্রীতি কর বিদূরিত ;

এস শরতের বেশে,
ম্লানিমা যাউক ভেসে,
হাস্থক আকাশ ধরা— ভাণ্ডার পূর্ণিত।

হেমন্ত শীতের প্রায়,
এস পূর্ণ করুণায়,
অভয়, আশ্বাসে তুষি ভীত সঙ্কুচিত।

এস বসন্তের মত,
বাতাসে বাঁচিবে কত,
ফুলে ফুলে আলো, বিশ্ব শ্যামল হরিত।

বিহগ-কাকলি মধু
স্থধামুখী দিগ্‌বধূ
স্থধার অঞ্জলি দিবে হয়ে হৃষ্টচিত।

ভারতীর পুত্ররত্ন
কেবা দিবে যোগ্য যত্ন,
এ যে মোরা দীন, হীন, অশক্ত, বঞ্চিত !

তবে জানি বসুন্ধরা,
থাকিলে আঁধার ভরা,
রবির গৌরবে হয় পুনঃ আলোকিত,
এস মা'র মণি-রত্ন ! সবার বন্দিত।

শ্রীমানকুমারী [বস্থ]

গান

	গানে গানে	ভরিয়ে দিলে
	বিশ্বভুবন	গানের কবি !
	স্বরের আলো	ছড়িয়ে দিলে
	ভুবন-তলে	ভুবন-রবি !
	তোমার আলোয়	ভুবন আলো
	বেসেছি তাই	নিখিল ভাল
মোর	নয়ন হতে	মুছল কালো।
	তোমার পুণ্য	প্রসাদ লভি !
	গানের কবি	ভুবন-রবি
	নমি তোমায়	পুণ্য-ছবি !

শ্রীনির্ম্মলকুমার বড়াল

এবং, এই সময়ে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র-অভিনন্দন রবীন্দ্র-অভিভাষণ ও রবীন্দ্র-প্রশস্তি উদ্‌ধৃত করা হল—

বঙ্গ-রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা অভিনন্দন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রদ্ধাস্পদেষু

হে কবীন্দ্র! সুদীর্ঘ প্রবাস হইতে বিদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি বহন করিয়া, আপনি নির্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন— স্বদেশী সাহিত্যের সর্ব্বায়তন এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আপনাকে আজ অভিনন্দন করিতেছে।

পরিষৎ নানা প্রকারে আপনার নিকট ঋণী। পরিষদের শৈশবে আপনি অজস্র স্নেহদানে ইহাকে পোষণ করিয়াছিলেন— পরিষদের কৈশোরে আপনি সহায় হইয়া, ইহার শ্রী ও সম্পদ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন —আজ পরিষদের যৌবনে আপনি ইহার অকৃত্রিম 'সুহৃৎ সখা'। যখনই অমিত্র-নীরদের ঘনঘটায় পরিষদের পক্ষে 'পন্থ বিজন অতি ঘোর' হইয়াছে, তখনই শুভ পথ প্রদর্শন করিয়া, আপনি ইহাকে ঋতমার্গে পরিচালন করিয়াছেন। সেই জন্য আপনার পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইলে বঙ্গের সাহিত্যিকগণের মুখস্বরূপ এই সাহিত্য-পরিষৎ আপনাকে অভিনন্দন করিয়া বিশ্বপিতার নিকট আপনার শতায়ুঃ কামনা করিয়াছিল।

যাঁহার অর্চ্চনার জন্য সাহিত্যের এই পুণ্যপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হে বরেণ্য! আপনি সেই বাণীর বরপুত্র। যুগ-যুগান্তের সাধনার ফলে দেবী সারদা আপনার চিত্ত-সরোজে তাঁহার রক্তচরণ চিহ্নিত করিয়াছেন। সেই জন্য সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই আপনি বিজয়ী; সেই জন্য আপনি সাহিত্যের যে বিভাগ যখন স্পর্শ করিয়াছেন, স্পর্শমণির করস্পর্শে সেই বিভাগই স্বর্ণময় হইয়াছে। বীণাপাণির সপ্তস্বরার শততন্ত্রীতে যে বিশ্বসংগীত নিয়ত ঝঙ্কৃত হইতেছে, হে মহাকবি! আপনার হৃদয়-বীণায় তাহার প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

মানব অমৃতের পুত্র— অতএব কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে, সে চিরদিন অমৃতত্বের প্রয়াসী। প্রাচীন ভারতের স্নিগ্ধ তপোবনে যে অমৃতের উৎস উৎসারিত হইয়াছিল, সেই পুণ্যপীযুষ পান ভিন্ন কোন মতে তাহার

অদম্য ব্রহ্মতৃষ্ণার নিবৃত্তি হইতে পারে না। এই সত্যের উপলব্ধি করিয়া জীবনের ছায়াময় অপরাহ্ণে মহর্ষি-সন্তান আপনি কুলোচিত ব্রত গ্রহণ করিয়া, জগৎকে সেই অমৃতবারি মুক্তহস্তে পরিবেশন করিতেছেন।

বিদ্যাপক্ষিণীর দুই পক্ষ— দর্শন ও বিজ্ঞান। এই পক্ষদ্বয়ে নির্ভর করিয়া, সে প্রজ্ঞানের পর-ব্যোমে নির্ভয়ে বিহরণ করে। পূর্ব্ব পশ্চিম হইতে বিজ্ঞান আহরণ করুক; পূর্ব্ব পশ্চিমকে দর্শন বিতরণ করুক। এই আদান প্রদানের পূর্ণতায় যে বিদ্যার প্রপূর্ত্তি হইবে, সেই বিদ্যার দ্বারাই "বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"। সেই জন্য আপনি "বিশ্ব-ভারতী"র প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে রাখিবন্ধনে সংযুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

হে রবীন্দ্র! আপনি সাহিত্যাকাশের দীপ্ত ভাস্বর— জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্। যিনি 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' পরম জ্যোতিঃ যাঁহার উর্জ্জিত বিভূতি আপনাতে দেদীপ্যমান— সেই সত্য শিব সুন্দর আপনাকে জয়যুক্ত করুন। ওঁ

গুণমুগ্ধ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। ১৯ ভাদ্র ১৩২৮ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভারতী ১৩২৮ আশ্বিন

অভিভাষণ

য়ুরোপে আমি সমাদর পেয়েছি এবং য়ুরোপকে আমি সমাদর করেচি, কিন্তু হৃদয় আমার উৎকণ্ঠিত ছিল ভারতের জন্যে। শিশুকাল থেকে ভারতের আকাশ দুই চক্ষু ভরিয়ে আমার মনকে যে-আলোক পান করিয়েচে তার তৃষ্ণা আমার মনে নিয়ত জেগে ছিল; আর যারা আমার আপন দেশের লোক, তাদের কাছ থেকে প্রীতি পাবার যে-আকাঙ্ক্ষা সে কি আমার মিটেচে, কিম্বা কোনোকালে মিটবে? তাই অনেক দিন পরে দেশে ফিরে এসে আপনাদের কাছ থেকে এই যে অভ্যর্থনা লাভ করলেম এ আমার কাছে উপাদেয়।

আমার বয়স যেদিন পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়েছিল সেদিন আমার যা কিছু সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি সে ত এই বাংলা দেশের সীমানা পার হয়নি। কিন্তু সেদিন এই বাংলা সাহিত্যপরিষদই আমার সম্বর্দ্ধনা করে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। সে কথা আমি ভুলব না। কেন না সেদিন আমার একমাত্র পরিচয় বাংলা ভাষার মধ্যে বাঙালীর কাছে, অর্থাৎ সে ছিল আত্মীয়ের পরিচয় আত্মীয়ের কাছে। এই অতি-নিকটের পরিচয়ে সকল সময়ে সুবিচারের আশা থাকে না; যে বরমাল্য পাওয়া যায় তাতে কারো কারো ভাগ্যে ফুলের চেয়ে কাঁটার অংশই বেশি থাকে; এবং যেহেতু তা আত্মীয়ের হাতের দান এই জন্যে তার মধ্যে যে পীড়া থাকে তার বেদনা দুঃসহ। তাই সেদিন সাহিত্যপরিষৎ আমাকে উপলক্ষ্য করে যে কবি-প্রশস্তি-সভা ডেকেছিলেন সে আমার পক্ষে যেমন বিস্ময়ের তেমনি আনন্দের বিষয় হয়েছিল। সেদিন এই পরিষদের কাণ্ডারী ছিলেন আমার পরমবন্ধু স্বর্গগত রামেন্দ্রসুন্দর। তাঁর বুদ্ধির গভীরতা এবং হৃদয়ের ঔদার্য্য দুইই ছিল অসামান্য; সেদিন তিনিই বাঙালীর প্রতিনিধিরূপে এই বরণ-সভা আহ্বান করেছিলেন, এই আনন্দ এবং গৌরব সকলের চেয়ে আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। জনসভার অনেক অংশই আনুষ্ঠানিক; প্রায় তা কাঠখড়েই তৈরি, একদিন তার সমারোহ, পরদিন তা বিস্মৃতির জলে বিসর্জ্জন দেবার যোগ্য। কিন্তু সেই আমার বন্ধুর নির্ম্মল হাস্যে এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় সেদিনকার সভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তাঁর প্রীতিস্নিগ্ধ বাণীর মধ্যে আমার পক্ষে এই আশ্বাস ছিল যে এই প্রীতি বর্ত্তমানের সমস্ত বিরোধ-বিদ্বেষ, সমস্ত কলহ-কলুষের উপরকার জিনিষ, এই প্রীতি সেই ভবিষ্যতের যা

বাহির থেকে নিকটের মানুষকে দূরে নিয়ে গিয়ে অন্তরের দিকে তাকে নিকটতর সত্যতর করে। আজ তিনি স্বয়ং শাশ্বতলোকে গমন করেচেন, সেখান হ'তে তাঁর প্রসন্ন হাস্যের অভিনন্দন আমি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করি।

দশ বৎসর হ'য়ে গেল। এখন আমি ষাট উত্তীর্ণ হয়েচি। সাহিত্য-পরিষদে আজ আপনাদের এই অভিভাষণ কিসের উপলক্ষ্যে? আজ এখানে কেবল স্বাদেশিক আত্মীয়সভার মঙ্গলাচরণ নয়। ভৌগোলিক ভাগ-বিভাগের দ্বারা মানুষের যে আত্মীয়তা খণ্ডিত আজ সেই আত্মীয়তার চতুঃসীমানার মধ্যে এই সভার অধিবেশন বসেনি। যে আত্মীয়তায় আত্মপরের বিচ্ছেদ, দূর-নিকটের ভেদ-ব্যবধান দূর হয়ে যায় আজ সেই আত্মীয়তার মাল্য আপনারা আহরণ করেচেন এই কথাই আমি মনে অনুভব করতে চাই।

আপনারা হয়ত মনে ভাবেন যে, দেশের সাহিত্যকে আমি বিদেশে যশস্বী করে এসেচি, দেশের লোকের কাছে আজ সেই দাবীতেই আমার বিশেষ সম্মান। কিন্তু এই যশকে আপনারা খুব বেশি বড় করে দেখবেন না। আমি নিজে, সকলের চেয়ে যেটিকে আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি, সে এই সাহিত্যের যশ নয়। য়ুরোপে আমার কাছে যারা হৃদয়ের অনুরাগ অকৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে ব্যক্ত করেচে তাদের অনেকেই সাহিত্যরস-ব্যবসায়ীদলের কেউ নয়। তারা কেবলমাত্র সাহিত্যের বাজার যাচাই করে আমাকে যশের মূল্য চুকিয়ে দেয়নি, তারা আমাকে প্রীতি দিয়েচে যা সকল মূল্যের বেশি। অর্থাৎ তারা ওস্তাদ বলে আমাকে শিরোপা দিয়ে বিদায় করেনি; তারা আমাকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করেচে। সেই আত্মীয়তা নিয়ে আত্মশ্লাঘা করা চলে না, তাকে নিয়ে নম্র মনে আনন্দ করাই যায়।

দ্বিজত্ব লাভ করবার একটি তত্ত্ব আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। তাতে এই কথা বলে, যে, মানুষের প্রথম জন্ম নিজের অহঙ্কারের ক্ষেত্রে। সেই "আমি"র ক্ষুদ্র সীমার আবরণ ও বন্ধন ভেদ করে মানুষ যখন অধ্যাত্মক্ষেত্রে অসীমের মধ্যে জন্মলাভ করে তখনই হয় তার দ্বিতীয় জন্ম। যেমন অধ্যাত্মক্ষেত্রে তেমনি সংসারের মধ্যেও মানুষের দুটি জন্ম। একটি হচ্চে নিজের দেশের মধ্যে, আরেকটি সকল দেশে। এই দুটি জন্মের সামঞ্জস্যেই মানুষের সার্থকতা। নিজের হৃদয়ে দেশের সঙ্গে বিশ্বের মিলন সাধন করাতে পারলে তবেই হৃদয়ের মুক্তি।

পঞ্চাশোর্দ্ধে, সংহিতাকার যখন বনব্রজনের ব্যবস্থা করেচেন, সেই সময়ে আমি পশ্চিম মহাদেশে গিয়ে পৌঁছলেম। দেখলেম সেখানে আমার বাসস্থান আছে। দেখলেম সংসারে এই আমার দ্বিতীয় জন্মের মাতৃক্রোড় পূর্ব্ব হতেই প্রসারিত। আপন দেশ থেকে দূরে, যেখানে জন্মগত কোনো দাবী নেই, কর্ম্মগত কোনো দায় নেই, সেইখানে যখন প্রেমের অভ্যর্থনা পাওয়া যায় তখনি আমরা বিশ্বজননীর সুধাস্পর্শ পেয়ে থাকি। আমার ভাগ্যক্রমে সেই স্পর্শের আশীর্ব্বাদ লাভ করেচি এবং মাতৃভূমিতে বহন করে এনেচি বলেই, আমার রচনার পরে বিশ্ববাণীর প্রসন্নতা লাভ করেচি বলেই, আজ আপনারা আমাকে নিয়ে বিশেষভাবে আনন্দ করচেন।

ভেবে দেখবেন, এই আনন্দের মধ্যে একটি মুক্তির উৎসাহ আছে। দেশ যখন আপনটুকুকে নিয়েই আপনি নিবিষ্ট তখন সে বিশ্বের অগোচরে থাকে। এই বিশ্বের অগোচরতা একটি মস্ত কারাপ্রাচীর। সঙ্কীর্ণ বাসের অভ্যাসে একথা আমরা অনেক সময়ে ভুলেই থাকি। হঠাৎ যখন একটা বন্ধ দরজা কোনো একটা হাওয়ায় খুলে যায় তখন মন খুশি হয়ে ওঠে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁর যে আবিষ্কার নিয়ে প্রথম বিশ্বসভার আহ্বান পেলেন, তাঁর সে আবিষ্কার যে কি তা আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই এখনো স্পষ্ট করে বোঝেনি —কিন্তু দেশের মন হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল। তার কারণ এই যে, একদিকের দরজা খুলে গেল। সহসা

অনুভব করলেম যে, আমরা বিশ্বের মানুষ, কেবলমাত্র দেশের মানুষ নই ; আমাদের প্রাণের সঙ্গে বিশ্বের হাওয়ার, মনের সঙ্গে বিশ্বের আলোর সুগভীর যোগ আছে। স্বাদেশিক প্রাচীরের বদ্ধ জানলা খোলবামাত্র হঠাৎ সামনে দেখতে পাই সর্ব্বজন-বিধাতার রূপটি। এই রূপটি দেখবার জন্যেই আমাদের মানব-জন্ম।

সাহিত্যের কলা-কৌশল বিচার করে আমার লেখার কি মূল্য সে কথা দূরে রেখে আজ আমাকে এই গৌরবটুকু ভোগ করতে দিন যে, আমার গানে বা অন্য রচনায় সর্ব্বজন-দেবতার রূপ হয়ত কিছু প্রকাশিত হয়েছে, সেইজন্যেই অন্য দেশের লোকে আমাকে আপন বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। এই নিখিল দেবের সাধন-মন্ত্র ভারতের কবির কানে পৌঁচেছিল কোথা থেকে? ভারতবর্ষেরই তপস্বীদের কাছ থেকে। তাঁরাই একদিন বলেছিলেন, "এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মামহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ"। যিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বজনের হৃদয়বাসী সেই দেবতাই মহাত্মা ; এবং তিনি বিশ্বকর্ম্মা অর্থাৎ তাঁর সকল কর্ম্মই বিশ্বের কর্ম্ম, ক্ষুদ্র কর্ম্ম নয়।

আজ আপনাদের যে আতিথ্য লাভ করচি এ আমি একলা নিতে পারব না। কেন না একলা আমি কোনো আতিথ্য কোনো সমাদরের যোগ্য নই। আমার রচনায় আমি মহামানবের বাহন এই বলে যদি আমাকে সমাদর করেন তবে তাঁর আতিথ্যের জন্য প্রস্তুত থাকুন। তাঁকে ফেরাবেন না ; বল্‌বেন না, আজ আমাদের দুঃসময়, আজ আমাদের দরজা বন্ধ। যখন পশ্চিমে ছিলেম তখন গৌরব করে সকলকে বলেচি, আমি আমার মাতৃভূমির নিমন্ত্রণপত্রের ভার নিয়ে এসেচি। বলেচি, যেখানে মাতার অমৃত অন্নের পরিবেশন হয় সেইখানে এস। এসেছিলে একদিন আমাদের কয়লার খনিতে ; আমাদের পণ্যের হাটে। যা সংগ্রহ ক'রে নিয়ে গেছ তাই নিয়ে তোমাদের পাড়ায় পাড়ায় ঈর্ষার আগুন জ্বলচে। পরস্পরের প্রতি সন্দেহে তোমাদের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্র কাঁটাবনের জঙ্গল হয়ে উঠেছে। আজ এস সেই ভাণ্ডারে, যেখানে অন্ন ভাগ করলে তার ক্ষয় হয় না।

য়ুরোপে শুনে এলেম কত জ্ঞানী গুণী সাধক বলচে তাদের আত্মা ক্ষুধিত। তারা খুঁজছে শোকের সান্ত্বনা, ক্ষতবেদনার শুশ্রূষা। এই সন্ধানে যদি তারা পূর্ব্ব মহাদেশে যাত্রা করে তবে যেন দেখতে পায় আমাদের দ্বার খোলা আছে। আমরা যেন না বলি, "আমরা নিজের ভাবনায় মরচি, পর আমাদের কাছে আজ অত্যন্ত পর, হৃদয় আমাদের বিমুখ।" এতদিন আমরা পরের দিকে তাকিয়ে ছিলেম ভিক্ষা করবার জন্যে, তাতে লজ্জার পর লজ্জা পেয়েচি, অভাব পূরণ হয়নি। আজ যদি ধিক্কারের সঙ্গে বলতে পারি পরের কাছে ভিক্ষা কর্‌ব না সে ত ভাল কথা। কিন্তু সেই ক্ষোভে যদি বলি, পরের আতিথ্য করব না, তবে আরো বেশি লজ্জা। ভিক্ষার যে দীনতা, অতিথির প্রত্যাখ্যানে দীনতা তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। ভিক্ষায় যে আত্মাবমাননার অপরাধ তারও অভিশাপ আছে, আর অতিথির প্রত্যাখ্যানে যে বিশ্বাবমাননা তারও অভিশাপ কঠিন। আমাদের পিতৃঋণ শোধ হবে কি করে? পিতৃগণের কাছ থেকে আমরা যে উত্তরাধিকার পেয়েচি সে কি কেবল আমাদের নিজেরই জন্য? সে কি আমাদের ন্যস্ত ধন নয়? আমরা যদি বিশ্বের কাছে তার পূর্ণ ব্যবহার না করি তবে তাতে করে আমাদের পিতামহদের অগৌরব।

শকুন্তলা ছিলেন তপোবনের কন্যা। সেই তপোবনের কুটীর-দ্বারে বসে তিনি আপনজনের কথাই ভাবছিলেন, বিশ্বজনের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। ভোলবার কারণ ছিল, কেননা কঠিন দুঃখে তাঁর মন ছিল অভিভূত। এমন সময় অতিথি এল তাঁর দ্বারে, বল্‌লে "অয়মহং ভোঃ"। সে ডাক কানে পৌছল না। তখন তাঁকে বাইরের শাপ লাগল, অসম্মানিত অতিথির শাপ। সে শাপ এই যে, যে আপনজনের ভাবনায়

তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে সেই আপন জনকেই হারাবে। বিশ্ব যদি আজ আমাদের দ্বারে এসে বলে "অয়মহং ভোঃ" তবে কি আমরা বলতে পারি যে, "আজ নিজের ভাবনা কঠিন হয়ে উঠেছে, অন্যমনস্ক আছি।" এ জবাব খাটবে না। নিজের দুঃখধন্দার তাড়ায় বিশ্বকে যে ফিরিয়েচে বিশ্বের শাপ তাকে লাগবেই—তার আপনটুকু কেবলি ক্ষীণ হবে, আচ্ছন্ন হবে, নষ্ট হবে। যে-সব জাত বিশ্বের অগোচরে নিজের মধ্যে বদ্ধ তারা নিজেকে হারিয়ে বসে আছে, অথচ এত বড় ক্ষতি অনুভব করবার শক্তি পর্য্যন্ত তার লুপ্ত হয়েচে।

যখন সাহিত্য-রচনায় আমি নিবিষ্ট ছিলেম তখন বাহিরের কোনো সহায় আমার দরকার ছিল না। কবির আসন নির্জ্জনে। সেখানে অনাদরে ক্ষতি করে না, বরঞ্চ জনাদর অনেক সময় মত্ত হস্তীর মত সরস্বতীর পদ্মবনের পঙ্ক উন্মথিত করে তোলে। কিন্তু যজ্ঞ ত একলা হয় না। তাতে সর্ব্বলোকের শ্রদ্ধা ও সহায়তা চাই। ঘরে যখন উৎসব তখন বিশ্ব হন্ অতিথি। এইজন্যে পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই এই কাজকে আপনার কাজ বলেই গ্রহণ করেন। কর্ম্মকর্ত্তা দরিদ্র হলেও সেদিন দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে সকলকে ডেকে ডেকে বলেন, "এস এস।" কিসের জোরে বলেন? সকলের জোরে। দেশের হয়ে আমিও আজ একটি যজ্ঞের ভার নিয়েচি। সত্যের সাধনায় আমাদের সঙ্গে একাসনে বসবার জন্যে। সেইজন্যেই আজ আপনাদের কাছ থেকে আমি যে-অভ্যর্থনা পাচ্চি এ'কে আমি কবির অভ্যর্থনা বলে একলা গ্রহণ করতে পারব না। এই অভ্যর্থনাকে ভারতের নবযুগে অতিথি-সমাগমের প্রথম মঙ্গলাচরণরূপে আমি সকল আগন্তুকের হয়ে গ্রহণ করচি— আপনাদের সকলের সহযোগে মাতৃভূমির প্রাঙ্গণে বিশ্বচিত্তের একটি মিলনাসন প্রতিষ্ঠিত হোক্।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পঠিত
ভারতী ১৩২৮ কার্তিক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে

মূকেরে বাচাল করে—হেরি নাই, শুনিয়াছি—দেবতার বরে,
বাচালে অবাক্ করে— এ কথা যে সত্য, বুঝি অন্তর-অন্তরে,
যখন তোমার বাণী, তোমার ও প্রতিভার সীমাহীন ভাতি
সমগ্র ধরিতে মোর রসনার— রচনার— জাল খানি পাতি!
শুধু স্তব্ধ, শুধু মুগ্ধ, শুধু লুব্ধ, চিরদিন অতৃপ্ত পিয়াসী
তোমার ঝরণাতলে আমি নিত্য সুনির্জ্জনে যাই আর আসি!

তাই আমি কাব্য-গীতি-মুখরিত তব পূজা-উৎসবের দিনে,
লুপ্ত করি' আপনারে, একান্ত নিঃসঙ্গ যেন জনতা-বিপিনে,
বসেছিনু বাক্যহারা; গণি নাই মানি নাই কিবা প্রয়োজন
খুলি' দিতে কণ্ঠ মোর সে-সভায়, মুক্ত যবে নয়ন-শ্রবণ!
কত ভক্ত নিবেদিল পূজাঞ্জলি থরে থরে চরণে তোমার,
মন্ত্র পড়ি' পুরোহিত সমর্পিল অনবদ্য নৈবেদ্য-সম্ভার!
হেরি' মোর মূঢ় দৃষ্টি, রিক্ত হস্ত, নিরুচ্ছ্বাস নিষ্প্রভ বদন,
ডাকে নাই কেহ মোরে,—ধন্যবাদ! সে যে হত বড় অশোভন!

তোমারে পূজিব আমি কোন্ মন্ত্রে, বুঝি না যে হে রবীন্দ্রনাথ!
যে বীজ যখনি জপি— ভুল হয়, হেরি' নিত্য নব রশ্মিপাত!
ধ্যানে মোর, জ্ঞানে মোর ধরিবারে চাই তোমা অখণ্ড-স্বরূপে,
তা' না হ'লে চিত্ত মোর প্রসন্ন হবে না জানি, দীপে আর ধূপে!
সত্য আর সুন্দরের যে বিগ্রহ গড়িয়াছ মানস-ভুবনে,
অসীমের রূপ-সীমা ফুটায়েছ, আঁখি-আগে জাগ্রতে-স্বপনে
হেরি তা'য় রাত্রি দিবা একাকার! ভেদ নাই আলো-অন্ধকার!
অধরে নির্ব্বাণ বাণী! মন্ত্রহীন তাই মোর গুরু-নমস্কার!

তোমারে বরেছি আমি আমা হ'তে বহুদূরে, আমার বাহিরে—
সত্যের শাশ্বতলোকে, শেষতীর্থে, নিস্তরঙ্গ পারাবার-তীরে!
যতটুকু যেই দিন অগ্রসরি পথে মোর—সেই মোর পূজা!
আনন্দ আরতি মোর—সে যে তোমা নিত্য আরো বড় ক'রে বুঝা!
তোমার কবিতা-বিশ্বে অন্তহীন বিবিধ সে বিচিত্রের পানে—
দিকে-দিকে ধাই, তবু জানি তার সত্য এক!—সেই কোন্‌খানে
একবৃন্তে অগণন ফুটিয়াছে অবিচ্ছেদ! জানি, আমি জানি,
তোমার কবিতা মোরে দিবে সেই আদিমন্ত্র, একাক্ষরা বাণী।

ভারতের শেষ ঋষি! যে সাধনা অর্দ্ধপথে গিয়েছিল থামি'
সহস্র বর্ষেরও আগে,— যে আলোক পূর্ণ হয়ে আসে নাই নামি'—
অসমাপ্ত সেই সিদ্ধি, পরমা সে ঋদ্ধি আজ দৈবী প্রতিভায়,
ফুলের মতন করি', স্বচ্ছন্দ সতেজ বৃন্তে, ফুটাইলে গানে-কবিতায়!
রসে-রঙ্গে-রূপে তুমি, সম্বোধিলে সনাতন নিত্য সত্য-ধনে—
ধুলায় আসন রচি' বসিলা যে মহেশ্বর সহাস্য আননে!
সৃষ্টিপদ্মে যেই মধু মর্ম্মকোষে চিরদিন বিরাজে বিমল,
তারি বর্ণে গন্ধে স্বাদে ভরি' দিলে জন্ম-জরা— কটু-তিক্ত ফল!
সেই মন্ত্র প্রাণ-কর্ণে শুনিয়াছি হৃদয়ের গভীর অতলে
জ্ঞানের ললাট-নেত্রে নেহারিব যেই দিন,— লয়ে করতলে
সেই সত্য পূজাঞ্জলি, বাহিরিব মহাহর্ষে উচ্চারিয়া জয়!
ততদিন র'ব মৌনী, অন্তরে বহিয়া শুধু ব্যাকুল বিস্ময়!

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

ভারতী ১৩২৮ অগ্রহায়ণ

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

১৮৬১ - ১৯৩০

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় জীবনকথা

শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী

বাংলাদেশ ও বাঙালীর ইতিহাস -রচনার অন্যতম পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় নদীয়া জেলার অন্তর্গত সিমলা গ্রামে ইংরাজি ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। নিকটবর্তী কুমারখালিগ্রামে তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। এই দুইটি গ্রামই অবিভক্ত বাংলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলা-বিভাগের পর এখন পূর্বপাকিস্থানের অন্তর্গত।

অক্ষয়কুমার পিতার প্রথম সন্তান। পিতা মথুরানাথ ছিলেন কুমারখালির ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মাতা সৌদামিনী দেবী ছিলেন রাজশাহীর বৈদ্যনাথ বাগচীর কন্যা। অক্ষয়কুমারের মাতামহ বৈদ্যনাথ বাগচীর সংস্কৃত ও পারসি ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। দেবভাষা সংস্কৃতে অক্ষয়কুমারের যে অনুরাগ ও পারদর্শিতা দেখা যায় তাহা হয়তো তিনি মাতৃকুল হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বালক অক্ষয়কুমারের চরিত্র-গঠনে ও প্রতিভার স্ফুরণে তাঁহার এক পিতৃবন্ধুর বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি ছিলেন কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার— পিতা মথুরানাথের আবাল্য সুহৃদ্। উত্তরকালে তিনি কাঙ্গাল হরিনাথ নামে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমারের নামকরণ করিয়াছিলেন কাঙ্গাল হরিনাথ। হরিনাথ-প্রতিষ্ঠিত কুমারখালির বঙ্গবিদ্যালয়ে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। এই বিদ্যালয়ে তাঁহার সতীর্থ ছিলেন পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও সাহিত্যিক জলধর সেন। তাঁহারা 'তিন জনেই হরিনাথের নিকট বিদ্যা ও রচনা শিক্ষার উপদেশ' পাইয়াছিলেন। উত্তরকালে এই তিন বন্ধুই সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। 'আত্মকথা'য় অক্ষয়কুমার হরিনাথকে তাঁহার 'সাহিত্য-পথের গুরু' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

অক্ষয়কুমারের জন্মের পর পিতা মথুরানাথ সরকারী কর্ম পাইয়া রাজশাহীতে বাস করিতে আরম্ভ করেন। অক্ষয়কুমারের দশ বৎসর বয়সে কুমারখালি পরিত্যাগ পূর্বক রাজশাহী শহরেই তাঁহাদের স্থায়ী বসবাস স্থাপিত হয়। বারেন্দ্রশ্রেণীর এই কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের আদি নিবাস ছিল রাজশাহী জেলার গুড়নই গ্রামে। অক্ষয়কুমারের এক পূর্বপুরুষ বিবাহসূত্রে ফরিদপুর জেলায় চলিয়া যান ও সেই জেলার রুক্মিণী গ্রামে এই পরিবার বাস করিতে আরম্ভ করেন। পরে অক্ষয়কুমারের পিতামহের আমলে নীলকরদের অত্যাচারে রুক্মিণী গ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক এই পরিবার নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে বসবাস স্থাপন করেন। কুমারখালি গ্রামে ছিল অক্ষয়কুমারের পিতামহীর পিত্রালয়। অক্ষয়কুমারের পিতা মথুরানাথ রাজশাহী শহরে স্থায়ী বাস স্থাপন করেন। অক্ষয়কুমারের শিক্ষা আর কর্মজীবনও অতিবাহিত হয় রাজশাহীতে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তাঁহার পরিবারবর্গ রাজশাহীতেই ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা রাজশাহী ত্যাগ করিয়া অনেক কাল ফরিদপুর আর নদীয়া জেলায় বসবাস করিলেও বরেন্দ্রভূমির সহিত এই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সম্পর্কে ছিল অটুট। কথা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি— 'অবস্থাব্যপদেশে আমার জন্ম প্রবাসে, ঈশ্বরানুগ্রহে আপন আবাসে ফিরিয়া আসিয়াছি।' দীর্ঘকাল রোগভোগ সত্ত্বেও চিকিৎসার জন্য কলিকাতা আসিতে চাহিতেন

না। কামনা ছিল বরেন্দ্রের মাটিতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবেন। এই বরেন্দ্রপ্রীতি আর বারেন্দ্রাভিমানই তাঁহাকে বরেন্দ্রীর লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী করিয়াছিল। আর এ ব্রত সার্থক করিবার জন্য কঠোর পরিশ্রম আর সাধনা তিনি করিয়াছেন, ইতিহাসানুরাগী সকলেই তাহা জানেন। কিন্তু এই অভিমান তাঁহাকে সংকীর্ণ করিয়া তুলে নাই। কুমারখালির মায়া তিনি কাটাইতে পারেন নাই। আপন জন্মস্থানের প্রতি স্বাভাবিক মমতা আর গুরু হরিনাথের স্মৃতিবিজড়িত পূত পরিবেশ তাঁহার মনকে সমানভাবে নাড়া দিয়াছে।

১৮৭১ সালে রাজশাহীর বোয়ালিয়া গভর্নমেণ্ট স্কুলে অক্ষয়কুমারের ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ হয়। তখন তাঁহার বয়স দশ বৎসর। ১৮৭৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় রাজশাহী বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তিনি প্রথমস্থান লাভ করেন। তৎপরে ১৮৮০ সালে রাজশাহী কলেজ হইতে এফ. এ. ও ১৮৮৩ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রসায়ন ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে এম্. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াও অসুস্থতাবশতঃ রাজশাহী ফিরিতে বাধ্য হন। ১৮৮৫ সালে রাজশাহী কলেজ হইতে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং রাজশাহীতে আইনব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইংরাজি স্কুলে পড়িবার কালে চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ (পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের পিতা), রামকুমার বিদ্যারত্ন (উত্তরকালে স্বামী রামানন্দ ভারতী) ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃতে তাঁহার গভীর জ্ঞান ইতিহাসের অনেক দুরূহ তথ্যের সুষ্ঠু সমাধানে সহায়তা করিয়াছে। তাঁহার সুমধুর সংস্কৃত কাব্যের আবৃত্তি অনেককেই মুগ্ধ করিয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক বাল্যকালে অনেকবার সে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

আইনব্যবসায়ে অক্ষয়কুমারের যথেষ্ট সুনাম ও পসার হইয়াছিল। কিন্তু অর্থের মোহ তাঁহাকে জীবনের আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। সে আদর্শে তাঁহার দীক্ষা হইয়াছিল গুরু হরিনাথের নিকট। তরুণ বয়সেই তাঁহার সাহিত্যকর্মের শুরু হয় কবিতারচনায়। অল্পবয়স হইতেই তাঁহার উন্মুখ মন ইতিহাসের পথে আনাগোনা করিয়াছে। পদ্যই লিখুন বা গদ্যই লিখুন, তাঁহার সাহিত্যকৃতি ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়াই বিকশিত হইয়াছে। বিদেশীর লেখা ইতিহাস কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ভ্রান্ত, অনেক সময় পক্ষপাতদুষ্ট, এ বোধ তাঁহার জন্মিয়াছিল অতি অল্প বয়সেই। তাঁহার প্রথম সাহিত্যকর্ম 'বঙ্গবিজয় কাব্য' তাঁহার ছাত্রাবস্থাতেই লিখিত হয়। সপ্তদশ অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে বক্তিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয়ের কাহিনী যে একেবারে কাল্পনিক— ইহাই ছিল এ কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। দুঃখের বিষয়, এ রচনা এখন লুপ্ত। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, স্কুলপাঠ্য ইতিহাস পড়িয়া তরুণ মনের আবেগে এ কাব্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন। 'তবাকত-ই-নাসিরী'র গ্রন্থকার মিনহাজ উদ্দীনের বর্ণনা পড়িবার বয়স তখনও তাঁহার হয় নাই। পরবর্তীকালে রমাপ্রসাদ চন্দ রচিত 'গৌড়রাজমালা'র উপোদ্ঘাতে তিনি মিনহাজ উদ্দীনের বর্ণনার যথাযথ আলোচনা করিয়াছেন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সমরসিংহ' নামে ঐতিহাসিক চিত্র। ইহা প্রকাশিত হয় ১২৯০ বঙ্গাব্দে তাঁহার বি. এ. পাস করিবার অব্যবহিত পরে। এই পুস্তক রচনায় তাঁহার প্রধান উপজীব্য ছিল Colonel Tod রচিত *Annals and Antiquities of Rajasthan* নামক মহাগ্রন্থ। এই পুস্তক তাঁহার স্বাভাবিক ইতিহাসানুরাগের পরিচায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু ইতিহাসবিদ্যার কষ্টিপাথরে খাঁটি সোনা হিসাবে স্বীকৃতি পায় না।

অক্ষয়কুমারের ইতিহাসানুরাগী মন ক্রমশঃ তাঁহাকে ইতিহাসচর্চায় উৎসাহিত করিয়াছে। দেশের প্রকৃত ইতিহাস -রচনায় তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ক্রমশঃ তিনি অনুভব করিয়াছেন তথ্য ও প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা, আর সে প্রমাণের বিচার-বিশ্লেষণের সার্থকতা। তথ্যপ্রমাণাদির স্বল্পতা দৃষ্টে তিনি অনুভব করিয়াছেন অনুসন্ধানকার্যের আবশ্যকতা। এই ভাবে তাঁহার তত্ত্বান্বেষী মন তাঁহাকে আজীবন লিপ্ত রাখিয়াছে এক মহান অনুসন্ধানের বিরাট ক্ষেত্রে। বরেন্দ্রীর প্রাচীন কীর্তি অনুসন্ধানে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কোনো ক্লেশই তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রাচীন কীর্তি, পুরাতন কাহিনী ও কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়াছেন। যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার যথার্থ তাৎপর্য নির্ধারণে ডুবিয়া গিয়াছেন পুঁথিপত্রের গহণ অরণ্যে।

কী অপূর্ব নিষ্ঠা, আর কী অক্লান্ত পরিশ্রম এই ইতিহাস-সাধকের। বাল্যকালে আমরা অবাক হইয়া দেখিয়াছি— সে সাধনার মর্ম বুঝিবার বয়স তখন আমাদের হয় নাই। স্কুলে তখন আমাদের শিক্ষক ছিলেন উত্তরকালে খ্যাত ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়। তাঁহাকেও অক্ষয়কুমারের নিকট পাঠ লইতে দেখিয়া অগোচরে হয়তো অক্ষয়কুমারের সাধনায় আকৃষ্ট হইয়াছি। কিন্তু তখন তাঁহার সাধনা আমাদের নিকট মনে হইয়াছে বৃদ্ধবয়সের এক ধরণের খেলা। আর শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকেই মনে করিয়াছেন এক উদ্ভট খেয়ালিপনা। অক্ষয়কুমারের পরমসুহৃদ্ কান্তকবি রজনীকান্ত অক্ষয়কুমারের খেয়ালিপনা লইয়া 'ঐতিহাসিক' নামে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—

> রাজা অশোকের কটা ছিল হাতি,
> টোডরমলের ছিল কিনা নাতি,· ·
> এসব তথ্য করিয়া বাহির
> বড় বিদ্যা করেছি জাহির। ইত্যাদি

কান্তকবির এ কবিতা কিন্তু শ্লেষ-ভরে রচিত হয় নাই। সোদরপ্রতিম বন্ধুর প্রতি অনাবিল কৌতুক।

এই ভাবে অক্ষয়কুমারের ঐতিহাসিক-প্রতিভার স্ফুরণ। ইতিহাসবিদ্যার বৈজ্ঞানিক ধারায় রচিত অক্ষয়কুমারের প্রথম গ্রন্থ 'সিরাজদ্দৌলা'— প্রথমে 'সাধনা' ও পরে 'ভারতী'তে ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত— ১৩০৪ বঙ্গাব্দে (ইংরাজি ১৮৯৮ সালে) সংশোধিত ও পরিবর্ধিত কলেবরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। অল্পসময়ের ব্যবধানে পর পর প্রকাশিত হয় 'সীতারাম রায়' 'মীরকাশিম' 'ফিরিঙ্গি বণিক' প্রভৃতি গ্রন্থ। এই তিনটি গ্রন্থই প্রথমে ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তৎকালীন 'সাহিত্য' 'ভারতী' 'প্রদীপ' 'উৎসাহ' 'বঙ্গদর্শন' 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায়। এই সমস্ত ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধের সংখ্যা কিঞ্চিন্ন্যূন দুই শত। ইংরাজিতে তিনি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন RUPAM, MODERN REVIEW প্রভৃতি পত্রিকায়। প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বিশেষ লক্ষণীয়। ইতিহাসবিদ্যার অন্তর্গত এমন কোনো বিষয় নাই যাহা সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধ লিখেন নাই। এই সমস্ত প্রবন্ধ উপযুক্ত সম্পাদকের সহায়তায় কোনো উৎসাহী প্রকাশক পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে বাঙালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে বাংলাভাষায় ইতিহাস-পত্রিকা প্রকাশ অক্ষয়কুমারের অন্যতম কীর্তি। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে এইরূপ একখানি পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প তাঁহার মনে উদিত হয়, এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি একখানি

প্রস্তাবনাপত্র প্রচার করেন। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় এই প্রস্তাবনাপত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বক অক্ষয়কুমারকে বিশেষ উৎসাহিত করেন ও যথাসাধ্য সহায়তা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই প্রকারে অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রের 'সূচনা' লিখিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম সংখ্যায় 'সম্পাদকের নিবেদনে' অক্ষয়কুমার ইতিহাসের সংজ্ঞা ও পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। ইতিহাসের সংজ্ঞা তিনি আলোচনা করেন এক শাস্ত্রবাক্যের উদ্ধৃতি সহ—

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে ॥

এই ব্যাপক সংজ্ঞার উদ্ধৃতিতে অক্ষয়কুমারের ইতিহাস-বোধের গভীরতা অনুমান করা যায়। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনায় গবেষণা ও অনুসন্ধানের ধারা, তথ্যপ্রমাণাদির বিচার-বিশ্লেষণের রীতি সম্বন্ধে তিনি যেসব মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন তাহা ইতিহাসের সকল ছাত্রেরই স্মরণ রাখা প্রয়োজন। 'ঐতিহাসিক চিত্র' কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়। তবুও এই পত্রিকা প্রকাশে অক্ষয়কুমার যে উচ্চমান স্থাপনে সার্থক হইয়াছিলেন তাহা বাঙালীর ইতিহাসচর্চায় এক স্মরণীয় অধ্যায় রূপে স্বীকৃতি পাইবার দাবী রাখে।

রাজশাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি ও তাহার চিত্রশালা অক্ষয়কুমারের অক্ষয় কীর্তিরূপে এখনও বিদ্যমান। ইতিহাসচর্চায় অনুসন্ধানকার্যের প্রয়োজনীয়তা তিনি বহুদিন পূর্বেই অনুভব করিয়াছিলেন, এবং একক চেষ্টায় যথাসম্ভব অনুসন্ধানকার্য চালাইতেছিলেন। তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আগাইয়া আসিলেন দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়। শরৎকুমারের অর্থানুকূল্যে আর অক্ষয়কুমারের পরিচালনায় ইংরাজি ১৯১০ সালে রাজশাহী শহরে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। অক্ষয়কুমার ছিলেন এই সমিতির আজীবন Director। এই সমিতিতে যোগ দেন রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক রমাপ্রসাদ চন্দ, রাজশাহী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ও রাজশাহী কলেজের আরবি ও পারসি ভাষার অধ্যাপক গোলাম ইয়াজদানী। ইঁহারা সকলেই ছিলেন অক্ষয়কুমারের সুযোগ্য শিষ্য। রমাপ্রসাদ চন্দ উত্তরকালে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সংস্থার অধ্যক্ষরূপে অবসর গ্রহণ করেন। রাধাগোবিন্দ বসাক ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে আমরা আজ গৌরব অনুভব করি। গোলাম ইয়াজদানী হায়দরাবাদের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির অবদান অপ্রচুর নয়, আর এইরূপ সুযোগ্য কর্মীগঠনে অক্ষয়কুমারের কৃতিত্ব অবশ্যস্বীকার্য।

অক্ষয়কুমারের পরিচালনায় বরেন্দ্রীর গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধানকার্য চালাইয়া সমিতি যে সংগ্রহশালা গড়িয়া তুলিয়াছে বাংলাদেশের ইতিহাস-রচনায় তার মূল্য কম নয়। বরেন্দ্রীর শিল্পসম্ভারে পূর্ণ এই সংগ্রহশালা বাংলাদেশের শিল্পকলার ইতিহাসে অভিনব। তাম্রশাসন ও শিলালিপি, গ্রন্থাগারে সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথি বাংলাদেশের ইতিহাস-রচনার পক্ষে অমূল্য উপাদান। সমিতি শুধু সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত রহে নাই। প্রতিষ্ঠাকালে সমিতির উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস রচনা, আর সেই উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান ও গবেষণাকার্য চালনা। বাংলা ভাষায় আট খণ্ডে বাঙালীর ইতিহাস রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন অক্ষয়কুমার। এই আটখণ্ডের নামকরণ করিয়াছিলেন তিনি 'আটলহর মালা'। সেই পরিকল্পনায় 'গৌড়রাজমালা' ও

'গৌড়লেখমালা' প্রকাশিত হয় ইংরাজি ১৯১২ সালে। প্রথমখানির লেখক রমাপ্রসাদ চন্দ। অক্ষয়কুমার এই পুস্তকের সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন। দ্বিতীয়খানির সম্পাদক অক্ষয়কুমার নিজে। পরে সমিতির উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়। বাংলাভাষায় প্রকাশনার পরিবর্তে ইংরাজিতে প্রকাশনার পরিকল্পনা করা হয়। এই পরিকল্পনায় প্রকাশিত হয় ননীগোপাল মজুমদার সম্পাদিত *Inscriptions of Bengal*, Vol. III। ইংরাজিতে কয়েকখানি Monographও সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। উপরন্তু ১৯২৫-২৬ সাল হইতে Annual Reportও প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। এতদ্ব্যতীত সমিতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশেরও ব্যবস্থা করিয়াছে এবং এই ব্যবস্থায় প্রাচীনকালে বাঙালী-রচিত কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। অক্ষয়কুমার ছিলেন সমিতির প্রাণ। সমিতির এই অসামান্য কৃতিত্ব ঘটিয়াছিল তাঁহার সময়েই। তাঁহার মৃত্যুর পর সমিতির সে উৎসাহ বা নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয় নাই।

অক্ষয়কুমারের চেষ্টা ও আগ্রহে অনুসন্ধানকার্যের অঙ্গ হিসাবে সমিতি প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে অগ্রসর হয়। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতিই প্রথম আরম্ভ করে। ১৯২১-২২ সালে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-সংস্থার অনুমতিক্রমে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় অধুনাখ্যাত পাহাড়পুরে খননকার্য শুরু করে। অবশ্য সমিতির পক্ষে এই কার্য সম্পূর্ণ করিবার সুযোগ হয় নাই। তবে এ কথাও স্বীকার্য যে অক্ষয়কুমারের পরিচালনায় সমিতি পাহাড়পুরে যে খনন-কার্যের উদ্বোধন করে পরবর্তীকালে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সংস্থার অধীনে কয়েক বৎসরের চেষ্টায় সে কার্য সম্পূর্ণ হয়। বাংলার শিল্পকলার ইতিহাসে সংযোজিত হয় এক নূতন অধ্যায়।

অক্ষয়কুমারের ছিল বহুমুখী প্রতিভা। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ, তিনি ছিলেন লিপিতত্ত্বে পারদর্শী। দেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে এই দুই বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই দুই বিদ্যার সহযোগে তিনি দেশের ইতিহাস রচনায় নূতন ধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই হিসাবে তাঁহাকে পথিকৃৎ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল অসীম। দেশের শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়ে তিনি প্রচুর মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় তাঁহার প্রবন্ধ অপ্রচুর নয়। তাঁহার প্রবন্ধের তালিকা পরীক্ষা করিলে তাঁহার জ্ঞানের প্রসার উপলব্ধি করা যায়।

বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের যে কাঠামো তিনি রচনা করিয়াছেন— তাহা শুধু রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ইতিহাসেই আবদ্ধ নয়। দেশের সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস রচনাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কাঠামো তিনি রচনা করিয়াছেন সেই মূল উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে। তাঁহার রচিত পুস্তক ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা অবহিত হইতে পারিব। তাঁহার নীতি ও নিয়ম অনুসরণ করিলে বাংলাদেশের ইতিহাস-দেবীর মূর্তি গঠনে সক্ষম হইব।

প্রচলিত ইতিহাসের ভুল-ভ্রান্তি দূর করিবার মানসে অক্ষয়কুমার ইতিহাসানুশীলনে ব্রতী হইয়াছিলেন। এফ. এ. ক্লাসে পড়িবার সময়ে কলেজের অধ্যক্ষের সহিত তাঁহার বাদানুবাদে তাঁহার প্রকৃত ইতিহাস জানিবার আকুল আগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। এই আগ্রহেই তাঁহার সিরাজদ্দৌলার ঐতিহাসিক চিত্র -রচনার শুরু হয়। অক্ষয়কুমারই সর্বপ্রথমে সিরাজদ্দৌলার অন্ধকূপহত্যা সম্পর্কীয় কলঙ্ককালিমা মোচনে অগ্রসর হন। ১৯১৬ সালের ২৪ মার্চ Calcutta Historical Societyর আহ্বানে এশিয়াটিক সোসাইটি হলে যে বিতর্কসভার অধিবেশন হয় তাহাতে অক্ষয়কুমার এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। এই বিতর্ক-সভার বিবরণ ১৯১৬ সালের

*Bengal Past and Present*এর এক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। অক্ষয়কুমারের চেষ্টায় সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা আর অযথা কল্পিত মিথ্যা কাহিনীর নিরসন হইয়াছে।

অক্ষয়কুমারের সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ছিল। সংগীতে তাঁহার ছিল বিশেষ আসক্তি আর আগ্রহ। নাটকাভিনয়ে তাঁহার মত সুদক্ষ অভিনেতা পেশাদার মঞ্চেও বিরল। ঘর সাজাইবার পদ্ধতি ছিল সহজ ও সামান্য, অথচ অপূর্ব রুচিশীলতার পরিচায়ক। বসিবার ঘরখানি ফুল লতাপাতা আর কিছু বাঁশ ও বেতের আসবাব দিয়া সাজানো থাকিত। পুত্রকন্যাগণও পিতার রুচি পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের সংগীত ও নাটকানুশীলনে, চিত্রাঙ্কন ও মূর্তিগঠনে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। মূর্তিগঠন শিক্ষা দিবার জন্য এক শিক্ষকও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই শিক্ষক ছিলেন একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত— নাম বাণী-ঠাকুর। মূর্তি গড়া ছিল তাঁর খেয়াল, ইংরাজিতে যাকে আমরা hobby বলি। বাণী-ঠাকুরের সাহায্যে শিল্পশাস্ত্র মন্থন করিয়া দুই পণ্ডিত মূর্তি গড়ার মাটি তৈয়ারীর এক প্রাচীন অথচ অভিনব প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেই মাটিতে papier mache -র মত হালকা আর ফাঁপা মূর্তি গড়া চলিত। এই মাটিতে গড়া অনেক মূর্তি অক্ষয়কুমারের বৈঠকখানায় সজ্জিত থাকিত। এই মাটি তৈয়ারীর আসল কৌশল কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় কাহাকেও শিক্ষা দেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আজকাল বাংলাদেশে বিগ্রহ-নির্মাণে পুরাতন শিল্পরীতি প্রবর্তনের যুগ চলিয়াছে। অনেকে মনে করেন এই আন্দোলনের মুলে রহিয়াছে Indian Society of Oriental Art, আর সে সোসাইটির প্রতিষ্ঠার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। ভারতীয় চিত্র-ঐতিহ্যের পুনঃপ্রবর্তনে অবনীন্দ্রনাথের অবদান অসামান্য। কিন্তু ভারতীয় ভাস্কর্য-রীতির পুনরুদ্ধারে আর জাতীয়-জীবনে সে রীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব আমার মনে হয় অক্ষয়কুমারের প্রাপ্য। শিল্পশাস্ত্রজ্ঞ আর রসবেত্তা এই পণ্ডিতকে দিনের পর দিন দেখিয়াছি স্থানীয় কুমারকে শিল্পশাস্ত্রের 'তাল-মান' শিক্ষা দিতেছেন। ছোটবেলা হইতেই তাঁহার গৃহে বিভিন্ন পূজাপার্বণে পূজার বিগ্রহের নূতনত্ব লক্ষ্য করিয়াছি। তৎকালে প্রচলিত বিগ্রহের সহিত তাহার পার্থক্যও লক্ষ্য করিয়াছি। তাহার ছন্দ ও সুষমা মনকে আকৃষ্ট করিয়াছে। পরে বয়স বাড়িতে জানিতে পারিয়াছি সেসবের রীতি অভিনব হইলেও আমাদের পুরাতন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে নির্মিত। কিঞ্চিদধিক চল্লিশ বৎসর পূর্বে প্রবর্তিত পুরাতনাশ্রয়ী এই নূতন রীতি ক্রমশঃ সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য আজ জীবিত থাকিলে অক্ষয়কুমার পুরাতনের এই উৎকট ব্যভিচারে শিহরিয়া উঠিতেন।

১৯৩০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি অক্ষয়কুমার পরলোকগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর। পঞ্চাশ বৎসর তিনি ইতিহাসের চর্চা আর অনুশীলন করিয়াছেন। পরবর্তী যুগের ছাত্র ও কর্মীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন এক নূতন আদর্শ। তাঁহার গবেষণার বিষয় তিনি প্রকাশ করিয়াছেন ইংরাজি ও বাংলায়। তাঁহার ভাষা ছিল সাবলীল, গতিশীল, এককথায় ছন্দোময়। তিনি সুবক্তাও ছিলেন। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভার আর-এক প্রকাশ বাংলা দেশে রেশমশিল্পের পুরাতন ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস। অনেক যত্নে ও আয়াসে তিনি রেশমশিল্পের বিভিন্ন অঙ্গ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। রাজশাহীতে তিনি এক রেশমশিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ও পাঁচ বৎসর সে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯০১ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে রেশমশিল্পের বিভিন্ন অঙ্গের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

রন্ধনবিদ্যাতেও তাঁহার দক্ষতা রাজশাহীর অন্তরঙ্গ সমাজে সুপরিচিত ছিল। বন্ধুবান্ধবদের ভোজ দিয়া তিনি আনন্দ পাইতেন— আর সেসব ভোজে তিনি নিজে রন্ধনকার্যের ভার লইতেন।

১৮৬১ সালের ১লা মার্চ তাঁহার জন্ম হয়। অক্ষয়কুমারের জন্মের শতবর্ষ অতিক্রান্ত হইল। ১৮৬১ সালেই রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন— এই সালেই জন্মিয়াছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ইঁহাদের কনিষ্ঠ। ১৮৬১ সাল এইসব যুগপ্রবর্তকদের আবির্ভাব-বৎসর হিসাবে স্মরণীয়। এই সামান্য প্রবন্ধ-লেখকের অক্ষয়কুমারের প্রতিভার পরিমাপ করিবার যোগ্যতা নাই। খুব অল্পবয়স হইতেই এই লেখকের তাঁহার সান্নিধ্যে আসিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল অক্ষয়কুমারের নিকটতম প্রতিবেশী হিসাবে। অক্ষয়কুমারের কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়কুমার ছিলেন লেখকের সমবয়সী। অক্ষয়কুমারের সান্নিধ্যে বাস করিয়া এই লেখক তাঁহার সাধনা বিস্ময়ের সহিত লক্ষ করিয়াছে শৈশবকাল হইতেই। সে সাধনার প্রকৃত মূল্য ও তাৎপর্য অনুধাবন করিবার বয়স আসিতে না আসিতেই অক্ষয়কুমার পরলোকগমন করিলেন। লেখকের অজ্ঞাতসারে এই মনীষী হয়তো লেখককে আকর্ষণ করিয়াছেন— তাই আজ এই ক্ষুদ্র লেখক তাঁহার পথেই বিচরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রসঙ্গে একদিনের কথা মনে পড়ে। লেখক তখন রাজশাহী কলেজে বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। রাজশাহীতে সরস্বতী পূজার বিশেষ ধুম ছিল। সরস্বতী পূজার রাত্রে তাঁহার বৈঠকখানায় সরস্বতী-প্রতিমার সম্মুখে দেবী সরস্বতীর মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সেদিন অনেক কথা শুনাইয়াছিলেন। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালায় মেষ-বাহনা সরস্বতীর কয়েকটি মূর্তি আছে। উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত প্রাচীন সরস্বতী মূর্তির এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অক্ষয়কুমারকে এই লেখক এই বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিল। রোগে অশক্ত বৃদ্ধ উত্তর দিয়াছিলেন— 'জানিস না, বাঙালী আমরা সবাই মেষে পরিণত। তাদের দেবী মেষ-বাহনা না হইবেন কেন?' পরমুহূর্তেই আশ্বাসের সুরে বলিলেন— 'ইতিহাসের ছাত্র তোরা, খুঁজিয়া যা, উত্তর মিলিবে। আমি কেন উত্তর দিব? এ তো তোদেরই কাজ। আমি তো শেষের পথে চলিয়াছি।' সেই উপদেশই লেখকের জীবনকে হয়তো প্রভাবিত করিয়াছে— তাই তাঁহার পথে চলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। তাঁহার জন্মের শতবর্ষ পরে এই সামান্য স্মৃতিচিত্রণে প্রতিভাদীপ্ত মহাপুরুষের প্রতি লেখক আপন অন্তরের সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছে।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ঐতিহাসিক গবেষণার পথিকৃৎ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বর্তমান বৎসরে বাংলার কয়েকজন প্রতিভাধর মনীষীর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ডক্টর নীলরতন সরকার, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ইঁহাদের প্রত্যেকেরই কথা জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা কম-বেশি জানিতে পারিয়াছি পত্রপত্রিকা এবং সভাসমিতির মাধ্যমে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয়ের জন্মের শতবর্ষও পূর্ণ হইল। তাঁহার কথাও আমাদের স্মরণ-মনন করা কর্তব্য। অক্ষয়কুমারের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা পুস্তকে ও প্রবন্ধে ইতিপূর্বে কিছু কিছু সংকলিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা এ-সকলের মধ্যে তাঁহার জীবনের ঘটনাপরম্পরা জানিতে পারিবেন। এখানে আমি অক্ষয়-কুমারের ঐতিহাসিক কীর্তি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন ১লা মার্চ ১৮৬১; তাঁহার মৃত্যুদিবস ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩০। এই দীর্ঘ সত্তর বৎসরব্যাপী তাঁহার জীবনকালকে আমরা দুইভাগে ভাগ করিতে পারি। প্রথম পঁয়ত্রিশ বৎসর তাঁহার প্রস্তুতিকাল, দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে এই প্রস্তুতির ফল তিনি গৌড়জনকে পরিবেশনে নিয়োজিত হন। অক্ষয়কুমারের শৈশব ও কৈশোর কাটে নদীয়া জেলার কুমারখালিতে। পল্লীর সুষমা-মণ্ডিত হইয়াও এটি শহরের মর্যাদা পাইবার যোগ্য। গত শতাব্দীর সপ্তম অষ্টম দশকে কয়েকটি নির্দিষ্ট পল্লী-অঞ্চলে যখন মিউনিসিপ্যালিটি প্রবর্তিত হয় তখন এখানেও মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছিল। কুমারখালি সুবিখ্যাত কাঙ্গাল হরিনাথের লীলাক্ষেত্র। তাঁহার পুরা নাম হরিনাথ মজুমদার। অক্ষয়কুমারের পিতা মথুরানাথ এবং হরিনাথ সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কুমারখালির বঙ্গবিদ্যালয় এবং অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মূলে ছিলেন প্রধানত এই দুইজন।

এইসময়কার মধ্য- ও উত্তর- বঙ্গে নীলকরদের অত্যাচার সুবিদিত। যশোহর এবং নদীয়া জেলায় তাহাদের অত্যাচার-নিপীড়ন চরমে উঠে। কলিকাতার হিন্দু পেট্রিয়ট -সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীল চাষীদের সপক্ষ ছিলেন এবং নীলকরদের অত্যাচার-নিপীড়নের কাহিনী সপ্তাহের পর সপ্তাহ 'পেট্রিয়টে' প্রকাশিত করিতেন। অক্ষয়কুমার বলেন, স্থানীয় নীলকরদের অত্যাচার-কাহিনী মথুরানাথ এবং হরিনাথ হরিশচন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এবং ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' পত্রাকারে লিখিয়া পাঠাইতেন। তাঁহাদের এই যুগ্ম প্রচেষ্টায় স্থানীয় জনসাধারণের বিশেষ উপকার হইয়াছিল। অক্ষয়কুমারও তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা স্মরণ করিয়া পরে জনসেবায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

গত শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে বাংলাদেশে অভিনব স্বাজাত্যবোধের উন্মেষ লক্ষ করি। বাংলা ভাষা-সাহিত্যকে বাহন করিয়াই ইহার সূচনা হয়। নিজ সন্তানগণকে দক্ষ করিয়া তোলার প্রযত্ন নানাভাবে চলিতে থাকে। বন্ধুপুত্র অক্ষয়কুমারের বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের ভার লন হরিনাথ স্বয়ং। অক্ষয়কুমার হরিনাথকে তাঁহার সাহিত্যগুরু বলিয়া পরবর্তীকালে উল্লেখ করিয়াছেন। সুদূর পল্লীঅঞ্চলেও সাহিত্যিক-প্রবর অক্ষকুমার দত্তের বাংলা পুস্তকাদি প্রচারিত হয় এবং ইহার দ্বারা ঐ ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা বিশেষ অনুপ্রাণিত হন। অক্ষয়কুমারও শৈশবে এবং কৈশোরে অক্ষয়-সাহিত্য পাঠে মনঃসংযোগ করেন।

হরিনাথের 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় অক্ষয়কুমার প্রথমে বাংলা লেখা প্রকাশিত করিতে শুরু করেন। বড়লাট লর্ড লিটন ১৮৭৮ সনে দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র-আইন বিধিবদ্ধ করিলে হরিনাথ কাগজখানি লইয়া বিব্রত হইয়া পড়েন। ক্রমে নানা দুশ্চিন্তায় তিনি ব্যাধিগ্রস্ত হন। এই সময়, ১৮৮২ সনে, অক্ষয়কুমার অন্য দুই বন্ধুর সহযোগে কাগজখানি সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য-গুরু হরিনাথকে কাগজ সম্পাদনার দায় ও ঝুঁকি হইতে মুক্তি দেওয়া।

পিতা মথুরানাথ কর্ম উপলক্ষে রামপুর বোয়ালিয়ায় (বর্তমান নাম রাজশাহী) গমন করেন এবং সেখানেই তিনি বসবাস করিতে থাকেন। পুত্র অক্ষয়কুমারকেও তিনি বোয়ালিয়ায় লইয়া যান। অক্ষয়কুমার স্থানীয় স্কুল হইতে ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই বৎসরে তাঁহার বাল্যবন্ধু জলধর সেন এবং কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই পরীক্ষায় পাস করেন। এই সনটি আর-একটি কারণেও বিশেষ স্মরণীয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্বপ্রথম একজন বাঙালী মহিলা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম কাদম্বিনী বসু (গঙ্গোপাধ্যায়)। সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে তিনিই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবার গৌরব লাভ করেন।

এইসময় কি কলিকাতায় কি মফস্বলে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক আলোড়ন উপস্থিত হয়। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, তাঁহারা তখন বিপ্লবের কথা ভাবেন নাই বটে, তবে রাষ্ট্রীয় অধীনতা-বোধ তাঁহাদিগের মনে কাঁটার মত বিঁধিতে থাকে। রাজশাহীতেও শিক্ষিত সমাজে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছায়। প্রাণ-চঞ্চল ছাত্রবৃন্দও নব ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়। ছাত্র অক্ষয়কুমার রাজশাহী কলেজে অধ্যয়নকালে মেকলের রচনাচাতুর্যের মধ্যে বাঙালীর অবমাননা বুঝিতে পারিয়া ইংরেজ অধ্যাপকের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হইতেন। ১৮৮০ সনে রাজশাহী কলেজ হইতে এফ. এ. এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৮৩ সনে বি. এ. পরীক্ষা অক্ষয়কুমার উত্তীর্ণ হন। শেষোক্ত বৎসরে তাহার 'সমরসিংহ' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার বলেন, তিনি ইহার লভ্য 'জাতীয় ভাণ্ডারে' দান করেন। তাঁহার হৃদয় যে ঐ সময় হইতেই স্বদেশপ্রীতিতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল, ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঐ সনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবরণের পর সঙ্ঘবদ্ধভাবে দেশের সর্বত্র রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার নিমিত্ত একটি ধনভাণ্ডার খোলা হয়। ইহার নাম দেওয়া হয় 'ন্যাশনাল ফাণ্ড' বা জাতীয় ভাণ্ডার। দেখা যাইতেছে, ছাত্রাবস্থা অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই অক্ষয়কুমার রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। তিনি ১৮৮৫ সনে ওকালতি পরীক্ষা পাস করেন। তিনি অতঃপর আইন-ব্যবসায়ে রত হন। এই বৃত্তি অবলম্বন করায় রাজনৈতিক ও অন্যবিধ লোকহিতকর কার্যে যোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইল।

অক্ষয়কুমার বলেন, তিনি সাত বৎসর যাবৎ রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বা সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতসভার আনুকূল্যে মফস্বলের বহু শহরে ও গঞ্জে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সুপরিচালনার জন্য শাখা-সভা স্থাপিত হয়। রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশন ইহার পূর্ববর্তী হইলেও সভার কার্যক্রম অনুসরণ করিতে থাকে। ভারতসভার নেতৃবৃন্দের আহ্বানে যথাক্রমে ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ সনে কলিকাতায় ন্যাশনাল কনফারেন্স বা জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমি দ্বিতীয়বারের সম্মেলনের কার্যবিবরণী পাইয়াছি। রাষ্ট্রীয় উন্নতিমূলক বিবিধ প্রস্তাব এই সম্মেলনের তিনদিনব্যাপী

অধিবেশনে উত্থাপিত আলোচিত ও গৃহীত হয়। শুধু বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে নহে, বাংলার বাহিরের কোনো কোনো অঞ্চল হইতেও প্রতিনিধি আসিয়া এখানে সমবেত হন। রাজশাহী হইতে 'জনৈক প্রতিনিধি' এই সম্মেলনে যোগ দেন এবং অস্ত্র-আইন প্রত্যাহার, শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, পুলিশ বিভাগের সংস্কার এই তিনটি প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা করেন। রাজশাহীর প্রগতিশীল আন্দোলন-সমূহের সঙ্গে অল্প বয়সেই অক্ষয়কুমারের যেরূপ সংযোগ সাধিত হইয়াছিল তাহাতে অক্ষয়কুমারকেই রাজশাহীর 'জনৈক প্রতিনিধি' বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এবম্বিধ আন্দোলন এবং নিজ ব্যবসায়ের অন্তরালে অক্ষয়কুমারের সাহিত্যিক মানস বরাবর ক্রিয়াশীল ছিল। তিনি সাহিত্যগুরু হরিনাথের 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় আকৈশোর লিখিতেন। অন্যান্যদের সহযোগে তৎকর্তৃক ইহার সম্পাদনাভার গ্রহণের কথাও একটু আগে বলিয়াছি। রাজশাহীর 'হিন্দুরঞ্জিকায়'ও তাঁহার লেখা নিয়মিতভাবে বাহির হইত। তাঁহার স্বদেশপ্রেম এতই প্রবল ছিল যে বিদেশী কর্তৃক আরোপিত মিথ্যা কলঙ্ককাহিনী তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়-কাহিনীর অলীকত্ব প্রতিপাদন করিয়া তিনি একখানি কাব্যগ্রন্থও রচনা করেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হইবার পূর্বেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

অক্ষয়কুমারের সাহিত্যসাধনা পুষ্টিলাভ করে আর-একটি কার্যের ফলে। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তির পরিচয় মিলে তদীয় বিবিধ বাংলা রচনার মধ্যে। ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ আবিষ্কারে ও বিচার-বিশ্লেষণে এই সংস্কৃত জ্ঞান তাঁহার সবিশেষ সহায় হয়। ইহা কিঞ্চিৎ পরের কথা। সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-অনুষ্ঠান দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত অক্ষয়কুমারকে স্বদেশের কাল্পনিক কলঙ্কমোচন পূর্বক তথ্যভিত্তিক সত্যিকার ইতিহাস রচনায় প্রবুদ্ধ করে। ব্যবহারশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা এবং দেশীবিদেশী বিবিধ সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি হেতু তথ্যপ্রমাণ-বিশ্লেষণে ও স্বদেশীয় ভাষায় পরিবেশনে তিনি যেরূপ সাফল্য লাভ করেন, অন্যান্যের পক্ষে তেমনটি হওয়া খুবই দুর্ঘট ছিল। দীর্ঘকালের প্রস্তুতির পর রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সাধনা'র মাধ্যমে ১৮৯৫ সনে তিনি শিক্ষিত সাধারণের নিকট তাঁহার ঐতিহাসিক মননশীলতার পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। এই কথাই এখন বলি।

অক্ষয়কুমারের সুবিখ্যাত 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থখানির প্রথম অংশ কয়েকটি অধ্যায়ে প্রথমে 'সাধনা'য় এবং 'সাধনা' উঠিয়া গেলে পরবর্তী অংশ 'ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি এ সমুদয় উক্ত পুস্তকাকারে গ্রথিত ও প্রকাশিত করেন ১৮৯৮ সনের জানুয়ারি মাসে। ইতিহাসগ্রন্থ হইলেও 'সিরাজদ্দৌলা' বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক্‌স্‌এর মর্যাদা লাভ করিয়াছে। বিদেশী লেখকবর্গ নবাব সিরাজদ্দৌলার চরিত্রকে নানাভাবে কালিমাময় করিয়া তোলেন। যে-সব অপরাধে তিনি অপরাধী নন তাহাও তাঁহাতে আরোপিত হয়। অক্ষয়কুমার উক্ত পুস্তকে প্রাঞ্জল ভাষায় যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া তৎসমুদয় খণ্ডন করিতে প্রয়াস পান। ঠিক অ্যাডভোকেটের মত নবাবের সপক্ষে তিনি নথিপত্রের নিরিখে যুক্তিজাল বিস্তার করেন। একারণ তাঁহাকে পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন বটে কিন্তু বিদেশী ইতিহাস-লেখকদের উগ্র মতবাদের ভ্রান্ততা প্রতিপাদন-কল্পে তখন ইহা আবশ্যক হইয়াছিল নিঃসন্দেহ। তাঁহারই লেখনীমুখে একটি ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের সুযোগ ঘটে। তিনিই সর্বপ্রথম এই মর্মে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করেন যে তথাকথিত অন্ধকূপহত্যা একটি অলীক কাহিনী মাত্র। অক্ষয়কুমারের এই অভিমত প্রকাশের পর দেশীবিদেশী ঐতিহাসিক মহলে বেশ একটা আলোড়ন উপস্থিত

হয়। কলিকাতা হিস্টরিক্যাল সোসাইটির আনুকূল্যে ১৯১৬ সনের ২৪শে মার্চ এই বিষয়টি সম্পর্কে পণ্ডিতমণ্ডলীর যে আলোচনা-বৈঠক বসে তাহাতেও অক্ষয়কুমার পূর্বপ্রকাশিত নিজ মত দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করেন। অন্ধকূপহত্যার স্মৃতিস্তম্ভটিও পরে কলিকাতার প্রকাশ্য রাজবর্ত্ম হইতে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের ভারতবর্ষ তথা বাংলার ইতিহাস বৃটিশ ও ভারতবাসীর সংঘাতের ইতিহাস। অক্ষয়কুমার এ সময়কার ইতিহাস রচনার পক্ষে বহু উপকরণের সন্ধান পান। তাহার ভিত্তিতে তিনি 'মীরকাসিম' 'ফিরিঙ্গি বণিক' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'রাণীভবানী' শীর্ষক তাঁহার এক প্রস্থ প্রবন্ধ ১৩০৪ সালের (১৮৯৭-৯৮) 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়। কি তথ্য-বিশ্লেষণে কি ভাষা-পারিপাট্যে প্রবন্ধ-গুলি বাস্তবিকই অপূর্ব। অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশ লইয়া যাঁহারা গবেষণা করেন, এ-সকলের মধ্যে তাঁহারা বিস্তর নূতন বিষয়ের নির্দেশ পাইবেন। স্বদেশপ্রাণ অক্ষয়কুমারের ইতিহাসচর্চা ইঙ্গ-বঙ্গ সংঘাত লইয়া শুরু হইলেও তাঁহার গবেষণা ক্রমশ ব্যাপকতর হইয়া পড়ে। আধুনিক যুগ হইতে ক্রমান্বয়ে মধ্যযুগ প্রাচীন যুগ প্রভৃতি লইয়াও তাঁহার গবেষণা আরব্ধ হয়। তৎকর্তৃক সম্পাদিত 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামীয় ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রকাশারম্ভ (জানুয়ারি ১৮৯৯) হইতে ইহার সূচনা—আমরা এইরূপ ধরিয়া লইতে পারি।

এই পত্রিকাখানি প্রকাশের কিছুকাল পূর্বে অক্ষয়কুমার ইহার একটি প্রস্তাবনা প্রচার করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবনাটিকে আন্তরিক সমর্থন জানাইয়া ভাদ্র ১৩০৫ ভারতীতে একটি সারগর্ভ প্রসঙ্গ লেখেন। ইহাতে তিনি এইরূপ বলেন যে জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্যে অনেকে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন কিন্তু ইহার দ্বারা আমাদের মহদুপকারও সাধিত হইতেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে যেমন ঐক্যবোধ বাড়িতেছে তেমনই আমাদের অতীত ইতিহাস উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের দৃষ্টি এখন শুধু বর্তমান কালের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়, আমাদের মধ্যযুগ, পৌরাণিক যুগ এবং এমনকি বৈদিক যুগেরও ইতিহাস উদ্ধারে বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি দৃঢ়-সঙ্কল্প। আমাদের জাতীয় দোষ-ত্রুটি, কলঙ্ক-অপযশ যাহাই থাকুক-না কেন, অপরের মুখে আমরা তাহা না শুনিয়া নিজেরাই তাহার সত্যাসত্য যাচাই করিয়া লইব এবং অতীত গৌরবকাহিনী উদ্ধার পূর্বক আমাদের জাতীয় ইতিহাস রচনার দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইব। জাতীয় ইতিহাস উদ্ধারে আমাদের অহংকার বাড়িবে বটে কিন্তু তাহা হইবে আত্মপ্রত্যয়েরই নামান্তর। অতীতের সত্যিকার ইতিহাস বর্তমানকে সংযত অথচ শক্তিশালী করিবে আর ইহা হইবে ভবিষ্যৎ উন্নতিরও দ্যোতক। তখন বহুজনে বিবিধ পত্রিকায় ঐতিহাসিক সন্দর্ভ পরিবেশন করিতেছিলেন। 'ঐতিহাসিক চিত্রে' ঐতিহাসিক সন্দর্ভগুলি একত্র সন্নিবেশ করার সম্পাদকীয় প্রস্তাবকেও তিনি অভিনন্দিত করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম সংখ্যায় 'সূচনা' শীর্ষক একটি নিবন্ধে ইহার প্রশস্তি করিয়াছেন।

অক্ষয়কুমার প্রথমাবধি দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিবিধ কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যরূপে তাঁহার সক্রিয় যোগদানের কথা আজ সুবিদিত। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সাহিত্যের মাধ্যমেই স্থায়ী ও সার্থকরূপে দেশ ও সমাজ -সেবা সম্ভব বলিয়া ইহাকেই তিনি বিশেষভাবে আশ্রয় করেন। সাহিত্যের একটি প্রধান বিভাগ ইতিহাস। দেশাত্মবোধকে জীবনে

ও কর্মে বস্তুগত করিতে হইলে জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হওয়া একান্ত দরকার। কিন্তু ইহার পক্ষে প্রথম প্রয়োজন উপকরণসংগ্রহ। স্বদেশীয় কাব্য-পুরাণাদিতে বিদেশীদের লিখিত সমসাময়িক বিবরণ ও ভ্রমণবৃত্তান্তে দেশের অভ্যন্তর ও বাহিরের পুঁথিপত্র শিল্পকলা শিলালেখ তাম্রশাসন ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের মধ্যে স্বদেশের ইতিহাসের উপকরণ ছড়াইয়া আছে। অক্ষয়কুমার এই-সকল উপকরণ নিজে এবং বিভিন্ন লেখক দ্বারা সংকলন করাইতে প্রয়াসী হন, 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র মাধ্যমে। এই পত্রিকাখানি প্রকাশ সম্পর্কে তিনি রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "তাঁহার সহায়তায় এবং তাঁহার প্রস্তাবে ঐতিহাসিক চিত্র নামক ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করি।" এখানি এক বৎসর মাত্র চলিলেও ইহার যাহা মূল উদ্দেশ্য— অর্থাৎ "সাধারণতঃ ভারতবর্ষের এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, পুরাতত্ত্বের উপকরণ সংকলনে"র যে সূচনা হইল তাহার আর বিরাম ঘটে নাই। আমরা দেখিতে পাই, অক্ষয়কুমার বাংলাদেশের এবং বাঙালী জাতির ইতিহাস -রচনার বিবিধ উপকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে লাগিয়া যান। 'প্রদীপ' 'প্রবাসী' 'বঙ্গদর্শন'-নবপর্যায় 'সাহিত্য' প্রভৃতি তৎকালীন বিখ্যাত পত্রিকাগুলিতে এবং কখনো কখনো অল্পজ্ঞাত পত্রাদিতে ইতিহাস-মূলক প্রবন্ধ পরিবেশন করেন। তাঁহার অনুপ্রেরণায় রামপ্রাণ গুপ্ত, নিখিলনাথ রায় প্রমুখ লেখকবর্গ কখন মূলে কখনও-বা অনুবাদে ইতিহাসের উপকরণ -সম্বলিত রচনা প্রকাশ শুরু করিয়া দেন। বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভাবধি অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মোগল যুগের তথ্য-ভিত্তিক ইতিহাস রচনায় মনঃসংযোগ করিলেন। বাংলার বৌদ্ধযুগ ও তৎপরবর্তী যুগের ইতিহাসের উপকরণ বিভিন্ন উপায়ে সংগ্রহ করিতে হইবে, কিন্তু তাহা একক প্রচেষ্টায় কদাপি সম্ভবপর নহে। এজন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রযত্নের বিশেষ প্রয়োজন। শতাব্দীর প্রথম দশকে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে সুধীবর্গের দৃষ্টি এইদিকে পতিত হয়।

অক্ষয়কুমার কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসে একটি শিল্পকমিটি গঠিত হয় লালা হরকিসন লালের সভাপতিত্বে। লুপ্তপ্রায় স্বদেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিচার আলোচনা করা ছিল এই কমিটির উদ্দেশ্য। অক্ষয়কুমার ইহার অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। এই কংগ্রেসের সঙ্গে যে শিল্পপ্রদর্শনী আয়োজিত হয় তাহাতে তিনি স্বদেশীয় শিল্পের বিশেষ করিয়া রেশমশিল্পের উপরে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি ইহাতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন। ইহার ফলে স্বদেশীয় সাহিত্য দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা-গবেষণার দিকেও সুধীমণ্ডলী ঝুঁকিয়া পড়েন। এই সময়, ১৯০৬ সনে, কলিকাতায় দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইল। কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ ইহার সঙ্গে একটি শিল্পপ্রদর্শনীরও আয়োজন করেন। এই প্রদর্শনীর একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয় বাংলাদেশের পুরাতন পুঁথিপত্র গ্রামীণ লোকশিল্প সমেত বিবিধ পুরাকীর্তির সংগ্রহ লইয়া। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নেতৃত্বে এই বিভাগটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তোলার বিশেষ চেষ্টা হয়। এই সংগ্রহ দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে নিছক বঙ্গদেশের পুরাকীর্তির নিদর্শনগুলি লইয়া একটি সংগ্রহশালা স্থাপনের কথা উদিত হইল। ইহা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের পরিপূরক হইয়াও স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল থাকিবে। বস্তুতঃ প্রদর্শনীর এই বিভাগটিতে সংগৃহীত পুরা দ্রব্যাদি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইল। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই পরিষদের মিউজিয়ম বা চিত্রশালা গড়িয়া উঠিয়াছে। অক্ষয়কুমার প্রমুখ উত্তরবঙ্গের জননায়কগণের মনেও

অনুরূপ একটি মিউজিয়ম স্থাপনের বাসনা জন্মে। ঐতিহাসিক উপকরণ সংকলনকালে অক্ষয়কুমার উত্তরবঙ্গে গৌড় এবং অন্যান্য বহু অঞ্চলে ধ্বংসস্তূপের সন্ধান পান। এই-সব অঞ্চলে প্রাপ্ত পুরাদ্রব্যাদির একটি সংগ্রহশালা গঠনও আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। কিন্তু তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ রূপ পাইতে কয়েক বৎসর কাটিয়া যায়।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির নাম শিক্ষিত মহলে আজ কে না জানে? এই সমিতির মধ্যেই সংগ্রহশালা গঠনের বাসনা রূপ পরিগ্রহ করিল। অক্ষয়কুমারের কর্মস্থল রাজশাহীতে সমিতি ১৯১০ সনে স্থাপিত হয়। দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়ের বদান্যতায় এবং ঐকান্তিক উৎসাহে সমিতি স্থাপন সম্ভব হইল। অক্ষয়কুমারকে সারথি করিয়া ইহার কার্য অবিলম্বে আরম্ভ হয়। তিনি তাঁহার সহযোগী রূপে পাইলেন রমাপ্রসাদ চন্দকে। পুরাকীর্তি-সংগ্রহের দিকেও সমিতি অবিলম্বে মন দিলেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থলে প্রাপ্ত পুথিপত্র গ্রামীণ শিল্প মূর্তি ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের প্রাচীন নিদর্শনসমূহ, শিলালেখ তাম্রশাসন মুদ্রা প্রভৃতি একে একে সংগৃহীত হইয়া ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল। রংপুর সাহিত্য-পরিষদও এইরূপ একটি মিউজিয়ম গঠনে অগ্রণী হইলেন। ঢাকা নগরীতে সরকারী আনুকূল্যে পূর্ববঙ্গের পুরাদ্রব্যাদির সংগ্রহ লইয়া একটি মিউজিয়ম স্থাপিত হইল। নবলব্ধ বিভিন্ন উপকরণের ভিত্তিতে বাঙালী জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার এইরূপে উপায় হইয়া উঠিল। এতদিন বঙ্গদেশ তথা বাঙালী জাতির নির্ভরযোগ্য ইতিহাস না থাকায় বহু বিষয়ে পণ্ডিতমহলে ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয়। এখন তাহা নিরাকরণের পন্থাও পাওয়া গেল। অক্ষয়কুমার বিভিন্ন স্থল হইতে প্রাপ্ত ও সংগৃহীত পুরাদ্রব্যাদি লইয়া অবিলম্বে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলেন। তৎসম্পাদিত 'গৌড়লেখমালা' সমিতি বাহির করেন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। লেখমালার লেখগুলির ব্যাখ্যাও তিনি ইহাতে সংযোজিত করিলেন। এই বৎসরে সমিতি রমাপ্রসাদ চন্দ সম্পাদিত 'গৌড় রাজমালা'ও প্রকাশিত করেন। যে যুগ লইয়া এতদিন বিস্তর সন্দেহ ও অস্পষ্ট ধারণাবশে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন তাহার নিরাকরণেরও সুবিধা হইল।

বলিতে কি, গুপ্তযুগের পর হইতে মুসলমান আমলের পূর্ব পর্যন্ত অষ্টম-দ্বাদশ শতাব্দী—এই পাঁচ শত বৎসরের বাংলা তথা বাঙালীর ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করিতেছিলেন। ভারত-দ্বীপপুঞ্জে শিল্পদ্রব্য ভাস্কর্য স্থাপত্যের নিদর্শন বিস্তর পাওয়া যাইতেছিল এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কখনও ভারতের পশ্চিম-উপকূলের আবার কখনও মহাচীনের প্রভাব এই সমুদয় সুস্পষ্ট বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কিন্তু বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতিতে যেসব শিল্পনিদর্শন মূর্তি প্রভৃতি সংগৃহীত হইতে থাকে তাহার সঙ্গে ভারত-দ্বীপপুঞ্জের শিল্পনিদর্শনসমূহের আশ্চর্য মিল দেখিয়া ইহা যে গৌড়ীয় রীতির অনুসরণে কৃত তাহা অক্ষয়কুমার প্রকাশ করিলেন। যবদ্বীপে কোনো কোনো সংস্কৃত পুথি পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাহার ভাববিশ্লেষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিষম ভ্রমে পতিত হন। অক্ষয়কুমার পুথির সংস্কৃত ভাষার বিচার করিয়া দেখান যে উহা গৌড়ীয় কথোপকথনের ভাষা তথা ইহার উচ্চারণের মূলের সঙ্গে যোগ হারাইয়া তথাকার অধিবাসীরা উচ্চারণ অনুসারেই শব্দাদি লিখিতে অভ্যস্ত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃষ্ণ পুথিতে হইয়াছে 'কেষ্ট', হৃদয় 'রিদয়' ইত্যাদি উৎকল এবং মগধে পুরাকীর্তিগুলির শিল্পরীতিও গৌড়ীয় শিল্প-রীতি অনুসারী। উক্ত পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে গৌড়ে পালরাজগণের অভ্যুদয়। তাঁহাদের প্রথম অভ্যুদয়কালে বাংলার প্রকৃতিপুঞ্জই নৃপতি নির্বাচন করিয়াছিলেন। তৎকালীন অবস্থা বিবেচনা করিলে

কি এদেশে, কি বিদেশে সর্বত্রই এই ব্যাপারটি অভিনব বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। পালযুগে বঙ্গদেশ শৌর্য-বীর্য ও ধন-সম্পদের অধিকারী হয়। শুধু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নহে, সমুদ্রপারের দূরদুরান্ত পর্যন্ত বাংলার প্রভাববিস্তার ঘটে। ধর্ম ও লোকাচার, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, স্থাপত্য-ভাস্কর্য কোনো কোনো অঞ্চলে, যেমন ভারত-দ্বীপপুঞ্জে বিশেষভাবে প্রবর্তিত হয়। বলীদ্বীপের অধিবাসীরা ধর্মে এখনও হিন্দু। অক্ষয়কুমার সমিতির নবলব্ধ উপকরণ এবং ঐসব অঞ্চলের শিল্প-সাহিত্যের বিবিধ নিদর্শন বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যে, উক্ত তথাকথিত বাংলার মাৎস্যন্যায় বা অধঃপতনের যুগেই গৌড়ের এই বিজয়-অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। তিনি 'সাগরিকা' শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে (সাহিত্য ১৩১৯-২০) যুক্তিপ্রমাণ-সহযোগে এই বিজয়-অভিযানের কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিলেন। ইতিপূর্বে গৌড়ের ইতিহাস তথা পালযুগের কাহিনী কিছু কিছু রচিত হইলেও এখন হইতেই ইহার গৌরবময় ইতিহাস সম্যক বুঝা যাইতে থাকে। অক্ষয়কুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯১৫-১৬ সনে অনারারি লেকচারার পদে বৃত হইয়া Decline of the Pala Kingdom of Bengal শীর্ষক এক প্রস্থ বক্তৃতা দেন। অতঃপর বাংলাদেশের বৌদ্ধযুগ গুপ্তযুগ পালযুগের (মুসলমানদের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত) বাংলার তথ্যনির্ভর ইতিহাস সংকলনের পক্ষে প্রচুর উপকরণ হস্তগত হইল।

উত্তরবঙ্গে পুরাদ্রব্যাদি সংগ্রহ ব্যাপারে লিপ্ত থাকার দরুণ অক্ষয়কুমার প্রমুখ বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির সভ্যগণের গোচরে আসিল বহু স্তূপ ও ধ্বংসাবশেষ স্বাভাবিক ভাবেই। সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খননকার্যে তখনও হস্তক্ষেপ করেন নাই। দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুর স্তূপ -খননে সরকার কিরূপে উদ্‌বুদ্ধ হন তাহার কথা অক্ষয়কুমার স্বয়ং এখানে খননকার্য আরম্ভের প্রথম দিনে, ১লা মার্চ ১৯২৩ তারিখে, উদ্‌বোধন বক্তৃতায় সবিস্তারে বলিয়াছেন।[1] পাহাড়পুর স্তূপটি পাহাড়ের মত দেখিতে বলিয়া স্থানীয় লোকেরা ইহার এইরূপ নাম দেয়। পুর্বে কোনো কোনো ইংরেজ কর্মচারী এ স্তূপটির ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনো কাজ হয় নাই। এই স্তূপটির গহ্বরে যে বিস্তর ঐতিহাসিক পুরা দ্রব্যাদি লুক্কায়িত থাকা সম্ভব সে সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ সার জন মার্শালকে একটি যুক্তিপূর্ণ মন্তব্যলিপি প্রেরণ করেন। মার্শাল সাহেব ইহার পর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় খননকার্য পরিচালনার ভার লন, এবং সুবিখ্যাত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখানে এইজন্য পাঠান। পাহাড়পুর খননের ফলে বাংলার গৌরবময় বৌদ্ধযুগ ও পালযুগ সম্বন্ধে বহু নতুন তথ্য বাহির হয়। যাহার ফলে অক্ষয়কুমার-বর্ণিত বহির্ভারতের সঙ্গে ভারত তথা বাংলার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশ রহিল না। রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিত-মণ্ডলীর সঙ্গে ভারত-দ্বীপপুঞ্জে পরিভ্রমণ করিয়া এইপ্রকার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহাকে পুরোধা করিয়া এ সম্বন্ধে গবেষণাকার্য পরিচালনার নিমিত্ত কলিকাতায় Greater India Society বা বৃহত্তর ভারত সভা স্থাপিত হয়। অক্ষয়কুমার ছিলেন এ ধরণের গবেষণার পথিকৃৎ।

অক্ষয়কুমার বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে (১৯১৪) ইতিহাস-শাখার সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি এই মর্মে বলেন যে, আমরা এখন আর শুধু বাংলার একখানি

১ বঙ্গবাণী— বৈশাখ ১৩৩০ : "পাহাড়পুর"

ইতিহাস লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারি না, আমরা বাংলার একখানি 'ভাল ইতিহাস' চাই। অর্থাৎ নবাবিষ্কৃত তথ্যপ্রমাণাদির ভিত্তিতে তাঁহার মতে একখানি নির্ভরযোগ্য বাংলার ইতিহাস সংকলন তখনই সম্ভবপর হইয়াছিল। তিনি তথ্যপ্রমাণাদির বিচার-বিশ্লেষণ কর্তব্য বলিয়া বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। 'বিচারণা' কথাটির উল্লেখ এখানে আমরা প্রথম পাই। অক্ষয়কুমারের এই বক্তৃতাটি এখনও বাংলা তথা বাঙালীর ইতিহাস-রচয়িতাদের বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। ইতিহাস-রচনার ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত অক্ষয়কুমারের ইতিহাস-পুস্তক এবং ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী পাঠে সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে। বাস্তবিকই তাঁহার রচনাশৈলী ঐতিহাসিক বর্ণনাকে সাহিত্যের মর্যাদা দান করিয়াছে। অক্ষয়কুমারের ভাষা যেমন ঐশ্বর্যময়ী তেমনি প্রসাদগুণে অভিসিঞ্চিত। কোনো বিদ্বজ্জনসভা এই-সকল প্রবন্ধের কিয়দংশও যদি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করেন তাহা হইলে ঐতিহাসিক উপকরণাদি যে ইতিহাস-গবেষকদের সহজলভ্য হইবে শুধু তাহাই নয়, ইহা বাংলাসাহিত্যেরও গৌরব স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করিবে। জনৈক ইতিহাস-লেখক অক্ষয়কুমারকে বাংলার ইতিহাস -রচনার প্রথম সৈনিক বলিয়াছেন, কিন্তু এটুকু বলিলেই তাঁহার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয় না। তিনি সত্যসত্যই ছিলেন বাংলা তথা বাঙালী সম্পর্কীয় ঐতিহাসিক গবেষণার পথিকৃৎ।

উল্লেখপঞ্জী। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গভাষার লেখক— ১৩১১ ; প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৬এ প্রকাশিত অক্ষয়কুমারের জীবনকথা ; প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৭এ প্রকাশিত অক্ষয়কুমারের পত্রাবলী ; Annie Besant, *How India Wrought For Freedom*, 1915 ; Proceedings of the National Conference (1885) ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইতিহাস, ১৩৬২ ; শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, বাংলার ইতিহাস-সাধনা, ১৩৬০ ; Presidency College Register, 1927 ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (এই পুস্তকখানিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলীর একটি নির্ভরযোগ্য তালিকাও প্রদত্ত হইয়াছে) ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক-পত্র, নূতন সংস্করণ, ১৩৫৪।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পাহাড়পুরের স্মৃতি

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

'ঐতিহাসিকগণের ভীষ্ম পিতামহ' বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, পাহাড়পুর-খননকার্যের প্রধান উদ্যোক্তা, বাংলায় মাৎস্যন্যায়ের অরাজকতার পর পালবংশের প্রথম নির্বাচিত নৃপতি গোপালদেবের তাম্র-শাসনের আবিষ্কর্তা, প্রকৃত অক্সোনীয় স্কলারের মত ঠিক ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, সিরাজদ্দৌলাচরিত্রচিত্রণে ও অন্ধকূপহত্যার কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করণে দেশপ্রেমের উদ্বোধক আচার্য অক্ষয়কুমারের এই জন্মশতবার্ষিকী মুহূর্তে তাঁর অসামান্য মৌলিক প্রতিভা-উজ্জ্বল কৃতিত্বের কথা স্মরণ করি।

১৯১৯ ও ২০ সালে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার সময়ে পণ্ডিত কপিলেশ্বর মিশ্রজীর কাছে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নির্দেশমত ধর্মশাস্ত্র নিয়ে প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতির বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করি। রাজশাহী কলেজে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণের পর আমি প্রত্যেক দিন বিকাল ও সন্ধ্যায় বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটিতে গিয়ে অক্ষয়কুমারের কাছে বসে আরব্ধ বিষয়ে আলোচনাদি করতাম। কুমারী স্টেলা ক্রামরীশ (উত্তরকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা) সে সময়ে ভিয়েনা থেকে ভারতীয় চিত্রশাস্ত্র বিষয়ে তাঁর কাছে পাঠ নিতে এসে প্রায় দশ-বারো দিন বরেন্দ্র রিসার্চের আবাসে থাকেন; তখন শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব অধ্যাপক বন্ধু শ্রীহরিদাস মিত্র শ্রদ্ধেয় মৈত্রেয় মহাশয়ের পদপ্রান্তে বসে রিসার্চ স্কলার হিসাবে কাজ করতেন। সে সময়ে অক্ষয়কুমারের অধীনে বিষ্ণু ধর্মোত্তরে উল্লিখিত ভারতীয় চিত্রশাস্ত্র বিষয়ে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে আলোচনা চলে।

রূপ ভেদ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনং
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গমিতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্।

চিত্রশাস্ত্র বিষ্ণু ধর্মোত্তরে চিত্রাঙ্কন বিষয়ে রূপ ভেদ প্রমাণ (অনুপাত) ভাবলাবণ্য সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ চিত্রের এই ষড়ঙ্গ বিষয়ে নির্দেশগুলির তাঁর কৃত মৌলিক ব্যাখ্যা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। এদের মধ্যে রেখা দ্বারা রূপভেদ দেখানো ও সাদৃশ্যবিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যা আমাদের কাছে অভিনব বলে বোধ হয়েছিল। কালিদাসের রেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্ হতে বুঝা যায় যে রেখা দ্বারা রূপভেদ দেখানো ভারতচিত্রেরই বিশেষত্ব। তাঁরই আলোচিত 'সাদৃশ্য' শব্দের দ্বারা প্রাচীন ভারতে প্রাকৃতিক দৃশ্যাঙ্কন-প্রথা প্রচলিত ছিল বুঝা যায়— এই চিত্র শুধু ভাবময়ই ছিল না। চিত্রসূত্রের ব্যাখ্যায় এইখানেই অক্ষয়কুমারের অন্যতম মৌলিকতা। এই প্রসঙ্গে তিনি 'আকাশং দর্শয়েৎ প্রাজ্ঞো বিবর্ণং খগমাকুলম্' এই সূত্রের উদ্ধার করে দৃশ্যাঙ্কন বা landscape painting -এর বিষয়ে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত প্রণালীর আলোচনা করেন। তা ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার উপর নব আলোকপাত করে।

'চিত্রং নৃত্যপরং মতং'— চিত্রশাস্ত্রের এই উক্তি হতে তিনি বলেন, নৃত্যের পর চিত্রের উদ্ভব। সমুদ্রমন্থনরত নারায়ণের অঙ্গভঙ্গিমাদর্শনে মুগ্ধ লক্ষ্মী তার পুনরাবৃত্তি দেখতে বাসনা করলে একমাত্র শিবই সে পুনরভিনয়ে সমর্থ বলে বিবেচিত হওয়ার পর তা দেখান।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে পাহাড়পুরের খননকার্য আরম্ভ করা হয়। প্রধানত, দিঘাপতিয়ার কুমার
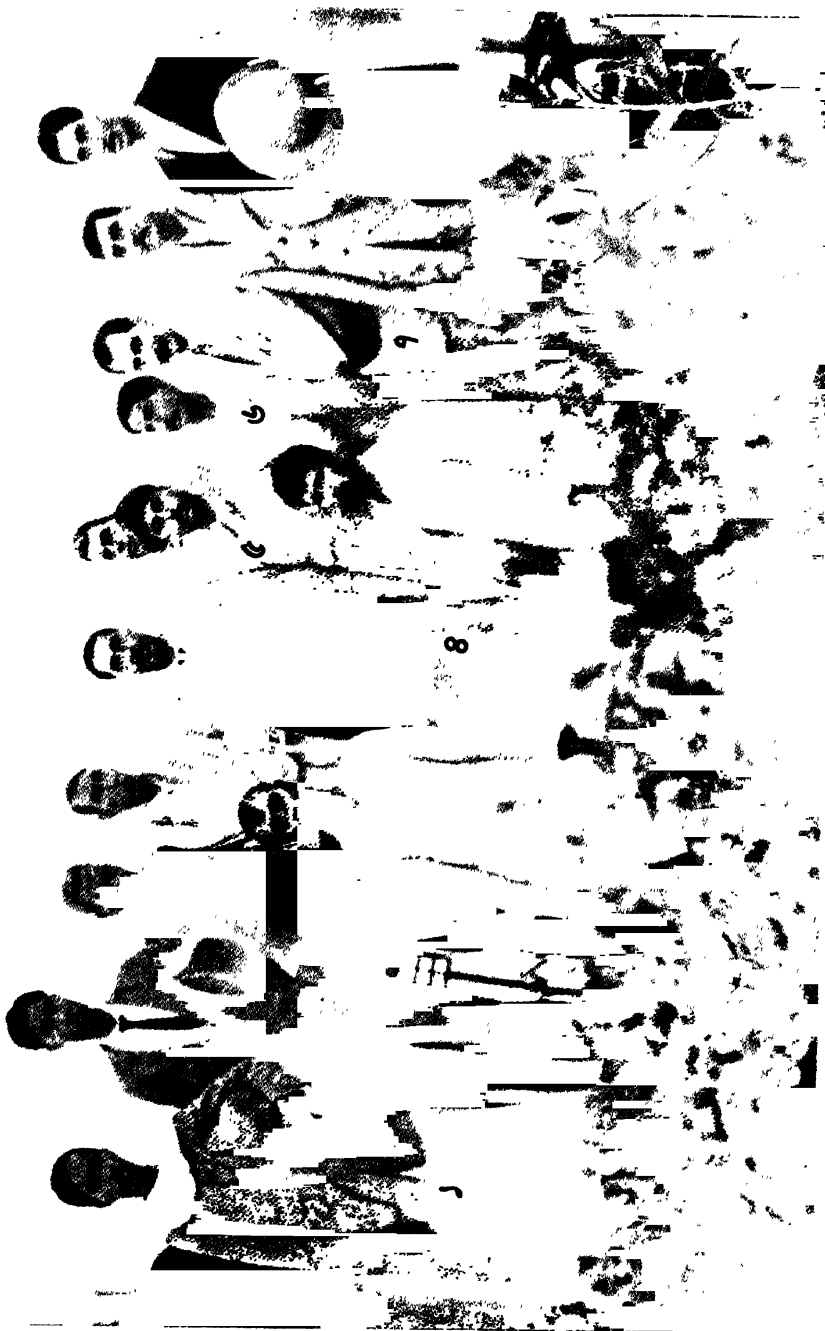
পাহাড়পুরের অভিযাত্রী

১ শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ২ হেমচন্দ্র রায় ৩ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৪ শরৎকুমার রায় ৫ ননীগোপাল মজুমদার ৬ যতীন্দ্রনাথ রায় ৭ ডি. আর. ভাণ্ডারকর

শরৎকুমার রায়ের প্রদত্ত অর্থে ও আচার্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের যুক্ত তত্ত্বাবধানে। সার্ আশুতোষও কিছুটা অর্থসাহায্য করেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ হতে খানিকটা সাহায্য পরে মেলে। খননকার্যের আগের বছরে মৈত্রেয় মহাশয় ও কুমার বাহাদুর পাহাড়পুর অঞ্চলের প্রাথমিক পরিদর্শন শেষ করেন। মৈত্রেয় মহাশয় বরেন্দ্র রিসার্চের সভাপতি ছিলেন। তিনি সরকারের রক্ষণাধীনে সহকর্মীদের নিয়ে পাহাড়পুর ক্যাম্পে যাওয়ার সময় রাজশাহী কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলে আমাকেও সঙ্গে নিলেন।

ক্যাম্পে পৌঁছতে আমাদের প্রায় সন্ধ্যে লেগে গেল। আক্কেলপুর স্টেশন থেকে মাইল-দেড়েক পথ অতিক্রম করার পর দেখি সামনে মাঠের মাঝে তৃণাচ্ছাদিত বৃক্ষ-শোভিত পর্বতপ্রমাণ এক স্তূপ। ডাকাত ও চোর তাড়াতে মিলিটারি পুলিসের পাহারা বসে গিয়েছে। তখন এই সতর্কতাকে একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন মহেঞ্জোদারোতে খননকার্যের ভারপ্রাপ্ত মদ্বন্ধু ননীগোপাল মজুমদারের ডাকাতদের হাতে প্রাণ যাওয়ার করুণ সংবাদ পেলাম তখনই খননকার্যে পুলিস-পাহারার মূল্য বুঝতে পারলাম। ফর্দা জমির উপর আমাদের ছোট বড় সব রকমের ক্যাম্প খাটানো হয়েছিল— অ্যাসিটিলিন ল্যাম্পের আলোয় চারি দিক ঝলমল করছিল, সকালে গ্রামের চৌকিদার এসে রিপোর্ট করে গেল; অক্ষয়কুমার তাকে বললেন, 'তুমি নিজেই ভয়ে কাঁপছে তো ডাকাত ধরবে কি করে?'

সকলের মাঝখানে একটি মাঝারি গোছের তাঁবুতে ক্যাম্পের নেতা অক্ষয়কুমারের জন্য আবশ্যক আসবাবপত্রসহ বিছানা ও খাট পাতা হয়েছে। পর্দার আড়ালে ঘরের এক অংশে অফিস বসেছে। আমার তাঁবুটা ছিল ছোট একজনের মত। ভিতরে বিচালির গাদার উপর কম্বল পেতে শোওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। সকালে ও বিকালে চা মোহনভোগের ব্যবস্থা বেশ ভালোই লাগত; মাঠে ঘোরাঘুরির পর খিদেও লাগত খুব। মৈত্রেয় মহাশয় দু বেলাই আমায় ডেকে তাঁর প্লেট থেকে স্ট্রবেরী জ্যাম মাখন -মাখানো টোস্ট খেতে দিতেন।

মৈত্রেয় মহাশয় সোমপুর মহাবিহারের সেই ধ্বংসস্তূপ দেখিয়ে বললেন, 'এখানেই বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দান করেন'; ছোট আশোকস্তূপ তুলসীমন্দিরের চেয়ে বড় ছিল না, তা থেকেই হয় এই বিরাট বিহারের উৎপত্তি। ভিক্ষুরা এখানে নিজ নিজ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে পাঠ পূজা উপাসনায় রত থাকতেন। তিনি স্তূপের পাদদেশে দক্ষিণ দিকে প্রায় চতুষ্কোণ ঢিপির একাংশ দেখিয়ে মস্ত বড় এক ডাইনিং হলের অবস্থান বলে সন্দেহ করেন। এ ছাড়া সেকালের বড় বড় ড্রেনের অবশেষও দেখালেন।

খননকার্য অগ্রসর হলে দেখা গেল, উপরের মেঝের তিনটি ভাগের মধ্যে সামনেটা ছিল একটা বারান্দা আর ভিতরের দিকে ছিল সন্ন্যাসীদের প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠগুলি ও দালানের মধ্যে ছিল লম্বা একটি পথ। দক্ষিণ বা দক্ষিণপূর্ব প্রাচীরের সমান্তরাল করে তোলা তিনটি দেওয়ালের কি অর্থ এখনও তা পরিস্ফুট হয় নি। খননকার্যের রিপোর্টে সন্দেহ করা হয়েছে— ওগুলি শত্রু বা প্লাবন হতে রক্ষার জন্য করা হয়। গড়মান্দারণের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সম্প্রতি ঠিক এইরূপ প্রাচীরব্যবস্থার চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে— কৈবর্ত-বিদ্রোহকালে গড়ের একাংশে এই-রকম দেওয়াল তোলা হয়েছিল সৈন্যদের থাকবার সুবিধার জন্য। সোমপুরের বিহারেও ঐ একই বিদ্রোহের সময় গোপালদেব কর্তৃক অনুরূপ ব্যবস্থা করা হয়ে থাকতে পারে বলে আমার মনে হয়। স্তূপের এক কোণে ১৮ ইঞ্চি লম্বা ও ৬ ইঞ্চি চওড়া ইটের ছয় ফুট

চওড়া প্রাচীর ও তৎসংলগ্ন ভিক্ষু-প্রকোষ্ঠও আমরা দেখি। সেখানে মৈত্রেয় মহাশয় তার কিছু পূর্বে পালবংশের প্রথম এবং নির্বাচিত নরপতি গোপালদেবের প্রস্তরস্তম্ভ আবিষ্কার করে তার উপরে খোদিত লিপির উদ্ধার করেন; সেই লিপিটি ছিল এইরূপ— 'রত্নত্রয়প্রমোদেন প্রজানাং হিতকাম্যয়া দশবলগর্ভেন দ্বিতীয়বুদ্ধেন স্তম্ভোয়ং কারিতো বরঃ'।— পালবংশের প্রথম নির্বাচিত নরপতি গোপালদেব দ্বিতীয়বুদ্ধের মত লোকহিতকারী নৃপতি ছিলেন। তিনি ধর্ম বুদ্ধ এবং সংঘের প্রমোদের জন্য স্তম্ভটি দান করেন। স্তম্ভস্থাপনা হইতে স্থানমাহাত্ম্য উপলব্ধি হয়।

আঠারো ইঞ্চি ইটে গড়া প্রাচীর গুপ্তযুগের কীর্তি বলেই ধরা হয়। পাহাড়পুর-খননকার্যের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় একে পালযুগের বলেছেন।

পাহাড়পুর-খননের সময়ে নালন্দার মত ছোট জালায় করা বীজধান পাওয়া যায়, ধানগুলির রং কালো হয়ে গিয়েছিল; প্রাচীন মৃৎপাত্রও অনেক ভগ্ন ও অভগ্ন অবস্থায়। এই সম্পর্কে মিলের কথা অক্ষয়কুমারই প্রথমে বলেন।

অক্ষয়কুমারের মতে খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পাহাড়পুরের অবস্থানে কয়েকটি অশোকস্তূপ নির্মিত হয়; খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে গুপ্তযুগে হিন্দু দেবদেবীর পুরাণ-চিত্রাবলী-খচিত টেরাকোটা বিচিত্র মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। পালবংশের আবির্ভাবের সঙ্গেসঙ্গে গোপালদেবের স্তম্ভস্থাপনার সহিত পরে বৌদ্ধ মঠ-মন্দিরাদির পুনরভ্যুদয় ঘটে।

বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির মিউজিয়মে রক্ষিত অর্ধনারীশ্বর ও মকরবাহনা গঙ্গামূর্তি এবং যমের তুলাদণ্ড তাঁরই আবিষ্কৃত। গোপালদেবের স্তম্ভের খবর সমীর মণ্ডল নামে এক কর্মকার তাঁকেই প্রথম দেয়। তার পর তিনি পাহাড়পুর গিয়ে প্রোথিত স্তম্ভটি উদ্ধার করে আনেন। গৌড়লেখমালায় আছে—

ভাগীরথ্যা স্তপনতনয়া যত্র নির্যাতি দেবী
স্কন্ধাবারং বিজয়পুর মিত্যুন্নতাং রাজধানীং।

ভাগীরথী ও তপনতনয় নদীর সঙ্গমস্থলে উন্নত ভূমিভাগের উপর সেনরাজগণের বিজয়পুর রাজধানী ছিল। অক্ষয়কুমার ও রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়দ্বয়ের মতে বিজয়পুর মালদহে ছিল। তবে সেখানে ওরূপ নদীনাম পাওয়া যায় না। মিনহাজ উদ্দীনের তবাকত-ই-নাসিরীতে সেনরাজগণের নদীয়া রাজধানীর কথা মিলে। নবদ্বীপের পূর্বপারে যে উঁচু জমিতে বলাল রাজার বাড়ি বলে এক ভগ্নাবশেষ দেখা যায় তার পূর্ব ধার দিয়ে বর্তমানের খড়িয়া নদী ও তার থেকে কিছু তফাতে অলকানন্দা প্রবাহিতা। খড়িয়ার এখনকার আর-এক নাম জলঙ্গী; ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে খড়িয়াকে 'গাঙ্গিনী' বলা হয়েছে। তার কিছুটা দক্ষিণ-পূর্বে অলকানন্দা নামে এক মজা নদী দেখা যায়; এর ধারেই মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের গঙ্গাবাস নামে প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ; অলকানন্দা আকাশগঙ্গা তপনতনয়া কিনা জানি নে। খড়িয়ার নাম সেকালে 'তপনতনয়া' ছিল কিনা বলা কঠিন। লক্ষ্মণ সেনদেবের সভাসদ কবি গোবর্ধনাচার্য ধোয়ীর পবনদূতের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো সন্ধান মিলে কিনা জানি নে। নবদ্বীপের অনেকটা দক্ষিণে ত্রিবেণীতে সম্রাট বিজয় সেনের বিরাট নৌঘাটি ছিল; তদ্দক্ষিণের নৈহাটি নাম হয়তো সেই সম্পর্কেই এসেছে। ত্রিবেণী তখন বড় বন্দর; তার কিছু পূর্বে বিজয়পুর নামে একটি গ্রামের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কাটোয়ার কাছে বিজয়নগর বা বিজ্নগর বলে একটি গ্রাম আছে।

মৈত্রেয় মহাশয়ই ইংরাজের রচিত অন্ধকূপহত্যার কাহিনীকে অকাট্যভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন।

১৯১৫-১৬ সালে সিনেট হলে পালবংশ সম্বন্ধে আচার্য অক্ষয়কুমারের মৌলিক গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতামালা এখনও আমার কানে বাজছে। তা সুধীমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ ঔৎসুক্য ও আগ্রহের সৃজন করে।

পঞ্জাবের ভক্তিসাহিত্য

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

দক্ষিণ-ভারত হইতে ভক্তিধর্মের তরঙ্গ উত্তরাভিমুখী হইয়া সুদূর পঞ্জাবে পৌঁছিবার পূর্বেই পশ্চিম হইতে আগত অন্য একটি ভাবতরঙ্গ পঞ্জাবের মনোভূমিকে সিঞ্চিত করিয়া দিল, এবং তাহা হইতেছে সুফী[১]-ধর্ম। মধ্যযুগে ভারতবর্ষ সুফীধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিচিত হইলেও এই ধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল নবম শতকের আরব দেশে[২]।

কুরান-শরীফের সঙ্গে সুফীদের চিন্তাধারার পূর্ণ সংগতি ছিল না বলিয়া সুফীরা বরাবরই গোঁড়া মুসলমানদের অপ্রীতিভাজন ছিল। প্রথম যুগের আরবীয় সুফীরা যথাসম্ভব কুরানের অনুগামী হইয়া চলিবার চেষ্টা করিলেও সুফীধর্ম যতই আরবের বাহিরে প্রচারিত হয় ততই বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ধর্মচিন্তা ও সংস্কৃতির নিকট-সংস্পর্শে আসিয়া সুফীবাদে পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। যে সুফী সাধকেরা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম পদার্পণ করেন তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল হজরৎ মুহম্মদ-প্রবর্তিত পন্থায় ঈশ্বরতত্ত্বে শিক্ষাদান। কিন্তু ক্রমশই ভারতীয় চিন্তার প্রভাবে সুফীবাদ রূপান্তরিত হইতে থাকে— হিন্দুদের বেদান্তদর্শন ও ব্রহ্মচিন্তা সুফীদের নিকট গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠে। পঞ্জাবী সুফীদের মধ্যে অনেকে আবার কর্মফল জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি বিশ্বাস করিতেন বলিয়া জানা যায়[৩]। এইভাবে ভারতীয় সুফীধর্ম আরবীয় সুফীধর্মের একান্ত অনুবৃত্তি না হইয়া হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-সাধনার একটা মিশ্ররূপ গ্রহণ করে[৪]।

ভারতে সুফীসাধনার প্রথম প্রবেশ ঘটে একাদশ শতকে অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ ভক্ত-দার্শনিক রামানুজাচার্যের সমকালে। গজনী প্রদেশের মখদুম সৈয়দ আলি অল্ হুজবেরীকেই ভারতের আদি সুফীসাধকরূপে গণ্য করা হয়[৫]। কিন্তু এ দেশে সুফীধর্ম শক্তিশালী হইয়া উঠে ইরাণের প্রসিদ্ধ সুফীসাধক খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্‌তীর (১১৪২ - ১২৩৩) ভারত-আগমনের পরে। উত্তরপশ্চিম-ভারতের পঞ্জাব আজমের প্রভৃতি অঞ্চলেই সুফীধর্ম-সাধনার প্রথম প্রচার ঘটে।

জনসাধারণের কাছে সুফীদের ধর্মমত আকর্ষণীয় করিয়া তোলার একটি প্রধান উপায় ছিল গান ও কবিতা। প্রথম যুগের ভারতীয় সুফী কবিরা তাঁহাদের রচনার জন্য ফারসী ভাষাকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুই হউক মুসলমানই হউক, ভারতীয় জনসাধারণের কাছে ফারসী অপেক্ষা তাহাদের

---

১ সুফ (আরবী শব্দ)=পশম। পশমী কম্বলে আবৃত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন বলিয়া আরবে একশ্রেণীর মুসলমান সাধক 'সুফী' নামে পরিচিত হন। সুফী শব্দের মূল অর্থ 'পশমী বস্ত্র পরিধানকারী' হইলেও পরবর্তীকালে যোগরূঢ় শব্দরূপে বিশিষ্ট সাধক-সম্প্রদায় বুঝাইতেই ইহার প্রচলন হয়।

২ *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. XII, p. 10.

৩ Lajwanti Rama Krishna, *Panjabi Sufi Poets*, p. XVIII.

৪ 'Indian Sufism is a mixture of Muslim-Hindu thinking—A. M. A. Shushtery, *Outlines of Islamic Culture*, p. 413.

৫ ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতের সংস্কৃতি, পৃ ৫৪।

নিজস্ব ভাষা অধিকতর হৃদয়স্পর্শী হইবে অনুভব করিয়া সুফীকাব্যরচনার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে দেশীয় ভাষার ব্যবহার হইতে থাকে।

পঞ্জাবী ভাষায় সুফীদের কাব্যরচনার ইতিহাস কবে হইতে আরম্ভ হয় তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে একটি প্রবল মতভেদ আছে। কিন্তু বিবদমান উভয়পক্ষই স্বীকার করেন যে, পঞ্জাবী সাহিত্যের প্রথম সুফী কবি শেখ ফরীদ— যাঁহার কিছু রচনা সংকলিত হইয়াছে শিখদের ধর্মগ্রন্থ 'গুরু গ্রন্থসাহিব'-এ। এই ফরীদের কাল ও পরিচয় লইয়াই পণ্ডিতগণের মতানৈক্য[৬]। আমরা যে দুইজন ফরীদের পরিচয় পাই, তাঁহাদের প্রথমজন হইলেন পূর্বোল্লিখিত প্রসিদ্ধ সুফীসাধক খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্‌তীর শিষ্য শেখ ফরীদুদ্দীন মসউদ শকরগঞ্জ (১১৭৩ - ১২৬৬); সংক্ষেপে ইনি 'বাবা ফরীদ' নামে পরিচিত। দ্বিতীয় ফরীদ হইলেন বাবা ফরীদের অধস্তন একাদশ পুরুষ শেখ ইব্রাহীম ফরীদ (১৪৫০-১৫৫২)। গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮) তাঁহার এই সমসাময়িক সুফীসাধকের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন এবং দুইবার তিনি শেখ ইব্রাহীম ফরীদের সাধনাস্থল অজোধন (পরবর্তী নাম পাকপটন) পরিদর্শন করিয়া শেখ ফরীদের সহিত নানারূপ ধর্মালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

গ্রন্থসাহেব প্রথমবার সংকলিত হয় গুরু অর্জুনদেবের কালে (১৫৬৩-১৬০৬)। সুতরাং এই গ্রন্থে সংকলিত ও ফরীদ-নামাঙ্কিত রচনা সময়ের দিক হইতে দ্বিতীয় ফরীদেরও হইতে পারে। এমনকি যাঁহারা গ্রন্থসাহেবের উক্ত পদগুলিকে প্রথম ফরীদের রচনা বলিয়া মনে করেন তাঁহারাও এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, গুরু নানক শেখ ইব্রাহীম ফরীদের কাছ হইতেই বাবা ফরীদের বাণীসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।[৭] আমরা নানা কারণে বাবা ফরীদের বংশধর শেখ ইব্রাহীম ফরীদকেই পঞ্জাবীর প্রথম সুফী কবি বলিয়া বিবেচনা করি। তাহা হইলে পঞ্জাবী ভাষায় সুফী কাব্যসাধনার সূত্রপাত হইয়াছে পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে, এইরূপ ধরা যাইতে পারে।

ইসলামই মানুষের মুক্তিসাধনার একমাত্র পন্থা— পরবর্তী সুফীসাধকগণ এ কথা অকুণ্ঠিতচিত্তে ঘোষণা করিতে পারেন নাই। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কেও যে তাঁহাদের চিত্তে সংশয় দেখা দিয়াছিল, ফরীদের রচনাতেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন— ভগবান এক, শিক্ষক দুইজন (মুহম্মদ এবং হিন্দুর অবতার)। কাহাকে সেবা করিব আর কাহাকেই বা ভর্ৎসনা করিয়া পরিত্যাগ করিব ?[৮]

ফরীদ নরনারীর প্রেমের রূপকে ঈশ্বরের সহিত মানুষের প্রেম ও বিরহমিলনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন,

---

৬ "সটীক শলোক ফরীদ" (১৯৪৬)এর রচয়িতা সাহিব সিং, 'বাবা ফরীদ দরশন' (১৯৫৩)এর রচয়িতা দীবান সিং প্রভৃতির মতে গ্রন্থসাহেবে ফরীদ-নামাঙ্কিত যে সকল বাণী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা শকরগঞ্জ শেখ ফরীদের, শেখ ইব্রাহিম বা দ্বিতীয় ফরীদের নয়। পঞ্জাবী-শিক্ষিত শ্রেণীর ইহাই সাধারণ বিশ্বাস।

অপর পক্ষে দ্বিতীয় ফরীদকে উল্লিখিত বাণীসমূহের রচয়িতা বলিয়া যে সমস্ত আলোচনা করা হইয়াছে তাহার জন্য দ্রষ্টব্য সন্ত সুধাকর (১৯৫৩)— বিয়োগী হরি সম্পাদিত পৃ. ৪০৫ ; *Panjabi Sufi Poets*—p. 7 ; *The Sikh Religion* (1909) Vol. VI p. 357—*Macauliffe*.

৭ সাহেব সিং— সটীক শলোক ফরীদ পৃ. ১১।

৮ ইক খুদাঈ দুঈ হাদী কেহ্‌রা সেবী কেহ্‌রা হদ্দা রদ্দী॥ জনমসাখী পৃ. ৫৪৪ হইতে উদ্ধৃত সন্তসুধাসারে প্রাপ্ত।

ফরীদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু ভারতীয় কবির রচনায় আমরা সেই চিত্রটি দেখিতে পাই। অভারতীয় সূফী কবিদের কাব্যে ভগবান প্রায়শঃ স্ত্রীরূপে কল্পিত। জীবাত্মা-রূপী কবি আশিক (প্রেমিক) এবং পরমাত্মা তাহার মাশূক (প্রেয়সী)। ফারসী কাব্যের এই আশিক মাশূক -কল্পনা ও বর্ণনা উর্দূকাব্যের আসরকে পঙ্কিল করিয়া রাখিয়াছে। পঞ্জাবী সূফী কাব্যের গোড়া হইতেই দেখা যায় ভগবান প্রেমিক এবং সূফী বা জীবাত্মা বিরহিণী নায়িকা। ফরীদের একটি পদে বিচ্ছেদবেদনার বর্ণনা করা হইয়াছে এইরূপে: বিরহজ্বরে আমার সকল অঙ্গ জ্বলিতেছে আর আমি হাত মলিতেছি; প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় আমি ব্যাকুল হইয়াছি; হে প্রিয়, তুমি মনে মনে আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছ; দোষ আমারই, দোষ তোমার নয়; হে স্বামী, আমি তোমার গুণ বুঝিতে পারি নাই; যৌবন হারাইয়া এখন পছতাইতেছি; কালো কোকিল, তুই কি কারণে কালো হইয়াছিস?— আপন প্রিয়ের বিরহ-জ্বালায় জ্বলিয়া? প্রিয়ের বিরহে কেহ কোনোদিন কি সুখ পাইয়াছে? যদি প্রভু কৃপালু হন তবেই প্রভুর সঙ্গে মিলন হইতে পারে; কুঁয়া (অর্থাৎ সংসার) খুব দুঃখদায়ক, আর সেই স্ত্রী (জীবাত্মা) একাকিনী (কুঁয়ার মধ্যে পড়িয়া আছি); আমার কোনো বন্ধুবান্ধব নাই; আমার পথ বড়ই বিকট, তলোয়ার অপেক্ষাও ধারালো; উহার উপর দিয়া আমাকে যাইতে হইবে; শেখ ফরীদা, সময় হইয়াছে, পথ চলার জন্য তৈরী হও।[৯]

এই জাতীয় পদ ছাড়া গ্রন্থসাহেবে ফরীদের দুই-চরণ-যুক্ত কতকগুলি শ্লোক সংকলিত হইয়াছে।[১০] সেই ক্ষুদ্রকায় শ্লোকগুলির মধ্যেও ফরীদের কবিপ্রকৃতির নিঃসংশয় পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

---

৯ তপি তপি লুহি লুহি হাথ মরোরউ।
বাবলি হোঈ সো সহু লোরউ॥
তৈ সহি মন মহি কীআ রোসু।
মুঝু অবগন সহ নাহী দোসু॥
তৈ সাহিব কী মৈ সার ন জানী।
জোবনু খোই পাছৈ পছুতানী॥
কালী কোইল তু কিতগুন কালী।
অপনে প্রীতম কে হউ বিরহৈ জালী॥
পিরহি বিহুণ কতহি সুখু পাএ।
জা হোই কৃপালু তা প্রভু মিলাএ॥
বিধন খূহী মুংধ ইকেলী।
না কো সাথী না কো বেলী॥
বাট হমারী খরী উডীনী।
খঁনি অহু তিখী বহুতু পিঈনী॥
উ সু উপরি হৈ মারগু মেরা।
সেখ ফরীদা পন্থু সম্হারি সবেরা॥ —গ্রন্থসাহেব পৃ. ৭৯৪

১০ গ্রন্থসাহেবে ১৩৭৭-১৩৮৪ পৃষ্ঠায় ফরীদের 'সলোক' সংগৃহীত আছে। এইরূপ শ্লোকের মোট সংখ্যা ১৩০

ক. কেশ যখন কালো থাকে তখন রমণ না করিয়া কোনো নারী কি চুল পাকিয়া শাদা হইয়া গেলে রমণ করে ? স্বামীর সঙ্গে তুই এখনই প্রীতি কর যাহাতে তোর চুলের রঙ্‌ আবার নতুন হয়।

ফরীদা কালী জিনী ন রাবিআ ধউলী রাবৈ কোই।
করি সাঁঈ সিউ পিরহড়ী রংগু নবেলা হোই॥ ১২ সং শ্লোক

খ. গলিতে জলকাদা এবং প্রিয়ের ঘরও অনেক দূরে। যদি আমি তাহার কাছে যাই তো কম্বল ভিজিয়া যাইবে, আর না গিয়া যদি ঘরে থাকি তো প্রেম ভাঙিয়া যাইবে।

ফরীদা গলীএ চিকড়ু দূরি ঘরু নালি পিআরে নেহু।
চলা ত ভিজৈ কঁবলী রহাঁ ত তুটৈ নেহু॥ ২৪ সং শ্লোক

গ. যৌবন যদি চলিয়াও যায় তবু ভয় করি না যদি উহার সহিত প্রিয়ের ভালোবাসা না যায়। কতবার তো বিনা প্রেমেই যৌবন শুকাইয়া গিয়াছে।

জোবন জান্দে না ডরাঁ জে সহ প্রীতি ন জাই।
কিতীঁ জোবন প্রীতি বিনু সুকি গএ কুমলাই॥ ৩৪ নং

ঘ. মানুষ সর্বদাই প্রেম-বিরহের কথা বলে। বিরহ, তুই তো সুলতান। যে তনুতে বিরহ জন্মে না সেই তনুকে শ্মশান বলিয়া জানিও।

বিরহা বিরহা আখীএ বিরহা তূ সুলতানু।
ফরীদা জিতু তন বিরহু ন উপজে সো তনু জাণু মসানু॥ ৩৬ নং

ঙ. যতক্ষণ কুমারী ততক্ষণ উৎসাহ ; বিবাহ হইলেই মামলা (অর্থাৎ নানাপ্রকার আপদ আসিয়া পড়ে)। এখন পরিতাপ এই যে, আর কুমারী হওয়া যায় না।

জাঁ কুআরী তা চাউ বীবাহী তাঁ মামলে।
ফরীদা এহো পছোতাউ বতি কুমারী ন থীএ॥ ৬৩ নং

চ. কাক তুই আমার অস্থি-পঞ্জর খুঁজিয়া খুঁজিয়া সকল মাংস খাইয়াছিস। আমার এই চোখ দু'টি তুই স্পর্শ করিবি না, কেননা এখনও আমি প্রিয়কে দেখিবার আশা রাখি।

কাগা করঙ্গ ঢঢোলিআ সগলা খাইআ মাসু।
এ দুই নৈনা মতি ছুহউ পির দেখন কী আসু॥ ৯১ নং

একদিন ফরীদ সমাধি হইতে জাগিয়া বলিয়া উঠিলেন : যে নয়ন ঈশ্বরের দিকে তাকায় না, তাহার অন্ধ হওয়াই ভালো ; যে রসনা তাঁহার নাম কীর্তন করে না তাহার মূক হওয়াই শ্রেয় ; যে কান তাঁহার স্তুতি শ্রবণ করে না তাহার বধির হওয়াই উচিত ; যে দেহ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হয় না তাহার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়।[১১]

পঞ্জাবে শেখ ইব্রাহীম ফরীদের বাণী বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া হিন্দু-শিখ-মুসলমান সকল শ্রেণীর মানুষের হৃদয় জয় করিয়াছে। ইব্রাহীম-প্রবর্তিত এই সুফী কাব্যের ধারা পঞ্জাবী

---

১১ তুলনীয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (মধ্যলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)—"বংশীনামামৃতধাম" ইত্যাদি অংশটি। ফরীদের আলোচ্য অংশটি *Macauliffe* রচিত *The Sikh Religion* (Vol. VI) পৃ. ৩৭৯ হইতে গৃহীত।

সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা। উত্তরকালে যে সমস্ত সুফী কবির কণ্ঠ এই ধারাটিকে সতেজ ও সরস রাখিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেবল দুই জনের বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতেছে। একজন লাল হুসৈন (১৫৩৯-১৫৯৩): অপর জন বুলেহ্ (বুল্লে) শাহ (১৬৮০-১৭৫৩)।

লাল হুসৈনের পিতামহ কুলজস সুফীধর্মে আকৃষ্ট হইয়া মুসলমান হইয়াছিলেন। উত্তরকালের সুফী কবিদের মধ্যে এইরূপ ধর্মান্তরিতের সংখ্যা একেবারে নগণ্য নয়। সুফীদের চিন্তাধারায় হিন্দু-মুসলমান ধর্ম-বিশ্বাসের যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা লক্ষ করা যায় তাহার অন্যান্য কারণের সহিত এই কারণটিও বিশেষভাবে স্মরণীয়। উর্দু কাব্যের ন্যায় পঞ্জাবী সুফী কাব্যেও প্রেমের ব্যাকুলতা বুঝাইবার জন্য আরবের লৈলা-মজনূ এবং পারস্যের শীরীঁ-ফরহাদের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে পঞ্জাবের নিজস্ব তিনটি প্রেম-কাহিনীর স্থান আরও গুরুত্বপূর্ণ। হীর-রাঁঝা, সস্‌সী-পুন্নূ এবং সোহনী-মহীবাল— পঞ্জাবের লোক-সাহিত্য হইতে গৃহীত এই তিনটি প্রেমিক-যুগলের বিরহ-বেদনা সুফী কাব্যে বিশেষ মাধুর্য সঞ্চার করিয়াছে। এই তিনের মধ্যে আবার হীর-রাঁঝাই সর্বাধিক জনপ্রিয়।

লাল হুসৈনের একটি বিরহ-পদে আছে— বন্ধু বিনা রাত্রিগুলি বড় হইল; মাংস ঝরিয়া ঝরিয়া দেহ আমার কঙ্কাল হইল; হাড়গুলি পরস্পরে ঠোকাঠুকি করিতেছে; ভালোবাসাকে লুকাইয়া রাখিলেও লুকানো যায় না বিশেষত যখন বিরহ তাহার তাঁবু গাড়িয়াছে; রাঁঝা যোগী, আমি তাহার যোগিনী; ভগবানের ফকীর হুসৈন বলিতেছে, আমি তোমার আঁচল ধরিয়াছি।[১২]

উল্লিখিত পদে কবি নিজেকে নায়িকা হীর রূপে কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন— রাঁঝা যোগী, আমি যোগিনী। নিম্নোদ্ধৃত পদে আছে সোহনী মহীবালের প্রসঙ্গ: বিরহ-বেদনার কাহিনী আমি কাহার কাছে বর্ণনা করিব? এই যন্ত্রণা আমাকে পাগল করিয়াছে, আমার চিন্তায় কেবল এই বিরহ। আমি কাহার কাছে সে কথা বলিব? বনে বনে আমি খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি, আজও মহীবালকে পাইলাম না। হায়, আমি কাহার কাছে সে কথা বলিব? ভগবানের ফকীর হুসৈন বলিতেছে, গরীবের দুর্গতি দেখ। আমি কাহার কাছে সে কথা বলিব?[১৩]

পঞ্জাবী সুফী কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন বুল্লেহ্ শাহ (১৬৮০-১৭৫৩)। কেহ কেহ তাঁহাকে পঞ্জাবের রূমী বলিয়া অভিহিত করেন। বুল্লেশা রূমীর সমকক্ষ কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু অন্য কোনো

১২ সজ্জন বিন রাতাঁ হোইআঁ বড্‌ডীআঁ।
মাস ঝড়েঝড় পিঞ্জর হোইআ। কনকন হোইআঁ হড্ডীআঁ॥
ইশ্‌ক্ ছপাইআঁ ছপদা নাহীঁ। বিরহোঁ তনাবাঁ গড্‌ডীআঁ॥
রাঁঝা জোগী মৈঁ জুগিআনী। কমলী কর কর সদ্দীআঁ॥
কহে হুসৈন ফকীর সাঁঈদা। দামন তেরে লগ্‌গীআঁ॥
— মোহন সিং সম্পাদিত "শাহ হুসৈন" (১৯৫২) পৃ. ২৩১।

১৩ দর্দ বিছোড়ে দা হাল নীঁ মৈঁ কৈনূঁ আখাঁ॥
সূলাঁ মার দীবানী কীতী বিরহুঁ পইআ সাডে খিয়াল॥ নীঁ মৈঁ··
জংগল জংগল ফিরাঁ ঢুণ্ডেঁদী অজেন মিলিআ মহীঁবাল॥ নীঁ মৈঁ··
কহে হুসৈন ফকীর সাঁঈদা বেখ নিমানিআঁ দা হাল॥ নীঁ মৈঁ··

স্থফী কবি যে তাঁহার ন্যায় খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই তাহা যে কেহ পঞ্জাবী 'কাওয়ালী' শোনার স্থযোগ লাভ করিয়াছেন তিনিই স্বীকার করিবেন।

হিন্দু-মুসলমানের যে সহজ যোগসাধনার পরিচয় পাওয়া যায় বাংলাদেশের বাউলদের মধ্যে, তাহার মূলে স্থফী ধর্মের প্রভাব আছে বলিলে অনুচিত হইবে না। বুল্লেশা'র রচনার একটা প্রধান স্থর হইতেছে হিন্দু-মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনা। একটি পদে কবি বলিয়াছেন: আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই; অভিমান ত্যাগ করিয়া আমি এই বসিলাম তিরঞ্জনে।[১৪] আমি স্থন্নী নই, সিয়া নই; আমি পূর্ণ শক্তি ও ঐক্যের পথ লইয়াছি। আমি ক্ষুধিতও নই, রাজাও নই; আমি হাসিও না, কাঁদিও না; আমার বাড়ি নাই, আবার আমি গৃহহীনও নই। আমি পাপী নই, ধার্মিক নই; পাপপুণ্যের পথ আমার জানা নাই। প্রত্যেক হৃদয়ে প্রেমিক বাস করেন, স্থতরাং আমি হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই ত্যাগ করিয়াছি।[১৫]

কৃষ্ণ-রাম মুহম্মদের মধ্য দিয়া যে একই শক্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে সেই প্রসঙ্গে বুল্লেশা'র একটি ক্ষুদ্র কাফী এইরূপ: বৃন্দাবনে তুমি গোরু চরাইয়াছ, লঙ্কায় তুমি জয়ধ্বনি তুলিয়াছ, মক্কায় তুমি আসিয়াছ হাজীরূপে। বাঃ, বিচিত্র তোমার রঙ্-রূপ! এখন তুমি কীভাবে নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়াছ?[১৬]

একটি কাফী-তে বুল্লে শা "জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে" কতকটা এই স্থরে সেই বিচিত্র-রূপীর পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন: আমি পাইয়াছি কিছু পাইয়াছি। আমার সদ্‌গুরু আমাকে অলক্ষে দেখাইয়াছেন। কোথাও সে শত্রু, কোথাও বা বন্ধু। কোথাও মজনূঁ, কোথাও লায়লা। কোথাও গুরু, কোথাও শিষ্য। সমস্ত বিষয়ে সে তাহার নিজের স্বরূপ দেখাইয়াছে। কোথাও সে মসজিদ, কোথাও সে ঠাকুরের দুয়ার (মন্দির)। কোথাও জপমালা-ধারী বৈরাগী, কোথাও শেখ-বেশী মুসলমান। কোথাও

১৪ তিরঞ্জন পঞ্জাবের গ্রাম্য জীবনের একটি প্রধান উৎসব— ইহাকে বলা যায় স্থতা-কাটার উৎসব। পঞ্জাবের লোক-সংগীতেও সুফীকাব্যে স্থতা-কাটা কাপড় বোনা প্রভৃতি প্রসঙ্গের উল্লেখ বারবার পাওয়া যায়।

১৫ হিন্দু না, নহীঁ মুসলমান বেহীএ তিরঞ্জন তজ অভমান।
স্থন্নী না, নহীঁ হম শীআ স্থল্‌হ কুলকা মারগ লিআ।
ভুখে না নহীঁ হম র জ নঙ্গে না নহীঁ হম কজে।
রোদে না নহীঁ হম হসদে উজড়ে না নহীঁ হম বসদে।
পাপী না স্থধর্মী না পাপপুণ কী রাহ ন জাঁ।
বুল্লাহ শাহ্ হরচিত লগে হিন্দু তুরুক দো জন তিআগে॥

১৬ বিন্দ্রাবন মেঁ গউ চরাবে,
লঙ্কা চড়কে নাদ বজাবে,
মক্কে দা বন্ হাজী আবে,
বাহ বাহ রংগ বটাঈ দা
হুন্ কী থীঁ আপ ছপাঈ দা॥

সে তুরুক-রূপে নমাজ পড়ে, কোথাও জপ করে ভক্ত হিন্দু-রূপে। কোথাও ঘরে ঘরে কবর খোলে, আবার শিশু-রূপে ভালোবাসা পায়।[১৭]

নায়িকা-ভাবে আবিষ্ট হইয়া বুল্লেশা যে কাফীগুলি রচনা করিয়াছেন বৈষ্ণব-রস-নিষ্ণাত বাঙালি পাঠক অবশ্যই তাহার মাধুর্য উপলব্ধি করিবেন। একটিপদ এইরূপ: আমার হৃদয় কাঁদে প্রেমিক-বন্ধুর জন্য। কোনো কোনো মেয়ে তাহার সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কথা বলে; কেহ কেহ বা তাহার সঙ্গে মিলিত হয় চোখের জলে। তাহাকে বলিও, এই প্রফুল্ল বসন্তকালে তাহার জন্য. আমার হৃদয় কাঁদে। আমি স্নান করিয়া বৃথাই বসিয়া আছি; বন্ধুর হৃদয়ে কী একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। আমার হার ও শৃঙ্গার রচনায় আগুন লাগাইব। হৃদয় কাঁদে বন্ধুর জন্য।··· ও বুল্লা, এখন বন্ধু তো ঘরে আসিয়াছে; আমি গাঢ় আলিঙ্গনে রাঁঝাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছি; আমার দুঃখকষ্ট সমুদ্রের ওপারে চলিয়া গিয়াছে (দূর হইয়াছে)।[১৮]

উল্লিখিত পদের শেষাংশে যে মিলনের কথা বলা হইয়াছে তাহা বোধ করি ভাবসম্মিলন। 'সুন্দরী রাধা অনুক্ষণ মাধবকে স্মরণ করিতে করিতে নিজেই মাধবে পরিণত হইল'— বৈষ্ণব পদাবলীর এই সুর ফুটিয়াছে নিম্নোদ্ধৃত কাফী-তে:

'রাঝা রাঝা' বলিতে বলিতে আমি নিজেই রাঁঝা হইয়া গেলাম। সুতরাং এখন তোমরা আমাকে 'ধীদো' (মহিস-পালক) বলিয়া ডাকিবে, কেহ আর 'হীর' বলিয়া ডাকিও না।[১৯] রাঁঝা আমার মধ্যে আছে, আমি রাঁঝার মধ্যে আছি। আর কোনো চিন্তা নাই। আমি আর নাই, সে-ই আছে। সে নিজেকে লইয়া নিজে আনন্দ করিতেছে। রাঁঝা রাঝা বলিতে বলিতে ইত্যাদি। হাতে আমার লাঠি,

---

১৭ পাইআ হৈ কিছু পাইআ হৈ। মেরে সতিগুরু অলখ লখাইআ হৈ॥
কহুঁ বৈর পড়া কহুঁ বেলী হৈ। কহুঁ মজনুঁ হৈ কহুঁ লৈলী হৈ॥
কহুঁ আপ গুরু কহুঁ চেলী হৈ। আপ আপ কা পন্থ্ বতাইআ হৈ॥
কহুঁ মহিজত কা বরতারা হৈ। কহু বনিআ ঠাকর দু আরা হৈ॥
কহুঁ বৈরাগী জপধারা হৈ। কহুঁ শেখন বণি বণি আইআ হৈ॥
কহুঁ তুরক মুসল্লা পড়তে হো। কহুঁ ভগত হিন্দু জপ করতে হো॥
কহুঁ ঘোড়ি ঘুংড়ে মো পড়তে হো। কহুঁ ঘরি ঘরি লাড লডাইআ হৈ॥

—মেহর সিং এণ্ড্ সন্স্ প্রকাশিত "কাফীআঁ বুলহে শা" (১৯৫৬) পৃ. ১-২

১৮ দিল লোচে মাহী ইয়ার্ নুঁ, দিল লোচে মাহী ইয়ার্ নু।
ইক হস্স হস্স গল্লাঁ কর দিআঁ
ইক রোদিআঁ ধোদি আঁ ফিরদিআঁ।
কহীও ফুল্লী বসন্ত বহার নুঁ দিল লোচে মাহী ইয়ার নুঁ।
মাঈ ন্হাতী ধোতী রৈহী গঈ, ইক গণ্ঢ্ মাহী দিল বৈহী গঈ।
ভাহ লাঈ এ হার শীঙ্গার নুঁ দিল লোচে মাহী ইয়ার নুঁ।
বুল্লাহ হুঁ সাজন ঘর আইআ, মৈঁ ছুট রাঁঝা গল লাইআ।
দুখ গএ সমুন্দরোঁ পার নুঁ দিল লোচে মাহী ইয়ার নুঁ॥

১৯ অভিজাত বংশের মেয়ে হীর। তাহার ভালোবাসার টানে রাঁঝা হীরের বাড়ীতে মহিষ-পালক রূপে নিযুক্ত হয়। পঞ্জাবী কবি ওয়ারিস্ শাহ -রচিত "হীর" কাব্যখানি পঞ্জাবী জনসাধারণ অতি আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করিয়া থাকে।

সামনে আমার গোধন, কাঁধে আমার ধূসর কম্বল। বুল্লাহ্, দেখ, শিয়ালবংশের (একটি উচ্চবংশের) মেয়ে হীর কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। রাঁঝা রাঁঝা বলিতে বলিতে ইত্যাদি।[২০]

আর-একটি পদে বুল্লেশা সেই হীর-রাঁঝার রূপকে ঈশ্বরের প্রতি যে কাতর আহ্বান জানাইয়াছেন তাহা একান্তই মর্মস্পর্শী— তুমি আমাকে তোমার প্রেমিকা বলিয়া মনে করো কি নাই করো, একবার আমার আঙিনায় এস। আমি তোমার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি; একবার তুমি আমার আঙিনায় এস। তোমার মতো আমার আর কেহ নাই; আমি তোমাকে সমস্ত বনে-প্রান্তরে খুঁজিয়াছি, সমস্ত পৃথিবীতে খুঁজিয়াছি। তুমি একবার আমার আঙিনায় এস। লোকে তোমাকে বলে মহিষপালক, তাহাদের মধ্যে আমি তোমাকে রাঁঝা বলিয়াই ডাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি আমার ধর্ম ও বিশ্বাস; একবার তুমি আমার আঙিনায় এস।[২১]

ভারতবর্ষে সুফীধর্ম পঞ্জাবে যতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে আর কোনো প্রদেশে ততটা করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। পঞ্জাবই বোধ করি ভারতবর্ষে সুফী সাধনার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। ইহার পল্লীতে পল্লীতে সুফী সাধকদের দরগা। মধ্যযুগ হইতে যখনই কোনো সাম্প্রদায়িক দুর্যোগ দেখা দিয়াছে, এই সাধকবৃন্দ তাঁহাদের ভাবধারা প্রচার করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানসিক উত্তেজনাকে প্রশমিত রাখার চেষ্টা করিয়াছেন। সুফী কবিদের গানের মধ্য দিয়া শান্তি-প্রেম-ঐক্যের বাণী গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে।

পঞ্জাবের যে বিশিষ্ট ধর্ম শিখধর্ম, তাহারও মূলে রহিয়াছে সুফী ধর্মের প্রভাব। গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮) একাধিকবার ভারত-পরিক্রমা করিয়া এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের নানা স্থান হইতে নানা সজ্জন-সংসর্গে প্রেরণালাভ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার ভক্তজীবনের মূল উৎস ছিল পঞ্জাবের সুফী সাধনা। বাবা ফরীদ (১১৭৩-১২৬৬) হইতে ইব্রাহীম ফরীদ (১৪৫০-১৫৫২) পর্যন্ত সুদীর্ঘ তিনশত

২০ রাঁঝা রাঁঝা করদী নী মৈঁ আপে রাঁঝা হোঈ।
সদ্দো নীঁ মৈঁনুঁ ধীদো রাঁঝা, হীর না আক্‌কো কোঈ॥
রাঁঝা মৈঁ বিচ মৈঁ রাঁঝে বিচ হর খিআল না কোঈ॥
মৈঁ নহীঁ বহ আপে হৈ অপনী আপ করে দিল জোঈ॥
রাঁঝা রাঁঝা করদী নী মৈঁ আপে রাঁঝা হোঈ॥
সদ্দো নীঁ মৈঁনুঁ ধীদো রাঁঝা, হীর না আক্‌কো কোঈ॥
হাত খূণ্ডী মোরে অগ্গে মঙ্গূঁ মোঢে ভুরা লোঈ,
বুল্লহা হীর সলেটী দেখো কিথে জা খবলোঈ॥
রাঁঝা রাঁঝা ইত্যাদি।

২১ ভাবেঁ জান না জনে রে বেহড়ে আবাড় মেরে।
মৈঁ তেরে কুরবান্ রে বেহড়ে আ বাড় মেরে।
তেরে জিহা মৈঁনুঁ হোর না কোঈ, ঢুঁড়াঁ জংগল বেলী রোহী।
ঢুঁড়াঁ তাঁ সারা জহাঁ রে বেহড়ে আ বাড় মেরে।
লোকাঁ দে ভাণে চাক মহী দা রাঁঝা লোকাঁ বিচ কহী দা।
সাদা তাঁ দীন ইমান রে বেহড়ে আ বাড় মেরে॥

বৎসরের সুফীসাধনা সাধারণভাবে পঞ্জাবের জনজীবনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। নানক এক দিকে যেমন সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, অন্য দিকে তেমনি তিনি কবীর (১৩৯৯-১৫১৮), ফরীদ প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িকদের নিকট-সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। কবীরদাস ইব্রাহীম ফরীদের ন্যায় বিশুদ্ধ সুফী সাধক না হইলেও কবীরপন্থ রচনায় দক্ষিণের বৈষ্ণবধর্ম ও পূর্বাঞ্চলের নাথধর্মের সহিত পশ্চিমের সুফী ধর্মেরও সমাবেশ ঘটিয়াছিল। গুরু নানক কবীরদাসের মন্ত্রশিষ্য না হইলেও তাঁহার অনুগামী। বস্তুত পঞ্জাবে কবীরদাসের নির্গুণ উপাসনার ধারা প্রচার করিতে করিতে নানক শিখ-সম্প্রদায়ের আদি গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

নানক (১৪৬৯-১৫৩৮) হইতে গোবিন্দ সিংহ (১৬৬৬-১৭০৭) পর্যন্ত দুই শত বৎসর ব্যক্তি-গুরু পরম্পরা চলিবার পর শিখদের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেব-ই তাহাদের গুরুস্থানীয় হইল। ইহাই তাহাদের 'আদি-গ্রন্থ' বা 'গুরু গ্রন্থসাহেব'। পঞ্চম গুরু অর্জুনদেব (১৫৬৩-১৬০৬) তাঁহার তিরোধানের দুই বৎসর পূর্বে এই মহান্ সংগ্রহ-গ্রন্থের সংকলন সম্পূর্ণ করিয়া যান। আদিগুরু বাবা নানক হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস এবং অর্জুন এই পঞ্চগুরুর রচনা ও বাণী ইহাতে সংকলিত হয়। পরবর্তীকালে নবম গুরু তেগবহাদুরের রচনাও ইহাতে স্থান লাভ করে। মধ্যবর্তী তিনগুরু হরিগোবিন্দ, হরিরায় এবং হরিকৃষণ কিছু রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না; কারণ তাঁহাদের নামে স্বতন্ত্র পুস্তকও নাই, আবার গ্রন্থসাহেবেও কোনো রচনা সংকলিত হয় নাই। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৬৬-১৭০৭) তাঁহার সংগ্রামপূর্ণ স্বল্প আয়ুর মধ্যে যাহা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার পরিমাণ কম নয়। যিনি বিশ্বাস করিতেন অস্ত্র-সাহায্য ব্যতীত অত্যাচারীর জুলুম বন্ধ করা যায় না, তিনিই যে আবার নানাভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও দার্শনিক, ভক্ত ও কবি ছিলেন ইহা সত্যই বিস্ময়কর। কিন্তু গোবিন্দ সিংহের কোনো রচনাও গ্রন্থসাহেবের অন্তর্ভুক্ত নাই। এইরূপে দেখা গেল, নামদেব, কবীর, রৈদাস, ফরীদ প্রভৃতি সাধকদের রচনা ছাড়া মোট ছয়জন গুরুর বাণী গ্রন্থসাহেবে সংকলিত হইয়াছে।

গুরুবাণী সমূহের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার প্রত্যেক পদেই নানকের ভণিতা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং হাজার হাজার পদের মধ্যে কোন্ রচনাটি কাহার তাহা ধরিবার উপায় নাই। নানকের অনুগামীদের বিশ্বাস, পরবর্তী সমস্ত গুরুর মধ্যেই নানকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। বিভিন্ন গুরুরূপে নানকই সমস্ত পদের রচয়িতা। তবে লৌকিক ব্যবহারের সুবিধার জন্য গ্রন্থসাহেবের গুরু-বাণী সমূহ মহলা ১, মহলা ২ ইত্যাকার রূপে সাজাইবার ফলে কাহার কোন রচনা চিনিয়া লওয়া যায়। সমগ্র গুরু-বাণী লইয়া যেন একটি নগরী, তাহার ছয়টি মহলা। নানকের বাণী লইয়া মহলা ১; অঙ্গদের বাণী লইয়া মহলা ২; এইরূপে অর্জুনদেব পর্যন্ত পাঁচ মহলা। নবম গুরু তেগবহাদুরের বাণী লইয়া মহলা ৯। এইরূপে গুরুপরম্পরা অনুযায়ী মহলার সংখ্যা চিহ্নিত হইয়াছে।

মূল গ্রন্থের পদবিন্যাসে গুরুদের আবির্ভাবের কালক্রম অপেক্ষা পদের রাগের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। সিরী (শ্রী) রাগ, বিহাগড়া রাগ, ধনাসরী, টোডী, বিলাবল, রামকেলী, কেদারা, ভৈরউ, মলার, কানড়া প্রভৃতি ৩১টি রাগের নামানুসারে পদগুলি সাজানো। কেবল গুরু নানক রচিত জপুজী, সোদরু, সুনিবড্ডা ও সোহিলা— এই ক'টি রচনাকে গ্রন্থের প্রথমে বসানো হইয়াছে।

গুরু-বাণীর ভাষা অনুধাবন করিলে দেখা যায় প্রথম তিন গুরু নানক-অঙ্গদ-অমরদাসের রচনা মোটামুটি

পঞ্জাবী ভাষা প্রধান। চতুর্থ ও পঞ্চম গুরু রামদাস ও অর্জুনের ভাষায় হিন্দীর (ব্রজভাষার) প্রভাব পড়িয়াছে। নবম গুরু তেগবহাদুরের রচনায় এই প্রভাব আরও বেশি। হিন্দীর বিভিন্ন পদসংগ্রহে সাধারণত নানকের নামে যে-সকল পদের প্রচলন আছে তাহার অনেকগুলি তেগবহাদুরের রচনা।

গ্রন্থসাহেবের সর্বপ্রথমে প্রদত্ত ৩৮টি পদবিশিষ্ট 'জপুজী'ই গুরু নানকের শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া বিবেচিত হয়। ধর্মপ্রাণ শিখের পক্ষে নিত্য প্রভাতে 'জপুজী' পাঠ একটি অবশ্যকর্তব্য কর্ম। হিন্দুর চোখে গীতা, বৌদ্ধের চোখে ধম্মপদ সেইরূপ, শিখদের চোখে জপুজীর মর্যাদা ঠিক সেইরূপ। ১৭নং পদে গুরুজী ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন— অসংখ্য তোমার মন্ত্রজপ ও ভক্তিভাব। কত লোক কত ভাবে তোমার পূজা-অর্চনা ও তপস্যা-সাধনা করিতেছে। কত বেদাদি মুখ্য গ্রন্থ পাঠ হইতেছে। অসংখ্য যোগী তোমার দিকে উদাসমনে চাহিয়া থাকে। অসংখ্য ভক্ত তোমার জ্ঞান গুণ বিচার করে। পৃথিবীতে কত তোমার সত্য সেবক, কত দাতা। অসংখ্য শূর তোমার নাম গ্রহণ করে। অসংখ্য মুনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া তোমার দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। আমার এমনকি কুদরৎ (শক্তি) আছে যে তোমার বিচার করি। আমি একবারও তোমার কাছে সমর্পণ করিতে পারি নাই (এতই ছোট আমি)। হে নিরাকার, তুমি যাহা করো সবই ভালোর জন্য, তোমার মধ্যে অমঙ্গল নাই।[২২]

ঈশ্বরের নাম-মহিমা এবং সদ্‌গুরুর কৃপালাভ সন্তসাহিত্যের একটি প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। গুরু নানকের নিম্নোদ্ধৃত পদে তাহার কিছুটা পরিচয় মিলিবে।— যজ্ঞ হোম পুণ্য তপস্যা পূজা ইত্যাদি করিয়া মানুষ নিত্য দেহকে কষ্ট দেয়। ঈশ্বরের নাম ব্যতীত মুক্তি পাইবে না ; গুরু-উপদেশের পথে প্রভুর নাম লইলেই মুক্তি পাওয়া যায়। যে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে না এই পৃথিবীতে বৃথাই তাহার জন্ম। বিষ (ইন্দ্রিয় বিষয়) খাওয়া, বিষ-কথা বলা ; নাম ব্যতীত নিষ্ফল এই মৃত্যু ও ভ্রমণ (জন্ম-জন্মান্তর লাভ)। বই-পড়া, ব্যাকরণ-আলোচনা, ত্রিকালে (সকালে মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায়) সন্ধ্যা-বন্দনা করা বৃথা। হে প্রাণী, গুরুউপদেশ বিনা মুক্তি কোথায় ? প্রভুর নাম ব্যতীত মানুষ জড়াইয়া মরে। দণ্ড-কমণ্ডলু-শিখা-সূত্র-ধুতি-তীর্থ-গমন-ভ্রমণেও কিছু হয় না, রাম নাম ব্যতীত শান্তি আসে না। যে বার বার হরিনাম জপ করে সে পারে যায়।[২৩]

---

২২ অসংখ জপ অসংখ ভাউ। অসংখ পূজা অসংখ তপ তাউ ॥
অসংখ গরন্থ মুখি বেদপাঠ। অসংখ জোগ মনি রহহি উদাস ॥
অসংখ ভগতগুণ গিআন বীচার। অসংখ সতী অসংখ দাতার ॥
অসংখ সূর মুহ ভখ সার। অসংখ মোনি লিবলাই তার ॥
কুদরতি কবণ কহা বাচারু। বারিআন জাবা একবার ॥
জো তুধু ভাবৈ সাঈ ভলী কার। তূ সদা সলামতি নিরংকার ॥
—গ্রন্থসাহেব পৃ. ৩-৪

২৩ জগন হোম পুংন তপ পুজা দেহ দুখী নিত দুখ সহৈ।
রাম নাম বিনু মুকতি ন পাবসি মুকতি নামি গুরমুখি লহৈ ॥
রাম নাম বিনু বিরথে জগি জনমা।
বিখু খাবৈ বিখু বোলী বোলৈ বিনু না বৈ নিহফল মরি ভ্রমণা ॥
পুস্তক পাঠ বিআকরণ বখানৈ সংধিআ করম তিকাল করৈ।
বিনু গুর সবদ মুকতি কহা প্রাণী রাম নামে বিনু উরঝি মরৈ।
ডণ্ড কমণ্ডল সিখা সূতু ধোতী তীরথি গবনু অতি ভ্রমণু করৈ ॥
রাম নাম বিনু সাংতি ন আবৈ জপি হরি হরি নামু সু পারি পরৈ ॥
—গ্রন্থসাহেব পৃ. ১১২৭ (রাগু ভৈরউ)

নায়িকাভাবে ভাবিত হইয়া গুরু নানক যে সমস্ত পদ রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্য হইতে মাত্র দুইটি পদ বাছিয়া লইয়া আমরা তাঁহার কবি-প্রকৃতির পরিচয় লইব। প্রথম পদে সেই পরিচিত সুর—"বর আসিয়াছে, সখি তোমরা মঙ্গলগীত গাও।" নানক বলিতেছেন—যখন বর কৃপা করিয়া আমার গৃহে আসিল, সখীরা মিলিয়া কাজ (বিবাহের আয়োজন) আরম্ভ করিল। সেই খেলা দেখিয়া আমার মনে খুব আনন্দ হইল। সে আসিয়াছে আমাকে বিবাহ করিতে। ওলো তোরা গা, বিবেক বিচার করিয়া মঙ্গলগীত গা। জগজ্জীবন আজ আমার ঘরে আসিয়াছে ভর্তারূপে। যেহেতু গুরু দ্বারা আমার বিবাহ হইয়াছে, তাই যখনই সে আসিয়া মিলিত হইল, আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম। নানক বলে, সে একাই সকলের প্রিয়পতি। যাহার উপর সে সুনজর করে সে-ই সোহাগিনী হয়।[২৪]

আধুনিক কবি যে বেদনা বুকে লইয়া গাহিয়াছেন,

সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনি ॥

নানকের নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে আমরা কতকটা সেই ভাবেরই আভাস পাই। কবির নৈরাশ্য-বেদনা অনুতাপ এখানে মর্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য শৃঙ্গার রসের আতিশয্যে পদটির শেষ কয়েকটি ছত্র রুচিমান পাঠকের নিকট কিঞ্চিৎ পীড়াদায়ক বোধ হইতে পারে। কবি এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন: এই কলুষিত দেহ ধুইবার মতো কোনও গুণই আমার নাই। আমার স্বামী জাগে, আর আমি সারানিশি ঘুমাই। এইভাবে আমি কিরূপে কান্তের প্রিয় হইব? স্বামী জাগে, আমি সারা নিশি ঘুমাই। যদি পিপাসা লইয়া তাহার শয্যায় আসি তাহাকে খুশি করিতে পারিব কিনা জানি না। মা, কী হইবে কেমন করিয়া জানিব? হরিকে না দেখিয়া থাকা যায় না। প্রেম আস্বাদন করি নাই, আমার তৃষ্ণাও মিটিল না। আমার যৌবন চলিয়া গিয়াছে, এখন সেই হারানো ধনের জন্য অনুতাপ করি। আজও আমি আশাহীন অন্তরে পিপাসা লইয়া জাগি। কামিনী যদি অহঙ্কার ছাড়িয়া শৃঙ্গার করে তবেই ভর্তা

২৪ করি কিরপা অপনৈ ঘরি আইআ।
তা মিলি সখীআ কাজু রচাইআ ॥
খেলু দেখি মনি অনদু ভইআ।
সহু বীআহণ আইআ ॥
গাবহু গাবহু কামনী বিবেক বীচারু।
হমরৈ ঘরি আইআ জগজীবণু ভতারু ॥
গুরূ-দুআরৈ হমরা বীআহু জি হোআ।
জাঁ সহু মিলিআ তাঁ জানিআ ॥
ভনতি নানকু সভনা কা পিরু একো সোই।
জিস নো নদরি করে সা সোহাগণি হোই ॥

—গ্রন্থসাহেব পৃ. ৩৫১ (রাগু আসা)

থাকিবে। তখন সে স্বামীর মন খুশি করিতে পারিবে। বড়াই ছাড়িয়া নিজের পতির মধ্যে মিশিয়া যাইবে।[২৫]

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিশ্ববিধাতার যে মহান উপলব্ধি রবীন্দ্র-কাব্যের একাংশে অপরিমেয় গৌরব সঞ্চার করিয়াছে, গুরু নানকের এক-আধটি পদে তাহার আভাস পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার সেই সুবিখ্যাত পদটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই যেখানে কবি পুলকিত বিস্ময়ে বলিয়াছেন : হে ভবখণ্ডন, হে জন্ম-মরণের মুক্তিদাতা, এ তোমার কী অদ্ভুত আরতি! এই গগন-মণ্ডল থালা; সূর্যচন্দ্র তাহার দুইটি বাতি; তাহার সঙ্গে জড়াইয়া আছে মোতীর মালা— অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডলের মালা। মলয়ানিল তোমার ধূপ; পবন তোমার চামর; হে জ্যোতি-স্বরূপ, সমগ্র বনরাজি তোমার ফুল। আর ঐ যে বাজিতেছে অনাহত শব্দের ভেরী। সহস্র তোমার নয়ন, তবু তুমি নয়নহীন; সহস্র তোমার মূর্তি, তবু তুমি মূর্তি বিহীন; সহস্র-চরণ হইয়াও তুমি চরণহীন; সহস্র নাসিকা, তবু তোমার গন্ধ-শক্তি নাই। আমি তোমার এই লীলায় মুগ্ধ। সকলেই তোমার জ্যোতি হইতে জ্যোতি পাইতেছে। তোমার প্রকাশেই সকল প্রকাশিত। গুরু-উপদেশে সেই জ্যোতি প্রকট হয়। যাহা তোমার ভালো লাগে, সেই তোমার আরতি। হরি, তোমার চরণকমলের মকরন্দলুব্ধ আমার মন; প্রতিদিন আমার সেই মধুপানের আকাঙ্ক্ষা। এই নানক-চাতককে তোমার কৃপাজল দাও যাহাতে সে তোমার নামেই লীন হইয়া যাইতে পারে।[২৬]

২৫ এক ন ভরীআ গুণ করি ধোবা। মেরা সহু জাগৈ হউ নিসি ভরি সোবা॥
ইউ কিউ কংত পিআরী হোবা। সহু জাগৈ হউ নিসি ভরি সোবা॥
আস পিআসী সেজৈ আবা। আগৈ সহ ভাবা কিন ভাবা॥
কিআজানা কিআ হোইগা রী মাঈ। হরিদরসন বিনু রহনু ন জাঈ॥
প্রেমু ন চাখিআ মেরী তিস ন বুঝানী। গইআ সু জোবনু ধন পছুতানী॥
অজৈ সু জাগউ আস পিআসী। ভঈলে উদাসী রহউ নিরাসী॥
হউ মৈ খোই করে সীগারু। তউ কামণি রবৈ ভতারু॥
তউ নানক কংতৈ মনি ভাবৈ। ছোডি বড়াই অপণে খসম সমাবৈ॥

—গ্রন্থসাহেব পৃ. ৩৫৬-৩৫৭ (রাগু আসা)

২৬ গগন মৈ থালু রবি চন্দু দীপক বনে। তারিকামণ্ডল জনক মোতী॥
ধূপু মলআনলো পবণু চবরো করে। সগল বনরাই ফূলংত জোতী॥
কৈসী আরতী হোই ভবখংডনা তেরী আরতী। অনহতা সবদ বাজংত ভেরী॥
সহস তব নৈন নন নৈন হৈ। তো হি কউ সহস মূরতি ননা এক তোহী॥
সহস পদ বিমল নন একপদ। গন্ধবিনু সহস তব গন্ধ ইব চলত মোহী॥
সভ মহি জোতি জোতি হৈ সোই। তিসকৈ চাণনি সভ মহি চানণু হোই॥
গুরসাখা জোতি পরগটু হোই। জো তিসু ভাবৈ সু আরতী হোই॥
হরি চরণ কমল মকরন্দ লোভিত মনো। অন দিনো মোহি আহী পিআসা॥
কৃপাজলু দেহি নানক সারিংগ কউ। হোই জাতে তেরৈ নামি বাসা॥

—গ্রন্থসাহেব পৃ. ৬৬৩ (রাগু ধনা সরী)

নানকের উপরি-উদ্ধৃত পদটির কিয়দংশ রবীন্দ্রনাথের হাতে অনূদিত হইয়া অসামান্য মর্যাদা লাভ করিয়াছে। অনূদিত অংশটুকু এই—

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে ॥
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে ॥
কেমন আরতি হে ভব খণ্ডন, তব আরতি—
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে ॥

—গীতবিতান (১৯৬০ মে) পৃ ৮২৩

দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ (১৫০৫-১৫৫২) রচনা করিয়াছেন সামান্যই। তাঁহার জীবনের প্রধান আনন্দ ছিল গুরু নানকের সেবা ও তাঁহার বাণীর রসাস্বাদন। ইনিই সর্বপ্রথম নানকের বিক্ষিপ্ত রচনাসমূহ সংগ্রহ করিয়া গুরুমুখী লিপিতে আবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। কেহ কেহ গুরু অঙ্গদকেই গুরুমুখী লিপির আবিষ্কর্তা ও প্রচারক মনে করেন। "সন্তসুধাসার" হইতে অঙ্গদের দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল—

ক. সুখে তুই যাহার নাম স্মরণ করিস, দুঃখেও তাহার নাম স্মরণ কর। হে সেয়ানা মেয়ে, এইভাবেই স্বামীর সঙ্গে তোর মিলন হইবে।

খ. যে শির প্রভুর সামনে নত হয় না, তাহা কাটিয়া ফেলিয়া দে। যে শরীরে বিরহের বেদনা নাই, সেই দেহকে জ্বালাইয়া দে।[২৭]

তৃতীয় গুরু অমরদাস (১৫০৯-১৫৭৪)-রচিত পদাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রচনা তাঁহার ৪০টি পদ-বিশিষ্ট "আনন্দু"। ইহা আজ পর্যন্ত সিখদের বিবাহ প্রভৃতি প্রতিটি আনন্দ-উৎসবে গীত হয়। "আনংদু"র দ্বিতীয় শ্লোকটি এই—

হে আমার মন, তুই সর্বদা ভগবানের সঙ্গে থাক। সর্বদা ভগবানের সঙ্গে থাকিলে সে তোর দুঃখ ভুলাইয়া দিবে। সে তোমাকে অঙ্গীকার করিয়া তোমার সকল কাজের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। ভগবান সর্বশক্তিশালী। কেন, মন, তাহাকে ভুলিবি ?[২৮]

এই ভগবৎ-নির্ভরতা "আনন্দু" পদগুচ্ছের বিশিষ্ট সুর। দশম পদেও দেখিতে পাই কবি নিজের চঞ্চল মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন : হে চঞ্চল মন চালাকি দ্বারা কেহ ভগবানকে পায় নাই। হে

---

২৭ জা সুখু তা সহু রাবিও দুখি ভী সংম্ হালিওই।
নানকু কহৈ সিআনী এ ইউ কংত মিলাবা হোই॥ (পৃ. ২৭৪)
জো সিরু সাঁঈ না নিবৈ সো সিরু দীজৈ ডারি।
নানক জিস্‌ পিংজর মহি বিরহ নহীঁ সো পিংজর লৈ জারি॥ (পৃ. ২৭৭)

২৮ এ মন মেরিআ তু সদা রহু হরি নালে॥
হরি নালি রহু তু মঁন মেরে দুখ সভি বিসারণা॥
অংগীকারু ওহু করে তেরা কারজ সভি সবারণা॥
সভনা গলা সমরথু সুআমী সো কিউ মনহু বিসারে॥
কহৈ নানকু মঁন মেরে সদা রহু হরি নালে॥

আমার মন, তুই শোন। এই মায়া মোহিনী—যে মায়া মানুষকে ভুলাইয়া ভ্রান্ত পথে লইয়া যায়। যিনি ঠগডলী অর্থাৎ এই সৃষ্টির ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়াছেন, তিনিই মায়াকে মোহিনী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি বিটহু অর্থাৎ মরণশীল প্রাণীদের কাছে সাংসারিক মোহকে এত মধুর করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, আমি তাঁহার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করিলাম। হে চঞ্চল মন, চালাকি দ্বারা কেহ ভগবানকে পায় নাই।[২৯]

নায়িকা-রূপে ভগবৎ-আরাধনা সূফী এবং বৈষ্ণব ভক্ত কবিদের একটি অতি প্রিয় প্রসঙ্গ। একটি পদে অমরদাস দুষ্টা ও শিষ্টা নারীর রূপকে ঈশ্বরোপাসনার কথা বলিয়াছেন এইভাবে: মনমুখী মানুষ কেবল মিথ্যার বেসাতি করে, স্বামীর মহল পর্যন্ত কখনও পৌঁছয় না। জগৎ-প্রপঞ্চে লগ্ন হইয়া ভ্রমে ভুলিয়া থাকে, মমতায় বদ্ধ হইয়া আসা-যাওয়া করে। দুষ্টা নারীর শৃঙ্গার দেখ। তাহার চিত্ত লাগিয়া আছে পুত্রে, পুত্রবধূতে, ধনে ও মায়ায়; আর লাগিয়া আছে মিথ্যায়, মোহে, শঠতায় ও বিকারে। সে-ই তো সোহাগিনী রমণী যে সর্বদা প্রভুর প্রিয়। গুরুর উপদেশে সে শৃঙ্গার করে। তাহার শয্যা সুখের এবং প্রতিদিন সে প্রিয় হরির সঙ্গে মিলিত হইয়া সুখ লাভ করে। সেই প্রকৃত সৌভাগ্যবতী নারী, যে তাহার প্রকৃত স্বামীকে ভালোবাসে। সে নিজের প্রিয়কে সর্বদাই বক্ষে ধরিয়া রাখে। সে তাহাকে নিজের কাছে সর্বদাই দেখে। আমার প্রভু সর্ব-ব্যাপী। জাতি ও সৌন্দর্য কাহারও সঙ্গে পরলোকে যাইবে না। যে যেরূপ কাজ করে, সে সেইরূপ ফল পায়। সদ্‌গুরুর উপদেশে মানুষ উচ্চ হইতে উচ্চতর হয় এবং সত্যরূপ পরমাত্মায় লীন হয়।[৩০]

২৯ এ মন চংচলা চতুরাঈ কি নৈ ন পাঈআ ॥
চতুরাঈ ন পাঈআ কিনৈ তূ সুণি মঁন মেরিআ ॥
এহ মাইআ মোহনী জিনি এতু ভরমি ভুলাঈআ ॥
মাইআ ত মোহনী তিনৈ কীতী জিনি ঠগডলী পাঈআ ॥
কুরবাণু কীতা তিসৈ বিটহু জিনি মোহ মীঠা লাঈআ ॥
কহৈ নানকু মন চংচল চতুরাঈ কিনৈ ন পাঈআ ॥

৩০ মন মুখি ঝূঠো ঝূঠু কমাবৈ। খসমৈ কা মহলু কদে ন পাবৈ ॥
দূজৈ লাগী ভরমি ভুলাবৈ। মমতা বাধা আবৈ জাবৈ ॥
দোহাগনী কামণি দেখু সী গারু ॥
পুত্র কলতি ধনি মাইআ চিতুলাএ ঝূঠু মোহু পাখংড বীকারু ॥
সদা সোহাগনি জো প্রভ ভাবৈ। গুর সবদী সীগারু বণা বৈ ॥
সেজ সুখালী অনদিনু হরি রাবৈ। মিলি প্রীতম সদা সুখু পাবৈ ॥
সা সোহাগণি সাচি জিসু সাচী পিআরু।
আপন পিরু রাখৈ সদা উর ধারি ॥
নেড়ৈ বেখৈ সদা হদুরি। মেরা প্রভু সরব রহিআ ভরপুরি ॥
আগৈ জাতি রূপুন জাই। তেহা হোবৈ জেহে করম কমাই ॥
সবদে উচো উচা হোই। নানক সাচি সমাবৈ সোই ॥ —সন্তসুধাসার, পৃ. ৩০৯-৩১০।

চতুর্থ গুরু রামদাস (১৫৩৪-১৫৮১) শিখদের প্রধান তীর্থ অমৃতসরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার একটি পদে মোহাচ্ছন্ন ভক্তের যে বিলাপ ধ্বনিত হইয়াছে তাহাতে "দৈন্য নির্বেদ বিষাদে"র সুন্দর অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। গুরুজী বলিতেছেন: হৃদয় চায় কাঞ্চন ও নারী; মায়া মোহ তাহার কাছে বড়ই মধুর লাগে। গৃহ, প্রাসাদ, ঘোড়া এবং অন্যান্য রসে সে আনন্দ পায়। ভগবান্, তোমাকে আমি স্মরণ করি না, আমি কিরূপে রক্ষা পাইব? হে রাম, ইহাই আমার নীচ কর্ম। হে গুণবান দয়ালু হরি, কৃপা করিয়া আমার সকল দোষ ক্ষমা কর। আমার রূপ নাই, জাতি নাই, রীতি-নীতি কিছুই নাই। গুণহীন আমি তোমার নাম জপি নাই, কোন্ মুখে আমি তোমাকে বলিব? আমি পাপী; আমি যে আবার গুরু দ্বারা রক্ষা পাইব ইহা সদ্‌গুরুর দয়া। ভগবান মানুষকে দিয়াছেন প্রাণ, শরীর, মুখ, নাক ও ব্যবহার্য জল। আর দিয়াছেন খাইবার শস্য, পরিবার কাপড় এবং উপভোগের রস। কিন্তু যিনি দিয়াছেন, তাঁহার কথা স্মরণ করি না; ভিতরের পশুটা ভাবে সে নিজেই করে। হে অন্তর্যামী, তুমি সমস্ত সৃষ্টি করিয়া সেই সমস্ত ব্যাপিয়া আছ। আমরা জন্তু কী বিচার করিতে পারি? হে প্রভু, এই সব তোমারই খেলা। হাটে-কেনা নানক তোমার গোলামের গোলাম—দাসানুদাস।[৩১]

রামদাসের পুত্র এবং অমর দাসের দৌহিত্র পঞ্চম গুরু অর্জন (অর্জুনদেব) (১৫৬৩-১৬০৬) বাল্যকালেই এমন তীক্ষ্ণ মেধা ও সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, যাহা দেখিয়া অমরদাস এইরূপ উক্তি করেন বলিয়া জানা যায়—"আমার এই দৌহিত্র বহু লোককে পার করিয়া দিবে"—ইয়ে মেরা দোহিত পানী কা বোহিত হোগা। উত্তরকালে জহাঙ্গীরের কারাগারে অমানুষিক নির্যাতনের সম্মুখীন হইয়া গুরু অর্জুন বলিয়াছিলেন—"আমার ভ্রমের ডিম ভাঙিয়া গেল, মন আলোকিত হইল, গুরু আমার পায়ের বেড়ি কাটিয়া দিয়া বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিলেন।"

---

৩১ কংচন নারী মহি জীউ লুভতু হৈ মোহু মীঠা মাইআ ॥
ঘর মন্দর ঘোড়ে খুশী মনু অন রসি লাইআ ॥
হরি প্রভু চিতি ন আবঈ কিউ ছুটা মেরে হরি রাইআ ॥
মেরে রাম ইহ নীচ করম হরি মেরে ॥
গুণবংতা হরি, হরি দই আলু করি কিরপা বখসি অবগণ সভি মেরে ॥
কিছু রূপু নহী কিছু জাতি নাহী কিছু ঢংগু ন মেরা ॥
কিআ মুহু লৈ বোলহ গুণবিহূণ নামু জপিআ ন তেরা ॥
হম পাপী সংগি গুর উবরে পুনু সতিগুরু কেরা ॥
সভু জীউ পিংডু মুখু নকু দীআ বরতন কউ পাণী ॥
অংনু খাণা কপড়ু পৈনণু দীআ রস অনি ভোগাণী ॥
জিনি দীএ সু চিতি ন আবঈ পসূ হউ করি জানী ॥
সভু কী তা তেরা বরতদা তু অন্তরজামী ॥
হম জংত বিচারে কিআ করহ সভু খেলু তুম সুআমী ॥
জন নানকু হাটি বিহাঝিআ হরি গুলম গোলামী ॥

—গ্রন্থসাহেব পৃ. ১৬৭

ফ়ুটো অংডা ভরম কা, মনহি ভইঊ পয়গাস।
কাটী বেড়ী পগহ্‌ তে, গুরু কী নী বন্ধ খলাস॥

গুরু অর্জুনের প্রসিদ্ধ রচনা "সুখমনী"। ধর্ম-প্রাণ শিখগণ নিত্য প্রভাতে গুরু নানকের "জপুজী" আবৃত্তির পরে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন। অর্জুনের শ্রেষ্ঠ কাজ হইল গ্রন্থসাহেবের সংকলন ও সম্পাদন। একটি পদে তিনি সাধারণ মানুষের মূঢ়তা ও সদ্‌গুরুর মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন: মানুষ যদিও এই পৃথিবীতে ক্ষণকালের অতিথি, তবুও সে তাহার কাজ গুছাইয়া লইবার চেষ্টা করে। কামের মধ্যে ডুবিয়া আছে, মূর্খ জানে না যে, সে ক্ষণকালের অতিথি। চলিয়া যাইবার কালে তাহার অনুতাপ জন্মে এবং তখন সে যমের কবলে পতিত হয়। ওরে অন্ধ, তুই যে বসিয়া আছিস ক্ষয়-হওয়া নদীর তীরে। ইহাই যদি তোর পূর্ব-লিখন হইয়া থাকে তবে গুরু-বচন অনুসারে কাজ কর। মালিক কাঁচা, আধ-পাকা অথবা পাকা শস্য সংগ্রহ করিতে পারে। কৃষকেরা আয়োজন করিয়া মাঠে আসিয়া উপস্থিত হয়। হুকুম হইলেই তাহারা জমি মাপিয়া ফসল কাটিয়া লয়। প্রথম প্রহর কাটিল কাজেকর্মে, দ্বিতীয় প্রহর কাটিল নিদ্রায়, তৃতীয় প্রহর বাক্‌ বিতণ্ডায়, চতুর্থ প্রহরে ভোর। যিনি এই দেহ ও প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহার কথা কখনও মনে আসে না। যে সাধু-সংসর্গে আমি জ্ঞান লাভ করিয়াছি এবং সর্বজ্ঞ পুরুষকে পাইয়াছি তাঁহাদের চরণেই আমি প্রাণ মন সমর্পণ করিলাম।[৩২]

অর্জুনের পরবর্তী তিনগুরুর রচনার নিদর্শন কিছু নাই। নবম গুরু তেগবহাদুর (১৬২২-১৬৭৫) যাহা রচনা করিয়াছিলেন পরবর্তীকালে গ্রন্থসাহেবে সংকলিত হইয়া তাহা 'মহলা ৯' এইরূপে চিহ্নিত হইয়াছে। যাঁহার অভাবনীয় আত্মত্যাগ শিখদের মধ্যে এক অভিনব প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিল, তিনি যে ব্যক্তিগত জীবনে প্রকৃত ভক্তের মনোভাব পোষণ করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। আমরা তাঁহার যে

৩২ ঘড়ী মুহতকা পাহুণা কাজ সবারণ হারু॥
মাইআ কামি বিআপিআ সমঝৈ নাহী গবারু॥
উঠি চলিআ পছুতাইআ পরিআ বসি জন্দার॥
অংধে তূঁ বৈঠা কংধী পাহি॥
জে হোবী পুরবি লিখিয়া তা গুর কা বচুন কমাহি॥
হরী নাহী নহ উডুরী পকী বঢণ হার।
লৈ লৈ দাত পহুতিআ লাবেঁ করি তঈআরু॥
জা হোআ হুকমু কিরিসাণ দা তা লুণি মিণিআ খেতারু॥
পহিলা পহরা ধংধৈ গইআ দুজৈ ভরি সোইআ॥
তী জৈ ঝাখ ঝখাইআ চউথৈ ভোরু ভইআ॥
কদ হী চিতি ন আইও জিনি জীউ পিংডু দীআ॥
সাধসংগতি কউ বারিআ জীউ কীআ কুরবাণু॥
জিস তে সোঝী মনি পঈ মিলিআ পুরখু সুজাণু॥

—গ্রন্থসাহেব, পৃ. ৪৩

দুইটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহার প্রথমটিতে আছে প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ-নির্ণয়, এবং দ্বিতীয় পদটিতে দেখিতে পাই অনুতাপ-দগ্ধ ভক্তচিত্তের সকরুণ আর্তনাদ। প্রথম পদটি এইরূপ—

সাধু, তোমার মনের অহঙ্কার ত্যাগ কর। কাম, ক্রোধ এবং দুর্জনের সংসর্গ হইতে অহর্নিশি দূরে থাক। যিনি সুখ দুঃখ ও মান-অপমানকে সমান করিয়া জানেন, এবং হর্ষ শোক হইতে দূরে থাকেন, জগতে তিনিই কেবল প্রকৃত বস্তু (তত্ত্ব) জানেন। নিন্দা-স্তুতি দুই-ই পরিত্যাগ করিয়া নির্বাণপদ সন্ধান করিবে। এই খেলা খুবই কঠিন, কেবল কয়েকজন গুরুমুখী (ধার্মিক ব্যক্তি) জানেন।[৩৩]

দ্বিতীয় পদটি এই: মা, আমি কি উপায়ে প্রভুকে দেখিব? মহা মোহ এবং অজ্ঞানের অন্ধকারে আমার মন ডুবিয়া আছে। ভ্রান্ত পথে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি সমস্ত জীবনটা হারাইলাম, স্থির বুদ্ধি পাইলাম না। দিবারাত্রি বিষয়াসক্ত আমি দুষ্ট অভ্যাস হইতে মুক্তি পাই নাই। কখনও সাধুসঙ্গ করি নাই, কখনও প্রভুর গুণকীর্তনও করা হয় নাই। আমার কোনও গুণই নাই, হে প্রভু, তুমি আমাকে রক্ষা কর।[৩৪]

শিখ গুরুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিধর পুরুষ ছিলেন অন্তিম ও দশমগুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৬৬-১৭০৭)। শস্ত্র ও শাস্ত্র উভয় বিদ্যায় তিনি সমান দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে ছিল তাঁহার কবিত্ব-শক্তি। সংস্কৃত, প্রাকৃত, পঞ্জাবী, ব্রজভাষা ও ফার্সী—এই কয়টি ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তন্মধ্যে শেষোক্ত তিনটি ভাষাতেই তাঁহার রচনার নিদর্শন রহিয়াছে। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে গুরু গোবিন্দের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়। পঞ্জাবীতেও তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। "জাপু সাহিব" এবং "অকাল উসততি" গ্রন্থে "অকাল পুরখ" ঈশ্বরের পরম স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে। তবে তাঁহার ভক্তিমূলক পদ রচনা অপেক্ষা শক্তিমূলক কথাকাব্যই অধিকতর পরিচিত।[৩৫]

৩৩ সাধো মন কা মান তিআগউ॥
কাম ক্রোধু সংগতি দুরজন কী তাতে অহিনিস ভাগউ॥
সুখুদুখু দোনো সম করি জানৈ অউর মান অপমানা॥
হরখ সোগতে রহৈ অতীতা তিনি জগি ততু পছানা॥
উসততি নিন্দা দোউ তিআগৈ খোজৈ পদু নিরবানা॥
জননানক ইহু খেলু কঠিন হৈ কিনহূ গুরমুখি জানা॥ —গ্রন্থসাহেব পৃ. ২১৯।

৩৪ মাঈ মৈ কিহ্ বিধি লখউ গুসাঈ॥
মহামোহ অগিআন তিমর মো মনু রহিও উরঝাঈ॥
সগল জনমু ভ্রম হী ভ্রমি খোইও, নহ অসথির মতি পাঈ॥
বিখি আসকত রহিও নিসি-বাসুর নহ ছুটী অধমাই॥
সাধসংগু কবহূ নহী কীনা নহ কীরতি প্রভ গাঈ॥
জননানক মৈ নাহি কোউ গুনু রাখি লেহু সরনাঈ॥ —সন্তসুধাসার পৃ. ৩৮৮।

৩৫ শক্তি-উপাসক গোবিন্দ সিংহের পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত 'ভারতীয় শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থের "হিন্দী শাক্তসাহিত্য" নামক অধ্যায়টি।

এই প্রসঙ্গে শস্ত্রনামা, চণ্ডী দী বার, চণ্ডী চরিত্র, বচিত্তর (বিচিত্র) নাটক প্রভৃতি রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পঞ্চম গুরু অর্জুন গ্রন্থসাহেবের সংকলয়িতা হইলেও পরবর্তীকালে নবম গুরু তেগবহাদুরের রচনাও এই মহান্ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের কোনো পদ গ্রন্থসাহেবে সংকলিত হয় নাই। আমরাও তাহার আলোচনা হইতে বিরত থাকিলাম।

বঙ্গবাসী কলেজ

চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র। শ্রীভবতোষ দত্ত। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ২৯। মূল্য ছয় টাকা।

বঙ্গসাহিত্যাকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব সূর্যোদয়ের সঙ্গে তুলিত হইয়াছে। চতুর্দিক প্রায়ান্ধকারে আচ্ছন্ন, এমন সময় দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি প্রকাশিত হইল। সহসা উষার আলোকে ধরাতল উদ্ভাসিত হইল এবং বঙ্গসাহিত্য নূতন ভাব ও নূতন ভাবনায় সঞ্জীবিত হইল। কিন্তু বস্তুজগতের মত চিন্তা-জগতেও কিছুই আকস্মিক নহে, যাহার অভ্যাগম অতর্কিত বলিয়া মনে হয় তাহারও আরম্ভ এবং পরিণতি আছে এবং তাহা পূর্বপ্রস্তুতিরও অপেক্ষা রাখে।

আলোচ্য গ্রন্থে এই প্রস্তুতির এবং এই আরম্ভ ও পরিণতির ধারাবাহিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের বিচার করেন নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই সুচিন্তিত সুলিখিত গ্রন্থের অধ্যায়গুলির উল্লেখ করিলেই ইহার পরিধির পরিচয় পাওয়া যাইবে। 'বঙ্কিম-মনীষার উন্মেষ' 'বঙ্কিমযুগের মনন-সাধনা' 'বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষা' 'বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারতসংস্কৃতি' 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস' 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা' 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' 'বঙ্কিম-মনীষার অনুবর্তন' (বিপিনচন্দ্র পাল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)— এই কয়টি বিষয়কে আশ্রয় করিয়া গ্রন্থকার চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের সামগ্রিক পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় চিন্তা-ধারার বিশদ বিশ্লেষণ করিয়া গ্রন্থকার সেই পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শনের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়াছেন। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিকতা ও বিগত শতাব্দীর চিন্তাধারার ধারাবাহিকতা— উভয়ই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ, কোমৎ বেন্থাম মিল প্রভৃতির ঐহিকতা কেমন করিয়া গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্মের সঙ্গে সমন্বিত হইয়াছে গ্রন্থকার তাহারও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়াছেন। অবশ্য এই সকল কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে এবং বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তাঁহার মতামতের বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মননসাধনার সঙ্গে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির যে নিবিড় সংযোগ আছে, যতদূর মনে হয়, বর্তমান গ্রন্থকারই তাহা সর্বপ্রথমে দেখাইয়াছেন। গ্রন্থের সর্বশেষ তিনটি প্রবন্ধে তাঁহার মৌলিকতা আরও বেশি স্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র উদীয়মান রবির প্রতিভা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের এই দুই শ্রেষ্ঠ মহারথীর প্রতিভার মধ্যে পার্থক্য ছিল। সেই পার্থক্যের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিনিষ্ঠ কিন্তু জাতীয়তার দ্বারা সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা-সাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছিল। সেই প্রভাবের প্রধান ধারক ও বাহক বিপিনচন্দ্র পাল ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। দুইটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধে এই দুই মনীষীর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ও বঙ্কিমানুবর্তিতার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। খুব সংগত কারণেই গ্রন্থকার এই প্রবন্ধ দুইটিকে পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কিন্তু আলোচনার বিস্তৃতি ও সূক্ষ্মতায় ইহারা স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ।

বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না; বরং মালাবারি প্রভৃতি রিফরমরদের নিন্দাই করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে নৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতিই প্রধানতঃ কাম্য। আলোচ্য গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের নৈতিক ও ধর্মবিষয়ক মতামতের যতটা ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তদনুপাতে রাজনৈতিক (এবং অর্থ নৈতিক) চিন্তাকে

লঘু করিয়া দেখা হইয়াছে। এইজন্য আলোচনা একটু অপূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। স্বীকার করিতে হইবে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই 'সাম্য'-গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ করেন নাই। কিন্তু ঐ গ্রন্থে তিনি অধিকারবাদের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার মধ্যেই তাঁহার সামাজিক-অর্থনৈতিক চিন্তা সর্বাপেক্ষা অগ্রসর হইয়াছে এবং সেইখানেই তিনি বিপ্লবাত্মক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে কমলাকান্ত তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা এবং 'বিড়াল' কমলাকান্তের অপূর্ব সৃষ্টি। বিড়াল বলিতেছে, 'দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? ·তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্যলোক। পণ্ডিত বা মান্যলোক বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাহাদের ক্ষুধা বেশী?' এই অধিকার-সাম্যই বার্নার্ড শ প্রভৃতির রচনার ভিত্তি। এই মত কতখানি মৌলিক তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন ; কোনো কিছুই নিছক মৌলিকতা দাবি করিতে পারে না, গাছ বাতাসে জন্মায় না। কিন্তু ইহা মানিতে হইবে যে বঙ্কিমের রচনায় এই অভিনব অধিকারবাদ জোরালো অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, এবং এই মতের গভীরতা ও সুদূরপ্রসারিতাও অবশ্য স্বীকার্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা -বিষয়ক প্রবন্ধটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। এই প্রসঙ্গে ইউরোপীয় সাহিত্যের যে সব নজির উত্থাপিত হইয়াছে তাহার অনেকগুলিই অপ্রাসঙ্গিক। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টির কোনো একক সূত্র আবিষ্কার করেন নাই অথবা করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি সর্বত্র সাহিত্যসৃষ্টিকে দ্বিধাবিভক্ত করিতে চাহিয়াছেন : সৌন্দর্যসৃষ্টি ও নীতিশিক্ষা, বাস্তবানুগামিতা ও আদর্শ কল্পনা, অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির চর্চা। এই দ্বিধাবিভাগের যৌক্তিকতা বিচার্য, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে সেই বিচারের কোনো পরিচয় নাই।

কিছু কিছু অপূর্ণতা থাকিলেও বর্তমান গ্রন্থের মৌলিকতা ও বিশ্লেষণনৈপুণ্য প্রশংসার্হ। এইরূপ তথ্যবহুল যুক্তিনিষ্ঠ মননশীল সমালোচনা আধুনিক বাংলাসাহিত্যে বিরল।

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

আধুনিক কবিতার ভূমিকা। সঞ্জয় ভট্টাচার্য। সবিতা প্রকাশভবন, কলিকাতা ২৬। সাড়ে তিন টাকা

কবিতার ধর্ম ও বাঙলা কবিতার ঋতুবদল। অরুণ ভট্টাচার্য। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ২৯। চার টাকা

কবিতার কথা। বিমলকৃষ্ণ সরকার। সুপ্রকাশ প্রাইভেট, লিমিটেড, কলিকাতা ৬। পাঁচ টাকা

কবিতার বয়স কত ? এ প্রশ্নের উত্তর এই ভাবে এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে : কবিত্ব মানুষের প্রথম-বিকাশের লাবণ্যপ্রভাত। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি একজন বিশেষ মানুষের পক্ষে যতখানি সত্য মানব-ইতিহাস সম্বন্ধেও সম্ভবত ততখানিই প্রযোজ্য, কবিতাও মানুষের প্রথম-বিকাশের লাবণ্যপ্রভাত। তা ছাড়া, অন্য সমস্ত কৈশোরক চরিতার্থতার মতই একমাত্র হৃদয়গহনেই যেহেতু এই অভিজ্ঞতার সব সাক্ষ্য ও প্রমাণ সমস্ত সমর্থন, খররৌদ্রের আড়ালে স্মৃতি এবং স্বপ্নের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে আবহমান কাল ধ'রে মানুষ এই অকলুষ আদর্শের আসন অটুট রাখতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে অনবচ্ছিন্ন ভাবে। এবং চারিপাশের সহস্র ভ্রূকুটিকে অস্বীকার করে কবিতার ইতিহাস প্রবাহিত হয়ে এসেছে এমন কি এই মুহূর্ত পর্যন্ত। এই মুহূর্তে, যখন প্রভাতলাবণ্যের লেশমাত্র কোনোখানে অবশিষ্ট নেই, শিল্প যখন অর্থান্তরিত হয়ে টেকনোলজির জন্য স্থান করে

দিয়েছে, সৌন্দর্যরচনার অধিকার যখন কবির কাছ থেকে স্খলিত হয়ে অনায়াসে উঠে এসেছে এঞ্জিনীয়রের হাতে, এমনকি এই মুহূর্তেও।

ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁদের মনে পড়ছে একটি বিশেষ সময় থেকে বহু প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভীড়ে নামতে হয়েছিল কবিদের, তাঁরা বুঝেছিলেন তাঁদের পণ্যসামগ্রী একেবারেই অবিক্রেয়, জনহীন নির্বাসনে অতএব তাঁরা মন ফিরিয়েছিলেন তুরূহের সাধনায়, সেই স্বরচিত তুর্গদরোজায় অত্যন্ত উজ্জ্বল ফলকে একদিকে প্রাকৃতজনের জন্য যেমন প্রবেশ-নিষেধ টাঙানো ছিল, তেমনই ; অথচ নিজেদের স্বপ্নবিলাসকে যুক্তিসিদ্ধ করে তুলতে তাঁদের বিন্দুমাত্র আলস্য ঘটে নি। একদিকে পো ও তাঁর অনুসারী কবিসমাজের নিঃসঙ্গচারণায়, অপরদিকে পীকক-শেলি বচসায়, কার্লাইল ও আর্নল্ড-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে, মধুসূদনের প্রত্যাশাতুর পত্রাবলীতে, সমাজসেবীদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের অটল মহিমায়, রিকার্ডিয়ান কাব্যসূত্রে এই নিরলস স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার নীরব সংগ্রাম স্বাক্ষরিত আছে। সমস্ত শিল্পের মধ্যে কবিতাই সবচেয়ে বিষয়বিবিক্ত, যদিও, জন্মমুহূর্ত থেকেই তাকে সহস্র বিষয়ের দায় মেনে নিতে হয়েছে, সংসারে নিজেকে ব্যবহার্য প্রতিপন্ন করতে হয়েছে। হয়তো একই সমস্যা, কিন্তু এখনকার দায়িত্ব আরও অনেক বেশি তীব্র। এমনকি নৈর্ব্যক্তিক কাব্যপ্রণয়নেও সেই দায় ফুরোয় না, অসংখ্য মশালের দিগ্‌দর্শনী তার চতুর্দিকে স্থাপন করতে হয়। কবিরা এগিয়েছেন সেই মশাল জ্বালতে, তাঁদের সঙ্গে তাঁদের পাশে ভীড় করেছেন অজস্র কাব্যবিবেচক, জন জে চ্যাপম্যান যতই তিরস্কার করুন, এই নবীন সূত্রকারদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে কবিতার ব্যবহারিক মূল্য কি একটুও বাড়ে নি ?

বাংলাদেশে অবশ্য এই আয়োজনের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া কঠিন। তার কারণ এ নয় যে অন্য ব্যবসায়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখে এ দেশের সবাই সেদিকে ঝুঁকেছেন, অথবা আমাদের কবিরা কৃতী চরিত্র হিসাবে খুবই সমাজবন্দিত। কিন্তু নিজেদের সযৌক্তিক প্রমাণ করে তুলতে তাঁদের আলস্য কিছু অধিক। অথচ ইতিহাসের সর্বকোণের বায়ুপ্রবাহ এখানে এসে পৌঁছচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, সমস্ত নিরীক্ষাপ্রবণতাই তাঁদের স্পর্শ করছে, এবং তাঁদের নির্বাসন আরও জনবিরল হয়ে উঠছে। সুখের বিষয়, ইদানীং কবিরা নিজেরাই কেউ কেউ সুগম কাব্যপরিচয় লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, প্রথম বই তুটি তারই সাক্ষ্য। সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং অরুণ ভট্টাচার্য তুজনেই সুপরিচিত কবি, কিন্তু আত্মপরিচয়েই তাঁরা গ্রন্থের সীমা নির্ধারণ করেন নি। অপিচ, তুজনেই পত্রিকাপরিচালক হিসেবে সম্প্রতিকালের কবিতার ভূমিকা লেখার অত্যন্ত সময়োপযোগী দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অবশ্য, বলাই বাহুল্য, একটি ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রস্থান থেকে তাঁরা এগিয়েছেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্য স্বকীয় অনুভবের নিরিখে সমস্ত ঘটনাপরম্পরাকে যাচাই করে নেন ; অরুণ ভট্টাচার্যও, সম্ভবত, বক্রোক্তিবাদী। কিন্তু তুজনেই তাঁদের ব্যাপকতর দায়িত্বের কথা জানেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্য অনুভব করেছেন, 'একটি কবির অভিজ্ঞতা জানতে হলে সপ্ত সমালোচকরথীরই দরকার।' শুধু তাই নয়। 'বিপ্লবী সমালোচকের দরকার'। অরুণ ভট্টাচার্য আক্ষেপ করেছেন—

> বাংলা সাহিত্যে বর্তমান শতাব্দীর মধ্যযুগেও বৈজ্ঞানিক সমালোচনার কোনো সংস্কার তৈরি হল না, হাল আমলের কবিকুলের কাছে তা তুর্ভাগ্যের বিষয়।

কিন্তু প্রত্যাশা ও শোচনাতেই এঁরা দায়মুক্ত হবার চেষ্টা করেন নি। নিজেদের কাব্যদর্শনের পরিচয় দিয়েছেন সূচনায়, সেই আলোয় সার্বভৌম কাব্যবিচার এবং আধুনিকতম কবিতার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে পাঠক ও কবিকুলের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন, নিঃসন্দেহে উভয়েরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

আধুনিক কবিতার ভূমিকা'র একটি পূর্বতন খসড়া অনেকদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছিল 'তিনজন আধুনিক কবি' নামে, এই নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণে সম্ভবত পূর্বপরিকল্পনাই পূর্ণাঙ্গ হয়েছে, এবং পরিসর অনেকখানি বেড়েছে। একদিকে পঞ্চম দশকের কাব্যোদ্যম পর্যন্ত তিনি স্পর্শ করেছেন, অপরদিকে উত্তর রৈবিক কাব্যধারার সন্ধিমুহূর্তের অনেক বিস্মৃতপ্রায় নাম তিনি স্মরণ করেছেন, উত্তরণের অনেকগুলি পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছেন তাঁদের রচনায়, কৃতজ্ঞচিত্তে প্রাপ্য সম্মানে তাঁদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই বইকে হয়তো অনেকেই আধুনিক বাংলা কবিতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস মানতে রাজী হবেন না, কিন্তু কৌতূহলী পাঠককে এই বই পরবর্তী জিজ্ঞাসার ইন্ধন যোগাবে, এতে সন্দেহ নেই। উপরন্তু রবীন্দ্রোত্তর কবিগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য -বিরচিত ব'লেও এই বইয়ের প্রতিটি লাইনই স্বীকারোক্তির গৌরবে মূল্যবান, এতেও সন্দেহ নেই।

সেই মূল্য অরুণ ভট্টাচার্যের বইকেও নিশ্চিত বিশিষ্ট করে তুলেছে। কিন্তু অরুণ ভট্টাচার্য আত্মভাবনার চেয়ে তথ্যযোজনার কর্তব্যে হয়তো একটু বেশি ব্যাপৃত, দুটি পর্বে বিন্যস্ত এই বইয়ের সর্বত্রই সেই বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় আছে। সমালোচক হিসেবে কার্যকারণের অনুশাসনকে তিনি কোথাও অস্বীকার করতে চান নি, সব সময় মনে রেখেছেন 'তাঁর বক্তব্য যেন শুধুমাত্র আবেগ-প্ররোচিত না হয়'। অথচ শুধু কবিস্বভাব বলেই নয়, সহৃদয় পাঠক হিসাবেও কাব্যবিচারে তিনি পাণ্ডিত্যের চেয়ে কাব্যবোধকে বড় আসন দিতে ভোলেন নি। তাতে তাঁর রচনা নিছক তথ্যের বাহন হওয়া থেকে মুক্তি পেয়েছে। জীবনানন্দ সম্বন্ধে তিনি যখন বলেন—

এখন থেকে কবির চোখে শুধু কল্পনার কাজল নেই, রয়েছে 'চোখের ক্ষুধা',

অথবা অন্য সূত্রে—

শিল্প অর্থ স্বচ্ছতা, দৃষ্টির স্বচ্ছতা, মনের স্বচ্ছতা, সহজ করে আনা, চিন্তা ভাবনার সরলীকরণ।

কিংবা কখনও—

আলোকের পাদপীঠে ছায়ার বিস্তারের মত এই কবিতা নরম ও বেদনার্দ্র, তখন এই সমস্ত বক্তব্যই স্পর্শময় হয়ে পাঠককে অধিকার করে।

উপরের বই দুখানির সঙ্গে তৃতীয় বইটির চরিত্রগত প্রভেদ আছে। গ্রন্থকারের কবিপরিচিতি নেই। আত্মপ্রকাশের তিলমাত্র প্রয়োজন না থাকায় অগোচরেও অসতর্কভাবেও তিনি নিজেকে তাঁর বইয়ের কোথাও আরোপ করেন নি। অথচ উপরের বই-দুটির থেকে তাঁর বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক। প্রাচীনতম কাব্যসৃষ্টি থেকে রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারা পর্যন্ত তিনি নেমে এসেছেন, বাংলা কবিতার পাশে ভারতীয় কবিতা এবং তারও পাশে পশ্চিমী কবিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় রেখেছেন। এবং শুধু ইতিহাসপ্রবাহই নয়, বিভিন্ন যুগের কাব্যতত্ত্বের বিবরণ দিয়েছেন। কোনো বর্ণনাতেই ব্যক্তিগত রঙ ধরান নি, কাব্যোপভোগের জন্য প্রাথমিক পরিশীলনের সোপানগুলি শুধু একে একে আগ্রহীজনের সামনে রচনা করে দিয়েছেন। ভূমিকায় অন্যবিধ কোনো প্রতিশ্রুতি দেন নি, বলে নিয়েছেন—

বইটিতে কোন মৌলিক তত্ত্ব উপস্থাপনের প্রয়াস নেই। প্লেটো-অ্যারিস্টটলের যুগ থেকে আরম্ভ করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যে সব তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়েছে তাদের মধ্যে আমি শুধু একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছি।

প্রথম চারটি অধ্যায়ে কাব্যশাস্ত্রের সেই পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে যেমন নন্দনতত্ত্বের অংশ আছে তেমনই অলংকারশাস্ত্রের, যেমন প্রাচীন ভারতীয় বিদগ্ধজনের উপস্থিতি আছে তেমনই সাম্প্রতিকতম প্রতীচ্য রসবেত্তার সাক্ষ্য। অত্যন্ত নিপুণ হাতে সবগুলি দিককে সংযুক্ত করে তিনি তাঁর বক্তব্যের জন্য অনেক বড় পটভূমিকা গড়ে নিয়েছেন।

আসলে চমৎকার একটি সংকলনগ্রন্থ, অত্যন্ত সাবলীল তথ্যবাহী ভাষায় লেখা। জিজ্ঞাসুজনের জন্য এই বই এই বিষয়ের একখানি আদর্শ হ্যাণ্ডবুক হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়। সম্প্রতিকালে আমাদের শিক্ষাপীঠসমূহে কাব্য পড়ানোর প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু কাব্যের পরিবর্তে পড়ানো হয় কাব্যসমালোচনা। সে ক্ষেত্রেও একটি সর্বাঙ্গীণ প্রাথমিক পুস্তকের অভাব এই বই দিয়ে পূর্ণ হবে। তাতে এর মর্যাদা লাঘব হয় নি, সিদ্ধি সার্বভৌম হয়েছে বলে মনে হয়।

জর্জ সাণ্টায়না বলেছিলেন, কবিতাই আসলে আমাদের স্বতোৎসার প্রকাশ, সংসারবেষ্টিত হয়ে বেঁচে থাকতে হয় বলেই আমরা তার পবিত্র গোপন আন্তরিক অংশটুকু ছেঁটেকেটে তাকে গদ্য করে নিই, গদ্য মানুষের নিতান্তই বাহিরমহল।

কিন্তু যে বিচিত্র কোলাহলের মধ্যে আমরা বেঁচে আছি, তার কোথায় আমাদের এই মর্মের গেহিনী-র জন্য স্থান রচনা করে দেব। যে কোনো সূত্রেই হোক, কবিতার আলোচনা হলে তা সহজেই আরও বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য মনে হয়, আলোচনা প্রীতিপ্রকাশের সবচেয়ে সাধারণ রূপ।

বাংলা ভাষা এখন নানা দিক থেকে পুষ্ট হয়ে উঠছে, সেই উজ্জ্বলতার ভীড়ে পাঠকের কাছে এই বই তিনখানির দাবি সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। অন্তত কবিতার পক্ষপাতী কণ্ঠস্বর হিসেবেও নিশ্চিত বিশিষ্ট।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি

এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে ;
আমি কুড়িয়ে নিয়েছি, তোমার চরণে দিয়েছি—
লহো লহো করুণ করে ॥
যখন যাব চলে ওরা ফুটবে তোমার কোলে,
তোমার মালা গাঁথার আঙুলগুলি মধুর বেদনভরে
যেন আমায় স্মরণ করে ॥
বউকথাকও তন্দ্রাহারা বিফল ব্যথায় ডাক দিয়ে হয় সারা
আজি বিভোর রাতে।
দুজনের কানাকানি কথা, দুজনের মিলনবিহ্বলতা,
জ্যোৎস্নাধারায় যায় ভেসে যায় দোলের পূর্ণিমাতে।
এই আভাসগুলি পড়বে মালায় গাঁথা কালকে দিনের তরে
তোমার অলস দ্বিপ্রহরে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

[পা পা]
সা -ন্ II {সা সা র্সা । না ধা -া I পা পা -া । পক্ষা ^{ধ}পা -ক্ষা I
এ ই উ দা সী হাও য়া র্ প থে ০ প০ থে ০

I ক্ষা ^{গ}ক্ষা -গা । গা ^{ম}গা -রা I ^{গ}রা সা -া । (সা সা -রা I
মু কু ল্ গু লি ০ ঝ রে ০ আ মি ০

I গা গপা পা । পা পা -ক্ষা I ক্ষাধপা -ক্ষা -পা । ^{প}ক্ষা গা -া I
কু ড়ি০ য়ে নি য়ে ০ ছি০০ ০ ০ তো মা র্

I গা ক্ষা পা । পক্ষা ^{গ}ক্ষা -গা I গা -া -া । গা গা -ক্ষা I
চ র ণে দি০ য়ে ০ ছি ০ ০ ল হো ০

I ক্ষানা না -ধা । ধা পা পা I ক্ষা গা -া । -া গা -ক্ষা)} I [ ] I
ল০ হো ০ ক রু ণ ক রে ০ ০ এ ই

-া -া -া II {পা ^র্সা^পা -গা । পা পা -ধা I ধর্সা র্সা -া । র্সা র্সা -া I
০ ০ ০ য খ ন্ যা ব ০ চ০ লে ০ ও রা ০

I র্সা -া র্সর্গা । র্রা র্সা -া I না ^ধ^না -া । (-ধা -পা -া)} I ধা পা -ক্ষা I
ফু ট্ বে০ তো মা র্ কো লে ০ ০ ০ ০ তো মা র্

I পক্ষা পা -র্সা । না ধা -পা I পক্ষা পক্ষা -ধা । ^ধ^পা পা -ক্ষা I
মা০ লা ০ গাঁ থা র্ আ০ ঙু০ ল্ গু লি ০

I ক্ষা ক্ষা ক্ষাগা । গা ক্ষা পা I ক্ষা ^গ^ক্ষা -গা । গা গা -া I
ম ধু র০ বে দ ন ভ রে ০ যে ন ০

I গা গা -রা । গা গপা ^র্সা^পা I গা ^র^গা -া । -রা সা -ন্‌া II
আ মা য়্ স্ম র০ ণ ক রে ০ ০ "এ ই"

-া -া -রা II {গা -া গা । ^গ^রা সা -রা I গা -া গা । রা সা -া I
০ ০ ০ ব উ ক থা ক ও ত ন্ দ্রা হা রা ০

I সা ঋা ঋা । ঋা ঋা -গা I সা -া গা । গা রা -গা I
বি ফ ল ব্য থা য়্ ডা ক্ দি য়ে হ য়্

I ^গ^রা সা -া । সা সা -রা I গাগমা ^ব^গা । রা সা (-রা)} I -া I
সা রা ০ আ জি ০ বি ভো০ র রা তে ০ ০

I -া -া -া । -া -া -া I {-া -া পা । ^র্সা^পা গা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ দু জ নে র্

I পা পা -ক্ষা । ধা ধা -পা I ধর্সা র্সা -া । -া -া -া I
কা না ০ কা নি ০ ক০ থা ০ ০ ০ ০

I -া -া র্সা । র্সর্গা র্গা -র্রা I র্রার্রসা র্সনা । ধা -র্সা র্সনা I
০ ০ দু জ০ নের্ মি ল০ ন০ বি ০ ম্ব০

I ধনা ধপা -া । (-া -া -া)} I -হ্মা-গা-হ্মা I পা -র্সা র্সা । নাধা-পা I
ল তাং ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ জ্যো ৎ স্না ধা রা য়্

I পহ্মা -ধা ধপা । পহ্মা ধপা -হ্মা I হ্মা হ্মা -গা । গা -হ্মা পা I
যাং য়্ ভেং সেং যা য়্ দো লে র্ পূ র্ ণি

I পহ্মা গা -া । -া র্সা -না I র্সা র্সা -র্গা । র্রা র্রা -র্সা I
মা তে ০ ০ এ ই আ ভা স্ গু লি ০

I র্সা -না নর্রা । র্রর্সা র্সা -না I ধনা না -া । -ধা -পা -হ্মা I
প ড়্ বেং মাং লা য়্ গাঁ থা ০ ০ ০ ০

I পা -া পর্সা । না ধা -না I ধা পা -া । পা পা -হ্মা I
কা ল্ কেং দি নে র্ ত রে ০ তো মা র্

I হ্মা হ্মা হ্মগা । গা -া পা I পহ্মা গা -া । -া গা -হ্মা II [ ] II
অ ল সং দ্বি ০ প্র হ রে ০ ০ "এ ই"

সম্পাদকের নিবেদন

এই সংখ্যায় আমরা ক বি সং ব র্ধ না শিরোনামায় কিছু তথ্য পরিবেশন করলাম। এই তথ্য আমরা মূল্যবান বলে মনে করি।

রবীন্দ্রশতপূর্তি উৎসবের মধ্যে আমরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের কথা প্রথমে স্মরণ করেছি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে যে কবিসংবর্ধনার আয়োজন করেন তার বিবরণ আমরা মুদ্রিত করলাম; এবং সেই সঙ্গে, সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিতরিত বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য আমন্ত্রণলিপির প্রতিলিপিও প্রকাশ করা হল।

এর দশ বৎসর পরে, রবীন্দ্রনাথের ষষ্টিতম বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুনরায় কবিসংবর্ধনার আয়োজন করেন, এবং র বী ন্দ্র ম ঙ্গ ল নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটি দুষ্প্রাপ্য, সেটি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানসূচীর প্রতিলিপি -সহ আমরা পুস্তিকাটি মুদ্রণ করলাম।

এর দ্বারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে আমাদের পূর্বসূরীদেরও স্মরণ করা হল বলে আমরা মনে করি। রবীন্দ্রসমকালীন মনীষী ও কবি -বৃন্দ রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেছেন, সশ্রদ্ধ ভাবে আমরা সে কথা স্মরণ করলাম।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের জন্ম সেই স্মরণীয় বৎসরে— ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। রবীন্দ্রসমসাময়িক ও রবীন্দ্রসুহৃৎ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র প্রকাশ ক'রে এবং অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশ ক'রে আমরা অক্ষয়কুমারের প্রতি শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত।

—

স্বীকৃতি

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে কবিসংবর্ধনার আমন্ত্রণলিপি ও ষষ্টিতম বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে প্রকাশিত রবীন্দ্রমঙ্গল পুস্তিকা শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের আলোকচিত্র অক্ষয়কুমারের দৌহিত্র শ্রীপ্রিয়ভূষণ সান্যালের সৌজন্যে, পাহাড়পুর-অভিযাত্রীদলের আলোকচিত্রের প্রতিলিপি শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

রবীন্দ্রনাথ -অঙ্কিত

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯ · ১৮৮৪ শক
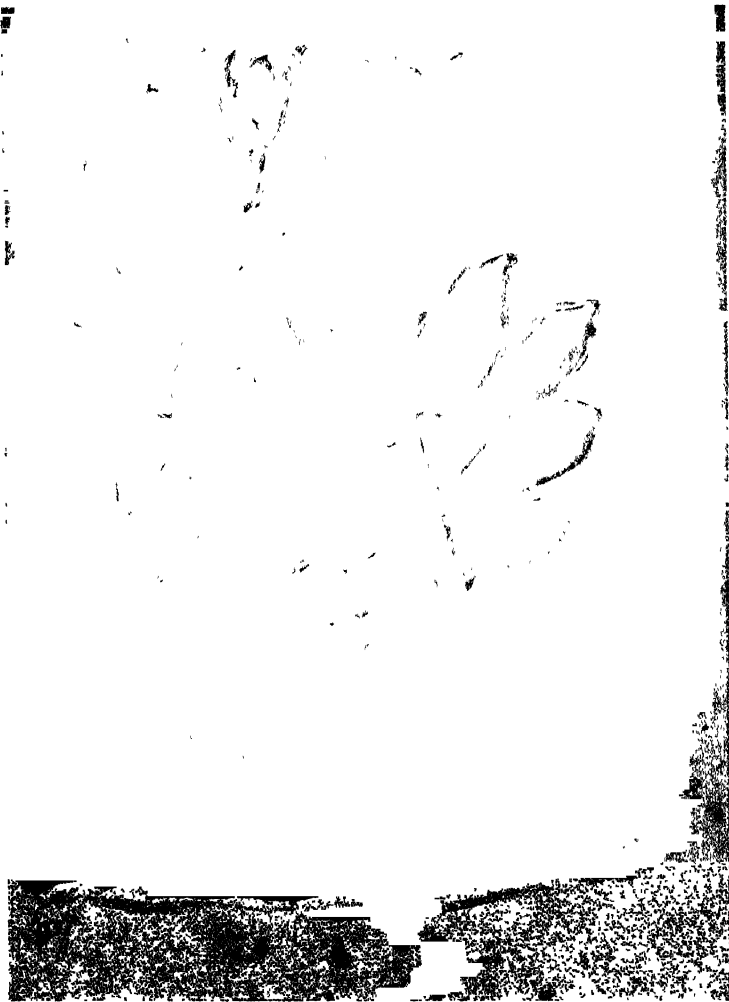
ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনুষ্যহৃদয়ের স্বভাব এই যে, যখনই সে সুখ দুঃখ শোক প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে ভাব বাহ্যে প্রকাশ না করিলে সে সুস্থ হয় না। যখন কোন সঙ্গী পাই, তখন তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করি, নহিলে সেই ভাব সঙ্গীতাদির দ্বারা প্রকাশ করি। এইরূপে গীতিকাব্যের উৎপত্তি। আর কোন মহাবীর শত্রুহস্ত বা কোন অপকার হইতে দেশকে মুক্ত করিলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে গীতি রচিত ও গীত হয় তাহা হইতেই মহাকাব্যের জন্ম। সুতরাং মহাকাব্য যেমন পরের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়, তেমনি গীতিকাব্য নিজের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়। মহাকাব্য আমরা পরের জন্য রচনা করি এবং গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি। যখন প্রেম করুণা ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি সকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয় তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবণজাত সেই স্রোত হয়ত শত শত মনোভূমি উর্ব্বরা করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। ইহা মরুভূমির দগ্ধ বালুকাও আর্দ্র করিতে পারে, ইহা শৈলক্ষেত্রের শিলারাশিও উর্ব্বরা করিতে পারে। কিম্বা যখন অগ্নিশৈলের ন্যায় আমাদের হৃদয় ফাটিয়া অগ্নিরাশি উদ্গীরিত হইতে থাকে, তখন সেই অগ্নি আর্দ্র কাষ্ঠও জ্বালাইয়া দেয়, সুতরাং গীতিকাব্যের ক্ষমতা বড় অল্প নহে। ঋষিদিগের ভক্তির উৎস হইতে যে সকল গীত উত্থিত হইয়াছিল তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম গঠিত হইয়াছে, এবং এমন দৃঢ়রূপে গঠিত হইয়াছে যে, বিদেশীয়রা সহস্র বৎসরের অত্যাচারেও তাহা ভগ্ন করিতে পারে নাই। এই গীতিকাব্যই যুদ্ধের সময় সৈনিকদের উন্মত্ত করিয়া তুলে, বিরহের সময় বিরহীর মনোভার লাঘব করে, মিলনের সময় প্রেমিকের সুখে আহুতি প্রদান করে, দেবপূজার সময় সাধকের ভক্তির উৎস উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এই গীতিকাব্যই ফরাসী বিদ্রোহের উত্তেজনা করিয়াছে, এই গীতিকাব্যই চৈতন্যের ধর্ম্ম বঙ্গদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে, এবং এই গীতিকাব্যই বাঙ্গালির নির্জ্জীব হৃদয়ে আজকাল অল্প অল্প জীবন সঞ্চার করিয়াছে। মহাকাব্য সংগ্রহ করিতে হয়, গঠিত করিতে হয়; গীতিকাব্যের উপকরণ সকল গঠিত আছে, প্রকাশ করিলেই হইল। নিজের মনোভাব প্রকাশ করা বড় সামান্য ক্ষমতা নহে। সেক্সপীয়র পরের হৃদয় চিত্র করিয়া দৃশ্যকাব্যে অসাধারণ হইয়াছেন, কিন্তু নিজের হৃদয়-চিত্রে অক্ষম হইয়া গীতিকাব্যে উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। তেমনি বাইরন্ নিজ হৃদয়চিত্রে অসাধারণ; কিন্তু পরের হৃদয়চিত্রে অক্ষম। গীতিকাব্য অকৃত্রিম, কেননা তাহা আমাদের নিজের হৃদয়কাননের পুষ্প; আর মহাকাব্য শিল্প, কেননা তাহা পর-হৃদয়ের অনুকরণ মাত্র। এই নিমিত্ত আমরা বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভার্জ্জিল প্রভৃতি প্রাচীন কালের কবিদিগের ন্যায় মহাকাব্য লেখিতে পারিব না; কেননা সেই প্রাচীন কালে লোকে সভ্যতার আচ্ছাদনে হৃদয় গোপন করিতে জানিত না, সুতরাং কবি হৃদয় প্রত্যক্ষ করিয়া সেই

অনাবৃত হৃদয় সকল সহজেই চিত্র করিতে পারিতেন। গীতিকাব্য যেমন প্রাচীনকালের তেমনি এখনকার, বরং সভ্যতার সঙ্গে তাহা উন্নতি লাভ করিবে, কেননা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন হৃদয় উন্নত হইবে, তেমনি হৃদয়ের চিত্রও উন্নতি লাভ করিবে। নিজের হৃদয় চিত্র করিতে গীতিকাব্যের উৎপত্তি বটে, কিন্তু কেবলমাত্র নিজের হৃদয় চিত্র করা গীতিকাব্যের কার্য্য নহে; এখন নিজের ও পরের উভয়ের মনোচিত্রের নিমিত্ত গীতিকাব্য ব্যাপৃত আছে, নহিলে গীতিকাব্যের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিত না। ইংরাজিতে যাহাকে Lyric Poetry কহে, আমরা তাহাকে খণ্ডকাব্য কহি। মেঘদূত খণ্ডকাব্য, ঋতুসংহারও খণ্ডকাব্য এবং Lalla Rookhও Lyric Poetry, Irish Melodiesও Lyric Poetry, কিন্তু আমরা গীতিকাব্য অর্থে মেঘদূতকে মনে করি নাই, ঋতুসংহারকে গীতিকাব্য কহিতেছি। আমাদের মতে Lalla Rookh গীতিকাব্য নয়, Irish Melodies গীতিকাব্য। ইংরাজিতে যাহাদিগকে Odes, Sonnets প্রভৃতি কহে তাহাদিগের সমষ্টিকেই আমরা গীতি-কাব্য বলিতেছি। বাঙ্গলা দেশে মহাকাব্য অতি অল্প কেন? তাহার অনেক কারণ আছে। বাঙ্গলা ভাষার সৃষ্টি অবধি প্রায় বঙ্গদেশ বিদেশীয়দিগের অধীনে থাকিয়া নিজ্জীব হইয়া আছে, আবার বাঙ্গলার জলবায়ুর গুণে বাঙ্গালীরা স্বভাবতঃ নিজ্জীব, স্বপ্নময়, নিস্তেজ, শান্ত; মহাকাব্যের নায়কদিগের হৃদয় চিত্র করিবার আদর্শ হৃদয় পাইবে কোথা? অনেক দিন হইতে বঙ্গদেশ সুখে শান্তিতে নিদ্রিত; যুদ্ধবিগ্রহ, স্বাধীনতার ভাব বাঙ্গালীর হৃদয়ে নাই; সুতরাং এই কোমল হৃদয়ে প্রেমের বৃক্ষ অষ্ঠে পৃষ্ঠে মূল বিস্তার করিয়াছে। এই নিমিত্ত জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের লেখনী হইতে প্রেমের অশ্রু নিঃসৃত হইয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছে এবং এই নিমিত্তই প্রেমপ্রধান বৈষ্ণব ধর্ম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে। আজকাল ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীরা স্বাধীনতা, অধীনতা, তেজস্বিতা, স্বদেশ-হিতৈষিতা প্রভৃতি অনেকগুলি কথার মর্মার্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং আজকাল মহাকাব্যের এত বাহুল্য হইয়াছে যে যিনিই এখন কবি হইতে চান তিনিই একখানি গীতিকাব্য লিখিয়াই একখানি করিয়া মহাকাব্য বাহির করেন, কিন্তু তাঁহারা মহাকাব্যে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছেন না ও পারিবেন না। যদি বিদ্যাপতি-জয়দেবের সময় তাঁহাদের মনের এখনকার ন্যায় অবস্থা থাকিত তবে তাঁহারা হয়ত উৎকৃষ্ট মহাকাব্য লিখিতে পারিতেন। এখনকার মহাকাব্যের কবিরা রুদ্ধহৃদয় লোকদের হৃদয়ে উঁকি মারিতে গিয়া নিরাশ হইয়াছেন ও অবশেষে মিল্টন খুলিয়া ও কখন কখন রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া অনুকরণের অনুকরণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত মেঘনাদ-বধে, বৃত্রসংহারে ঐ সকল কবিদিগের পদছায়া স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার গীতিকাব্য আজকাল যে ক্রন্দন তুলিয়াছে তাহা বাঙ্গালার হৃদয় হইতে উত্থিত হইতেছে। ভারতবর্ষের দুরবস্থায় বাঙ্গালিদের হৃদয় কাঁদিতেছে, সেই নিমিত্তই বাঙ্গালিরা আপনার হৃদয় হইতে অশ্রুধারা লইয়া গীতিকাব্যে ঢালিয়া দিতেছে। 'মিলে সবে ভারতসন্তান' ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত, স্বদেশের নিমিত্ত বাঙ্গালির প্রথম অশ্রুজল। সেই অবধি আরম্ভ হইয়া আজি কালি বাঙ্গালা গীতিকাব্যের যে অংশে নেত্রপাত করি সেইখানেই ভারত। কোথাও বা দেশের নিজ্জীব রোদন, কোথাও বা উৎসাহের জলন্ত অনল! 'মিলে সবে ভারতসন্তানে'র কবি যে ভারতের জয়গান করিতে অনুমতি দিয়াছেন, আজ কালি বালক পর্য্যন্ত, স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত সেই জয়গান করিতেছে, বরং এখন এমন অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা সমূহ হাস্যজনক! সকল বিষয়েরই অতিরিক্ত হাস্যজনক, এবং এই অতিরিক্ততাই প্রহসনের মূল ভিত্তি। ভারতমাতা, যবন, উঠ, জাগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, প্রভৃতি শুনিয়া শুনিয়া আমাদের হৃদয় এত অসাড় হইয়া পড়িয়াছে যে ওসকল কথা আর

আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। ক্রমে যতই বালকগণ ভারত ভারত চীৎকার বাড়াইবেন ততই আমাদের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইবে! এই নিমিত্ত যাঁহারা ভারতবাসীদের দেশহিতৈষিতায় উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত আর্য্যসঙ্গীত লেখেন, তাঁহাদের ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিই; তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁহাদের প্রয়াস দেশহিতৈষিতার প্রস্রবণ হইতে উঠিতেছে বটে কিন্তু তাঁহাদের সোপান হাস্যজনক। তাহারা বুঝেন না ঘুমন্ত মনুষ্যের কর্ণে ক্রমাগত একই রূপ শব্দ প্রবেশ করিলে ক্রমে তাহা এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে তাহাতে আর তাহার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। তাঁহারা বুঝেন না যেমন ক্রন্দন করিলে ক্রমে শোক নষ্ট হইয়া যায় তেমনি সকল বিষয়েই। এই নিমিত্তই সেক্সপীয়র কহিয়াছেন "Words to the heat of deed too cold breath give". তোমার হৃদয় যখন উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিবে তখন তুমি তাহা দমন করিবে নহিলে প্রকাশ করিলেই নিভিয়া যাইবে এবং যত দমন করিবে ততই জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিবে!

ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী, দুঃখসঙ্গিনী এই তিনখানি গীতিকাব্য আমরা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাদিগের মধ্যে ভুবনমোহিনীপ্রতিভা ও অবসরসরোজিনীর মধ্যে অনেকগুলি আর্য্যসঙ্গীত আছে, কেননা ইহাদিগের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক, অপরটি বালক। ইহা প্রায় প্রত্যক্ষ যে দুর্ব্বলদিগের যেমন শারীরিক বল অল্প তেমনি মানসিক তেজ অধিক; ঈশ্বর একটির অভাব অন্যটির দ্বারা পূর্ণ করেন। ভুবনমোহিনীপ্রতিভা ও অবসরসরোজিনী পড়িলে দেখিবে, ইঁহাদিগের মধ্যে একজনের প্রয়াস আছে, অধ্যবসায় আছে, শ্রমশীলতা আছে। একজন আপনার হৃদয়ের খনির মধ্যে যে রত্ন যে ধাতু পাইয়াছেন তাহাই পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন, সে রত্নে ধূলিকর্দ্দম মিশ্রিত আছে কিনা, তাহা সুমার্জ্জিত মসৃণ করিতে হইবে কিনা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আর একজন আপনার বিদ্যার ভাণ্ডারে যাহা কিছু কুড়াইয়া পাইয়াছেন, তাহাই একটু মার্জ্জিত করিয়া বা কোন কোন স্থলে তাহার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া পাঠককে আপনার বলিয়া দিতেছেন। একজন নিজের জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, আর-একজন পাঠকদিগের জন্য কবিতা লিখিয়াছেন। ভুবনমোহিনী নিজের মন তৃপ্তির জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, আর রাজকৃষ্ণবাবু যশপ্রাপ্তির জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, নহিলে তিনি বিদেশীয় কবিতার ভাব সংগ্রহ করিয়া নিজের বলিয়া দিতেন না। ভুবনমোহিনী পৃথিবীর লোক, তাঁহার কবিতার নিন্দা করিলেও গ্রাহ্য করিবেন না, কেননা তিনি পৃথিবীর লোকের নিমিত্ত কবিতা লেখেন নাই। আর রাজকৃষ্ণবাবু তাঁহার কবিতার নিন্দা শুনিলে মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধ হইবেন কেননা যশেচ্ছাই তাঁহাকে কবি করিয়া তুলিয়াছে। একজন অশিক্ষিতা রমণীর প্রতিভায় ও একজন শিক্ষিত যুবকের প্রয়াসে এই প্রভেদ। কবিরা যেখানেই প্রায় পরের অনুকরণ করিতে যান সেইখানেই নষ্ট করেন ও যেখানে নিজের ভাব লেখেন সেইখানেই ভাল হয়, কেননা তাঁহাদের নিজের ভাবস্রোতের মধ্যে পরের ভাব ভাল করিয়া মিশে না। আর কুকবিরা প্রায় যেখানে পরের অনুকরণ বা অনুবাদ করেন সেইখানেই ভাল হয় ও নিজের ভাব জুড়িতে গেলেই নষ্ট করেন, কেননা হয় পরের মনোভাব-স্রোতের মধ্যে তাঁহাদের নিজের ভাব মিশে না কিম্বা তাঁহার আশ্রয় উচ্চতর কবির কবিত্বের নিকট তাঁহার নিজের ভাব 'হংসমধ্যে বক যথা' হইয়া পড়ে! এই নিমিত্ত অবসরসরোজিনীর "মধুমক্ষিকা-দংশন" ও "প্রবাহি চলিয়া যাও অয়ি লো তটিনী" ইত্যাদি কবিতাগুলি মন্দ নাও লাগিতে পারে!

"THE WOUNDED CUPID"

Cupid, as he lay among
Roses, by a bee was stung.
Whereupon, in anger flying
To his mother said thus, crying,
Help, O help, your boy's a-dying!
And why my pretty lad, said she.
Then, blubbering, replied he,
A winged snake has beaten me,
Which country people call a bee.
At which she smiled; then with her hairs
And kisses drying up his tears
Alas, said she, my wag! if this
Such a perniceous torment is;
Come, tell me then, how great's the smart
Of those thou woundest with thy dart?

"HERRICK"

মধুমক্ষিকা-দংশন

একদা মদন করিয়ে যতন,
বাছি বাছি তুলি কুসুমরতন
রচিল শয়ন মনের মতন,

*

ঘুমের ঘোরেতে হয়ে অচেতন
মুদিয়ে নয়ন রহিল মদন

*

ঘুমঘোরে কাম নড়িল যেমন,
মধুমাছি-দেহে বাজিল চরণ;
রাগভরে মাছি সবলে তখন
ফুটাইল কাম-চরণে হুল।
অধীর হইয়া বিষের জ্বালায়
উঠি রতিপতি ছুটিয়ে পালায়

রবীন্দ্রনাথ

আনুমানিক পনেরো বৎসর বয়সে

প্রিয়তমা রতি বসিয়ে যথায়
গাঁথিতে ছিলেন মালতী ফুল।
"অয়ি প্রিয়তমে!" কহিল রতিরে
রতিনাথ, "প্রাণ যায় যে অচিরে

*

কেন শুইলাম বিছাইয়া ফুল
তাই মধুমাছি ফুটাইল হুল
কি হবে কি করি প্রাণ যে যায়!"

*

কহে কামে রতি নিকটে আসিয়ে,
"ছোট মধুমাছি দিয়েছে বিঁধিয়ে

*

তাই তুমি, নাথ! হইলে কাতর
ভাল, বল দেখি দাসীর গোচর
কতই জ্বলিবে তাহার অন্তর,
পঞ্চশর তুমি বিঁধিবে যায়?"

Flow on thou shining river;
But ere thou reach the sea,
Seek Ella's bower and give her
The wreath I fling o'er thee etc.

MOORE

প্রবাহি চলিয়া যাও অয়ি লো তটিনি!
কিছু দূরে গিয়ে, পরে দেখিবে নয়নে;
তব তটে বসি মম সুচারু হাসিনী
নব বিবাহিতা বালা আনত আননে!
এই লও, স্রোতে তব দিনু ভাসাইয়া
কমলকুসুমমালা, দিয়ে করে তার।

ইত্যাদি।

এই ইংরাজি কবিতা ও বাঙ্গালা কবিতাগুলিতে অতি অল্প প্রভেদ আছে।

বাঙ্গালী ভায়ারা করি নিবেদন
যোড় করে বন্দি ও রাঙ্গা চরণ!
যা কিছু বলিনু ভালরি কারণ
ভাবি দেখ মনে কোরনা রাগ।

রাগ ত করনা দাসত্ব করিতে
রাগ ত করনা নিগার হইতে
পাদুকা বহিতে অধীন রহিতে
হৃদয়ে লেপিয়া কলঙ্কদাগ!
এসব করিতে রাগ যদি নাই
আমার কথায় রেগোনা দোহাই
বাড়িবে কলঙ্ক আরো তা হ'লে!

অবসরসরোজিনীর কবি ভাবিতেছেন তিনি হাসিতে হাসিতে, উপহাস করিতে করিতে খুব বুঝি অর্থ স্পর্শ করিতেছেন, কিন্তু "বাঙ্গালী ভায়ারা" ইত্যাদিতে কবিতার উপর অভক্তি ভিন্ন আর কোন ভাব মনে আসে না। তাঁহার মনোরচিত কবিতার মধ্যে ছন্দ আছে বটে, কিন্তু ভাব নাই। তাঁহার প্রেমের কবিতার মধ্যে কৃত্রিমতা ও আড়ম্বর আছে বটে কিন্তু অনুরাগের জ্বলন্ত তেজ নাই। তিনি 'কেন ভালবাসির?'র ন্যায় একটি কবিতা লিখিতে পারেন না এবং ভুবনমোহিনীরও তাঁহার 'প্রিয়তমা হাসিল'র ন্যায় কবিতা মনে আসিতে পারে না। সরোজিনীর মধ্যে রূপক তুলনার কৌশলবাক্যের আড়ম্বর আছে, কিন্তু সেগুলি হৃদয় স্পর্শ করে না। ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে অর্থহীনতা, অসম্বদ্ধ রচনা অনেক আছে তথাপি সেগুলি সত্ত্বেও কতকগুলি কবিতা হৃদয় স্পর্শ করে।

যদিও ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে প্রয়াসজাত কবিতা নাই, সবগুলিই প্রতিভার চিরজীবন্ত নির্ঝরিণী হইতে উৎসারিত, তথাপি যদি ভুবনমোহিনীকে মন হইতে স্থানান্তরিত করিয়া কবিতাগুলি পড়ি তবে কেমন লাগে বলিতে পারি না। আমরা ইহার যাহাই পড়িতে যাই তাহাতেই ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে। গুণ পাইলে অমনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি সেই গুণ দ্বিগুণিত হইয়া মনে উঠে। দোষ পাইলে অমনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি তাঁহার চতুর্থাংশ কমিয়া যায়। যখন আমরা

রুধির মেখেছে, রুধির পিতেছে,
রুধির প্রবাহে দিতেছে সাঁতার
ছিন্ন শীর্ষ শব, ভেসে যায় সব
পিশাচী প্রেতিনী কাতারে কাতার!
সম্বনে নিস্বনে মলয় পবন,
আহরি সুরভি নন্দনরতন
মন্দারসৌরভ অমৃতরাশি
মর্ম্মরিছে তরু অটল ভূধর,
দমিছে দাপেতে কাঁপিছে শিখর—

প্রভৃতি পড়িয়া কিছুই অর্থ করিতে পারি না তখন ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে এবং ইহার অর্থ বুঝিতেও চাই না! যখন উন্মাদিনী পড়িয়া আমাদের হাসি আসে তখন ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি হাসি চাপিয়া ফেলি! যখন প্রতিভার 'পিশাচী' 'প্রেতিনী' ময়ী কবিতার মধ্যে কোন কর্কশ কথা পাই তখনি ভুবন-মোহিনীকে মনে পড়ে ও আমরা যথাসাধ্য কোমল করিয়া পাঠ করি! একজনকে আমি 'উন্মাদিনী' কবিতার

অর্থ বুঝাইতে বলি, তিনি কহিলেন আমি ইহার অর্থ বুঝাইতে পারি না, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে একটি মাধুর্য্য আছে। কবিতার মধ্যে যাহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ, যাহার অর্থ হয় না, লোকে তাহার মধ্যে মাধুর্য্য কল্পনা করে; এবং দর্শনের মধ্যে যে অংশটুকু দুর্ব্বোধ্য ও কঠোর তাহাই পাঠকেরা গভীর দর্শন বলিয়া মনে করেন। অনেক গীতিকাব্যের দোষ এই যে তাহার শৃঙ্খলা নাই, অর্থ নাই, উন্মত্ততাময়; অনেকে মনে করেন এরূপ উন্মত্ততা না হইলে কবির উচ্ছ্বসিত হৃদয় হইতে যে কবিতা প্রসূত হইয়াছে তাহার প্রমাণ থাকে না। প্রতিভা এই দোষে কলঙ্কিত। ইহার অনেক দোষ পরিহার করিয়া কতকগুলি কবিতা পাই যাহা উচ্চশ্রেণীর কবিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

'সরোজিনী' ও 'প্রতিভা' পড়িতে পড়িতে আমরা 'দুঃখসঙ্গিনী'কে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। 'দুঃখসঙ্গিনী'তে আর্য্যসঙ্গীত নাই, আর্য্যরক্ত নাই, যবন নাই, রক্তারক্তি নাই; ইহাতে হৃদয়ের অশ্রুজল, হৃদয়ের রক্ত ও প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নাই। হৃদয়ের বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে প্রেমে যেমন বৈচিত্র্য আছে, এমন আর কিছুতেই নাই। প্রেমের মধ্যে দুঃখ আছে, সুখ আছে, নৈরাশ্য আছে, দ্বেষ আছে, এবং প্রেমের সহিত অনেকগুলি মনোবৃত্তি জড়িত! এখন কতকগুলি সমালোচক ধুয়া ধরিয়াছেন যে প্রেমের কথা কহিলে বঙ্গদেশ অধঃপাতে যাইবে। এ কথার অর্থ খুব অল্পই আছে। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি প্রেমকে অবহেলা করিয়া যিনি তেজস্বিতা সঞ্চয় করিতে চাহেন তিনি মানবপ্রকৃতি বুঝেন না। যে মনুষ্যের হৃদয়ে প্রেম নাই তেজস্বিতা আছে, তাহার হৃদয় নরক! কিন্তু যাহার হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম আছে, তাহার তেজস্বিতা আছেই। তুমি কবি! নৈরাশ্য বিষাদ-জনিত অশ্রুজল যদি তোমার হৃদয়ে জমিয়া থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া ফেল! তাহা দমন করিয়া তুমি বলপূর্ব্বক যেন 'ভারত' 'একতা' 'যবন' প্রভৃতি বলিয়া চীৎকার করিও না। কবিতা হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে উত্থিত হয়, সমালোচকদের তিরস্কার হইতে উত্থিত হয় না। দুঃখ-সঙ্গিনীর বিষয় আমরা এই বলিতে পারি— তাহার ভাষা অতিশয় মিষ্ট। তিনি যেখানে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন সেইখানকার ভাষাই মিষ্ট হইয়াছে। তবে একটি কথা স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহার ভাবের মাধুর্য্য অপেক্ষা ভাষার মাধুর্য্য অধিকতর মন আকর্ষণ করে। এই পুস্তকের মধ্যে হইতে আমরা অনেক সুন্দর পংক্তি তুলিয়া দিবার মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে পারিলাম না।

এই রচনাটির পরিচয় এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'অগ্রদূত' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

শান্তিনিকেতনের দীক্ষা-আহ্বান

ক্ষিতিমোহন সেন

শুভ্র আলোকের মঙ্গলশঙ্খ আকাশ ভরিয়া যুগে যুগে বাজিয়া আসিতেছে। সর্বত্রই তো তাঁহার কল্যাণশঙ্খ বাজিতেছে। আকাশে তাহা বাজিতেছে শুভ্র জ্যোতিতে, প্রকৃতির মধ্যে বাজিয়াছে পুষ্পবনের পুণ্যগন্ধে ও বিহঙ্গকলসংগীতে, মানবের মধ্যে বাজিয়াছে প্রেমমৈত্রীর কল্যাণতপস্যায় ও ত্যাগে। তিমির পরপার হইতে আজ সেই মহাজাগরণের সুমহান্ আহ্বানকে বিমলতর পুণ্যকর-পরশ-হরষিত হইয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

মানব-কল্যাণ-তপস্যার এই আহ্বানই প্রাচীন যুগে বৈদিক ঋষিদের সুগম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে; তপস্তে আকাশন্ (তৈ. ব্রা., ৩, ১২. ৭৪)। এই তপস্যাই আকাশে আলোকরূপে দীপ্যমান। তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ সত্যং চ ত্যাগশ্চ ধর্মশ্চ সত্যং চ॥ এই শঙ্খই বাজিয়াছে মানবীয় সাধনার তপস্যায়, তাহাই বাজিতেছে আকাশের তেজোময় শুভ্র আলোকে, তাহাই বাজিতেছে মানবের শ্রদ্ধায়, তাহাই ধ্বনিত হইতেছে সকল সত্যে, সকল ত্যাগে। তাহারই নাম ধর্ম, তাহারই নাম সত্য।

সেই বিশ্ব-সত্যই মানব-তপস্যায় আপনাকে খুঁজিতেছে। সেই মঙ্গলশঙ্খের মূলাধার পরম সত্যকেই ঋষিরা বলিয়াছেন, সত্যং অসি (তৈ. সং. ১ ৬. ১১), তুমিই সত্য। জ্যোতিরসি (অ. ২. ১১. ৫), তুমিই জ্যোতি। জ্যোতির্জনায় শশ্বতে (ঋ. ১. ৩৬. ১৯), তুমিই বিশ্বমানবের শাশ্বত কল্যাণের জ্যোতি। তোমারই জয়, আর জয় জয় তোমারই কল্যাণের সঙ্গে অনুগত যুক্ত মানবের মঙ্গল-তপস্যায়। তপসে স্বাহা (বা. সং. ২২, ৩১), জয় হউক সেই তপস্যার। প্রবুধ্যস্ব সুবুধা বুধ্যমানা (অ. ১৪. ২. ৭৫)। বিশ্বচরাচরব্যাপী সেই কল্যাণশঙ্খের শোভন মঙ্গল জাগরণে সকলে বুধ্যমান হইয়া আজ জাগ্রত হউক; প্রবুদ্ধ হউক। আজ জগৎ অকল্যাণের দুঃস্বপ্নে প্রপীড়িত; মোহ ঘুচুক, দুর্গতি দূর হউক।

সেই তপস্যাতে আগে হইতেই যিনি জাগিয়াছেন তিনিই যথার্থ তপস্বী— তপসা তপস্বী, (অথর্ব, ১৩. ২. ২৫)। আগে হইতেই মানবকল্যাণের জাগ্রত সেইসব তপস্বীদের জয় হউক। এখন যাঁহারা সেই কল্যাণ-তপস্যায় জাগিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও জয় হউক। ভবিষ্যতে যাঁহারা কল্যাণের সেই মহাতপস্যায় জাগিবেন, তাঁহাদেরও জয়-জয়কার হউক।

জাগরিতায় স্বাহা
জাগ্রতে স্বাহা
জাগরিষ্যতে স্বাহা— তৈ. সং. ৭. ১. ১৯. ২

এই তপস্যার জন্যই ভবিষ্যৎ তপস্বীদের জাগাইতে গম্ভীর কণ্ঠে কঠোপনিষৎ ডাক দিয়াছেন

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।—কঠ, ৩. ১৪

এই শূন্য প্রান্তরের বিশাল বক্ষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই বিরাট ডাকই রাখিয়া গিয়াছেন। আজও বিশ্বজগৎ ভরিয়া সেই আহ্বান-ভারতীই ধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার দীক্ষাদিন— আহ্বানের দিনটিকে ধরিয়া এই প্রান্তরে তিনি তাঁহার বিরাট দীক্ষামন্ত্রটি মন্ত্রিত করিলেন। সেই পুণ্যদিনে সেই কল্যাণশঙ্খে ধ্বনিত

হইল—এখানে দীক্ষার যজ্ঞ-অগ্নি জ্বলিয়াছে। সকলে সর্বদিক হইতে এখানে চলিয়া আইস—আয়ন্তু সর্বে সর্বতঃ স্বাহা।

ইহাই কি সত্য? দীক্ষাদিনের ডাক কি আজও ধ্বনিত হইতেছে? নিশ্চয়। সেই ধ্বনির কি অবসান আছে? সেই ধ্বনি এখনো মন্দ্রিত হইয়াই চলিয়াছে। সেই শাশ্বত ঘোষণার কখনো মৃত্যু নাই। কান থাকিলে শুনিবে, চক্ষু থাকিলে দেখিবে।

পশ্যদক্ষণ্বান্ ন বিচেতদন্ধঃ —ঋ ১, ১৬৪, ১৬

যখন কেহ সেই আহ্বান শুনিতে পায়, তখনই ব্রহ্ম তাহার জীবনে হন দীপ্যমান। এই ধ্বনি শুনিতে না পাওয়ার অর্থই মৃত্যু।

এত দ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যচ্ছোত্রেণ শৃণোতি অথৈ তন্ম্রিয়তে যন্ন শৃণোতি।

শান্তিনিকেতনের দীক্ষা আহ্বানের মৃত্যু নাই। মহর্ষির সেই ঘোষণার মুহূর্তটি ক্ষণ হইলেও মানব-কল্যাণ-তপস্যার অমৃতপরশে শাশ্বত অক্ষর হইয়া চিরদিন বিরাজ করিবে। কেমন করিয়া তবে বিলয়ধর্মী কাল অমৃতত্ব লাভ করিল?

বৃষ্টির বিন্দু মুহূর্তে বিলীন হয়। তাহাই যদি স্বাতী নক্ষত্রের শুভলগ্নে শুক্তিতে প্রবেশ করে তবে তাহাই হয় মুক্তা। উপমা মিথ্যা হইলেও এ কথা চিরসত্য যে বিশ্বমানবের কল্যাণ-তপস্যায় মৃত্যুহীন অমৃতলগ্নের বিনাশ নাই। সেই মুহূর্তে তাহা যথার্থ কল্যাণপরশ লাভ করিল, সেই মুহূর্তেই তাহা সকল বিশ্বের। শুক্তি যাহারই হউক, মুক্তার মুক্ত সৌন্দর্য নিখিল মানবের। এখানে বৈষয়িক অধিকার যাহারই হউক, এখানকার চিন্ময় অধ্যাত্মসম্পদ্ বিশ্বসংসারের। তাই আশ্রমের উৎসবে সবারই চিরন্তন অধিকার। এই উৎসব-আহ্বান মহর্ষি সকলকে সর্বকালের জন্য দিয়া গিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, ধর্মসাধনার ও তপস্যার এই দান লইয়া এখনকার বিজ্ঞান-শাসিত দিনে কি লাভ হইবে? তাহা ছাড়া এ কথাও অনেকে মনে করেন ধর্ম একটা বৃথা ভাব-বিলাসিতা মাত্র। ধর্ম মনের ভাব-সৌন্দর্য, অনুরাগ-ভক্তি-মৈত্রী প্রভৃতি চিন্ময় আনন্দলীলা মাত্র। এখনকার দিনে এইসব সৌন্দর্য ও ভাব-বিলাসিতা লইয়া কী হইবে?

কে বলিল ধর্ম ও মৈত্রী শুধু ভাব-বিলাসিতা? চিন্ময় আনন্দেরও প্রয়োজন আছে। যিনি অরণ্যের কাছে কাষ্ঠ চান, তিনি যদি সৌন্দর্যমাত্র বলিয়া ফুলগুলিকে অরণ্য হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কাষ্ঠেরও আশা হয় তিরোহিত। মায়ের বুকের চিন্ময় স্নেহের মধ্যেই জীবশিশু বাড়িয়া উঠে। হাসপাতালের বৈজ্ঞানিক ধাত্রীবিদ্যাতেই যদি সৃষ্টি চলিত তবে আর মাতৃস্নেহের কোনো মূল্য থাকিত না। চিন্ময় সৌন্দর্য বিলাসিতা নহে, স্নেহ-প্রেমও বিলাসিতা নহে। সমস্ত ভবিষ্যৎ সৃষ্টির মূলাধারই এই বিস্ময় স্নেহ-সৌন্দর্য।

ধর্ম শুধু সৌন্দর্য ও প্রীতি বা মৈত্রীমাত্র নহে। ধর্ম আমাদের সমস্ত জীবনের মূলগত সংযম ও তপস্যা। যেখানে শক্তি ও বেগ সেইখানেই চাই সংযম। তাহা না হইলে সকল শক্তি ও বেগের পরিণতি হইবে প্রলয়ে। পালে বাতাস লাগে যতই জোরে, ততই দৃঢ় হাতে ধরিতে হয় নৌকার হাল। অশ্ব যতই শক্তিশালী, লাগাম ততই শক্ত হওয়া চাই। নহিলেই সমূহ বিপদ।

বিজ্ঞানও প্রচণ্ড শক্তি। এই অন্ধশক্তিকে যদি ধর্ম অর্থাৎ মানবীয় স্নেহ ও প্রীতি দ্বারা চালিত না করা

হয়। যদি জনকল্যাণ তাহার লক্ষ্য না হয় তবে যে কী সর্বনাশ হইতে পারে তাহা য়ুরোপ ও আমেরিকা ক্রমেই অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ধর্ম হইতে বিমুখ হইলে বিজ্ঞান কী নিষ্ঠুরই হইতে পারে! অথচ ধর্মের সহায়তায় বিজ্ঞানের সম্পদের অন্ত নাই। মানবের কত কল্যাণই বিজ্ঞান না করিতে পারে! ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে এই সামঞ্জস্য সাধিত না হইলে কিছুতেই চলিবে না। হাজার হাজার বছর আগে এই কথাই ঈশোপনিষৎ উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ —ঈশ. ৯

যাঁহারা অবিদ্যা অর্থাৎ শুধু পার্থিব ভৌতিক বিদ্যার (বিজ্ঞান) উপাসনা করেন তাঁহারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। আর যাঁহারা শুধু অধ্যাত্ম বিদ্যায় রত। তাঁহারা তদপেক্ষাও গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হন।

বিদ্যাং চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদো ভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া মৃতমশ্নুতে।—ঈশ. ১১

আর যাঁহারা পার্থিব বিদ্যা ও অধ্যাত্ম বিদ্যা একত্র যুক্ত করিয়া জানেন তাঁহারা পার্থিব বিদ্যার কল্যাণে মৃত্যু হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অধ্যাত্মবিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন।

মহর্ষির সাধনার মধ্যে উভয় বিদ্যার এই সামঞ্জস্যটি সুব্যবস্থিত ছিল। তাই এখানে তিনি ধর্মসাধনার তপস্যা করিয়াও উত্তরকালের জ্ঞান ও সৌন্দর্য সাধনার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পিতৃদেব মহর্ষির সেই কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করিলেন। তাই আজ এই সাধনার স্থানে বিশ্বমানবের অবাধ আমন্ত্রণ বিঘোষিত।— শান্তিনিকেতনে জগতের কল্যাণের জন্য মহাসামঞ্জস্য সাধিত হইবে!

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি, বাণীতেই প্রকাশ করা ছিল তাঁর পক্ষে সহজ। নির্জন পদ্মাতীরে তিনি তাঁহার কবিসাধনার আসনে বসিয়া এই মৈত্রীসাধনার কথা কত কবিতায় কত গানে না প্রকাশ করিলেন! কিন্তু কেবল কথা ও সুরে সেই সত্যের সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না। এই জন্যই তাঁহাকে আসিতে হইল শান্তিনিকেতনের এই উদার উন্মুক্ত প্রান্তরে। সেখানে বিদ্যা ও জ্ঞানের ভিতর দিয়া তিনি তাহারই প্রকাশ দিতে চাহিলেন— ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। কর্মে তিনি সেই মন্ত্রের প্রকাশ দিলেন শ্রীনিকেতনের পল্লীসেবার কাজে। যে-মন্ত্র তিনি চেতনায় লাভ করিয়াছিলেন তাহাকে কেবল চেতনায় আবদ্ধ না রাখিয়া তিনি নিখিল লোককল্যাণে ব্যাপ্ত করিতে চাহিলেন। এই যে প্রসার, এই যে প্রকাশ, তাহারই উপর তাঁহার বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা। এই সাধনার প্রথমে তিনি শুধু ভারতবর্ষকেই ডাকিয়াছিলেন। অচিরেই তিনি উপলব্ধি করিলেন এই মহামন্ত্র, তার প্রয়োজন সর্বসাধারণের জন্য, সাধনার জন্য সমস্ত বিশ্বের সহযোগ প্রার্থনীয়। প্রথম যুগের ব্রহ্মচর্যাশ্রম রূপান্তরিত হইল বিশ্বভারতীতে।

গুরুদেব আজ পরলোকে। কিন্তু তিনি তাঁহার আহ্বান রাখিয়া গিয়াছেন এই বিশ্বভারতীতে— যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্। সেই ডাকে সমস্ত বিশ্বের সাধনা এইখানে একত্রিত হউক, সিদ্ধ হউক এবং সর্বত্র প্রসারিত হইয়া জগতের সমস্ত অকল্যাণকে বিদূরিত করুক— জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক।

আজ সারা জগতে এই সাধনতীর্থের মুক্ত তপস্যার অতিশয় প্রয়োজন। আজ পৃথিবী বিপন্ন। প্রতীচ্য তাহার বৈজ্ঞানিক দারুণ শক্তি ও দুর্বার অস্ত্রসম্ভারে বিপন্ন ও নিরুপায় হইয়া এই দেশেরই কল্যাণসাধনার দিকে চাহিয়া আছে। আজ ভারত যদি প্রতীচীর এই বিপদের দিনে সাড়া না দেয় তবে বিজ্ঞানের মারণাস্ত্রভয়ে নিপীড়িত ভীত বিপন্ন পৃথিবীর আর উপায় নাই।

আজ ভারত যদি শুধু তাহার প্রাচীন তপস্যা লইয়াই বসিয়া থাকে বা য়ুরোপ-আমেরিকা যদি শুধু তাহার নবলব্ধ পার্থিব বিজ্ঞানযন্ত্র লইয়াই খুশি থাকে তবে চলিবে না। শিব-শক্তির মিলন না হইলে সৃষ্টি আর থাকে না। এই শিব-শক্তির মিলন না হইলে মহতী বিনষ্টিঃ।

আর আজ ভারত যদি তাহার তথাকথিত স্বাধীনতা পাইয়া হীনস্বার্থ ও সংকীর্ণতা বশত আপন কল্যাণব্রত হইতে সত্য তপস্যা হইতে ভ্রষ্ট হয় তবে সেই দুঃখের আর অন্ত নাই। সে "বিনষ্টি"র আর শেষ নাই, তাহা জগতের সর্বনাশ

বিবেকভ্রষ্টানাং ভবতি বিনিষ্টতি শত মূর্খঃ।
দৌর্ভিক্ষদ যাতি দৌর্ভিক্ষং কষ্টাৎ কষ্টং ভয়াদ্ভয়ম্॥

কাজেই ভারতকে আজ তাহার চিরন্তন মহদাদর্শে অটল থাকিতে হইবে। এবং আজ এই বিপদের দিনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাধনাকে মিলিতে হইবে। এই মিলন সাধনাই যথার্থ যোগ্য, তাং যোগমিতি মন্যন্তে—কঠ, ৬, ১১। মানবের যেমন দেহ আছে, তেমনি আত্মাও আছে। আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন দেহ অমেধ্য শবমাত্র এবং দেহ হইতে বিচ্যুত অশরীরী আত্মাকে সকলে দারুণ ভূত বলিয়াই ভয় পায়। দেহ বিনা আত্মা নিষ্ক্রিয়; আর আত্মা ছাড়া দেহ নির্জীব অকর্মণ্য। ইহাকেই সংস্কৃতে বলে অন্ধপঙ্গুন্যায়। চক্ষুষ্মান পঙ্গু আত্মাকে পাইয়া অন্ধ দেহ ধন্য; আর চলচ্ছক্তিসম্পন্ন অন্ধ দেহকে পাইয়া আত্মা সার্থক। আজ তাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ছাড়া কোনো গতি নাই। দানবশক্তিকে মানবধর্মের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ করিলেই নিখিল চরাচরের পরম কল্যাণ।

মহর্ষির এই সাধনার ক্ষেত্রে সেই পরিপূর্ণ যোগের আহ্বানবাণী ধ্বনিত হইয়াছে। এখানে বেদ-উপনিষদের সাধনা, ভাগবতদের ভক্তি, জৈন বৌদ্ধদের অহিংসা ও মৈত্রী, শৈবদের তপস্যা, বৈষ্ণবদের প্রেম, সাধুসন্তদের সাধনা সব যুক্ত হইয়া নবযুগের সাধনাকে এই মহাযোগতীর্থে আহ্বান করিতেছে। এখানে শুধু গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নহে, এখানে নিখিল সাধনার ধারা যুক্ত হইবে। এই মুক্তিতীর্থে সকল চরাচরের প্রতি সকল মানবের প্রতি শাশ্বত আহ্বান আসিয়াছে।

সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। —শ্বেত', ৩, ৪

সকলে সবার পরমকল্যাণের জন্য এখানে আসিয়া যুক্ত হউন।

শান্তিনিকেতন, ১৩৫৫

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৬

বৃহস্পতিবার, ১৩ই অক্টোবর ১৯২৭

প্রাতরাশ সেরে আজ সকাল ন-টায় কবির সঙ্গে আমরা গেলুম আর একজন রাজকুমারের বাড়ীতে— Prince Narisra, নরিস্র্া বা নরেশ্বর। ইনি প্রবীণ ব্যক্তি, ইংরিজি জানেন না। ইনি একজন ভাল চিত্রকর। যে বড়ো বৈঠকখানা ঘরে আমাদের স্বাগত ক'রলেন, সেখানে এঁরই আঁকা একটি মস্ত বড়ো রঙীন বিষ্ণুমূর্তি দেখলুম। অনন্ত নাগের উপর নারায়ণ, লক্ষ্মী আর সরস্বতীর সঙ্গে ব'সে। এখানে এই ব্যাপারে বাঙ্‌লাদেশের সঙ্গে শ্যামদেশের মিল আছে। বাঙ্‌লাদেশে বিষ্ণুর দুই পত্নী, লক্ষ্মী আর সরস্বতী। প্রাচীন বাঙ্‌লার পাল আর সেন যুগের পাথরের আর ধাতুর বিষ্ণুমূর্তিতে বিষ্ণুর দু-পাশে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে থাকেন লক্ষ্মীদেবী আর সরস্বতীদেবী, আবার বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় লক্ষ্মীদেবী আর ভূদেবী বা পৃথিবীদেবী। দক্ষিণ-ভারতে বিষ্ণুর সঙ্গে সরস্বতী থাকেন না— থাকেন লক্ষ্মী আর ভূদেবী। বাঙ্‌লাদেশে সাধারণতঃ সরস্বতী বিষ্ণুর পত্নী এবং লক্ষ্মীর সপত্নী ব'লে পরিচিত। কিন্তু বাঙ্‌লার বাইরে ভারতবর্ষের অন্যত্র অনেক জায়গায় সরস্বতী হচ্ছেন ব্রহ্মার পত্নী। এক্ষেত্রে শ্যামদেশে যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আর দেবকাহিনী প্রচলিত হ'য়েছিল, তার সঙ্গে বাঙ্‌লাদেশের একটু বিশেষ যোগ দেখা যাচ্ছে। রাজকুমার নরেশ্বর শ্যামের প্রাচীন শিল্প-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ দেখে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এই শিল্পের বাছা-বাছা কতকগুলি শ্রেষ্ঠ জিনিসের ছবি তিনি পরে কবিকে পাঠিয়ে' দেবেন।

রাজকুমারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা গেলুম আর একটি বৌদ্ধ মন্দির দেখ্‌তে— Wat Sudat বা Wat Sudasn অর্থাৎ 'সুদর্শন' মন্দির। এটি মন্দিরও বটে, আর ভিক্ষুদের থাকবার বিহারও বটে। এই মন্দিরের দেওয়ালে প্রাচীন পদ্ধতির শ্যামী ভিত্তিচিত্র অনেক আছে, বৌদ্ধ ইতিহাসের সঙ্গে-সঙ্গে স্থানীয় শ্যামী জীবন-যাত্রার চমৎকার নিদর্শন এই সব ছবিতে আছে। ব্রোঞ্জের কতকগুলি ঘোড়ার মূর্তিও এই মন্দিরে আছে। মঠাধিকারী একজন অল্প-বয়সী শ্যামী ভিক্ষু। কথাবার্তায় জানা গেল তিনি কিছু পালিও জানেন।

কবি এর পরে হোটেলে ফিরে গেলেন, কারণ তাঁকে নিয়ে এত ঘোরাফেরা চলে না। একে তাঁর বয়স হ'য়েছে, তা-ছাড়া অল্প একটু ঘুরলেই শ্রান্ত হ'য়ে পড়েন। আমাদের সঙ্গে যে শ্যামী অফিসারটি শ্যামদেশের সরকারের পক্ষ থেকে সব দেখিয়ে' শুনিয়ে' বেড়াচ্ছিলেন, সেই ফ্রা রাজধর্ম-নিদেশ, তিনি একটু যেন চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লেন—তাঁর ভাবনা হ'চ্ছিল এই যে, সরকার থেকে যেখানে-যেখানে কবিকে নিয়ে যাবার জন্য প্রোগ্রাম ক'রে দিয়ে তাঁর উপর নিয়ে যাবার হুকুম দেওয়া হ'য়েছে, সেই প্রোগ্রাম-মোতাবেক সব জায়গায় কবিকে না নিয়ে গেলে তাঁর কর্তব্যের খেলাপ হবে, তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে যেন তাঁকে জবাবদিহি ক'রতে হবে। এই কারণে তাঁর একটু বেশী আগ্রহ ছিল, যেন কবিকে সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। আর সেটা না হওয়ায় তিনিও যেন একটু অস্বস্তিতে প'ড়লেন। যা-হ'ক্, তিনি কেবল আমাদের সঙ্গে ক'রে বাকি কয় জায়গায় নিয়ে গেলেন, প্রোগ্রামের খেলাপ হ'ল না।

আমাদের তার পরে নিয়ে গেলেন এখানকার স্থানীয় ব্রাহ্মণদের মন্দিরে। শ্যামী ব্রাহ্মণেরা যে ভারতবর্ষ থেকে এসেছিলেন, তার নানা প্রমাণ আছে। প্রাচীন শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, কম্বুজ বা কাম্বোডিয়ার রাজবংশের পত্তন করেন দক্ষিণ-ভারত থেকে আগত 'কম্বু' নামে একজন ব্রাহ্মণ। তিনি ঐ দেশে এসে বাস ক'রতে থাকেন, আর 'মেরা' নামে একজন 'অপ্সরা' অর্থাৎ স্থানীয় অভিজাত বংশের কন্যা অথবা রাজ-কুমারীকে বিয়ে করেন। কম্বু আর মেরার পুত্র কাম্বোডিয়ার সূর্য্য-বংশীয় রাজ-কুলের আদি-পুরুষ। আবার চম্পা বা কোচিন-চীনের সোম বা চন্দ্র-বংশীয় রাজ-কুলের আদি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দক্ষিণ-ভারত থেকে আগত 'কৌণ্ডিন্য' নামে আর একজন ব্রাহ্মণ। ইনি 'সোমা' নামে একটি স্থানীয় 'নাগ-কন্যা' অর্থাৎ এখানকার চাম্-জাতির কুমারীকে বিবাহ করেন। এই চম্পা দেশ (কোচিন-চীন, এখনকার দক্ষিণ-ভিয়েৎ-নাম) সেকালে চাম্ বা আদি-চম্পা জাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল ; এরা এখনকার ভিয়েৎ-নামী জাতির দ্বারা বিজিত হয়, আর এখন এরা প্রায় সম্পূর্ণ-রূপে বিধ্বস্ত হ'য়ে গিয়েছে। এইভাবে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা আর ক্ষত্রিয় আর অন্য জাতির লোকেরা এই দেশে এসে বিয়ে-থা ক'রত, স্বদেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অন্য-ভাবে থাকলেও, বৈবাহিক আদান-প্রদান, অত দূর দেশ ব'লে, আর হ'তে পা'রত না। শ্যাম-দেশের ব্রাহ্মণদের চেহারা দেখ্‌লে বোঝা যায় যে এঁরা মিশ্র জাতির মানুষ। গায়ের রঙ্ গৌর-বর্ণ, তবে অন্য শ্যামীদের তুলনায় একটু ময়লা-মতন। কারণ, অপেক্ষাকৃত শ্যাম-বর্ণ ভারতীয় জাতির সঙ্গে মিশ্রণ হ'য়েছিল। মিশ্র জাতির হ'লেও, ব্রাহ্মণদের আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি, সংস্কৃত-চর্চা এই সমস্তই এঁরা পূরাপূরি বজায় রাখবার চেষ্টা ক'রে এসেছেন। প্রাচীন কালে শ্যামীরা ফানুম বা মাল-কোঁচা দিয়ে লুঙ্গি প'রত— মেয়ে পুরুষ দুই-ই,— আর গায়ে একখানা চাদর রাখ্‌ত। এখানকার ব্রাহ্মণদের পোশাকও ঐ রকমের ছিল। তবে আজকাল কোনও-কিছু সরকারী ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের আনুষ্ঠানিক-ভাবে যোগ দিতে হ'লে, তাঁদের নীল বা শাদা রঙের ফানুম, আর সাদা কাপড়ের গলা-আঁটা কোট প'রতে হয়। শ্যামী জাতির মানুষের মতন এখানকার ব্রাহ্মণদের মুখে দাড়ি-গোঁফ কম। তবে মাথার উপরে সকলে চূড়ার আকারের একটি বড়ো টিকি বা ঝুঁটি রাখেন— প্রায় পাকানো বেণী ব'ললেই হয়— সেটিকে মাথার উপরে গোল ক'রে পাকিয়ে', তা'তে ২।১টি ফুল গুঁজে রাখেন। এই ব্রাহ্মণ-মন্দিরটির স্থানীয় নাম হ'চ্ছে Bot Bhram, 'ব্যোৎ-ফ্রাম', 'ফ্রাম' শব্দটি হ'চ্ছে সংস্কৃত 'ব্রহ্ম' বা 'ব্রাহ্মণ', অথবা 'ব্রাহ্মণ্য' শব্দের শ্যামী বিকার। এই মন্দিরে আমাদের জন্য কতকগুলি ব্রাহ্মণ প্রতীক্ষা ক'রছিলেন— সকলেরই গায়ে সাদা কোট, পরণে নীল রঙের ফানুম, পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত সাদা মোজা, বিলিতি জুতা, আর মাথার চূড়ার মধ্যে ফুল গোঁজা। এঁদের মধ্যে দেখ্‌তে বেশ সুন্দর এবং সৌম্য চেহারার একজন ব্রাহ্মণ যুবক ছিলেন। এঁরা কেউ ইংরিজি জানেন না। ফ্রা রাজধর্ম-নিদেশ যথারীতি দোভাষীর কাজ ক'রলেন। মন্দিরের প্রধান দেবতা হ'চ্ছেন শিব। বেদির উপরে একটা ব্রোঞ্জের তৈরী মস্ত বড়ো শিব-মূর্তি, আর তা ছাড়া বেদির আশে-পাশে অন্য নানা দেবতার ছোটো-ছোটো মূর্তি। শ্যামদেশে ভারতের হিন্দু দেবতাদের পোশাকে এবং মুখাবয়বে যে পরিবর্তন হ'য়েছে, তার কিছুটা উল্লেখ উপরে ক'রেছি। এই দেশে গরুড়-বাহন বিষ্ণুমূর্তি খুবই লোকপ্রিয়। বৌদ্ধ মন্দিরে দেখেছি, বুদ্ধ-মূর্তির কাছে-পিঠে শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী বা বসুধারা, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, Nang-Thoroni নাঙ-থরনি অর্থাৎ ধরণী বা পৃথিবী দেবী— এঁদের মূর্তিও খুব দেখা যায়। বেদির সামনে আমাদের বস্‌বার জন্য কতকগুলি চেয়ার পাতা ছিল। ব্রাহ্মণেরা কি রীতিতে তাঁদের পূজার অনুষ্ঠান করেন, সেটা দেখা হ'ল না, তবে বেদির উপর ফুল, পঞ্চপাত্র, শাঁখ, প্রদীপ ইত্যাদি সব ছিল। ওঁরা কিভাবে মন্ত্র পড়েন তা

জান্‌বার ইচ্ছা হওয়ায়, কতকগুলি সংস্কৃত স্তোত্র প'ড়ে ওঁরা শোনালেন— উচ্চারণ একেবারে দুর্বোধ্য নয়, তবে তাতে শ্যামী ভাষার ছাপ স্পষ্ট। ব্রাহ্মণদের সামাজিক অবস্থা আর শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধেও কিছু কথা হ'ল। শ্যামদেশে প্রাচীন ভারতীয় রীতি কিছু-কিছু বিদ্যমান, অনেকটা বর্মারই মত। অনেকগুলি হিন্দু ও ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠান যা বুদ্ধদেব নিজে পালন করেছিলেন, সেগুলি এখানেও চলে। যেমন, নামকরণ, ছোটো ছেলেদের কর্ণবেধ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি সব অনুষ্ঠানে, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আস্‌তে হয়। তাঁরাই শ্যামী গৃহস্থদের ঘরে পূজা অর্চনা মন্ত্রপাঠ ক'রে থাকেন। এখন অবশ্য এইগুলি অনেকটা উঠে যাচ্ছে। কিন্তু রাজ-পরিবারের মধ্যে, আর বড়ো-বড়ো সামন্ত আর জমিদারদের ঘরে, প্রাচীন আভিজাত্যের নিদর্শন হিসাবে ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান অনেক আছে। শ্যামদেশে নূতন রাজার অভিষেকের সময় ব্রাহ্মণদের একটা মস্ত বড়ো স্থান আছে। এই রাজ্যে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি বয়সে আর বিদ্যা-বুদ্ধিতে সকলের চেয়ে প্রবীণ, তাঁকে স্বয়ং কাশীতে এসে গঙ্গাজল নিয়ে যেতে হয়, তাতে রাজার অভিষেক হয়। আমরা যেদিন বাংকক শহরে এসেছিলুম, সেদিন বিজয়া দশমীর দিন। প্রাচীন হিন্দু রাজাদের অনুসরণে শ্যামী ফৌজের এক বিরাট্ প্যারেড হ'ল, তখন প্রত্যেক সেনাদলের ঝাণ্ডা আনা হ'ল মন্ত্রপূত করবার জন্য, দুইটি পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডপে— একটিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা হ'লুদে কাপড় প'রে জমা হ'য়েছিলেন, তাঁরা পালি মন্ত্র প'ড়ে যুদ্ধের ঝাণ্ডা বা পতাকার উদ্দেশ্যে মঙ্গল-কামনা ক'রলেন, তারপর আর একটি মণ্ডপে সাদা জামা পরা, মাথায় চূড়া, পায়ে জুতা শ্যামী ব্রাহ্মণেরা পঞ্চপাত্র থেকে জল ছিটিয়ে ঝাণ্ডাগুলিকে মন্ত্রপূত ক'রে দিলেন। এই ব্রাহ্মণদের জমিজমা কিছু-কিছু আছে। তবে প্রাচীন-কালের মতন এঁদের আর সেই মর্য্যাদার স্থান থাক্‌ছে না। সাধারণ-ভাবে এঁরা অন্য শ্যামী নাগরিকের মত লেখাপড়া শিখে সরকারী কাজকর্মেও যেতে আরম্ভ ক'রেছেন। কিন্তু এখনও বেশীর ভাগই ঘরে ব'সে একটু সংস্কৃত শিখে নেন, জ্যোতিষের চর্চা করেন, তবে এই পর্য্যন্ত— শ্যামী ব্রাহ্মণরা কাশীতে বা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও রীতিমত সংস্কৃত প'ড়তে এসেছেন, তা শুনি নি। বহুপূর্বে এই রকম রীতি ছিল। বর্মা থেকে আসতেন, বৌদ্ধভিক্ষু আর ব্রাহ্মণেরা— বর্মায় ব্রাহ্মণদের বলা হয় "পোন্না"— তেমনি শ্যাম থেকেও সম্ভবতঃ আস্‌তেন। অতি প্রাচীন কালের কথা আলাদা। আমার খুব ইচ্ছা হ'চ্ছিল এঁদের সঙ্গে ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে কথাবার্তা কই। বলিদ্বীপের ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে যতটা জান্‌তে পারা গিয়েছিল, এখানে ততটা জান্‌তে পারা গেল না, এজন্য বেশ একটু আপসোস্ হয়— বলিদ্বীপে দুই সপ্তাহ, আর শ্যামী ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঘণ্টাখানেকের বেশী তো নয়।

এর পরে আমরা গেলুম, অনেক লক্ষ টিকল খরচ ক'রে তৈরি ওখানকার রাজার সিংহাসন-দরবারে। একটা বিরাট্ পাথরের বাড়ী— আধুনিক ইটালিয়ান রেনেসাঁস্, বা প্রাচীন গ্রীক আর রোমান বাস্তু-রীতি এবং শিল্পের প্রভাবে খ্রীষ্টীয় ১৫-১৬র শতকে ইটালিতে যে বাস্তু-রীতি প্রবর্তিত হয়, সেই রীতি অনুসারে এই বাড়ীটি পরিকল্পিত। এর ভিতরটার অলঙ্করণ নানা রঙীন মর্মর-প্রস্তরে তৈরী। ইটালি থেকে আনা হয়েছিল এইসব রঙীন পাথর। তা-দিয়ে বাড়ীর ভিতরকার থাম, মেঝে, দেওয়াল, প্রভৃতি ; এবং বাড়ীর ছাতের গোল গম্বুজের নীচে mosaic মোসাইক বা পচ্চেকারী কাজ, অর্থাৎ রঙীন, সোনালী আর রূপালী চীনে-মাটির আর পাথরের টুকরো মিলিয়ে-মিলিয়ে আঁকা ছবি বা নক্‌শা— এসব রচিত হ'য়েছে। এই প্রকারের ছবিতে শ্যামদেশের প্রাচীন ইতিহাসের কতকগুলি ঘটনা প্রদর্শিত হয়েছে। কোনও বিশেষ ঘটার ব্যাপার হ'লে, এই সিংহাসন-সভা ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোন বিদেশী রাষ্ট্র-প্রতিনিধিকে যখন শ্যামদেশের রাজা

আনুষ্ঠানিক-ভাবে দেখা দেন, আর সেই রাষ্ট্র-প্রতিনিধি বা দূতের কাছ থেকে তাঁর নিজের দেশের সরকারের পক্ষ থেকে পত্র গ্রহণ করেন। এই বাড়ীটির নাম হ'চ্ছে Dusit Prasat অর্থাৎ 'তুষিত প্রাসাদ', 'তুষিত' হ'চ্ছে বৌদ্ধ মতে একটি স্বর্গের নাম, যে স্বর্গ থেকে বুদ্ধদেব পৃথিবীতে এসে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন আর শাক্য-বংশে জন্ম নিয়েছিলেন। স্থানীয় ইংরিজি ভাষায় একে বলে Dusit Throne Hall. এই Dusit Throne Hall-এর প্রধান ঘর বা কেন্দ্র হ'চ্ছে 'আনন্দ সমাগম' রাজ-সভা— এই আনন্দ সমাগম রাজ-সভায় রাজার সিংহাসন স্থাপিত আছে। শ্যামী উচ্চারণে বলে 'আনন্থ সমাখোম'। একটি সিংহাসন হ'চ্ছে ইউরোপীয় ধরণের— একটি বড়ো স্বর্ণমণ্ডিত চেয়ার। আর একটি সিংহাসন হ'চ্ছে প্রাচীন শ্যামী বা ভারতীয় পদ্ধতির, সেটি খুব উঁচু, পিছনের দিক্ থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে হয়। সেটির উপরে যে গদি পাতা আছে, তার উপরে সিংহচর্ম বিছানো আছে, এবং দুই পাশে জরির কাজ করা সাদা কাপড়ে ঢাকা তাকিয়া। সিংহাসনের মাথার উপরেতে একটির উপরে আর একটি ক'রে, সাতটি সাদা কাপড়ের সাবেক চালের ছত্র; আর সিংহাসনে রাজা যেখানে পিঠ রেখে বসেন তার পিছনে গরুড়-বাহন বিষ্ণু-মূর্তি, কালো কাঠের তক্তায় সাদা ঝিনুকের কাজে এই মূর্তি আঁকা। সমস্ত প্রাসাদটির মধ্যে বেশ একটা শিল্প-ভাস্বর ঐশ্বর্য্যের ভাব।

আজকে দুপুর একটায় ছিল এখানকার চূড়ালঙ্করণ বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজন। অনেক প্রধান-প্রধান ব্যক্তির আগমন হ'য়েছিল। কতকগুলি মহারাজকুমার— শ্যামের মহারাজার পিতৃব্যরা— এসেছিলেন, যেমন রাজকুমার দামরঙ্, রাজকুমার ধনিনিরাৎ, রাজকুমার বিদ্যা। ভারতীয় বণিক্ শ্রীযুত নানা-ও আহূত হ'য়ে এসেছিলেন। একজন রাজকুমার ব'ললেন যে তিনি ভারতবর্ষের একজন বিশিষ্ট রাজ-কর্মচারী, Accountant-General শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্রকে জানেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক খোলা ময়দানে প্রায় দুই-আড়াই হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের সমাগম হ'ল। কবিকে সেখানে গিয়ে ছোটো একটি বক্তৃতা দিতে হ'ল— প্রাসঙ্গিক-ভাবে তিনি বুদ্ধদেবের করুণার বাণী আর ভারতবর্ষের জ্ঞান-চর্চার কথা ব'ললেন, প্রায় ২০ মিনিট ধ'রে। তারপর সামান্য কিছু বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল, এবং আমাদের সভা এখানেই শেষ হ'ল।

কবি হোটেলে ফিরে গেলেন। আমরা তখন জাহাজ কোম্পানীর আপিসে গিয়ে, আমাদের দেশে ফির্‌বার জন্য জাহাজের টিকিটের ব্যবস্থা ক'রতে ব'সে গেলুম। জাপানী জাহাজ-লাইন Nippon Yusen Kaisha কোম্পানীর Awa Maru 'আওয়া-মারু' জাহাজ, পেনাং থেকে ক'লকাতায় যাবে কয়দিন পরে, ক'লকাতার জন্য তিন খানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনলুম। ঠিক হ'ল যে কবি, সুরেন-বাবু এবং আমি, এই তিনজন একত্র ফিরবো; আর আরিয়ম্ এখানে দিন কতকের জন্য থেকে যাবেন। এর পরে সুরেন-বাবুতে আর আমাতে শহরের এদিক ওদিক ঘোরাফেরা ক'রে, কতকগুলি টুকিটাকি জিনিস কিনলুম। তার মধ্যে শান্তিনিকেতনের মিউজিয়মের জন্য ঝিনুকের পচ্চেকারী কাজ করা কালো কাঠের বাক্স ছিল।

আজ বিকেল পাঁচটায় স্থানীয় চীনাদের আহূত এক সভায় কবির সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়, আর তাঁর জন্য চা-পানের আয়োজন করা হয়। জাহাজের ব্যবস্থা আর অন্য কেনা-কাটার কাজে নিযুক্ত থাকায়, সুরেন-বাবুর এবং আমার এই চীনাদের চা-পান সভায় যাওয়া হ'ল না, কবির সঙ্গে কেবল আরিয়ম্ ছিলেন।

আজ সন্ধ্যার দিকে শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ আলী আমাদের জন্য তাঁর বাড়ী থেকে ভারতীয় খাবার তৈরী ক'রে এনে দিয়ে গেলেন। অনেক দিন পরে ভারতীয় রান্না পোলাও, কোর্মা, হালুয়া প্রভৃতি খাওয়া গেল। শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ আলীর সঙ্গে তাঁর আত্মীয় কতকগুলি ছোকরাও এসেছিল। স্থানীয় সিন্ধী curio বা মণিহারী দোকানের মালিকরা কবিকে কয়েকখানি কাশীর কিংখাব উপহার দিয়ে গেলেন।

কবি ইতিপূর্বে শ্যাম-দেশের উদ্দেশ্যে ইংরিজিতে যে কবিতাটি লিখেছিলেন, সেটি স্থানীয় 'বাংকক ডেলি-মেল' প্রেসে অতি সুন্দর-ভাবে ছাপানো হয়। শ্যামের রাজা ও রানীকে ভেট দেবার জন্য সেই কবিতা দুখানি ভালো কাগজে ভালো ক'রে ছেপে রেশমের রুমালে মুড়ে নেওয়া হ'ল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে কবির নিজের হাতে লেখা ইংরিজি অনুবাদ আর মূল বাঙ্‌লা দুই-ই ঐ সঙ্গে আমরা নিয়ে নিলুম।

নৈশ আহারের পরে, রাত্রি সাড়ে-নয়টায় আমাদের রাজবাড়ীতে নিয়ে গেল। কবি অবশ্য সাদা গরদের জোড় আর সাদা রেশমের পাঞ্জাবী প'রে গেলেন, এতে তাঁকে বিশেষ সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু আমাদের তিন জনকে এক অভূত-পূর্ব পোশাকে কি-রকম দেখাচ্ছিল তা অনুমান ক'রতে পারি না। শ্যাম-দেশের রাজসভার এটিকেটের মর্য্যাদা এ-রকম অদ্ভুত-ভাবে আমরা রক্ষা ক'রলুম— আমরা প'রেছিলুম কালো রেশমের ধুতি আর সাদা রেশমের পাঞ্জাবী, আর গলায় সাদা রেশমের চাদর, এবং মাথায় গোল কালো টুপি। অবশ্য রাজসভার শ্যামী অভিজাত-বর্গের পোশাকের সঙ্গে তার একটা সামঞ্জস্য হ'ল— তাঁরা প'রেছিলেন, সকলেই, ময় রাজা পর্য্যন্ত— কালো রেশমের ফানুম, সাদা জিনের কোট, আর পায়ে সাদা মোজা। এই সভায় শ্যাম-দেশের অনেক রাজপুত্র আর অন্য অভিজাত ব্যক্তিরাও ছিলেন, যেমন প্রিন্স দামরঙ্, প্রিন্স চান্তাবুন, প্রিন্স ধনীনিব্রাৎ, প্রিন্স নরিস্রা। একটা বড়ো ঘরে কবির ভাষণ শুন্‌বার জন্য রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণে অনেকগুলি লোক এসে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। উপরে একটা গ্যালারি ছিল, সেটা-ও ভর্তি হ'য়ে গিয়েছিল। আমরা কবির সঙ্গে এই ঘরে আস্‌তে, আমাদের তিনজনকে যথাস্থানে বসিয়ে' দেওয়া হ'ল। কিন্তু কবিকে ভিতরে রাজার খাস কামরায় নিয়ে গেল, কবির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত Interview বা সাক্ষাতের জন্য। কবি এবং রাজা দুজনের এক সঙ্গে আগমনের জন্য বাইরে আমরা প্রতীক্ষা ক'রতে লাগলুম।

রাজার সঙ্গে কবি শিষ্টাচার-সম্মত আলাপ ক'রলেন। ভারতবর্ষ আর শ্যামের বন্ধুত্ব সম্বন্ধে রাজা বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। বোধ হয় মিনিট ২০ এইভাবে কেটে গেল, স্থানীয় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের মধ্যে মৃদু আলাপের একটা গুঞ্জন চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। তারপরে দশটা বাজবার কিছু পরে কবিকে নিয়ে রাজা বক্তৃতা-ঘরে এলেন, সঙ্গে শ্যাম-দেশের রানীও ছিলেন। কবি আমাদের তিনজনকে রাজা ও রানীর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে' দিলেন। যথারীতি ওঁরা আমাদের সঙ্গে করমর্দন ক'রলেন। আজকালকার দিনে রাজ-বাড়ীর আদব-কায়দা অনেক ব'দলে গিয়েছে। আগে রাজার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারত না, ভূঁয়ে হাঁটুগেড়ে ব'স্‌তে হ'ত— বিদেশী হ'লেও। সে-সব এখন অতীতের কথা। তারপর কবির বক্তৃতা হ'ল, এক ঘণ্টার উপর ধ'রে। প্রায় ১০-২০ থেকে রাত্রি ১১-৩০ পর্য্যন্ত। এই রাজসভায় কবির বক্তৃতাটি চমৎকার হ'য়েছিল, যেমন হৃদয়গ্রাহী ভাষা, তেমনি তাঁর বলবার ভঙ্গী। প্রধানতঃ তিনি শান্তিনিকেতনের কথা ব'ললেন— প্রকৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে শিক্ষা দেওয়া, প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে গুরু আর শিষ্যের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগ, জাতীয় আত্মচেতনার উদ্বোধন, এই-সব আদর্শের কথা। শান্তিনিকেতনের কিছু-কিছু স্লাইড আমাদের কাছে ছিল, সেগুলি দেখাবার ব্যবস্থা হয়। তারপর শ্যামদেশ-সম্বন্ধে যে কবিতাটি

তিনি লিখেছিলেন, সেটি বাঙলায় আর ইংরিজিতে কবি পাঠ ক'রলেন, তারপর রাজাকে ও রানীকে এই কবিতা উপহার দেওয়া হ'ল।

এই-ভাবে স্বাধীন শ্যাম-দেশের মহারাজা কর্তৃক কবিকে নিজের প্রাসাদে আহ্বান ক'রে তাঁর সমাদর করা হ'ল। তাঁর কাছ থেকে তাঁর আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে রাজা আর শ্যামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা কিছু শুন্‌লেন। এই সভাতে নানাদেশের রাজদূত আর প্রধান-প্রধান বিদেশী মেয়ে-পুরুষ অনেকগুলি ছিলেন। সভার সমস্ত পাট চুকিয়ে' হোটেলে ফিরতে আমাদের রাত্রি ১২টা হ'য়ে গেল।

শুক্রবার, ১৪ই অক্টোবর ১৯২৭ সাল

গত রাত্রের আমাদের রাজ-দর্শন আর রাজবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার একটা বর্ণনা আজ সকালে ব'সে-ব'সে লিখলুম, ইংরিজিতে। সেটি আজকে-ই বিকাল বেলায় 'বাংকক ডেলি-মেল' পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল। বেলা দশটায় কবির সঙ্গে আমরা গেলুম এখানকার এক বৌদ্ধ বিহার দেখতে— Devasirindra অর্থাৎ 'দেবশ্রী-ইন্দ্র' বিহার। এই বিহারের যিনি প্রধান, তিনি গতকাল রাত্রে রাজ-বাড়ীতে কবির বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। বেশ সৌম্য-মূর্তি, হাসি-মুখ ভিক্ষু ইনি। এখানে আর একজন ভিক্ষুর সঙ্গে আমাদের বিশেষ ক'রে পরিচয় হ'ল। আর একজন ছিলেন রাজবংশের এক রাজকুমার। অল্প বয়সে ইনি প্রব্রজ্যা নিয়েছেন। তবে বোধহয় পুরোপুরি ভিক্ষু-জীবন গ্রহণ ক'রবেন না। বর্মার মতন এ-দেশেও নিয়ম আছে যে, কিশোর আর তরুণদের কয়েক মাস ভিক্ষুর ব্রত নিয়ে কোনও বিহারে থাকতে হয়, আর এইভাবে সাধারণ যুবকদের মনে তাদের ধর্মের একটা প্রধান প্রকাশ-ক্ষেত্র বৌদ্ধ বিহারের সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে। আর একজন ছোকরা ভিক্ষুকে দেখলুম, অতি সুন্দর সুগঠিত শরীর। ইনি বিলেতে বহুদিন ছিলেন, মনে হ'ল এই যুবক ভিক্ষু বোধ হয় পুরাপুরি ভিক্ষু-জীবন গ্রহণ ক'রেছেন। বিহারের প্রধান মহাশয়ের সঙ্গে কবির আলাপ হ'ল। ইনি অবশ্য ইংরিজি জানতেন না, কিন্তু বিলেত-ফেরত ভিক্ষু যুবকটি দো-ভাষীর কাজ ক'রলেন। এই প্রধান-মহাশয় (বা বিহারের মহাস্থবির) আমাদের কতগুলি পালি বই, শ্যামী অক্ষরে ছাপা, দিলেন; আর দিলেন, তাঁর নিজের হাতের তৈরী একটি ক'রে শিল্প-দ্রব্য, আমাদের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত উপহার হিসেবে— এই শিল্প-দ্রব্যটি আর কিছু নয়, ছোটো-ছোটো কাপড়ের রুমাল পাকিয়ে, নানান্ রকম-ভাবে গাঁট বেঁধে তৈরী জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি— খরগোশ, হরিণ, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি। জিনিসটি ছোটো, কিন্তু বৌদ্ধ বিহারের এক মহাস্থবির এই রকম খেলা ক'রে আনন্দ পান দেখে আমরাও খুশী হ'লুম।

কবি হোটেলে ফিরে গেলেন। আমরা বিশ্বভারতীর সংগ্রহালয়ের জন্য মূর্তির খোঁজে লাখন-কাসেম বাজারে ঘুরে ফিরে বেড়ালুম, আর বড়ো-বড়ো তিনটি ধাতু-নির্মিত মূর্তি সংগ্রহ ক'রলুম।

দুপুরে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে আমরা একটু ব্যস্ত ছিলুম। এঁদের রাজকীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ থেকে একজন ছোকরা অফিসার এলেন। এই ক'দিন ধ'রে আমরা যে-সমস্ত পুরোনো মূর্তি আর অন্য শিল্প-দ্রব্য কিনেছি, সরকারী হুকুম না হ'লে দেশের বাইরে আমরা সেগুলি নিয়ে যেতে পার্‌বো না। এখানে নিয়ম আছে যে, কোন প্রাচীন জিনিস দেশের বাইরে নিয়ে যেতে হ'লে, এখানকার প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর জন্য শ্যাম-দেশের যে-সব প্রাচীন শিল্প-দ্রব্য যাচ্ছে, তার সম্বন্ধে কোনও আপত্তি উঠ্‌তেই পারত না, সে-জন্য যে কর্মচারীটি এলেন, তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের

গায়েতে একটি ক'রে লেবেল দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলেন, আর তার উপরে গালায় সরকারী সীল-মোহরের ছাপ দিলেন। শ্যাম-দেশের সীমা পার হবার সময়ে যদি চুঙ্গি-বিভাগ গোলমাল করে যে দেশের মূল্যবান্ প্রাচীন সম্পদ্ এই-ভাবে দেশের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে কেন, তখন এই সীল-মোহর করা টিকিট বা লেবেল থাক্‌লে কোনও গোলমাল হবে না।

বিকেলের দিকে কতকগুলি চীনা অর্থশালী ব্যক্তির আগমন, এঁরা কি-ভাবে বিশ্বভারতীকে অর্থ-সাহায্য ক'রতে পারেন সে বিষয়ে কবি, সুরেন-বাবু আর আরিয়মের সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে গেলেন।

আজকে বিকেল সাড়ে-চারটার পর এখানকার মিউজিয়মে কবির বক্তৃতা ছিল। প্রাচীন শ্যামী ব্রোঞ্জ-মূর্তি-সংগ্রহের যে বড়ো হল-ঘরটি আছে, সেখানে সভা হয়। খুব ভীড় হ'য়েছিল, বিস্তর ভারতবাসী এসেছিলেন, আর শ্যামী এবং বিদেশীদের সংখ্যাও কম ছিল না। কবি ভারতবর্ষের আদর্শ সম্বন্ধে আর এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ সম্বন্ধে যথারীতি অতি চমৎকার-ভাবে ব'ললেন। মিউজিয়মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক ফরাসী পণ্ডিত Dr. Coedes সেদেস্, আমার সঙ্গে বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে আলাপ ক'রলেন, আর তাঁর কতগুলি প্রবন্ধের মুদ্রিত প্রতি আমাকে দিলেন।

এর পরে আমাদের আর একটি বৌদ্ধ বিহারে যেতে হ'ল—এটির নাম Bovornivet 'বরর্‌-নিরেৎ' অর্থাৎ 'প্রবর-নিবেশ' বিহার। এর প্রধান স্থবির হ'চ্ছেন একজন সিংহলী ভিক্ষু। ইনি ১৫ বছর ধ'রে শ্যামে আছেন। এই বিহারে একজন শ্যামী ভিক্ষুর সঙ্গে দেখা হ'ল, ইনি আমেরিকায় Applied Chemistry বা ফলিত-রসায়ন প'ড়ে এসেছেন। আমাদের সব দেখাবার এবং বোঝাবার জন্য ফ্রা রাজধর্ম-নিদেশ ছিলেন। মোটের উপরে, শ্যামদেশের বৌদ্ধ বিহারগুলি দেখে মনে হ'ল, বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা শ্যামদেশে খুব ভালো। বিহারের ভিক্ষুদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত আছেন, তা-ছাড়া বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত লোক ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণ ক'রে বিহারগুলির পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রছেন।

সন্ধ্যে সাড়ে-সাতটায় এখানকার জর্মান রাজদূতের বাড়ীতে কবির আর আমাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। জর্মান রাজদূত নিজে জর্মান, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন রুষদেশের মহিলা, অতি সুন্দরী, নর্ডিক বা Scandinavian লোকেদের মত দীর্ঘকায়া, হিরণ্য-কেশী, নীল-চক্ষু; কথাবার্তায় ভব্যতায় অত্যন্ত ভদ্র। অন্য অনেকগুলি অতিথি ছিলেন। মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ছিলেন, পালি আর বৌদ্ধধর্ম তাঁর বিশেষ বিষয়, এঁর নামটি লিখে নেওয়া হয়নি, এখন ভুলে যাচ্ছি। আমাদের আহারের পর্ব শেষ হ'লে পরে, আরও অনেকগুলি অতিথি এসেছিলেন। কবি তাঁর কেদারায় ব'সে রইলেন, একে-একে সকলে এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রতে লাগ্‌লেন। তাঁদের অনুরোধে কবিকে তাঁর কতগুলি কবিতার ইংরিজি অনুবাদ প'ড়তে হ'ল।

শনিবার ১৫ই অক্টোবর ১৯২৭ সাল

আজকে বাংককে আমাদের শেষ দিন। এঁদের বন্দোবস্ত-মত, সকাল ৮-৫ মিনিটের গাড়ীতে আমরা শ্যাম-দেশের প্রাচীন রাজধানী Ayuthia—'আয়ুথিয়া' অর্থাৎ 'অযোধ্যা' নগর— দেখ্‌তে গেলুম। কবির সঙ্গে সুরেন-বাবু, আমি, ফ্রা রাজধর্ম-নিদেশ আর শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ আলীর পুত্র শ্রীমান্ সৈয়দ সাদির আলী, এই কয়জন ছিলুম। ওখানে যাবার পথে এখানকার হাওয়াই জাহাজের আড্ডা হ'য়ে গেলুম, Bang-pa-in—

বাং-পা-ইন্ এই স্টেশন হ'য়ে যেতে হ'ল। এখানে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন একজন সিংহলী বৌদ্ধ ভদ্রলোক, ২৭ বছর শ্যাম-দেশে আছেন, এখানকার জাতীয়তা গ্রহণ ক'রেছেন। ইনি এখানকার রেলওয়ের কাজে বরাবর আছেন, এখন একজন Permanent Way Inspector অর্থাৎ রেলওয়ে লাইনের তদারককারী। বিয়ে ক'রেছেন একটি শ্যামী মহিলাকে। এঁর নামটি হ'ল Wickremasinhe 'বিক্রম-সিংহ'। বহুদিন ধ'রে ইনি রাজ-প্রাসাদের সংলগ্ন রাজার খাস স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। রাজার পক্ষ থেকে এঁকে একটা খেতাব দেওয়া হয়, এই দীর্ঘকাল ধ'রে রাজ-সেবার দরুন। সেই খেতাবটি হ'চ্ছে পালিতে Vijita-bhaccādhikāra 'বিজিত-ভচ্চাধিকার,' অর্থাৎ 'বিজিত-ভৃত্যাধিকার', আর শ্যামী ভাষায় এই শব্দের উচ্চারণ 'ফিছিং-ফজাথিগান্'। এই লম্বা সংস্কৃত বা পালি শব্দের অর্থ হ'চ্ছে, 'যিনি রাজার সেবার দ্বারা রাজ-ভৃত্যের অধিকারকে জয় করেছেন'। শ্যাম দেশে এই রকম বড়ো-বড়ো সংস্কৃত বা পালি ভাষার পদবীর অভাব নেই— যেমন 'বারিসীমাধ্যক্ষ', 'রথচারণ-প্রত্যক্ষ' ইত্যাদি, যার কথা আগেই ব'লেছি। এই রকম বড়ো-বড়ো উপাধি আমরা সেদিন পর্য্যন্ত মহীশূর-রাজ্যে দেখেছি। ভারত সরকারের প্রদত্ত 'মহামহোপাধ্যায়' আর পালি পণ্ডিতদের জন্য 'অগ্‌গ-মহাপণ্ডিত' মনে করা যেতে পারে।

আমরা বেলা এগারোটায় আয়ুথিয়াতে এলুম। ১৭৮০-র পরে বাংকক্-নগরী থাই বা শ্যামী জাতির নূতন রাজধানী হয়, এর আগে রাজধানী এই অযোধ্যা নগরে ছিল। অযোধ্যা নগরে যখন শ্যামীদের রাজপাট ছিল, তখন প্রতিবেশী বর্মীদের সঙ্গে তাদের লড়াই লেগেই থাক্‌ত। বর্মীরা এই অযোধ্যা নগরের নাম উচ্চারণ ক'র্‌ত 'জোডিয়া' বলে। আয়ুথিয়া থেকে বর্মীদের মধ্যে শ্যামী নাট্যকলা আর শিল্পকলা কিছু-কিছু প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল। আয়ুথিয়ার পূর্বে থাই-জাতির রাজাদের মুখ্য কেন্দ্র ছিল, আরো উত্তরে Sukhothai সুখোথাই বা Sukhodaya 'সুখোদয়' নগরে। আয়ুথিয়া নগর তার পূর্বের গৌরব অনেককাল হ'ল হারিয়েছে। কিন্তু এখনো প্রাচীন মন্দির আর অন্য কীর্তির ধ্বংসাবশেষ প্রচুর দেখা যায়। শহরটী মেনাম্ নদীর ধারে। বাংককের মতন এখানেও মানুষের জীবন এই নদীকে অবলম্বন ক'রে অনেকটা জুড়ে আছে। আয়ুথিয়া স্টেশনে পৌঁছুবার পরে শ্যাম রাজ-সরকারের একজন প্রতিনিধি এসে আমাদের একটি মোটর-লঞ্চে তুললেন। এই লঞ্চে করে মেনাম্ নদী ধ'রে গিয়ে, আমরা দেখে এলুম একটি পুরাতন রাজপ্রাসাদ— আর তার সংলগ্ন একটী মিউজিয়ম বা সংগ্রহশালা। আমরা মেনাম্ নদীর মধ্যে একটা জিনিস ভালো ক'রে দেখ্‌তে পেলুম। যেটা হ'ল, জলের উপরেতে নৌকো নিয়ে হাট-বাজার বিকি-কিনি। নদীর বুকের উপরে একেবারে যেন একটা চলন্ত বাজার ব'সে গিয়েছে। ছোটো বড়ো নানা নৌকোয় ক'রে জলে ঝপ্-ঝপ্ শব্দ ক'রতে-ক'রতে খরিদ্দারেরা আসছে,— আর তেমনি রকমারি নৌকোর উপর বিক্রেতারা নানারকম জিনিসের পসরা দিয়ে র'য়েছে। শাক-সবজী, মাছ, চা'ল আর অন্য খাদ্য-দ্রব্য; তা-ছাড়া কাপড়-চোপড়ের দোকান, আর ঘর গৃহস্থালীর নানা জিনিসের দোকানও র'য়েছে। নৌকোর উপর ছোটো-বড়ো রেষ্টুরেণ্ট— অন্য নৌকোর আরোহীরা টাট্‌কারান্না ভাত মাছ তরকারী সেখান থেকে কিনে নিয়ে খাচ্ছে। নৌকোয় আর মানুষে সমস্ত নদীর জল একেবারে ভ'রে গিয়েছে, নৌকো আর মানুষ সেখানে গিজ্-গিজ্ ক'রছে। এটা অদ্ভুত জিনিস লাগ্‌ল।

আজকের দিনে কি একটা উৎসব ছিল, তাই ওখানে দেখা গেল, নদীর ধারে একটী বৌদ্ধ বিহারের কাছে যাত্রীর মেলা। বোধ হয়— এই উৎসবের-ই অঙ্গ-হিসাবে বা'চ খেলা হবে। বা'চের নৌকো

অনেকগুলি এসেছে, আর তার চড়নদাররা সবাই নানারকম উজ্জ্বল রঙীন কাপড় প'রে র'য়েছে। আর কতক-গুলি নৌকো বেশ তালে-তালে দাঁড় বেয়ে বা'চের মহড়া দিচ্ছে। দুপুর হ'তে চ'ল্‌ল; রৌদ্র খুব প্রখর। অনেকে নৌকোয় মাথার উপর চীনে' ছাতা খুলে ধ'রেছে, কেউ বা রোদের জন্য মাথায় কাপড়ের ফ্যাটা বেঁধেছে। শ্যামী মেয়েদের আধুনিক শ্যাম দেশের পোশাক—নীচু-গলা হাত-কাটা ঢিলে জামা; আর পরনে রঙীন ফানুম্‌। আর প্রায় সকলকারই মাথার চুল ছোটো ক'রে ছাঁটা। সমস্ত নদী জুড়ে অনেকক্ষণ ধ'রে এই দৃশ্য দেখ্‌তে-দেখ্‌তে চ'ললুম।

তারপর আমরা এখানকার স্থানীয় শাসন-কর্তার বাসভবনের কাছে এলুম, আর তাঁর হাউস-বোটে বা থাকবার নৌকোয় আমাদের দুপুরের খাওয়া খেতে যেতে হ'ল। শ্যামী আর বিলিতি উভয় রকম খাবার, নানা পদ ছিল।

বেলা দুটোয় আবার আমরা যাত্রা ক'রলুম। এই অঞ্চলটা আমাদের ঠিক বাঙ্‌লাদেশের মত। এখানে নদী, খ'ড়ো ঘর, আর না'রকেল গাছের বাহুল্য, আমাদের বাঙ্‌লা দেশের কথা মনে করিয়ে' দিতে লাগ্‌ল।

আমরা পরে বাং-পা-ইন রাজ-প্রাসাদ দেখ্‌তে গেলুম। প্রায় আশী বছর আগে শ্যাম দেশের মহারাজা মহা-মঙ্কুটের আমলে তাঁর চীনা প্রজাদের দান হিসাবে রাজা এই বাড়ীটি পান। এটি আগাগোড়া চীনা ধরনে তৈরী। আর এর আস্‌বাব-পত্র অলঙ্করণ সবই চীনা রুচি অনুসারে।

আমাদের স্টীম-লঞ্চে চা খেতে হ'ল। চারটায় আমরা বাং-পা-ইন্‌ স্টেশনে আবার ফিরলুম। সেখান থেকে সাড়ে-চারটার দিকে বেরিয়ে সওয়া ছ'টায় বাংককে ফিরে এলুম।

এখানকার ভোজপুরিয়া আর অন্য হিন্দু বাসিন্দাদের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু-মন্দিরের কথা পূর্বেই বলেছি। শহরতলীর মধ্যে, শহরের একটু বাইরে, এই মন্দিরটি। ভোজপুরিয়াদের আগ্রহে এই মন্দিরে এসে কবি এঁদের সঙ্গে দেখা ক'রতে, আর এঁদের কিছু ব'লতে স্বীকৃত হ'য়েছিলেন। এঁরা বেশীর ভাগ গরীব আর অশিক্ষিত লোক, সে কথা এঁরা উল্লেখ ক'রে বলাতে, কবি সহজেই রাজী হ'য়ে যান। এই মন্দিরের সভায় কবির সঙ্গে কেবল আমি-ই ছিলুম। সাড়ে-ছয়টার দিকে আমরা মন্দিরের কাছে এসে পৌঁছোলুম। মন্দিরে যেতে গেলে একটা সরু গলি দিয়ে খানিকটা পথ যেতে হয়। কবির জন্য এঁরা একখানা রিক্‌শার ব্যবস্থা করেছিলেন। মন্দিরে গিয়ে দেখি, মন্দিরের আঙিনায় প্রায় তিন-চারশত লোক একত্র হ'য়েছে—বেশীর ভাগই আমাদের "ভৈয়া-লোগ", ভোজপুরী দেশওয়ালী। এরা ইংরিজির ধার ধারে না। আমাদের মূল মন্দিরের সামনে দর-দালানে বসালে। কবি এদের কি বিষয়ে ব'লবেন, সেটা জেনে নিয়ে তৈরী হ'য়ে আসা আমার কর্তব্য ছিল। কিন্তু কাজের ভীড়ে এ-বিষয়ে আমার একটু ভুল হ'য়ে গিয়েছিল। এ-রকম স্থলে, কবি যা ব'লবেন, তা তাঁর কাছে শুনে নিয়ে, হিন্দীতে ছোটো-খাটো একটি নিবন্ধ রচনা ক'রে রাখতুম, আর সেটা পড়ে দিতুম, মালয়-দেশের দু-একটি জায়গায় এ-রকমটি করায় বেশ কাজ হ'য়েছিল। কিন্তু আজকে আয়ুথিয়ায় সারাদিন ব্যস্ত ছিলুম। কাজেই এ বিষয় চিন্তা ক'রতে পারিনি। তাই এখানে এই ইংরিজি-না-জানা লোকেদের দেখে একটু মুস্কিলে পড়া গেল। কবি কিন্তু অল্প দু-চার কথা মামুলী বাজার-চল্‌তি হিন্দীতেই ব'ললেন। কিন্তু মনে হ'ল, এরা আরো কিছু শুন্‌তে চায়। বিদেশে এসে ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্যবোধ আর জাতির সম্মান-সম্বন্ধে, জাতীয়তাবোধ যে অবশ্য রক্ষা করবার বিষয়,

তাই নিয়ে সাধারণ-ভাবে দু-একটি কথা বললেন। তখন একজন পাঞ্জাবী কন্‌ট্রাক্‌টর বা ঠিকাদার এসে কবির কাছে ব'ললেন—"অগর হুজুরকী ইজাজৎ হো, তো মৈঁ আপকী অঙ্গ্‌রেজী তকরীর-কো হিন্দোস্তানী-মেঁ তর্জুমা করকে ইন্‌হেঁ সুনা দুঙ্গা— ইয়ে লোগ, আপ দেখতে তো হৈঁ, জ্যাদাতর জাহেল ঔর অন্‌পঢ় হৈঁ —যদি হুজুরের অনুমতি হয়, তা-হ'লে আপনার ইংরিজি বক্তৃতা হিন্দুস্থানীতে তর্জমা ক'রে এদের শুনিয়ে দেবো— এই লোকগুলি, আপনি তো দেখ্‌ছেন, বেশীর ভাগ হ'চ্ছে মূর্খ আর নিরক্ষর।" পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের চোস্ত উর্দু শুনে আমরা যেন একটু কিনারা পেলুম। যাই হ'ক্— উর্দু তো উর্দু-ই সই— কবির আদর্শের কথা, আর বিশ্বভারতী-স্থাপনের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে, তাঁর কথামত ইনি উর্দুতে অর্থাৎ ফারসী-ঘেঁষা হিন্দুস্থানীতে এদের দু কথা ব'লতে পারবেন। তখন কবি ইংরিজিতে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। খানিকটা-খানিকটা ক'রে তিনি বলেন, আর এই ভদ্রলোক তর্জমা ক'রে যান। দেখলুম, ব্যাপারটি তেমন সুবিধার হ'ল না। একদিকে কবির ভাব আর ভাষা— আর অন্যদিকে এই ভদ্রলোকের বিদ্যাবুদ্ধি আর ইংরিজির জ্ঞান, এই দুই-ই তেমন উচ্চ কোটির নয়, আর বেশী গোলমেলে ব্যাপার দেখলেই তিনি সাঁটে স্থুল-ভাবে ব'লতে আরম্ভ করেন। তার ফল হ'ল যেমন হাস্যকর, তেমনি হৃদয়বিদারক। ইংরিজিতে ব'লতে-ব'লতে কবি এক জায়গায় এই ধরনের একটা কথা ব'ললেন— My idea has been to establish in some place in our Country a centre of study and research, where foreigners, who want to participate in the spiritual feast left by our ancestors, may stay with us as our honoured guests, and receive whatever they can take from us and what India has to give; and at the same time, we would also claim it as our right to receive from them the best they have to offer from their own culture, their own thought and ideas. এর অনুবাদ এঁর মুখে সংক্ষেপে এই রকম হ'ল— কবির দিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, তাঁর প্রতি শ্রোতাদের দৃষ্টি এইভাবে আকর্ষণ ক'রে, ইনি ব'ললেন, "আপ রাবিন্দর্‌-নাথ টেগোর কহতে হৈঁ কি, পর্‌দেসী তালিবে-ইল্‌মোঁ-কে লিয়ে এক হোটাল বনাওএঙ্গে, তাকি ওয়ে আকর কুছ ইল্‌ম্ হাসিল কর সকেঁ— উনি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব'লছেন যে, বিদেশী বিদ্যার্থীদের জন্য একটি হোটেল বানাবেন, যাতে তারা এসে কিছু বিদ্যা অর্জন ক'রতে পারে।" তাঁর বিশ্বভারতী-স্থাপনের এই ব্যাখ্যা শুনে কবি চ'মকে উঠ্‌লেন, আর আমার দিকে একবার কাতর-ভাবে দৃষ্টিপাত ক'রলেন। আর আমি অপরাধীর মত মাথা নীচু ক'রে রইলুম। কবি তখন যথাসম্ভব শীঘ্র, নমোনমঃ ক'রে, তাঁর এই "অঙ্গ্‌রেজী তকরীর" শেষ ক'রলেন। কিন্তু এতেই উপস্থিত জনগণের উৎসাহের সীমা নেই। এদের মধ্যে একজন ভোজপুরিয়া ভদ্রলোক, শুনলুম এঁর অনেক গোরু-ম'ষ আছে— মাতব্বর ব্যক্তি, বেশ জোর গলায় সমবেত ভাইদের ঠাকুরজীর "বিস্‌-ভার্‌তী বিস্‌-বিদিয়ালে"-র জন্য চাঁদা দিতে অনুরোধ ক'রলেন। এরা বেশীর ভাগই অল্প পুঁজির লোক। কিন্তু এখান থেকে এক টিকল, ওখান থেকে দু টিকল, দূর কোণ থেকে তিন টিকল, আবার এদিক থেকে চার টিকল, পাঁচ টিকল ক'রে মুদ্রা প'ড়তে লাগ্‌ল। দু-চারজন উৎসাহী ব্যক্তি আবার তারস্বরে হিন্দীতে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ক'রে ব'লতে লাগলেন—"ভাঈ লোগ, বিদ্যা-দান-সে বঢ়কর পুন্ নহীঁ হৈ— বিদ্যাদানের বাড়া পুণ্য আর নেই; অপনী শক্তিকে মুতাবিক দান করো।" এইভাবে প্রায় মিনিট দশের মধ্যে ১৬০।১৭০ টিকলের মত চাঁদা বিশ্বভারতীর জন্য এঁরা তুলে দিলেন, বেশীর ভাগ দু-চার টাকার দানে।

একজন চেঁচিয়ে ব'ললেন "পুরো দুইশত টিকল না হ'লে আমাদের বাঙ্কক্ শহরের হিন্দুদের দুর্নাম হবে।" তখন স্থানীয় দু-জন ভদ্রলোক বাকী টাকা দিয়ে দুইশত টিকল পূরো ক'রে দিলেন। ঘটনাটি ছোটো, কিন্তু এর পিছনে যে একটা সহৃদয়তা ছিল, কবির আদর্শ ভালো ক'রে না বুঝলেও তার প্রতি শ্রদ্ধা আর সহানুভূতি ছিল, সেটা সহজেই বোঝা যায়।

কবি যখন ঐ স্থান থেকে বিদায় নিলেন, তখন তাঁর চারিদিকে তাঁর দর্শনার্থী লোকেদের ভীড়। অনেকে তাঁকে প্রণাম ক'রতে লাগ্‌ল। তবে এরা ওঁকে বিব্রত করেনি, বেশীর ভাগ লোক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে এবং মাথা হেঁট ক'রে ওঁকে প্রণাম জানাতে লাগ্‌ল। কিন্তু উঁচু মঞ্চ থেকে নামবার সময়ে ঠিকমত সিঁড়ি বুঝে নাম্‌তে না পারায়, কবি একটু প'ড়ে গেলেন, পাশ থেকে আমরা ধ'রে ফেলায় চোট লাগে নি। এরা এতে একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে প'ড়্‌ল, কিন্তু কবি তাঁর প্রসন্ন হাসি হেসে উঠে দাঁড়াতে সকলেই আশ্বস্ত হ'ল। বিদায় নিয়ে পরে আমরা যখন মোটরে এসে ব'সলুম, তখন কবি আমাকে কেবল এই কথা ব'ললেন—"লোকগুলির হৃদয় ভালো, কিন্তু শেষটায় এরা আমাকে হোটেলওয়ালা ক'রে ফেল্‌লে হে।"

সন্ধ্যাবেলায় আমাদের হোটেলে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ থেকে প্রাচীন শিল্পদ্রব্য নিয়ে যাবার জন্য একটা বিশেষ অনুমতি-পত্র এলো। আমরা আহারের পরে জিনিস-পত্র গুছোতে লেগে গেলুম। কাল সকালেই আমাদের বাংকক ছেড়ে যেতে হবে। কবির শ্যামদেশ দর্শন এই-ভাবে সমাপ্ত হ'ল।

এবার প্রত্যাবর্তনের পালা॥

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার জাতীয়জীবন

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

অঙ্কুর যখন দীর্ঘদিনের জীবন-যাত্রায় মাটি হইতে অনেকখানি উঁচুতে মাথা তুলিয়া বনস্পতি রূপ লাভ করে এবং ঘনপল্লব-কুঞ্চিত শাখাবাহু বিস্তার করিয়া আকাশের অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া থাকিতে চায় তখন তাহার দিকে তাকাইয়া নীচের মাটির বন্ধনটাকে আর বড় করিয়া ভাবিতে ইচ্ছা হয় না; তখন মনে হয়, আকাশে বাড়িয়া অফুরন্ত শূন্যে অবাধ বিস্তার লাভ করা, মেঘ হইতে ছায়া ও জল, বায়ু হইতে প্রাণ এবং সূর্য হইতে তেজ ও বর্ণ আহরণ করা— নিত্য নব পল্লবে ফুলে ফলে নিজেকে বিকশিত করা— বনস্পতির এইই হইল জীবনযাত্রা। কিন্তু নীচে মাটির সঙ্গে যোগ শেষ পর্যন্ত থাকিয়া যায়, সে কথাটা একেবারে ভুলিবার নহে। পরিণত বয়সের রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকাইলে মনে হয়, কোনও একটি বিশেষ দেশকালের মাটির সঙ্গে এই অসাধারণভাবে বিস্তৃত ব্যক্তি-বনস্পতির তেমন কোনো শিকড়বন্ধন নাই— জীবনরস সংগৃহীত হইয়াছে দেশে দেশে কালে কালে বিস্তৃত মহামানবের জীবনভূমি হইতে; কিন্তু তখনও হয়তো বাঙলা দেশের মাটি এবং বাঙলা দেশের জীবনের সঙ্গে মূলে একটা শিকড়বন্ধন ছিল; কোথায় কিভাবে কতটুকু ছিল— সেই কথাটাই কৌতুকাবহ।

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার জাতীয় জীবন কথাটাকে লইয়া ভাবিতে গেলে প্রথমে জাতীয় জীবন কথাটাকেই পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। জাতীয়জীবন কথাটার মধ্যে দুই দিক্ হইতে দুইটি ইঙ্গিত আছে। একদিকে জাতীয় জীবন অত্যন্তভাবে রাজনীতি-ঘেঁষা, যে-ক্ষেত্রে তাহার পরিণতি দেখিতে পাই আজকালকার দিনে বহুপ্রচলিত 'জাতীয়তাবাদ' বা 'ন্যাশনালিজ্‌ম্' কথাটার মধ্যে। এই 'ন্যাশনালিজ্‌ম্'এর মধ্যে যে 'নেশন' বলিয়া বস্তুটি আছে তাহার উপাদানের মধ্যে অনেক-জাতীয় ঐক্যবন্ধনের উপাদানের কথা আমরা উল্লেখ করি বটে, কিন্তু দেখা যায়, কার্যক্ষেত্রে অন্য সব উপাদান একত্র হইয়া যেন 'ঢাকের বাঁ', 'ডাহিনা'রূপে টং টং করিয়া বাজিতে থাকে শুধু রাষ্ট্রীয় উপাদানটা। অন্য আর একদিকে জাতীয় জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ সমাজজীবনের সঙ্গে; এ-ভাবে কথাটাকে না বলিয়া আরও ভালোভাবে বলা যায় যদি বলি, একটি বিশেষ কালে বিশেষ দেশে বিশেষ বিশেষ বাস্তব কারণকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া ওঠে যে একটি সুসংহত সমাজজীবন তাহাই আসল জাতীয়জীবন। এই সুসংহতসমাজ-ভিত্তিক জাতীয়জীবনের বিস্তীর্ণ পরিধির মধ্যে রাজনৈতিক দিক্ আর পাঁচটা দিকের মত একটা দিক্ মাত্র, তাহার উদগ্র একাধিপত্য লইয়া তো নয়ই, তাহার দাম্ভিক প্রাধান্য লইয়াও নয়।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও যখন তাঁহার সঙ্গে জাতীয়জীবনের সম্পর্কের প্রশ্ন তোলা যায় তখন আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই দুই দিক্ হইতে জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিতে পারে। প্রথম দিকের জিজ্ঞাসাটাকে এইভাবে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে, উনবিংশ এবং বিংশ শতকে আমাদের রাজনীতি-ঘেঁষা জাতীয়জীবনে যে আলোড়ন ও বিবর্তন দেখা দিয়াছিল রবীন্দ্রনাথ তাহার সঙ্গে নিজেকে কিভাবে যুক্ত করিয়াছিলেন। 'আমাদের জাতীয়জীবন' বলিতে এখানে আপাততঃ ভারতবর্ষের কথা বলিতেছি না, বাঙালীর জাতীয়-জীবনের কথাই বলিতেছি। দ্বিতীয় দিক্ হইতে আবার জিজ্ঞাসাটিকে উপস্থাপিত করা যায় এইভাবে,

বিশ্বজীবনের মধ্যে বাঙালীজাতির একটি সমাজভিত্তিক বিশেষ অস্তিত্ব— অর্থাৎ একটি বিশেষ জীবনযাপন-প্রথা রহিয়াছে— যাহা বিশ্বজীবনের মধ্যেই বাঙালী-জীবনকে আবার স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে; এই যে আমাদের বিশেষভাবে চিহ্নিত একান্ত বাঙালী জীবন তাহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কতটুকু যোগ ছিল এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের ভিতরে সেই পরিচয় কোথায় কিভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের যে জাতীয়জীবনের ইতিহাস তাহাকে পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, জাতীয়জীবনের কথা বলিলে সে-সময়ে আমরা বিশেষ করিয়া আমাদের বৃহৎ সমাজজীবনের কথাই ভাবিতাম। রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ এ-কথাটা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশে জাতীয়-জীবন বলিতে মুখ্যতঃ সমাজজীবনকেই বুঝাইত; রাষ্ট্র এই জন্য কোনোদিনই আমাদের দেশে একটা সর্বগ্রাসী মর্যাদা লাভ করে নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে নানাভাবে বিশ্লেষণ-বিচার করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাই বার বারই এই জিনিসটি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে ভারতবর্ষের জাতীয় শক্তি কোনো যুগেই রাষ্ট্রের ভিতরে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়া ওঠে নাই— যুগ যুগ ধরিয়া জাতির সামগ্রিক বিবর্তনের পিছনে বেশিভাবে কাজ করিয়াছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিকেন্দ্রিত সমাজ-শক্তি।

রাষ্ট্রবন্ধনের উপরে রবীন্দ্রনাথের একটা সহজাত অবিশ্বাস— সুতরাং অশ্রদ্ধা ছিল, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ছিল তাঁহার সমাজবন্ধনের উপরে। কারণটাও খুব দুর্নিরীক্ষ্য নয়; রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, দশদিকে দশপ্রহরণ ধারণ করিয়া রাষ্ট্র-নামক যে যন্ত্রটি মানুষের মধ্যে গড়িয়া ওঠে, এবং তাহার মধ্যে কেন্দ্রীভূত শক্তির একটা একাধিপত্যের দুর্নিবার্য প্রবণতা যেভাবে মাথা নাড়া দিয়া ওঠে— ও জিনিসটা মানববিকাশের কোনো স্বাভাবিক পথে দেখা দেয় না; দেখা দেয় ক্রূর কুটিল পথে মানুষের অপরিমিত লোভ এবং ক্ষমতালিপ্সার প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে জড়িত হইয়া। এই লোভ এবং ক্ষমতামত্ততার নেতৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত সমাজ তাহার বৃহৎ পরিধির মধ্যে ছড়াইয়া ছড়াইয়া সৃষ্টি করিয়া লয় যে শক্তি তাহার পিছনে মানবমঙ্গলের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং গতি আছে; কারণ, ইহা গড়িয়া ওঠে মানুষের স্বভাবকে অবলম্বন করিয়া, আর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, মানুষ যে পর্যন্ত অপরিমিত লোভ এবং ক্ষমতাপ্রমত্ততার প্রচণ্ড পাকে পড়িয়া বিকৃত হইয়া না ওঠে সে পর্যন্ত মানুষ স্বভাবতঃ ভালো— সে নিজের ও অপরের কল্যাণকামী— আর সেই কল্যাণ-কামনাতেই সে নীতিপ্রবণ; তাহার এই স্বভাবগত নৈতিক প্রেরণাই তাহার মধ্যে সৃষ্টি করে ধর্মের এষণা; এই ধর্ম তাহাকে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত করিয়াই ধারণ করিয়া রাখে। ইহা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত বিশ্বাসও বটে, আবার আজীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ দৃঢ় সিদ্ধান্তও বটে। মানুষ যত অন্যায় করুক, যত পাপ করুক— ক্ষণে ক্ষণে মূঢ়তার হিংস্রতার ফাঁকে ফাঁকে নিজেকে যত কদর্য করিয়া তুলুক, রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন, শেষ অবধি মানুষের যে স্বরূপটি বিজয়লাভ করিয়া এত যুগ ধরিয়া মানুষের ইতিহাস রচনা করিয়া তুলিয়াছে তাহা হইল মানুষের 'কল্যাণকৃৎ' স্বরূপ। বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা— দুই দিক্ হইতেই সমর্থন লাভ করিয়া এই প্রত্যয় তাঁহাকে উজ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসপ্রবণতাই তো সব মানুষের বিশ্বাসপ্রবণতা নয়, আর রবীন্দ্রনাথ যে কালে যে দেশে যে জাতির মধ্যে জন্মাইলেন তাহার ইতিহাসেরও সর্বতোভাবে রবীন্দ্রনাথের রুচি-মেজাজের অনুগ-রূপে আবর্তিত হইবার কথা নয়। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙালী জাতির ভিতরেও যে জাতীয়তাবাদের জাগরণ দেখা দিল তাহার আশেপাশে সর্বতোভাবেই একটা জাগরণের আশা-আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছিল;

কিন্তু তথাপি জাতির বিদ্রোহী শক্তি ক্রমে কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল রাষ্ট্রকে অবলম্বন করিয়া, জাতীয়-আন্দোলনের মুখ্য দাবীরূপে দেখা দিল পর জাতির কাছ হইতে নিজের জাতির হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিনাইয়া লওয়া। ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে লাগিল কংগ্রেস-আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথকে একদিন তাঁহার কবিসত্তা লইয়াই আগাইয়া গিয়া যুক্ত হইতে হইল এই কংগ্রেস-আন্দোলনের সঙ্গে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন অন্ততঃ প্রত্যক্ষভাবে এবং খানিকটা সক্রিয়ভাবেই যাহার সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইলেন তাহাকে ঠিক কংগ্রেস-আন্দোলন বলিব না, তাহাকে বলিব 'স্বদেশী আন্দোলন'। এই উভয় আন্দোলনকেই সাধারণতঃ এক করিয়া ধরা হয়; কিন্তু আমার কাছে এই দুইয়ের মাঝখানে একটা তফাত আছে। কংগ্রেসের সামনে ছিল ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তিকে তাড়াইয়া দিয়া নিজেদের রাষ্ট্রশক্তি গড়িয়া তোলা এবং তাহা দিয়া দেশ শাসন করিবার লক্ষ্য; স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে এই উদ্দেশ্য নিহিত থাকিলেও তাহার মধ্যে একটু অস্পষ্টভাবে আর একটা ব্যাপক দৃষ্টি দেখা দিয়াছিল; সে দৃষ্টি হইল শুধু কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-যন্ত্রটিকে নয়—আমাদের বৃহৎ সমাজজীবনটাকেই নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার দৃষ্টি। স্বদেশে সকল দ্রব্য উৎপন্ন করিতে এবং স্বদেশজাত সকল দ্রব্য শ্রদ্ধায় আদরে মাথায় তুলিয়া লইতে যে দুরন্ত আগ্রহ দেখা দিল, যেখানে দেখা দেয় নাই সেখানে সেই আগ্রহকে জাগাইয়া তুলিবার যে ঐকান্তিক চেষ্টা দেখা দিল, সেটা শুধু আর্থিক ক্ষেত্রে অপর জাতিকে পরাজিত করিবার জন্য নয়, আত্মবিস্মৃত জাতিকে—আত্মসম্মানে বঞ্চিত জাতিকে—সর্বতোভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিবার একটা দৃঢ়পণ সাধনাও তাহার ভিতর দিয়া সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে যেটুকু যুক্ত করিয়া তুলিলেন তাহা হইল এই সর্বোতোভাবে চিত্তজাগরণ এবং সর্বোতোভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনার সঙ্গে।

স্বদেশী যুগে বাহিরের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে চিন্তারও একটা মস্ত বড় আন্দোলন চলিয়াছিল, স্থায়িমূল্যের দিক্ হইতে সেই আন্দোলনটাকেই বড় স্থান দিতে হইবে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ দেখা দিয়াছিলেন পুরোধা রূপেই। তিনি প্রকাশ্য মঞ্চে উচ্চৈস্বরে অনেক বক্তৃতা দিয়া জননেতারূপে জনসাধারণের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন না বটে, কিন্তু জাতীয়জীবনের সমস্ত সমস্যাগুলির কথা এবং তাহাদের সমাধানের কথা তিনি যেমন গভীর করিয়া এবং তন্ন তন্ন করিয়া ভাবিলেন এবং তাকে প্রবন্ধে ভাষণে প্রকাশ করিতে লাগিলেন তেমন ব্যাপক এবং গভীরভাবে সেই সময়ে আর কেহ তাহা করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। কিন্তু তবু তিনি তৎকালে যে প্রকাণ্ড জননেতা বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিলেন না তাহার মুখ্য কারণ, রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতাকে অচিরাৎ করায়ত্ত করিবার জন্য তখন যে অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা সমস্ত সমস্যার অগ্রভাগে দেখা দিয়াছিল, তাহার উষ্ণতা রবীন্দ্রনাথকে তেমন তপ্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই। ঠিক হোক আর বেঠিক হোক, ইংরেজ তাড়াইবার জন্য অত্যন্ত একটা তাড়া কোনোদিনই কবি তেমনভাবে অনুভব করেন নাই যেমন অনুভব করিয়াছিলেন জাতিকে সবদিক হইতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিবার তাগিদ। রাজনীতিজ্ঞ-গণের মধ্যে একদল বরাবরই ছিলেন উগ্রপন্থী, তাঁহাদের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম; এক্ষেত্রে যাঁহারা ছিলেন স্থিতধী সেইসব নেতাও মনে করিতেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজেদের হাতে না পাওয়া পর্যন্ত জাতির সমাজজীবনকে পরিপূর্ণভাবে গড়িয়া তোলা কখনোই সম্ভব নয়; সেই কারণেই সকল দৃষ্টিকে এবং শক্তিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের সংগ্রামে কেন্দ্রীভূত করাই ছিল জাতিগঠনের প্রাথমিক কাজ। রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের সঙ্গেও ঠিক একমত হইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় ধারণা ছিল, জাতির দেহবন্ধনের মুখ্য কারণ

একটি বৈদেশিক শক্তির আকস্মিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ নয়, মুখ্য কারণ অজ্ঞানতা জড়তা সংস্কারপ্রিয়তা প্রথা-বদ্ধতার জন্য জাতির চিত্তের বন্ধন। চিত্তবন্ধন দূরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে দেহবন্ধন আপনা হইতে দূরীভূত হইতে বাধ্য। এই চিত্তবন্ধন সবটা বিদেশীশক্তির রাজশক্তিরূপে আবির্ভাবের জন্য নয়; সুতরাং জাতির জাগরণের সঙ্গে আর বিদেশীশক্তিকে অপসারণের সঙ্গে একটা নিত্য ব্যাপ্তি যে স্বীকার করিতেই হইবে এমন কথা নহে।

তাহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন, চিত্তের জাগরণের সঙ্গে বিদেশী শক্তির অপসারণের সঙ্গে যদি কোনো যোগ থাকিয়াও থাকে তথাপি জাতীয় মুক্তির জন্য পররাষ্ট্রশক্তিকে দূরীভূত করিয়া দিবার চেষ্টা অনেকখানি একটা নঙর্থক চেষ্টা; সর্বপ্রকার স্থষ্টিকর্মের ভিতর দিয়া যে মুক্তি তাহাই হইল মুক্তির যথার্থ সদর্থক রূপ। বিপ্লবের নামে আমাদের যে ঝোঁকটা তাহা হইল একটা নঙর্থক প্রবৃত্তি— একটা ভাঙিবার মাতলামি। এই নঙর্থক প্রবৃত্তির প্রবল পরিচালনাই যে আপনা হইতে মহৎ সদর্থক প্রবৃত্তিগুলিকে অনিবার্য-ভাবে জাগ্রত করিয়া দিবে— ভাঙনের অপর্যাপ্ত মাতলামি যে পরমুহূর্তে মানুষকে স্থষ্টিপ্রেরণা না দিয়াই পারে না, রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাকে একটা অবশ্যঘটনীয় সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না।

জাতীয়তাবাদের সহচররূপে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় প্রবল জাত্যভিমান, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাঁহার প্রথমজীবনে এ-সত্যের ব্যত্যয় ঘটে নাই। যেটি ছিল রবীন্দ্রনাথের মন গড়িয়া উঠিবার যুগ সেটি ছিল বাঙালীমানসে জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রীতির ক্রম-উদ্বোধনের যুগ। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে তাই চিত্ত ভাবালু হইয়া উঠিল বাঙলাদেশ ও বাঙালীকে লইয়া। ইহার ভিতরেও আবার লক্ষ্য করিতে পারি, তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়স হইতে উত্তর-তিরিশের কয়েক বৎসরের মধ্যে রচিত কবির যত স্বদেশী সঙ্গীত তাহার ভিতরে বাঙালী জাতি ততখানি প্রাধান্য লাভ করে নাই যতখানি করিয়াছে বাঙলা দেশ, আর সে বাঙলা দেশ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে সর্বত্রই বঙ্গজননী। রবীন্দ্রনাথের এই-জাতীয় স্বদেশী সঙ্গীতগুলি এতই প্রসিদ্ধ যে তাহাদের স্মরণ করাইবার জন্য কোনো উদ্ধৃতির প্রয়োজন করে না। কিন্তু বাঙলা দেশকে অবলম্বন করিয়া বাঙালী জাতির জন্য একটি বিশেষ মমতা এবং তাহার জন্য একটি বিশেষ দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধ কবিচিত্তে সত্বরই গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত কবির একখানি পত্রাংশে—

"এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানবজাতিকে আমাদের কি কিছু সংবাদ দিবার নাই?… আমাদের এই শ্যামল সুন্দর বঙ্গভূমি কি এই সুবিস্তীর্ণ মানবরাজ্যের মধ্যে সাহারা-ক্ষেত্র? জগতের একতান সঙ্গীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে?… আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে স্বর্গের কোনো গান বহন করিয়া আনিতেছে না?… সকল দেশ অসীমকালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে, বাঙ্গালীর নাম কি কেবল পিটিশনের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকিবে?…

"বাংলা দেশের মাঝখানে দাঁড়াইয়া একবার কাঁদিয়া সকলকে ডাকিতে ইচ্ছা করে— বলিতে ইচ্ছা করে— 'ভাই সকল, আপনার ভাষায় একবার সকলে মিলিয়া গান কর। বহু বৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথা বলিতে দাও। বাংলা ভাষায় একবার আপনার কথা বলিতে দাও। বাংলা ভাষায় সকলে মিলিয়া মা বলিয়া ডাক।"

— সজনীকান্ত দাসের " 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'এর কবি রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য, শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৬৮।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে স্বদেশপ্রেম এখানে কবিচিত্তে ভাবালুতায় উচ্ছ্বসিত; এই উচ্ছ্বাসের পরিচয় স্বদেশী সঙ্গীতগুলির মধ্যেও যথেষ্ট পরিমার্ণে রহিয়াছে। ইহার অনেক পরবর্তী কালে বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি রচনা করিয়াছিলেন, শুধু রচনা করেন নাই, এই গান গাহিয়া কলিকাতার পথে পথে রাখীবন্ধন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। একটা জীবনে বাঙলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে লইয়া রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনা এমনভাবে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল যে পরবর্তী কালের পরিণতি ও প্রসারণের সঙ্গে যোগ না করিয়া কবির এই জীবনটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে আমরা হয়তো রবীন্দ্রনাথকে 'বাঙলা ও বাঙালীর কবি' বলিয়া বর্ণনা ও গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ হইতে পারি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ জিনিসটি করিতে যাওয়া ভ্রমাত্মক হইবে বলিয়া মনে করি। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের মত এমন আশ্চর্যভাবে বর্ধনশীল ব্যক্তিত্ব অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যেন তিনি বাড়িয়াছেন, সারাজীবনে বাড়িয়া ওঠা একটা প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্বের সত্যকে কোনও একটি বিশেষ কালপরিধিতে প্রকাশিত পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে যাওয়া আর নববসন্তারম্ভে কিশলয়যুক্ত একটি বৃক্ষকে ফলপুষ্পের সম্ভাবনাবর্জিত একটি কিশলয়সর্বস্ব উদ্ভিদ বলিয়া বর্ণনা করা একই জিনিস।

রবীন্দ্রনাথের ক্রমবর্ধনশীল মন তাঁহার স্বাদেশিকতা এবং জাতীয়তার জন্য ব্যাপকতর পরিধি এবং গভীরতর ভাবাবলম্বন চাহিতেছিল। তখন দেখা গেল, একটি স্বাভাবিক পথেই তাঁহার স্বাদেশিকতা এবং জাতীয়তা বাঙলা-বাঙালীকে অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীতে ছড়াইয়া পড়িল। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-উন্মাদনার যুগটি কাটিল বাঙলা ও বাঙালীকে লইয়া, অনুভূতির নিবিড়তা ও ধ্যান-মননের গভীরতা প্রকাশ পাইয়াছে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে লইয়া।

ভারতবর্ষের ধর্ম ঐতিহ্য সাহিত্য সংস্কৃতি এবং সমাজের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ করিয়া উত্তরত্রিশের জীবনে রবীন্দ্রনাথ অনেক লেখা লিখিয়াছেন। এ লেখাগুলির মধ্যে আক্রমণাত্মক সুর নাই, পৃথিবীর অপর কোনো জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের কোনো অত্যুৎসাহী প্রচেষ্টা নাই, আছে নিজের পূর্বপরিচয়টা যে মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে কোনো দিক হইতেই অগৌরবের নয়— সেই সত্যটির খ্যাপন। এ সত্যটির খ্যাপন তখনকার দিনে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই কবি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। জাতির আসল জীবন বলিতে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই মনে করিতেন জাতির সমাজজীবন। উনবিংশ শতকে আমাদের সমাজ-জীবনে প্রাণশক্তিতে অনেকখানি ভাঁটা পড়িয়া গেল— তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল দেখা দিয়াছিল বিবিধ বিকৃতিতে। এই প্রাণশক্তির ক্ষীণতা এবং তজ্জনিত বিকৃতির উপরে আসিয়া সহসা প্রবলবেগে যখন লাগিল ইউরোপ হইতে আগত অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রবল ধাক্কা, তখন একটা কথাই আমাদের কাছে প্রতিপন্ন হইয়া উঠিতে চাহিল, যে-জীবনযাত্রা লইয়া আমরা বাঁচিয়াছিলাম মানুষ হিসাবে তেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার আমাদের কোনো অর্থ ছিল না; বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার পাইতে হইলে আমাদের বাঁচিবার ধারাটাকেই আমূল পরিবর্তিত করিয়া লইবার প্রয়োজন ছিল। ইহাকে ঠিক পরিবর্তন করিয়া লওয়া বলা যায় না, ইহা যেন একটাকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া অপরটাকে একেবারে নূতন করিয়া গ্রহণ। এইখানে রবীন্দ্রনাথের মনে লাগিয়াছিল একটা বড় ধাক্কা। সংস্কারাবৃত দৃষ্টিতে তিনি যে নূতনের আকৃতিটাকে এবং প্রকৃতিটাকে ঠিক বুঝিতে পারিলেন না— এবং সেই জন্যই একটা অন্ধ

প্রতিক্রিয়ায় রক্ষণশীল হইয়া উঠিলেন তাহা নয়; ইউরোপ হইতে যাহা-কিছু আসিয়াছিল নূতন তাহাকে খুব ভালোভাবে চিনিতে পারিয়া— ভিতরকার মঙ্গলময় সত্যটুকুকে অকুণ্ঠচিত্তে এবং সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানাইয়াও তিনি আন্তরিকভাবেই এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হইলেন যে, ভারতবর্ষ নামক পৃথিবীগ্রহের যে অঞ্চলটিতে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া কোটি কোটি মানুষ জীবনের যে মূল্যবোধ লইয়া যে জীবন-যাত্রা গড়িয়া তুলিয়াছে, মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে সেটা সম্পূর্ণ অগৌরবের নয়। আমাদের সমাজজীবনে যে সজীবপ্রাণের প্রবাহ ছিল তাহার বিমল শক্তিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারিলেই আমাদের দেহের বহু স্থানে যে বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দূরীভূত হইবে এবং আমরা মানুষের মত স্বাস্থ্য ও আনন্দময় বিকাশ লাভের অধিকারী হইব।

এ-কথাটা আজকাল আমরা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি যে, প্রথমবয়সে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে খানিকটা চলিতে চলিতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিপ্রবণতা লইয়া পাশ কাটাইয়া একটু দূরে সরিয়া পড়িলেন। কথাটাকে তাহা মিথ্যা বলিব না। সহজাত কবিপ্রকৃতি কর্মসংগ্রামের কোলাহল এবং ধূলিলিপ্ততা হইতে কবিকে যে খানিকটা বিমুখ করিয়া রাখিয়াছিল সে কথা মানিতেই হইবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এই কথাটিই সবখানি কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ যে সরিয়া দাঁড়াইলেন তাহা যথার্থ স্বদেশী-আন্দোলন হইতে নয়, তাহা কংগ্রেস-আন্দোলন হইতে; তাহার কারণও শুধু তাঁহার কর্মকোলাহল-বিমুখ কবিপ্রকৃতি নয়, তাহার কারণের ইঙ্গিত পূর্বেই দিয়াছি— তাহা হইল জাতীয়-আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাটাকে ছিনাইয়া লইবার সংগ্রামকে— শুধু প্রধান নয়— প্রায় একমাত্র করিয়া তুলিবার দুর্বার আগ্রহ। জাতীয়-আন্দোলনের এই রূপটাই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়া প্রকটিত হইল, তখন রবীন্দ্রনাথের জাতীয়-আন্দোলনের উপরে অবিশ্বাসটাও ঘনীভূত হইয়া উঠিল— সবটা সত্য বুঝিতে হইলে এই কথাটাও নির্ভুলভাবে লক্ষণীয়।

এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে— তিনি যাঁহাকে শুধু ভারতবর্ষের নেতা হিসাবে নয়, জগতের মধ্যে একজন মানুষ হিসাবে সমসাময়িক মানুষদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করিতেন সেই মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে এ-বিষয়ে তিনি যখন প্রকাশ্য বাদপ্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেখানে দেখি, মহাত্মা গান্ধীর 'স্বরাজ'এর আদর্শটিই কবির মনঃপূত ছিল না; কবির আদর্শ ছিল মুক্তির আদর্শ। পূর্বেই দেখিয়াছি এ মুক্তি মুখ্যভাবে হইল চিত্তের মুক্তি, অজ্ঞতা হইতে জড়তা হইতে কুসংস্কার হইতে মুক্তি— যে মুক্তি ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে মানুষকে আগাইয়া লইয়া চলিবে নিরন্তর মনুষ্যত্বের বিকাশের পথে। কবি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার দেশবাসীকে এই বিকাশের পথে আগাইয়া দিবার কাজেই ছিল তাঁহার স্বধর্ম, স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর হইতে এই স্বধর্মকেই তখন তিনি তাই বাছিয়া লইলেন।

একটা যুগে ভারতবর্ষের মহিমাখ্যাপনে কবি প্রায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার ভিতরে এমন উক্তি বা মনোভাব আবিষ্কার করা কিছু কঠিন নয় যে ভারতবর্ষের প্রতি বিধাতার একটি বিশেষ করুণা রহিয়াছে, যাহার ফলে মানব-মহত্ত্বের এমন কতকগুলি দিক্‌ ভারতবর্ষে বিকাশ লাভ করিয়াছে যাহা অন্যত্র বিরল। কিন্তু ইহার পরে চলিল বিশ-পঁচিশ বছর ধরিয়া কবির কেবলই ভ্রমণের পালা। এশিয়া ইউরোপ আমেরিকা— কোথাও বাকি রহিল না, দেশবিদেশে যে শুধু প্রচুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুলাভ ঘটিল

তাহা নয়, দেশবিদেশের বিচিত্রধরণের মানুষের সঙ্গে ঘটিতে লাগিল প্রত্যক্ষ এবং আন্তরিক পরিচয়। এই পরিচয় কবির স্বাজাত্যের মোহকে ভাঙিয়া দিল। ধীরে ধীরে তিনি তাঁহার সামনে দেখিতে পাইলেন নির্বিশেষ মানুষকে— যে মানুষের কোনো দেশগত বা কালগত পরিচয় নাই, যে মানুষ সর্বদেশের সর্বকালের মানুষ— অনাদি-অনন্তকালে নিরন্তর জায়মান মানুষ। এই মানুষ রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার কবিতার মধ্যেও মাঝে মাঝে আসিয়া উঁকিঝুঁকি মারিয়াছে; কিন্তু তখন এই মানুষ ছিল কল্পনার সুদূর শূন্যে ঝিকমিক্-করা নীহারিকাপুঞ্জ; তাহার একটা অস্পষ্ট আকর্ষণ ছিল, বাস্তব রূপ ও মহিমা ছিল না। তাহাকে লইয়া একটা জীবনচর্যার আদর্শ গড়িয়া তোলা যায় নাই। ১৯১০ সনের পর হইতে আরম্ভ করিয়া বার বৎসরের একটি যুগে কবি নিজের মনের ভিতরকার 'মানুষে'র সহিত দেশে দেশে রক্তমাংসের ভিতরে দুঃখেসুখে ভালোমন্দে বিষয়ীকৃত মানুষের মিলটাকে ভালো করিয়া অনুভব করিলেন, 'ভাবের মানুষ' এবং 'ভবের মানুষে'র ভিতরকার ব্যবধানটা ঘুচিয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথের প্রথমজীবনের গান-কবিতার ভিতরেই অস্পষ্টভাবে একটি ভাবধারার প্রকাশ দেখিতে পাই যে, নিখিল সৃষ্টি কালে কালে তাহার সকল প্রবাহের ভিতর দিয়া বিকশিত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে তাহার মর্মবাণী চেতন মানুষের অনন্ত বৈচিত্র্যময় এবং রহস্যময় প্রকাশের ভিতর দিয়া। এই ভাবধারা ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়া যেখানে একটা ধ্রুবপদের মতন কবির মনে ও সুরে দেখা দিল তখন নিখিল মানবের বিবর্তন কবির মনে একটি নিরন্তর জায়মান 'ব্রহ্মকমলে'র রূপ পরিগ্রহ করিল। এই 'ব্রহ্মকমলে'র মহিমা কবির মনকে যখন সবটুকু অধিকার করিয়া বসিল তখন আর 'ভারতকমলে'র দিকে পৃথক্ করিয়া চাহিবার অবকাশ রহিল কোথায়? আর পূর্বেই বলিয়াছি, 'বঙ্গকমল' তো বহুদিন পূর্বেই 'ভারতকমলে'র মধ্যে তাহার মহিমা ও আকর্ষণকে সমর্পণ করিয়া দিয়া ব্যাপক ও গভীর অর্থ লাভ করিতে চাহিয়াছে। তখন কেবল চেষ্টা চলিয়াছে বাঙলার বুকেই 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে বিশ্বের 'একনীড়' করিয়া তুলিবার চেষ্টা।

রাজনীতিঘেঁষা জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কতটুকু যোগাযোগ ছিল না ছিল সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করিলাম, কথা উঠিবে আর একটি দিক্ লইয়া, অর্থাৎ রবীন্দ্রসাহিত্যে বাঙলার জাতীয়জীবন কি করিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা লইয়া।

সাহিত্য বা সাধারণ শিল্পের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটা আমরা যখনই তুলি তখনই আমাদের মনের মধ্যে একটি বিশেষ বাসনা থাকে। আমরা জানি, নিখিল মানুষ দেশে দেশে কালে কালে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীতে বা সমাজে ভাগ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা এই ভাগগুলিকে সাধারণভাবে বলিয়া থাকি জাতি। বিশেষ ধরণের একটা ভৌগোলিক অবস্থান, নৃতত্ত্ব, জীবনযাত্রা এবং নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি, ধর্মবিশ্বাস, ভাষা-সাহিত্য, প্রথা-সংস্কার— সব লইয়া বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে বিচিত্র রঙ-রেখা জাগিয়া ওঠে। মনুষ্যসামান্যে জীবনের যে রঙ-রেখা তাহা অপেক্ষা জাতীয়জীবনের এই বিশেষ রঙ-রেখার প্রতি অনেক সময় আমাদের একটা বিশেষ মমতা এবং আকর্ষণ থাকে। অনেকের সাহিত্যে এই উপাদানই যোগায় মধুর একটি স্বাদ, যেমন স্বাদ রহিয়াছে শরৎচন্দ্রের বিভূতিভূষণের তারাশঙ্করের অনেক গল্প-উপন্যাসে। কবি হিসাবে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় কুমুদরঞ্জন মল্লিক কালিদাস রায় প্রভৃতির কিছু কিছু কবিতার উল্লেখ করিতে পারি যেখানে বাঙালীত্বের নিজস্ব মাধুর্য আস্বাদনের মধ্যে একটা বিচিত্র মমতার সৃষ্টি করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে এই বাঙালীত্বের মমতা কোথাও বিশেষ আকর্ষণের সৃষ্টি করে নাই। ইহার কারণও স্পষ্ট মনে হয়। বাঙালী জীবনের সকল আনাচে কানাচে ছড়ানো এই যে রঙ-রেখা-মাধুর্যের বিশেষ বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের জীবনে ইহার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হইবার এবং নিবিড়ভাবে যুক্ত হইবার সুযোগ তিনি পান নাই। নিজের কবিতায় নিজেই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে জীবনের বিচিত্র ঐকতানে সবখান হইতে যাহারা সুর মিশাইয়াছে তাহার সব স্তরে গিয়া তাঁহার দৃষ্টি পৌছায় নাই, দৃষ্টি পৌছায় নাই বলিয়াই আকর্ষণও বড় হইয়া ওঠে নাই। শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত 'কাঙ্গালীচরণের মা', বিভুতিভূষণের 'ইন্দির ঠাকরুণ', তারাশঙ্করের 'শবলা', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কুবের জেলে'— ইহাদের জন্য আমাদের মনে একটা বিশেষ মমতা এবং আকর্ষণ রহিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না। বাঙালীজীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ইহাদের পর্যন্ত গিয়া বিস্তৃতি লাভ করে নাই। উপরে উল্লেখিত লেখকেরা এইসব স্তরের বাঙালীজীবনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া যেমনভাবে অনেকখানি এক হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ সে সুযোগ লাভ করেন নাই।

অতি প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে রবীন্দ্রনাথের শতাধিক ছোটগল্পের কথা স্মরণে আসিবে। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি অধিকাংশই সঙ্কেতধর্মী অথবা প্রতীকধর্মী, যেখানে তাহা নয় সেখানেও চরিত্রগুলি বিশেষ কোনো ভাবদ্বন্দ্বের বিগ্রহীভূত মূর্তি ; এই কারণে এই চরিত্রগুলির বিশেষভাবে কোনো বাঙালী মাধুর্যে মোহ সৃষ্টি করিবার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির ভিতরকার চরিত্রগুলি মুখ্যতঃ নাগরিক, এ কথা রবীন্দ্র-উপন্যাস আলোচনাকারিগণ উল্লেখ করিয়াছেন। নাগরিক জীবনে বাঙালীত্বের বিশেষ আকর্ষণ তেমনভাবে ফুটিয়া উঠিবার কথা নয়। কিন্তু ছোটগল্পগুলির শুধু অবলম্বনই বাঙলার পল্লীজীবন নয়— এগুলির প্রেরণাও বাঙলার পল্লীজীবন। ১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথ জমিদারী তদারকের ভার লইয়া প্রথম পল্লীবাঙলায় চলিয়া আসিলেন। পল্লীবাঙলার সহিত কবির এইই সত্যকারের পরিচয়। প্রকৃতিকে জন্মাবধি ভালোবাসেন কবি, এখানে পাওয়া গেল জল-স্থল মিলিয়া প্রকৃতির এক সমগ্র রূপ— যে রূপের সমগ্রতার মধ্যে মানুষও আসিয়া অপর সকল কিছুর সঙ্গে নির্বিরোধে এক হইয়া যোগ দিল। কালিদাস একদিন তপোবনের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন বিশ্বপ্রকৃতির একটি অখণ্ড রূপ— যেখানে চেতনে-অচেতনে কোথাও ছিল না বিরোধ— সমস্ত জুড়িয়া যেন একটি বিরাট্ রহস্যময় অস্তিত্ব। পদ্মাবক্ষে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন বিশ্বপ্রকৃতির নূতন রকমের একটি সমগ্র রূপ ; আকাশের চঞ্চল মেঘের খেলা, জলের কলপ্রবাহ, আর তীরে তীরে ঘনবিন্যস্ত তরুশ্রেণী— তাহার আড়ালে আড়ালে ছোট ছোট কুটির, তাহারই ভিতরে জীবনের চঞ্চল কলস্রোত ; কোথাও যেন ছেদ ছিল না, বিরোধ ছিল না— সব মিলিয়া এক।

কিন্তু প্রকৃতির এই সমগ্রতার ভিতর দিয়াও এই যুগে মানুষ কবিচিত্তকে বিশেষভাবে নাড়া দিল ; মানুষের জীবন অমন করিয়া নাড়া দিল বলিয়াই ছোটগল্পের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ— শুধু কবিতায় চলিল না, কবিতার সঙ্গে সঙ্গে সমানে ছোটগল্পে ; প্রকৃতিতে মানুষে এখানে অচ্ছেদ্য ভাবে মেশামেশি আছে বলিয়া এ যুগের কবিতা এবং ছোটগল্পেও রহিয়াছে অপূর্ব মেশামিশি। বাঙালীর পল্লীজীবনকে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন ধরিয়া নদীয়া-রাজশাহী-পাবনার একটা বিস্তৃত অঞ্চল ঘুরিয়া ঘুরিয়া সত্যই দেখিলেন— শুধু কল্পনায় দেখা নয়— চোখে দেখা কানে শোনা— হৃদয় দিয়া প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা। কিন্তু এ-দেখাও দেখিলেন

অনেকখানি নদীবক্ষ হইতে তীরভূমিকে দেখার মত করিয়া, দেখিলেন একটু দূর হইতে পদ্মাবক্ষের 'বোট' হইতে। যেখানে স্থলে নামিলেন সেখানেও দেখিলেন জমিদারী কাছারি হইতে— একটু ব্যবধান রাখিয়া, শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষণ তারাশঙ্করের ন্যায় পল্লীবাসীর সঙ্গে একেবারে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া নয়।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রভৃতি হইতে আগে আসিয়াছিলেন, পল্লীর বাঙালী-জীবনে প্রবেশের পথ তিনি প্রথমে রচনা করিয়া দিলেন ; ইহার পূর্বে বাঙলা মঙ্গলকাব্যে এই পথের জাল বিছানো ছিল— আর ছিল গাঁথা-গীতিকাগুলির মধ্যে ; বাঙলা উপন্যাস-ছোটগল্পের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে পল্লীবাঙলার ছোটখাটো সুখদুঃখের মধ্যে এমন করিয়া প্রবেশের পথ আর ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা-সাহিত্যে পল্লীজীবনে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত -জীবনে প্রবেশের পথ বাঁধিয়া দিলেন ; সেই পথের সুযোগ পাইয়া শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষণ তারাশঙ্কর নানা আঁকাবাঁকা পথে সেই জীবনের অনেক দুর্গম এবং অজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রাপদ্ধতি এত দুর্গম আনাচে-কানাচে প্রবেশ করিবার পক্ষে অনুকূল ছিল না এইটাই সবটুকু সত্য নহে, তখনকার দিনে বাঙলা-সাহিত্যে তাহার কোনো রেওয়াজও ছিল না। মানিতে হইবে, রেওয়াজ রবীন্দ্রনাথই আনিলেন ; তিনি নিজে সবটুকু দূরে অগ্রসর হইতে পারিলেন না ; অতি স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছিতরূপে তাঁহার পরবর্তিগণ নিজের নিজের রুচিপ্রবণতা লইয়া আরও আরও অনেকদূরে আগাইয়া গেলেন। ইহা দ্বারা পরবর্তিগণের সঙ্গে এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কোনও বিরোধিতা সূচিত হইতেছে না, রবীন্দ্রনাথের কালসঙ্গত বিস্তারই সূচিত হইতেছে।

বাঙলা ও বাঙালীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগের কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে আর-একটি জিনিস অত্যন্তভাবে লক্ষণীয়। আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, মধ্যবয়সের পরে মানুষ হিসাবে 'বাঙালী'-মানুষ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে বিশেষ করিয়া আকর্ষণের সৃষ্টি করে নাই। যতদিন যাইতে লাগিল ততই নিখিল মানবযাত্রীর 'ব্রহ্মকমল' রূপটি তাঁহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বসিতে লাগিল। কিন্তু বাঙলা দেশের প্রতি— অর্থাৎ বাঙলার প্রকৃতির প্রতি যে তাঁহার একটা বিশেষ আকর্ষণ তাহা কোনও দিন হ্রাস পায় নাই— বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। একযুগে কবি গান করিয়াছিলেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। এই যুগে কবি বাঙালীকেও ভালোবাসি— এ কথাও বলিয়াছেন ; আমরা দেখিয়াছি— সে ভালোবাসার পরিধি ক্রমবিস্তৃতি লাভ করিয়া বিশ্বজনের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'— এ কথা রবীন্দ্রনাথের জীবনে কোনো বিশেষ যুগের কথা নয়— এ কথা সমভাবে সমগ্রজীবনের কথা। ইহার প্রমাণ শুধু তাঁহার প্রথম দিককার স্বদেশী গানে নয়— ইহার প্রমাণ আছে তাঁহার সব যুগের গল্পে নাটকে কবিতায় গানে। বিদেশের প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথ অল্পবয়স হইতেই দেখিয়াছেন, অল্পবয়সের অনেক লেখায় এবং পত্রে তুলনায় বাঙলার প্রকৃতির প্রতি কবির বিশেষ টান প্রকাশ পাইয়াছে। তুলনায় সেই অধিক টান শেষজীবন পর্যন্ত স্থায়ী হইয়া উঠিয়াছে। মনের ছোট বড় তারগুলির সঙ্গে বঙ্গপ্রকৃতির নিত্যপরিবর্তনের বিচিত্রতার সঙ্গে যেন একটা নিগূঢ় সুর বাঁধা ছিল ; সেই সঙ্গতি কোনও যুগেই ব্যাহত হয় নাই, উত্তরোত্তর যেন আরও পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া নিখুঁত হইয়া উঠিয়াছে।

ইতিহাস অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার জাতীয়জীবন সম্বন্ধে দুই দিক হইতেই কিছু কিছু আলোচনা করিলাম বটে, কিন্তু আলোচনার অন্তে মনে হইতেছে, 'এহ বাহ্য'। রবীন্দ্রনাথ কখন কোন্ জাতীয়

আন্দোলনের সঙ্গে কেন এবং কতটুকু যোগ দিয়াছিলেন না দিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার জাতীয়-জীবনের ভিতরকার যোগ বুঝিতে সেইটাই বড় কথা নয়। আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মের এক শত বৎসর পরে যখন নিজেদের দিকে ভালো করিয়া তাকাইয়া দেখিতেছি তখন দেখিতে পাইতেছি, যেখানে যেটুকু জাগিয়া উঠিয়াছি তাহার পিছনে রবীন্দ্রনাথের আহ্বান রহিয়াছে, চিন্তার সচকিত বেদন রহিয়াছে, আর রহিয়াছে বিকাশকামী চিত্তের পাপড়িতে পাপড়িতে তাঁহার সুকুমার সুরের স্পর্শ। একটা জাতি যদি জীবন্ত জাতি হয় তবে কালের প্রবাহকে অবলম্বন করিয়া জীবনের পথে তাহাকে চলিতেই হইবে, আর চলা থাকিলেই তাহার ভিতরে অনুস্যূত থাকিবে একটা গতিনির্দেশ। রবীন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া আছেন আমাদের জাতীয়-জীবনে চলার সেই গতিনির্দেশের সঙ্কেত লইয়া। এই গতিনির্দেশের মধ্যেই জাগিয়া ওঠে জাতির সমগ্র শ্রেয়োবোধ— জীবন সম্বন্ধে তাহার চরম মূল্যবোধ। সেইখানে দাঁড়াইয়া আছেন রবীন্দ্রনাথ নিয়ন্ত্রণের কাজ লইয়া— সে নিয়ন্ত্রণ সতত সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে তাঁহার মননে আচরণে— তাঁহার ছন্দে সুরে রঙে রেখায়। এই খানেই বাঙলা জাতীয়জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় যোগের সর্বোত্তম পরিচয়।

রবীন্দ্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ প্রথম জীবন

শ্রীসুকুমার সেন

প্রতিভা দিব্যজ্যোতির মত। মানুষকে আশ্রয় ক'রে সে জ্যোতির প্রকাশ। পার্থিব জ্যোতির প্রকাশের মাত্রা ও প্রকৃতি জ্যোতির্বস্তুর ও জ্যোতিঃপিণ্ডের আধার ও আধেয়ের উপর নির্ভর করে, দিব্যজ্যোতির প্রকাশের মাত্রা ও প্রকৃতি নির্ভর করে জন্মাবধি লব্ধ সংস্রব ও সংস্কার -জাত মানসিকতার উপর। সম্ভাবনার দিক দিয়ে প্রতিভার বিচারের বিশেষ কোনো মূল্য নেই, কেননা প্রতিভার পরিচয় তো প্রকাশে। অপ্রকাশিত প্রতিভার মূল্য অলিখিত কবিতার মতই, যা নাস্তি তার খোঁজ করা।

প্রতিভার মূল্য তার সৃষ্টির— সৃষ্টি এখানে ব্যাপক অর্থে নিতে হবে— অনুযায়ী। সৃষ্টির দুর্লভতা, তার বিচিত্রতা, তার বিপুলতা, তার ব্যাপকতা— এই তো প্রতিভার পরিমাণদণ্ড। বৃহৎ প্রতিভার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের গল্পের পরীর পরিচয়ের মত, অন্তর্হিত হলে পরেই তবে তার স্বরূপ বোঝা যায়; আর যত দিন কাটতে থাকে ততই পালানো-পরীর মত প্রতিভাধরের সৃষ্টির মহার্ঘ্যতা বেশি করে অনুভূত হতে থাকে। আমাদের ভারতবর্ষে অতিবৃহৎ সাহিত্যপ্রতিভা দুটি জন্মেছে— কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ। বাল্মীকি ও ব্যাসের নাম ইচ্ছা করেই বাদ দিলুম। বাল্মীকির লেখা আদিরামায়ণ যুগ যুগ আগেই হারিয়ে গেছে, অথবা তলিয়ে গেছে। সুতরাং কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তি মানুষ রূপে বাল্মীকির কবিত্ববিচার সমীচীন মনে করি না। ব্যাস নামে কোনো এক ব্যক্তি কোনো এক সুনির্দিষ্ট কালে আমাদের পরিচিত অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারত রচনা করেছিলেন ব'লে মনে করতে আমার ঐতিহাসিক বোধে বাধে। তার উপর, ব্যাসের ব্যক্তিত্ব বাল্মীকির চেয়েও বেশি ধোঁয়াটে। সুতরাং বাল্মীকিকে বাদ দিলে ভারতবর্ষের মহৎ কবিদের আলোচনায় ব্যাসকেও টেনে আনা যায় না।

প্রতিভার ক্ষেত্রপ্রসার বিবেচনা করলে রবীন্দ্রনাথ একাকী। এই একক প্রতিভার আধার যে মানুষটি তাঁর মানসিকতা ও চারিত্র্য সংসারের ও সমাজের পরিবেশে আর বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের রঙে-বেরঙে ও আকর্ষণে-বিকর্ষণে কিভাবে গড়ে উঠেছিল তারই এখানে বিশ্লেষণের চেষ্টা করছি। এই আলোচনার যা-কিছু বস্তু তা প্রায় সবই রবীন্দ্রনাথ নিজে জুগিয়ে গেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ বিনয় সৌজন্য ও স্বাভাবিক সংকোচ হেতু অনেক বিষয়ে অল্পকথায় সেরেছেন, আর কোনো কোনো বিষয়ে মৌনী রয়ে গেছেন। সেসব বিষয় উপযুক্ত পারস্‌পেক্‌টিভে এনে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির একটা *raison d'etre* অর্থাৎ ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করছি। আমাদের শাস্ত্রে বলে আদিত্যের হৃদয়ে এক হিরণ্ময় পুরুষ বাস করছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাদীপ্তির কেন্দ্রস্থলে যে মানুষটির মন ক্রিয়াশীল ছিল তার সে মনের আকৃতি-প্রকৃতি কেমন তা জানবার কৌতূহল স্বাভাবিক। তবে আমরা আধ্যাত্মিক জাতি বলে সে কৌতূহলকে আমল দিই না। আমাদের কৌতূহল ইহলোকেরও মানুষের উপর ততটা নেই যতটা আছে পরলোকের ও দেবতার উপর। এখন, পরলোক ও দেবতার উপর বিশ্বাস ও ভক্তি কালধর্মে লোপ পাচ্ছে। কিন্তু পরলোকে দেবতার স্থানে যা আসছে তারা আর যাই হোন বর্তমান কালের সাধারণ মানুষ— ইংরেজিতে যাকে বলে common man, তা— নন। সুতরাং অবস্থা অপরিবর্তিত রয়ে গেল। আমরা

যতই কালপ্রবাহে এগিয়ে চলছি ততই পিছে-ফেলা অতীতের খ্যাত ব্যক্তিদের দেবতা বানিয়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে দৈবাৎ এক-আধ জন অত্যন্ত অসাধারণ। এই অসাধারণ মানুষ-দেবতাদের মধ্যে কনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠতম হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ যখন জন্ম নিয়েছিলেন তখন কলকাতার ধনী বাঙালী সংসারের ও সমাজের চালচলন ও ক্রিয়াকর্ম পাড়াগাঁয়ের জমিদার-ঘরের থেকে খুব বেশি আলাদা ছিল না। অন্তঃপুরের পরিবেশ অশনবসন ও কাজকারবার শহরে ও পাড়াগাঁয়ে প্রায় পুরাপুরি একরকম ছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে অবশ্য তখন ঢেঁকিতে ধান ভেনে চাল করে ভাত রান্না হত না, বাজার থেকে কেনা হত অথবা জমিদারি থেকে চাল আসত। কিন্তু ঢেঁকির পাট তখনও একেবারে উঠে যায় নি। বাড়িতে ধানের মরাই ছিল না বটে, তবে গোলাবাড়ি তখনও ছিল। ঢেঁকিশালার মত একটা চালাঘর ছিল এবং সেখানে ঢেঁকিও ছিল। হয়তো পিঠাপরবে চালগুঁড়ি করা হত। ঠাকুরদের সংসারে পাড়াগাঁয়ের থেকে খুব কমবয়সী মেয়েদের বউ করে আনা হত, এবং সেই সূত্রে অনেক সময়ই বধূর আত্মীয় মহিলাও ঠাকুরপরিবারে স্থান পেতেন। বধূরা প্রায়ই একটি অঞ্চলের (যশোর-খুলনা) থেকে আসতেন, কেননা পিরালী ঘরে মেয়ে দিতে অনেকেই নারাজ ছিল। যাঁরা দিতেন তাঁরা আশা রাখতে সগোষ্ঠী-ভরণপোষণের। তেমনি, মেয়ে দিলেও জামাই পুষতে হ'ত। পাড়াগাঁয়ে সমান ঘরে কারবার তখন কলকাতার ধনীদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। কলকাতার ধনী ঘরের সঙ্গে বাইরের সমান দরের ধনী ঘর বিবাহসম্বন্ধ করতে সাধারণত নারাজ হত। কারণ বোঝা কঠিন নয়। রবীন্দ্রনাথেরা ধনে ছোট ছিলেন না, কলকাতার দেশি ও বিলিতি সমাজে মানে খুবই বড় ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁদের স্থান মোটেই উঁচুতে ছিল না। তাই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ আত্মীয়দের তাঁদের পুষতে হত। এইসব কারণে রবীন্দ্রনাথের শৈশবে তাঁদের অন্দরমহলে পুরানো একান্নবর্তিতার সঙ্গে শহুরে ভাবের অভাব স্পষ্টভাবে বিজড়িত ছিল। এমনটি সে সময়ের অন্য ধনী সংসারে ছিল কিনা তা জানি না এবং জানবার উপায়ও নেই।

রবীন্দ্রনাথ যখন জন্ম নিলেন তার অল্পকাল আগেই তাঁদের সংসার থেকে পৌত্তলিকতার শেষ চিহ্নটুকু মুছে গিয়েছিল। তাঁদের চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, সেখানে দুর্গাপূজা বন্ধ হলেও পাঠশালা বসত, যেমন বসত পাড়াগাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে।

যে পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম সে পরিবার বৃহৎ, পুত্র-কন্যায় আত্মীয়-পরিজনে কর্মচারী-ভৃত্যে বৃহৎ। প্রায় সমবয়সী ভাই বোন ভাইপো ভাইঝি বোনপো বোনঝি— এই সবের মধ্যে শিশু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন। দুগ্ধপোষ্যতা (infancy) কাটিয়ে ওঠবার পরে যখন বোধশক্তির সূক্ষ্মতা এবং স্মৃতিশক্তির প্রস্ফুটন হল তখন রবীন্দ্রনাথ দেখলেন যে তাঁর সঙ্গী-সঙ্গিনীদের মত তাঁর শিশুসমাদর নেই। দিনের বেলায় তিনি মাতৃসদন থেকে চাকরদের মহলে নির্বাসিত। এই অনাদর-বোধ ও নির্বাসন-পীড়া রবীন্দ্রনাথের শিশুমানসের গঠনে খুব কাজ করেছে। জননী বহুপ্রসবিনী, তাঁর শরীর খুব পটু ছিল না। তাই কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি তাঁর যে-পরিমাণ স্নেহাভিব্যক্তি অপেক্ষিত ছিল ততটা রবীন্দ্রনাথ পান নি। সমবয়সীরা তাদের মায়ের কাছে যে লালন পেত সে লালন, শিশু রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করতেন। তা না পেয়ে তাঁর মনে ক্ষোভ রয়ে গিয়েছিল। বেশি বয়সেও এ ক্ষোভের রেশ তাঁর

মন থেকে মুছে যায় নি। তবে শিশু বয়সে সে ক্ষোভ তাঁর সজ্ঞান মনে সঞ্চারিত হয়ে নাড়া দিতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের মনোধর্মের যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য— অর্থাৎ অন্তর্মুখীনতা— সে বৈশিষ্ট্য তাঁর চার-পাঁচ বছর বয়স থেকেই জাগতে শুরু করেছিল। সে জাগার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হয়েছিল চাকরদের তাঁবেদারিতে থাকা। তান্ত্রিক যোগী যেমন নিজেকে চক্রমণ্ডলের অভ্যন্তরে রেখে যোগসাধনা করেন এও যেন সেই ধরণের একটা ব্যাপার। তান্ত্রিক-যোগী মণ্ডলচক্রের বেড়ি দিয়ে বহিরাক্রমণ থেকে, চিত্তবিক্ষেপের হেতু থেকে, নিজেকে ঠেকিয়ে রাখে, শিশু রবীন্দ্রনাথও যেন, ঠেকানো থাকতেন দু দিক থেকে— অন্তঃপুরের লালন থেকে আর বহিঃসংসারের আকর্ষণ থেকে। এই শিশুবন্দী-দশার যে সুমহৎ ফল ফলেছিল সে কথা সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্রনাথের চিত্তে যে প্রশান্তি, যে যোগিজনোচিত অক্ষোভ ছিল, যা তাঁর চারিত্র্যের একটা মুখ্য লক্ষণ ছিল তার শুরু এইখান থেকেই।[১] অক্ষোভ্য রবীন্দ্রনাথের জীবনে— ভালো-মন্দর কথা তুলব না— এই সংযম-সাধনার ফল অত্যন্ত গুরুতর হয়েছিল। লোভের বস্তু থেকে, এমনকি প্রাপ্য বস্তু থেকে, নিজেকে বঞ্চিত রাখা এবং সে বঞ্চনাকে সহজ ও স্বাভাবিক -ভাবে গ্রহণ করায় রবীন্দ্রনাথ তখন থেকেই অভ্যস্ত হতে থাকেন। অত্যন্ত আবশ্যকের বস্তুর জন্যেও তিনি হাত বাড়াতে কুণ্ঠিত হতে শিখলেন এই বয়স থেকেই।[২] তাই মাতৃস্নেহের ও অন্তঃপুর-লালনের অভিব্যক্তির অভাব অবোধভাবে অনুভূত হলেও রবীন্দ্রনাথের শিশুচিত্তকে আবিল করতে পারে নি। এ বড় সৌভাগ্যের কথা।

ভৃত্যশাসনের ফলে পরোক্ষ উপকার হয়েছিল দু'প্রকারে। এক, ঘরের কোণে জানালার ধারে গণ্ডীবদ্ধ থেকে শিশুমনকে বাইরের দিকে উধাও ছুটোতে পেরেছিলেন, দেহের নিগড় কল্পনাকে বাধামুক্ত করে ছেড়ে দিয়েছিল। দুই, প্রয়োজনের ও লোভের বস্তুর জন্যে হাত না বাড়ানোর অভ্যাস আপনিই হয়ে গিয়েছিল, আর আদর-অনাদর সম্বন্ধে মন অনেকটা নিরাসক্ত হয়ে উঠছিল। পরোক্ষ অপকারও যে কিছু হয় নি তা নয়। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে বরাবরই একটু মুখচোরা, সংকোচশীল ভাব ছিল। সে ভাবের সূত্রপাত হল এই সময়ে— মাতৃলালনের অভাব আর ভৃত্যশাসনের প্রভাব থেকে। প্রত্যক্ষ উপকার হল এই যে, শিশু রবীন্দ্রনাথ ভৃত্যশাসনতন্ত্রের দাক্ষিণ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে সাহিত্যের রসের প্রথম আস্বাদ পেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্যই উদ্‌ধৃত করছি।

> এই ভূতপূর্ব গুরুমহাশয় সন্ধ্যাবেলায় আমাদিগকে সংযত রাখিবার জন্য একটি উপায় বাহির করিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চার দিকে আমাদের বসাইয়া সে রামায়ণ মহাভারত

১ "এমনি করিয়া ত দূরে দূরে প্রতিহত হইয়া চিরদিন কাটিয়াছে। বাহিরের প্রকৃতি যেমন আমার কাছ হইতে দূরে ছিল, ঘরের অন্তঃপুরও তেমনই। সেইজন্য যখন তাহার যেটুকু দেখিতাম আমার চোখে যেন ছবির মত পড়িত।"

২ শিশুকালের শাসনকর্তাদের মধ্যে যার স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ অনেকটাই বহন করেছিলেন এবং নামও তোলেন নি তার প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতিতে তিনি যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করি। "তাহার নাম ঈশ্বর। সে পূর্বে গ্রামে গুরুমশায়গিরি করিত।... আমরা খাইতে বসিতাম। লুচি আমাদের সামনে একটা মোটা কাঠের বারকোশে রাশ-করা থাকিত। প্রথমে এই-একখানি মাত্র লুচি যথেষ্ট উঁচু হইতে শুচিতা বাঁচাইয়া সে আমাদের পাতে বর্ষণ করিত।...তাহার পর ঈশ্বর প্রশ্ন করিত, আরো দিতে হইবে কিনা। আমি জানিতাম, কোন্ উত্তরটি সর্বাপেক্ষা সদুত্তর বলিয়া তাহার কাছে গণ্য হইবে। তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দ্বিতীয়বার লুচি চাহিতে আমার ইচ্ছা করিত না।"

শোনাইত। চাকরদের মধ্যে আরও দুই-চারিটি শ্রোতা আসিয়া জুটিত। ক্ষীণ আলোকে ঘরের কড়িকাঠ পর্যন্ত মস্ত মস্ত ছায়া পড়িত, টিকটিকি দেওয়ালে পোকা ধরিয়া খাইত, চামচিকে বাহিরের বারান্দায় উন্মত্ত দরবেশের মতো ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিত, আমরা স্থির হইয়া বসিয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম। যেদিন কুশলবের কথা আসিল, বীরবালকেরা তাহাদের বাপখুড়াকে একেবারে মাটি করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল, সেদিনকার সন্ধ্যাবেলার সেই অস্পষ্ট আলোকের সভা নিস্তব্ধ ঔৎসুক্যের নিবিড়তায় যে কিরূপ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখনো মনে পড়ে। এদিকে রাত হইতেছে, আমাদের জাগরণকালের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু পরিণামের অনেক বাকি। এহেন সংকটের সময় হঠাৎ আমাদের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি দ্রুতগতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল;— কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল— অনুপ্রাসের ঝকমকি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

শুধু সাহিত্যরসের পেয় নয়, ধর্মতত্ত্বের খাদ্যের স্বাদও প্রথম এইখানেই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। তখনও তাঁর গায়ত্রী দীক্ষার ও উপনিষদ্ শিক্ষার প্রথম পাঠ নেবার অনেক দেরি।

কোনো কোনো দিন পুরাণ পাঠের প্রসঙ্গে শ্রোতৃসভায় শাস্ত্রঘটিত তর্ক উঠিত, ঈশ্বর সুগভীর বিজ্ঞতার সহিত তাহার মীমাংসা করিয়া দিত।

কিশোরী চাটুয্যের কাছে ছড়া-পাঁচালীর ছন্দে রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-দীক্ষা হয়েছিল।[৩] বালক রবীন্দ্রনাথের সুকণ্ঠের প্রশংসাও সর্বপ্রথম কিশোরী চাটুয্যের কাছে পাওয়া, দেশি গানে হাতেখড়িও তাঁর কাছে। এই ব্যক্তিটির প্রভাব রবীন্দ্র-মানস গঠনে কুমার ভৃত্য ঈশ্বরের পরেই উল্লেখযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথের পরিচারকের কাজ করবার আগে কিশোরী চাটুয্যে পাঁচালির দলে গাইয়ে ছিল।

সে আমাকে পাহাড়ে থাকিতে প্রায় বলিত— আহা দাদাজি, তোমাকে যদি পাইতাম তবে পাঁচালির দল এমন জমাইতে পারিতাম, সে আর কি বলিব। শুনিয়া আমার ভারি লোভ হইত— পাঁচালির দলে ভিড়িয়া দেশ-দেশান্তরে গান গাহিয়া বেড়ানোটা মহা একটা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ হইত। সেই কিশোরীর কাছে অনেকগুলি পাঁচালির গান শিখিয়াছিলাম।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে পাঁচটি গানের প্রথম ছত্র উদ্‌ধৃত করেছেন। গানগুলি দাশরথি রায়ের পাঁচালির। (কিশোরী চাটুয্যে কি অল্প বয়সে দাশরথির পাঁচালির দলে ছিলেন এবং দাশরথির দল ভেঙে গেলে কি তিনি কলকাতায় এসে ঠাকুর-বাড়িতে চাকরি নিয়েছিলেন?) একটি গান, যেমন—

ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্ত-কারীরে, নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়ান্ত হবে ভবে।
ভাবিলে ভাবনা যত ভ্রূভঙ্গে হরে রে,
তরল তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে॥

---

৩ তার আগেও, ছড়ার বাগর্থরস একটুকুও নিংড়াবার সময় আসে নি, সেই অতিশৈশবেও বৃদ্ধ কৈলাস মুখুজ্জের ছড়া শিশু রবীন্দ্রনাথের মন ভুলিয়েছিল। কৈলাস মুখুজ্জে তাঁদের অনেককালের খাতাঞ্চি, আত্মীয়ের মত। অত্যন্ত রসিক লোক। "সেই কৈলাস মুখুজ্জে আমার শিশুকালে অতিদ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মত বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল।··· ···বালকের মত যে মাতিয়া উঠিত তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দে দোলা।" কৈলাস মুখুজ্জে যা করেছিলেন তা ঠাকুরমা-দিদিমা-পিসি-মাসি-মায়ের কাজ।

মন, কিমর্থে এ মর্ত্যে কি তত্ত্বে এলি,
সদা কুকীর্তি দুর্বৃত্তি করিলি,— কি হবে রে,
উচিত এ নহে দাশরথিরে ডুবাবে।
কর প্রায়শ্চিত্ত, রে চিত্ত, সে নিত্য পদ ভেবে ॥

হিমালয় পর্যন্ত ঘুরে এসে বালক যখন অন্তঃপুরে মায়ের অভ্যর্থনা পেলেন তখন কিশোরী চাটুজ্যের কাছে শেখা এই গানগুলি খুব কাজে লেগেছিল। "এই গানগুলিতে আমাদের আসর যেমন জমিয়া উঠিত এমন সূর্যের অগ্নিউচ্ছ্বাস বা শনির চন্দ্রময়তার আলোচনায় হইত না।"

যে সংসারে রবীন্দ্রনাথ জন্ম নিয়েছিলেন ও মানুষ হয়েছিলেন সে সংসারের বাস্তোষ্পতি এবং শক্তিকেন্দ্র ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বৈদিক অর্থে দম্পতি, সংস্কৃত অর্থে কুলপতি এবং লাটিন অর্থে *pater familias* ছিলেন। তাঁর চারিত্র্যের দৃঢ়তা ও মহিমা দেখিয়া দেশের শিক্ষিত লোকে মহর্ষি বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিল। সংস্কৃতির খোলা হাওয়াই বলি আর উপনিষদের দীপ্তাকাশই বলি— তা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিপরিমণ্ডলের বিকিরণ। রবীন্দ্রনাথের চারিত্র্য গঠনে পিতা দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিপ্রভাব সব চেয়ে বেশি। দেবেন্দ্রনাথ যেন সংসারে থেকেও থাকতেন না। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ তিনি, বিষয়কর্মের, জমিদারির, নাড়ীনক্ষত্র বুঝতেন অথচ নিজেকে পরিচালনায় লিপ্ত রাখেন নি। জমিদারি চালনে শৈথিল্য ছিল না, কাঠিন্যও নয়। সংসারকর্মে এই অনুদাসীন নির্লিপ্ততার জন্য দেবেন্দ্রনাথ সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি আত্মীয়স্বজনের প্রতি স্নেহশীল ও প্রীতিমান ছিলেন অথচ কারো সঙ্গে মাখামাখি করতেন না। প্রীতির বিনিময়ে অকৃপণ হয়েও একটু দূরত্ব রেখে চলা রবীন্দ্রনাথের লোকব্যবহারে স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তাঁর এ স্বভাব খানিকটা পিতৃসূত্রে সঞ্চারিত বলে মনে করি।

পিতার কাছেই রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথম যথার্থ শিক্ষালাভ হয়েছিল। পরিবারের মধ্যে কেবল তিনিই বৃহৎ সংসারের চোখ এড়ানো এই কনিষ্ঠতম বালককে অনাদরের অনালোক থেকে টেনে এনে নিজের দীপ্ত সংসর্গে মাসকতক রেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের যখন উপনয়ন হয় তখন তিনি ফিরিঙ্গি ইস্কুল বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে পড়েন। মুণ্ডিত মস্তকে সে ইস্কুলে যাওয়া অসম সাহসের কাজ। একেই রবীন্দ্রনাথ ইস্কুল-গমনে অত্যন্ত নারাজ, তার উপর এখন নেড়া মাথা। এমন দুশ্চিন্তার সময়ে দেবেন্দ্রনাথ গ্রীষ্মের দীর্ঘ অবকাশ আসন্ন দেখে, ছেলেকে দেশভ্রমণে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন। যে পিতা জন্মের ঢের আগে থেকেই কলকাতা থেকে দূরে বাইরে বাইরে থাকতেন এবং যে পিতা বাল্যকালে তাঁর কাছে (তাঁর উক্তি অনুসারে) "অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়" সেই পিতার এখন যেন কোলে উঠলেন। পিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দূর ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন (ফাল্গুন ১২৭৯)। এই হল তাঁর প্রথম রেলে চড়া। এর আগে তিনি কলকাতার বাইরে একবার মাত্র গিয়েছিলেন (১৮৬৯), তাও দূরে নয়— কলকাতার উপকণ্ঠেই, পেনেটিতে।[৪] বাড়ির সদর দরজা রবীন্দ্রনাথ প্রথম পার হয়েছিলেন ছ-সাত বছর বয়সে, যখন কান্নাকাটি করে ইস্কুলে ভর্তি হন (১৮৬৮)। প্রথম ইস্কুলে যাওয়ার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইহার পূর্বে কোনোদিন গাড়িও চড়ি নাই বাড়ির বাহিরও হই নাই।"

---

৪ তখন পেনেটিকে কলকাতার উপকণ্ঠ বলা চলত না। বলা উচিত কলকাতার অল্প দূরে পাড়া গাঁ।

দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত রাশভারি ও কেতাদুরস্ত ছিলেন, কোনো কিছুতেই ঢিলেঢালা সহ্য করতে পারতেন না। "ছোটো হইতে বড়ো পর্যন্ত সমস্ত কল্পনা এবং কাজ অত্যন্ত যথাযথ ছিল। তিনি মনের মধ্যে কোনো জিনিস ঝাপসা রাখিতে পারিতেন না এবং তাঁহার কাজেও যেমন তেমন করিয়া কিছু হইবার জো ছিল না।" পিতার সঙ্গে ঘরের বাইরে এসে রবীন্দ্রনাথ ডিসিপ্লিনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতার কিছু অধিকার প্রথম পেলেন। "যদিচ আমি নিতান্ত ছোটো ছিলাম কিন্তু পিতা কখনো আমাকে যথেচ্ছবিহারে নিষেধ করিতেন না।" শুধু বেড়াবার স্বাধীনতা নয় কাজে ভার দিবার অছিলায়ও দেবেন্দ্রনাথ বালক পুত্রকে দায়িত্বের মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন।

> আমার কাছে দুই চারি আনা পয়সা রাখিয়া বলিতেন, হিসাব রাখিতে হইবে, এবং আমার প্রতি তাঁহার দামি সোনার ঘড়িটি দম দিবার ভার দিলেন।···সকালে যখন বেড়াইতে বাহির হইতেন, আমাকে সঙ্গে লইতেন। পথের মধ্যে ভিক্ষুক দেখিলে ভিক্ষা দিতে আমাকে আদেশ করিতেন।···
>
> ভগবদ্‌গীতায় পিতার মনের মতো শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ সমেত আমাকে কাপি করিতে দিয়াছিলেন। বাড়িতে আমি নগণ্য বালক ছিলাম, এখানে আমার পরে এইসকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।

সংস্কৃত লেখা কপি করতে দিয়ে, সংস্কৃত ও বাংলা রচনা করতে উৎসাহ দিয়ে, ইংরেজি ও সংস্কৃত বই পড়িয়ে, বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা থেকে শব্দরূপ মুখস্থ করিয়ে, আর বিজ্ঞানের (জ্যোতির্বিদ্যার) সূত্র মুখে মুখে ব'লে পিতা পুত্রকে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন। পাঠ্যতালিকার বাইরের এই বিদ্যা ও রচনা-শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের চিত্তবিকাশে খুব উপকার করেছিল। বিজ্ঞান-সত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বরাবর একটু টান ছিল। সে টানের সূত্রপাত না হলেও রজ্জুপাত এইখানেই। (সূত্রপাত হয়েছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রহস্য সন্দর্ভের প্রবন্ধ পড়ে।)

> পিতা আমাকে একেবারেই ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে উপক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ করিতে দিলেন।···একেবারে গোড়া হইতেই যথাসাধ্য সংস্কৃত রচনা কার্যে তিনি আমাকে উৎসাহিত করিতেন। আমি যাহা পড়িতাম তাহারই শব্দগুলা উলট পালট করিয়া লম্বা লম্বা সমাস গাঁথিয়া যেখানে সেখানে যথেচ্ছা অনুস্বার যোগ করিয়া দেবভাষাকে অপদেবের যোগ্য করিয়া তুলিতাম। কিন্তু পিতা আমার এই অদ্ভুত দুঃসাহসকে একদিনও উপহাস করেন নাই।

সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারে এমন উচ্ছৃঙ্খলতায় পিতার ভর্ৎসনা পান নি বলেই বুঝি রবীন্দ্রনাথের ভাষা-ব্যবহার নিছক বৈয়াকরণিক কুণ্ঠায় কখনো কুণ্ঠিত হয় নি।

> ইহা ছাড়া তিনি প্রক্টরের লিখিত সরল পাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন; আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।

বাংলা প্রবন্ধ লেখার বীজাঙ্কুর এই করেই দেখা দিয়েছিল।

পুত্রের দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের কিছুমাত্র অনবধান ছিল না। রাত্রির অন্ধকার দূর হবার আগেই বালককে শয্যাত্যাগ করতে হত। তার পর প্রাতর্ভ্রমণের পর বরফগলা ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হত। "ইহা হইতে কোনোমতেই অব্যাহতি ছিল না।" তার পর বড় এক বাটি দুধ খাওয়া। "দুধ খাওয়া আমার আর-এক তপস্যা ছিল।"

প্রথমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, তার পর আনন্দ। সেও উপেক্ষিত হয় নি।

যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসংগীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে— আমি বেহাগে গান গাহিতেছি— "তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে। কে সহায় ভব-অন্ধকারে"— তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুইহাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন— সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে কৃতিত্বের প্রথম স্বীকৃতি ও পুরস্কার যে পিতার কাছ থেকেই পাওয়া তা এই প্রসঙ্গে তিনি জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন। সে তেরো-চোদ্দ বছর পরেকার (১২৯৩ সালের) কথা। এইখানেই বলে রাখি।

একবার মাঘোৎসবে সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা গান— "নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।"

পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়ামে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সব-কটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, "দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে-কাজ করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ-শ টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের চারিত্র্য যে ভাবে রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রতিভাত হয়েছিল আর সে চারিত্র্য তাঁর মনের গঠনে আদর্শের দাগা বুলিয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন—

··মনের মধ্যে সকল জিনিস সুস্পষ্ট করিয়া দেখিয়া লওয়া তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল— তা হিসাবের অঙ্কই হোক বা প্রাকৃতিক দৃশ্যই হোক বা অনুষ্ঠানের আয়োজন হোক। শান্তিনিকেতনের নূতন মন্দির প্রভৃতি অনেক জিনিস তিনি চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু যে-কেহ শান্তিনিকেতন দেখিয়া তাঁহার কাছে গিয়াছে, প্রত্যেক লোকের কাছ হইতে বিবরণ শুনিয়া তিনি অপ্রত্যক্ষ জিনিসগুলিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আঁকিয়া না লইয়া ছাড়েন নাই। তাঁহার স্মরণশক্তি ও ধারণাশক্তি অসাধারণ ছিল। সেইজন্য একবার মনের মধ্যে যাহা গ্রহণ করিতেন তাহা কিছুতেই তাহার মন হইতে ভ্রষ্ট হইত না।

দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে হিমালয়যাত্রা প্রসঙ্গে শুধু কোনো এক বড়ো স্টেশনে[৫] টিকেট-কলেক্টরের আচরণ ও দেবেন্দ্রনাথের মৌন ক্রোধের উল্লেখমাত্র করেছেন।

তাঁহার জীবনের শেষ পর্যন্ত ইহা দেখিয়াছি, তিনি কোনোমতেই আমাদের স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে চাহিতেন না। তাঁহার রুচি ও মতের বিরুদ্ধ কাজ অনেক করিয়াছি— তিনি ইচ্ছা করিলেই শাসন করিয়া তাহা নিবারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু কখনো তাহা করেন নাই। যাহা কর্তব্য তাহা

৫ সম্ভবত দানাপুরে অথবা মোগলসরাইয়ে।

আমরা অন্তরের সঙ্গে করিব, এজন্য তিনি অপেক্ষা করিতেন। সত্যকে এবং শোভনকে আমরা বাহিরের দিক হইত লইব, ইহাতে তাঁহার মন তৃপ্তি পাইত না— তিনি জানিতেন, সত্যকে ভালোবাসিতে না পারিলে সত্যকে গ্রহণ করাই হয় না। তিনি ইহাও জানিতেন যে, সত্য হইতে দূরে গেলেও একদিন সত্যে ফেরা যায় কিন্তু কৃত্রিম শাসনে সত্যকে অগত্যা অথবা অন্ধভাবে মানিয়া লইলে সত্যের মধ্যে ফিরিবার পথ রুদ্ধ করা হয়।···যেমন করিয়া তিনি পাহাড়ে-পর্বতে আমাকে একলা বেড়াইতে দিয়াছেন, সত্যের পথেও তেমনি করিয়া চিরদিন তিনি আপন গম্যস্থান নির্ণয় করিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন। ভুল করিব বলিয়া তিনি ভয় পান নাই, কষ্ট পাইব বলিয়া তিনি উদ্‌বিগ্ন হন নাই। তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।

নৈবেদ্যের কোনো কোনো কবিতায় ও অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ যখন ঈশ্বরকে রাজা ও পিতা -রূপে দেখেছেন তখন তাঁর সেই দৃষ্টিতে তাঁর পিতৃদেবের প্রতিচ্ছবি যেন প্রতিফলিত। ব্রহ্ম-উপাসনার একটি প্রধান মন্ত্র— উপনিষদের "পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি"[৬]— রবীন্দ্রনাথ যেন নিজে পিতৃদেবের মূর্তিতে কিছু উপলব্ধি করেছিলেন।

সংসার পথে শত সংকট ঘুরিছে ঘূর্ণবায়ে,
তারি মাঝখানে অচলা শান্তি অমর তরুচ্ছায়ে।
নিন্দা ও ক্ষতি, মৃত্যু বিরহ,
কত বিষবাণ উড়ে অহরহ—
স্থির যোগাসনে চির-আনন্দ, তাহার নাহিকো নাশ।

দেবেন্দ্রনাথের পক্ষেও এ বর্ণনা বেশ খাটে।

সকল সংসার বন্ধে বন্ধন বিহীন
তোমার মহান্ মুক্তি থাক্ রাত্রিদিন।—

এ মুক্তির আদর্শ তো দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথদের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।—

এ পত্রগুলি নৈবেদ্যের উৎসর্গে[৭] থাকলেও কিছুমাত্র বেমানান হত না।

দেবেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনে উপনিষদের প্রভাবের কথা আসে। আমরা সবাই মনে করি (এবং সেই মতো অনর্গল বলি ও অক্লান্ত লিখি) যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আসলে উপনিষদের উৎস থেকে উৎসারিত। এই ধারণা এখন ভালো করে বিবেচনা করবার সময় এসেছে। উপনিষদের রস বলে যা আমরা রবীন্দ্ররচনায় আস্বাদন করি সে রসের স্বাদ উপনিষদের মন্ত্র কানে যাবার ও উপনিষদ্ পড়বার

---

৬ 'তুমি আমাদের (সত্যকার) পিতা বটে, তুমি আমাদের (মানবজন্মের) পিতার মত হও।'

৭ "এই কাব্যগ্রন্থ পরমপূজ্যপাদ পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে উৎসর্গ করিলাম।"

অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন। সে হল আনন্দরস, বেঁচে থাকার এবং চারি দিকের জড় ও জীবন, বস্তু ও অবস্তু দেখে শুনে ভেবে কল্পনা করে নির্হেতু ভালো লাগা।[৮] উপনিষদের মন্ত্র পাবার পর যখন তা বোঝবার সময় এসেছিল তখন রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন যে এ তো নতুন কথা নয়— তাঁরই মনের গোপন কথা—

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

অর্থাৎ— 'যা কিছু প্রকাশ পায় (সবই) তা আনন্দরূপ এবং অমৃত।'

এই যা-কিছু প্রকাশ হচ্ছে তা প্রাণেরই প্রকাশ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অনুভবে আনন্দরূপমমৃতং হচ্ছে অনবচ্ছিন্ন প্রাণরস।

রামমোহন রায় উপনিষদের অনুবাদ করেছিলেন এবং বাংলাদেশে শিক্ষিত মনস্বীদের কাছে উপনিষদকে পরিচিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের মত। শঙ্করাচার্যের কাছে যেমন রামমোহনের কাছেও তেমনি উপনিষদ বেদান্তসূত্রের যেন তুলা যুগিয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের ব্রহ্মউপাসনা স্বীকার করেছিলেন কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তকে পুরাপুরি মেনে নেন নি। রামমোহন উপনিষদকেই মূল বলে আশ্রয় করেছিলেন।[৯] রামমোহনের ব্রহ্ম প্রধানত সৎ ও চিৎ, আনন্দের প্রকাশ রামমোহনের ব্রহ্মজ্ঞানে খুব পরিস্ফুট নয়। ব্রহ্মের আলোচনায় তিনি আনন্দভাতির কথা তোলেনই নি। রামমোহনের সুফীশাস্ত্র পড়া ছিল, সম্ভবত সুফীতত্ত্বও ভালো করে জানা ছিল। তাঁর শিক্ষা ও জ্ঞান তাঁর অধ্যাত্মভাবনায় আনন্দের রঙ ফোটাতে পারে নি। রামমোহন, গীতার উক্তি অনুসারে, বুদ্ধিতেই শরণ ইচ্ছে করেছিলেন, অনুভবে নয়। দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মভাবনায় উপনিষদের সত্য ও আনন্দবোধের সঙ্গে সুফী-প্রেমবোধ বিজড়িত ছিল, তবে বৈষ্ণব-প্রেমভাবনার স্পর্শ ছিল না। তাই দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তায় ও অধ্যাত্মপ্রচেষ্টায় ইমোশনের প্রকাশ ছিল নিরুদ্ধ এবং আনন্দের অনুভব ছিল শুধু সৌন্দর্যবোধেই অবরুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি দেবেন্দ্রনাথের মত অতটা গভীরভাবে আত্মমুখী ও ধ্যানতন্ময় নয় তবে সে দৃষ্টি আত্ম-অনাত্মকে এক করে নিয়ে জীবনকে অনাদি-অনন্ত এবং অবিচ্ছিন্ন অনুভব ক'রে বুদ্ধিবিস্তার ও দেশকালের সীমানা অতিক্রান্ত হয়েছে। সে দৃষ্টিতে প্রেমের যে রঙ লাগা তা সুফীর নয় বৈষ্ণবের। দেবেন্দ্রনাথের অন্তরেও ভক্তি ছিল— সে ভক্তি শান্ত ও দাস্য রসের— বড় জোর সখ্য রসের। রবীন্দ্রনাথের অন্তর ভক্তিময়— সে ভক্তি বিশ্বব্যাপী মধুর রসের।

দেবেন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে দিলে দুজনের চারিত্র্যপ্রভাব বালক রবীন্দ্রনাথের উপর সমধিক কার্যকর হয়েছিল। একজন তাঁর প্রথম সাহিত্যগুরু বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, আর একজন তাঁর সংগীতরসগুরু, পিতৃবন্ধু শ্রীকণ্ঠ সিংহ। দুজনেই আনন্দরসিক ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর, দুজনেই অত্যন্ত সরলহৃদয় ও করুণচিত্ত।

---

৮ রবীন্দ্রনাথের অনেক গানেই এই ভালো লাগার স্বীকৃতি আছে,— "লাগল ভালো, মন ভুলাল,— এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই।"

৯ রামমোহনের বেশ বৈষ্ণব বিদ্বেষ ছিল। অথচ তাঁর পিতৃবংশ বৈষ্ণব, তাঁদের গৃহদেবতা রাধাকৃষ্ণ। মাতৃবংশ ঘোর তান্ত্রিক। রামমোহনের আকর্ষণ ছিল তন্ত্রের দিকে। সেইজন্যে তিনি তন্ত্রকে বেদান্ত মতে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন। সে চেষ্টার ফলেই বোধ করি মহানির্বাণ তন্ত্রের উৎপত্তি। বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে যে পৌত্তলিকতা ছিল তার বিরুদ্ধে রামমোহনের আপত্তি আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু চৈতন্যের প্রতি তাঁর বিরাগের হেতু বোঝা যায় না। সম্ভবতঃ ভাগবত ছাড়া আর কোনো ভক্তিগ্রন্থ তাঁর পড়া ছিল না। রামমোহনের বৈষ্ণববিদ্বেষ কিছুপরিমাণে জাতিবিরোধের অপরোক্ষ ফল হতে পারে।

দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ তুই পুত্র কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং তুই পুত্রেরই কবিত্বশক্তি অপর্যাপ্ত ও প্রাণপ্রচুর। মেঘদূতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে আকর্ষণ সে একদিন তাঁর বাল্যকালে বড়দাদার মুখে আবৃত্তি শুনেই প্রথম অনুভূত হয়েছিল। বড়দাদার কবিতার ভোজে রবীন্দ্রনাথ যখন যোগ দিয়েছিলেন তখন তাঁর বয়স নিতান্ত কাঁচা। তবুও তাতে তাঁর যে উপকার হয়েছিল সে তাঁর নিজের কথাতেই বলি।

> বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এইজন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন।...
>
> তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল-আবডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছড়ি যাইত যে, আমাদের মতো প্রসাদ আমরাও পাইতাম।...স্বপ্নপ্রয়াণের সব কি আমরা বুঝিতাম। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি লাভ করিবার জন্য পুরাপুরি বুঝিবার প্রয়োজন করে না। সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কিনা জানি না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম— তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিচ্ছায়া রবীন্দ্র-রচনায়, গদ্যে ও পদ্যে আছে। বিশেষভাবে আছে ছড়া কবিতায় ও চিঠি লেখায়।

এই প্রসঙ্গে দাদাদের সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের একটা মোটামুটি মন্তব্য করা যেতে পারে।

বড়দাদার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভক্তি প্রায় পিতৃতুল্য ছিল। শেষকালেও তিনি বড়দাদাকে "শ্রীচরণেষু" বলে চিঠি আরম্ভ করতেন এবং সেইভাবে প্রণাম জানিয়ে চিঠি শেষ করতেন। বড়দাদা ও মেজদাদার মধ্যে বয়সের পার্থক্য তুবছরের বেশি নয়। কিন্তু মেজদাদাকে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা সখার মত অন্তরঙ্গভাবে দেখতেন। তাই মাঝবয়সের চিঠিতে তাঁকে সম্বোধন করতেন "ভাই মেজদাদা"। রবীন্দ্রনাথের কৈশোর শিক্ষায় যে মোটা অংশটা স্বেচ্ছাগৃহীত তার মধ্যে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের হাত খানিকটা ছিল। কর্মসূত্রে সত্যেন্দ্রনাথ গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন সহরে যখন যেখানে থাকতেন রবীন্দ্রনাথ সেখানে কিছুকাল কাটিয়ে আসতেন। সত্যেন্দ্রনাথই রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করে বিলাতে নিয়ে যান আর পরের বারে বিলাত-গমনেও সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ, তাঁর পত্নী ও শিশুপুত্র-কন্যার সাহচর্য রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে মনের গড়নে ও সাহিত্যের দৃষ্টিতে কার্যকর হয়েছিল। এ সব কথা পরে বলছি।

মোট কথা মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ছিল বিমিশ্র— ভক্তিশ্রদ্ধার সঙ্গে সৌহার্দ্য।

ভাইদের মধ্যে সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ বোধকরি সব চেয়ে অ-কবিমন ও প্র্যাক্‌টিক্যাল ছিলেন। ইনি বাড়ির ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষার যে সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা করেছিলেন তার সুফলের স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে আছে। ন (অর্থাৎ চতুর্থ) দাদা বীরেন্দ্রনাথ যৌবনকালেই অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোথাও কিছু বলেন নি।

দাদাদের মধ্যে নতুন (অর্থাৎ পঞ্চম) দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সে ঘনিষ্ঠতা ছিল সব চেয়ে বেশি। তুভাই পরস্পরকে যে দৃষ্টিতে দেখতেন তার মধ্যে তুতরফেই ছিল প্রীতি ও সৌহার্দ্য। তুভাইয়েরই সাহিত্য ও সংগীতচর্চা প্রথম থেকে আর নাট্যচর্চা পরের দিকে, কিছুকাল ধরে সহযোগিতায় ও সমবায়ে চলেছিল। সে কথা জীবনস্মৃতিতে ভালো করে বলা আছে।

ছোটদাদা সোমেন্দ্রনাথ (যাঁকে তিনি জীবনস্মৃতিতে "দাদা" বলে উল্লেখ করেছেন—) তিনি রবীন্দ্রনাথের

চেয়ে দুবছরের বড় ছিলেন। দুভাই ছেলেবেলায় এক সঙ্গে মানুষ হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সোমেন্দ্রনাথের সমবয়সী ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলিও ছিলেন। জীবনস্মৃতিতে এই তিন শৈশব ও বাল্যসঙ্গীর কথা আছে। কোন কোন গল্পের ভূমিকায়ও আভাস ইঙ্গিত আছে। ছোট ভাইয়ের কবিত্বগৌরবে সোমেন্দ্রনাথ বাল্যকালেই গৌরববোধ করতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচিত কাব্য বনফুল তিনিই প্রকাশ করেছিলেন। (বনফুল প্রকাশের কিছু আগে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্য কবিকাহিনী গ্রন্থাকারে বার হয়েছিল। প্রকাশক প্রবোধচন্দ্র ঘোষ সোমেন্দ্রনাথের বন্ধুবর্গের একজন ছিলেন। মনে হয় কবিকাহিনী প্রকাশেরও আসল উদ্যোক্তা সোমেন্দ্রনাথ।) প্রথম যৌবনেই শিরোরোগে পড়ায় সোমেন্দ্রনাথ আত্মীয়স্বজনের অন্তরঙ্গতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। সোমেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অল্প তবে যথোচিত কথা বলেছেন। তাতে দাদার প্রতি তাঁর গভীর প্রীতি ধ্বনিত।

দিদিদের মধ্যে শুধু দুজনের সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা জানা যায়। বড়দিদি সৌদামিনী ছিলেন "তিন সঙ্গী"র অন্যতম সত্যপ্রসাদের মা। মাতার মৃত্যুর পূর্বেও সৌদামিনী দেবীই পিতার বাড়িতে থাকলে তাঁর পরিচর্যার ভার বহন করতেন। মাতার মৃত্যুর পরে তিনি সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথকে ও ছোট বোনদের তত্ত্বাবধান করতেন। এঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভক্তিপ্রীতির পরিচয় বউঠাকুরানীর হাটের উৎসর্গে পাওয়া যায়। সৌদামিনী দেবীর স্বামী সারদাপ্রসাদ জামাতাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের সব চেয়ে প্রীতি ও বিশ্বাস-ভাজন ছিলেন। এঁরই উপর দেবেন্দ্রনাথের জমিদারিতদারকের ভার ছিল। (রবীন্দ্রনাথের বিবাহদিনে সারদাপ্রসাদের মৃত্যু হয়। তখন জমিদারির ভার প্রথমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর তার পর রবীন্দ্রনাথের উপর পরে।) রবীন্দ্রনাথের প্রথম যাকে বলা যায় officially প্রকাশিত বই সেই 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' প্রকাশ করেছিলেন সারদাপ্রসাদ, সম্ভবত এস্টেটের জেনারেল ম্যানেজার রূপে।

ন-দিদি স্বর্ণকুমারী ভারতীর আসরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সাহিত্যসঙ্গী ছিলেন। এঁর সাহিত্য কৃতিত্ব সকলেরই জানা।

সোনার-তরীতে যে 'গানভঙ্গ' কবিতাটি আছে তাতে "বুড়া রাজা প্রতাপ রায়" দ্বিজেন্দ্রনাথের এবং গায়ক "বুড়া বরজলাল" শ্রীকণ্ঠ সিংহের মডেলে আঁকা। (কবিতার বিষয় স্বপ্নে পাওয়া—জুলাই ১৮৯২—এবং স্বপ্নেও দ্বিজেন্দ্রনাথের ভূমিকা অনুরূপ।)

শ্রীকণ্ঠ সিংহ তাঁর আনন্দ পরিবেশের মধ্যে এলে রবীন্দ্রনাথকে আত্মসাৎ করেছিলেন বললে অন্যায় হয় না। এই আত্মসাৎ করা মানে আনন্দের অভিষেক। বালকের কবিতা শুনে গান শুনে শ্রীকণ্ঠবাবু বিস্ময়ে ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের চারিত্র্যে একটি প্রধান প্রবণতা হ'ল জীবনকে ভালোমন্দ সবশুদ্ধ নিয়ে ভালোবাসা। সে ভালোবাসায় তৃপ্তির প্রশ্ন নেই, পর্যাপ্ততার সীমা নেই, শান্তির অগাধতা আছে, প্রণতির আত্মোসংকোচন আছে। এ ভালোবাসার শিক্ষা শ্রীকণ্ঠবাবুর কাছে পাওয়া। "ভালো লাগিবার শক্তি ইঁহার এতই অসাধারণ যে মাসিকপত্রের সংক্ষিপ্ত-সমালোচক পদলাভের ইনি একেবারেই অযোগ্য।" "পরিচয় থাক আর নাই থাক, স্বাভাবিক হৃদ্যতার জোরে মানুষমাত্রেরই প্রতি তাঁহার এমন একটি অবাধ অধিকার ছিল যে, কেহই সেটি অস্বীকার করিতে পারিত না।" এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকণ্ঠবাবুর চরিত্রের একেবারেই মিল নেই। (রবীন্দ্রনাথ কখনোই উপযাচক হয়ে কারো সঙ্গে মিশতে পারতেন না।) সে কারণেও রবীন্দ্রনাথ শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রতি আরো বেশি ক'রে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

কেহ দুঃখ পায়, ইহা তিনি সহিতে পারিতেন না। —ইহার কাহিনীও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল।···

এই বৃদ্ধটি যেমন আমার পিতার, তেমনি দাদাদের, তেমনি আমাদেরও বন্ধু ছিলেন। আমাদের সকলেরই সঙ্গে তাঁহার বয়স মিলিত।···ঝরনার ধারা যেমন একটুকরা নুড়ি পাইলেও তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিয়া মাত করিয়া দেয়, তিনিও তেমনি যে-কোনো একটা উপলক্ষ্য পাইলেই আপন উল্লাসে উদ্বেল হইয়া উঠিতেন।

রবীন্দ্রনাথের পরিচিত যে ব্যক্তিটি তাঁর সাহিত্যে সব চেয়ে বেশিবার আর সবচেয়ে গাঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সে হল শ্রীকণ্ঠবাবু। বউঠাকুরানীর-হাটের বসন্ত রায়, চিরকুমার সভার রসিকদাদা, শারদোৎসবের সন্ন্যাসী— এইসব ভূমিকায় সাজ বদল ক'রে শ্রীকণ্ঠবাবুই উঁকি দিচ্ছেন।

এইবার ইস্কুলের কথায় আসা যাক। অত্যন্ত অল্প বয়সে— ছয় কিংবা সাতবছর বয়সে— রবীন্দ্রনাথ দাদাদের ইস্কুল যাওয়া দেখে জেদ করেই ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম থেকেই ইস্কুল তাঁর ভালো লাগে নি। ক্লাসে বন্দী হয়ে থাকাটাই যে শিশুর একমাত্র কষ্টের বিষয় ছিল তা নয়। নিজের বাড়িতে বন্দী হয়ে থাকায় তো অভ্যাস ছিল। আসলে কষ্ট ছিল মন চালনায় স্বাধীনতা না থাকায়। মন দিতে হত বইয়ের পাতায় অথবা বোর্ডের আঁকায় কিংবা মাস্টারের কথায়। ইস্কুলে সহপাঠী ছেলেদের ব্যবহারও মোটেই ভালো লাগে নি। অনেক মাস্টারের ব্যবহারও খুব খারাপ লেগেছিল। অত্যন্ত সুন্দর চেহারা, অতি ভালো মানুষ লাজুক কাঁচা বয়স বিশেষ অভিজাত ঘরের ছেলে, বাইরের ছেলের সঙ্গে মেশার যার কোনো কালে অভ্যাস নেই এমন কোনো ছেলেকে সহপাঠী পেলে সাধারণ ছেলের দল কৌতূহলী হয়ে বিরূপ আচরণে বিরক্ত করবেই। কিন্তু কোনো কোনো শিক্ষকও যে অভদ্র, নীচ ও নিষ্ঠুর আচরণ করেছিলেন তার তো কোনোই সমর্থন নেই।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ভর্তি হয়েছিলেন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে। সেখানে এক সেসনের বেশি ছিলেন না। তার পর যান নর্মাল স্কুলে। সেখানে গোড়ার দিকেই এক শিক্ষক এমন অপ্রত্যাশিত হৃদয়হীন ব্যবহার করেছিল যার ফলে এক শ্রেণীর ইস্কুল-শিক্ষকের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মন চিরকালের জন্য বিরূপ হয়েছিল।[১০] এই কাহিনী তাঁর প্রথমদিকের একটি ছোট গল্পে লিপিবদ্ধ আছে। সে গল্পের নাম 'গিন্নি'। এই শিক্ষকের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিৎ ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সংবৎসর তাঁহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম।

১০ "পথিকদের মধ্যে সব চেয়ে যাহাকে পাষণ্ড বলিয়া মনে হইয়াছে, এমনকি যাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় মনে করিয়াছি যে, এইমাত্র সে কোনো একটা উৎকট দুষ্কার্য সাধন করিয়া আসিয়াছে, সন্ধান করিয়া জানিয়াছি সে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত এখনি অধ্যাপনাকার্য সমাধা করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। এইসকল লোকেরাই অন্য কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করিলে বিখ্যাত চোর ডাকাত হইয়া উঠিতে পারিত, কেবলমাত্র যথোচিত জীবনীশক্তি এবং যথেষ্ট পরিমাণ পৌরুষের অভাবেই আমাদের দেশে ইহারা কেবল পণ্ডিতী করিয়া বৃদ্ধবয়সে পেন্সন লইয়া মরে— বহু চেষ্টা ও সন্ধানের পর এই দ্বিতীয় পণ্ডিতটার নিরীহতার প্রতি আমার যেরূপ সুগভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল কোনো অতি ক্ষুদ্র ঘটিবাটি চোরের প্রতি তেমন হয় নাই।" (ডিটেক্‌টিভ্)

"শিক্ষাদান ব্যাপারের মধ্যে যে সমস্ত অবিচার, অধৈর্য, ক্রোধ পক্ষপাতপরায়ণতা ছিল" তা ইস্কুলে যাবার অল্পকালের মধ্যেই বালক রবীন্দ্রনাথ বুঝে নিয়েছিলেন।

কিন্তু ইস্কুলে তিনি এমন শিক্ষকও পেয়েছিলেন যাঁরা বালক রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করেছিলেন।

এঁদের কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনে কখনো ভোলেন নি। তবে এঁরা অধিকাংশই তাঁর ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন না, কেউ বা ইস্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, কেউ বা মাঝে মাঝে ক্লাস নিতেন, কেউ বা দৈবাৎ দুই-একদিন অন্য শিক্ষকের একটিনি করেছিলেন। এমন দুজন শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রথম পাব্‌লিক পৃষ্ঠপোষক বলে স্মরণীয়। একজন হলেন সাতকড়ি দত্ত। রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখেন জানতে পেরে তিনি উৎসাহ দেবার জন্যে দু-এক ছত্র কবিতা দিয়ে তা বাড়িয়ে পূর্ণ কবিতা করে আনতে বলতেন। এমনি কবিতা পূরণের একটি জীবনস্মৃতি রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের স্মরণে ছিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন নর্মাল ইস্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গোবিন্দবাবু, "ঘনকৃষ্ণবর্ণ বেঁটেখাটো মোটা-সোটা মানুষ"। ছেলেরা তাঁকে ভয় করত। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথকে ফরমাস করে নীতি-কবিতা লেখাতেন।

যাঁর কাছে নিয়মিত শিক্ষা পান নি, অথবা কবিতা লেখার ফরমাস কিংবা কবিতা লেখার জন্য প্রশংসাও পান নি এমন এক শিক্ষকের কদাচিৎ সান্নিধ্যটুকু বালক রবীন্দ্রনাথের চিত্ত গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। তখন তিনি সেণ্ট জেভিয়ার্সে পড়েন।

> সেণ্ট জেভিয়ার্সের একটি পবিত্র স্মৃতি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে অম্লান হইয়া রহিয়াছে—তাহা সেখানকার অধ্যাপকদের স্মৃতি।...কিন্তু তবু সেণ্ট জেভিয়ার্সের সমস্ত অধ্যাপকদের জীবনের আদর্শকে উচ্চ করিয়া ধরিয়া মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছে, এমন একটি স্মৃতি আমার আছে। ফাদার ডি. পেনেরাণ্ডার সহিত আমাদের যোগ তেমন বেশি ছিল না;—বোধ করি কিছুদিন তিনি আমাদের নিয়মিত শিক্ষকের বদলিরূপে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে স্পেনীয় ছিলেন। ইংরেজি উচ্চারণে তাঁহার যথেষ্ট বাধা ছিল। বোধ করি সেই কারণে তাঁহার ক্লাসের শিক্ষায় ছাত্রগণ যথেষ্ট মনোযোগ করিত না। আমার বোধ হইত, ছাত্রদের সেই ঔদাসীন্যের ব্যাঘাত তিনি মনের মধ্যে অনুভব করিতেন কিন্তু নম্রভাবে প্রতিদিন তাহা সহ্য করিয়া লইতেন। আমি জানি না কেন, তাঁহার জন্য আমার মনের মধ্যে একটা বেদনা বোধ হইত। তাঁহার মুখশ্রী সুন্দর ছিল না, কিন্তু আমার কাছে তাহার কেমন একটি আকর্ষণ ছিল। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, তিনি সর্বদাই আপনার মধ্যে যেন একটি দেবোপাসনা বহন করিতেছেন—অন্তরের বৃহৎ এবং নিবিড় স্তব্ধতায় তাঁহাকে যেন আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আধঘণ্টা আমাদের কাপি লিখিবার সময় ছিল—আমি তখন কলম হাতে লইয়া অন্যমনস্ক হইয়া যাহা তাহা ভাবিতাম। একদিন ফাদার ডি. পেনেরাণ্ডা এই ক্লাসের অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যেক বেঞ্চির পিছনে পদচারণা করিয়া যাইতেছিলেন। বোধ করি তিনি দুই-তিনবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আমার কলম সরিতেছে না। এক সময়ে আমার পিছনে থামিয়া দাঁড়াইয়া নত হইয়া আমার পিঠে তিনি হাত রাখিলেন এবং অত্যন্ত সস্নেহস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ট্যাগোর, তোমার কি শরীর ভালো নাই।"—বিশেষ কিছুই নহে কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহার

সেই প্রশ্নটি ভুলি নাই। অন্য ছাত্রদের কথা বলিতে পারি না কিন্তু আমি তাঁহার ভিতরকার একটি বৃহৎ মনকে দেখিতে পাইতাম— আজও তাহা স্মরণ করিলে আমি যেন নিভৃত নিস্তব্ধ দেবমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই।

গৃহশিক্ষকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে উপকৃত তা জীবনস্মৃতিতে ভালো ক'রে বলা আছে, তার বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন। কেবল একজনের সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। তিনি রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য, বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের হেড পণ্ডিত এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের বন্ধুস্থানীয়। রামসর্বস্ব পণ্ডিতের উদ্যোগেই রবীন্দ্রনাথের গদ্য পদ্য রচনা প্রথম সাহিত্যপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[১১] ইনি রবীন্দ্রনাথকে সংস্কৃতও পড়িয়েছিলেন।

আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের বাইরে দু ব্যক্তিকে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন। এ দুজন হচ্ছেন সে সময়ের দুই প্রধান মনীষী—বিদ্যাসাগর ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। দুজনেই প্রচণ্ড পণ্ডিত ও অদম্য কর্মী। রবীন্দ্রনাথের বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা গোড়াথেকেই বিদ্যাসাগরের বই প'ড়ে—বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, আখ্যান মঞ্জরী, সীতার বনবাস, শকুন্তলা, উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠ। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধা সঞ্চার হওয়ার তো কথা নয়, বিশেষ করে অল্পবয়সীর। বিদ্যাসাগরের বইয়ে মুখপত্রে তাঁর যে প্রতিকৃতি ছাপা থাকত (এবং এখনও থাকে) তাও তো মনোহারী নয়। রবীন্দ্রনাথদের সংসারে ও ও সমাজে বিদ্যাসাগরের আসাযাওয়া ছিল না। (বিদ্যাসাগর একবছর মাত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু সে রবীন্দ্রনাথ জন্মাবার অনেক আগে।) সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মনে বিদ্যাসাগরের প্রতি যে শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হয়েছিল তা ব্যক্তি সংস্পর্শ বিহীন, তা হল তাঁর গুণের জন্য, তাঁর চারিত্র্য দৃঢ়তার জন্য শ্রদ্ধা। তখনও বিদ্যাসাগরের কোনো জীবনীগ্রন্থ বার হয় নি, তাঁর "স্বরচিত জীবনচরিত" তো নয়ই। কিন্তু তাঁর জীবনের অনেক বৃত্তান্ত, তাঁর অনেক আচরণের কাহিনী দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে শোনার সূত্রেই যে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হয়েছিল তা মনে হয় না। আরও অনেক কারণ ছিল। প্রথমত রবীন্দ্রনাথের পরিবারের জ্যেষ্ঠরা সকলেই বিদ্যাসাগরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধালু ছিলেন, বালক রবীন্দ্রনাথ এই শ্রদ্ধার সৌরভে মানুষ হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কিশোর বয়সের সংস্কৃত অধ্যাপক এবং তাঁর রচনার প্রথম প্রকাশক (মাসিক পত্রিকায়) রামসর্বস্ব ভট্টাচার্যের কাছে বিদ্যসাগরের মহৎ চারিত্রের ও মহৎ হৃদয়ের অনেক কথা শুনে থাকবেন। বিদ্যাসাগরের বিদ্যালয়ের (মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশনের) প্রধান পণ্ডিত ছিলেন ইনি, বিদ্যাসাগরের পরিচিত ব্যক্তি।[১২] ইনিই বালক রবীন্দ্রনাথকে প্রথম বিদ্যাসাগর-দর্শনে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> রামসর্বস্ব পণ্ডিতমহাশয়ের প্রতি আমাদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার ছিল। অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় ভঙ্গ দিয়া তিনি আমাকে অর্থ করিয়া করিয়া শকুন্তলা পড়াইতেন। তিনি একদিন আমার ম্যাকবেথের তর্জমা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শুনাইতে হইবে বলিয়া আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন।··· পুস্তকে-ভরা তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিতে আমার বুক দুরুদুরু

---

১১ ইনি 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার সম্পাদক হলে পরেই রবীন্দ্রনাথের রচনা সে পত্রিকায় বেরিয়েছিল।

১২ এই বিদ্যালয়ের আরও কোনো কোনো শিক্ষক কখনো না কখনো রবীন্দ্রনাথদের গৃহশিক্ষকতা করেছিলেন। যেমন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্রজবাবু (? ব্রজনাথ দে) তখনকার দিনে গভর্নমেণ্ট স্কুল-কলেজের বাইরে ভালো শিক্ষক বিদ্যাসাগরের বিদ্যালয়েই মিলত।

করিতেছিল ; তাঁহার মুখচ্ছবি দেখিয়া যে আমার সাহসবৃদ্ধি হইল তাহা বলিতে পারি না। ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই ; অতএব এখান হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল ছিল। বোধ করি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম।

অনেককাল পরে যখন দ্বিতীয়বার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ নিয়ে ফেরেন নি, সত্য শিক্ষা নিয়ে ফিরেছিলেন। তবে সে সত্যশিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করতে দেরি হয়েছিল। সে ব্যাপার হ'ল সাহিত্যের সভা স্থাপন নিয়ে (১৮৮২)।

···বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।···যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সভায় আহ্বান করিবার জন্য গেলাম. তখন সভার উদ্দেশ্য ও সভ্যদের নাম শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমি পরামর্শ দিতেছি, আমাদের মতো লোককে পরিত্যাগ করো— হোমরাচোমরাদের লইয়া কোন কাজ হইবে না, কাহারও সঙ্গে কাহারও মতে মিলিবে না।" এই বলিয়া তিনি এ সভায় যোগ দিতে রাজি হইলেন না।···

বিদ্যাসাগরের কথা ফলিল— হোমরাচোমরাদের একত্র করিয়া কোনো কাজে লাগানো সম্ভবপর হইল না। সভা একটুখানি অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইয়া গেল।

বিদ্যাসাগর-চারিত্র্যের দৃঢ়তা রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। এমন কোমল কঠিন মানুষ তিনি এ দেশের মাটিতে আর দ্বিতীয়টি জন্মাতে দেখেন নি। বিদ্যাসাগর মানুষটির যে মূল্য আমরা এখন দিই তা আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি আধুনিক কালের দুটি বাঙালীকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে গেছেন। একজন তাঁর অদেখা— রামমোহন রায়। আর একজন তাঁর দেখা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর যেমন পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচর্চার গুরু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র তেমনি অ-পাঠ্য গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তাঁর মনশ্চর্যার গুরু।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্থ-সংগ্রহ বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিক পত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধানো একভাগ সেজদাদার আলমারি মধ্যে ছিল। সেটা আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বার বার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া···তিমিমৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।

সাহিত্যের সভায় যোগ দেবার আমন্ত্রণ নিয়ে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়েছিলেন এবং সেই প্রথম পরিচয়েই এই বিখ্যাত পণ্ডিত ও দুর্ধর্ষ বাগ্মীর ব্যবহারে ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

···রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম।

এ পর্যন্ত বাংলাদেশের অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারও নহে।

পরিচয়ের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই রাজেন্দ্রলালের কাছে যখন তখন যেতেন—

> আমি সকালে যাইতাম— দেখিতাম, তিনি লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত আছেন। অল্পবয়সের অবিবেচনাবশতই অসংকোচে আমি তাঁহার কাজের ব্যাঘাত করিতাম। কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে মুহূর্তকালও অপ্রসন্ন দেখি নাই। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি কাজ রাখিয়া দিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিতেন। সকলেই জানেন তিনি কানে কম শুনিতেন। এইজন্য পারতপক্ষে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিতেন না। কোনো একটা বড়ো প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি নিজেই কথা কহিয়া যাইতেন। তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিবার জন্যই আমি তাঁহার কাছে যাইতাম। আর কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপে এত নূতন নূতন বিষয়ে এত বেশি করিয়া ভাবিবার জিনিস পাই নাই। আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলাপ শুনিতাম। বোধ করি তখনকার কালের পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচন সমিতির তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। তাঁহার কাছে যে সব বই পাঠানো হইত তিনি সেগুলি পেনসিলের দাগ দিয়া নোট করিয়া পড়িতেন। এক-একদিন সেইরূপ কোনো একটা বই উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বাংলা ভাষারীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা কহিতেন, তাহাতে আমি বিস্তর উপকার পাইতাম।

বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্বের আলোচনার পথপ্রদর্শক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল। তিনি রবীন্দ্রনাথেরও ভাষাতত্ত্বজ্ঞানের গুরু।

প্রাচীন ভারতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে সজাগ কৌতূহল ছিল তা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্পর্শে এসেই ভালো ক'রে জেগেছিল। রাজেন্দ্রলাল আমাদের দেশে বৌদ্ধবিদ্যার পথপ্রদর্শক। ইনি প্রত্নবিদ্যায়ও বাংলাদেশের এবং ভারতবর্ষের মহাগুরু। বৌদ্ধসাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের প্রকৃত শিষ্য বলিতে কেউ যদি থাকে তো রবীন্দ্রনাথ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত রাজেন্দ্রলাল-শিষ্য বৌদ্ধ শাস্ত্র নিয়ে ভালো গবেষণা করেছেন জানি। কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থে যে সাহিত্যরস আছে তার নিষ্কর্ষ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ করতে পারেন নি, কি এদেশে কি বিদেশে। সুতরাং 'রাজা', 'অচলায়তন' ও 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'র জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার কিঞ্চিৎ অংশ রাজেন্দ্রলাল মিত্রেরও প্রাপ্য।

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ যাঁদের সাহিত্যের সঙ্গী বলে উল্লেখ ও ইঙ্গিত করেছেন তাঁদের দ্বারাও রবীন্দ্রনাথের মানস-গঠনে যথেষ্ট সহায়তা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর পত্নী সর্বাগ্রে গণনীয়। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে সাহিত্য-আসর পেতেছিলেন সে আসরে প্রবেশের অধিকার পাবার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের লেখকজীবনের সত্যকার যাত্রারম্ভ। গান রচনা, সুর তৈয়ারি, নাটক বিচার ইত্যাদি বিবিধ ব্যাপারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্য অকুণ্ঠভাবে নিতেন এবং তাঁর সঙ্গে সমবয়সীর মতোই ব্যবহার করতেন। রবীন্দ্রনাথের career যে আর-পাঁচজনের ভদ্র বাঙালী ছেলের মত ইস্কুল-কলেজের বেড়া ডিঙিয়ে পাস-ফেলের তুফান কাটিয়ে চাকুরিতে অথবা আইন-ব্যবসায়ে এসে উত্তীর্ণ হয় নি তার জন্যে আমাদের কৃতজ্ঞতার ভাগ অনেক অংশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রাপ্য।

রবীন্দ্রনাথ ও আশ্রম-শিক্ষা

হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, এ কথা সকলেই জানেন। সেই সময়ে আশ্রমের আদর্শ ও শিক্ষার বিষয়ে যে-সকল আপত্তি উঠেছিল বা উঠতে পারত— রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নানাস্থানে তার উল্লেখ করে যথাবিহিত উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী-কালেও রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-সমালোচকগণ এই জাতীয় আপত্তির আলোচনা করেছেন। তাই থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আশ্রম-শিক্ষার বিরোধী মতবাদ স্পষ্ট ও অস্পষ্টভাবে বরাবরই বর্তমান ছিল। আধুনিককালে এই মতবাদ নানাক্ষেত্রে আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, প্রশ্ন উঠেছে এই আশ্রমের শিক্ষা ও আদর্শ বর্তমানকালের উপযোগী কি না। ১৯৫৫ সালে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবের উপলক্ষে সর্দার পাণিক্করের অভিভাষণে এই মৌলিক প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছিল, এবং প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বভারতীর সমালোচনা না ঘটে থাকলেও পরোক্ষভাবে তার কয়েকটি চিরাচরিত মূল আদর্শের প্রতিবাদ করা হয়েছিল। সমসাময়িক কাগজে-পত্রে এই সূত্রে কিছু বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে এমনও যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আশ্রমের আদর্শকে বহুকাল ত্যাগ করেছিলেন এবং তদনুসারে আদর্শ ও কার্যকলাপে শান্তিনিকেতনের প্রাচীন রূপের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আশ্রমের আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে সত্যই পরিত্যাগ করেছিলেন কি না, এই আদর্শ তাঁকে কেন আকৃষ্ট করেছিল এবং তার সমর্থনে তিনি কী যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, এবং বর্তমান কালের ও আধুনিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এই আদর্শ ও যুক্তিগুলির মূল্য কী— এই প্রশ্নগুলিই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

এই প্রশ্নগুলির পুনর্বিচারের নানা দিক থেকে প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শনের কয়েকটি মূল আদর্শের সত্যাসত্য নিরূপণ ও মূল্যায়ন এর উপর নির্ভর করছে। সেই সূত্রে শান্তিনিকেতনের ও বিশ্বভারতীর স্বরূপ ও সার্থকতার দিঙ্‌নির্ণয় সম্ভব হবে। পরিশেষে, এই প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্বের কয়েকটি প্রয়োজনীয় সমস্যার সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, যার মূল্য কেবল ভারতের সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ নয়।

২

প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে আদিম সূচনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-আশ্রমকে বৈদিককালের তপোবনের হুবহু অনুকরণে পরিণত করার বিরোধী ছিলেন ; এবং এ বিষয়ে নানাস্থানে নিজের মত প্রকাশ করেছিলেন : "ঠিক সেদিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সেও একটা নকল হইবে মাত্র।" —'শিক্ষাসমস্যা'। তাই প্রাচীন তপোবনের মূল আদর্শগুলির বর্তমানকালের পটভূমিকায় অবতারণা করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। "প্রাচীনের নকল হবে না, অনেক বৈসাদৃশ্য থাকবে, এমনকি অনেক কিছু উল্টোও থাকবে— কিন্তু মূল আদর্শটি অক্ষুণ্ণ থাকবে।" —'প্রাক্তনী', পৃ. ১৩। এই কথাই অন্যত্র আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন : "the spirit of the tapovana in the purity of its original shape would be a fantastic anachronism in the present age. Therefore, in order to be real, it

must find its reincarnation under modern conditions of life and be the same in truth, not merely identical in fact." —*A Poet's School.*

কিন্তু সেই সঙ্গেই সমান প্রত্যয়ের সহিত তিনি বলেছিলেন যে প্রাচীন তপোবনের আদর্শের অনেকখানিই বর্তমান কালেও প্রযোজ্য, কারণ তার মধ্যে সর্বজনীন ও সর্বকালীন সত্যের উপাদান আছে। "তপোবনের যুগ ফিরিয়ে আনা সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু তখনকার কালে যে আদর্শ সক্রিয় ছিল তা সত্য, তা বিশেষ কালে আবদ্ধ নয়।" —'প্রাক্তনী', পৃ. ১৩। এই তপোবন-শিক্ষার প্রসঙ্গেই কবি দ্বিধাহীন ভাষায় অন্যত্র বলেছেন, "কালে আমাদের অবস্থার যতই পরিবর্তন হইয়া যাক এই শিক্ষা-নিয়মের উপযোগিতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, কারণ, এ নিয়ম মানবচরিত্রের নিত্যসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত।" —'শিক্ষাসমস্যা'।

যাঁদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে আশ্রমের আদর্শকে প্রায় পরিত্যাগ করেছিলেন তাঁদের ধারণা ভ্রান্ত। শান্তিনিকেতনের সূচনা থেকে বিশ্বভারতীপর্বে তাঁর জীবিতকালের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত উভয় বিদ্যায়তনকেই তিনি 'আশ্রম' আখ্যায় অভিহিত করেছেন। ৮ই শ্রাবণ ১৩৪৭ সালে শান্তিনিকেতনের মন্দিরে 'আশ্রমের আদর্শ' শীর্ষক তাঁর সর্বশেষ অভিভাষণটিতে তার সাক্ষ্য আছে। ১৯৩৬ সালে 'আশ্রমের শিক্ষা' প্রবন্ধে আশ্রম-শিক্ষার সনাতন আদর্শগুলিকে তিনি পুনরায় সকলের সমক্ষে উপস্থিত করেছিলেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে ইংরাজী বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-র শীত-সংখ্যায় এই প্রবন্ধের একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং পরে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায় -কৃত এই অনুবাদটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে পুনঃ প্রকাশিত হয়। এই তথ্য থেকে এও প্রমাণিত হয় যে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ সাম্প্রতিক কালেও এই আশ্রম-শিক্ষার আদর্শের মর্যাদাকে স্বীকার ও প্রচার করেছেন। পরিশেষে, শিক্ষা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি শেষ রচনা, 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (আষাঢ়, ১৩৪৮), নামে ও মর্মে এই আশ্রম-শিক্ষার আদর্শ ও সুরকেই প্রচার করেছে।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে শান্তিনিকেতনের প্রাথমিক পর্বে ব্রহ্মবান্ধবের আমলে কিংবা তার কিছুকাল পরেও তার যা আকৃতি ও পরিবেশ ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের মধ্যেই তার প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছিল, যার অনেকটাই কবি বর্তমানকালের প্রয়োজনে এবং তাগিদে কিছুটা স্বেচ্ছায় এবং কিছুটা বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এ কথাও স্মরণীয় যে এ বিষয়ে তাঁর নানা আশঙ্কাও জেগে উঠেছিল এবং এই আশঙ্কা ও আক্ষেপ ক্রমশঃই তীব্র ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যে মূল আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার উত্তরকালের নানা বৃদ্ধি ও প্রসারের মধ্যে সেই আদর্শগুলি আচ্ছন্ন ও বিস্মৃত না হয়ে যায় এ বিষয়ে তিনি বারংবার সতর্কতার বাণী উচ্চারিত করেছিলেন। অতএব এ কথা বলা ভুল হবে যে রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে আশ্রমের আদর্শকে প্রায় সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছিলেন।

৩

আশ্রমের শিক্ষার যে-সকল লক্ষণ ও আদর্শ নানাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করেছেন এবং তাদের সমর্থনে যে-সব যুক্তি দেখিয়েছেন রবীন্দ্র-শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে তা সুপরিচিত। তবে অতি পরিচয়ের অসুবিধা এই যে তা থেকে অবজ্ঞা ও বিস্মৃতি জন্মাবারও সম্ভাবনা। তা ছাড়া, সাধারণের অনেকেরই হয়তো এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা নেই। তাই তার সংক্ষিপ্ত পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন হবে না। মতামতগুলির একত্র সমাবেশ ও তাদের সমালোচনাত্মক বিচারেরও স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে প্রাচীন ভারতের তপোবনের যে চিত্র রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তার অনেকটাই যে অনুমানাত্মক তা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করে গেছেন : "অবশ্য তপোবনের -যে একটা পরিষ্কার ছবি আমাদের মনে আছে তাহা নহে এবং তাহা অনেক অলৌকিকতার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যেকালে এই সকল আশ্রম সত্য ছিল সেকালে তাহারা ঠিক কিরূপ ছিল তাহা লইয়া তর্ক করিব না, করিতে পারিব না।" —'শিক্ষাসমস্যা'। অন্যত্রও বলেছেন, "প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটার ঠিক বাস্তব রূপ কী তার ঐতিহাসিক ধারণা আজ সহজ নয়।" —'আশ্রমের শিক্ষা'। তাই 'তপোবনের যে প্রতিরূপ স্থায়ীভাবে আঁকা পড়েছে ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে, বর্তমান যুগের বিদ্যায়তনে ভাবলোকের সেই তপোবনকে রূপলোকে প্রকাশ করবার' আগ্রহ ও প্রয়াস তিনি করেছিলেন। 'তপোবন' প্রবন্ধেও কবি প্রাচীন ভারতের তপোবনের যে বর্ণনা করেছেন তারও ভিত্তি মূলতঃ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য।

যদিও ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, ও পরবর্তী ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্, সূত্র, পাণিনি, কৌটিল্য, পুরাণ ও দর্শন সাহিত্য থেকে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তবুও অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায়, "unfortunately, the evidence on the subject is comparatively meagre and not given in any one place in any of the numerous works to be studied for it. One can only find bits of evidence here and there and piece together the scattered bits for constructing a system that may be understood." —*Ancient Indian Education*, Macmillan, 1947, p. 71।

তপোবন-আশ্রমের প্রথম লক্ষণ: তা সাধারণ লোকালয় থেকে দূরে, সহরের বাইরে, অবস্থিত। এই অবস্থিতি বালকের সত্যকার শিক্ষার জন্য প্রয়োজন, কারণ, "সংসার কাজের জায়গা এবং নানা প্রবৃত্তির লীলাভূমি— সেখানে এমন অনুকূল-অবস্থার সংঘটন হওয়া বড়ো কঠিন যাহাতে শিক্ষাকালে অক্ষুব্ধভাবে ছেলেরা শক্তিলাভ এবং পরিপূর্ণ জীবনের মূলপত্তন করিতে পারে।" —'শিক্ষাসমস্যা'। "সংসারে কৃত্রিম জীবন-যাত্রায় হাজার রকমের অসত্য ও বিকৃতি যেখানে প্রতিমুহূর্তে রুচি নষ্ট করিয়া দিতেছে," সেখানে সুকুমারমতি শিশুদের "সুবুদ্ধির স্বাভাবিকতা ও সৌকুমার্য নষ্ট করিয়া দেয়।" —'শিক্ষাসমস্যা'।

এই অবস্থিতির মধ্যে বাল্যাবস্থায় ব্রহ্মচর্যপালন আশ্রম-শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। ব্রহ্মচর্যপালনের অর্থ— কৃচ্ছ্রসাধন নয়। "প্রবৃত্তির অকালবোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্‌গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য পালনের উদ্দেশ্য।" —'শিক্ষাসমস্যা'। স্বভাবের নিয়মে স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠা শিশুর দেহমনের পূর্ণ-বিকাশের জন্যে একান্ত প্রয়োজন। জীববিজ্ঞান থেকে সুন্দর যুক্তি আহরণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভ্রূণকে গর্ভের মধ্যে এবং বীজকে মাটির মধ্যে নিজের উপযুক্ত খাদ্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গোপনে থাকিতে হয়।··· প্রকৃতি তাহাকে অনুকূল অন্তরালের মধ্যে আহার দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখে— বাহিরের নানা আঘাত অপঘাত তাহার নাগাল পায় না; এবং নানা আকর্ষণে তাহার শক্তি বিভক্ত হইয়া পড়ে না। ছাত্রদের শিক্ষাকালেও তাহাদের পক্ষে এইরূপ মানসিক ভ্রূণ অবস্থা। এই সময়ে তাহারা জ্ঞানের একটি সজীব বেষ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনের খোরাকের মধ্যেই বাস করিয়া বাহিরের সমস্ত বিভ্রান্তি হইতে দূরে গোপনে যাপন করিবে— ইহাই স্বাভাবিক বিধান।" —'শিক্ষাসমস্যা'। বাল্য থেকে যৌবনে বিকাশের অবস্থায় মনুষ্য-সমাজের নানা বিক্ষোভ, বিকৃতি ও পাপের আঘাত থেকে বালককে রক্ষা করার এই নঞাত্মক প্রক্রিয়াকেই রুসো

'নেগেটিভ্ এডুকেশন' আখ্যা দিয়েছেন এবং এই সময়ের পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা বলে প্রচার করেছেন। "The first education, then, should be purely negative. It consists, not in teaching the principles of virtue or truth, but in guarding the heart against vice and the mind against error"—*Emile*, Book II— রুসোর এই অধুনা-সুবিদিত উক্তি রবীন্দ্রাথের ব্যাখ্যায় গভীর ও প্রতীতিজনক সমর্থন পেয়েছে— যদিও এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষার আদর্শ রুসোর মতো সম্পূর্ণ নঙাত্মক নয়, তাকে পূর্ণতা দেবার অন্যান্য নানা উপাদানের কথা তিনি বলেছেন, কিন্তু তার বিশদ আলোচনা এখানে অবান্তর। এই প্রসঙ্গে রুসো ও রবীন্দ্রনাথের মতবাদে আর-একটি মিল পাওয়া যায়। উভয়েরই মতে— বাল্যাবস্থায় নিয়মিত নীতিপাঠ ও নীতি-উপদেশ সত্যকার নৈতিক শিক্ষার পক্ষে উপযুক্ত প্রণালী নয়। রুসো যেমন এই সময়ে 'teaching the principles of virtue of truth'এর পক্ষপাতী নন, 'negative education'এর সাহায্যেই বালকের নৈতিক চরিত্রকে সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় করতে চেয়েছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের মতে 'নীতি-উপদেশ জিনিষটা একটা বিরোধ· · ইহাতে কেবল ভূরি ভূরি ভাণের সৃষ্টি হয়' এবং 'নৈতিক জ্যাঠামি যাহা সকল জ্যাঠামির অধম' তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সুতরাং 'ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা ধর্মসম্বন্ধে সুরুচিকে স্বাভাবিক করিয়া দেওয়া'ই নীতিশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। —'শিক্ষাসমস্যা'।

এই তপোবন-শিক্ষার প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ নিসর্গ-প্রকৃতির পরিবেশে শিক্ষার মহৎ আদর্শের অবতারণা করেছেন যা রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শনের একটি মুখ্য তত্ত্ব। এই গুরুত্বপূর্ণ মতবাদের বিশদ আলোচনা স্বতন্ত্র অবকাশ-সাপেক্ষ। এ স্থানে তার মূল কথাগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ মাত্র করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "শুধু এই ব্রহ্মচর্য পালন নয়, তাহার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য থাকা চাই।" —'শিক্ষাসমস্যা'। সহর মানবসন্তানের স্বাভাবিক আবাস নয়, 'সজীব সরস বিশ্বপ্রকৃতির বক্ষেই' তার স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব। নিসর্গ-প্রকৃতির নানা অঙ্গের সহিত মানবশিশুর সম্বন্ধ জৈবিক ও আদিম, তার মজ্জায় মজ্জায় তাদের প্রতি আকর্ষণ, তাই তাদের সাহচর্যে তার আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত। এই আনন্দ তার জীবনে জীবনী-রসের সঞ্চার করে। দেহমনের সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে শিশুর চারি দিকে বৃহৎ অবকাশের প্রয়োজন। "বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশালভাবে বিচিত্রভাবে সুন্দরভাবে বিরাজমান।" —'শিক্ষাসমস্যা'। দেহের শিক্ষার জন্যে 'মাটি-জল-বাতাস-আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ' থাকা আবশ্যক। মনের শিক্ষার জন্যেও প্রকৃতির রাজ্যের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় অসংখ্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, নয়তো বইপড়া যান্ত্রিক শিক্ষায় 'জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের স্বাদশক্তি' নষ্ট হয়ে যায়।—'আবরণ'। 'বিশ্বসংসারের যে-সকল অদৃশ্য মাস্টার অলক্ষ্যে থেকে পাঠ শিখিয়ে দেন' ('বিশ্বভারতী' ১৩৫৮, পৃ. ৪৬), প্রকৃতির বিদ্যালয়েই তাঁরা কাজ করে থাকেন। ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা ও জ্ঞানের শিক্ষার উপরেও যে-শিক্ষা, অর্থাৎ 'বোধের শিক্ষা', তাও পেতে হবে 'তপোবনে— প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে।' —'তপোবন'। এই বোধের শিক্ষার অর্থ বিশ্বচেতনা; 'বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ।' —'তপোবন'। এই শিক্ষাকেই রবীন্দ্রনাথ 'যথার্থ শিক্ষা' বলেছেন। জলস্থল আকাশের আনন্দময় অপরিমেয় রূপরাশির মধ্যেই এই বিশ্বানুভূতি সম্ভব। সে অনুভূতি একদা ঘটেছিল ভারতের প্রাচীন আরণ্যক ঋষিদের। এই সব বিবিধ কারণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার

প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই।" —'শিক্ষাসমস্যা'। নিসর্গ-প্রকৃতির পরিবেশে শিক্ষাদানের নীতির সমর্থনে আজকের দিনে নতুন কিছু বলা বাহুল্য। রুসো-কর্তৃক প্রকৃতিশিক্ষা-দর্শনের প্রচারের পর আধুনিক কালের শিক্ষাজগৎ কার্যতঃ সম্পূর্ণভাবে না হোক অন্ততঃ তত্ত্বের দিক থেকে এই নীতিকে মেনে নিয়েছে। কেবল এইটুকু বলা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিশিক্ষাদর্শনের ক্ষেত্রে রুসোর উত্তরসূরী হলেও চিন্তার গভীরতায় ও সত্যতায়, অনুভূতির সূক্ষ্মতায় প্রসারে ও প্রাবল্যে, এবং ভাবপ্রকাশের অনুপম সৌন্দর্যে সামগ্রিক বিচারে এই বিষয়ে রুসোকেও অতিক্রম করে গেছেন, এবং উক্ত বিষয়ে শিক্ষাশাস্ত্রীদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থান অধিকার করেছেন।

আশ্রমশিক্ষার আর-একটি প্রধান অঙ্গ বালকদের স্বজন থেকে দূরে গুরুগৃহে বাস। গৃহশিক্ষা ও বিদ্যালয়শিক্ষার আপেক্ষিক উৎকর্ষ শিক্ষাশাস্ত্রের একটি জটিল বিতর্কমূলক সমস্যা। যদিও লক্, হেরবার্ট ও আধুনিককালে প্রখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিক ম্যাক্‌ডুগাল প্রভৃতি মনীষিগণ গৃহশিক্ষার তরফে রায় দিয়েছেন, অন্যদিকে প্লেটো, অ্যারিস্‌টট্‌ল্, কুইন্‌টিলিয়ান্ প্রভৃতি প্রাচীন চিন্তানায়ক থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের বহু শিক্ষাশাস্ত্রী গৃহশিক্ষার নানা অপূর্ণতা ও অক্ষমতার নজির দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের যুক্তির অধিকাংশই বর্তমান যুগের গৃহ ও 'ডে-স্কুলের' পরস্পর সহযোগিতায় সম্মানিত হয়। পাশ্চাত্যদেশের আদর্শানুযায়ী 'পাব্‌লিক স্কুল' বা বোর্ডিং-স্কুলের যে-জাতীয় আবাসিক শিক্ষার সঙ্গে আমরা পরিচিত, বিদ্যালয়শিক্ষার তা একটি চূড়ান্ত সংস্করণ হলেও বিশেষ বিশেষ অনিবার্য ক্ষেত্র ছাড়া সেখানেও গৃহের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না, বৎসরে স্বল্পকালের জন্যেও বালকের গৃহের সংস্পর্শলাভ ঘটে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্যাশ্রমধর্ম-অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বালকের আযৌবন সম্পূর্ণভাবে গৃহসম্পর্কবিচ্যুত হয়ে গুরুগৃহে বাসের প্রথা ছিল। এই নীতিকেই রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মৌলিক ও চিন্তা-পূর্ণ যুক্তির সহিত সমর্থন করেছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতো তিনিও একস্থানে বলেছেন, "নিজের বাড়িতে যদি সেই অনুকূল অবস্থা পাওয়া যায় তো কথাই নেই।··· এরূপ সুযোগ সকল ঘরে নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য।" —'ধর্মশিক্ষা'। "শিক্ষার জন্য বালকদিগকে ঘর হইতে দূরে পাঠানো উচিত নহে এ কথা মানিতে পারি যদি ঘর তেমনি ঘর হয়।" —'শিক্ষাসমস্যা'। কিন্তু এ উক্তি সত্ত্বেও তিনি গৃহশিক্ষার বিপক্ষে যে-সব যুক্তির অবতারণা করেছেন তাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এ বিষয়ে তিনি মৌলিক অনিবার্য বাধা অনুভব করেছেন। তাঁর মতে সাধারণ ভদ্র গৃহের পরিবেশেও আদর্শশিক্ষা সম্ভব নয়। কারণ, "সংসারে কেহ বা বণিক্, কেহ বা উকিল, কেহ বা ধনী জমিদার, কেহ বা আর-কিছু। ইহাদের প্রত্যেকের ঘরের রকমসকম আবহাওয়া স্বতন্ত্র। ইহাদের ঘরে ছেলেরা শিশুকাল হইতে বিশেষ একটি ছাপ পাইতে থাকে।" —'শিক্ষাসমস্যা'। বালকের স্বাভাবিক স্বকীয় বৃত্তিগুলির যথাযথ বিকাশ হওয়ার পূর্বেই গৃহের এই বিশিষ্ট ব্যবহারিক ছাপ পড়া রবীন্দ্রনাথের মতে আদর্শশিক্ষার প্রতিকূল, কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, কোনো বিশিষ্ট নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক বা সামাজিক ভূমিকার জন্যে পূর্বে থেকেই প্রস্তুত করে তোলা নয়। ধনীর সন্তানের উদাহরণ সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সে সম্পূর্ণরূপে মানবসন্তান হইতে শিখিবার পূর্বেই ধনীর সন্তান হইয়া উঠে—ইহাতে দুর্লভ মানবজন্মের অনেকটাই তাহার অদৃষ্টে বাদ পড়িয়া যায়, জীবনধারণের অনেক রসাস্বাদের ক্ষমতাই তাহার বিলুপ্ত হয়।" —'শিক্ষা-সমস্যা'। আধুনিক গণতন্ত্রবাদ এবং মনোবিজ্ঞান উভয়েরই মূলনীতি ব্যক্তিত্বের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী

ব্যক্তির উৎকর্ষসাধন ; পূর্ব-নির্দিষ্ট বাঁধাধরা কোনো পথে অল্পবিস্তর জবরদস্তির দ্বারা শিশুকে প্রভাবিত বা পরিচালিত করা উভয়েরই মূলনীতির বিরুদ্ধ। ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ এই মূল তত্ত্বটি এমন গভীর প্রত্যয় ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সহিত উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এটা বিস্ময়ের কথা।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরুগৃহে বাস যে সার্বজনিক অবশ্য কর্তব্য ছিল তা নয়। ছাত্রদের গুরুগৃহে 'অন্তেবাসী' হয়ে থাকা এবং দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্যপালনের পর পিতৃগৃহে 'সমাবর্তনে'র অনেক তথ্য ও কাহিনী বেদে ও উপনিষদে পাওয়া যায় বটে, তথাপি বহু 'গুরুকুল' লোকালয়ের মধ্যেই অবস্থিত ছিল, এবং অনেকক্ষেত্রে ছাত্রগণ পিতৃগৃহ থেকেই— আধুনিক 'ডে-স্কুল' প্রথা অনুযায়ী গুরুকুলে যাতায়াত করত। বাইরে গুরুকুলে পাঠাবার বয়সের মধ্যেও তারতম্য দেখা যায়। বৌদ্ধজাতকে জানা যায়, উপনয়নের বেশ কিছুকাল পরে, চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়সে, অনেকটা সক্ষম অবস্থায় ছাত্রকে বাইরে পাঠানো হয়েছে। এ অবস্থায় গৃহশিক্ষার গুরুত্বও কম ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে পিতাই পুত্রকে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত করে বেদের অধ্যাপনা করেছেন দেখা যায়। তা ছাড়া প্রাচীন বর্ণ-ব্যবস্থা অনুযায়ী আপন বর্ণের প্রয়োজনীয় শিক্ষা গৃহেই প্রাপ্ত হওয়ার প্রথাও বিরল ছিল না। সে-সময়ে গার্হস্থধর্মের আদর্শও উচ্চ ছিল, সমস্ত সমাজে মহৎ ভাবের ও আকাঙ্ক্ষার পরিবেশ ছিল। তাই গৃহশিক্ষার স্বাভাবিক অপূর্ণতার অনেক পরিমাণে উপশম ঘটতে পারত। এ সত্ত্বেও গুরুগৃহে বাসের আদর্শ উজ্জ্বল ছিল, কারণ গুরুর নিরন্তর সান্নিধ্য ও ব্যক্তিগত মনোযোগ, সচ্চরিত্র মহদাদর্শ সতীর্থদের সাহচর্য, এবং আশ্রমের পবিত্র উন্নত পরিবেশের গভীর প্রভাবের মূল্য-বিষয়ে সচেতনতা সমাজে প্রবল ছিল। আমাদের বর্তমান সমাজে "অনেকদিন হইতেই সে-আদর্শ হীন হইয়াছে এবং তাহার স্থলে কোনো মহৎ আদর্শই গ্রহণ করি নাই"। এ অবস্থায় গৃহের ও লোকসমাজের পরিবেশ পূর্বাপেক্ষা অনেক ক্ষতিকর, এবং সেই কারণে শিশুকে বাল্যকালেই সেই পরিবেশ থেকে দূরে রাখাই কর্তব্য।

দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাসের প্রথার সূত্রেই গুরুশিষ্যের সম্বন্ধের কথা এসে পড়ে যা আশ্রম-শিক্ষার একটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য বোর্ডিংস্কুলকে অনেকে home-substitute বলে থাকেন। কথাটি আংশিকভাবে সত্য হলেও এই দিক থেকে প্রাচীন গুরুকুলের আদর্শ ও ঐতিহ্য আরো উৎকৃষ্ট ছিল। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুরু সপরিবারে বাস করতেন এবং শিষ্যেরা সেই পরিবারের সন্তানের মতো প্রতিপালিত হত ; গুরু ও গুরুপত্নীর স্নেহসতর্ক লালন পিতামাতার স্থান অধিকার করত ; শিষ্যেরাও আপন পিতা-মাতার ন্যায়, এমনকি তদপেক্ষাও শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাঁদের সেবা করত। মাতৃক্রোড়চ্যুত হওয়ার পর শিক্ষাকালে গুরুর এই অনাবিল স্নেহ ও ভালোবাসা বালকের ব্যক্তিত্বের পরিপুষ্টির জন্যে কতখানি প্রয়োজন তার গভীর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ *My School* প্রবন্ধে করেছেন। এই স্নেহের মাধ্যমেই বাস্তব জগতের রূঢ় সত্যের সঙ্গে পরিচয়সাধন সহজে ঘটে, এই তাঁর মত। প্রাচীন শিক্ষায় গুরুর স্থান ছিল 'তপোবনের কেন্দ্রস্থলে'। তাঁদের আদর্শ চরিত্র ও জ্ঞানের তপস্যা স্বতঃই শিষ্যের চিত্তে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করত, এবং এই আন্তরিক শ্রদ্ধার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গুরুর পবিত্র প্রভাব শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হত। "শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটি আশ্রমের শিক্ষার সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান।" —'আশ্রমের শিক্ষা'। পিতা সন্তানের জনক ; কিন্তু গুরুও শিষ্যকে নবজন্ম দান করেন, যার ফলে তার 'দ্বিজত্ব' প্রাপ্তি ঘটে ; এই বিচারে গুরুও পিতৃতুল্য। শতপথ ব্রাহ্মণে

উপনয়ন-সংস্কারের বর্ণনায় গুরুর কর্তব্যের এই ব্যাখ্যাটি সত্যই মহত্বপূর্ণ। গুরুশিষ্যের এই সম্বন্ধটির বিশেষ মূল্য বর্তমানকালে আমরা নানা দুঃখ ও দুর্গতির মধ্যে উপলব্ধি করছি। এই সম্বন্ধ ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে আমাদের শিক্ষায় ও জীবনে নানা গ্লানির সৃষ্টি হয়েছে, ছাত্রশাসন-সমস্যা ক্রমশঃই গুরুতর আকার ধারণ করছে, এ কথা সকলেই একবাক্যে বলছেন। রাধাকৃষ্ণণ ও মুডালিয়ার -কমিশনের প্রতিবেদনে এ বিষয়ে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অতএব আশ্রম-শিক্ষার এই প্রধান একটি আদর্শের সুগভীর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য।

প্রাচীন ভারতের আদর্শে গুরুশিষ্যের এই নিরবচ্ছিন্ন অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের একটি বিশেষ দিক ছিল উভয়ের সমবেত জ্ঞান-সাধনা ও সত্যানুসন্ধান, পরমতত্ত্বের উপলব্ধি-কল্পে সমবেত তপস্যা। গুরুশিষ্যের মধ্যে এই একাত্মতা সুন্দর ও মহৎ রূপ পেয়েছে উপনিষদের প্রার্থনায়: "ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ"। রবীন্দ্রাথ বহুস্থানে এই বিশেষ দিকটির উল্লেখ করেছেন। গুরুর জীবনে জ্ঞান-তপস্যার অনির্বাণ শিখা প্রজ্জ্বলিত, তাই তা শিষ্যের চিত্তে ও জীবনেও সেই অগ্নিশিখাকে জ্বালাতে সক্ষম। গুরুদের সাধনা ছিল: "to see the world in God and to realise their own life in him." তাঁদের সাহচর্যে শিষ্যেরাও "grew up in an intimate vision of eternal life", "in an atmosphere of living aspiration" —*My School*। এই মহোন্নত পরিবেশই সত্যকার জ্ঞানসাধনার প্রকৃত প্রেরণা ও পথ, এবং আশ্রমের পবিত্র স্নিগ্ধ শান্তির মধ্যে এই সাধনা যতখানি সহজ ও নিবিড় হতে পারে সাধারণ বিদ্যায়তনের বিশ্লিষ্ট পরিবেশে তা ততখানি সম্ভব হতে পারে না, এ কথা বোঝা কঠিন নয়। বস্তুতঃ, যে সকল বিদ্যায়তনে, তা সে আমাদের দেশেই হোক বা অন্য দেশেই হোক, জ্ঞানের সাধনা প্রবল ও বেগবান, সেখানে গুরুশিষ্যের এই সমবেত জ্ঞানানুশীলনের রূপটি সুস্পষ্ট, আশ্রমের বাহ্যিক রূপটি না থাকলেও, তার এই বিশেষ আদর্শটি সেখানে সজীব ও বাস্তব হয়ে উঠেছে বলতে হবে। আমাদের দেশেও আধুনিককালে আচার্য জগদীশ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, মনীষী রমণ প্রভৃতি বিজ্ঞানসাধকদের জীবনেও এই আদর্শের জীবন্ত রূপ ফুটে উঠতে দেখা গিয়েছে। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের শিক্ষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুক্ষেত্রে নানাকারণে সেই আদর্শের শোচনীয় বিলুপ্তি ঘটতে দেখা যাচ্ছে বলে অনেকেই আক্ষেপ করে থাকেন। অতএব সেই আদর্শ আজ আমাদের নতুনভাবে স্মরণীয়।

এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ আশ্রম-শিক্ষার আর-একটি প্রধান দিকের উল্লেখ করেছেন— 'আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষা'। স্কুলের চারদেয়ালের খাঁচায় বদ্ধ না থেকে আশ্রমজীবনের সহজ স্বাধীন উন্মুক্ত ক্ষেত্রে জীবনের অসংখ্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অফুরন্ত অবকাশ থাকে। চিত্তকে তা নিরন্তর সজীব ও ঔৎসুক্যময় করে রাখে। এই ঔৎসুক্যই জ্ঞানের উৎস, জীবনগঠনের পাথেয়। মনীষী বার্টরাণ্ড রাসেল তাই 'curiosity'কে শিক্ষার চারিটি প্রধান উদ্দেশ্যের অন্যতম বলে গণ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, "আশ্রমের ছেলেরা চারি দিকের অব্যবহিত সম্পর্কলাভে উৎসুক হয়ে থাকবে—সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। এখানে এমন-সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে; যাঁরা চক্ষুষ্মান, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে।" —'আশ্রমের শিক্ষা'। এই তত্ত্বেরই অনেকটা প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় মুডালিয়র কমিশনের এই উক্তিতে: "the intelligent and wide awake teacher has numerous opportunities to kindle new interest, to expand and

strengthen existing ones and to satisfy their innate desire to touch life at many points." বর্তমানকালে আমাদের দেশের শিক্ষকদের মধ্যে এবং অনেকটা সেইকারণে ছাত্রদের মধ্যেও, আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের অভাবের কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থানে বলেছেন। সাম্প্রতিককালে এই পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়েছে, এ কথা আমাদের অবিদিত নয়। সেই কারণে প্রাচীন আশ্রম-শিক্ষার এই মূল্যবান্ তত্ত্বটিকে আমাদের শিক্ষায় যথার্থভাবে গ্রহণ করার প্রয়োজন ঘটেছে।

আশ্রম-শিক্ষার আর-একটি বিশিষ্ট লক্ষণ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন: "সহযোগিতার সভ্য নীতিকে প্রত্যহ সচেতন করে তোলা আশ্রমের শিক্ষার প্রধান সুযোগ।"—'আশ্রমের শিক্ষা'। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জী. এইচ. টম্‌সনের একটি মূল্যবান মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক কিল্‌প্যাট্রিকের একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেছেন যে যদিও সাধারণের ধারণা এই যে বিদ্যাশিক্ষা হয় বিদ্যালয়ে এবং চরিত্রশিক্ষা হয় গৃহে ও অভ্যস্ত সামাজিক পরিবেশে, এবং প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থায় একথা যথার্থও ছিল বটে, কিন্তু বর্তমানকালের জীবনধারার পরিবর্তন অনুসারে চরিত্রশিক্ষণের অনেকখানি দায়িত্বও স্কুলের ওপর এসে পড়েছে। প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় পরিবারের ও সমাজের অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিসর গণ্ডীতে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই দৈনন্দিন জীবনে একটি নির্দিষ্ট কর্তব্য ছিল, পারিবারিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক সমবেত জীবনযাত্রায় প্রত্যেকেরই একটি সুস্পষ্ট দান ছিল, এবং প্রত্যেকেই তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে আপন আপন দায়িত্বও সার্থকতাকে অনুভব করতে পারত। অধ্যাপক টম্‌সন বলেন, "Such a life taught self-help combined with co-operation, brought its own rewards, and punishments if it was not lived properly, and could be learned by simple participation on the part of the young, for whom it was never necessary to make artificial tasks, for an abundance, easily understood by them, and seen by them to be necessary and within their powers, arose in the daily communal life." —*A Modern Philosophy of Education*, George Allen and Unwin 1947, pp. 47-48। বর্তমান সভ্যতার যান্ত্রিকতায় ও জটিলতায় জীবনযাত্রার সেই সব সহযোগিতামূলক ব্যক্তিগত বহু কাজ অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে এবং বিরাট কারখানার অদৃশ্যগর্ভে অলক্ষ্যে সম্পাদিত হচ্ছে; সেই কারণে সামাজিক জীবনে সহযোগিতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসের ক্ষেত্রও বিরল হয়ে গেছে। অতএব এখন বিদ্যালয়ের দায়িত্ব হয়ে পড়েছে 'সহযোগিতার সুসভ্য নীতিকে সচেতন করে তোলা।' প্রাচীন ভারতের আশ্রমজীবনে এই শিক্ষা নানাভাবে সুসম্পন্ন হত, রবীন্দ্রনাথ এই কথা সুন্দরভাবে বলেছেন। আশ্রমজীবনে জটিল যান্ত্রিকতার স্থান নেই, তার জীবনযাত্রার ছাঁদটি সরল ও অনেকটা আদিম, তাই সেখানে সকলের সহযোগিতা অপরিহার্য। আশ্রম একটি বৃহৎ পরিবার, তাই পারিবারিক জীবনযাত্রার মুখ্য উপাদান, পরস্পরের সম্বন্ধে সহানুভূতি ও সহযোগিতা, এই জীবনের অবকাশে প্রকাশ ও বিস্তার লাভ করতে পারে।

এই সহযোগিতামূলক দৈনন্দিন জীবনযাত্রার আর-একটি মূল্যবান দিক আছে, তা হচ্ছে উদ্যোগশিক্ষা ও বাস্তবশিক্ষা। প্রাচীন তপোবনে 'গোরু-চরানো, গো-দোহন, সমিধ-কুশ আহরণ, অতিথি-পরিচর্যা, যজ্ঞবেদীরচনা' প্রভৃতি দিনকৃত্যের মাধ্যমে এই শিক্ষার অব্যাহত অবসর ছিল। বর্তমানযুগের আশ্রম-

জীবনে ঠিক এই কৃত্যগুলির ক্ষেত্র না থাকলেও ঐ জাতীয় অনেক কর্মের অনিবার্য অবসর ঘটতে পারে। পশুচর্যা, কৃষিকার্য, উদ্যান-রচনা, আবাস-সম্মার্জনা, উৎসবানুষ্ঠান, পল্লীসেবা, আশ্রমবাসী গুরু ও সহপাঠীদের সেবা-শুশ্রূষা, অতিথি-সৎকার ইত্যাদি বহুবিধ কাজের দ্বারা ব্যবহারিক ও বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা ও কুশলতা এবং সামগ্রিকভাবে আত্মকর্তৃত্বচর্চার প্রচুর অবকাশ সেখানে আছে। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমজীবনের 'সতত উদ্যমশীল এই কর্মসহযোগিতা'কে অন্তরের সঙ্গে কামনা করেছিলেন। পাশ্চাত্যশিক্ষায় বোর্ডিং স্কুলের ব্যবস্থায় এই আদর্শকেই বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়েছে, তা বলা বাহুল্য। আমাদের দেশের শিক্ষা-পরিকল্পনা সূত্রে মুডালিয়র কমিশনের প্রতিবেদনেও এই 'co-operative work, willingly undertaken and efficiently completed'-এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, এবং বিদ্যালয়ের জীবনে এই শিক্ষার ক্ষেত্রকে সুপ্রসারিত করে দেবার জন্যে আবেদন করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, আশ্রমের জীবন সরল, অনাড়ম্বর, বিলাস-ব্যসন-বর্জিত, আসবাব-উপকরণ-বিহীন। শান্তিনিকেতন আশ্রম -স্থাপনার অনেক পূর্বে থেকেই রবীন্দ্রনাথ এই সরলতার আদর্শের গুণগান করে এসেছেন শেষ দিন পর্যন্ত। পশ্চিমের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার নানা বিষময় ফলের আলোচনা করে ভারতের এই সনাতন আদর্শকে তিনি বহু দিক থেকে বিচার করে বহুবার জগতের সমক্ষে উপস্থিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের ও শিক্ষাদর্শনের একটা প্রধান অঙ্গ বলে একে ধরে নেওয়া যেতে পারে। উপকরণবহুল বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য যন্ত্র-সভ্যতার বিরুদ্ধে নানা প্রতিবাদ ও সতর্কতার বাণী কেবল আমাদের দেশেই নয়, পাশ্চাত্য দেশেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাস্কিন, টলস্টয় প্রভৃতি মনীষীদের চিন্তাধারায় উচ্চারিত হয়ে আসছে। এমনকি ঘোর জীবনবাদী রাসেল সাহেবেরও শান্ত সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার আদর্শের স্বপক্ষে নানা উক্তি আছে: যথা— "A happy life must be to a great extent a quiet life, for it is only in an atmosphere of quiet that true joy can live." —*Conquest of Happiness* ; অথবা— "With these changes there would come a quieter manner of life— less fever and hustle, fewer material changes, more leisure for meditation, less cleverness and more wisdom." —*Prospects of Industrial Civilization.* কিন্তু এই সরলতার আদর্শকে অনেকে আধুনিক কালের উপযোগী বলে মনে করেন না। সর্দার পাণিক্কর তাঁর ১৯৫৫ সালের বিশ্বভারতীর অভিভাষণে এই সরলতার আদর্শের প্রতিবাদ করে বলেছেন, "The doctrine of the simple life which is presumed to encourage high thinking is but the worship of poverty." তাই তিনি 'poverty as a national ideal' সমর্থন করতে চান নি। কিন্তু অভিজ্ঞমাত্রেই জানেন রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন দারিদ্র্যের পূজা করেন নি, বরং তার প্রতিবাদই করেছেন। তিনি বলেছেন, "একথা বারবার বলেছি, আবার বলি, আমি বৈরাগ্যের নাম করে শূন্য ঝুলির সমর্থন করি নে।" —'শিক্ষার মিলন'। *My School* প্রবন্ধেও তিনি বলেছেন, "There are men who think that by the simplicity of living, introduced in my school, I preach the idealization of poverty which prevailed in the mediæval age." —*Personality*, p. 121. এবং সেই প্রসঙ্গেই

তিনি বলেছেন যে দারিদ্র্য-পূজার উদ্দেশ্যে নয়, উপকরণ-বিরলতার ও সরলতার অন্তর্নিহিত যে গভীর শিক্ষার তাৎপর্য আছে সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এই আদর্শের অনুরাগী। অনাবশ্যক উপকরণ মানুষের প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে পঙ্গু ও অপরিণত করে রাখে, জীবনের মূল রসাস্বাদে বাধা আনে, 'বিশ্বজগৎ এবং আমাদের স্বাধীনশক্তির মাঝখানে··· অনেকগুলো বেড়া' তুলে দেয়। তাই আত্মকর্তৃত্বচর্চা ও পূর্ণতার সাধনার জন্যে চাই উপকরণহীন সরলতার পবিত্র স্বাধীন পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথের মতে এই সরলতার আদর্শ ভারতবর্ষের একটি সনাতন আদর্শ। কিন্তু সর্দার পাণিক্কর বলেছেন, "At no time in India was this preached as an ideal.··· The idea that the Hindu religion supports the doctrine of simple living seems to me to be wholly untrue." প্রাচীন ভারতে জীবনের সর্বতোমুখী পূর্ণ বিকাশ ও সমৃদ্ধির সাধনা ছিল এ কথা অবশ্য সুবিদিত। কিন্তু সরলতার আদর্শের মধ্যে সংযম ও ত্যাগের যে-অভিব্যক্তি আছে, সকল ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির মধ্যেও প্রাচীন ভারত তারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে এসেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলেছেন: "সেই প্রতাপশালী ঐশ্বর্যপূর্ণ যৌবনদৃপ্ত ভারতবর্ষ বনের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করতে কোনোদিন লজ্জা বোধ করে নি। তপস্যাকেই সে সকল প্রয়াসের চেয়ে বেশী সম্মান দিয়েছে··· ভারতবর্ষের পুরাণ-কথায় যা-কিছু মহৎ আশ্চর্য পবিত্র, যা-কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য, সমস্ত সেই প্রাচীন তপোবন-স্মৃতির সঙ্গেই জড়িত। বড়ো বড়ো রাজার রাজত্বের কথা সে মনে করে রাখবার জন্যে চেষ্টা করে নি, কিন্তু নানা বিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী করে আজ পর্যন্ত সে বহন করে এসেছে। মানব ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব"—'তপোবন'। যে-সভ্যতার আদর্শে জীবনের সকল ক্রিয়া-কর্ম, সাধারণ গৃহস্থ থেকে শ্রেষ্ঠ নরপতি পর্যন্ত সমাজের সকল স্তরের ব্যক্তি এক অখণ্ড ধর্মভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত, এবং সকলের জীবনের শেষ পরিণতি বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, যে-সমাজে সংযম ও ত্যাগের প্রতিমূর্তি ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থিত—সে-সভ্যতার সে-সমাজের লক্ষ্য কোন্ দিকে তা বোঝা কঠিন নয়। অতএব আশ্রমজীবনের যে সরলতার আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ আজীবন প্রচার করে এসেছেন তার মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। নেহরু, আজাদ, রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি দেশের নেতৃবৃন্দ বিশ্বভারতীর প্রসঙ্গে নানা ভাষণে বিশেষ করে এই আদর্শের জয়গান করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে আশ্রম-সুলভ সরলতার এই আদর্শ স্বাধীন ভারতের শিক্ষার আদর্শরূপে দেশের সম্মুখে এখনো জাগ্রত আছে।

পরিশেষে, রবীন্দ্রনাথের মতে আশ্রম-শিক্ষার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ ও সর্বোৎকৃষ্ট অমৃতফল, গভীর ও নিবিড় অধ্যাত্মচেতনা। আশ্রমের উদার প্রাকৃতিক পরিবেশে 'জগতের অন্তরতম রহস্যলোক আবিষ্কারের', বিশ্বসৃষ্টির মূল প্রস্রবণ 'একটি চেতনাময় অনন্ত আনন্দের' সহজ অনুভবের অব্যাহত অবকাশ আছে। নিখিলচরাচরের অন্তর্নিহিত ঐক্য ও একাত্মতার উপলব্ধিই ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ সাধনা, এবং সে-সাধনা আশ্রমের পবিত্র সুন্দর প্রাণময় পরিবেশেই স্বাভাবিক ও সুন্দর। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যে তপোবন তপস্যা ও ত্যাগের প্রতীক। বর্তমানকালেও এই তপস্যা ও ত্যাগের যথার্থ রূপ আশ্রমজীবনের বিলাস-বাহুল্যবর্জিত সরলতার মধ্যেই ফুটে উঠতে পারে। অপর দিকে, প্রাচীন ভারতের আদর্শে 'তপোবন শান্তরসাস্পদ'। এই শান্ত রসে সকল রসের পূর্ণতা। এই পূর্ণতার উপলব্ধি ও সাধনার ক্ষেত্র আশ্রমজীবনে প্রশস্ত। তাই আশ্রমের শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ফলরূপেই এই আধ্যাত্মিক চেতনা ও সাধনাকে পাওয়া যাবে।

বস্তুতঃ, বাহ্যিকভাবে নীতিশিক্ষা বা ধর্মশিক্ষা দেওয়ার সব প্রয়াসই নিষ্ফল হতে বাধ্য। যথার্থ ধর্মবোধ আশ্রমের স্বাভাবিক উন্নত আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যেই সম্ভব। বিশ্বভুবনের মূলগত এই একাত্মতার অনুভূতির সাহায্যেই যথার্থ বিশ্বজাগতিকতার শিক্ষালাভ ঘটে। পৃথিবীর সকল মনুষ্য, সকল জাতিকে কেবল জ্ঞানের দ্বারা এক জানাই যথেষ্ট নয়, বোধের দ্বারাও জানা প্রয়োজন। আশ্রমেই এই বোধের সাধনার প্রকৃত ক্ষেত্র। আশ্রম-শিক্ষার অঙ্গীভূত এই আধ্যাত্মিকতার সুরকে অনেকে আধুনিক কালের উপযোগী বলে মনে করেন না। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, দুই-মহাযুদ্ধ-বিপর্যস্ত পাশ্চাত্য জগৎ নানাভাবে ভারতের মুখাপেক্ষী হয়েছে শান্তি ও মৈত্রীর বাণীর জন্যে। এই শান্তি ও মৈত্রীর বাণী আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ বাণী। অধ্যাত্ম-শিক্ষার বিপক্ষেও যে-মত প্রকাশ করা হয়েছে আধুনিক শিক্ষাজগতের চিন্তাধারায় তার সম্পূর্ণ সায় মেলে না। আমাদের বর্তমান শিক্ষা যে জ্ঞানসর্বস্ব এবং অধ্যাত্মশিক্ষার অভাবে যে তার মধ্যে গভীর ফাঁক রয়ে গেছে, এ কথা অনেকদিন থেকেই অনেক সূত্রে বলা হয়ে আসছে। ১৯১৭ সালে স্যাড্‌লার কমিশনের প্রতিবেদনে আক্ষেপ করা হয়েছিল, "The mass of new knowledge which now claims a place in schemes of education has not yet found a synthesis. It has not yet been unified intellectually. Still less has it been co-ordinated with spiritual belief." সার রিচার্ড লিভিংস্টন ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে অনুরূপ আক্ষেপ করে ১৯৪৭ সালে বলেছেন যে পরমার্থ সম্বন্ধে চিন্তার কোনো অবকাশ সে-শিক্ষায় নেই।—*Some thoughts on University Education*. Prof. Brubacherও বলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমের শিক্ষানায়কগণ অনুভব করেন যে মাত্র চরিত্র-শিক্ষার দ্বারা বর্তমান যুগের সংকটের প্রতিরোধ সম্ভব হবে না; "they thought that moral and character education could not fully succeed so long as the public school neglected religious or spiritual values". তাই তাঁর মতে, "the reversion to an emphasis on religious education was a more significant event than might appear on the surface." —*A History of the Problems of Education*. আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্‌দের চিন্তায় এবং বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণণ-শিক্ষা-প্রতিবেদনে ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্যে আবেদন যে সুস্পষ্ট, এ কথা সকলেই জানেন। অতএব আশ্রম-শিক্ষার আদর্শে অধ্যাত্মশিক্ষার যে মূল অংশ আছে তাকে একালের অনুপযোগী ও অপ্রয়োজনীয় বলে অভিহিত করলে ঠিক বলা হবে না।

৪

আশ্রম-শিক্ষার বিভিন্ন আদর্শের সম্বন্ধে যে-সব প্রশ্ন ও আপত্তি উঠতে পারে বা উঠেছে স্বতন্ত্রভাবে তাদের আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। এখন সামগ্রিকভাবে দু-একটি প্রশ্নের আলোচনা প্রয়োজন।

একটি মৌলিক প্রশ্নের আলোচনা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং করেছেন: "এমন কথা আমি একদিন কোনো বন্ধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জনতা হইতে দূরে একটা নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে যে জীবনযাত্রা তাহার মধ্যে একটা শৌখিনতা আছে, তাহার মধ্যে পুরাপুরি সত্য নাই, সুতরাং এখানকার যা শিক্ষা তাহা সম্পূর্ণ কাজের শিক্ষা নহে।"—'ধর্মশিক্ষা'। আলোচনা সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে যথার্থ সামাজিক পরিবেশ ও তার মাধ্যমে

সামাজিক শিক্ষা যে শহরেই সুলভ তা ঠিক নয়। বরঞ্চ বিশাল নগরীর জনময় নির্জনতায় সত্যকার সামাজিক জীবন দুর্লভ; সেখানে সকলেই স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন; সামাজিক জীবনের সুসংবদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত রূপ সেখানে অস্পষ্ট। অন্যদিকে, আশ্রমজীবনে "একশো দুশো মানুষকে এক আশ্রয়ে লইয়া দিনযাপন করাকে কোনোমতেই নির্জনবাস বলা চলে না।" —'ধর্মশিক্ষা'। সেখানে সকলেই পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত, এবং সমবেত দায়িত্ব-নীতির দ্বারা বদ্ধ। এই রকম স্থানেই সত্যকার সামাজিক চেতনা ও সামাজিক শিক্ষা সম্ভব।

আশ্রমের অতিমাত্রায় পবিত্র পরিবেশে সাধারণ সংসারের সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দের তরঙ্গাঘাত প্রবেশ করতে পারে না; অতএব এদিক থেকেও আশ্রমের শিক্ষা অসম্পূর্ণ— এই অভিযোগের উত্তরেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আশ্রমের এই বর্ণনা নিতান্ত কাল্পনিক। কারণ, এতগুলি লোককে নিয়ে যে মনুষ্যসমাজ সেখানে সকলেই দেবতা নন, মানবচরিত্রের প্রকৃতিগত নানা বিকৃতির লীলা সেখানেও দেখা যায়। প্রাচীন ভারতের তপোবনের উন্নত বায়ুতেও 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ' হবার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অতএব বাস্তব আশ্রমে 'লোকালয়ের অন্য বিভাগেরই মতো মন্দের জন্য সিংহদ্বার খোলাই আছে'। এমনকি আশ্রমের পরিমিত ও পবিত্র অবকাশে মন্দের আবির্ভাবগুলি সহরের অপেক্ষা তীব্রতররূপেই প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে: তা হলে আশ্রমের স্বকীয়তা কী রইল, সাধারণ মনুষ্য-সমাজের তুলনায় তার স্বাতন্ত্র্য কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর স্থূলভাবে দেওয়া যাবে না, সে-কথা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন। তৎসত্ত্বেও তিনি এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে আশ্রমের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা খুঁজতে হবে তার স্থূলদেহে নয়, সূক্ষ্ম জায়গাটিতে। সেখানে তার একটি নিজস্ব আদর্শ বিরাজ করছে, সে-আদর্শের নিরন্তর লক্ষ্য সাধনার দিকে, ভূমার দিকে, পূর্ণ জীবনের দিকে। নানা ত্রুটিবিচ্যুতির মধ্যেও এই আদর্শেই আশ্রমের যথার্থ পরিচয় ও সত্য নিহিত।

পরিশেষে, এত আলোচনা সত্ত্বেও হয়তো আধুনিক মন আশ্রমের নামেই সঙ্কুচিত হয়ে উঠতে পারে, জীবন-বিমুখ কৃচ্ছ্রসাধনপরায়ণ পলায়নধর্মী কোনো সেকেলে আদর্শের কল্পনায় বিরূপ ভাব আশ্রয় করতে পারে। বলা বাহুল্য আশ্রম কথাটির সম্বন্ধেই আমাদের একটা সংস্কার জন্মে গেছে। তাই বিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে, এই 'স্পুটনিক্-যুগে', আশ্রমের চিন্তা করাটা নিতান্তই অতীতপূজা বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের মতে প্রাচীন ভারতের আশ্রম-শিক্ষার আদর্শের মধ্যে এমন-সব সর্বজনীন সর্বকালীন উপাদান আছে যা শুধু আধুনিক কালের উপযোগীই নয়, বিশেষভাবে প্রয়োজন। আবাসিক শিক্ষা, ব্রহ্মচর্যপালন, গুরুশিষ্যের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ, প্রকৃতির পরিবেশ, সরল জীবনযাত্রা, সদাজাগ্রত ঔৎসুক্যের অনুশীলন, সহযোগনীতি, সমবেত জ্ঞানসাধনা, এবং অধ্যাত্ম-চেতনা ও বিশ্ববোধ— আশ্রম-শিক্ষার এই সব মূল আদর্শগুলির কোনটি বর্তমান যুগের শিক্ষায় নিষ্প্রয়োজন বা অচল? উপরের আলোচনার মূল প্রতিপাদ্যই এই যে, বর্তমানকালের জীবনযাত্রায় ও শিক্ষাসংগঠনে এর প্রত্যেকটিরই বিশিষ্ট স্থান ও মূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "এখনকার কালের উপযোগী বলিয়া ইহার একটা স্বাতন্ত্র্যও থাকিবে এবং চিরকালীন সত্যের প্রকাশ বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন কালের সহিত ইহার মিলও থাকিবে। অতএব, মৃত পিতার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ছেলেকে যেমন শ্মশানে দাহ করাটা কর্তব্য নহে, তেমনি সত্যের নূতন প্রকাশচেষ্টা তাহার পুরাতন চেষ্টার সঙ্গে কোনো অংশে মেলে বলিয়াই তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিতে ব্যস্ত হওয়াটাকে সংগত বলিতে পারি না।" —'ধর্মশিক্ষা'। রবীন্দ্রনাথ একথাও বলেছেন:

"বর্তমানকালে এখনি দেশে এই রকম তপস্যার স্থান, এই রকম বিদ্যালয় যে অনেকগুলি হবে আমি এমনতরো আশা করি নে।" —'তপোবন'। ঠিক শান্তিনিকেতনের মতো বিদ্যাশ্রম জাতীয় পরিমাপে সারা ভারতবর্ষে বহুল সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু পূর্ণশিক্ষার আদর্শ হিসাবে এই ধরণের বিদ্যালয় স্থানে স্থানে থাকা প্রয়োজন। সুশিক্ষার অপরিহার্য আদর্শগুলি সেখানে সুষ্ঠুভাবে অনুশীলিত হবে এবং সমগ্র শিক্ষাজগতকে আদর্শের আলোক প্রদর্শন করবে। ডিউইর 'ল্যাবরেটরী স্কুলে'র মতো এই স্বল্পসংখ্যক বিদ্যাশ্রমগুলিও আদর্শ শিক্ষানীতির জীবন্ত প্রয়োগশালা হিসাবে গণ্য হবে এবং দেশের ও বিদেশের অন্যান্য বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রেরণা জোগাবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়গুলির অনেকগুলিই আবাসিক; তাদের পরিবেশ ও জীবনযাত্রায় আশ্রমসুলভ সৌন্দর্য, সরলতা ও শান্তি বিরাজমান; সেখানেও শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক স্নেহপ্রীতিবিজড়িত ও অন্তরঙ্গ; তাদের অনেকগুলিতে আন্তর্জাতিক আদর্শ সক্রিয়; স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতা ও সহযোগনীতি তাদের জীবনযাত্রাকে আনন্দময় ও সার্থক করে তোলে। প্রগতিশীল শিক্ষাজগতে আজও এই বিদ্যালয়গুলিকে অনেকাংশে আদর্শস্থানীয় বলে গণ্য করা হয়। অতএব আশ্রমশিক্ষার এই মূলগত আদর্শগুলি এখনও বিশ্বের শিক্ষাক্ষেত্রে জীবন্ত আছে, তা অস্বীকার করা চলে না। ভ্রান্তসংস্কারবশতঃ সেগুলিকে বর্তমান যুগের অনুপযোগী জ্ঞানে অবজ্ঞা করাটা সত্যের অপলাপ হবে; রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাসাধনার একটি প্রধান অঙ্গকেও অমর্যাদা দেখানো হবে। দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষাবিধান এবং শিক্ষাচিন্তা সমৃদ্ধি ও সার্থকতার দিক থেকে তা অকল্যাণকর।

‘অর্ঘ্যাভিহরণ’

গত সংখ্যায় আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম ও ষষ্টিতম বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে কবিসংবর্ধনার বিবরণ প্রকাশ করেছি।

বর্তমান সংখ্যায় শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের “পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি-উৎসবে অর্ঘ্যাভিহরণ” সম্বন্ধে তথ্য পরিবেশন করা হল।

১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ তারিখে শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসিবৃন্দ “শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাধিপতি পরমভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি” -উৎসব উদ্‌যাপিত করেন। এই উৎসবের দুষ্প্রাপ্য অনুষ্ঠানপত্রটির প্রতিলিপি এখানে মুদ্রিত হল।

‘রাজা’-অভিনয়

১৩১৭ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে ‘রাজা’ প্রকাশিত হয়। “প্রথম অভিনয় হয় শান্তিনিকেতনে ৫ চৈত্র ১৩১৭।”[১] এই অভিনয় সম্বন্ধে শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ‘চিঠিপত্র’ তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত আছে, তার কিয়দংশ এই—

> বৌমা, এই কয় দিন অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে ছিলুম। রাজা অভিনয়ের আয়োজন করতে কিছুদিন থেকে ভারি ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। তার পরে অভিনয় দেখবার জন্যে কলকাতা থেকে অনেক অতিথি এখানে এসেছিলেন— তাঁদের আতিথ্য নিয়েও আমার আর কিছুমাত্র অবকাশ ছিল না। মেয়ে আট জন ও পুরুষ নয়-দশ জন এসেছিলেন।· ·পশু অভিনয় হতে রাত দুপুর হয়েছিল— তার পরে কাল রাত্রে মেয়েরা অনেক রাত পর্য্যন্ত নানা ব্যাপার নিয়ে আমাদের জাগিয়ে রেখেছিল।· ·আমাদের অভিনয়ে সুধীরঞ্জন[২] সেজেছিল রাণী— বেশ ভাল করে তাকে সাজানো গিয়েছিল— অন্তত তার চেহারাটা সকলের ভাল লেগেছিল— তার অভিনয়ও মন্দ হয় নি।· ·

শান্তিনিকেতনে রাজার পরবর্তী অভিনয় হয় রবীন্দ্রনাথের “শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে” উক্ত জন্মতিথি-উৎসবের পূর্বদিন— ২৪ বৈশাখ ১৩১৮।

এবারকার অভিনয়ে রাণীর (সুদর্শনা) ভূমিকাভিনয় করেন অজিতকুমার চক্রবর্তী।

দুষ্প্রাপ্য অনুষ্ঠানসূচীর প্রতিলিপি ও তৎসহ নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের পূর্ণ বিবরণ মুদ্রিত করা হল।

১ রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, আশ্বিন ১৩৬৮, পৃ ২৬১

২ শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

Printed by S. C. Ghosh, at the LAKSHMI PRINTING WORKS,
64-1 & 64-2, Sukea's Street, CALCUTTA.

শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাধিপতি

পরমভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয়ের

পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি-উৎসবে

অর্ঘ্যাভিহরণ

মঙ্গলগীতি

শং নো বাতঃ পবতাং মাতরিশ্বা, শং নস্তপতু সূর্য্যঃ।
অহানি শং ভবন্তু নঃ, শং রাত্রিঃ প্রতিধীয়তাং॥
শমুষা নো ব্যুচ্ছতু শমাদিত্য উদেতু নঃ।
শিবা নঃ শন্তমা ভব সুমৃড়ীকা সরস্বতি॥
(তৈ. আ. ৩. ৪২. ১—২।)

গমনশীল পবন আমাদের কল্যাণকর হইয়া প্রবাহিত হউক! সূর্য্য আমাদের কল্যাণকর হইয়া তাপ প্রদান করুক! দিবসসমূহ আমাদের কল্যাণকর হউক! রাত্রিসমূহ আমাদের কল্যাণপ্রদ হইয়া প্রতিষ্ঠাপিত হউক! ঊষা আমাদের কল্যাণদায়িনী হইয়া প্রভাতা হউক! সূর্য্য আমাদের কল্যাণকর হইয়া উদিত হউক! এবং হে সরস্বতী, আপনি আমাদের শিবদায়িনী, কল্যাণদায়িনী ও সুখদায়িনী হউন!

আবাহন

নমস্তেঽস্তু। (বা. স. ২.৩২)।
কবিঃ সীদ নি বর্হিষি। (ঋ. স. ৯.৫৯.৩)।
কবিং সম্রাজমতিথিং জনানাম্ (ঋ.স.৬.৭.১)।
গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে,
প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে,
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে।(বা.স.২৩.১৯)।
তব ব্রতে কবয়ো বিদ্মনাপসোঽজায়ন্ত
(ঋ.স. ১.৩১.১);
পশ্চাৎ পুরস্তাদধরাদুদক্তাৎ কবিঃ কাব্যেন
পরিপাহি রাজন্। (ঋ. স. ১০.৮৭.২১)।
মহান্ কবির্নিবচনানি শংসন্,
(ঋ.স.৯.৯৭.২),
স জীব শরদঃ শতম্। (শত.ব্রা.১৪.৯.৪.২৬)।

আপনাকে নমস্কার!

হে কবি, আপনি কুশাসনে উপবেশন করুন!

আপনি সম্রাট্-কবি, আপনি জনসমূহের অতিথি—সৎকারের যোগ্য পাত্র,

আপনি জনগণের নায়ক, আপনাকে আমরা আহ্বান করিতেছি!

আপনি প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয়, আপনাকে আমরা আহ্বান করিতেছি!

আপনি সমস্ত নিধির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি, আপনাকে আমরা আহ্বান করিতেছি!

আপনার ব্রত অনুসরণ করিয়া অনেক বিজ্ঞ কবি উৎপন্ন হইয়াছেন;

হে শোভমান কবি, আপনি সম্মুখ-পশ্চাৎ ও উচ্চ-নীচ সর্ব্বত্রই কাব্যদ্বারা (লোককে) রক্ষা করুন!

হে মহাকবি, আপনি আপনার সুভাষিতসমূহ উচ্চারণ করিয়া শতবৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকুন!

অর্ঘ্যাভিহরণ

এতচ্চন্দনমত্র শীলমিব তে চন্দ্রোজ্জ্বলং শীতলং,
দীপোঽয়ং প্রতিভাপ্রভাব ইব তে কান্তস্থিরং দীপ্যতে,
ধূপোঽয়ং তব কীর্ত্তিসঞ্চয় ইবামোদৈর্দিশি ব্যশ্নুতে,
মাল্যং নির্ম্মলকোমলং তব মনস্তুল্যং তথেদং
স্থিতম্॥
এতচ্চামরযুগ্মকং সুবিশদং কাব্যং ত্বদীয়ং যথা,
পুষ্পশ্রেণিরিয়ং গুণাবলিরিব তে পশ্যজ্জনাকর্ষিণী।
অর্ঘ্যং তাবদিদং কৃতং তব কৃতে দূর্ব্বাঙ্কুরাদ্যন্বিতং
প্রীত্যা নঃ প্রতিগৃহ্যতাং সকৃপয়া, স্বস্ত্যস্তু তে
শাশ্বতম্॥

এই চন্দ্রোজ্জ্বল চন্দন আপনার শীলের ন্যায় শীতল; আপনার প্রতিভাপ্রভাবের ন্যায় এই দীপ সুন্দর ও স্থিরভাবে দীপ্তি প্রাপ্ত হইতেছে; এই ধূপ আপনার যশোরাশির ন্যায় সৌরভে দিক্‌সমূহকে ব্যাপ্ত করিতেছে; এবং আপনার মনের ন্যায় কোমল ও নির্ম্মল এই মাল্যখানি এখানে অবস্থিত রহিয়াছে। আবার এই চামরযুগল আপনার কাব্যের ন্যায় সুবিশদ, এবং এই কুসুমশ্রেণী আপনার গুণাবলীর ন্যায় দর্শকবৃন্দকে আকর্ষণ করিতেছে। দূর্ব্বাঙ্কুরপ্রভৃতি দ্বারা আমরা আপনার জন্য এই অর্ঘ্য রচনা করিয়াছি, আপনি আমাদের প্রতি প্রীতি ও করুণা করিয়া ইহা গ্রহণ করুন! আপনার শাশ্বত স্বস্তি হউক প্রার্থনা করি!

শান্তি

পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিরাপঃ
শান্তিরোষধয়ঃ শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ
শান্তিঃ শান্তিভিঃ।
তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্ব্বশান্তিভিঃ শময়ামোঽহং
যদিহ ঘোরং যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং
তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্ব্বমেব শমস্তু নঃ॥
অথ. স. ১৯.৯.১৪।

পৃথিবী শান্তিময় হউক, অন্তরিক্ষ শান্তিময় হউক, দ্যুলোক শান্তিময় হউক, জল শান্তিময় হউক, ওষধিসমূহ শান্তিময় হউক, বিশ্বদেবগণ আমার সম্বন্ধে সমস্ত শান্তির দ্বারা শান্তিময় হউন!

এখানে যাহা কিছু ভয়ানক রহিয়াছে, যাহা কিছু ক্রূর রহিয়াছে, যাহা কিছু পাপ রহিয়াছে, আমরা তাহা সেই শান্তিসমূহের দ্বারা সমস্ত শান্তির দ্বারা উপশমিত করিতেছি; তাহা শান্ত হউক, তাহা শিব হউক! সমস্তই আমাদের কল্যাণকর হউক!

শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম
বোলপুর,
২৫শে বৈশাখ, ১৩১৮ সাল।

ভক্তিপ্রণত
আশ্রমবাসিবৃন্দ।

ওঁ

পরম ভক্তিভাজন আশ্রমগুরু

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে—

—•:※:•—

"রাজা।"

———

শান্তিনিকেতন।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বোলপুর—

২৪শে বৈশাখ, ১৩১৮ সাল।

কৃষ্ণ প্রেস ১৯৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

ঠাকুরদা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিনজন পথিক

জনার্দ্দন—শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

ভবদত্ত—শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

কৌণ্ডিল্য—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

প্রহরী—শ্রীকালিদাস বসু

নাগরিক-দল :

প্রথম—শ্রীহীরালাল সেন

বিরূপাক্ষ—শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

বিশ্ববসু—শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

বালকগণ

শ্রীহৃষীকেশ মুস্তফী, শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরকুমার সেন, শ্রীঅমিয় চৌধুরী, শ্রীঅরবিন্দ চৌধুরী, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমুরলীধর পাল, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশ, শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার সেন

পদাতিক—শ্রীকালিদাস বসু

মাধব—শ্রীহীরালাল সেন

কুম্ভ—শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

ভদ্রসেন—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

রাজবেশী—শ্রীঅন্নদাচরণ বর্দ্ধন

পাগল—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাঞ্চীরাজ—শ্রীজগদানন্দ রায়

কোশলরাজ—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বাউল

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন, শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়, শ্রীহীরালাল সেন, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত

কান্যকুব্জরাজ—শ্রীহীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মন্ত্রী—শ্রীতারকদাস মুখোপাধ্যায়

মালীদ্বয়

শ্রীতারকদাস মুখোপাধ্যায়

শ্রীশচীবিলাস রায়

দূত—শ্রীতারকদাস মুখোপাধ্যায়

বিদর্ভরাজ—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিঙ্গরাজ—শ্রীঅবনীনাথ রায়

পাঞ্চালরাজ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

বিরাটরাজ—শ্রীসুধাকান্ত রায়

স্ত্রীগণ

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী—সুদর্শনা

শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী—সুরঙ্গমা

শ্রীঅবনীনাথ রায়—রোহিণী

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, ২৭শে বৈশাখ, ১৩১৮ সাল.

ঠাকুরপরিবারের আদিপর্ব ও সেকালের সমাজ

বিনয় ঘোষ

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর গৃহপ্রবেশ উৎসবের সময় দ্বারকানাথ ঠাকুর 'অনেক অনেক ভাগ্যবান' সাহেব-বিবিদের নিমন্ত্রণ করে এনে 'চতুর্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য' ভোজন করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। কলকাতা শহরের বাঙালী ভাগ্যবানেরাও উৎসবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, এবং তাঁদের সংখ্যা পাথুরিয়াঘাটা শোভাবাজার বাগবাজার হাতীবাগান কুমোরটুলি বৌবাজার অঞ্চলে তখন খুব কম ছিল না। বড় বড় দেওয়ান বেনিয়ান মুচ্ছুদ্দী ব্যবসায়ী, নিমকমহল ও হাটবাজারের ইজারাদার ও রাজামহারাজা খেতাবধারীদের সমাগম হয়েছিল উৎসবে। দ্বারকানাথের বিশিষ্ট বন্ধু ও সহযোগী রামমোহন রায়েরও তখন (১৮২৩ সনে) কলকাতায় থাকার কথা, যদিও 'ব্রাহ্ম সমাজ' তখনও স্থাপিত হয়নি এবং 'ইউনিটেরিয়ান সভা' নিয়ে তিনি ব্যস্ত। উৎসবে রামমোহনও আসতে পারেন, তবে তিনি এসেছিলেন কি না সে-খবর তখনকার কোনো সংবাদপত্রে ছাপা হয়নি। একদিকে সাহেব-বিবিদের, আর-একদিকে অভিজাত বাঙালীদের ট্রাউজার-জ্যাকেট-টুপি এবং চোগা-চাপকান-শিরস্ত্রাণাদি সাজসজ্জার বাহারে উৎসব-সভা যে কী বিচিত্র রূপ ধারণ করেছিল তাও আজ মানসনেত্রে দেখা ছাড়া উপায় নেই, কারণ কোনো শিল্পী তৈলচিত্রে তা রূপায়িত করেননি, এবং আলোকচিত্রেও তা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। স্বচ্ছন্দে কল্পনা করা যেতে পারে যে সেদিন চিৎপুর-অঞ্চল ল্যাণ্ডো-ফিটন-ব্রউহাম-পাল্কী গাড়ি ও ঘোড়ার ভিড়ে দুর্গম হয়ে উঠেছিল এবং সাধারণ লোকের কথা ছেড়ে দিলেও, বিচিত্র বেশধারী কোচওয়ান সহিস খিদ্‌মৎগার মশাল্‌চিদের সমাবেশেই জোড়াসাঁকো সরগরম হয়ে উঠেছিল। ঘটনাটা সাধারণ নয়, দ্বারকানাথ ঠাকুরের গৃহপ্রবেশ-উৎসব।

উৎসবের দিন ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৩০ সাল, ইংরেজী ১৮২৩ সনের ১১ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার। উৎসবের সময় সন্ধ্যার পরে। আলোকসজ্জা ও আতসবাজীর জন্য সন্ধ্যার পরই প্রশস্ত সময়। সাহেবী, বাঙালী ইত্যাদি খানার 'চতুর্বিধ ভোজনীয় দ্রব্যের' বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়নি। শুধু এইটুকু জানা যায় যে ভোজনান্তে উত্তম গান, ইংরেজী বাদ্য ও নৃত্য হয়েছিল। তারপর ভাঁড়েরা সং সেজে উপস্থিত সাহেবলোক ও বাবুদের প্রচুর আমোদ বিতরণ করেছিল এবং তাদের মধ্যে একজন গো-বেশ ধারণ করে ঘাস চর্বণ করাতে আমন্ত্রিতদের আহ্লাদের আর সীমা ছিল না।[১]

জোড়াসাঁকোর নবনির্মিত গৃহে প্রবেশ করার আগে দ্বারকানাথের পূর্বপুরুষরা কলকাতার আরও অনেক গৃহে প্রবেশ ও বাস করেছিলেন। কেবল চিৎপুরে জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে নয়,

---

১ সম্পূর্ণ সংবাদটি এই: "নূতনগৃহ সঞ্চার।— মোং কলিকাতা ১১ দিসেম্বর ২৭ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীন বাটীতে অনেক ২ ভাগ্যবান সাহেব ও বিবীরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্ব্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাবসানে ঐ ভবনে উত্তম গানে ও ইংগ্লণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে ভাঁড়েরা নানা শং করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে একজন গো বেশ ধারণপূর্ব্বক ঘাস চর্ব্বণাদি করিল।"— সমাচার দর্পণ, ২০ ডিসেম্বর ১৮২৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, ১৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা।

তার বাইরে বর্তমান ধর্মতলা এসপ্লানেড ও ময়দান অঞ্চলে, যখন ময়দানের নতুন কেল্লা জুড়ে গঙ্গার তীর ধরে ছিল অধুনালুপ্ত গোবিন্দপুর গ্রাম। জব চার্ণক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে কলকাতা শহরের গোড়াপত্তন করেছিলেন গঙ্গার পূর্বতীরে ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের সিদ্ধান্ত করে। তার আগেই অবশ্য বাঙালী তন্তুবণিক শেঠ-বসাকরা আরও উত্তরে বড়বাজারের কাছে সূতাবস্ত্রের হাট বসিয়েছিলেন, যার জন্য অঞ্চলটার নামই 'সূতানুটি' হয়েছিল। পশ্চিমতীরে পর্তুগীজদের প্রতিষ্ঠিত বেতোড়ের হাট, পূর্বতীরে শেঠ-বসাকদের সূতানুটি হাট, কাজেই চার্ণকের পক্ষে কুঠির জন্য পূর্বতীর বেছে নেওয়া ভুল হয়নি। গোবিন্দপুর গ্রাম তারও আগে থেকে ছিল কিনা সঠিক জানা যায় না। মনে হয় পূর্বতীরে সূতানুটি হাট আর চার্ণকের কুঠি স্থাপিত হবার পর থেকে ভাগ্যান্বেষী বাঙালিরা কিঞ্চিৎ অর্থের ধান্ধায় পাশাপাশি গ্রাম থেকে এসে গঙ্গাতীরেই বাসা বেঁধেছিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই কয়েকটি বসতির সমাবেশে সেখানে একটি গ্রাম গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের গ্রামের বসতি সাধারণত কোন দেবতা ও দেবালয় কেন্দ্র করে বিন্যস্ত হয়, তাই গ্রামদেবতা গোবিন্দের নামে গ্রামের নাম হয় গোবিন্দপুর।

কলকাতা মহানগর তখন এইরকম কয়েকটি বিক্ষিপ্ত গ্রামের গর্ভে অঙ্কুরাবস্থায় ছিল। ইংরেজ বণিকের আগমনের ফলে তার ভবিষ্যৎ রূপ যাঁরা সেদিন মনশ্চক্ষুতে কিছুটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'ব্ল্যাক-জমিদার' বলে খ্যাত গোবিন্দরাম মিত্র, মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পিতা দেওয়ান রামচন্দ্র দেব প্রভৃতি অন্যতম। জোড়াসাঁকো-পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরপরিবারের পূর্বপুরুষও তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মীর সন্ধানে তিনিও আরও অনেকের মত বাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছিলেন ভাগীরথীর পূর্বতীরে ইংরেজের বাণিজ্যকুঠির অদূরে অবস্থিত গোবিন্দপুর গ্রামে। তারপর বংশানুক্রমে অনেক বুদ্ধি ও কৌশল খাটিয়ে তাঁরা সংগ্রাম করেছেন, কত চাকরি আর কতরকমের বাণিজ্য যে করেছেন তার ঠিক নেই। তবেই ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হয়েছেন তাঁদের প্রতি এবং সেই প্রসন্নতা-পরিবৃত পরিবেশে গোপীমোহন চন্দ্রকুমার প্রসন্নকুমার দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার বিচিত্র বিকাশ হয়েছে ঠাকুরপরিবারে। পরবর্তীকালের বংশধরদের বিচিত্রগামী প্রতিভার জৌলুসে ঠাকুরপরিবারের পূর্বপুরুষদের স্মৃতি স্বভাবতঃই ম্লান হয়ে গেছে এবং তাঁদের কীর্তিকলাপও মনে হয়েছে বিস্মরণীয়। কিন্তু তবু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পিতৃপুরুষদের প্রত্যহ স্মরণ করতেন এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করে :[২]

পুরুষোত্তমাদ্বলরামঃ বলরামাদ্ধরিহরঃ
হরিহরাদ্রামানন্দঃ রামানন্দান্মহেশঃ
মহেশাৎ পঞ্চাননঃ পঞ্চাননাজ্জয়রামঃ
জয়রামান্নীলমণিঃ নীলমণেরামলোচনঃ
রামলোচনাদ্দারকানাথঃ,
নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ।

পুরুষোত্তম থেকে বলরাম, বলরাম থেকে হরিহর, হরিহর থেকে রামানন্দ, রামানন্দ থেকে মহেশ, মহেশ থেকে পঞ্চানন, পঞ্চানন থেকে জয়রাম, জয়রাম থেকে নীলমণি, নীলমণি থেকে রামলোচন, রামলোচন থেকে

২ ঈশানচন্দ্র বসু : শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৯০২ সন ; ১২৮ পৃষ্ঠা।

পাথুরিয়াঘাটা - ঠাকুরবাড়ি
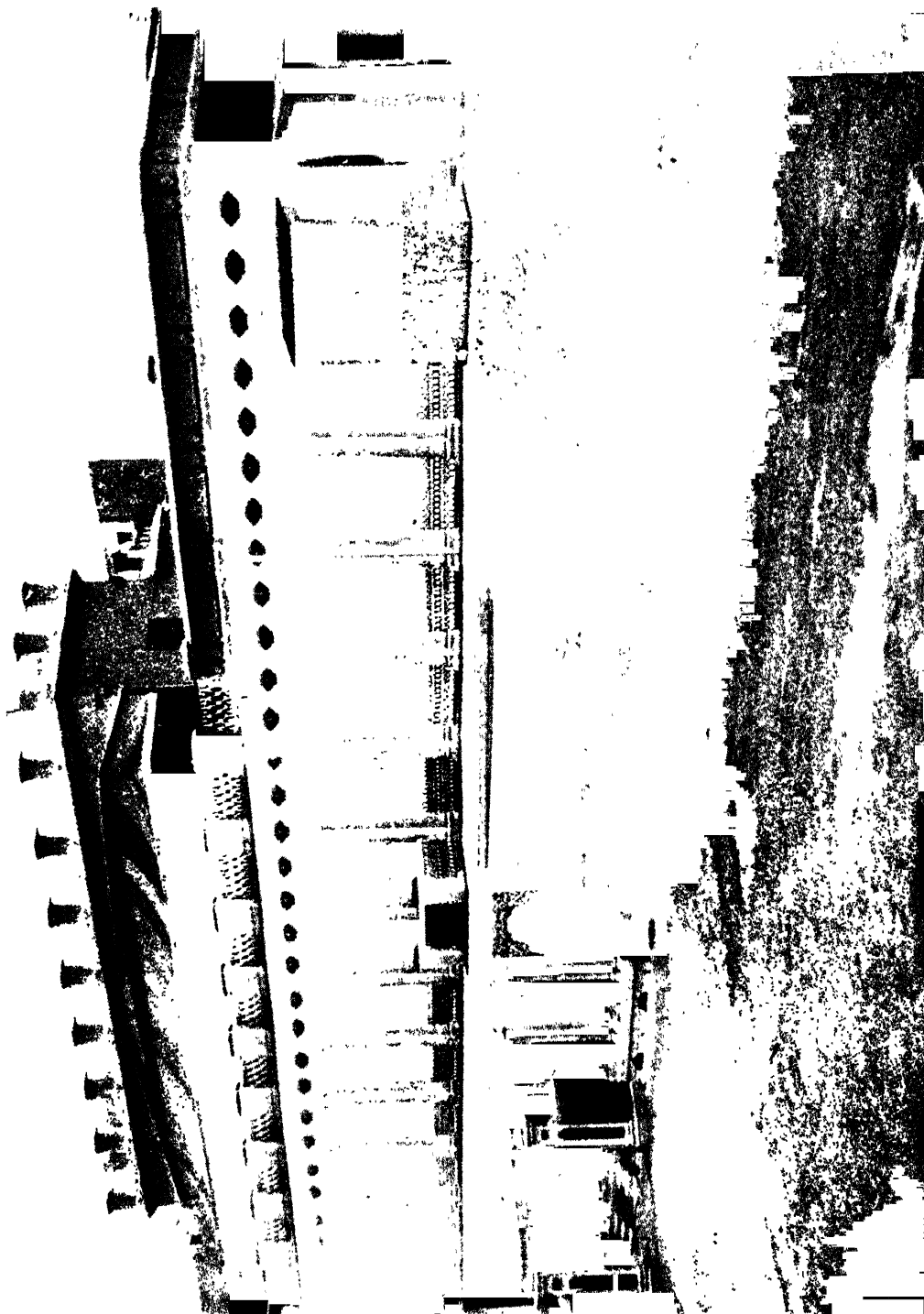
দ্বারকানাথ ঠাকুর পর্যন্ত পিতৃপুরুষদের তর্পণ করতেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। রামলোচন জ্যেষ্ঠ এবং দ্বারকানাথকে তিনি দত্তক গ্রহণ করেছিলেন বলে দ্বারকানাথের জনক রামমণির পরিবর্তে রামলোচনের নাম করা হয়েছে। দ্বারকানাথের জন্ম হয় আঠারো শতকের শেষ দশকে (১৭৯৪)। তার উর্ধ্বে চারপুরুষ পর্যন্ত ঠাকুরবংশের কেউ কলকাতায় আসতে পারেন, কারণ কলকাতা শহরের তখন পত্তন হয়েছে, লোকজনের বসতি বেড়েছে এবং রোজগারের পথও অনেক খুলে গেছে। দ্বারকানাথ থেকে চারপুরুষেরও আগে ঠাকুরদের কারও কলকাতায় আসা সম্ভব নয়, কারণ তাহলে প্রায় জব চার্ণকেরও আগে আসতে হয় এবং তা আসবার কোন সংগত কারণ থাকতে পারে না। পঞ্চানন-জয়রাম-নীলমণি-রামলোচন, এই হল দ্বারকানাথ ঠাকুরের উর্ধ্বতন চারপুরুষ। কাজেই আঠারো শতকের গোড়ার দিকে পঞ্চানন ঠাকুরকে আমরা দেখতে পাই গঙ্গাতীরের গোবিন্দপুর গ্রামে। কিন্তু এই ঠাকুর মহাশয়ের কথা শুরু করার আগে আরও কয়েক পুরুষ উর্ধ্বে পুরুষোত্তম-বলরাম পর্যন্ত কিছু বলা দরকার। মহর্ষি যখন পুরুষোত্তম পর্যন্ত স্মরণ করতেন তখন ঠাকুরপরিবারের ইতিহাস প্রসঙ্গে তাঁদের কথাও উল্লেখ করতে হয়।

পুরুষোত্তম হলেন দ্বারকানাথ থেকে উর্ধ্বতন দশম পুরুষ, রবীন্দ্রনাথ থেকে দ্বাদশ পুরুষ। সাধারণত আমরা সাতপুরুষের কথা উল্লেখ করে থাকি এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে সেই সাতপুরুষের মধ্যে প্রথম পঞ্চানন ঠাকুর একেবারে কলকাতা শহরে পদার্পণ করেছেন দেখা যায়। পঞ্চাননের আরও পাঁচপুরুষ আগে পুরুষোত্তম। একপুরুষে পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে গণনা করলে পুরুষোত্তমকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিয়ে যেতে হয়। তখন বাংলাদেশে হুসেন শাহী সুলতানদের পর শূরবংশীয় আফগান সুলতানদের রাজত্বকাল। শ্রীচৈতন্য ও তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাবে সমাজ ও সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনে তখন বাংলাদেশে এক নবযুগের সূচনা হয়েছিল। পুরুষোত্তম মধ্যযুগের এই নবজাগরণকালের লোক।

বাংলাদেশে ঠাকুরবংশ 'পিরালী' ব্রাহ্মণবংশ বলে কথিত। পিরালীদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী ও কাহিনীর অন্ত নেই। কুলাচার্য নীলকান্ত ভট্টের কারিকা থেকে জানা যায় যে সুলতানের একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ কর্মচারী নবদ্বীপের কাছে পিরলিয়া বা পিরল্যা গ্রামে বাস করতেন। এক সুন্দরী মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করার জন্য তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। পিরল্যা গ্রামে বাস করার জন্য অথবা মুসলমানপ্রীতির জন্য লোকে তাঁকে 'পিরালী' বলে ডাকত। এই কাহিনী যদি সত্যও হয় তাহলেও ঠাকুরবংশের সঙ্গে এই প্রেমিক পিরালীর কোন সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না, কারণ এই পিরালী যদি মুসলমান হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর বংশ ব্রাহ্মণবংশ বলে কথিত হতে পারে না।

অন্য কুলাচার্যদের কারিকায় দেখা যায় যে হুসেন শাহের আমলে জনৈক হিন্দু দেওয়ান যবনের খানা ঘ্রাণের জন্য, ঘ্রাণে অর্ধভোজন 'থিয়োরি' অনুযায়ী মুসলমানী খানা আস্বাদনের অপরাধে সমাজচ্যুত হন :

যবনের খানার ঘ্রাণ গেল তোমার নাকে।
কেমনে রইল হিন্দুয়ানী কহত আমাকে॥
বাদশার কথায় জব্দ দেওয়ান লোকে পাইল ভান।
সমাজেতে রাষ্ট্র হইল খানা খায় দেওয়ান॥

পীরের থৈইকা পাইল দোষ নাম হইল পিরারী।
সংস্রবেতে দোষী পিঠাভোগের কুশারি॥

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' আছে,

পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥

পিরালী ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এরকম আরও অনেক কারিকা, ছড়া ও কবিতা উদ্ধৃত করা যায়। কিন্তু এইসব কাহিনী থেকে যে ঐতিহাসিক সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার সঙ্গে কারিকার বা কিংবদন্তীর কাহিনী-কল্পনার সম্পর্ক খুব সুদূর। আসল সত্য এই হওয়া সম্ভব যে, সুলতানী আমলে বাংলার মুসলমান শাসকরা তুর্কীয়ানা পদ্ধতিতে যখন দেবদেউল ধ্বংস ও জাতিধর্ম নাশ করছিলেন তখন নবদ্বীপ ও তার পরিপার্শ্বের একাধিক ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামের উপর দিয়েও সেই ঝড় বয়ে গিয়েছিল। তারপর সেই বিপর্যস্ত গ্রামের ব্রাহ্মণরা আবার হিন্দুসমাজের কাছেও কঠোর দণ্ড পেয়েছিলেন। তখন সমাজে কেবল বৈষ্ণবধর্মের উদারতার বাণীই যে ঘোষিত হচ্ছিল তা নয়, রঘুনন্দন প্রমুখ স্মার্ত ভট্টাচার্যেরাও রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করে, নব্য-স্মৃতি হাতে নিয়ে তর্জনী তুলে অনাচার-অত্যাচারপীড়িত হিন্দুসমাজকে শাসাচ্ছিলেন। সামাজিক অবস্থা যা হয়েছিল তাতে স্মার্ত পণ্ডিতদের শাসানিকেও দোষ দেওয়া যায় না। তাঁরা ভেবেছিলেন যে মুসলমানদের অত্যাচারে অনর্গল ধারায় অনাচার প্রবেশ করছে সমাজে এবং সমাজ রসাতলে যাচ্ছে। কাজেই স্মৃতি-ধর্মশাস্ত্রের বজ্রবন্ধনে তাঁরা সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে চেয়েছিলেন। বজ্র আঁটুনির ফলে গেরো ফস্কা হয়েছিল কিনা তা সামাজিক ইতিহাসের বিচার্য বিষয়, আপাতত ঠাকুরপরিবারের ইতিহাস প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়। লক্ষণীয় হল, এই সময় কুলাচার্যরাও সোৎসাহে কুলগ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন, ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ সকলেরই কুলপঞ্জী তৈরি হয়। মুসলমানদের অত্যাচারে অথবা মুসলমান শাসকদের দরবারে রাজকার্য উপলক্ষে ঘনিষ্ঠতার জন্য যেসব ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্যদের বিচারে জাতিচ্যুত হয়েছিলেন, মনে হয় তাঁদের মধ্যে 'পিরালী ব্রাহ্মণরা' অন্যতম। হিন্দুসমাজের বিচারে যবন-সাহচর্যের ফলে গ্রামকে-গ্রাম দণ্ডিত হওয়াও আশ্চর্য নয়। নবদ্বীপের কাছে পিরল্যাবাসী ব্রাহ্মণরা এইভাবেও দণ্ডিত হতে পারেন।

কলকাতার ঠাকুরপরিবার, কুলাচার্যদের মতে, যশোহর-খুলনার পিঠাভোগের কুশারী-বংশজাত। কুশারীরা তাঁদের বর্ধমান জেলার আদিনিবাস কুশগ্রাম থেকে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ও যশোহর-খুলনা জেলার ঘাটভোগ, দামুড়হুদা, পিঠাভোগ প্রভৃতি গ্রামে ছড়িয়ে পড়েন। পুরুষোত্তমের পিতা জগন্নাথ কুশারী আদিপিরালী শুকদেবের কন্যাকে বিবাহ করে যশোহর জেলায় বসবাস করেন। জগন্নাথের বংশধররা এইভাবে পিরালী ব্রাহ্মণদের থাকভুক্ত হন।[৩] জগন্নাথ কুশারীর কাল ষোড়শ শতকের প্রথম পর্ব, পুরুষোত্তমের কাল মধ্য পর্ব। উভয়েই মুসলমান রাজত্বের মধ্যাহ্নকালের লোক।

---

৩ নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থের 'পিরালী ব্রাহ্মণ' খণ্ড থেকে সংগৃহীত। এবিষয়ে নগেন্দ্রনাথ বসুর সমস্ত মতামত ও উক্তি এই বই থেকে গৃহীত হয়েছে।

পুরুষোত্তমের পুত্র বলরাম, পৌত্র হরিহর, প্রপৌত্র রামানন্দ। রামানন্দের পুত্র মহেশ্বর থেকে পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের উৎপত্তি। মহেশ্বরের পুত্র পঞ্চানন সর্বপ্রথম কলকাতায় আসেন এবং বংশলতা অনুসারে তাঁর আগমনকাল আঠারো শতকের প্রথম পর্ব অনুমান করতে বাধা নেই। ১৭০৭ সনে যখন সম্রাট ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু হয় তখন কলকাতা অঞ্চল জরিপ করে দেখা যায় যে 'বাজার-কলকাতা' অঞ্চলে মোট প্রায় ৫০০ বিঘার মধ্যে কমপক্ষে ৪০০ বিঘায় লোকজনের বসতি ও ঘরবাড়ী আছে, কিন্তু 'টাউন-কলকাতা' অঞ্চলে প্রায় ১৭০০ বিঘার মধ্যে মাত্র ২৫০ বিঘা, 'সুতানুটি' অঞ্চলে ১৭৭০ বিঘার মধ্যে মাত্র ১৩৪ বিঘায় এবং 'গোবিন্দপুর' অঞ্চলে ১২০০ বিঘার মধ্যে মাত্র ৫৭ বিঘায় লোকবসতি আছে, বাকি সব ধানক্ষেত, কলাবাগান, বাঁশবাগান, পুকুর ও জলাজঙ্গলে ভর্তি।[৪] তবু বাজার-কলকাতার (বর্তমান বড়বাজার প্রভৃতি অঞ্চল) বসতির ঘনত্ব দেখে বোঝা যায় যে আঠারো শতকের গোড়ার দিকেই শহরের আকর্ষণ বেশ বেড়েছিল, অন্তত আর্থিক আকর্ষণ তো নিশ্চয়ই। তা না হলে বাজার অঞ্চলে লোকের ভিড় হবে কেন? সুতানুটি (বর্তমান উত্তর-কলকাতা), টাউন-কলকাতা (বর্তমান মধ্য-কলকাতায় বৌবাজার প্রভৃতি অঞ্চল) ও গোবিন্দপুরে (বর্তমান ময়দানে কেল্লার কাছে) লোকবসতি আদৌ ঘন হয় নি। আগেই বলেছি, বাজার-কলকাতা অঞ্চলে বাঙালী তন্তুবণিক শেঠ-বসাকরা (মুর্শিদাবাদের জৈন ব্যাঙ্কার শেঠরা নন) আগে থেকে বাজার পত্তন করেছিলেন, সেই কারণে এই অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় লোকবসতি বেশ বেড়েছিল।[৫] এদেশের লোক, প্রধানত বিভিন্ন বণিক-সম্প্রদায়, ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এই বাজার অঞ্চলে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। তা হলেও গোবিন্দপুর গ্রামের আকর্ষণও তখন কম ছিল না, কারণ গঙ্গাতীরে ইংরেজদের পুরাতন কুঠি ও কেল্লা গোবিন্দপুরের কাছেই অবস্থিত ছিল (বর্তমান কাস্টমস হাউস ও বড় ডাকঘরের কাছে)। কলকাতা শহরের মূলকেন্দ্র (nucleus) ছিল এই পুরাতন কুঠি-কেল্লা অঞ্চল, এবং এই কেন্দ্রটিকে অর্ধবৃত্তাকারে বেষ্টন করে গোবিন্দপুর থেকে সুতানুটি পর্যন্ত মৌচাকের মত লোকবসতি গড়ে উঠেছিল। ১৭০৫-৬ সনেই দেখা যায়, কোম্পানির কর্মচারীরা কলকাতার খবর জানিয়ে বিলেতে ডিরেক্টরদের লিখছেন—"The Towne buildings increased and the Streets regular"—এবং তার চেয়েও বড় সুসংবাদ দিচ্ছেন এই বলে যে "people flocking there to make the Neighbouring Jemindars envy them"—অর্থাৎ দলে দলে লোক শহরে আসছে এবং তাই দেখে আশেপাশের জমিদাররা বেশ ঈর্ষা প্রকাশ করছেন।[৬]

পঞ্চানন ঠাকুর যদি এই সময় কলকাতায় আরও অনেকের মত ভাগ্যপরীক্ষার জন্য এসে থাকেন তা হলে যথাসময়েই এসেছিলেন বলতে হবে। বাজার-কলকাতায় যেমন প্রধানত বণিকজাতির বাস ছিল, তেমনি গোবিন্দপুরে মনে হয় প্রধানত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ মধ্যবিত্তরা এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কুশারীবংশীয় ব্রাহ্মণ বলেও পঞ্চানন গোবিন্দপুরে বাস করা বাঞ্ছনীয় মনে করতে পারেন। এ ছাড়া সাহেবদের কুঠি, কেল্লা, মালগুদাম ও জাহাজঘাট কাছে বলেও তাঁর গোবিন্দপুরে বাস করার ইচ্ছা হতে পারে। শোভাবাজারের মহারাজা

৪ C. R. Wilson: The Early Annals of the English in Bengal, Vol. I.

৫ Benoy Ghose: "Some Old family-founders in 18th century Calcutta, The Setts of Sutanuti"—in *Bengal: Past and Present*, Vol. LXXIX, Part I, January-June 1960.

৬ Fort William General, dated 31 December 1706 (MS. Records).

নবকৃষ্ণের পিতা, কুমোরটুলির গোবিন্দরাম মিত্র, এঁরা পঞ্চাননের সময়ে, কিছু আগে বা পরে, কলকাতার গোবিন্দপুর অঞ্চলে এসেছিলেন। অর্থ উপার্জনের জন্য যাঁরা তখন কলকাতায় আসতেন তাঁরা হয় কোম্পানির কলকাতার জমিদারীর কাজকর্ম, না হয় ব্যবসাবাণিজ্য করতেন। কাপড়চোপড় ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা তখনও কুলবৃত্তি হিসেবে প্রধানত বিভিন্ন বণিকজাতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থরা তখন জায়গাজমির পত্তনি, বাজারঘাট ও নিমকমহলের ইজারাদারী, জাহাজের বিদেশী নাবিক ও লস্করদের জিনিসপত্তর সরবরাহ অথবা বেনিয়ানগিরি করতেন। পঞ্চানন এর মধ্যে জাহাজের ক্যাপ্টেন ও খালাসীদের মাল-সরবরাহের কাজটি বেছে নিয়েছিলেন শোনা যায়। এতে বিলক্ষণ দু'পয়সা রোজগার হত এবং জাহাজের ক্যাপ্টেন ধরার জন্য ব্যবসায়ীদের যে আগ্রহ প্রকাশ পেত তাই থেকে নাকি পরে 'কাপ্তেন পাকড়াও' কথা শহরে চালু হয়েছে এবং শহরের বাবুরাও 'কাপ্তেন' নামে অভিহিত হয়েছেন। ইংরেজ ক্যাপ্টেন, খালাসী ও বণিক মহলে পঞ্চানন 'ঠাকুর' বলে পরিচিত হন। আমাদের দেশে সাধারণ লোক ব্রাহ্মণকে 'ঠাকুর মশাই' বলে সম্বোধন করে থাকেন। গোবিন্দপুরের সাধারণ গ্রামবাসীর কাছে পঞ্চানন কুশারীর 'ঠাকুর মশাই' নামটি ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, এবং এই 'ঠাকুর' কথাটি ইংরেজদের মুখে 'Tagore' হয়ে যায়। এর মধ্যে কতটুকু কাহিনী আর কতটুকুই বা ইতিহাস তা বলা কঠিন। তবে পঞ্চাননের কালের দিক থেকে বিচার করলে কলকাতা শহরে তাঁর পেশা ও পদবীর রূপান্তর কোনটাই খুব অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

'পঞ্চাননাজ্জয়রামঃ জয়রামান্নীলমণিঃ'। পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম কলকাতায় ইংরেজদের জমিদারী কাছারীতে কাজ করতেন। কলকাতা কলেক্টরেটের দলিলপত্রে কোথাও জয়রামের নাম পাওয়া যায় না, পাওয়া সম্ভবও নয়। কলকাতার জমিদারীতে তখন গোবিন্দরাম মিত্রের অসাধারণ প্রতিপত্তি, ইংরেজের অধীনে 'ব্ল্যাক ডেপুটি' হিসেবে আসলে তিনিই জমিদারীর তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁর প্রতাপে কলকাতা-সুতানুটি-গোবিন্দপুরের লোক কাঁপত, 'গোবিন্দরামের ছড়ি' প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। কাছারীতে এদেশের লোক নায়েব, গোমস্তা, আমিন, রাজস্ব-আদায়কারী প্রভৃতি নানা রকমের চাকরি পেতেন। জয়রাম গোবিন্দরামের সমসাময়িক ছিলেন বলে মনে হয় তাঁর পক্ষে কলকাতার জমিদারী কাছারীতে কোনো কাজে নিযুক্ত থাকা অসম্ভব নয়। পলাশীর যুদ্ধের বছরখানেক আগে ১৭৫৬ সনে (ফারেল সাহেব ১৭৬২ সন বলেছেন) জয়রামের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুকালে দুই স্ত্রী, তিন পুত্র—দর্পনারায়ণ নীলমণি ও গোবিন্দরাম—এবং পৌত্ররা জীবিত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্লোকে কেবল 'জয়রামান্নীলমণিঃ' এবং 'নীলমর্ণেরামলোচনঃ' উল্লেখ করা হয়েছে, দর্পনারায়ণের নাম নেই। পরিষ্কার বোঝা যায় যে ঠাকুরপরিবারে দ্বারকানাথ-দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের শাখা নীলমণি থেকে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি শাখাকে দর্পনারায়ণের শাখা, আর একটিকে নীলমণি ঠাকুরের শাখা বলা যায়। দেবেন্দ্রনাথ এই কারণে জয়রাম-নীলমণি-রামলোচন-দ্বারকানাথের নাম পিতৃপুরুষের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। দর্পনারায়ণের শাখাকে পাথুরিয়াঘাটার এবং নীলমণির শাখাকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার বলা হয়।

পলাশীর যুদ্ধের পর পুরাতন কেল্লা তুলে দিয়ে নূতন কেল্লা নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। তার জন্য গোবিন্দপুর গ্রাম দখল করে স্থানীয় লোকজনদের কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে শহরের অন্য অঞ্চলে

স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতার ইংরেজ কর্তারা কোম্পানির ডিরেক্টরদের লেখেন: "আমরা গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে 'নেটিব' বাসিন্দাদের অন্যত্র তুলে দিতে বাধ্য হয়েছি, কারণ নূতন কেল্লা এই স্থানে তৈরি করা হবে ঠিক হয়েছে। ইটের পাকাবাড়ির মালিক যাঁরা তাঁদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলা হয়েছে। যাঁরা কাঁচা চালাঘরে থাকতেন তাঁদের অন্যত্র বসবাসের জমি দেওয়া হয়েছে এবং স্থানান্তরের খরচ বাবদ কিছু নগদ টাকাও দেওয়া হবে জানানো হয়েছে।"[৭] এই খবরটুকু ছাড়া গোবিন্দপুরের বাসিন্দারা কে কত জায়গাজমি ও নগদ টাকা পেয়েছিলেন, দলিলপত্র থেকে তা জানা যায় না। তবে ক্ষতিপূরণের জন্য উৎখাত বাসিন্দাদের যে অনেকদিন ধরে বোর্ডের কাছে লেখালেখি করতে হয়েছিল, সরকারী নথিপত্রের বিবরণ থেকে তা বোঝা যায়।[৮] জয়রাম ঠাকুর গোবিন্দপুরের ভদ্রাসন রেখেই গত হয়েছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু দর্পনারায়ণ ও নীলমণি তা ছেড়ে আসার জন্য কোম্পানির কাছ থেকে কত ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন কোথাও তার উল্লেখ নেই। তাঁদের বসতবাড়ি পাকা ছিল কিনা, এবং থাকলেও কত বড় ছিল তা অনুমান করা সম্ভব নয়। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থে নগেন্দ্রনাথ বসু পিরালী ব্রাহ্মণখণ্ডে ঠাকুরবংশের বিবরণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে জয়রাম মৃত্যুকালে ধনসায়েরের বাড়ি বাগান পুষ্করিণী বৈঠকখানা ব্যতীত নগদ টাকাও অনেক রেখে যান। কিন্তু এই উক্তির কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ তিনি দেন নি। ধনসায়েরই বা কোথায়? ধর্মতলা? আঠারো শতকের মধ্যভাগে কলকাতায় ধর্মতলা অঞ্চলে 'ধনসায়ের' নামে কোনো জায়গা ছিল বলে জানা যায় না। ভদ্রাসনের নাম হতে পারে, 'সায়র' বা সরোবর-দীঘি হতে পারে, কিন্তু তারই বা প্রমাণ কি? ১৭৫৭ সনের শেষে গোবিন্দপুরের বসতি তুলে দেওয়া হয়, কারণ এই বিষয়ে কোম্পানির কাছে লেখা পূর্বোক্ত চিঠির তারিখ ১০ জানুয়ারি, ১৭৫৮। জয়রামের মৃত্যুর অল্পদিন পরের ঘটনা। কাজেই দর্পনারায়ণ ও নীলমণি যদি কোনো বসতবাড়ি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়ে থাকেন তা হলে সেটা গোবিন্দপুরে হওয়াই সম্ভব। এই সময় শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ, কুমোরটুলির গোবিন্দরাম মিত্র এবং আরও অনেক দর্পনারায়ণ-নীলমণির সমসাময়িক ব্যক্তি উত্তর-কলকাতায় সুতানুটি অঞ্চলে নূতন ভদ্রাসন নির্মাণ করে গোবিন্দপুর থেকে উঠে আসেন।

ঠাকুরদের মধ্যে দু'জন অবশ্য কয়েক হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন কোম্পানির কাছ থেকে, কিন্তু সেটা মনে হয় নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে কলকাতায় ইংরেজদের যুদ্ধের ফলে (১৭৫৬) যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তারই পূরণস্বরূপ। যাঁরা এই ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিখ্যাত পিতা-পুত্র গোবিন্দরাম মিত্র ও রঘু মিত্র (প্রায় ৪ লক্ষ টাকা পান), শোভারাম বসাক (প্রায় ৪ লক্ষ), রতু (রতন) সরকার (প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার), শুকদেব মল্লিক ও নয়ান মল্লিক (প্রত্যেকে

৭ Letter to Court, January 10, 1758, para 110—"We have been obliged to remove all the Natives out of Govindpore, where the new citadel will stand, the brick houses having been valued in the most equitable manner, and when reported to the Board, will be paid for; those who dwelt in thatched houses have had a consideration made them for the trouble and expense of removing, and have been allowed ground in other parts of the town and outskirts to settle in."

৮ Proceedings, 1760 onwards, also Rev. Long's Selections from Unpublished Records, 1748-1767.

প্রায় ৪০ হাজার), নীলমণি ও হরিকিষণ ঠাকুর (যথাক্রমে ১৮ হাজার ও ১০ হাজার)।[৯] হরিকিষণ ঠাকুর নীলমণি ও দর্পনারায়ণের ভাই হতে পারেন। বংশলতায় সব নাম নেই ঠাকুরবংশের এমন অনেক নাম পুরাতন দলিলপত্রে পাওয়া যায়।

১৭৫৮-৫৯ সনে কোনো সময় দর্পনারায়ণ ও নীলমণি ঠাকুর উত্তর কলকাতায় পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠা করে বাস করতে আরম্ভ করেন। নগেন্দ্রনাথ বসু কয়েকটি দলিল (বিক্রয়-কোবলা, পাট্টা ইত্যাদি) উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে ১৭৬৪ সনে নীলমণি ঠাকুর সুতানুটি গ্রামে কলকাতা কালেক্টরীর জব্দজমি থেকে দু'বিঘে তের কাঠা জমি সালিয়ানা ৭৬/৪ গণ্ডা সিক্কামুদ্রা খাজনায় পাট্টা করে নেন। এর কয়েক মাস পরে তিনি ডিহি কলকাতার প্রান্তে জনৈক রামচন্দ্র কলুর কাছ থেকে ৫২৫৲ টাকায় ঘরবাড়িসহ সাড়ে দশকাঠা জমি নিজের নামে কেনেন। তারপর ১৭৬৯ সনে এই সব জমির সংলগ্ন আরও দু'বিঘে সাতকাঠা জমি বসতবাড়িসহ তিনি জনৈক জগমোহন সাহার কাছ থেকে ৯০০০৲ টাকায় কেনেন। এইসব জমি জুড়ে পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুরপরিবারের বাসস্থান গড়ে ওঠে।

এই সময় পাথুরিয়াঘাটায় দর্পনারায়ণ ও নীলমণি ঠাকুরের ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও, সমাজে তাঁদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে মনে হয় না। ব্যবসাবাণিজ্য বা চাকরিবাকরি করে তাঁরা তখন পর্যন্ত হয়ত প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেন নি। কারণ ১৭৬০ সন থেকে ১৭৭০-৭৫ সন পর্যন্ত দর্পনারায়ণ বা নীলমণির নাম কোনো সরকারী নথিপত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না, কেবল পূর্বোক্ত ক্ষতিপূরণের তালিকায় (১৮ সেপ্টেম্বর, ১৭৫৮) হরিকিষণ 'Tagoor'-এর সঙ্গে 'নীলমণি' নামটি ছাড়া। অথচ ১৭৬০ সন থেকে দলিলপত্রে বিবিধ প্রসঙ্গে একাধিক ঠাকুরের নাম পাওয়া যায়, যেমন ভবানীচরণ ঠাকুর, বিশনারায়ণ ঠাকুর, দয়ারাম ঠাকুর, হরিকিষণ ঠাকুর, কেবলরাম ঠাকুর ইত্যাদি। চব্বিশ-পরগণার জমিদারী নিয়ে ইংরেজরা যখন টাউন-হলে নিলাম ডেকে তার ইজারা দেন তখন ভবানীচরণ ঠাকুর (বলরাম বিশ্বাসের সঙ্গে) পিচাকুলির জমিদারী ৩৩,৪০০৲ টাকায় ডাক দিয়ে কেনেন (৩১ জুলাই ১৭৬০)।[১০] গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র রাধাচরণ মিত্র কোন প্রতারণার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তখনকার ইংরেজদের দণ্ডনীতির সঙ্গে আমাদের দেশীয় দণ্ডনীতির গুরুতর পার্থক্যের ফলে সমাজে রীতিমত বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়েছিল। মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি তার বড় দৃষ্টান্ত। রাধাচরণের ফাঁসির হুকুম হলে কলকাতার সম্ভ্রান্ত বাঙালী ও অবাঙালী বাসিন্দারা দণ্ড মকুব করার জন্য আবেদন করেছিলেন (২৯ জানুয়ারি ১৭৬৬)। আবেদনপত্রের ৯৫ জন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে পূর্বের ভবানীচরণ ছাড়া বাকি ছ'জন ছিলেন ঠাকুরবংশের।[১১] এঁদের মধ্যে নীলমণি বা দর্পনারায়ণ কারও নাম না থাকাতে মনে হয় যে ঠাকুরগোষ্ঠীর মধ্যেই এই দুই ভাই তখনও প্রধান হয়ে ওঠেন নি।

১৭৭৫-৭৬ সন থেকে বিভিন্ন নথিপত্রে দর্পনারায়ণ ঠাকুরের প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে তখন তিনি যে খুবই গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। নীলমণি ঠাকুর

৯ Consultations, September 18, 1758; Long: op. cit, p. 149.

১০ Proceedings, July 31, 1760; Long: op. cit, p. 205.

১১ Proceedings, January 29, 1766; Long: op cit, p. 430.

ব্যবসায়ী ছিলেন না, থাকলেও তাঁর ভাইয়ের মত প্রতিষ্ঠা পান নি। মনে হয় সরকারী জমিদারী বিভাগে অথবা কোন বাণিজ্যকুঠিতে তিনি বাঁধা মাইনের চাকরি করতেন। নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন যে নীলমণি সেরেস্তাদারের কাজ করতেন এবং উড়িষ্যায় থাকতেন। তা হতে পারে এইজন্য যে দর্পনারায়ণের সমসাময়িক দলিলে ব্যবসাবাণিজ্য অথবা বিষয়সম্পত্তি কেনাবেচার ব্যাপারে কোথাও নীলমণি ঠাকুরের নাম নেই। দর্পনারায়ণ কলকাতায় থেকে ব্যবসাবাণিজ্য করতেন এবং নীলমণি বাইরে কোম্পানির জমিদারীতে চাকরি করতেন, একথা সত্য বলেই মনে হয়।

বৈদেশিক বিভাগের নথিপত্রে দর্পনারায়ণ ঠাকুর—"Who made his fortune as Dewan to Mr. Wheeler and in the Pay Office of that time"—বলা হয়েছে।[১২] কিন্তু এইটুকু পরিচয় তাঁর যথেষ্ট নয়। কলকাতার 'রেভিনিউ কমিটি', 'রেভিনিউ বোর্ড' এবং সম্পত্তির 'লীজ-ডীডের' দলিলপত্র থেকে তাঁর বিষয় যা জানা যায় তাতে মনে হয় রামদুলাল দে-সরকার, মদন দত্ত প্রভৃতির মত তিনি সেকালে অসাধারণ কর্মী পুরুষ ছিলেন। কোথাও তাঁকে বলা হয়েছে 'বেনিয়ান', কোথাও 'merchant of Calcutta', কোথাও বা নিমক ও বাজারের ইজারাদার ও জমিদারীর পত্তনিদার। জানবাজার অঞ্চলে দর্পনারায়ণ অনেক ভূ-সম্পত্তি কিনেছিলেন, সেখানে বেশ বড় বাজার বসিয়েছিলেন।[১৩] চব্বিশ-পরগণায় নিমকের এজেন্টদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।[১৪] নদীয়ার কৃষ্ণনগরের মহারাজা শিবচন্দ্রকে একবার তিনি, বারাণসী ঘোষ ও রামশঙ্কর হালদার মিলে বকেয়া সরকারী রাজস্ব পরিশোধ করার জন্য প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিলেন। সেই টাকা মহারাজা শিবচন্দ্র পরিশোধ করতে পারেননি বলে কমিটির কাছে তাঁরা আবেদন করেছিলেন যে তাঁর মাসহারা থেকে মাসিক কিস্তীতে যেন ঋণ শোধ করার ব্যবস্থা করা হয় এবং কমিটি আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন।[১৫] চব্বিশ-পরগণার বড় বড় ইজারাদারদের জামিন হতেন দর্পনারায়ণ, আর্থিক জগতে তাঁর এত সুনাম ও প্রতিপত্তি ছিল।[১৬] এত বড় কর্মী পুরুষ যিনি ছিলেন তাঁকে শুধু হুইলার সাহেবের দেওয়ান ও পে-আফিসের কর্মচারী বলে পরিচয় দিলে কিছুই বলা হয় না। বিষয়-সম্পত্তিও কলকাতায় তিনি যথেষ্ট কিনেছিলেন। রাধাবাজার, তালতলা বাজার প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর সম্পত্তি ছড়িয়ে ছিল।[১৭] এ ছাড়া পরগণা উত্তর শ্রীপুরে (রাজশাহী জমিদারীর অধীন) বাৎসরিক ১৩,০০০৲ টাকা নীট আয়ের প্রায় ২৪৯ বর্গমাইল ব্যাপী বিরাট জমিদারীও তিনি ৯১,৫০০৲ টাকায় কিনেছিলেন।[১৮]

দর্পনারায়ণ ঠাকুরের সাতপুত্রের মধ্যে গোপীমোহন ঠাকুরের বৈষয়িক বুদ্ধি পিতার মতই প্রখর ছিল। তখনকার দিনে কলকাতার বৈঠকখানা বাজার, তালতলা বাজার, ধর্মতলা বাজার, জানবাজার, মেছুয়াবাজার,

---

১২ Foreign Department Miscellaneous Records (MS), 1839, Vol. 131.

১৩ Calcutta Committee of Revenue, Proceedings, July 1781, Nos. 52, 74; September 1781, No. 16.

১৪ Calcutta Committee of Revenue, Proceedings, February 1776, p. 262; February 15, 1776, p. 510-11; June 21, 1776, p. 1490-2.

১৫ Calcutta Committee of Revenue, Proceedings, January 24, 1782, Nos. 3, 4, pp. 214 17.

১৬ Calcutta Committee of Revenue, Proceedings, December 1777, p. 246.

১৭ Leases and Deeds, Vols. II and III; No. 627, 26 and 27 August 1783; No. 709, 1784.

১৮ James W. Furrell: The Tagore Family—A Memoir, London, 1882, pp. 62-63.

সুতানুটি বাজার প্রভৃতি বাজার-হাট ইজারা নেওয়া, কোম্পানির অনুমতি নিয়ে (বিনা অনুমতিতেও) নূতন হাট-বাজার পত্তন করা, কলকাতা শহরের ধনবান লোকদের একটা বড় ব্যবসা ছিল। বাজার ইজারা নিয়ে অথবা পত্তন করে তাঁরা নানারকমের দোকান প্রতিষ্ঠার ও জিনিসপত্র বেচাকেনার ব্যবস্থা করে দিতেন, কোম্পানির কর্তাদের একটা নির্দিষ্ট টাকা দিতে হত, বাকি যা আয় হত তা তাঁরা নিজেরা ভোগ করতেন। গোবিন্দরাম মিত্র ও মহারাজা নবকৃষ্ণ থেকে রাধাকান্ত দেব, দর্পনারায়ণ ও গোপীমোহন ঠাকুর, মদন দত্ত, বারাণসী ঘোষ এবং আরও অনেকে কলকাতার বাজার থেকে বিলক্ষণ অর্থ উপার্জন করেছেন। দর্পনারায়ণের জানবাজারের বাজারের কথা বলেছি, গোপীমোহন ঠাকুর নূতন চীনাবাজারের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান লায়ন্স রেঞ্জের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রায় ৫ বিঘে ১৯ কাঠা ১২ ছটাক জমির উপর একদা (১৭৭৫ সনে) একটি রঙ্গালয় স্থাপিত হয়েছিল, 'নিউ থিয়েটার' বলা হত। পরে জনৈক রোওয়ার্থ সাহেব সেখানে একটি নিলেমকুঠি স্থাপন করেন। 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপনে (১৮০৮ সন) দেখা যায় যে এই বিস্তৃত ভূসম্পত্তি গোপীমোহন ঠাকুর কিনে নিয়েছিলেন নূতন বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য—"Known by the name of the New China Bazar, most of the shop-keepers of the Old China Bazar having agreed to remove their shops to the above mentioned buildings···on which very large investments and various other valuable articles have been purchased." ১৮০৮ সনের ২০ নভেম্বর এই নূতন চীনাবাজার খোলা হবে বলে পত্রিকায় 'নোটিশ' দেওয়া হয়েছিল এবং জানানো হয়েছিল যে সেখানে "Europe and other articles of every description will be found for sale."[১৯] গোপীমোহন এই চীনাবাজারের জন্য কতটা পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করেছিলেন এবং কতটাকা মুনাফা করতেন তার হিসেব না পাওয়া গেলেও কল্পনা করতে বাধা নেই।

নীলমণির কয় পুত্র ছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন রামলোচন রামমণি ও রামবল্লভ নামে তাঁর তিন পুত্র ছিল (নগেন্দ্রনাথ বসু ও ফারেল)। কারও মতে তাঁর পাঁচ পুত্র ছিল—রামতনু, রামরতন, রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ।[২০] কলকাতার বিষয়সম্পত্তি কেনাবেচার ব্যাপারে রামরতন ঠাকুরের নাম পুরাতন লীজ-ডীডের দলিলে দেখা যায়, কিন্তু তাঁর অন্য কোন ভাইদের, অর্থাৎ নীলমণির অন্য কোন পুত্রদের কোন বৈষয়িক খবর কিছু পাওয়া যায় না।[২১] এতে মনে হয় যে বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্য দর্পনারায়ণ নিজে ও তাঁর পুত্ররা অন্তত কলকাতা শহরে যতটা উদ্‌যোগী ছিলেন, নীলমণি বা তাঁর পুত্ররা তা ছিলেন না। নিমকের এজেন্সী, দেওয়ানী বা বেনিয়ানী, কলকাতার হাটবাজারের ইজারাদারী অথবা এই ধরনের কোন কাজকর্ম করে যদি তাঁরা প্রতিষ্ঠা পেতেন তা হলে রেভিনিউ কমিটি বা রেভিনিউ বোর্ডের কাগজপত্রে কোথাও তাঁদের নামের উল্লেখ থাকত।

নীলমণি উড়িষ্যায় সেরেস্তাদারের চাকরি থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে কলকাতায় যথেষ্ট ভূসম্পত্তি কিনেছিলেন, একথা নগেন্দ্রনাথ বসু উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি কলকাতায় থাকতেন না বলে তাঁর ভাই

১৯ Calcutta Gazette, 1st November 1808.

২০ Loke Nath Ghose: The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars etc., Part II, Calcutta, 1881—"The Tagore Family", pp. 160-223.

২১ Leases and Deeds, Vol. I, No. 144, 16 January 1781.
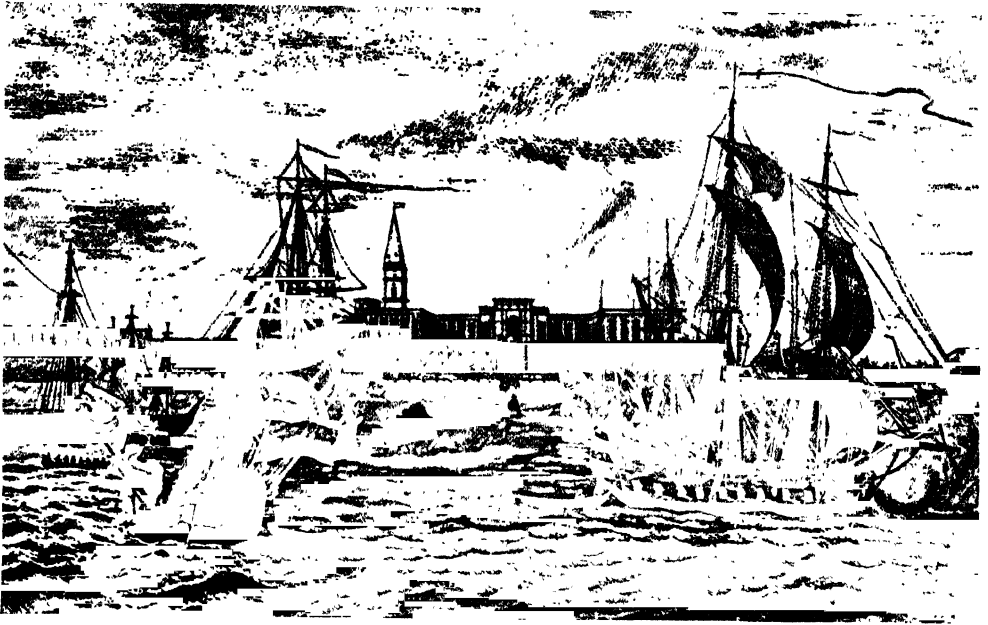
ফোর্ট উইলিয়াম। ১৭৩৬
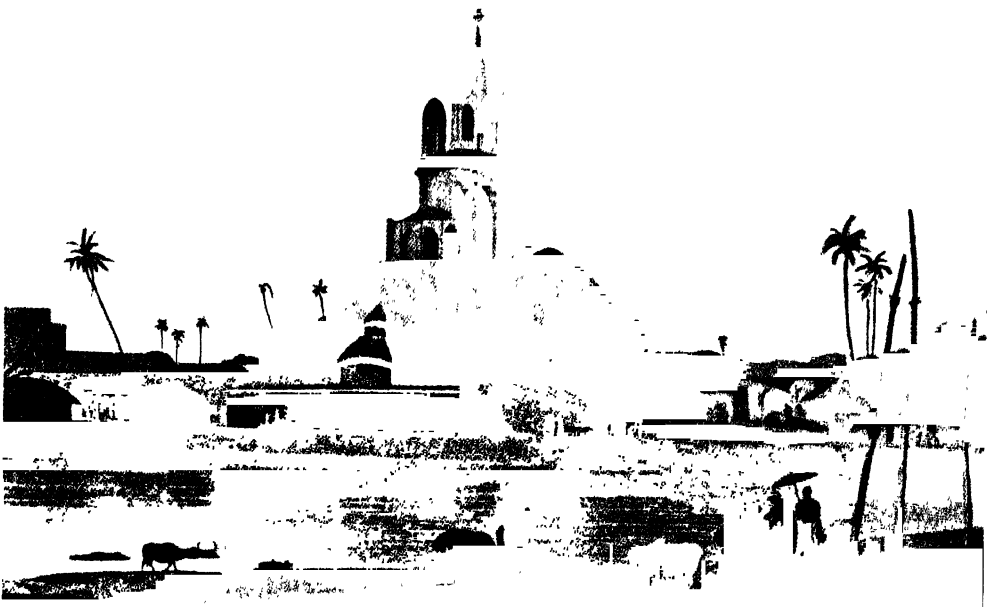
এসপ্লানেড । ১৮৩৮

দর্পনারায়ণকে পারিবারিক কর্তব্য পালন করতে হত। উপার্জিত অর্থ নীলমণি তাঁর ভাইয়ের কাছে কিছু কিছু গচ্ছিত রাখতেন। দুই ভাই এইভাবে যখন নিজেদের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করছিলেন তখন ঘটনাচক্রে তারা এক পারিবারিক সংকটের সম্মুখীন হন। সংকট ঘনিয়ে ওঠে তাঁদের পরলোকগত ছোটভাই গোবিন্দরামের বিধবা পত্নী রামপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পৃথক হবার ইচ্ছা থেকে। সম্পত্তি বিভাগের জন্য তিনি সুপ্রীমকোর্টে নালিশ করেন। তার ফলে একান্নবর্তী ঠাকুরপরিবার তিনটি শাখায় ভাগ হয়ে যায়, দর্পনারায়ণ ও নীলমণিও ভিন্ন হতে বাধ্য হন। পাথুরিয়াঘাটার বাড়ি ও পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন দর্পনারায়ণ, আর নীলমণি নিজের অংশের বদলে নগদ একলক্ষ টাকা নিয়ে মিটমাট করে নেন। পৈতৃক বিগ্রহের মধ্যে দর্পনারায়ণ রাধাকান্তের সেবার ভার পান এবং নীলমণি লক্ষ্মীজনার্দন শিলার সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কলকাতার আদিবাসিন্দা শেঠ-বসাকদের বিস্তীর্ণ বাগান ছিল উত্তর-কলকাতায়। এই বাগানকেই 'জোড়াবাগান' বলা হত। নীলমণি ঠাকুর নূতন ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠার জন্য শেঠবংশীয় বিখ্যাত ব্যবসায়ী বৈষ্ণবচরণের কাছ থেকে জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বাসের জমি লক্ষ্মীজনার্দন শিলার নামে গ্রহণ করেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাস থেকে জোড়াসাঁকোর ভদ্রাসনে নীলমণি-শাখার ঠাকুর পরিবারের বাসের সূত্রপাত হয়।[২২] জোড়াসাঁকো অঞ্চল তখন মেছুয়াবাজারের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু জোড়াসাঁকো নামটিও তার কম প্রাচীন নয়। গ্রাম্যজীবনকালেই এখানে কোন পুষ্করিণী বা নালার উপর যাতায়াতের জন্য একজোড়া সাঁকো ছিল বলে স্থানীয় লোকের কাছে জোড়াসাঁকো নামেই তা পরিচিত ছিল। এই কারণে এরকম পরিচয় গ্রামাঞ্চলে এখনও অনেক স্থানের আছে। উইলসনের বিবরণ থেকে মনে হয় যে শেঠদের যে পুরাতন বাগান ছিল এই অঞ্চলে তার নাম ছিল 'জোড়া বাড়ি বাগ'। অর্থাৎ একজোড়া বাড়িসহ বাগান ছিল এবং তার জন্যই অঞ্চলটির নাম হয়েছিল 'জোড়াবাগান'।[২৩] ১৭৪২ সনে ফোর্ট উইলিয়ামের প্রেসিডেন্ট ও গবর্নরের কাছে সেনাবিভাগ থেকে একটি রিপোর্ট দাখিল করা হয় কলকাতা শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করার জন্য। তাতে কলকাতার নগর-এলাকার মধ্যে সাতটি অঞ্চলে কামান স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। তার মধ্যে শেঠদের জোড়াবাগানে ছয়-কামানের একটি ব্যাটারি স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কলকাতা শহরের কয়েকটি অতিপ্রাচীন মানচিত্র ও নক্সা আছে। তার মধ্যে একটি নক্সায় (*Plan of Calcutta*, by Forresti and Clifres, 1742) পঞ্চম ব্যাটারীর উল্লেখ আছে 'Batarie Zora Sako' বলে। উইলসন বলেছেন, "It is placed at what is now the junction of the Chitpur Road with Ratan Sircar Street, near Lala Babu's Bazar, below the Jora Sanko Police Station". এই উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে ১৭৪২ সনে তো বটেই, তার আগেও স্থানটির 'জোড়াসাঁকো' নাম খুব অপরিচিত ছিল না কলকাতার লোকের কাছে। ১৭৮০ সনের পর থেকে কলকাতার প্রাচীন পাট্টা-দলিলেও 'Jurah Saukoo' নামের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় (Deed No 1165, dated Ist February 1786)। নামটি নূতন হলে পাট্টা-দলিলে এইভাবে ব্যবহৃত হত না। 'জোড়াবাগান'

২২ নগেন্দ্রনাথ বসুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

২৩ Wilson: Early Annals etc., Vol. I, pp. 158-9.

নামে খ্যাত শেঠদের বাগান আঠারো শতকের আগে, এমন কি ইংরেজরা কলকাতায় কুঠিস্থাপনের আগে থেকেই যে প্রতিষ্ঠিত ছিল তার পরিষ্কার প্রমাণ আছে। ১৭০৭ সনে কৌন্সিলের সদস্যরা শেঠ-বাগানের খাজনা কমিয়ে দেন এই কারণে যে "they being possessed of the Ground which they made into Gardens before we had possession of the Towns".[২৪] কাজেই সপ্তদশ শতকের শেষদিকে শেঠ-বসাকরা যখন সুতানুটিতে সুতার হাট বসিয়ে ঐ অঞ্চলে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিলেন তার কিছু পর থেকে তাঁদের বাগানটিও গ'ড়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকে জোড়াবাগান ও জোড়াসাঁকো নাম কলকাতা শহরে পরিচিত হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়। তা হলে 'জোড়াসাঁকো' নামটি পঞ্চানন ঠাকুরের আমলেই পরিচিত হবার কথা এবং তার আঞ্চলিক পরিচিতি হয়ত দর্পনারায়ণ-নীলমণি শাখার ঠাকুরপরিবারের প্রতিষ্ঠার পর শহরময় পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

কিন্তু জোড়াসাঁকোয় নূতন ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠার পরেও নীলমণি ঠাকুর ও তাঁর পুত্রদের আমলে এই শাখার ঠাকুরপরিবারের খ্যাতি-প্রতিপত্তি যে কলকাতার সমাজে কতদূর বিস্তৃত ছিল তা বলা কঠিন। বৈদেশিক দফ্‌তরে বিবিধ বিষয়ের নথিপত্রের মধ্যে 'Principal Hindoo Inhabitants of Calcutta' নাম দিয়ে কতকগুলি পরিবারের বিবরণ দেওয়া হয়েছে (১৮৩৯ সন)।[২৫] তার মধ্যে শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণের পরিবার, রাজা সুখময় রায়ের পরিবার, মল্লিক পরিবার, পাইকপাড়ার গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পরিবার, দেওয়ান রামচন্দ্র রায়ের পরিবার, খিদিরপুরের গোকুল ঘোষাল ও জয়নারায়ণ ঘোষালের পরিবার এবং আরও অনেক পরিবার ও ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে ঠাকুরপরিবার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা লক্ষণীয়, এখানে তা অবিকল উদ্ধৃত করছি :

> Thakoors. This is an extensive and very rich family—the principal branch of it is that derived from Durop Nerayun Thakoor who made his fortune as Dewan to Mr. Wheeler and in the Pay Office of that time. He had seven sons. Ram Mohun Thakoor (deceased), Gopee Mohun Thakoor, who died in 1816 after having long been at the head of the family to the great increase of its wealth—Krishna Mohun Thakoor (insane), Peearee Mohun Thakoor (born dumb and now dead), Hurree Mohun Thakoor (living now in great respectability), Ladlee Mohun Thakoor Do and Mohunee Mohun Thakoor who died a year or two ago leaving an infant child. Gopee Mohun left six sons, whereof the eldest Soorj Koomar Thakoor died childless shortly after. Chundur Koomar, Kalee Koomar, Nund Koomar, Hurro Koomar and Prosunno Koomar Thakoors now represent this branch.

ঠাকুরবংশের এই বিবরণের মধ্যে নীলমণি ঠাকুরের পরিবারের কোন পরিচয় নেই। পরে "List of the rich Bengalee Gentlemen of Calcutta" বলে অঞ্চলভেদে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি তালিকাও

২৪ Consultations, 11 September 1707.

২৫ Foreign Department Miscellaneous Records, 1839, Vol. 131 (National Archives, New Delhi).

দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ললিতমোহন ঠাকুর (?), শ্যামলাল ঠাকুর ও কানাইলাল ঠাকুরের নাম ছাড়া আর কোন ঠাকুরের নাম নেই। মেছুয়াবাজার অঞ্চলে দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম সন্নিবেশিত হয়েছে :

Muchhoowa Bazar. Dowarakanath Thakoor, son of Rammunee Thakoor.

জোড়াসাঁকো অঞ্চলে দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের পৌত্রদের নাম, গৌরচরণ মল্লিকের পুত্র রূপলাল মল্লিক ও জমিদার শিবচরণ সান্ন্যালের পুত্র মধুসূদন সান্ন্যালের নাম আছে। নীলমণি-শাখার ঠাকুরপরিবারকে জোড়াসাঁকোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই শাখার শুধু দ্বারকানাথের নাম ছাড়া আর কোন নাম নেই এবং দ্বারকানাথও মেছুয়াবাজার অঞ্চল-ভুক্ত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ১৮২৩ সনে দ্বারকানাথের গৃহপ্রবেশ উৎসবের যে খবর সংবাদপত্রে ছাপা হয় তাতেও 'জোড়াসাঁকো' অঞ্চলের নাম নেই।

জোড়াসাঁকো সম্বন্ধে এত কথা বলার কারণ হল এই যে নীলমণি-শাখার ঠাকুরপরিবারের প্রসিদ্ধির সঙ্গে জোড়াসাঁকো যুক্ত হয়েছে অনেক পরে। 'মেছুয়াবাজার' বা 'মেছোবাজার' নামের কোন ধ্বনিমাধুর্য নেই, শোভাবাজার শ্যামবাজার বাগবাজার রাধাবাজার বৌবাজার বড়বাজার জানবাজার প্রভৃতি কলকাতার আরও অনেক বাজার-পদবীযুক্ত আঞ্চলিক নামের একটা যে সাধারণশ্রী আছে, মেছুয়াবাজার তা থেকেও বঞ্চিত। স্থান-মাহাত্ম্যের কতখানি যে নাম-মাহাত্ম্যের সঙ্গে জড়িত, ইতিহাসে সেটাও কম কৌতূহলের বিষয় নয়। মেছুয়াবাজার তার নিরাভরণ শ্রীহীন পরিচয়ের জন্য ঠাকুরপরিবারের কাছে উপেক্ষিত হয়েছে। মেছুয়াবাজারের দ্বারকানাথ জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ হয়েছেন, পুরাতন মেছুয়াবাজারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল বহু-পুরাতন জোড়াসাঁকোর মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। দ্বারকানাথের সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রবল টানে জোড়াসাঁকো নাম তার আঞ্চলিক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের আমলে দেশ থেকে দেশান্তরে পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ও ঠাকুরপরিবারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলতে হয় দ্বারকানাথ ঠাকুরকে।

দ্বারকানাথের জন্মের বছর তিন-চার আগে, ১৭৯০-৯১ সনে, নীলমণি ঠাকুরের মৃত্যু হয়। তিনি তাঁর পৌত্র ও বংশের অন্যতম কীর্তিমান পুরুষকে দেখে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র রামলোচন হন পরিবারের অভিভাবক। রামলোচনের পুত্রসন্তান ছিল না, তাই তিনি মধ্যম সহোদর রামমণির পুত্র দ্বারকানাথকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ঘটনাটি নিয়ে পরে একটি কিংবদন্তীও রচিত হয়। একদিন এক সন্ন্যাসী রামলোচনের গৃহে ভিক্ষা করতে আসেন। রামলোচনের স্ত্রী ভিক্ষা নিয়ে এলে শিশু দ্বারকানাথকে খেলা করতে দেখে তিনি তাঁকে বলেন, "মা—এই শিশুটি তোমার খুব সুলক্ষণযুক্ত; এ তোমাদের বংশের গৌরব হবে, ধনদৌলত মানসম্ভ্রম বাড়াবে, কৃতী ও যশস্বী পুরুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবে।" সন্ন্যাসীর কথা শুনে স্বামীর সম্মতিক্রমে ১৭৯৯ সনে রামলোচন-পত্নী দেবরপুত্র দ্বারকানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। বোঝা যায়, দ্বারকানাথের সামাজিক প্রতিষ্ঠার পরে কিংবদন্তীটি রচিত হয়েছে এবং তার নায়ক হয়েছেন যথারীতি একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।

জ্যেষ্ঠতাত রামলোচনের স্বোপার্জিত সম্পত্তি ও পৈতৃক সম্পত্তির অংশ দ্বারকানাথ পেয়েছিলেন সত্য, আর্থিক অভাব-অনটনের মধ্যে তিনি মানুষ হননি। ঐশ্বর্যের মধ্যেই দ্বারকানাথ ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। পথের

ধুলো থেকে তাঁকে কিছু গড়ে তুলতে হয়নি। কিন্তু কেবল এই পৈতৃক ঐশ্বর্যের জোরে দ্বারকানাথ 'প্রিন্স' বলে সমাজে পরিচিত হননি। ঠাকুরপরিবারের পঞ্চানন থেকে দর্পনারায়ণ-গোপীমোহন, নীলমণি-রামলোচনের ধারায় দ্বারকানাথ প্রথম নূতন পথ খুলে দেন। তাঁর বহুমুখী উদ্যম ও কর্মশক্তি সেই নূতন প্রবাহপথে বিচিত্র তরঙ্গের সৃষ্টি করে। পশ্চিম থেকে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বহু জমিদারীর মালিক হন তিনি, তাঁর পৌত্র রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলীতে যে-সব জমিদারীর অপূর্ব প্রাকৃতিক বর্ণনা আছে। এই সব জমিদারী অধিকারের ও তত্ত্বাবধানের ইতিহাস বিচ্ছিন্ন সরকারী দলিলপত্রে টুক্‌রো হয়ে রয়েছে। টুক্‌রোগুলি জোড়া দিলে দ্বারকানাথের বিচিত্র কর্মপ্রতিভার একটা দিকের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। অথচ একথাও ঠিক যে সেকেলে জমিদার বলতে সমাজের একটি অন্ধকার কোণ থেকে যে-ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে দ্বারকানাথ সেই শ্রেণীর জমিদার ছিলেন না। প্রতাপের দিক থেকে নয়, চরিত্র ও প্রবৃত্তির দিক থেকে। প্রতাপ তাঁর হয়ত কোন প্রবল প্রতাপশালী জমিদারের চাইতে কম ছিল না, কিন্তু মন তাঁর 'বারো ভুঁইয়াদের' জমিদারীর যুগ অতিক্রম করে নিঃসন্দেহে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। মৃত স্বর্ণপিণ্ডের মত অসাড় অচৈতন্য মূলধনকে (Capital) তিনি মুক্ত বলাকার প্রাণাবেগে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন, ভূসম্পত্তির গর্ভে নিশ্চিন্তে সমাধিস্থ করতে চাননি। কিন্তু পরাধীন দেশের ঔপনিবেশিক পরিবেশে তা সম্ভব হয়নি। তাই দ্বারকানাথের মূলবন ইংরেজের অভিশাপেই শেষ পর্যন্ত আবার মাটিতেই মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তবু তার বন্ধনমুক্তির ডানা-ঝাপ্‌টানি দেখলে হতবাক হয়ে যেতে হয়। নীলক্ষেত আর নীলকুঠি থেকে আরম্ভ করে চিনির কারখানা, কয়লার খনি, বাষ্পীয় পোত, ব্যাঙ্ক, এজেন্সি হাউস, সংবাদপত্র, নাট্যশালা, সর্বত্র দ্বারকানাথ সাহস করে তাঁর মূলধন বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। পঞ্চানন ঠাকুরের 'ক্যাপ্টেন পাকড়ানো', জয়রাম ঠাকুরের আমিনী, দর্পনারায়ণ ঠাকুরের নিমক মহলের ও হাটবাজারের ইজারাদারী, নীলমণি ঠাকুরের সেরেস্তাদারী, গোপীমোহনের চীনাবাজার, রামলোচন-রামমণির স্থির বিষয়বুদ্ধি, সব একত্র করলেও দ্বারকানাথের দুরন্ত উদ্যম ও অভিযানের কাছে হার মেনে যায়। দ্বারকানাথের জীবনটাকে মনে হয় একটা রূপকথার মত। জীর্ণ দলিলপত্রের মধ্যে আজও তার অধিকাংশই চাপা পড়ে রয়েছে। যদি তা উদ্ধার করা যায় তা হলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের বিচিত্র-গামী প্রতিভার আসল উৎসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।[২৬]

---

২৬ কিশোরীচাঁদ মিত্রের লেখা ইংরেজীতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে—*Memoir of Dwarkanath Tagore*, Calcutta 1870. দ্বারকানাথের আসল কর্মজীবন ও কীর্তিকথার বিবরণ বিশেষ কিছু এই গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অপ্রকাশিত চিঠি থেকে মনে হয়, দ্বারকানাথের এই টুক্‌রো জীবনকথা কিশোরীচাঁদ লিখেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে। হাতের কাছে পারিবারিক সংগ্রহে দ্বারকানাথ সম্বন্ধে যেসব কাগজপত্র ও স্মৃতিচিহ্ন ছিল দেবেন্দ্রনাথ সেইগুলি কিশোরীচাঁদকে দিয়েছিলেন এবং লেখার জন্য পারিশ্রমিক দিতেও সম্মত হয়েছিলেন। কিশোরীচাঁদ নিজে এবিষয়ে তথ্যাদি অনুসন্ধান করেছিলেন বলে মনে হয় না। সেই কারণে তাঁর লেখা জীবনীটি কতকগুলি প্রশংসাপত্রের সমষ্টি হয়েছে মাত্র, দ্বারকানাথের প্রকৃত জীবনবৃত্তান্ত হয়নি।

লোকনাথ ঘোষের "Indian Chiefs, Rajas, Zamindars etc" বইখানি (দুইখণ্ড) এবং Furrell-এর লেখা "The Tagore Family" কলকাতা ও লণ্ডন থেকে একই সময়ে (১৮৮১-৮২ সনে) প্রকাশিত হয়। ঘোষ ও ফারেল উভয়েই কিশোরীচাঁদ সম্বল করার ফলে ঠাকুরপরিবারের ইতিহাসে অনেক ফাঁক থেকে গেছে এবং ভুলভ্রান্তিও আছে। সংশোধন ও সুসম্পূর্ণ করার উপায় হল সরকারী নথিপত্র ও সমসাময়িক পত্রিকাদি তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করা।

জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথের গৃহপ্রবেশ-উৎসবে সেদিন ইংরেজ ও বাঙালীর মিলন-মিশ্রণে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মিলন সূচিত হয়েছিল। কেবল জোড়াসাঁকোয় নয়, বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতেও এই মিলনের উৎসব হত ঘন ঘন, দ্বারকানাথের উদারতা ও ঐশ্বর্যের প্রকাশে দেশ-বিদেশের মানুষ বিস্মিত হত। মনে হয় যেন দ্বারকানাথের নিজের জীবনটাও ছিল একজোড়া সাঁকোর মত। একটি সাঁকো দিয়ে বাইরের বা পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা আচার-প্রথা ভিতরে আসত, আর একটি সাঁকো দিয়ে স্বদেশের ভাবধারা ঐতিহ্য আচার-প্রথা বাইরে যেত। দুই সাঁকোর উপর দিয়েই গতি ছিল অবাধ। সহযোগী রামমোহনের মত দ্বারকানাথও অস্তগামী মধ্যযুগ ও উদীয়মান নবযুগের সন্ধিক্ষণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সংস্কৃতিধারার মধ্যে বিশাল একটি সাঁকোর মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের উত্তরাধিকারীরা পরবর্তীকালে এই বিশ্ব-ভারত-বাংলার সাংস্কৃতিক সাঁকোর বন্ধন আরও দৃঢ় করেছেন।

প্রবোধচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'অভিলাষ'। এটি প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৭৯৬ শকের অগ্রহায়ণ (১৮৭৪ নবেম্বর-ডিসেম্বর) মাসে, কিন্তু অনামে। তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত কবিতার নাম 'হিন্দুমেলায় উপহার', ১৮৭৫ ফেব্রুআরি ১১ তারিখে হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে বালককবি-কর্তৃক স্মৃতি থেকে আবৃত্ত এবং পরবর্তী ২৫ ফেব্রুআরি (১২৮১ ফাল্গুন ১৪) তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত, সনামে। এটাই সনামে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা। তাঁর তৃতীয় প্রকাশিত কবিতা 'প্রকৃতির খেদ'। এটি প্রথমে আংশিকভাবে পঠিত হয় 'বিদ্বজ্জনসমাগম' সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে ১২৮২ সালের বৈশাখ মাসে, সম্ভবতঃ ২০ তারিখে। অতঃপর এটি সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয় 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় উক্ত বৈশাখ মাসের শেষ দিকে, কিন্তু অনামে। তার কিছুকাল পরেই এটি কিছু পরিমার্জিতরূপে আবার প্রকাশিত হয় শক ১৭৯৭ আষাঢ় (১৮৭৫ জুন-জুলাই) সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, এবারও অনামে।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম প্রকাশিত কবিতাগুলির বিশেষ গুরুত্ব থাকায় এগুলি সম্বন্ধে (প্রত্যক্ষতঃ প্রথম ও তৃতীয়টি সম্বন্ধে এবং পরোক্ষে দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে) অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্যরচনাগুলির গুরুত্বও কম নয়। সমগ্রভাবে রবীন্দ্রসাহিত্য অনুধাবনের পক্ষে এই গদ্য রচনাগুলি আলোচনার সার্থকতা অস্বীকার করা যায় না।

প্রথমেই দেখা দরকার রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা কোন্‌টি। বাল্যকালে হিমালয়-বাসকালের স্মৃতিপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখেছেন—

> তিনি প্রক্টরের লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন ; আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম। —'জীবনস্মৃতি', হিমালয় যাত্রা

এ হচ্ছে ১৮৭৩ সালের বৈশাখ মাসের কথা। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স বারো বৎসর।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে (১৯০৪) বলা হয়েছে—

> রবীন্দ্রনাথ প্রক্টরের রচিত সহজপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থের সহজ অংশগুলি বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতেন। ইহাই তাহার বাঙ্গলা গদ্য রচনার সূত্রপাত। —সজনীকান্ত। 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য', পৃ ১৯৫

এই বিবরণটি সম্ভবতঃ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দেওয়া তথ্য অবলম্বনেই রচিত।

রবীন্দ্রনাথের এই জ্যোতিষবিষয়ক বাল্যরচনা কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল কিনা, উল্লিখিত দুটি উক্তির কোনোটিতেই সে সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত নেই। আমরা একটু পরেই দেখব রবীন্দ্রনাথ প্রায় সারাজীবনই এই ধারণা পোষণ করে গেছেন যে, রচনাটি তৎকালেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৭৩ সালের এপ্রিল-মে (১২৮০ বৈশাখ) মাসে হিমালয়ে ডালহৌসি পাহাড়ে বাসকালে রবীন্দ্রনাথ উক্ত জ্যোতিষবিষয়ক রচনাটি লেখেন। তার অল্প পরেই তিনি পিতার সঙ্গে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' নামে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (শক ১৭৯৫ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় আশ্বিন কার্তিক পৌষ মাঘ)। প্রবন্ধটিতে অভিজ্ঞ বিচক্ষণ

লেখকের পাকা হাতের পরিচয় সুস্পষ্ট। তা ছাড়া, তৎকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় জ্যোতিষবিষয়ক আর কোনো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নি। এ বিষয়ে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি (১৯৩৯ সালে) যে উত্তর দেন তা এই।—

> পিতৃদেবের মুখ থেকে জ্যোতিষের যে বিদ্যাটুকু সংগ্রহ করে নিজের ভাষায় লিখে নিয়েছিলুম সেটা যে তখনকার কালের তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে এই অদ্ভুত ধারণা আজ পর্যন্ত আমার মনে ছিল। এটার দুটো কারণ থাকতে পারে। এক এই যে, সম্পাদক বেদান্তবাগীশ মহাশয় ছাপানো হবে বলে বালককে আশ্বাস দিয়েছিলেন, বালক শেষপর্যন্ত তার প্রমাণ পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে নি। আর একটা কারণ এই হতে পারে যে, অন্য কোনো যোগ্য লেখক সেটাকে প্রকাশযোগ্য রূপে পূরণ করে দিয়েছিলেন। শেষোক্ত কারণটিই সংগত বলে মনে হয়। এই উপায়ে আমার মন তৃপ্ত হয়েছিল এবং কোনো লেখকেরই নাম না থাকাতে এতে কোনো অন্যায় করা হয় নি। এ না হলে এমন দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কার মনে থাকতে পারত না। ইতি ১৫।১০।৩৯
>
> —সজনীকান্ত। 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য', পৃ ১৯৬-৯৭

সুতরাং তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত এই লেখাটির মূল বাংলা রচনায় রবীন্দ্রনাথের কিছু হাত ছিল বলেই মনে করা যায়। কিন্তু তার ভাব বা বক্তব্যবিষয় সংগৃহীত তাঁর পিতার কাছ থেকে এবং রচনাটিও কোনো যোগ্য লেখকের দ্বারা প্রকাশযোগ্যরূপে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত। এই অবস্থায় এটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা বলে স্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ অল্পবয়সের এই জ্যোতিষবিষয়ক রচনাটি তখনকার কালে তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে, এই দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কার থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কখনও এটিকে তাঁর প্রথম গদ্য-রচনা বলে উল্লেখ করেন নি। বরং অন্য একটি প্রবন্ধকেই তাঁর প্রথম গদ্যরচনার সম্মান দিয়েছেন। তার কারণ এই লেখাটিতে ভাষার দিক্ থেকে তাঁর কিছু কর্তৃত্ব থাকলেও ভাবের দিক্ থেকে কিছুমাত্র স্বকীয়তা ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনার আলোচনাপ্রসঙ্গে 'ঝানসীর রানী' নামক প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য। এটি প্রকাশিত হয় প্রথম বর্ষের 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৮৪ অগ্রহায়ণ), কিন্তু এটির রচনাকাল কয়েক বৎসর পূর্ববর্তী বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের 'ইতিহাস' (১৩৬৮) গ্রন্থে এটি সংকলিত হয়েছে। এই পুস্তকের 'গ্রন্থপরিচয়' বিভাগে এটির সম্বন্ধে বলা হয়েছে : 'রচনাটির রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত প্রাথমিক খসড়া শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে'। এই প্রাথমিক খসড়াটি যে পাণ্ডুলিপিতে আছে সেটি 'মালতী পুথি' নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের যতগুলি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে এটিই সর্বপ্রাচীন। তাঁর বাল্যজীবনের (এমনকি ছাত্রজীবনেরও) বহু রচনা এটিতে পাওয়া গিয়েছে।

হিমালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে গৃহশিক্ষকদের কাছে পাঠাভ্যাস করার সময়ে তিনি যেসব রচনা করেছিলেন তারও বহু নিদর্শন আছে এই মালতী পুথিতে। এই পুথিতে প্রাপ্ত 'ঝানসীর রানী'র প্রাথমিক খসড়াটি একটু মন দিয়ে পরীক্ষা করলে মনে কোনো সন্দেহ থাকে না, এটি তৎকালীন পাঠাভ্যাসের অঙ্গ হিসাবে কোনো ইংরেজি পুস্তক অবলম্বনে রচিত। পরবর্তীকালে এটি পরিমার্জিত হয়ে প্রথম বর্ষের ভারতীতে (১২৮৪ অগ্রহায়ণ) প্রকাশিত হয়। এসব কথা বিবেচনা করলে এই প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রথম গদ্যরচনা বলে গণ্য করা সমীচীন বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকাশকালের বিচারে এটি প্রাথমিক গদ্যরচনা বলে

স্বীকৃতিলাভের অধিকারী নয়। তা ছাড়া, যদিও এটিতে স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ভাবের আভাস ফুটে উঠেছে তবু এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, এটিতে তাঁর চিন্তাধারার স্বকীয়তা ও বিশিষ্টতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশলাভের অবকাশ পায় নি। কেননা, এক্ষেত্রে তাঁকে কোনো ইংরেজি রচনা অবলম্বনে মুখ্যতঃ অনুবাদের পথ ধরেই অগ্রসর হতে হয়েছিল। অনুবাদ বা অনুসরণের দিক্ থেকে বিচার করলে এই ইতিহাসবিষয়ক প্রবন্ধটিকে পূর্বোক্ত জ্যোতিষবিষয়ক প্রবন্ধটির অনুবর্তী বলে গণ্য করতে হয়। রচনাকালের বিচারে এটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনার পর্যায়ভুক্ত বলে স্বীকার করলেও ভাব বা ভাষার দিক্ থেকে এটিকে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট স্বকীয়তার অধিকারী বলে স্বীকার করা যায় না।

২

চিন্তা ও রচনার স্বকীয়তা তথা বিশিষ্টতা এবং প্রকাশকালের অগ্রবর্তিতার বিচারে যে প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা বলে মর্যাদালাভের অধিকারী তার নাম 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসর-সরোজিনী ও দুঃখসাঙ্গিনী'। এটি প্রকাশিত হয় 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার ১২৮৩ সালের কার্তিক (১৮৭৬ অক্টোবর-নবেম্বর) সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এটিকেই তাঁর প্রথম প্রকাশিত গদ্যপ্রবন্ধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি এই।—

> প্রথম যে গদ্যপ্রবন্ধ লিখি তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়। তাহা গ্রন্থসমালোচনা। তাহার একটু ইতিহাস আছে।
>
> তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা নামে একটি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল। বইখানি ভুবনমোহিনী-নামধারিণী কোনো মহিলার লেখা বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। সাধারণী কাগজে অক্ষয় সরকার মহাশয় এবং এডুকেশন গেজেটে ভূদেববাবু এই কবির অভ্যুদয়কে প্রবল জয়বাদ্যের সহিত ঘোষণা করিতেছিলেন।
>
> তখনকার কালের আমার একটি বন্ধু আছেন— তাঁহার বয়স আমার চেয়ে বড়ো। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে 'ভুবনমোহিনী' সই-করা চিঠি আনিয়া দেখাইতেন। 'ভুবনমোহিনী' কবিতায় ইনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং 'ভুবনমোহিনী' ঠিকানায় প্রায় তিনি কাপড়টা বইটা ভক্তি-উপহাররূপে পাঠাইয়া দিতেন।
>
> এই কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ভাবে ও ভাষায় এমন অসংযম ছিল যে, এগুলিকে স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া মনে করিতে আমার ভালো লাগিত না। চিঠিগুলি দেখিয়াও পত্রলেখককে স্ত্রীজাতীয় বলিয়া মনে করা অসম্ভব হইল। কিন্তু আমার সংশয়ে বন্ধুর নিষ্ঠা টলিল না, তাঁহার প্রতিমাপূজা চলিতে লাগিল।
>
> আমি তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, দুঃখসঙ্গিনী ও অবসরসরোজিনী বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে এক সমালোচনা লিখিলাম।
>
> খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম। খণ্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, তাহা অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। সুবিধার কথা এই ছিল, ছাপার অক্ষর সবগুলিই সমান নির্বিকার, তাহার মুখ দেখিয়া কিছুমাত্র চিনিবার জো নাই, লেখকটি কেমন, তাহার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত।
>
> —'জীবনস্মৃতি', রচনাপ্রকাশ

উক্ত সমালোচনা-প্রবন্ধটি যখন লিখিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স পনের বৎসর পাঁচ মাস। আর, জীবনস্মৃতি তাঁর পঞ্চাশ বৎসর বয়সের রচনা। পরিণতবয়সে তিনি তাঁর এই বাল্যরচনাটি সম্বন্ধে যে পরিহাস-মিশ্রিত কটাক্ষপাত করেছেন তা ওই রচনাটির প্রাপ্য কিনা বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

কিন্তু তার আগে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' 'অবসরসরোজিনী' ও 'দুঃখসঙ্গিনী', এই তিনখানি বইএর একটু পরিচয় দিয়ে নেওয়া কর্তব্য। তিনখানিই কবিতার বই।

'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' প্রথমভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ (শক ১৭৯৭ অগ্রহায়ণ) সালে। কবির নাম নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯২২)। 'ভুবনমোহিনী' তাঁর ছদ্মনাম। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে লেখকের নাম ছিল না। আখ্যাপত্রে ছিল 'Edited and published by Nobinchandra Mookhopadhyay' শুধু এই কথা-কয়টি। কিন্তু ছদ্মনাম 'ভুবনমোহিনী' সুপরিচিত ছিল। তাই তৎকালে ধারণা হয়েছিল, এই পুস্তকটি ওই নামের কোনো মহিলা কবির রচনা। এটিই কবির প্রথম কাব্য এবং প্রকাশের অল্পকাল পরেই এটিকে বালক-রবীন্দ্রনাথের কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে এ স্থলে বলা যেতে পারে যে, নবীনচন্দ্রের তৃতীয় কাব্য 'সিন্ধুদূত'কেও (১৮৮৩) রবীন্দ্রনাথের হাতে কঠোর সমালোচনার আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল।

'অবসরসরোজিনী' প্রথমভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালের মে মাসে। রচয়িতা কবি রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪)। তিনি নবীনচন্দ্রের চেয়ে অধিকতর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে রাজকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছেন, 'তাঁহার গ্রন্থাবলী বঙ্গসাহিত্যে আদরের বস্তু'। রাজকৃষ্ণ বহু গ্রন্থের লেখক। কিন্তু তাঁর খ্যাতির প্রধান হেতু 'অবসরসরোজিনী' কাব্যখানি। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তি স্মরণীয়।—

> অপরিচয় ও অজ্ঞতার দরুণই আজিকার বাঙ্গালী পাঠক তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছে, 'অবসর-সরোজিনী' পড়ে না বলিয়াই কবি রাজকৃষ্ণ রায়কে সে জানে না, পড়িলে 'ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি' প্রভৃতি জাতীয়তামূলক কবিতার কবিকে ভুলিতে পারিত না।
>
> — সাহিত্যসাধকচরিতমালা ৫০ (১৩৫৩ সং), পৃ ৫২

অতঃপর 'দুঃখসঙ্গিনী'। এটির প্রকাশকাল ১৮৭৫ অক্টোবর। রচয়িতা হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী (১৮৫৪-১৯৩০)। দুঃখসঙ্গিনীই তাঁর প্রথম বই। কিন্তু বইটি তৎকালে সাহিত্যজগতে উপেক্ষিত হয় নি। বান্ধব আর্যদর্শন বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় বহু উদ্‌ধৃতিসহ দীর্ঘ সমালোচনার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই বইটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত কি, তা যথাস্থানে দেখানো যাবে। তবে এস্থলেই এ কথা বলা যেতে পারে যে, বালক-রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার ফলেই এই কাব্যগ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরতা অর্জন করেছে। কিন্তু 'দুঃখসঙ্গিনী'র কবি বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি। বিস্মৃতির অন্ধকারেই তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।

'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'র কবি নবীনচন্দ্র, 'অবসরসরোজিনী'র কবি রাজকৃষ্ণ এবং 'দুঃখসঙ্গিনী'র কবি হরিশ্চন্দ্র, এই তিনজনের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন রাজকৃষ্ণ। তাঁকে জীবনে বহু প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল; তিনি দীর্ঘজীবনও লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসরের স্বল্পপরিসর জীবনে নানা বিরুদ্ধতার মধ্যেও তিনি নিজ প্রতিভার বিশিষ্টতাগুণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়তার

অধিকারী হয়েছেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেও তাঁর যাতায়াত ছিল। 'বিদ্বজ্জনসমাগম' সভার (প্রথম অধিবেশন হয় ১২৮১ বৈশাখ ৬ তারিখে) অধিবেশনেও তিনি উপস্থিত থাকতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি তখনই 'উদীয়মান কবি' বলে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন।

অপর দুই জন, নবীনচন্দ্র এবং হরিশ্চন্দ্র, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবন লাভ করেও রাজকৃষ্ণের ন্যায় খ্যাতি অর্জন করতে পারেন নি। বস্তুতঃ বালক-রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা-প্রবন্ধটিই অনেকাংশে তাঁদের সাহিত্যকৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

৩

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম প্রবন্ধটির কয়েকটি বিশিষ্টতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। একটু মন দিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, রবীন্দ্রপ্রতিভার যে বিশিষ্টতা পরবর্তীকালে বাংলাসাহিত্যকে অপূর্ব প্রভায় উদ্‌ভাসিত করেছিল তারই অরুণাভাস পাওয়া যায় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে। বস্তুতঃ, চিন্তামুক্তির যে বিশিষ্টতা ও বলিষ্ঠতা উত্তরকালীন রবীন্দ্রসাহিত্যের যোগে আমাদের কাছে সুপরিচিত হয়েছে, এই প্রবন্ধটিকে বলা যায় তারই অগ্রদূত। একটু কান পেতে অবহিত হলেই এই স্বল্পায়তন রচনাটির মধ্যেই শোনা যাবে রবীন্দ্রপ্রতিভার দুর্জয় আত্মঘোষণা-বাণী— 'অয়মহং ভো'।

এ কথা নিঃসংশয়েই বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার ক্ষেত্রে 'অভিলাষ' কবিতাটির যে স্থান, তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যের ক্ষেত্রে 'ভুবনমোহিনী' প্রভৃতি রচনাটিরও সেই স্থান। বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে প্রেরণাভূমি থেকে 'অভিলাষ' কবিতার উৎপত্তি, রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনাটিতেও তার প্রভাব সুস্পষ্ট। অন্যত্র দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, বালক-রবীন্দ্রনাথ 'অভিলাষ' কবিতা রচনার প্রেরণা লাভ করেন বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (১২৮১ শ্রাবণ) প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধটি থেকে। কিন্তু সে প্রেরণা আনুকূল্যের প্রেরণা নয়, প্রতিবাদের প্রেরণা। 'ভুবনমোহিনী'-ইত্যাদি-শীর্ষক গদ্য-রচনাটিতেও 'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধের ছায়াপাত সুস্পষ্ট। কিন্তু এবারকার প্রভাব প্রতিবাদের নয়, সমর্থনের। তার প্রমাণ দেওয়া কঠিন নয়। 'ভুবনমোহিনী' থেকে বালক-সমালোচকের দুটি উক্তি উদ্‌ধৃত করছি। প্রবন্ধের প্রথমেই এক জায়গায় বলা হয়েছে—

> এই গীতিকাব্যই বাঙ্গালির নির্জীব হৃদয়ে আজকাল অল্প অল্প জীবন সঞ্চার করিয়াছে।

এই উক্তির 'নির্জীব' শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাঙালি নির্জীব কেন, তার উত্তর পাওয়া যায় পরবর্তী আর-একটি উক্তিতে।—

> বাঙ্গলা দেশে মহাকাব্য অতি অল্প কেন? তাহার অনেক কারণ আছে। বাঙ্গলা ভাষার সৃষ্টি অবধি প্রায় বঙ্গদেশ বিদেশীয়দিগের অধীনে থাকিয়া নির্জীব হইয়া আছে, আবার বাঙ্গলার জলবায়ুর গুণে বাঙ্গালিরা স্বভাবতঃ নির্জীব, স্বপ্নময়, নিস্তেজ, শান্ত; মহাকাব্যের নায়কদিগের হৃদয় চিত্র করিবার আদর্শ হৃদয় পাইবে কোথায়? অনেকদিন হইতে বঙ্গদেশ সুখে শান্তিতে নিদ্রিত, যুদ্ধবিগ্রহ, স্বাধীনতার ভাব বাঙ্গালির হৃদয়ে নাই; সুতরাং এই কোমল হৃদয়ে প্রেমের বৃক্ষ অষ্টেপৃষ্ঠে মূলবিস্তার করিয়াছে। এই নিমিত্ত জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের লেখনী হইতে প্রেমের অশ্রু নিঃসৃত হইয়া

বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছে এবং এই নিমিত্ত প্রেমপ্রধান বৈষ্ণবধর্ম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে।
— জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, ১২৮৩ কার্তিক

এবার 'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত করা যাক।—

বাঙ্গালির পূর্ববীরত্ব, পূর্বগৌরবের কি জানা আছে?· · প্রাচীনকাল দূরে থাকুক, যখন মধ্যকালে চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থসাঙ বঙ্গদেশ পর্যটনে আসেন, তখন দেখিয়াছিলেন যে, এই প্রদেশ গৌরবশূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। বঙ্গদেশের পূর্বগৌরব কোথায়?···

পূর্বকালে বাঙ্গালিরা যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত কোন প্রমাণ নাই। পূর্বকালে ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য জাতি যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত প্রমাণ অনেক আছে, কিন্তু বাঙ্গালিদিগের বাহুবলের কোনো প্রমাণ নাই। হোয়েন্থসাঙ সমতটরাজ্যবাসীদিগের যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িয়া বোধ হয়, পূর্বে বাঙ্গালিরা এইরূপ খর্বাকৃত, দুর্বল গঠন ছিল।· ·

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের মতে, সকলই বাহ্য প্রাকৃতিক ফল। বাঙ্গালির দুর্বলতাও বাহ্য প্রকৃতির ফল। ভূমি, জলবায়ু এবং দেশাচারের ফলে বাঙ্গালিরা দুর্বল।· ·

বাঙ্গালি মনুষ্যেরই কি, বাঙ্গালি পশুরই কি, দুর্বলতা যে জলবায়ু বা মৃত্তিকার গুণ, তাহা সহজেই বুঝা যায়।
— বঙ্গদর্শন, ১২৮১ শ্রাবণ

দেখা যাচ্ছে প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীন রবীন্দ্রনাথ, উভয়েই বাঙালিকে প্রথমাবধি ঐতিহাসিক গৌরবে বঞ্চিত, কর্মকীর্তিহীন নির্বীর্য জাতি বলে ধরে নিয়েছেন এবং উভয়ের মতেই এই নির্বীর্যতার হেতু প্রাকৃতিক পরিবেশ অর্থাৎ জলবায়ুর প্রভাব। বাঙালি জাতির অতীত ও বর্তমান প্রকৃতি সম্বন্ধে উভয়ের এই সুস্পষ্ট মতসাদৃশ্য আকস্মিক বলে মনে করবার কোনো কারণ দেখা যায় না।

'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রকাশের কয়েক মাস পরে বঙ্কিমচন্দ্র 'ভাই ভাই' নামে কবিতাতেও কঠোর ভাষায় বাঙালির ঐতিহ্যগৌরবহীনতাকে ধিক্কার দিয়াছেন।—

নাহি ইতিবৃত্ত নাহিক গৌরব,
নাহি আশা কিছু নাহিক বৈভব,
বাঙ্গালির নামে করে ছি ছি রব,
কোমল স্বভাব, কোমল দেহ।· ·
কার উপকার করেছ সংসারে?
কোন্ ইতিহাসে তব নাম করে?
কোন্ বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালির ঘরে?
কোন্ রাজ্য তুমি করেছ জয়?
কোন্ রাজ্য তুমি শাসিয়াছ ভাল?
কোন্ মারাথনে ধরিয়াছ ঢাল?
এই বঙ্গভূমি এ-কাল সে-কাল
অরণ্য, অরণ্য, অরণ্যময়। —বঙ্গদর্শন ১২৮১ চৈত্র

'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধের উদ্‌ধৃত অংশের বক্তব্য এবং এই কবিতার বক্তব্যবিষয় অবিকল এক। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি বা এটির কোনো প্রভাব তাঁর উপরে পড়ে নি, এমন কথা মনে করবারও কোনো হেতু নেই। যা হক, 'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধ এবং 'ভাই ভাই' কবিতার সঙ্গে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদি রচনাটির এই চিন্তাগত ঐক্যটুকু অস্বীকার বা উপেক্ষা করবার উপায় নেই।

বাংলাদেশের জলবায়ুর গুণে বাঙালিরা হয়েছে নির্জীব এবং তারই ফলে বাংলাসাহিত্যে ঘটেছে মহাকাব্যের অল্পতা ও প্রেমবিষয়ক গীতিকবিতার প্রাধান্য, এই হচ্ছে বালক-রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম প্রবন্ধটির অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়। আমরা দেখেছি এই অভিমতের প্রথমাংশের উৎস হচ্ছে সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধটি, দ্বিতীয়াংশের উৎস নিহিত রয়েছে বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্রেরই অপর একটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধটির নাম 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'। এর থেকে একটি অংশ উদ্‌ধৃত করছি।—

> ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তথাকার জলবায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জলবাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্না এবং উর্বরা, এবং তাহার উৎপাদ্য অসার তেজোহানিকর ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্যতেজ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী আলস্যের বশবর্তিনী এবং গৃহ-সুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতীপ্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতিচরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত-আট শত বৎসর পর্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য। —বঙ্গদর্শন ১২৮০ পৌষ

এই প্রবন্ধেরই প্রথমাংশে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন যে, ভারতীয় আর্যরা যে-সময়ে 'অনার্যকুলপ্রমথনকারী ভীতিশূন্য, দিগন্তবিচারী, বিজয়ী বীর জাতি'রূপে পরিগণিত ছিল, তখনকার 'সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ' মহাকাব্য। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক পরিবেশপ্রভাবে যখন কোনো জাতির চরিত্রে বীর্যবত্তার প্রকাশ ঘটে তখন সাহিত্যেও দেখা দেয় সেই চরিত্রানুযায়ী বীররসাত্মক মহাকাব্য, সেইরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশগুণে যখন জাতীয় চরিত্রে দুর্বলতা ও কোমলতার প্রাধান্য ঘটে তখনই রচিত হয় মাধুর্যময় গীতিকবিতা। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিমতেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদি প্রবন্ধে।

বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' (১২৮০ পৌষ) ও 'বাঙ্গালির বাহুবল' (১২৮১ শ্রাবণ) প্রবন্ধ এবং 'ভাই ভাই' কবিতার (১২৮১ চৈত্র) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদি প্রবন্ধের (১২৮৩ কার্তিক) এই যে ভাবগত-ঐক্য, একে নেহাতই আকস্মিক বলে উপেক্ষা করা যায় না। 'ভাই ভাই' কবিতায় আছে বাঙালির 'কোমল স্বভাব কোমল দেহ'র কথা, তার পরেই আছে তার 'কোমল পিরীতি কোমল স্নেহ'র কথা। আর, বালক-সমালোচকের রচনায় আছে বাঙালির 'কোমল হৃদয়ে' প্রেমের প্রভাবের সবিস্তার পরিচয়। এই সাদৃশ্যটুকুও লক্ষণীয়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বালক-বয়সে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনায় হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'সারদামঙ্গল' এবং অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। এ

বিষয়ে তাঁর স্বীকৃতিরও অভাব নেই। তেমনি তাঁর সে বয়সের গদ্যরচনায় যদি বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার ছায়াপাত দেখা যায়, তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন তার বিচিত্র আলোকরশ্মিপাতে রবীন্দ্রনাথের উন্মেষোন্মুখ হৃদয়কে এক নূতন জগতের অপূর্ব বিস্ময়ের মধ্যে বিকশিত করে তুলেছিল, এ কথা তিনি যে কতবার কতভাবে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এ স্থলে তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। তবে সেকালে তাঁর কিশোর হৃদয় যে ভাবাবেগে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তার আভাস পাওয়া যায় এই লাইন-কয়টিতে—

মনে আছে সেই প্রথম বয়স নূতন বঙ্গভাষা
তোমাদের মুখে জীবন লভিছে বহিয়া নূতন আশা।
নিমেষে নিমেষে আলোকরশ্মি অধিক জাগিয়া উঠে।
বঙ্গহৃদয় উন্মীলি' যেন রক্তকমল ফুটে॥
প্রতিদিন যেন পূর্বগগনে চাহি রহিতাম একা
কখন ফুটিবে তোমাদের ওই লেখনি অরুণ-রেখা।
তোমাদের ওই প্রভাত-আলোক প্রাচীন তিমির নাশি,
নবজাগ্রত নয়নে আনিবে নূতন জগৎ-রাশি॥ —'মানসী', পরিত্যক্ত (১৮৮৮)

রবীন্দ্রনাথের কিশোর হৃদয়ে বঙ্কিমচিন্তাধারার এই যে প্রভাব, তা সহজে মুছে যায় নি। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো কোনো ভাব তাঁর অন্তরে চিরকালের জন্য বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় চরিত্র নিয়ন্ত্রণে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবই যে সর্বাধিক এই বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের শেষবয়স পর্যন্ত এই বিশ্বাস অবিচলিত ছিল। এস্থলে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এ রকম আর-একটি বিশ্বাস হচ্ছে বাঙালির নির্বীর্যতা ও ঐতিহ্যগৌরবহীনতা সম্বন্ধে। এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে শুধু দু-একটি কথার উল্লেখই যথেষ্ট। 'মানসী' কাব্যের দুরন্ত আশা, দেশের উন্নতি ও বঙ্গবীর, 'সোনার তরী' কাব্যের হিং টিং ছট, 'চৈতালি' কাব্যের বঙ্গমাতা, 'কল্পনা' কাব্যের উন্নতিলক্ষণ প্রভৃতি রচনার কথা স্মরণ করলেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে।—

অলস দেহ ক্লিষ্ট গতি গৃহের প্রতি টান,· ·
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো বাঙালি-সন্তান। —'মানসী', দুরন্ত আশা (১৮৮৮)

এর সঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙালি বর্ণনার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। 'গৃহের প্রতি টান' কি বঙ্কিমচন্দ্রের পুনঃ-পুনরুক্ত 'গৃহসুখপরায়ণ' বিশেষণটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না ?

অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ খর্বদেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ।· ·
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল,
পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যতমুষল॥ —'সোনার তরী', হিং টিং ছট্ (১৮৯২)

বঙ্কিমচন্দ্রের 'খর্বাকৃত দুর্বলগঠন' বিশেষণ স্মরণীয়। আর, শেষ লাইনটি হচ্ছে বাঙালির ঐতিহ্যগৌরব-হীনতার প্রতি আপাতনিষ্ঠুর ইঙ্গিত। 'নাহি ইতিবৃত্ত নাহিক গৌরব' 'ভাই ভাই' কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্রের

এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি 'পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যতমুষল'। 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদিতেও এই মনোভাব সুস্পষ্ট। বাঙালির এই অগৌরবের প্রতিকার -কামনাতেই তিনি কবিতায় লিখেছিলেন—

শীর্ণশান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননি,
রেখেছ বাঙালি করে মানুষ কর নি॥ —'চৈতালি', বঙ্গমাতা (১৮৯৬)

আর গদ্যে লিখেছিলেন—

বাঙালি আজকাল লোকসমাজে বাহির হইয়াছে। মুশকিল এই যে, জগতের মৃত্যুশালা হইতে তাহার কোনো পাস নাই।· ·

পিতামহদের বিরুদ্ধে আমাদের এইটেই সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ। সেই তো আজ, তাঁহারা নাই, তবে ভালো মন্দ কোনো- একটা অবসরে তাঁহারা রীতিমতো মরিলেন না কেন? তাঁহারা যদি মরিতেন তবে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরাও নিজেদের মরিবার শক্তি সম্বন্ধে আস্থা রাখিতে পারিতাম। তাঁহারা নিজে না খাইয়াও ছেলেদের অন্নের সংগতি রাখিয়া গেছেন, শুধু মৃত্যুর সংগতি রাখিয়া যান নাই। এত বড়ো দুর্ভাগ্য, এত বড়ো দীনতা আর কী হইতে পারে?

—'বিচিত্র প্রবন্ধ', মা ভৈঃ (১৩০৯)

পরবর্তীকালের এই বেদনাময় মনোভাবের বীজ নিহিত রয়েছে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'-ইত্যাদি প্রবন্ধে এবং রবীন্দ্রনাথ এই মনোভাব উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ও কবিতা থেকে।

অতএব এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, রবীন্দ্রসাহিত্য তথা রবীন্দ্রচিন্তার বিবর্তনের ইতিহাসে 'ভুবন-মোহিনীপ্রতিভা'-ইত্যাদি প্রবন্ধটির গুরুত্ব কম নয়।

অতঃপর উক্ত প্রবন্ধের ভাষা ও ভাব -গত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেই এই আলোচনা সমাপ্ত করব।

প্রথমেই ভাষার কথা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় 'বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল'। অন্যত্র বলেছেন—

তাঁর [বঙ্কিমচন্দ্রের] আগে ভাষার মধ্যে অসাড়তা ছিল, তিনি জাগিয়ে দেওয়াতে তার যেন স্পর্শবোধ গেল বেড়ে। নতুন কালের নানা আহ্বানে সে সাড়া দিতে শুরু করলে। অল্পকালের মধ্যেই আপন শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠল। বঙ্গদর্শনের পূর্বকার ভাষা আর পরের ভাষা তুলনা করে দেখলে বোঝা যাবে, এক প্রান্তে একটা বড় মনের নাড়া খেলে দেশের সমস্ত মনে ঢেউ খেলিয়ে যায় কত দ্রুতবেগে, আর তখনি তখনি তার ভাষা কেমন করে নূতন নূতন প্রণালীর মধ্যে আপন পথ ছুটিয়ে নিয়ে চলে। —'বাংলাভাষাপরিচয়' (১৯৩৮) পরিচ্ছেদ ৬

বাংলা সাহিত্যে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণতেজে আবির্ভাব তখন কিশোর-রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কোরকের উন্মেষকাল। এই দু-এর পারস্পারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল'। সুতরাং, বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার সত্যপরিচয় পেতে হলে তাঁর বালকচিত্তে বঙ্কিমচন্দ্রের বিচিত্র প্রভাবের যথোচিত বিশ্লেষণ ও আলোচনা প্রয়োজন।

এই অবস্থায়, আশা করা যায়, রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক গদ্যরচনায় বঙ্কিমী রীতির ছায়াপাত ঘটবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদি রচনাটিতে বঙ্কিমী রচনারীতির প্রভাব খুব অল্পই দেখা যায়। উদ্‌ধৃত রচনাংশগুলির তুলনা করলেই দুই জনের রচনারীতির পার্থক্য বোঝা যাবে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাবন্ধিক গদ্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঋজু যুক্তিপরায়ণতা ও অলংকারপ্রয়োগের স্বল্পতা; তাঁর রচনার লক্ষ্য বক্তব্যকে পাঠকের বুদ্ধিগ্রাহ্য করা, হৃদয়গ্রাহী করা নয়। এই রীতির আর-এক বৈশিষ্ট্য বক্তব্যের মধ্যে বেগ সঞ্চারের অভিপ্রায়ে স্থলে স্থলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ত সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ। পূর্বোদ্‌ধৃত অংশগুলির মধ্যে এই বিশিষ্টতাগুলি সহজেই লক্ষিত হবে। পক্ষান্তরে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদিতে এইগুলির পরিবর্তে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার যা প্রধান বিশিষ্টতা, কবিসুলভ আলংকারিকতার সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং হৃদয়গ্রাহিতার অলক্ষিত পথে পাঠকের আন্তরিক স্বীকৃতি আদায়, বাংলা সাহিত্যে তারই প্রথম পদসঞ্চারণ। এই প্রথম পদক্ষেপেই কোথাও কোনো দ্বিধা বা শঙ্কার চিহ্নমাত্রও নেই। প্রথম শরসন্ধানেই পাওয়া গেল অব্যর্থ নৈপুণ্যের পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম রচনার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি অংশ উদ্‌ধৃত করছি।—

> যখন প্রেম করুণা ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তিসকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয় তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবণজাত সেই স্রোত হয়ত শত শত মনোভূমি উর্বরা করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল বর্তমান থাকিবে। ইহা মরুভূমির দগ্ধবালুকাও আর্দ্র করিতে পারে, ইহা শৈলক্ষেত্রের শিলারাশিও উর্বরা করিতে পারে। কিম্বা যখন অগ্নিশৈলের ন্যায় আমাদের হৃদয় ফাটিয়া অগ্নিরাশি উদ্‌গীরিত হইতে থাকে, তখন সেই অগ্নি আর্দ্রকাষ্ঠও জ্বালাইয়া দেয়। সুতরাং গীতিকাব্যের ক্ষমতা বড় অল্প নহে।

এই ভাষায় রবীন্দ্ররচনাসুলভ অলংকারবাহুল্য ও প্রবল স্রোতোবেগময় হৃদয়োচ্ছ্বাস পূর্ণতেজেই প্রকাশ পেয়েছে। তা ছাড়া, এ ভাষার ভাবব্যঞ্জনা, ভারসামঞ্জস্য, ধ্বনিঝংকার ও অনতিস্ফুট ছন্দস্পন্দন উত্তরকালের রবীন্দ্ররচনার যোগে আমাদের কাছে সুপরিচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই বিশিষ্টতাগুলির একত্র সমাবেশ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধরচনায় সুলভ নয়। রবীন্দ্ররচনার এই সুপরিচিত বিশিষ্টতাগুলি তাঁর এই প্রথম রচনাটিকেই যে অপূর্ব সৌন্দর্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছে সে কথা ভাবলে রবীন্দ্রনাথেরই অনুসরণে এ ভাবাকে বলতে হয়—

> নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন

কিংবা

> যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা
> পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।

বালক-রবীন্দ্রনাথের হাতে এই যে নূতন গদ্যরীতির উদ্‌ভব হল, তাঁর মতে এর কৃতিত্বও বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রাপ্য। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, বঙ্গদর্শনের যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে প্রেরণালাভের ফলেই বাংলাভাষা সহসা 'নূতন নূতন প্রণালীর মধ্যে আপন পথ ছুটিয়ে নিয়ে' চলেছিল। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলাভাষা এই যে নূতন পথে প্রবলবেগে প্রবাহিত হল, স্বীকার করতে হবে তাও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণারই ফল।

গদ্যরচনায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম উদ্যমের পূর্ণ মূল্য বুঝতে হলে মনে রাখা উচিত যে, এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল পনেরো বৎসর পাঁচ মাস মাত্র।

এবার ভাবের কথা। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই স্বর্গত সজনীকান্ত দাসের একটি উক্তি উদ্‌ধৃত করি।—

> রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম গদ্যপ্রবন্ধে দুইটি বস্তু লক্ষণীয়। এক, সতের বৎসর বয়সে ইংলণ্ডের পথে আমেদাবাদ যাইবার পূর্বে তিনি ইংরেজি জানিতেন না—এই উক্তি সত্য নহে। রাজনারায়ণ বসু ও অক্ষয় চৌধুরীর কৃপায় ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার যে বিশেষ পরিচয় ঘটিয়াছিল তাহার প্রমাণ এই প্রবন্ধে আছে।· ·দ্বিতীয়, ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে (১৮৭৭ সনের জুলাই) ভারতীর প্রথম সংখ্যা হইতে 'মেঘনাদবধকাব্যে'র উপর যে ধারাবাহিক আক্রমণ কিশোর-রবীন্দ্রনাথ চালাইয়াছিলেন তাহার সূত্রপাত বীজাকারে এই প্রবন্ধেই আছে। —'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭), পৃ ২১৩

আমরা জানি যে, হিমালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের (১৮৭৩ মে-জুন) পরে রবীন্দ্রনাথ শেক্‌স্পীঅরের ম্যাক্‌বেথ বাংলা ছন্দে তরজমা করেছিলেন। ইংরেজি ভাষার উপরে বেশ-খানিকটা দখল না হলে এ কাজ কিছুতেই সম্ভব হত না। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এ সময়কার জ্ঞান যে গভীর না হলেও ব্যাপকতায় উপেক্ষণীয় ছিল না, তার যথেষ্ট পরিচয় আছে তাঁর এই প্রথম প্রবন্ধটিতে। শুধু ইংরেজি সাহিত্য নয়, সাহিত্যের ইতিহাসও তাঁর কাছে নেহাত অপরিচিত ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। তিনি যে তৎকালে শুধু কুমারসম্ভবই পড়েছিলেন তা নয়। সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষতঃ কালিদাসের সাহিত্য, সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা তাঁর তখনই হয়েছিল। সংস্কৃত ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের যে ব্যাপক ভূমিকার উপরে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতিষ্ঠা, তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় এই রচনাটিতেই।

শুধু সাহিত্য নয়, যে ইতিহাস-জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রচিত্তের অন্যতম প্রধান লক্ষণ তারও প্রথম সংশয়াতীত আবির্ভাব ঘটেছে এই প্রবন্ধটিতেই। একদিকে ফরাসি-বিপ্লব, অন্যদিকে বাংলাদেশের চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব, এই উভয়ই বালক-রবীন্দ্রনাথের মনকে আকৃষ্ট করেছে। বাংলার ইতিহাসে চৈতন্যদেবের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ পরবর্তীকালে দেখা গিয়াছিল, এ সময়েই যে সে-অনুরাগের সূত্রপাত হয়েছিল—এ কথাটা বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'গীতিকাব্যই চৈতন্যের ধর্ম বঙ্গদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে', বালক-সমালোচকের এই উক্তি আজও অগ্রাহ্য নয়। তা ছাড়া, কি কারণে 'প্রেমপ্রধান বৈষ্ণবধর্ম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে', কিশোর ভাবুক তার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন ও যে যুক্তিপরম্পরার উপরে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাও অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। শুধু তাই নয়। যে দক্ষতার সঙ্গে তিনি তা উপস্থাপিত করেছেন বা তৎকালের পক্ষে, তথা সেই বয়সের বালকের পক্ষে, সত্যই বিস্ময়কর।

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীনকাব্য-সংগ্রহ সে-সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল'। 'প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ' খণ্ডশঃ প্রকাশিত হয় ১২৮১-৮৩ (ইংরেজি ১৮৭৪-৭৬) সালে। যে-সময়ে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'-ইত্যাদি রচিত হয় সে-সময়েই বৈষ্ণব কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ ও সাগ্রহ পরিচয় ঘটে। সুতরাং এই প্রবন্ধে যে বৈষ্ণব গীতিকবিতার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে তা বিস্ময়ের বিষয় নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' (১২৮০ পৌষ) প্রবন্ধও এ বিষয়ে তাঁকে বিশেষ সহায়তা করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বৈষ্ণব গীতিকবিতার প্রতি যে বিশেষ আকর্ষণ রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম প্রধান প্রেরণা, তারও প্রথম প্রকাশ এই প্রবন্ধটিতেই।

এ প্রবন্ধে গীতিকাব্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগের কারণ যেমন যথেষ্ট যুক্তি ও নৈপুণ্যের সহিত উপস্থাপিত হয়েছে, মহাকাব্য-রচনার রীতি পরিহারের যুক্তিও তেমনি দৃঢ়তার সহিত উপস্থাপনের প্রয়াস করা হয়েছে। তাঁর মতে এখন মহাকাব্য-রচনার যুগ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। যে-কালে মানুষের হৃদয় ছিল অনাবৃত, কৃত্রিম সভ্যতার আচ্ছাদনে মানুষ হৃদয় গোপন করতে জানত না, তখনই ছিল মহাকাব্য-রচনার যুগ। আধুনিক কালের কৃত্রিমতার মধ্যে আর সার্থক মহাকাব্য-রচনা সম্ভব নয়। 'এই নিমিত্ত আমরা বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভার্জিল প্রভৃতি প্রাচীনকালের কবিদিগের ন্যায় মহাকাব্য লেখিতে পারিব না।' তৎকালে বাংলাদেশে মহাকাব্য-রচনার যে প্রবল উৎসাহ দেখা দিয়েছিল, বালক-রবীন্দ্রনাথ তাকে প্রসন্নহৃদয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। হেম-নবীনের মত প্রবীণ কবিরাও যে যুগধর্মের সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পান নি, কিশোর-রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে যে তা এত সহজেই প্রতিফলিত হয়েছিল তা তাঁর সহজাত অসামান্য প্রতিভারই পরিচায়ক। তাই তিনি তখনই অসংকোচে লিখতে পেরেছিলেন—

> আজকাল মহাকাব্যের এত বাহুল্য হইয়াছে যে, যিনিই এখন কবি হইতে চান তিনি একখানি গীতিকাব্য লিখিয়াই একখানি মহাকাব্য বাহির করেন, কিন্তু তাঁহারা মহাকাব্যে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছেন না ও পারিবেন না। এখনকার মহাকাব্যের কবিরা রুদ্ধহৃদয়ে লোকদের হৃদয়ে উঁকি মারিতে গিয়া নিরাশ হইয়াছেন ও অবশেষে মিল্টন খুলিয়া ও কখনো কখনো রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া অনুকরণের অনুকরণ করিতেছেন। এই নিমিত্ত মেঘনাদবধে, বৃত্রসংহারে ঐসকল কবিদিগের পদছায়া স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছে।

কিশোর-সমালোচকের এই প্রতিবাদ তখনকার মহাকবিদের শ্রুতিগোচর হয় নি। যদি হত তা হলে বাংলা সাহিত্য বিপুল পরিমাণ কৃত্রিমতা ও শক্তির অযথা অপচয় থেকে রক্ষা পেয়ে যেত।

পক্ষান্তরে সেকালে কৃত্রিম মহাকাব্যধারার পাশে পাশেই যে নূতন গীতিকাব্যের ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল তার কলোচ্ছ্বাসে কিশোর কবির হৃদয় মুগ্ধ হয়েছিল। তাই তিনি লিখলেন 'বাঙ্গালার গীতিকাব্য আজকাল যে ক্রন্দন তুলিয়াছে তাহা বাঙ্গালার হৃদয় হইতে উত্থিত হইতেছে।' এই 'ক্রন্দন' মহাকবিদের কর্ণগোচর হয়নি। কিন্তু এ ক্রন্দনই বালকের চিত্তকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। তাই তিনি জীবনের প্রথম থেকেই মহাকাব্যের পথ ছেড়ে গীতিকাব্যের পথই বেছে নিলেন। আর গীতিকাব্যের অন্যতম প্রধান উপজীব্য যে প্রেম, সে কথাও তিনি তখনই উপলব্ধি করেছিলেন। তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে এই প্রবন্ধটিতেই। সে প্রসঙ্গ একটু পরেই পুনরুত্থাপন করা যাবে। প্রেমগীতির প্রতি পক্ষপাতবশতঃ এই যে মহাকাব্যের পথ পরিহার, তার প্রতি ইঙ্গিত করেই তিনি পরবর্তীকালে লিখেছিলেন—

আমি নাবব মহাকাব্য
    সংরচনে
    ছিল মনে—
ঠেকল যখন তোমার কাঁকন-
    কিঙ্কিনীতে
কল্পনাটি গেল কাটি
    হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
    দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
    কণায় কণায়॥ —'ক্ষণিকা' (১৯০০) ক্ষতিপূরণ

যে যুগের প্রতি এই পরিহাস-মিশ্রিত কটাক্ষপাত, সেই মহাকাব্যের যুগের আর-একটি বিশেষ লক্ষণ স্বদেশপ্রীতির অতিবাহুল্য। সেই স্বাদেশিক উত্তেজনার যুগে প্রেমসংগীত শুধু উপেক্ষিত নয়, ধিক্‌কৃতও হত। কিঞ্চিদধিক পনেরো বৎসরের কিশোর-রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতির প্রেরণা কিছুমাত্র কম ছিল না। তার প্রচুর প্রমাণ আছে তাঁর তৎকালীন অনেক কবিতায় ও গানে। এস্থলে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এত অল্পবয়সের বালকের পক্ষে প্রেমগীতি রচনা বা প্রেমের কবিতার সমর্থন অনধিকারচর্চা বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত আজন্মপ্রতিভাশালী বালকের পক্ষে তা অস্বাভাবিক ছিল না। তাই তাঁর তৎকালীন অনেক রচনাতেই প্রেমপ্রসঙ্গের অভাব ঘটেনি, যদিও স্বভাবতঃই সে প্রেমের মধ্যে অবাস্তবতা ও অপরিণতির লক্ষণ যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। যা হক, তাঁর এই প্রথম সমালোচনা নিবন্ধটিতেও প্রেমরচনার সমর্থন পাওয়া যায় বলিষ্ঠ ভাষাতেই। 'দুঃখসঙ্গিনী'র সমালোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন—

> দুঃখসঙ্গিনীতে আর্যসংগীতে নাই, আর্যরক্ত নাই, যবন নাই, রক্তারক্তি নাই; ইহাতে হৃদয়ের অশ্রুজল, হৃদয়ের রক্ত ও প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নাই।· ·এখন কতকগুলি সমালোচক ধুয়া ধরিয়াছেন যে, প্রেমের কথা কহিলে বঙ্গদেশ অধঃপাতে যাইবে। এ কথার অর্থ খুব অল্পই আছে। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি প্রেমকে অবহেলা করিয়া যিনি তেজস্বিতা সঞ্চয় করিতে চাহেন তিনি মানবপ্রকৃতি বুঝেন না।

এই উক্তি বালকের। কিন্তু আশা করি পরিণতবয়সের কোনো সমালোচকও এই উক্তির সত্যতা অস্বীকার করবেন না। পরিণতবয়সে রবীন্দ্রনাথও তাঁর এই বালকবয়সের অভিমতকেই সমর্থন করেছেন তাঁর বিচিত্র রচনায়। 'প্রেমের কথা কহিলে বঙ্গদেশ অধঃপাতে যাইবে' আলোচ্যমান প্রবন্ধে তিনি এই অভিমতের প্রতিবাদ করেছেন সরল ভাষায়, যুক্তির যোগে। পরিণতবয়সে তিনি ঠিক এই অভিমতেরই প্রতিবাদ করেছেন ছন্দোবদ্ধ ভাষায়, পরিহাসের সুরে।—

বীর্যবল বাঙ্গালার
কেমনে বলো টিকিবে আর,
প্রেমের গানে করেছে তার
দুর্দশার শেষ। —'মানসী', দেশের উন্নতি (১৮৮৮)

তোমার তরে সবাই মোরে
করচে দোষী,
হে প্রেয়সী!
বলচে— কবি তোমার ছবি
আঁকছে গানে,
প্রণয়গীতি গাচ্চে নিতি
তোমার কানে।
নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে
তুচ্ছ কথা
ঢাকচে শেষে বাংলাদেশে
উচ্চ কথা॥ —'ক্ষণিকা' (১৯০০), ক্ষতিপূরণ

৬

একমুখীনতা ও আতিশয্য রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সর্বতোমুখীনতা ও বিচিত্রের মধ্যে যথোচিত সামঞ্জস্য রক্ষা, এই হচ্ছে রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রধান বিশিষ্টতা। তাঁর অল্পবয়সের এই প্রথম প্রবন্ধটিতে এই বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায় যথেষ্ট পরিমাণেই।

তখনকার দিনে যাঁরা স্বদেশপ্রীতির উদ্দীপনায় দেশকে মাতিয়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁদের কাছে প্রেমের কবিতা ছিল অপাংক্তেয়, রবীন্দ্রনাথ সে বয়সেই প্রেমের কবিতার সমর্থনে কুণ্ঠিত হলেন না। অথচ তিনি নিজে 'দুঃখসঙ্গিনী'র কবির মত একমাত্র প্রেমকেই কখনও তাঁর রচনার উপজীব্য করেন নি। পূর্বেই বলেছি তাঁর বাল্যরচনায় স্বদেশপ্রীতির উৎসাহও কম ছিল না। আলোচ্যমান প্রবন্ধটিতে স্বদেশপ্রীতিবিষয়ক রচনার প্রতি তাঁর অন্তরের আনুকূল্য প্রকাশ পেয়েছে সুস্পষ্ট ভাষায়। মধ্যযুগে 'জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের লেখনী হইতে প্রেমের অশ্রু নিঃসৃত হইয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত' করেছিল। কিন্তু 'আজকাল ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীরা স্বাধীনতা অধীনতা তেজস্বিতা স্বদেশহিতৈষিতা প্রভৃতি অনেকগুলি কথার মর্মার্থ গ্রহণ করিয়াছেন'। এই ভাবধারা অবলম্বনে রচিত মহাকাব্যগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত কি, তা পূর্বেই দেখানো হয়েছে। তাঁর মতে এগুলি সবই ব্যর্থ এবং ব্যর্থহতে বাধ্য, কারণ তা কালধর্মের বিরোধী। কিন্তু এই নূতন ভাবধারা নিয়ে রচিত নূতন গীতিকাব্যের সার্থকতাও সংশয়াতীত। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তি এই।—

> কিন্তু বাঙ্গালার গীতিকাব্য আজকাল যে ক্রন্দন তুলিয়াছে তাহা বাঙ্গালার হৃদয় হইতে উত্থিত হইতেছে। ভারতবর্ষের দুরবস্থায় বাঙ্গালিদের হৃদয় কাঁদিতেছে, সেই নিমিত্তই বাঙ্গালিরা আপনার হৃদয় হইতে অশ্রুধারা লইয়া গীতিকাব্যে ঢালিয়া দিতেছে। 'মিলে সব ভারতসন্তান' ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়সংগীত, স্বদেশের নিমিত্ত বাঙ্গালির প্রথম অশ্রুজল।

এই অংশটুকুতে রাবীন্দ্রিক গদ্যরীতির বিশিষ্টতা অতি স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পেয়েছে, প্রসঙ্গক্রমে তাও লক্ষণীয়। যা হক, এই উক্তি থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতির স্বরূপটিও সংশয়াতীতরূপেই প্রকাশিত

হয়েছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষই যে তৎকালে বাঙালিদের স্বদেশপ্রীতির লক্ষ্য ছিল, তাও এই উক্তি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। 'মিলে সব ভারতসন্তান' ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়সংগীত— এই বাক্যটি একটি ঐতিহাসিক উক্তি বলে গণ্য হবার যোগ্য। 'মিলে সব ভারতসন্তান' গানটিকে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুকাল পূর্বেই 'মহাগীত' বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন (বঙ্গদর্শন ১২৭৯ চৈত্র)। বালক-রবীন্দ্রনাথ এই গানটিকে 'ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়সংগীত' নামে অভিহিত করলেন। এই স্বীকৃতির ঐতিহাসিক মর্যাদা কম নয়। অন্যত্র দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সংগীতেও এই গানটির ছায়াপাত ঘটেছে এবং রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' গানটি 'মিলে সব ভারতসন্তান' গানেরই যথার্থ উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ, আধুনিক ভারতবর্ষের দুটি জাতীয়সংগীতই এই গানটির অনুবর্তী। রবীন্দ্রনাথ যে সেই অল্পবয়সেই এই গানটির যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন, বর্তমান প্রসঙ্গে সে কথাটিই বিশেষভাবে স্মরণীয়।

পূর্বে বলেছি রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাঁর যথোচিত পরিমাণবোধ। স্বদেশপ্রীতির প্রসঙ্গেও তিনি তাঁর এই পরিমাণবোধের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর প্রথম প্রবন্ধেই। তৎকালীন স্বদেশপ্রীতির অনুভূতিকে অন্তরের সহিত অনুমোদন করলেও তিনি তার কৃত্রিম বাড়াবাড়িকে ধিক্‌কার জানাতে দ্বিধাবোধ করেন নি। এ বিষয়েও তাঁর উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য।—

> আজিকালি বাঙ্গালা গীতিকাব্যের যে অংশে নেত্রপাত করি সেইখানেই ভারত। কোথাও বা দেশের নির্জীব রোদন, কোথাও বা উৎসাহের জলন্ত অনল। 'মিলে সব ভারতসন্তানে'র কবি যে ভারতের জয়গান করিতে অনুমতি দিয়াছেন, আজকালি বালক পর্যন্ত, স্ত্রীলোক পর্যন্ত সেই জয়গান করিতেছে, বরং এখন এমন অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা সমূহ হাস্যজনক। সকল বিষয়েরই অতিরিক্ত হাস্যজনক, এবং এই অতিরিক্ততাই প্রহসনের মূল ভিত্তি। ভারতমাতা, যবন, উঠ, জাগ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি শুনিয়া শুনিয়া আমাদের হৃদয় এত অসাড় হইয়া পড়িয়াছে যে, ও সকল কথা আর আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। ক্রমে যতই বালকগণ ভারত ভারত চীৎকার বাড়াইবেন ততই আমাদের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইবে। এই নিমিত্ত যাঁহারা ভারতবাসীদের দেশহিতৈষিতায় উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত আর্যসংগীত লেখেন, তাঁহাদের ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিই ; তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁহাদের প্রয়াস দেশহিতৈষিতার প্রস্রবণ হইতে উঠিতেছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের সে সোপান হাস্যজনক। তাঁহারা বুঝেন না ঘুমন্ত মনুষ্যের কর্ণে ক্রমাগত একইরূপ শব্দ প্রবেশ করিলে ক্রমে তাহা এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, তাহাতে আর তাহার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। তাঁহারা বুঝেন না, যেমন ক্রন্দন করিলে ক্রমে শোক নষ্ট হইয়া যায় তেমনি সকল বিষয়েই। · ·তোমার হৃদয় যখন উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিবে তখন তুমি তাহা দমন করিবে, নহিলে প্রকাশ করিলেই নিভিয়া যাইবে এবং যত দমন করিবে ততই জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

কিঞ্চিদধিক পনেরো বৎসর বয়স্ক লেখকের মুখে 'বালক পর্যন্ত' 'বালকগণ' 'উপদেশ দিই' প্রভৃতি কথা উপভোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, উদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যে নবীন লেখকের যে চিন্তাগত প্রবীণতার পরিচয় পাওয়া যায়, তৎকালে অনেক পরিণতবয়স্ক লেখকের মধ্যেও তার অভাব ছিল। ফলে ওই সহজাত প্রবীণতার প্রেরণাতেই তাঁর লেখনী থেকে উক্ত আপাত-অশোভন কথাগুলি বোধহয় এসেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪ জুলাই) এবং 'সরোজিনী' (১৮৭৫ নবেম্বর) নাটক 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'-ইত্যাদির পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। দুটি

নাটকেরই উপজীব্য স্বদেশপ্রেম। পুরুবিক্রমে বীররসেরও অভাব ছিল না। এ সম্বন্ধে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'গ্রন্থখানি বীররসপ্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্যবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়' (বঙ্গদর্শন ১২৮১ ভাদ্র)। 'ভারতমাতা, উঠ, জাগ, যবন' ইত্যাদি যেসব কথার অতিরিক্ত প্রয়োগ থেকে ক্ষান্ত হতে রবীন্দ্রনাথ উপদেশ দিয়েছিলেন, 'পুরুবিক্রম' নাটকে তারও অভাব নেই। যথা—

ওঠ! জাগ! বীরগণ দুর্দান্ত যবনগণ
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।
হও সব এক প্রাণ মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ॥· ·
স্বদেশ উদ্ধার তরে মরণে যে ভয় করে,
ধিক্ সেই কাপুরুষে, শত ধিক্ তারে। ইত্যাদি

দেখা যাচ্ছে বালক-রবীন্দ্রনাথ অগ্রজের লেখনী থেকেও স্বদেশপ্রীতি বা বীররসের অতিরিক্ততা পছন্দ করেন নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে অনেক সময় কনিষ্ঠের এসব অভিমত শ্রদ্ধাসহকারে স্বীকার করতেন, তার প্রমাণ আছে তাঁর আত্মস্মৃতি গ্রন্থে 'সরোজিনী' নাটকের ইতিহাস প্রসঙ্গে। এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে বা কবিতায় এ ধরণের স্বাদেশিক উত্তেজনাকে কখনও প্রশ্রয় দেন নি।

বলা বাহুল্য, বালক-সমালোচকের এই 'উপদেশ' কখনও গ্রাহ্য হয় নি। ফলে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এসব কৃত্রিম উত্তেজনাকে নিরস্ত করবার অভিপ্রায়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ
রয়েছে রেশ কানে,
কী যেন করা উচিত ছিল
কী করি কে তা জানে!
অন্ধকারে ওই রে শোন্
ভারতমাতা করেন groan,
এ-হেন কালে ভীষ্ম-দ্রোণ
গেলেন কোন্‌খানে॥ —'মানসী', দেশের উন্নতি (১৮৮৮)

'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদি প্রবন্ধে উক্ত 'ভারতমাতা, ভীষ্ম, দ্রোণ' প্রভৃতি কথার প্রতি কটাক্ষ এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই 'দেশের উন্নতি' কবিতাটিতেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের যথার্থ স্বরূপ স্পষ্টভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।—

সভা-কাঁপানো করতালিতে
কাতর হয়ে রই।
দশজনাতে যুক্তি ক'রে
দেশের যারা মুক্তি করে,

কাঁপায় ধরা বসিয়া ঘরে
তাদের আমি নই।

স্বদেশসেবা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই যে অপ্রমত্ত মনোভাব, তা তাঁর বাল্যবয়সে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদি রচনার কালেও যেমন সত্য ছিল, তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়েও তেমনি সত্য ছিল। তাঁর এই মনোভাব সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল স্বদেশী-আন্দোলনের প্রচণ্ড উত্তেজনার সময়ে। যে পরিমাণবোধ ও সংযমের নির্দেশ তিনি দিয়াছিলেন তাঁর এই প্রথম প্রবন্ধটিতে, সে নির্দেশই তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠে বার বার উচ্চারিত হয়েছিল স্বদেশী-আন্দোলন তথা গান্ধী-আন্দোলনের যুগে। 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃত অভিমতের শেষাংশটুকু এ প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কেননা, তার মধ্যে রবীন্দ্রচিত্তের একটি মূলগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

এ কথা সকলেই জানেন যে, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম প্রতিষ্ঠিত ছিল সুগভীর ইতিহাসবোধ তথা সংস্কৃতি-বোধের উপরে। তাঁর এই ভারতীয় ইতিহাস, তথা সংস্কৃতি, বোধের পরিচয় আছে এই 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'-ইত্যাদি রচনাটিতেই। বৈদিক ঋষি, ব্যাস্, বাল্মীকি, কালিদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্য—একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যে-ভাবে এসব নামের অবতারণা করা হয়েছে তা তাৎপর্যহীন নয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রপ্রতিভা যে বিশিষ্টতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, তার প্রথম সুস্পষ্ট আভাস আছে এই প্রবন্ধেই। এই প্রসঙ্গে বৈদিক ঋষির উল্লেখ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।—

> ঋষিদিগের ভক্তির উৎস হইতে যে সকল গীত উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে হিন্দুধর্ম গঠিত হইয়াছে, এবং এমন দৃঢ়রূপে গঠিত হইয়াছে যে, বিদেশীয়রা সহস্র বৎসরের অত্যাচারেও তাহা ভগ্ন করিতে পারে নাই।

এই উক্তি যেমন অতর্কণীয় ঐতিহাসিক সত্য, তেমনি রবীন্দ্রচিত্তের একটি বিশিষ্টতার পরিচায়ক। বৈদিক ঋষিদের তথা তপোবনের আদর্শ বাল্যকালেই রবীন্দ্রচিত্তে বদ্ধমূল হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, পরিণতবয়সেও এই প্রবণতা তাঁর চিত্ত থেকে তিরোহিত হয় নি।

রবীন্দ্রমানসের যে পরিমাণবোধ, সংযম ও অপ্রমত্ততার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি নানা প্রসঙ্গে, আলোচ্যমান প্রবন্ধে তার আরও কিছু পরিচয় আছে বিশুদ্ধ সাহিত্যপ্রসঙ্গে। গীতিকাব্য ও মহাকাব্যের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। পঞ্চাশ বৎসরের রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে যদিও পনেরো বৎসরের রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের কথা একটু হেসে-উড়িয়ে-দেওয়ার সুরেই উল্লেখ করেছেন তবু স্বীকার করতে হবে যে, গীতিকাব্য ও মহাকাব্য সম্বন্ধে তাঁর পরবর্তীকালের অভিমত ও কিশোর বয়সের অভিমত থেকে খুব ভিন্নরূপ ধারণ করে নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর 'বিহারীলাল' প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করতে পারি। গীতিকাব্যের ক্ষেত্রেও দেখি নবীনচন্দ্রের ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, রাজকৃষ্ণের অবসরসরোজিনী ও হরিশ্চন্দ্রের দুঃখসঙ্গিনী কাব্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণে যে সহজাত রসবোধের ও নিপুণ বিশ্লেষণক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে আজও তাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। প্রবন্ধটি

পড়লেই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। এই রচনাটিতেই মাঝে মাঝে যে মুন্‌সীয়ানা প্রকাশ পেয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

> একজন আপনার হৃদয়ের খনির মধ্যে যে রত্ন যে ধাতু পাইয়াছেন তাহাই পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন, সে রত্নে ধূলিকর্দম মিশ্রিত আছে কিনা, তাহা সুমার্জিত মসৃণ করিতে হইবে কিনা, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আর-একজন আপনার বিদ্যার ভাণ্ডারে যাহা-কিছু কুড়াইয়া পাইয়াছেন, তাহাই একটু মার্জিত করিয়া বা কোনো কোনো স্থলে আবার সৌন্দর্য নষ্ট করিয়া পাঠককে আপনার বলিয়া দিতেছেন।

এই উক্তিটুকুর মধ্যে রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য কিভাবে ফুটে উঠেছে তা দেখিয়ে দেবার অপেক্ষা রাখে না। অন্য ধরণের দু-একটি দৃষ্টান্ত দিই।—

> কবিরা যেখানেই পরের অনুকরণ করিতে যান সেইখানেই নষ্ট করেন ও যেখানে নিজের ভাবে লেখেন সেইখানেই ভালো হয়, কেননা, তাঁহাদের নিজের ভাবস্রোতের মধ্যে পরের ভাব ভালো করিয়া মিশে না। আর কুকবিরা প্রায় যেখানে পরের অনুকরণ বা অনুবাদ করেন সেইখানেই ভাল হয় ও নিজের ভাব জুড়িতে গেলেই নষ্ট করেন, কেননা হয় পরের মনোভাব-স্রোতের মধ্যে তাঁহাদের নিজের ভাব মিশে না কিম্বা তাঁহার আশ্রয় উচ্চতর কবির কবিত্বের নিকট তাঁহার নিজের ভাব 'হংস মধ্যে বক যথা' হইয়া পড়ে।
>
> কবিতার মধ্যে যাহা অসম্বন্ধ প্রলাপ, যাহার অর্থ হয় না, লোকে তাহার মধ্যে মাধুর্য কল্পনা করে এবং দর্শনের মধ্যে যে অংশটুকু দুর্বোধ্য ও কঠোর তাহাই পাঠকেরা গভীর দর্শন বলিয়া মনে করেন। অনেক গীতিকাব্যের দোষ এই যে তাহার শৃঙ্খলা নাই, অর্থ নাই, উন্মত্ততাময়; অনেকে মনে করেন এরূপ উন্মত্ততা না হইলে কবির উচ্ছ্বসিত হৃদয় হইতে যে কবিতা হইয়াছে তাহার প্রমাণ থাকে না।

এইসব উক্তির সত্যতা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আধুনিক কালের বাংলা কবিতা সম্বন্ধেও এসব মন্তব্য অনেকাংশেই প্রযোজ্য। যে অব্যর্থ ও সহজাত সাহিত্যিক রসবোধ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেছিলেন, উদ্‌ধৃত উক্তিগুলি তারই নির্দেশক।

রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতা সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁর যেসব কবিতা ধার-করা ভাব নিয়ে রচিত সেগুলি অপেক্ষাকৃত ভালো; পক্ষান্তরে 'তাঁহার মনোরচিত কবিতার মধ্যে ছন্দ আছে বটে, কিন্তু ভাব নাই।' এই দ্বিতীয় উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমতঃ, এটি বালক-রবীন্দ্রনাথের ছন্দসচেতনতার পরিচায়ক। যে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে বাংলা ছন্দে বিস্ময়কর অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্যের প্রবর্তন করেছিলেন তাঁর ছন্দচেতনাসূচক এই প্রথম উক্তিটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাঁর এই উক্তিটির দ্বিতীয় গুরুত্ব এই যে, ভাবের দীনতা সত্ত্বেও রাজকৃষ্ণ উত্তরকালে নব নব বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি পরবর্তী কালেও সত্য বলে স্বীকৃতিলাভ করেছিল। বস্তুতঃ এই অভিমতটি শুধু 'অবসরসরোজিনী' নয়, রাজকৃষ্ণ রায়ের সমগ্র সাহিত্য সম্বন্ধেই স্বীকার্য। যা হক, এই উক্তিটি বালক-রবীন্দ্রনাথের অভ্রান্ত সাহিত্যদৃষ্টির অন্যতম নিদর্শন বলে গণ্য হতে পারে।

৮

অতঃপর এই প্রবন্ধটির সর্বাপেক্ষা ঔৎসুক্যকর ও কৌতুককর বিষয়টি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালীন উক্তি তাঁর জীবনস্মৃতি থেকে এই প্রবন্ধের গোড়াতেই উদ্‌ধৃত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন, 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' কাব্যখানি কোনো মহিলার লেখা বলে সাধারণের ধারণা জন্মে গিয়েছিল এবং অক্ষয় সরকার মহাশয় ও ভূদেববাবু এই মহিলা কবির অভ্যুদয়কে প্রবল জয়বাদ্যের সহিত ঘোষণা করছিলেন। তদুপরি তাঁর কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুও এই মহিলা কবির রচনায় অতিরিক্ত মাত্রায় মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বালক-রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বাড়াবাড়ি ভালো লাগে নি। তা ছাড়া, এই কবিতাগুলির মধ্যে ভাব ও ভাষাগত অসংযম দেখে এগুলিকে স্ত্রীলোকের লেখা বলে মনে করতে তাঁর ভালো লাগত না। তদুপরি উক্ত বন্ধুর নিকট লিখিত 'ভুবনমোহিনী' সই-করা পত্র দেখেও লেখককে স্ত্রীজাতীয় বলে মনে করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হল। তাই তিনি এই কাব্যখানির সমালোচনা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, আলোচ্যমান প্রবন্ধটিতে কোথাও এই কাব্যের কবি স্ত্রীজাতীয় নয় বলে স্পষ্ট ভাষায় সংশয় প্রকাশ করা হয় নি। বরং এই কবিকে 'একজন অশিক্ষিতা রমণী' বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া, অবসরসরোজিনী ও ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, এই দুইখানি কাব্যের মধ্যে দ্বিতীয়টির প্রতিই কিছু পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয়েছে। তাঁর মতে ভুবনমোহিনীর কবিতা কিঞ্চিৎ অমার্জিত বা অমসৃণ হলেও তা অনায়াসলব্ধ এবং কবির হৃদয়খনি থেকে সদ্যতোলা রত্নের মত অসংস্কৃত হলেও মূল্যবান্ ও আদরণীয়। ভুবনমোহিনী যশের জন্য কবিতা লেখেন নি, লিখেছেন নিজের তৃপ্তির জন্য— এটাও একটা গুণ এবং 'একজন অশিক্ষিতা রমণী'র পক্ষে এটাই স্বাভাবিক, এমন মন্তব্যও আছে এই প্রবন্ধে।

ভুবনমোহিনীপ্রতিভার একটি দোষ তখনকার কালধর্মানুযায়ী কৃত্রিম স্বদেশপ্রীতি ও আর্যগর্ব-ঘোষণা।—

> ভুবনমোহিনীপ্রতিভা ও অবসরসরোজিনীর মধ্যে অনেকগুলি আর্যসংগীত আছে, কেননা ইহাদিগের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক, অপরটি বালক। ইহা প্রায় প্রত্যক্ষ যে, দুর্বলদিগের যেমন শারীরিক বল অল্প তেমনি মানসিক তেজ অধিক ; ঈশ্বর একটির অভাব অন্যটির দ্বারা পূর্ণ করেন।

এই উক্তির মধ্যে কিশোর লেখকের যে বিজ্ঞজনোচিত আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে তা উপভোগ্য। এই উক্তির 'কেননা' ও 'বালক' শব্দদুটি বিশেষভাবে লক্ষিতব্য। এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, স্ত্রীজনোচিত এবং বালকসুলভ দুর্বলতাই আর্যসংগীত রচনা করে তেজপ্রকাশের হেতু। এখানেও ভুবনমোহিনীকে 'স্ত্রীলোক' বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু এটা ব্যঙ্গার্থক না নিশ্চয়ার্থক বলা শক্ত। কেননা, রাজকৃষ্ণকেও বলা হয়েছে 'বালক'। বস্তুতঃ রাজকৃষ্ণ এ সময়ে (১৮৭৬) ছিলেন সাতাশ বৎসরের যুবক। 'রাজকৃষ্ণবাবু' তখন রবীন্দ্রনাথের কাছে অপরিচিত ছিলেন না বলে মনে করার হেতু পূর্বেই বলা হয়েছে। তবু যে তিনি তাঁকে 'বালক' বলে অভিহিত করলেন, তার কারণ ওই আর্যসংগীতগুলোর বালকজনোচিত দুর্বলতা। সুতরাং এখানে 'বালক' শব্দটি ব্যঙ্গার্থেই গ্রহণীয়।

যা হক, ভুবনমোহিনীপ্রতিভার অপর প্রধান দোষ এই কবিতাগুলির অর্থহীন অসংবদ্ধতা ও ভাবগত উচ্ছৃঙ্খলতা বা উন্মত্ততা। তখনকার দিনে এসব গুরুতর ত্রুটিও অনেকের কাছে গুণ বলেই গণ্য হত;

কারণ মহিলা কবির রচনার দোষ দর্শনে পাঠকদের অন্তরের স্বাভাবিক কুণ্ঠা। কিন্তু এই মোহ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। তাঁর সহজাত সাহিত্যনিষ্ঠা তাঁকে এই কাব্যের দোষত্রুটি প্রদর্শনে বিরত হতে দেয় নি কিংবা তার গুণগুলিকেও বাড়িয়ে দেখতে প্রণোদিত করে নি। এই কাব্যখানির সামগ্রিক গুণ ও দোষ সম্বন্ধে কিশোর সমালোচকের শেষ অভিমত এই।—

> যদিও ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে প্রয়াসজাত কবিতা নাই, সবগুলিই প্রতিভার চিরজীবন্ত নির্ঝরিণী হইতে উৎসারিত, তথাপি যদি ভুবনমোহিনীকে মন হইতে স্থানান্তরিত করিয়া কবিতাগুলি পড়ি তবে কেমন লাগে বলিতে পারি না। আমরা ইহার যাহাই পড়িতে যাই তাহাতেই ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে। গুণ পাইলে অমনি সেই গুণ দ্বিগুণিত হইয়া মনে ওঠে। দোষ পাইলে অমনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি তাহা চতুর্থাংশে কমিয়া যায়। যখন আমরা পড়িয়া· · কিছুই অর্থ করিতে পারি না তখন ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে এবং ইহার অর্থ বুঝিতেও চাই না! যখন 'উন্মাদিনী' পড়িয়া আমাদের হাসি আসে তখন ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি হাসি চাপিয়া ফেলি!

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের বিচারে এই কবিতাপুস্তকের জনপ্রিয়তার হেতু নারী নামের মোহ, যথার্থ কবিত্বগুণ নয়। এই যে লেখক লেখিকা নিরপেক্ষ নির্মোহ সাহিত্যদৃষ্টি, এটাই হচ্ছে তাঁর এই প্রথম সমালোচনা-প্রবন্ধটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এমনও হতে পারে যে, উদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যেই এই কাব্যের কবির নারীত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনের সংশয় গূঢ়ভাবে প্রচ্ছন্ন আছে। স্পষ্ট প্রমাণের অভাবে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার সময় তখনও হয় নি। পরবর্তীকালে যথার্থ তথ্য প্রকাশ পেয়েছিল বলেই তিনি জীবনস্মৃতিতে সে কথা খুলে বলতে পেরেছিলেন।

ভুবনমোহিনীপ্রতিভার কবির নারীত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কিশোর-বয়সের এই যে সংশয় (যা ভুদেব, অক্ষয় সরকার বা রবীন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুর মনেও ক্ষণকালের জন্য উদয় হয় নি), তা মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর সহজাত অনুভূতির ফল। তা ছাড়া তার অন্য একটি কারণ ছিল বলেও অনুমান করা যেতে পারে। আমরা জানি বালক-রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহজাত রসবোধের উৎকর্ষের জন্য তাঁর বউঠাকুরানী ও 'সাহিত্যের সঙ্গী' কাদম্বরী দেবীর (১৮৫৯-৮৪) নিকট কতখানি ঋণী ছিলেন। সুতরাং ভুবনমোহিনীপ্রভিতার কবিতাগুলির দোষগুণ নির্ণয়ে, তথা এই কাব্যের কবির প্রকৃতি নির্ণয়ে, তাঁর এই সাহিত্যের সঙ্গীর সাহচর্য বিশেষভাবেই সহায়তা করেছিল, এ কথা মনে করা অসংগত হবে না।

পরিশেষ

অতএব, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তিকালীন পরিহাসমিশ্রিত উপেক্ষা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর এই প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধটি বস্তুতঃ পরিহাস বা উপেক্ষার যোগ্য নয়। এই প্রবন্ধটি যে এখন পর্যন্ত যথোচিত স্বীকৃতি লাভ করে নি তার প্রথম কারণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের এই পরিহাস ও অবজ্ঞা, দ্বিতীয় কারণ এই প্রবন্ধ-রচনাকালে লেখকের বয়সের স্বল্পতা। লেখকের বয়স অতি অল্প, এই চেতনাই প্রবীণ রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞদের মনে এই রচনাটির প্রতি যথোচিত প্রণিধান-স্থাপনের অন্তরায় ঘটিয়েছে। 'ভুবনমোহিনী'র কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন তাকে উলটো করে নিয়ে তাঁর রচনাটি সম্বন্ধে সমভাবেই

প্রয়োগ করা যায়। অর্থাৎ বলা যায়—'যদি লেখকের বয়সের কথা মন হইতে স্থানান্তরিত করিয়া রচনাটি পড়ি তবে কেমন লাগে বলিতে পারি না। আমরা যখনই ইহা পড়িতে যাই তখনই লেখকের বয়সের কথা মনে পড়ে। দোষ পাইলে অমনি সেই দোষ দ্বিগুণিত হইয়া মনে ওঠে। গুণ পাইলে লেখকের বয়সের কথা মনে পড়ে, অমনি তাহা চতুর্থাংশে কমিয়া যায়।' বস্তুতঃ এই হচ্ছে এ লেখাটির অবজ্ঞাত হবার একটি প্রধান কারণ। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'গুণ হয়ে দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়' এই বিখ্যাত উক্তিটি।

বয়স-নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে দেখলে বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম প্রবন্ধটির চিন্তামূল্য বা রচনামূল্য কোনোটাই কম নয়। আমার বিশ্বাস, ভালো করে বিচার করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন কবিতার চেয়েও এই গদ্যরচনাটির সাহিত্যিক মূল্য অনেক বেশি। তা ছাড়া, এটির ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। বস্তুতঃ এই গদ্যরচনাটিই সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের যথার্থ ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথের বহু চিন্তাধারার উৎস-সন্ধানে অগ্রসর হলে শেষপর্যন্ত উপনীত হতে হবে এই রচনাটির কাছে। এই প্রবন্ধটিকে যথোচিতভাবে প্রণিধান না করে রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বরূপ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, কেননা এটিই হচ্ছে বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যের আসল ঐতিহাসিক পটভূমিকা॥

২৮ চৈত্র ১৩৬৮

রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম

পরিমল গোস্বামী

রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় রীতি অনুসরণ করেই ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন, যদিও তাঁর রীতির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট।

কারণ ইউরোপে প্রথম ছদ্মনাম ব্যবহার হয় রাজনৈতিক কারণে। এ রকম কোনো কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবনে ঘটে নি।

স্বনাম ব্যবহার যেখানে নিরাপদ নয় সেখানে ছদ্মনাম ব্যবহারের প্রয়োজন জরুরি। অন্যত্র, যেখানে স্বনাম প্রকাশে কোনো বাধা নেই সেখানেও অনেকক্ষেত্রে ছদ্মনাম ব্যবহার বিশুদ্ধ খেলার মজা উপভোগ ভিন্ন আর কিছু নয়।

আরও কতগুলি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। আদৌ লেখকের বিনয় থাকা সম্ভব। অর্থাৎ লেখাটাই তার যথার্থ নিজস্ব মূল্য পাক, লেখক ব্যক্তিটি অবান্তর।

কোনো লেখকের মনে আপন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু দাম্ভিকতা থাকতে পারে। তাঁর মনে হতে পারে লেখার মত একটি তুচ্ছ জিনিসের সঙ্গে নিজের নাম জড়িয়ে নিজেকে ছোট করে লাভ কি। নিজেকে তখন এতই বড় মনে হয়, এবং লেখাটা এতই তুচ্ছ যে লেখকের নামের সঙ্গে লেখা— নিতান্তই অপমানজনক।

তা ভিন্ন আরও অনেক রকম ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে। হয়তো লেখক স্বভাবতই ভীরু, বিশেষ করে নতুন লেখক। তিনি হয়তো ভাবলেন ছদ্মনামে এবং লেখক-নিরপেক্ষভাবে লেখার দাম আছে কি না দেখা যাক। দাম থাকে ভালো, না থাকলে কেউ জানতে পারল না কে পাঠিয়েছে। এ রকম সন্দেহ বা সংকোচ অনেক লেখকের থাকে, যেমন ছিল শ্রীমতী মারিয়ান এভান্‌স্-এর। তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস ছদ্মনামে পাঠিয়েছিলেন ব্ল্যাকউডকে, তাঁর কাগজে ছাপা চলতে পারে কিনা দেখার উদ্দেশ্যে।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জন গলসওয়ার্দি প্রথম লিখতে আরম্ভ করেন, এবং ১৮৯৮তে তাঁর প্রথম গল্পের বই প্রকাশিত হয় ছদ্মনামে। তাঁর সে গল্পের বইয়ের নাম 'ফ্রম দি ফোর উইন্‌ড্‌স' এবং তাঁর ছদ্মনাম 'জন সিন্‌জন'।

কিন্তু ছদ্মনাম হলেও এসব ক্ষেত্রে আসল নাম প্রকাশে বেশি দেরি হয় না। মাত্র একটি ক্ষেত্রে দেখা যায় এর ব্যতিক্রম। 'জুনিয়াস' ছদ্মনামে যে সব লেখা বেরিয়েছিল ('লেটারস্‌ অব্‌ জুনিয়াস') তার প্রকৃত লেখক কে, তা ডিটেকটিভের মত অনুসন্ধান চালিয়েও অদ্যাবধি কেউ জানতে পারেন নি। বহু দলিল ঘাঁটা হয়েছে, বহু রকম অনুমান করা হয়েছে, কিন্তু রহস্য যেমন ছিল তেমনি আছে।

লেখক নিজেই বলে গেছেন, "The mystery of Junius increases his importance"। জুনিয়াসের লেখা সত্তর খানা চিঠি লণ্ডনের 'পাবলিক অ্যাডভারটাইজার'এ প্রকাশিত হয়। প্রকাশের তারিখ ২১শে জুন ১৭৬৯ থেকে ২১শে জানুয়ারি ১৭৭২।

নামের রহস্য লেখকের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে, এটা সত্য কথা। অবশ্য লেখার গুরুত্বও সেই সঙ্গে থাকা অত্যাবশ্যক। তবে অনেক ছদ্মনামই যে এখন আসল নামে দাঁড়িয়ে গেছে এ কথা সবারই জানা; যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামকে তাঁর কোনো ছদ্মনামই আড়াল করে রাখে নি, এবং তিনিও সেরকম চেষ্টা করেন

নি। নইলে বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশেই যে পরিপক্ক চিন্তা এবং প্রকাশ-ভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা চালিয়ে গেলে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারতেন। কিন্তু মাত্র একটি রচনায় তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব বড়ই বিস্ময়ের কথা। আন্নাকালী পাকড়াশীই বা গেলেন কোথায়? তাঁরও কাব্যপ্রতিভা ছিল অসামান্য।

আজ বিদেশী সাহিত্যের ক্ষেত্রে সি. এল. ডজসন, মারিয়ান এভান্স্‌, জে. এ. থিবো, আলেক্সাই পেশকফ, ডব্‌লিউ. এস.-পোর্টার, সি. এফ. ব্রাউন প্রভৃতিকে কেই বা চেনে? আজও এঁরা এঁদের এইসব নিজস্ব নামে সাধারণের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে আছেন। কিন্তু এঁদের ছদ্মনাম সবারই প্রিয় পরিচিত নাম, এবং এছাড়াও যে তাঁদের অন্য কোনো নাম থাকতে পারে এ কথা কারো মনেই হয় না।

যেসব আসল নাম উল্লেখ করা হল, তাঁদের ছদ্মনাম যথাক্রমে লিউইস ক্যারোল, জর্জ এলিয়ট, আনাতোল ফ্রাঁস, ম্যাক্সিম গোর্কি, ও. হেনরি এবং আর্টেমাস ওয়ার্ড। এই নামে এঁরা সবাই পৃথিবী-বিখ্যাত। এর সঙ্গে আরও অনেক নাম যোগ করা যেত, কিন্তু প্রয়োজন নেই।

রবীন্দ্রনাথের কথায় আসা যাক। তিনি প্রথম ছদ্মনামে লেখেন পদাবলী, ভানুসিংহের নামে। কিন্তু তিনি যে-ছদ্মনামে প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হন (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭, খ্রী. ১৮৮০), সে নামটি বড়ই অদ্ভুত। তিনি যে কবিতাটি প্রকাশ করেন তার নাম 'দু'দিন' এবং যে নাম গ্রহণ করেন তা হচ্ছে শ্রীদিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য।

দিক্‌শূন্য তখন উনিশ বছরের তরুণ। বাংলা নামের সাধারণত যেমন একটা অর্থ থাকে, এরও তা আছে, এবং সেইজন্যই এটি যে অর্থপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

কবি প্রথম বিলেত গিয়ে এক সময় লণ্ডনের এক স্কট-পরিবারে বাস করেন। সেই বাড়িতে স্কটের দুটি কন্যা কবির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়েন। এঁদের কথা কবি একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন এবং জীবনস্মৃতিতেও বলেছেন। সে বাড়ি এখন আর নেই, বাড়ির বাসিন্দাদেরও কোনো খবর কারও জানা নেই, কিন্তু কবির ভাষায় 'গৃহটি আমার মনের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে'।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী প্রথম ভাগে লিখছেন—"কবির প্রতি মেয়ে দুইটি যে আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা পত্রধারার মধ্য হইতে আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন কিনা তাহা কবুল করেন নাই। তবে দু'দিন নামক কবিতাটির মধ্যে এই ভাবটি অব্যক্ত নাই।··লেখকের নাম দেওয়া হইয়াছে শ্রীদিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য। কবি কেন এ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন জানি না।··ফুরালো দু-দিন শীর্ষক একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি কবির পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। দ্র. মালতী পুঁথি: রবীন্দ্রসদন; দু-দিন কবিতাটি তাহারই সংস্কৃত রূপ। প্রথম পাঠটি ('ফুরাল দু-দিন') বোধহয় বোম্বাই-বাসকালে রচিত। এবং ইহার মধ্যে বিচ্ছেদের কথাই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। উহা প্রকাশিত হয় নাই। পরে স্কট কুমারীদ্বয়ের স্মরণে উহাকেই রূপান্তরিত করিয়া লেখেন ও ভারতীতে প্রকাশ করেন।"

দু-দিন নামক কবিতাটি সন্ধ্যাসঙ্গীতে স্থান পেয়েছে। এ কবিতা যদি বোম্বাই-বাসকালে রচিত হয়ে থাকে তবে এর এই পরিবর্তিত রূপে তুষারপাত ইত্যাদির কথা থাকলেও তা যে সম্পূর্ণভাবে একটি বিলাতি 'মুখ' স্মরণ করে রচিত তা বলা যায় না। সব মিলে একটি জটিল মনস্তত্ত্ব আছে এর পিছনে। কোনো-একটা মুহূর্তে মনে বেদনার যে প্রেরণা উপস্থিত হয়, তা যে-কোনো বিষয়কে আশ্রয় করেই প্রকাশ পেতে

পারে। তার পিছনে একটিমাত্র বিশেষ উপলক্ষ থাকতেও পারে, নাও পারে। সুতরাং জোর করে কিছু বলা যায় না। যাঁরা কবি তাঁরা এ কথার মর্ম সহজে বুঝবেন।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে যে বলেছিলেন, "দুটি মেয়েই যে আমাকে ভালোবাসত এ কথা আজ আমার কাছে একটুও ঝাপসা নেই— কিন্তু তখন যদি ছাই সে কথা বিশ্বাস করবার এতটুকুও মরাল কারেজ থাকত।"— এ কথা অবিশ্বাস করবার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ কিছু নেই। প্রভাতকুমার লিখেছেন, "কবি দিলীপকে এই কথা যখন বলেন তখন বোধ হয় দু-দিন কবিতাটির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।" এবং অন্যত্র লিখেছেন, (পূর্বে উদ্ধৃত) "পরে স্বট কুমারীদ্বয়ের স্মরণে উহাকেই রূপান্তরিত করিয়া লেখেন।"

কিন্তু সন্ধ্যাসঙ্গীতে প্রকাশিত দু-দিন কবিতায় দেখা যায়—

> সহসা এ মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতি উজলিয়া
> একটি অস্ফুট রেখা সহসা দিবে যে দেখা,
> একটি মুখের ছবি উঠিবে জাগিয়া,· ·
> শতফুল দলে গড়া সেই মুখ তার
> স্বপনেতে প্রতিনিশি হৃদয়ে উদিবে আসি,
> এলানো আকুল কেশে, আকুল নয়নে।
> সেই মুখ সঙ্গী মোর হইবে বিজনে· ·
> ধীরে ধীরে রেখা রেখা সেই মুখ তার· ·

অর্থাৎ এ কবিতায় স্বট কুমারীদ্বয়কে নিশ্চিত স্মরণ করা হয় নি। দুজনকে স্মরণ করে লিখলে একটি মুখের কথা বার-বার উল্লেখ করা সম্ভব হত কি?

অতএব এখানে সন্দেহাতীত না হওয়াই সম্ভবত সমীচীন। কিন্তু সে যাই হোক, উদ্দিষ্টা কে, তা নিয়ে আমার ভাবনার কোনো কারণ নেই।

আমার প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ শুধু ঐ একটিমাত্র কবিতা প্রকাশকালে ছদ্মনাম ব্যবহার করলেন কেন। সন্ধ্যাসঙ্গীতে এতগুলি স্পষ্ট প্রেমের কবিতা সংকলিত হয়েছে, তার মধ্যে ঐ একটি ভিন্ন কোনোটাতেই তাঁর ছদ্মনাম ব্যবহারের প্রয়োজন হয় নি। এবং ছদ্মনামে লেখা কবিতাটিও স্বনামে সন্ধ্যাসঙ্গীতে স্থান পেয়েছে।

মনে হয়, এর প্রথম প্রকাশকালে মনে কিঞ্চিৎ ভীরুতা জন্মে থাকবে। হয়তো তাঁর নিজের মনের কাছে এ কবিতায় তিনি নিজেকে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে ধরা দিয়ে বসেছেন বলে মনে হয়েছে। অথবা 'দিক্‌শূন্য' নাম (যার অর্থ দিশাহারা) ব্যবহারের মধ্যে নিজের প্রতি কিঞ্চিৎ করুণামিশ্রিত তিরস্কার প্রচ্ছন্ন থাকাও অসম্ভব নয়। অর্থাৎ নিজেকে একটি অবিমৃষ্যকারী দিগ্‌ভ্রান্ত ছোকরারূপে দেখার মাতব্বরিটুকু উপভোগ করা।

> লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে
> সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।

কবিরূপে এমন স্বীকারোক্তির পরেও উক্ত লাজুক হৃদয় ছদ্মনামের আড়ালে লুকোলেন কেন, এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেবার কেউ নেই। এই প্রসঙ্গে আরও একটি জিনিস লক্ষ করা যায় এই যে, যে-কবিতাটিতে কবি নিজেকে দিক্‌শূন্য রূপে দেখতে চেয়েছেন, সেই কবিতাতেই আছে—

এই যে ফিরানু মুখ চলিনু পূরবে ;
আর কি রে এ জীবনে ফিরে আসা হবে !

অর্থাৎ দিক্‌শূন্য, অথচ তিনি যে পুব দিকে রওনা হচ্ছেন সে বিষয়ে জ্ঞান বেশ পুরোপুরিই আছে !

অতঃপর কবির ভানুসিংহরূপে আত্মপ্রকাশ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। পদাবলী সন্ধ্যাসঙ্গীতের আগে রচিত কিন্তু পরে প্রকাশিত। অতএব ছদ্মনামের দিক দিয়ে ভানুসিংহের স্থান দিক্‌শূন্য ভট্টাচার্যের পরেই।

এ নামেরও অর্থ আছে। ভানু— রবি। কিন্তু এ ছদ্মনাম গ্রহণের পিছনে বালকোচিত দুষ্টুমি বুদ্ধি এবং সেও কিছু পরিমাণ চ্যাটারটনের অনুকরণে। এবং যদিও কবি পরে ঐ পদাবলীর বিরুদ্ধে সাহিত্যক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ এনেছেন, তবু পাঠকেরা কিন্তু পরিণত বয়সেও সে অভিযোগ মানতে রাজি হন নি।

কবি তাঁর এই বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণকে চ্যাটারটনের মত জালিয়াতি বলেছেন, কিন্তু আসলে দুইয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। টমাস চ্যাটারটন (১৭৫২-১৮৭০) যখন মাত্র পনেরো-ষোলো বছরের বালক তখন তিনি তাঁর সময়ের প্রায় তিন শ বছর পূর্বের কবিতা-লিখনভঙ্গি অনুকরণ করে সাহিত্যসমাজে তর্কের ঝড় তুলেছিলেন। কাব্যরচনার সহজাত ক্ষমতা তাঁর ছিল অসামান্য। এ পর্যন্ত বালক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বেশ মিল আছে। কিন্তু চ্যাটারটন তাঁর 'আবিষ্কৃত' 'প্রাচীন পাণ্ডুলিপি'গুলি যে সত্যই প্রাচীন তা প্রমাণের জন্য অনেক মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সবটাই ধাপ্পা। মনে হয় এ ধাপ্পার তাঁর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কারণ চ্যাটারটন ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র, এবং তাঁর মত একজন তরুণের পক্ষে কবিতা লিখে কিছু উপার্জন করা সে যুগে অসম্ভব ছিল। এবং জালিয়াতি করেও তিনি যে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারেন নি, তার প্রমাণ তিনি মাত্র আঠারো বছর বয়সে তাঁর বাসস্থানে, অর্থাৎ এক চিলেকোঠার দারিদ্র্যপূর্ণ পরিবেশে, নিজের লেখা যাবতীয় পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেলে, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

এঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ দিক দিয়ে কোনো তুলনাই চলে না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ছদ্মনামের আড়ালে পাঠকসমাজে একটুখানি আলোড়ন তোলা, একটুখানি মজা সৃষ্টি করা। এ প্রবৃত্তি নিতান্তই দুষ্টু ছেলের প্রবৃত্তি। অপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর নামও একস্থানে কবি ব্যবহার করেছেন, যদিও সে-নামে কোনো লেখা আমি নিজে দেখি নি।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী ছদ্মনাম বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নামটি এমন একটি (মাত্র) রচনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যাতে পাঠকের মনে না হয় যে এটি ছদ্মনাম। তখন এর দরকার ছিল, যদিও দরকারটি খুব জরুরি ছিল বলে মনে হয় না। বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি এক অনুপ্রাসমাধুর্য ভিন্ন অন্য কোনো সার্থকতা বহন করছে না। তবে বন্দ্যোপাধ্যায় পদবীটি পূর্বপুরুষের, ঠিকই আছে।

বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ১৩৩৪ (১৯২৭ খ্রী.) সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, তার নাম 'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড টমসনের বহি'। নিজের সম্পর্কে রচনায় ছদ্মনাম ব্যবহার এই বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যায় হয় নি কিছু। তবে এ ক্ষেত্রে তাঁর মনে যে কোনো-রকম মজা সৃষ্টির বাসনা জাগে নি, ঐ প্রবন্ধের জরুরিত্বেই তার প্রমাণ। অতএব এ ছদ্মনাম এ প্রবন্ধের পক্ষে সংগত হয়েছে সন্দেহ নেই। হতে পারে এ লেখা মূলতঃ অন্যের, কিন্তু সেক্ষেত্রে কবি এর নিশ্চিত পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন। এ লেখা যে তাঁরই এ কথা স্বীকার করতে কোনো বাধাই নেই। তবে নিজের বিরুদ্ধেও তিনি

শেষের কবিতায় একবার নিবারণ চক্রবর্তীকে খাড়া করেছিলেন, সে নিবারণ চক্রবর্তীও আসলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই। অর্থাৎ তাঁকে তিনি পুরোপুরি শক্র বানাতে পারেন নি। এ ক্ষেত্রে তিনি নিজেকেই দু ভাগ করে নেগেটিভ আর পজিটিভ -ধর্মীর মিলনে নিরপেক্ষ সাজতে চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। কিন্তু সে সম্পূর্ণ অন্য প্রস্তাব।

এডওয়ার্ড টমসন পূর্বে ছিলেন বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজের অধ্যাপক। বাংলা দেশে বাস করে কিছু বাংলা চর্চা করেছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনী লেখার উদ্দেশ্যে উপকরণ-সংগ্রহ-মানসে তিনি একবার শান্তিনিকেতনে তাঁর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন।

অতঃপর তাঁকে দেখা যায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার লেকচারার রূপে। তাঁর বই *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist*— অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়। এ বইতে বহু ক্রটি। স্পষ্টই বোঝা যায় বাংলা-ভাষা-শিক্ষা তাঁর অসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু এই অসম্পূর্ণ ভাষাজ্ঞান নিয়ে এবং সে বিষয়ে কিছুমাত্র বিনয় প্রকাশ না করে (মহৎ ইচ্ছা সত্ত্বেও) যেভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথের মত গভীর ভাব এবং অতি কোমল এবং সূক্ষ্ম ভাবরসের কবিকে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যায় বিকৃত করেছিলেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অস্বস্তি বোধ করা খুবই স্বাভাবিক। প্রবাসীর ঐ প্রবন্ধটি সেই অস্বস্তিবোধ থেকেই লেখা, অথচ কত তাৎপর্যপূর্ণ এবং যুক্তিপূর্ণ। তাঁর মূল উদ্দেশ্য, এ কার্যে টমসনের অধিকার কতখানি তা দেখানো। অত্যন্ত সাধারণ বোধ এবং বুদ্ধির কথায় ভরা এমন মনোহর একটি রচনা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই লেখা সম্ভব। অতএব এ রচনার লেখক বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিটি যে কে তা এর প্রথম প্যারাগ্রাফটি পড়লেই আর সন্দেহ থাকে না।—

"বাঙালীর পক্ষে বাংলাদেশের গঙ্গা শুধু তো জলের ধারা নয়, তাহার চেয়ে অনেক বেশি। জলের ধারা বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু সেই অনেক বেশিটি অনির্বচনীয়, তাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। এইজন্য গঙ্গা বাঙালীর মনে প্রাণে যে বিচিত্র ও গভীর আনন্দ আনে, তাহার প্রতি আমাদের যুগযুগান্তরব্যাপী যে নিরতিশয় মমত্ববোধ আছে, ঠিকটি তাহার রস বোঝা এমন কোনো বিদেশীয়ের পক্ষে সম্ভবপর নয় বাঙালীকে অন্তরঙ্গভাবে যে জানে না। এই জন্য ডাণ্ডিবাসী বণিক টেমস নদীর তীরকে উৎপীড়িত ও তাহার জলপ্রবাহকে কলুষিত করিতে যে পরিমাণে সংকোচ বোধ করে, গঙ্গাতীরে তাহা করে না।"

দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে কথাগুলি আরও ব্যাখ্যাত —

"ভাষামাত্রের মধ্যেই একটা আভিধানিক অর্থের এবং ব্যাকরণগত নিয়মের ধারা আছে, বিদেশী শব্দতত্ত্ববিদদের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু সেই ভাষার মধ্যে আর-একটি ঐশ্বর্য আছে, যাহা তাহার বস্তুর চেয়ে অনেক বেশি, যাহা পৃথিবীর চারিদিকের বায়ুমণ্ডলের মতো, যাহার ভিতর দিয়া আলো আসে, বর্ণ বিভাসিত হয়, যাহা প্রাণকে সমীরিত করে, অথচ যাহাকে পকেটে লওয়া যায় না, সিন্দুকে ভরা চলে না, যাহাকে রক্তের মধ্যে পাই, নিঃশ্বাসের মধ্যে অনুভব করি, যাহা আমাদের প্রাণের সামগ্রী।" ইত্যাদি।

বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় সাময়িকভাবে এর লেখক সেজেছিলেন, একটু দূর থেকে রবীন্দ্রনাথ ও টমসন —উভয়কেই দেখার উদ্দেশ্যে। লেখাটি সেজন্য দ্বিধাসংকোচহীন সত্যভাষণে মূল্যবান হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে।

এ প্রবন্ধে যেমন রবীন্দ্রনাথ তৃতীয় কোনো ব্যক্তির ভঙ্গি বা ভাষা অনুকরণ করেন নি, আন্নাকালী পাকড়াশী সেজেও তাই করেছেন। ঐ লেখিকা ও রবীন্দ্রনাথ যে অভিন্ন এ কথা গোপন রাখবার কোনো চেষ্টাই তিনি করেন নি তাঁর নিজস্ব ব্যঙ্গ-লিখনভঙ্গিটি বজায় রেখে।

আন্নাকালী পাকড়াশীর লেখা এই ব্যঙ্গ কবিতাটির নাম 'নারীর কর্তব্য'— বেরিয়েছিল অলকা মাসিক পত্রে ১৩৪৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (খ্রী. ১৯৩৯), পরে 'প্রহাসিনী'র অন্তর্ভুক্ত।

'নারীর কর্তব্য' আন্নাকালী পাকড়াশী নিজে লিখলে তাঁর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের এতখানি সফল অনুকরণ কি সম্ভব হত? কোনো নতুন লেখক বা লেখিকার পক্ষে এতখানি অনুকরণসিদ্ধ হওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

কাঠের বয়স নির্ণয়ের মতো ভাষাভঙ্গিরও বয়স নির্ণয়ের একটা উপায় আছে। লেখকের বয়স নির্ণয়ও ঐ একই উপায়ে করা যায়। কারণ লেখার ভঙ্গির একটা বিবর্তন আছে, খুব চেষ্টা করলে কিছু পরিমাণ বয়স লুকানো যায়, যেমন ভানুসিংহের পক্ষে বা চ্যাটারটনের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ সত্য আন্নাকালী পাকড়াশী হবার কোনো চেষ্টাই করেন নি। ঐ নামের মস্‌লিন-আবরণখানির ভিতর দিয়ে পরিপক্ব কবির পাকা চুলদাড়ি দেখা যাচ্ছে।—

'নারীর কর্তব্য' আরম্ভ হয়েছে এইভাবে—

পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্র মন্ত্র মিছে
মনু-পরাশরদের সাধ্য নাই টানে তারে পিছে।
বুদ্ধি মেনে চলা তার রোগ
খাওয়া-ছোঁওয়া সব-তাতে তর্ক করে, বাধে গোলযোগ।

এই চারটি ছত্রের মধ্যেই কবিকে চেনা যায়। এর পর বাকি কবিতা তো পড়েই আছে।

এর এক জায়গায় আছে—

সন্ধ্যাবেলা বিধবা ননদি বসে ছাতে
জপমালা ঘোরে হাতে।
বউ তার চুলের জটায়
চিরুনি আঁচড় দিয়ে কানে কানে কলঙ্ক রটায়
পাড়া প্রতিবেশিনীর— কোনো সূত্রে শুনতে সে পেয়ে
হন্তদন্ত আসে ধেয়ে
ও-পাড়ার বোসগিন্নি; চোখাচোখা বচন বানায়ে
স্বামীপুত্র-খাদনের আশা তারে যায় সে জানায়ে।

এ ভঙ্গি, এ ছবি, এ ভাষা, সর্বাঙ্গে লেখকের পরিচয় বহন করছে। স্বামীপুত্র-খাদনের কথাটিও গ্রাম্য ভাষার মার্জিত রূপ, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা গল্পের ভাষা স্মরণ করিয়ে দেয়: "কোথা হইতে এক চক্ষু-খাদিকা, ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী অষ্টকুষ্ঠির পুত্রী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে" ইত্যাদি।

'আন্নাকালী পাকড়াশী'র মূলে নিছক কৌতুকসৃষ্টির প্রবৃত্তি। সাধারণ পাঠকপাঠিকা পড়তে গিয়ে চমকে যাবে, বলবে, 'তাই তো! এমন মেয়ে-কালাপাহাড় এল কোত্থেকে?' এ কথা ভেবে নিশ্চয় কবি মনে মনে হেসেছিলেন।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ছদ্মনাম গ্রহণ করা নতুন কিছু নয়। তিনি তাঁর বহু নাটকে ঠাকুর্দার ছদ্মনামে, শেখরের ছদ্মনামে, অন্ধ বাউলের ছদ্মনামে, অথবা গোরা উপন্যাসে (শেষ অধ্যায়ের মোহমুক্ত) গোরার ছদ্মনামে, বারবার দেখা দিয়েছেন। এসব ছদ্মনাম আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা, পাঠককে বিভ্রান্ত করার ছদ্মনাম নয়, কিন্তু তবু এগুলিকে ছদ্মনাম অবশ্যই বলা চলে। এইভাবে কখনও বা নিজের সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে, কখনও বা নিজের হাতে ভিন্ন নাম সহি করার মধ্যে কবি নিজেকে দেখে মাঝে মাঝে আনন্দ পেয়েছেন।

এর কোনোটার মধ্যেই কাউকে স্থায়ীভাবে ঠকাবার মতলব তাঁর কোনোদিনই ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপন্থা

অমিয়কুমার সেন

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন তার সূচনায় তিনি বলেছিলেন—

"মানুষের জগতের সঙ্গে আমাদের এই মাঠের বিদ্যালয়টির সম্বন্ধটিকে অবারিত করিবার জন্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি। আমরা সেই বড়ো পৃথিবীর নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছি। কিন্তু, সেই নিমন্ত্রণ তো বিদ্যালয়ের দুই শো ছাত্র মিলিয়া রক্ষা করিতে যাইতে পারিব না। তাই স্থির করিয়াছিলাম, তোমাদের হইয়া আমি একলাই এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব। আমার একলার মধ্যেই তোমাদের সকলের ভ্রমণ সারিয়া লইব। যখন আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিব তখন বাহিরের পৃথিবীটাকে আমার জীবনের মধ্যে অনেকটা পরিমাণে ভরিয়া আনিতে পারিব।"

শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের কাছে তাঁর এই ভাষণ আজকের দিনের সমস্ত মানুষের প্রতিই প্রয়োগ করা চলে। এ যুগের মহামনীষীদের মধ্যে যাঁরা সমস্ত পৃথিবীর প্রতিভূ হিসেবে মানুষের জগতে ভ্রমণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের স্থান তাঁদের মধ্যেও একক। বাইরের পৃথিবীটাকে নিজের মধ্যে ভরে আনবার সাধনায় যাঁরা জীবন ব্যয় করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রগণ্য। পৃথিবীর নগণ্যতম মানুষও তাঁর কাছে অপরিসীম মূল্য পেয়েছে, পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের মানুষকেও তিনি গভীর সহানুভূতির দৃষ্টিতে নিকট করে তুলেছেন। মানুষের দুঃখ-বেদনার এমন নিখুঁত প্রতিধ্বনি, মানুষের অন্তরজগতের এমন নিপুণ ভাষ্য, মানুষের অগণিত সমস্যা সম্বন্ধে এমন নিবিড় সহানুভূতি, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে এমন দূরদৃষ্টি, এমন সংহত আকারে আর কোথাও একটিমাত্র মানুষকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়েছে কি না সন্দেহ। শুধু তাই নয়, মানুষের দুঃখ-বেদনা-বিফলতাকে, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-সফলতাকে তিনি এমন গভীর এবং ব্যাপক করে দেখেছেন যে, ভবিষ্যতে বহুদিন পর্যন্ত মানুষের যে-কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারব ; তাঁর রচনা তাঁর চিন্তা আমাদের পথের সন্ধান দেবে।

আজ সামাজিক অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিক নানা সমস্যা মানুষকে পীড়িত করছে। অ্যাটম্‌কে বিশ্লিষ্ট করার পদ্ধতি মানুষের অধিগত হয়েছে সত্য কিন্তু অন্তরে অন্তরে দেউলে মানুষের কাছে বিশ্লিষ্ট অ্যাটমের বিরাট শক্তি পশুশক্তিরই প্রতিরূপ। পুরাণে বর্ণিত ভস্মাসুর মহাদেবের কাছ থেকে এই বর পেয়েছিলেন যে তাঁর স্পর্শে মানব-দেবতা-গন্ধর্ব সকলেই ভস্ম হয়ে যাবে। কিন্তু বিচারবুদ্ধিহীন অসুর এই অমিত শক্তিকে নিজের উপকারে নিযুক্ত করতে পারেন নি। এই শক্তির অপব্যবহার করতে গিয়ে নিজেরই মৃত্যু ডেকে এনেছিলেন। মানুষও আজ ভস্মাসুরের মত অপরিসীম শক্তির বর লাভ করেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সে এই শক্তিকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করতে পারবে না ; হয়তো-বা নিজের ধ্বংসের জন্যই এই শক্তিকে সে নিয়োজিত করবে। মানুষের এই দুর্দিনে অল্পসংখ্যক যে-কটি মানুষ মানুষের জন্য অনির্বাণ বিশ্বাসের আলো জ্বালিয়ে তার শুভবুদ্ধিকে উদ্বোধিত করতে চেষ্টা করছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের

অন্যতম। তাঁর চিন্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে, তাঁর দৃষ্টি দিয়ে মানুষের দিকে তাকিয়ে আত্মস্থ হতে পারলে মানুষের বিরাট সম্ভাবনাও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অতি অল্পবয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ অনুভব করেছেন। বাল্যে এবং কৈশোরে এই যোগ শুধু একটা কবিত্বময় অনুভূতির আকারেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর পরিণত মনের কাছে এই অনুভূতি একটি গভীর বিশ্বাসে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর জীবনের পরম ব্রত মানবমৈত্রীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই পরিণতির ইতিহাসও বিস্ময়কর।

মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে অবলম্বন করে। অভিজাত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র রবীন্দ্রনাথ; তবু সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের প্রতি যে গভীর দরদ তাঁর গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে, তার তুলনা নেই। এই সহানুভূতি তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মানুষের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল। এই গভীর শ্রদ্ধার পরিণতি হিসেবেই তিনি ধনী দরিদ্র জাতি বর্ণ এবং দেশকাল-নির্বিশেষে মানুষের ব্যক্তিত্বকে পরম মূল্য দেবার প্রয়াসী হয়েছিলেন। কর্মবিভাগের প্রয়োজন এবং ধনতান্ত্রিক সুবিধার দিক দিয়ে তিনি কোনো সময়ে ভারতবর্ষের বর্ণবিভেদের পক্ষ সমর্থনও করেছিলেন, কিন্তু বর্ণবিভেদের বিপক্ষে তাঁর সবচেয়ে বড় আপত্তি ছিল এই কারণে যে, এই সামাজিক রীতি মানুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের পরিপন্থী। এই বাধাকেই মানব-দরদী রবীন্দ্রনাথ মানুষের সবচেয়ে বড় অপমান বলে মনে করতেন। বর্ণবিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে তাঁর মনে যে-সব অভিযোগ সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, তাই একদিন তাঁর লেখায় নিঃসৃত হয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে এই সামাজিক ব্যাধির পরাজয়ের সূচনা করেছিল। এ পাপ যে ভারতবর্ষ থেকে কিছু পরিমাণেও দূরীভূত হয়েছে তার মূলে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

ভারতবর্ষের বর্ণভেদের প্রতি সচেতনতার ফলে পশ্চিমের দেশগুলিতে নূতনতর বর্ণভেদের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। ধনতান্ত্রিক বিভেদ এবং জাতিবৈর পশ্চিমের আধুনিক ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। ভারতবর্ষের বর্ণভেদের প্রতি যেমন, আধুনিক ইউরোপীয় বর্ণভেদের প্রতিও তেমনি যুক্তি এবং নীতির দিক দিয়ে তিনি কঠোর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। তাঁর অভিযোগ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের দিক থেকে ততটা ছিল না যতটা ছিল মানুষের ব্যক্তিত্বের দিক থেকে। শুধু প্রবন্ধে নয়, বহু নাটকে এবং কাব্যেও তিনি পশ্চিমের আধুনিক সভ্যতার ব্যক্তিত্বনাশী দিকটির প্রতি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন। মুক্তধারা রক্তকরবী ইত্যাদি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক যন্ত্রযুগের কল্যাণকর দিকটির প্রতি তিনি যে অন্ধ ছিলেন তা নয়; কিন্তু যন্ত্র যেখানে মুখ্য হয়ে উঠে ব্যক্তিকে গ্রাস করে ফেলে সেখানকার যান্ত্রিকতাকে তিনি ক্ষমা করেন নি।

জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি এবং শিল্পবিপ্লবের (Industrial Revolution) ফলে ইউরোপ বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ উন্নতির প্রায় অপরিহার্য উপাদান হিসেবে সে পেয়েছে অন্যান্য জাতির প্রতি বিদ্বেষ এবং অশ্রদ্ধা। উন্নতিলাভের জন্য পরস্পরের মধ্যে যে অকল্যাণকর প্রতিযোগিতা চলেছে, তার ফলে পশ্চিমের দেশগুলি ক্রমশই অন্তরের দিক থেকে একে অন্যের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। অপরপক্ষে, যে দেশগুলি বিজ্ঞানের উন্নতির আলোক পায় নি তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা ইউরোপের জাতিদের মধ্যে প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে। অন্য জাতির প্রতি এই বিদ্বেষ

এবং অশ্রদ্ধা সভ্যতার পরম শত্রু। এই শত্রু ইউরোপের দেশগুলিকে অধিকার করে প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যেও জাতিবিদ্বেষের বিষ বহুলপরিমাণে সঞ্চারিত করেছে।

ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস মন্থন করে রবীন্দ্রনাথ একটি সত্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। সেটি হল এই যে, ভারতবর্ষ যখন উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল তখনও সে অন্য জাতির প্রতি অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষ পোষণ করে নি। যেসব জাতি ভারতবর্ষকে পদানত করার অভিপ্রায় নিয়েও এদেশে এসেছিল তাদেরও ভারতবর্ষ পর বলে শত্রু বলে দূর করে দেয় নি। তাদের জাতীয় চরিত্রের মহত্তম উপাদানগুলি নিজের জীবনযাত্রায় গ্রহণ করে ভারতবর্ষ পরকে আপন এবং শত্রুকে মিত্র করে নিয়েছে। পশ্চিমের আধুনিক উন্নতির ইতিহাসে এই গুণটির একান্ত অভাব। সর্বমানবের মৈত্রীর পথে এটি একটি প্রকাণ্ড অন্তরায়। সর্বজাতির মিলনের যে মহাস্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তার তুলনা মানুষের সমগ্র ইতিহাসে বড় বেশি নেই। সে-মিলন শুধু সম্পূর্ণ হতে পারে পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের দ্বারা। কোনো জাতি যদি আপনার উন্নতির অভিমানে এই কথা মনে করে যে তার অন্য জাতির কাছ থেকে গ্রহণ করার মত কোনো কিছুই নেই, তবে অন্য জাতিকে দান করার অধিকার থেকেও সে বঞ্চিত হবে। আবার অন্যদিকে জাতীয় দুর্দিনের পঙ্কে নিমগ্ন কোনো জাতি যদি নিজেকে হীন মনে করে, যদি ভাবে অন্যজাতিকে দান করার মত কোনো পুঁজিই তার নেই, তবে অন্য জাতির থেকে যে-দান সে গ্রহণ করেছে তাও ব্যর্থ হয়ে যাবে। জ্ঞানবিজ্ঞান এবং শিক্ষাসংস্কৃতির পণ্য শুধু আমদানী বা শুধু রপ্তানী করা চলে না। আমদানী এবং রপ্তানী, দেওয়া এবং নেওয়া, একই সঙ্গে চলতে থাকে। যে-কোনো একটি বন্ধ হয়ে গেলেই অন্যটি বিফল হয়। আন্তর্জাতিক জ্ঞানবিজ্ঞান এবং শিক্ষাসংস্কৃতির বাণিজ্যকে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহারিক পণ্যের বাণিজ্যের থেকে অনেক বেশি মূল্যবান্ মনে করতেন। ১৯৩০ সনে প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তিবাদী সম্মেলনে প্রেরিত তাঁর একটি বাণীতে এই চিন্তাটি লিপিবদ্ধ হয়ে আছে—

"The human world is made one, all the countries are losing their distance every day, their boundaries not offering the same resistance as they did in the past age. Politicians struggle to exploit this great fact and wrangle about establishing trade relationships. But my mission is to urge for a world-wide commerce of heart and mind, sympathy and understanding and never to allow this sublime opportunity to be sold in the slave markets for the cheap price of individual profits or be shattered away by the unholy competition in mutual destructiveness."

এক জাতির মানুষের প্রতি আর-এক জাতির মানুষের বিদ্বেষ এবং অশ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথকে কি পরিমাণ ব্যথিত করত তার পরিচয় আছে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর বিতর্কের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা ছিল ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অসহযোগ শেষ পর্যন্ত ইংরেজ জাতির প্রতি ভারতবর্ষের অসহযোগ এবং বিদ্বেষে পরিণত হবে। গান্ধীজিকে তিনি তাই বার বার সাবধান করে দিয়েছিলেন। গান্ধীজিও প্রত্যুত্তরে এই সাবধানবাণীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সত্যের আহ্বান বা Call of Truth নামক প্রবন্ধে সংকীর্ণ-জাতীয়তার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতের জাতীয় উদ্বোধন বিশ্বচিত্ত উদ্বোধনের অঙ্গ হবে—

"আজ এই বিশ্বচিত্ত-উদ্বোধনের প্রভাতে আমাদের দেশে জাতীয় কোনো প্রচেষ্টার মধ্যে যদি বিশ্বের সর্বজনীন কোনো বাণী না থাকে তা হলে তাতে আমাদের দীনতা প্রকাশ করবে। আমি বলছি নে, আমাদের আশু প্রয়োজনের যা-কিছু কাজ আছে তা আমরা ছেড়ে দেব। সকালবেলায় পাখি যখন জাগে তখন কেবলমাত্র আহার-অন্বেষণে তার সমস্ত জাগরণ নিযুক্ত থাকে না, আকাশের আহ্বানে তার দুই অক্লান্ত পাখা সায় দেয় এবং আলোকের আনন্দে তার কণ্ঠে গান জেগে ওঠে। আজ সর্বমানবের চিত্ত আমাদের চিত্তে তার ডাক পাঠিয়েছে; আমাদের চিত্ত আমাদের ভাষায় তার সাড়া দিক, কেননা ভাবের যোগ্য সাড়া দেওরার ক্ষমতাই হচ্ছে প্রাণশক্তির লক্ষণ।"

মহাত্মা গান্ধী এই প্রবন্ধের উত্তরে যে-প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে তিনি Great Sentinel বা মহাপ্রহরী আখ্যা দিয়েছিলেন। শুধু ভারতবর্ষের সম্পর্কেই যে রবীন্দ্রনাথ মহাপ্রহরীর কাজ করেছেন তা নয়। তিনি ভারতবর্ষের জাতীয় ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে সমস্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের মহাপ্রহরীর ভূমিকাও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পন্থা ছিল মানুষের প্রতি মানুষের অপমান দূর করে, জাতির প্রতি জাতির বিদ্বেষ এবং অশ্রদ্ধা অপসারিত করে সমগ্র মানবজাতিকে এক নূতন জগতের দ্বারে উত্তীর্ণ করে দেওয়া।

জাতিবিদ্বেষের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছিলেন যে বর্তমানে প্রাচ্যের জাতিসমূহের মধ্যে নিজেদের ঐতিহ্য এবং প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং পাশ্চাত্ত্যের জাতিসমূহের মধ্যে জাগতিক উন্নতি থেকে জাত আত্মাভিমান এবং অবিনয়ই এর মূল কারণ। এই দুটি মূল কারণের প্রতি জাতিপুঞ্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি। বহুবার পৃথিবী-পরিক্রমার পথে পথে তিনি এই কারণগুলি দূর করার জন্য সক্রিয় এবং একক প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির সূচনা তাঁরই কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত ছিল। প্রাচ্যের দেশগুলি পরিভ্রমণ করার সময় তিনি তাঁদের বিস্মৃত প্রাচীন ঐশ্বর্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁদের সকলের মধ্যেকার যোগসূত্রটি আবিষ্কার করার প্রয়াসী হয়েছেন। কারণ নিজস্ব ঐতিহ্যে বলীয়ান না হলে প্রাচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞানবাহিনী সভ্যতা তাঁদের কাছে সর্বগ্রাসীরূপে প্রতিভাত হবে। অপর পক্ষে পশ্চিমের দেশগুলিতে গিয়ে তিনি এ কথাই প্রচার করতে চেয়েছেন যে, পশ্চিম যেন না মনে করে যে পূর্বদেশের থেকে গ্রহণ করার মত তার কোনো কিছুই নেই। পশ্চিমের আছে জ্ঞান, পূর্বের আছে বিজ্ঞতা। জ্ঞানকে বিজ্ঞতার বিনয়ে পরিশোধন না করলে জ্ঞান একদিন মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনের এই স্বপ্ন সফল করার জন্যই তিনি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশ্বভারতীর আদর্শ হল, To study the the mind of man in its realisation of different aspects of truth from diverse points of view,· · সমস্ত পৃথিবীকে তিনি শান্তিনিকেতনের নীড়ে আমন্ত্রণ করে এনে বিশ্বমানবমৈত্রীকে সফল করতে চেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের একটি ছাত্রকে (সুহৃদকুমার মুখোপাধ্যায় বা সু-বাবু) তিনি প্রথম মহাযুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপের প্রাঙ্গণ থেকে লেখা একটি চিঠিতে যে-আহ্বান পাঠিয়েছিলেন, সে আহ্বান সমগ্র বিশ্বের হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণিত হবার যোগ্য।—

"ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোলবিভাগের মায়াগণ্ডি সম্পূর্ণ মুছে যাক—সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক—সেই জায়গা হোক আমাদের শান্তিনিকেতন। আমাদের জন্যে একটি মাত্র

দেশ আছে, সে হচ্ছে বসুন্ধরা; একটি মাত্র নেশন আছে, সে হচ্ছে মানুষ। আমাদের শান্তিনিকেতন পৃথিবীর উদয়গিরির কাছে, সেখান থেকে আমি অস্তগিরির লোকদের নিমন্ত্রণ করছি। তারা আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে। তাদের বরণ করে নেবার জন্যে তোরা তোদের ঘরকে প্রশস্ত কর— হৃদয়কে উন্মুক্ত কর।"

রবীন্দ্রনাথ মানবমৈত্রীর উপায় হিসেবে অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক বা রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধের গুরুত্বকে স্বীকার করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন বিদ্যা বুদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশ্বমানবের সহযোগিতা। অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ স্বার্থপ্রণোদিত, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রকে স্বার্থকলুষিত করে নি। এদের সহযোগে মিলনই প্রকৃত মিলন। তাঁর 'শিক্ষার মিলন' নামক প্রবন্ধে তিনি এই বাণীই প্রচার করেছেন। যদি মানুষের মিলন এবং সহযোগিতাকে চিরস্থায়ী রূপ দিতে হয় তবে মানুষের শুভবুদ্ধিকে হৃদয়াবেগ এবং স্বার্থের উর্ধ্বে স্থাপন করতে হবে।

বহু যুগ আগে আর-এক মহামানব মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে এমনি চরম মূল্য দিয়েছিলেন, তিনি বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেবের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথও মানবমৈত্রীর যে-পথের কথা বলেছেন তাতেও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকেই সবার উপরে সত্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এঁদের যুক্ত-সাধনা পথভ্রান্ত মানুষকে পথের সন্ধান দেবে, একদা সর্বদেশের এবং সর্বকালের মানুষের মধ্যে স্থায়ী যোগসূত্র রচিত হবে, আজকের বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ এই কামনাই করুক।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসংস্কৃতি

শান্তিদেব ঘোষ

ভারতসভ্যতার ধাত্রীভূমি ছিল গ্রাম। এইখানেই প্রাণের নিকেতন। মনুষ্যত্বচর্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে সর্বত্রই রক্ষিত ছিল। এমন গ্রাম ছিল না যেখানে সর্বজনসুলভ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালা না ছিল। চার-পাঁচটি গ্রামের মধ্যে অন্তত একজন শাস্ত্রগত পণ্ডিত ছিলেন যাঁর ব্রত ছিল বিদ্যার্থীদের বিদ্যাদান করা। এমনি ভাবে সর্বাঙ্গীণ প্রাণশক্তি গ্রামে-গ্রামে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। মানুষের চিত্তকে উপবাসী থাকতে হয় নি। তখনকার সমাজ বিদ্যার যে-কোনো বিষয়কেই শিক্ষণীয় রক্ষণীয় ব'লে জানত। শিক্ষার বিশেষ চর্চা ছিল টোলে চতুষ্পাঠীতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তীর্ণ ছিল বিদ্যার ভূমিকা। বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের নিত্যই ছিল চলাচল। দেশে এমন অনাদৃত অংশ ছিল না যেখানে রামায়ণ-মহাভারত পুরাণকথা ধর্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে না পড়ত। এমনকি, যেসকল তত্ত্বজ্ঞান দর্শনশাস্ত্র কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত, তারও সেচন চলেছিল সর্বক্ষণ জনসাধারণের চিত্তভূমিতে। যাত্রাগানের পালায়, বাউল-বৈরাগীদের গানে, কথকতায় শোনা যেত দেহতত্ত্ব সৃষ্টিতত্ত্ব ও মুক্তিতত্ত্ব। তারই সঙ্গে থাকত নাচ-গান-কৌতুকের দ্রুত মুখরিত ঝংকার। বিচিত্র রসের যোগে লোকে শুনেছে ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বত্যাগ ইত্যাদি কাহিনী। এ ছাড়া গ্রামে গ্রামে নানাপ্রকার ব্রত পার্বণ পূজা জন্ম মৃত্যু ও বিবাহাদি উৎসবের মাধ্যমে নানা প্রকার শিল্প ও নৃত্যগীতবাদ্য ছিল স্বতউৎসারিত। গ্রামে-গ্রামে মন্দির তৈরি হয়েছে, তা আজ ভগ্নপ্রায় হলেও তার স্থাপত্য ও পোড়ামাটির শিল্পকলার উৎকর্ষ আজও আমাদের মনে বিস্ময় সঞ্চার করে। এ সবের শিল্পীদের বাস ছিল গ্রামে। গ্রামসমাজের প্রতিদিনকার ব্যবহৃত বস্ত্র ও নানা প্রকার দ্রব্যে আমরা সে যুগের একটি অতিউন্নত শিল্পরুচির প্রকাশ দেখি।

তখনও দুঃখ ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে, কিন্তু সেইসঙ্গে এমন-একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল যাতে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যে মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের অবারিত পথ দেখিয়েছে, মানুষের যে শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতায় হেয় করতে পারে না তার পরিচয় উজ্জ্বল করেছে।

গ্রামসমাজের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল স্বৈচ্ছিক। তার পিছনে কোনো আইন ছিল না, বাইরের কোনো তাগিদ ছিল না। তার স্বতঃসঞ্চার ছিল ঘরে-ঘরে, যেমন রক্ত চলাচল হয় সর্বদেহে। এই ভাবে গ্রামবাসীরা কর্মে ও কৃষিকাজের সঙ্গে জ্ঞান ও আনন্দের আবেষ্টনে গ্রামগুলিতে সংস্কৃতির একটি পরিপূর্ণ প্রাণবান আবহাওয়া রচনা করতে পেরেছিল।

কেউ কেউ মনে করেন, প্রাচীন গ্রামসমাজের যে চিত্র আমরা আজ আঁকি প্রকৃতপক্ষে গ্রামগুলি নাকি সেইরূপ ছিল না। জাতিভেদ ও সর্ববিষয়ে কূপমণ্ডূকতার দূষণীয় মনোভাব আঁকড়েই গ্রামসমাজ কোনো রকমে বেঁচে ছিল; অর্থাৎ সে সমাজ ছিল প্রবাহহীন বদ্ধ জলাশয়ের মত দূষিত। এ কথার সত্যতা ইংরেজ-যুগের গ্রামগুলির অবস্থা দেখে আমরা হয়তো স্বীকার করে নিতে পারি। কিন্তু তার পূর্ববর্তী

যুগের গ্রামসমাজের পক্ষে তা সত্য বলে মানতে পারি না। মুসলমান-যুগের শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার ধাত্রীভূমি যে ছিল গ্রাম, এ কথার সমর্থনে কয়েকটি কথা বলতে ইচ্ছা করি।

ভারতীয় সভ্যতা মূলে চিরকালই ধর্মকেন্দ্রিক। ভারতীয় সমাজকে অতি প্রাচীনকালে চালনা করেছেন বর্ণাশ্রমের মুনিঋষিরা। বৌদ্ধযুগে করেছেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা পরিচালিত বৌদ্ধবিহার নামক বড় ও ছোট শিক্ষাকেন্দ্রগুলি; মধ্যযুগে করেছেন হিন্দু ও মুসলমান সন্ত ও সুফী সাধকেরা, বড় বড় তীর্থকেন্দ্রের গুরুরা। ইংরেজ-যুগে সমাজকে চালনা করেছেন যাঁরা তাঁরা সকলেই প্রায় কোনো-না-কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের গুরু বা ধর্মমতের প্রকৃত ভক্ত। যার শেষ উদাহরণ এ যুগে হলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী। দেখা গিয়েছে যে, ধর্মাত্মা মহাপুরুষেরা যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজকে চালিয়েছেন; সমাজের নানা সমস্যার সুরাহা করবার চেষ্টা করছেন। ইরেজপূর্ব যুগ পর্যন্ত প্রায় সব ধর্মাত্মাই ছিলেন গ্রামীণ সংস্কৃতির সৃষ্টি। এঁদের জন্ম ও শিক্ষা গ্রামের পরিবেশে। একমাত্র বুদ্ধদেব জন্মেছিলেন নগরে, বড়ও হয়েছিলেন সেই আবহাওয়ায়। কিন্তু তাঁকে সেই শহরের আবহাওয়া থেকে পালিয়ে যেতে হল গ্রামাঞ্চলে। তিনি নিজে তাঁর সাধনার প্রচার করলেন গ্রামে ও তীর্থে যা ছিল উচ্চস্তরের সাধনার কেন্দ্র। ধর্মকে কেন্দ্র করেই নানা শিল্পকলা সংগীত নৃত্য অভিনয়ের চর্চা হয়েছে প্রাচীন যুগে, গ্রামে-গ্রামে। তাই সে যুগে রাজাদের আনতে হত জ্ঞানী গুণী ও শিল্পীদের নিজেদের দরবার সাজানোর জন্যে গ্রাম থেকে। কৃত্তিবাস ফুলিয়া গ্রামের কবি। তিনি গৌড়েশ্বরের দরবারে যখন গেলেন তখন তাঁর নাম কবি হিসেবে গ্রামসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। গ্রাম যদি কূপমণ্ডুক হত তাহলে গ্রামের কবি চণ্ডিদাস লিখতে পারতেন না 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। চৈতন্যদেবের জন্ম গ্রামে, শিক্ষা তীর্থক্ষেত্রে, ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র তীর্থে ও গ্রামে। অদ্বৈতবাদী ধর্মপ্রচারক শংকরাচার্যের জন্ম ও শিক্ষা গ্রামে, তার প্রচার রাজধানীতে নয়, তীর্থে ও গ্রামে। ভক্তিমার্গের গুরু মাধবাচার্যের জন্ম ও কর্ম গ্রামে। আসামের বৈষ্ণবাচার্য শংকরদেব জন্মেছিলেন গ্রামে, তাঁর প্রচারস্থান মঠগুলিও ছিল রাজাদের রাজধানীর বহু দূরে, তিনি নৃত্য গীত অভিনয় ও চিত্রকলার প্রচার করেছিলেন ঐ মঠের সাহায্যে গ্রামের শিল্পীদের দিয়ে। কবীর নানক প্রভৃতি সন্তদের আবির্ভাব গ্রাম থেকে, গ্রামই ছিল এঁদের কর্মস্থল। ধর্মনেতারা যুগের প্রয়োজন সাধনের জন্যেই এসেছিলেন। গ্রামসমাজের সাহায্যেই তাঁদের কাজ এগিয়েছিল।

এইভাবে বিচার করে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে প্রাচীন গ্রামসমাজের যে চিত্র গুরুদেব এঁকেছেন এ নিছক ভাববিলাস বা প্রাচীনের প্রতি মোহবশে নয়। সে সমাজ জীবন্ত ছিল বলেই যখন যেভাবে যুগের প্রয়োজনে তার পরিবর্তন দরকার হয়েছে তখনি বিনা দ্বিধায় তা করেছে। মুসলমান-যুগের শেষ পর্যন্ত এই ছিল গ্রামজীবনের প্রকৃত স্বরূপ। প্রথম বাধা পেল যখন থেকে ইংরেজরা নগরকে কেন্দ্র করে তাদের সভ্যতাকে ভারতের উপর আরোপ করল। নতুন সভ্যতার সঙ্গে যোগ রক্ষার সুযোগ না পেয়ে স্থাণুবৎ হয়ে রইল গ্রামগুলি। এত যুগ ধরে যা পেয়েছিল তাকে কোনো মতে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা ছাড়া গ্রামের যেন আর কোনো কাজই রইল না।

ইংরেজ-শাসনের যুগে শহরে ইয়োরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশের যে অবস্থা দাঁড়াল তাতে দেখা গেল গ্রামগুলি শহরকে চারিদিকে যদিও ঘিরে আছে তবু শত যোজন দূরে। মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বলতে শহরবাসী আমরা যা বুঝি সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা বলি

ছোটলোক, ছোটলোকের পক্ষে সকল প্রকার মাপকাঠিই ছোট। ছোটরা ভদ্রলোকের ছায়াচর, তাদের প্রকাশ অনুজ্জ্বল ; অথচ দেশের অধিকাংশই তারা, সুতরাং দেশের অন্তত বারো আনাই অনালোকিত। ভদ্রসমাজ তাদের স্পষ্ট করে দেখতেই পায় না। মোট কথা হচ্ছে, দেশের যে অতিক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা মান সেই সব লোকের সঙ্গে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি অথচ আমাদের দেশ এক নয়। গ্রামের ঠিকমত পরিচয় নেবার উপযুক্ত কৌতূহল পর্যন্ত আমাদের নেই। ওরা ছোটলোক ; আমাদের মনে মানুষের প্রতি যেটুকু দরদ আছে তাতে ক'রে ওরা আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। আমাদের জনসাধারণের মধ্যে নানা আন্দোলন চলে আসছে, কিন্তু সে আমাদের শিক্ষিত সাধারণের অগোচরে। জানবার জন্যে কোনো ঔৎসুক্য নেই— কেননা তাতে পরীক্ষা পাসের মার্কা মেলে না। এই কারণেই— দেশ থেকে সৌন্দর্য গেল, স্বাস্থ্য গেল, বিদ্যা গেল, আনন্দের প্রবাহ ক্ষীণ, প্রাণও অবশিষ্ট আছে অতি অল্পই। পল্লীর জলাশয় শুষ্ক, বায়ু দূষিত, পথ দুর্গম, ভাণ্ডার শূন্য, সমাজবন্ধন শিথিল ; ঈর্ষা কলহ কদাচার লোকালয়ের জীর্ণতাকে প্রতি মুহূর্তে জীর্ণতর করে তুলছে।

উপরের কথাগুলি গুরুদেবই বলেছিলেন। বলতে পারার কারণ হল, বারো বৎসরের উপর একটানা পূর্ববাংলার পল্লী-অঞ্চলে বাস ও পল্লীর সমাজব্যবস্থা স্বাস্থ্য অর্থ শিক্ষা ও তার আনন্দের জীবনের সঙ্গে ভালোবাসার দ্বারা ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ। সেই পরিচয়েই ইংরেজ সভ্যতা ভারতের নগরসমাজ ও গ্রাম-সমাজের কতখানি ক্ষতি করেছে সহজেই তা তিনি বুঝতে পারলেন। ভাবতে লাগলেন উপায়। এবং বুঝলেন যে, এ যুগের বিদেশী সভ্যতা যতই উজ্জ্বল বা নিজেদের দেশের পক্ষে যতই প্রাণবান হোক-না কেন, আমাদের দেশে তার অনুকরণ বৃথা হয়েছে। আমরা তাদের সাজ পরেছি, বুলি শিখেছি, কিন্তু খাঁটি ইংরেজ বনে যাওয়া সম্ভব হয় নি। ইংরেজ জাতির চরিত্রের গুণগুলির কিছুই আমরা নিতে পারি নি। ভাবলেন, যে সমাজব্যবস্থার প্রভাবে আমাদের প্রাচীন সভ্যতা বা সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করেছিল সেই দিকেই আমাদের ফিরে তাকাতে হবে। নতুন যুগের সভ্যতা গড়ে তোলবার কথা চিন্তা করেই শহরবাসী ভদ্র-লোকদের ডাক দিয়ে 'স্বদেশী সমাজ' (১৩১১) ও 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (১৩১২) বক্তৃতার মাধ্যমে বলেছিলেন গ্রামের দিকে ফিরে তাকাতে, তার হৃদয়টিকে সহানুভূতির সঙ্গে অনুভব করতে। শিক্ষায় স্বাস্থ্যে ধনে মানে গ্রামবাসী যতই ক্ষুদ্র হোক-না কেন তাদের মধ্যেই ভারতের প্রকৃত স্বরূপটি এখনো বেঁচে আছে। সেইখানেই আসল ভারতবর্ষ। বলেছিলেন, নগরের মুষ্টিমেয় ভদ্রসমাজই একমাত্র ভারতবর্ষ নয়। যদি দেশের মুক্তিসাধন করতে হয় তবে পল্লীসমাজের আত্মশক্তিকে জাগাতে হবে। গ্রামকে অবহেলা করে নয়, তার সঙ্গে ভালোবাসার দ্বারা এক হয়ে। শহর ও গ্রাম সকলেই যেন এক হয়ে বলতে পারে— আমরা বিদেশীর মুখাপেক্ষী হয়ে বাঁচতে চাই না, আমাদের যা প্রয়োজন আমরা নিজেদের শক্তিতেই তা গড়ে নেব। দেশনেতারা তাঁর পরামর্শ বুঝি গ্রহণ করলেন না। কিন্তু গুরুদেব নিজে দেশবাসীকে উদ্দেশ করে যখনই যা বলেছেন সে কথা দেশ গ্রহণ করল কি না-করল তার অপেক্ষায় তিনি কখনো বসে থাকেন নি। নিজে হাতে-কলমে কাজ করে সেই চিন্তাকে রূপ দেবার চেষ্টা করতেন। এ পথেও তিনি কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন একলা গুটিকতক অনুরাগী সহচর নিয়ে নিভৃতে, পূর্ববাংলার পল্লীতে। ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশ যে পদ্ধতিতে ঘটেছিল, স্থির করলেন, সেই প্রকার একটি আদর্শ কেন্দ্র ভারতের কোথাও তাঁকে গড়তে হবে— যা হবে ভারতীয় সাধনার বিকাশ-কেন্দ্র, প্রাচীনের অন্ধ অনুকরণ

নয়। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ একটি চিন্তা থেকেই শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের উদ্‌ভব। এবং এ দুইয়ের সমষ্টি হল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে ইংরেজ-যুগে প্রবর্তিত স্কুলকলেজের রুটিন ও সিলেবাসের সাহায্যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত। শহরের প্রয়োজনে তাকে অস্বীকার করা সম্ভব হল না। কিন্তু ছাত্রছাত্রী ও কর্মী -সমাবেশে যে এক মানবসমাজ বিশ্বভারতীতে দেখা দিল তার জীবনধারার প্রতি একবার ধীর ভাবে সকলে চেয়ে দেখতে পারেন। এখানে বিভিন্ন জ্ঞান কর্ম মানবসেবা ও নানা প্রকার আনন্দচর্চার যে সম্মিলিত পরিবেশ রচিত হয়েছে, তার সঙ্গে এ সমাজ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আপনা থেকেই এ সমাজ নানা দিকে শক্তি সঞ্চয় করে। নিত্য চেষ্টা হচ্ছে নিজের প্রয়োজনের সব-কিছুই যেন নিজের চেষ্টায় মেটাতে পারে। এবং তা যেন হয় স্বেচ্ছিক। তিনি চেয়েছিলেন, স্কুলকলেজের পড়া ছাড়াও এখানকার নানাপ্রকার সভাসমিতি উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জ্ঞানের চর্চা নানা শাখায় এই সমাজে বিকশিত হয়ে উঠুক, বিচিত্র পথে কর্মের সাধনা সমাজের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাক, আনন্দের আয়োজন বিচিত্র পথে বিস্তারিত হয়ে এই সমাজ ভারতের কাছে দৃষ্টান্তরূপে খাড়া হোক। তাঁর এই চিন্তা ভারতের ইংরেজ-যুগে প্রবর্তিত সভ্যতার কাছ থেকে পাওয়া নয়। কোনোদিক থেকেই সে সমাজের সঙ্গে এর মিল নেই। পুরাতন গ্রামীণ সমাজের যে চিত্র তিনি মনে এঁকেছিলেন এ হল তারই রূপান্তর। যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছি। বিশ্বভারতী গড়ে উঠেছে প্রকৃত দেশজ আদর্শকে অবলম্বন করে। গুরুদেব যে কেবল ভাববিলাসী কবি নন, সত্যকার দেশপ্রেমিক কর্মী এর দ্বারাই তিনি তা নিষ্ঠার সঙ্গে প্রমাণ করে গেলেন।

বহুদিন পর্যন্ত আমাদের ভদ্রসমাজের বিশ্বাস ছিল— পল্লীজীবন মৃতপ্রায়, পূর্বের মত সচল প্রাণপ্রবাহ তার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার পক্ষে নতুন যুগকে সাহায্য করা বা নতুন যুগের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। কিন্তু এই চিন্তার প্রতিবাদ কার্যকরভাবে প্রথম গুরুদেবই করলেন। এবং প্রমাণ করে দেখালেন যে এখনো গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যে যে শক্তি ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগাতে পারলে সমগ্রভাবে এ যুগের ভারতবর্ষ লাভবান হবে। এই কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ উপস্থিত করছি।

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসবের প্রধান অঙ্গ হল মেলা। ভারতের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সেসব জায়গার প্রধান উৎসবে এইরূপে মেলাকে স্থান দিয়েছেন বলে শুনি নি। এ বিষয়ে বিশ্বভারতী একক। এই মেলা-প্রচলনের ধারণা গুরুদেব পেয়েছিলেন আমাদেরই এই দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত মেলাগুলি দেখে ও তার কথা শুনে। 'মেলা' যুগে যুগে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজকে যে কত দিক থেকে সমৃদ্ধ করে এসেছে তা বুঝেই তার কথা বলেছিলেন স্বাধীনতাকামী দেশনেতাদের কাছে, বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' নামে লিখিত ভাষণে। তাঁরই ইচ্ছায় বিশ্বভারতীর প্রধান দুটি উৎসবসূচীর প্রধান অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হয়েছে মেলা। 'ভদ্রলোক' ও 'ছোটলোক'দের মিলনের ক্ষেত্র রচনা করে জ্ঞান কর্ম ও আনন্দের আদানপ্রদান করে যাচ্ছে এই মেলা। 'স্বদেশী সমাজ' বক্তৃতায় মেলাগুলিকে গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির বড় উপায় হিসেবে সাজাবার যে প্রস্তাব গুরুদেব করেছিলেন, বিশ্বভারতীর এই মেলা দুটি সেই আদর্শেই গঠিত হয়ে কতখানি কার্যকর হয়েছে আজ আমরা তা চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি।

গুরুদেবের গানের কথা সকলেই জানেন। এদিক থেকে দেশকে তিনি দিয়ে গিয়েছেন অনেক। তাঁর এই বিরাট সৃষ্টির পথে যে দুটি প্রাচীন ভারতীয় সংগীতধারা তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল তার একটি হল ভারতের উচ্চাঙ্গ হিন্দি সংগীতের আর দ্বিতীয়টি হল বাংলার পল্লীসমাজে প্রচলিত নানা প্রকার সহজ সরল গান— যার মধ্যে বাউল সম্প্রদায়ের গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাবে ভাষায় সুরে ও ছন্দে বাউলদের গানের প্রভাব গুরুদেবের গানে নানা ভাবে ছড়িয়ে আছে। এ ছাড়া নতুন পথেও গুরুদেবের গান এগিয়ে গেছে এই সম্প্রদায়ের গানের সাহায্যে। নাটকে এই বাউলদের জীবনকে খাড়া করলেন আদর্শ চরিত্র হিসেবে। তাঁদের অধ্যাত্মচিন্তা গুরুদেবের অধ্যাত্মজীবনে যে গভীর সাড়া জাগিয়েছিল তার কথাও আমাদের অজানা নয়।

বিশ্বভারতীর যাবতীয় উৎসব-অনুষ্ঠান সভাসমিতির সাজসজ্জার একটি বিশেষ ধারা আছে। সেই সজ্জার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে আলপনা। এ শিল্পচর্চা গ্রামের মেয়েদের মধ্যে যুগে-যুগে চলে এসেছে। এর প্রাণশক্তিকে গুরুদেবই প্রথম অনুভব করলেন এ যুগে। এবং বিশ্বভারতীর যাবতীয় উৎসব ও সভাসমিতিকে এই আলপনা দ্বারা সাজানোর জন্য উৎসাহিত করলেন। শিল্পাচার্য নন্দলালের নেতৃত্বে সেই অজ্ঞাত অখ্যাত গ্রামীণ শিল্প আজ দেশের প্রায় সর্বত্র পরিবেশিত।

এ যুগের শিক্ষিত সমাজের নৃত্য-আন্দোলনের গুরু হলেন গুরুদেব স্বয়ং। তাঁর এই আন্দোলনের পিছনে নানা দেশের পল্লীসমাজের সহজ সরল নাচের প্রভাব আছে। বাংলার বাউলদের নাচের আদর্শও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল বলে 'ফাল্গুনী'তে (১৯১৬) অন্ধ বাউলের চরিত্র রচনা করে সেই চরিত্রের অভিনয় করলেন তিনি নিজে। নাচে গানে ও অভিনয়ে গুরুদেব দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন।

'রাঁয়বেশে' নাচ যখন নতুন করে শিক্ষিত সমাজে পরিচিত হল তখন আমাদের শেখাবার জন্যে গুরুদেব 'রাঁয়বেশে' নর্তকদের আনালেন। নাচ হিসেবে এ হল পুরুষদের অতি সাধারণ দলবদ্ধ নাচ। কিন্তু গুরুদেবের দৃষ্টিতে তার মূল্য ধরা পড়েছিল।

তিনি বললেন, বাংলার গ্রামাঞ্চলের যাত্রা তাঁর ভালো লাগে। তার একটি বড় কারণ হল যাত্রার চিত্রপটহীন মঞ্চ। চিত্রিত দৃশ্যপট যে নাটকের অভিনয়ে না হলেও চলে এ চিন্তা গুরুদেবের মনে জাগে এই যাত্রা দেখে। বিশ্বভারতীতে তাঁর নাটকের অভিনয়ে চিত্রিত দৃশ্যপটের ব্যবহার তাই তিনি তুলে দিলেন। তাঁর নাটকে কথার সঙ্গে বহুলপরিমাণে গান যোজনার রীতিটি তিনি গ্রহণ করলেন যাত্রা থেকে।

এই ভাবে গুরুদেবের প্রেরণায় পল্লীসংস্কৃতি বিভিন্ন দিকে প্রবল শক্তিতে নিজেকে বিকশিত করবার সুযোগ পেয়ে প্রমাণ করল যে সে রক্ষণশীল নয়, সেও জানে যুগের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যেতে।

এই পথে আমরা যদি না যাই, তাদের কাছে উপস্থিত হই শহরের ভদ্রলোকরূপে কেবল উপদেশবাক্য দানের উদ্দেশ্যে, তবে এতদিন তারা আমাদের যেমন দূরের মানুষ বলে জেনেছে আজও তাই জানবে। মনে করবে, তারা ছোটলোক, তাদের সব কিছুই ছোট। এই মনোভাবের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সুযোগ পেলেই তারা চেষ্টা করবে তাদের ছোটলোকত্ব দূর করে ভদ্রলোক হতে। এবং নিজের সমাজকে ভুলতে ও অবহেলা করতে।

এমন অনেক পল্লীবাসীর কথা জানি যাঁদের পূর্বপুরুষ বংশপরম্পরায় নিজেদের সমাজের প্রয়োজনে নৃত্য গীত, অভিনয় ইত্যাদি নানা কলার চর্চা করে এসেছেন, কিন্তু তাঁদেরই এ যুগের বংশধরেরা স্কুলকলেজের

শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রলোক হয়ে, গ্রামে ফিরে নিজেদের উৎসবাদিতে অন্যদের সঙ্গে একত্রে নাচ গান ও বাজনায় যোগ দিতে লজ্জা বোধ করেছেন। স্বাধীনতার পরেও এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে নি। চাষীর ছেলে লেখাপড়া শিখে হাল-লাঙল ধরতে লজ্জা পায়, এ ঘটনা আমরা সর্বদাই দেখছি। সাঁওতাল-সমাজের ছেলে বর্তমানে শহরে বিদ্যালয় থেকে সামান্য লেখাপড়া শিখে বিদ্যালয়ের ছুটির দিনে নিজের বাপ-মার কাছে যেতে চায় নি, এমন ঘটনাও ঘটেছে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে আমরা দরিদ্র পল্লীবাসীর সেবার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছি তাতে কোথাও গলদ আছে। ধাপে ধাপে এগিয়ে, পল্লীসমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে যদি এ কাজ করা হত তবে তার ফল হত অন্যরকমের। নিজেদের ছোট করে ভাববার যে সংস্কার গত প্রায় দু শতাব্দী ধরে তাদের মনে বসে গিয়েছে সেটিকে দূর না করা পর্যন্ত কাজ সফল হবে না।

প্রায়ই দেখা যায় যে, গ্রামের আনন্দ ফিরিয়ে আনার জন্য ভদ্রলোক-সমাজ নিজেরাই নাচ গান ও অভিনয়ের আসর সাজান, গ্রামে গ্রামে। জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে এ ধরণের কাজের প্রয়োজন আছে, কিন্তু প্রাণের যোগ এর দ্বারা ঘটে না। কারণ তারা ছোট হয়ে ভদ্রলোকের জিনিস দেখছে।

গুরুদেবের গান এদের মধ্যে প্রচার করার কথা উঠেছে। কিন্তু এই গান যদি গ্রামের সামনে আভিজাত্যের গর্ব নিয়ে উপস্থিত হয় তবেই সর্বনাশ। গুরুদেবের গান উচ্চস্তরের, তবুও গুরুদেবের মত সেও চায় গ্রামের গানের সঙ্গে এক-মাটিতেই বসতে। পংক্তিভোজনে যেন তাকে যোগ দিতে দেওয়া হয়। এর জন্যে আলাদা করে টেবিল-চেয়ার এনে পৃথক ভোজনের ব্যবস্থা যেন না হয়।

শহরের নবপ্রবর্তিত কিছু কিছু উৎসব গ্রামাঞ্চলে প্রবর্তনের চেষ্টা চলছে। কিন্তু যাঁরা সে কাজে নিযুক্ত তাঁরা গ্রামে প্রচলিত উৎসবগুলিকে তেমন মর্যাদা দেন না। সে সময়ে তাদের কাছ থেকে একটু দূরে দূরে থাকবারই তাঁরা চেষ্টা করেন। এর জন্যেই নবপ্রবর্তিত উৎসবগুলিকে গ্রামবাসীরা যে খুব আপনার করে নিতে পারছে তা মনে হয় না। এখনো পর্যন্ত যতটুকু দেখেছি তাতে বুঝেছি তা হয় নি। ভদ্রলোকদের খুশি করবার জন্যে সন্তোষ জানিয়েছে তারা, ধন্যবাদ জানিয়েছে ভদ্রতা করে। কিন্তু আপনার করে নেয় নি।

বিচিত্রা-পর্ব স্মৃতিকথা

সুকুমার বসু

একালের অনভিজ্ঞ পাঠক আর উত্তরকালের কৌতূহলী পাঠকদের দিকে লক্ষ্য রেখে স্থানকালের বিবরণ দিয়ে প্রবন্ধ আরম্ভ করি।

'বিচিত্রা'র জন্ম এবং তার স্বল্পপরিসর অথচ অসামান্য প্রদীপ্ত জীবন অতিবাহিত হয়েছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। এই স্থানের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের ১১ই মাঘ, যে-দিন আদিব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে সেখানে প্রথমবার যাই। সে আজ ৪৭ বছর আগেকার কথা।

মধ্য-কলকাতায় চিৎপুর রোডের এক জায়গা থেকে পুব দিক দিয়ে একটা হ্রস্ব রুদ্ধ পথ বার হয়ে যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে পড়ে প্রকাণ্ড একটা ফটক। পথটার নাম দ্বারকানাথ ঠাকুরের— কী? লেন না স্ট্রীট? আগেও ছিল লেন, আজও আবার সেই লেনই। কিন্তু একটা সময়ে, যখনকার কথা আজ বলছি, তার নাম হয়েছিল 'স্ট্রীট'। [আমন্ত্রণলিপির ছবি দ্রষ্টব্য। এ গলিকে সে সময়ে স্ট্রীট নামে গৌরবান্বিত করার কারণ হয়তো এই যে, তখন এখানে ব্রিটিশরাজের দ্বারা সম্মানিত 'নাইট' উপাধিধারী সার্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবাসস্থল ছিল। এ সম্মানের বোঝা তিনি চার বছরের বেশি বহন করতে পারেন নি। তবু স্ট্রীট নাম যে ১৯২৭ সালেও ছিল তার প্রমাণ আছে ঐ সময়ে আমার কোনো আত্মীয়াকে লেখা তাঁর একটা চিঠির উপরকার ছাপানো হেডিং। কবি ১৮৯০ সালে তাঁর 'ছোট বৌ'কে Paris থেকে যে পোস্টকার্ডখানা লিখেছিলেন তাতে কিন্তু ঠিকানা লিখেছিলেন 6 Dwarkanath Tagore's Lane.]

ফটক দিয়ে প্রবেশ করে পড়তে হয় একটা বিস্তৃত প্রাঙ্গণে, যার তিন দিক বেষ্টন করে আছে বড় বড় বাড়ি। সামনেরটি পুরাণো ধরণের তৈরি বৃহৎ এক অট্টালিকা—৬ নম্বর ভবন; ডান দিকের ত্রিতল অট্টালিকাটির নম্বর ৫।

কলকাতা শহরে চিৎপুরের মত কোলাহলপূর্ণ জনবহুল অঞ্চলের মাঝখানে সহসা প্রাচীরবেষ্টিত নিস্তব্ধ ও নির্জন সেকেলে জমিদারবাড়ির আবহাওয়ার মধ্যে প্রবেশ করে সেদিন মনে একটা বিস্ময়ের ভাব এসেছিল, তা আজও মনে আছে।

সামনের ৬ নম্বরের গৃহই কবি রবীন্দ্রনাথের বাস্তুভিটা, তাঁর জন্মস্থান, শৈশব ও যৌবনের আবাসস্থল, সারাজীবনের নিবাস ও ঠিকানা। বাড়ির একতলার সামনের প্রবেশদ্বার ভূমিসংলগ্ন, ভিতরে গেলে চক-মিলানো ঠাকুরদালানের উঠোনে গিয়ে পড়তে হয়, উপরটা খোলা, উৎসব আর অভিনয়াদির সময়ে চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়। ১১ই মাঘের উপাসনাও এইখানে হত, সন্ধের সময়। আদিব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথ আচার্যের কাজ করতেন বলে বহুলোক তাতে যোগ দিতে উৎসুক হত। কিন্তু স্থান তো সংকীর্ণ, তাই হট্টগোল নিবারণের জন্যে যত জনকে স্থান দেওয়া সম্ভব কর্তৃপক্ষ ততসংখ্যক প্রবেশপত্র ছাপিয়ে বিতরণ করতেন।

প্রবেশপত্র পেতে বেগ পেতে হয় নি। তখন আমাদের ছাত্রজীবন। প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার

সহাধ্যায়ী বন্ধু শ্রীচারু রায় শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ছবি শিখতে যেতেন। সেই কালেই তাঁর আর্টিস্ট বলে নাম হয়েছে, এমনকি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের বার্ষিক প্রদর্শনীতে তাঁর ছবিও একবার প্রদর্শিত হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে প্রবেশপত্র যোগাড় হয়ে গেল।

১৩২১ সালের ১১ মাঘের (জানুয়ারি ১৯১৫) সন্ধের উপাসনায় আমরা কয়জন রবিভক্ত রবীন্দ্র-সাহিত্যরসিক বন্ধু একত্রে ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। সে দিনের পরিচ্ছন্ন পরিবেশে সেখানে অনেক গণ্যমান্য ও বিশ্বজ্জনের সমাগম হয়েছিল। কবি এসেছিলেন শান্তিনিকেতনের আশ্রম থেকে। সঙ্গে এনেছিলেন বালকদল আর তাঁর 'সকল গানের ভাণ্ডারী' স্নেহাস্পদ নাতি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উপাসনায় গান করবার জন্যে। কবি আচার্যের আসনে উপবেশন করলে সমস্ত স্থানটাতে একটা সম্ভ্রমের আবহাওয়ার সৃষ্টি হত। দিনেন্দ্রনাথ অর্গ্যানে বসতেন, ছেলেমেয়েরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়াত, তখন গান আরম্ভ হত। তাঁর আকৃতি ছিল বৃহৎ, গান পরিচালনার সময় তাঁর একটা ব্যক্তিত্বপূর্ণ হাবভাব ফুটে উঠত। সে দৃশ্য যাঁরা না দেখেছেন আর সে গান না শুনেছেন তাঁদের কাছে ভাষায় সে ছবি ফোটানো যাবে না।

কবির নতুন-রচিত অনেক গান মাঘোৎসবের সময় গাওয়া হত। আমি তাঁর ১১ই মাঘের উপাসনায় তিনবার উপস্থিত ছিলাম— ১৩২১ ১৩২২ আর ১৩২৪ বঙ্গাব্দে। ১৩২৩এ তিনি দেশের বাইরে ছিলেন, —এ কয় বছর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। কোন্ গান কোন্ বার গাওয়া হয়েছিল তা আমার আর স্মরণ হয় না। তবে, 'এই তো তোমার আলোক-ধেনু' 'মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ' 'মেঘ বলেছে যাব যাব' ইত্যাদি তখনকার নতুন গান সেখানে শুনেছিলাম বলে মনে আছে। কবি ১৩২১ বঙ্গাব্দের উপাসনার উদ্বোধনে আর উপদেশে যা বলেছিলেন তা "যাত্রীর উৎসব" আর "মাধুর্যের পরিচয়" শিরোনামায় তাঁর "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থে ছাপা হয়েছে। তিনি অবশ্য মুখেই বলেছিলেন, কিছু পাঠ করেন নি।

কিন্তু এইভাবে স্মৃতিরোমন্থন করবার স্থান এ নয়। কবিসান্নিধ্যের স্মৃতিকথা যদি আমার কখনও শোনাবার সুযোগ হয় তো সে কথা একদিন শোনাবো। উত্তরকালের লোকে তা আগ্রহ করে শুনবে তা জানি। কারণ আমরা হলাম সেই দলের— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়— যারা "নিজেদের এই পরিচয়টুকু দিয়ে যাবো যে, কবির শুধু কাব্যেই নয়, তাঁকে আমরা চোখে দেখেছি, তাঁর কথা কানে শুনেছি, তাঁর আসনের চারিধারে ঘিরে বসবার ভাগ্য আমাদের ঘটেছে। মনে হয় সে দিন আমাদের উদ্দেশেও তারা নমস্কার জানাবে।" কিন্তু আজ বলব শুধু বিচিত্রার কথা। আর সেই উত্তরকালের বেচারাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে চেষ্টা করব যথাসাধ্য, যাতে তথ্যের দিক দিয়ে নির্ভুল লিখি, প্রবন্ধ যাতে নির্ভরযোগ্য হয়।

জোড়াসাঁকোতে সাহিত্যিকদের যে মিলনসভাটি গড়ে উঠেছিল তার একটু পূর্ব-ইতিহাস ছিল। ই. বি. হ্যাভেল (E. B. Havell) কলকাতা আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ থাকা-কালে তিনি ভারতীয় শিল্প ও চিত্রকলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দেশের মধ্যে তার পুনঃপ্রবর্তনে সচেষ্ট হন। তদুদ্দেশ্যে তাঁরই চেষ্টায় স্কুলে ভারতীয় চিত্রকলার শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে নতুন বিভাগ খোলা হয়, আর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত করে সহকারী অধ্যক্ষপদে নিয়োগ করা হয়।

'বিচিত্রা'

শ্রীযুক্ত

মহাশয়ের নিকট আমন্ত্রণ লিপি।

উপলক্ষ্য-

কাল-

স্থান—৬নং দ্বারিকানাথ ঠাকুর ষ্ট্রীট।

বিচিত্রা

বিচিত্রা'র আমন্ত্রণলিপি

শ্রীযুক্ত

মহাশয়ের নিকট আমন্ত্রণ লিপি।

উপলক্ষ্য-

কাল-

স্থান—৬নং দ্বারিকানাথ ঠাকুর ষ্ট্রীট।

বিচিত্রা

'বিচিত্রা'র আমন্ত্রণলিপি

সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পকলার প্রচার ও প্রসারের জন্যে কয়েকজন ধনী গুণগ্রাহী আর উচ্চপদস্থ লোকের চেষ্টায় কলকাতায় ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট নামক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। আমি যখন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত হই তখন এর আস্তানা ছিল কর্পোরেশন স্ট্রীটের 'সমবায় ম্যানসন' নামক বৃহৎ ভবনের একাংশে আর এর কর্ণধার যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিল্পী ভ্রাতারা, কলকাতা হাইকোর্টের ইংরেজ জজ সার্ জন উড্রফ (ইনি তন্ত্রশাস্ত্রে বিশ্বাসী ও গবেষক ছিলেন), কোনো বিলেতি ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানে যুক্ত ইংরেজ শিল্পদরদী নর্মান ব্লাউণ্ট্ আর ও. সি. গাঙ্গুলি নামে খ্যাত শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং চিত্রশিল্পী, আর্ট ক্রিটিক এবং স্বনামধন্য পণ্ডিত ব্যক্তি। প্রতিষ্ঠানের ছবির প্রদর্শনী প্রতিবৎসর শীতকালে বহু গুণী ও জ্ঞানী জনকে আকৃষ্ট করত।

কিন্তু সাধারণ শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ভিতর ভারতীয় চিত্রকলার আদর তখনও মোটেই হয় নি। আর আর্টে যাঁদের রুচি ছিল তাঁরাও ভারতীয় আর্টের সমঝদার হওয়া দূরে থাক্— তাকে অনাদরের চক্ষে, এমন কি, বিদ্রূপের চক্ষে দেখতেন। সেই জন্যে অবনীন্দ্রনাথ আর্টস্কুলের কাজ ছেড়ে দেওয়ার পর তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীনন্দলাল বসু প্রমুখ যে শিল্পীদল গড়ে উঠেছিলেন তাঁদের মুশকিলে পড়তে হয়। দেশের লোকের রুচি বিমুখ হলে আর্টিস্টের জীবিকা অর্জন হয় কী করে? এই অসহায় দলের সহায় শেষে অবনীন্দ্রনাথই হলেন। ঠাকুরভ্রাতারা তাঁদের অনেককে ডেকে নিয়ে নিজেদের পৈত্রিক ভদ্রাসন দ্বারকানাথ ঠাকুর স্ট্রীটে স্থান করে দিলেন আর তাঁদের দিয়ে দুই ঠাকুরবাড়ির ছেলে-মেয়ে বৌ-ঝিদের শিল্পশিক্ষা দিতে নিযুক্ত করলেন। ক্রমে অন্যান্য ছাত্রছাত্রী জুটে গেল, সবশুদ্ধ হল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন। এই ঘরোয়া ব্যাপারটার নাম হল 'বিচিত্রা স্টুডিও'। এ ঘটনা ১৯১৬ সালের।

রবীন্দ্রনাথ এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে এনড্রুজ, পিয়ার্সন আর বিচিত্রা স্টুডিয়োর একজন তরুণ শিল্পী শ্রীমুকুলচন্দ্র দে-কে সঙ্গে নিয়ে জাপান ও আমেরিকা সফরে বেরিয়ে যান। পুত্র রথীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন কলকাতাবাসী।

রাস্তা থেকে ঠাকুরবাড়ির ফটক দিয়ে প্রবেশ করে যে মুক্তপ্রাঙ্গণে পড়া যেত তার সামনে ছিল ৬ নম্বর আর দক্ষিণে ৫ নম্বর গৃহ, আগে সে কথা বলেছি। আরও ছিল বাম দিকে একটা লম্বা দুতলা বাড়ি যার এক প্রান্ত গিয়ে ৬ নম্বর বাড়ির প্রান্তের বারান্দায় যুক্ত হয়েছে। এই দুতলা কোঠার রং লাল তাই 'লালবাড়ি' নামে এটি খ্যাত। রবীন্দ্রনাথের পুস্তকসংগ্রহ ছিল লালবাড়ির একতলায়, আর দুতলার প্রায় সমস্তটা জুড়ে ছিল একটা হল-ঘর এবং সম্মুখে প্রাঙ্গণ-বরাবর লম্বা টানা বারান্দা। কবির পুস্তকসংগ্রহে বই ছিল প্রচুর, তা ছাড়া তিনি সর্বদা নতুন বই কিনতেন আর নানা স্থান থেকে উপহার পেতেন।

কবির বিদেশসফরের সময় তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথের খেয়াল গেল যে, লালবাড়ির লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করে বিচিত্রা স্টুডিয়োর আনুষঙ্গিক ভাবে একটা সাহিত্যসভা তৈরি করা যাক। সেই কাজে তিনি লেগে গেলেন, তাঁর প্রধান সহায় হলেন তাঁর জাঠতুত ভাই, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ক্লাব হওয়ার যোগ্য করে নীচের লাইব্রেরি আর দুতলার হল-ঘর সজ্জিত করা হল। উপরে ওঠার সিঁড়ির উভয় পাশ আর হল-ঘরের দেওয়াল পাঁচ-ছয় ফুট পর্যন্ত উঁচু করে শীতলপাটি দিয়ে মুড়ে কাঠের বেটম দিয়ে আটকে দেওয়া হল। হল-ঘরের দেওয়ালে দুটি বৃহৎ ছবি টাঙানো হল, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর

-অঙ্কিত 'সাগী' আর শ্রীনন্দলাল বসুর 'স্বপ্ন'। 'বিচিত্রা' লেখা একটা সীল আঁকলেন শ্রীনন্দলাল বসু বাংলাদেশের পল্লীকুটিরের আদর্শে। ক্লাবের চিঠি আমন্ত্রণপত্র ইত্যাদিতে সীলটি মুদ্রিত থাকত। ক্রমে ক্লাব বেশ গড়ে উঠল, এর সাপ্তাহিক অধিবেশনে বহু বিদ্বজ্জনের সমাগম হতে লাগল। কবির জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'তে লিখেছেন, "ইহাই বিচিত্রা নামে অল্পকালের মধ্যে কলিকাতার অভিজাত সাহিত্যিকদের মিলনকেন্দ্র হয়।"

এহেন মিলনকেন্দ্রে আমার প্রবেশলাভ হয় বন্ধু শ্রীঅমল হোমের দৌলতে। তিনি এ সময়ের কয়েক বছর আগে থেকেই তৎকালীন বিশিষ্ট সাহিত্যরসপিপাসু যুব-সমাজে, ছাত্রসভায়, ইংরেজি ও বাংলা বিতর্কের ক্ষেত্রে bright youngmenদের অন্যতম ছিলেন, প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের অন্তরঙ্গ, কবির ভক্ত আর তাঁর স্নেহের পাত্র হয়েছিলেন।

বিচিত্রাসভার অধিবেশন সপ্তাহে একবার হত— প্রায়ই বুধবারে। সভ্যদের কাছে 'আমন্ত্রণলিপি' ডাকে পাঠানো হত বিচিত্রার সীল-মুদ্রিত সরু লম্বা বাদামী রঙের পোস্ট কার্ডে। বিপরীত দিকে থাকত ঠিকানা আর এক পয়সা মূল্যের (হায় রে সেকাল!) ডাকটিকিট।

আমি একজন 'সভ্য' ছিলাম। কিন্তু এই 'সভ্য' হওয়ার ব্যাপারটা আজও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। হয়তো তখনকার সুপরিচিত সাহিত্যিকদের নামের একটা তালিকা তৈরি হয়েছিল আর তাঁদেরই কাছে পাওয়া আরও নাম সেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। আমার কাছে 'বিচিত্রা পুস্তকাগারে'র একখানা কার্ড (নং ৩৮) রয়েছে— তাতে হাতে লেখা আছে আমার নাম, "সভ্যের নাম :—" মুদ্রিত আছে তার আগে; নীচে মুদ্রিত—"পুস্তকাগারে প্রবেশের জন্য এই কার্ড দেখানো আবশ্যক"। কোনো দিন এ কার্ডটি দেখাতে হয় নি, মুখচেনা ছিলাম। 'সম্পাদক' রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাক্ষরিত চিঠির সঙ্গে এই কার্ড খামে এসেছিল। চার-পাঁচ বছর আগে একদিন রথীন্দ্রনাথের কাছে বিচিত্রার সভ্যের কথা তুলেছিলাম। দেখা গেল তাঁর স্মরণ নেই। "Formally কাউকে সভ্য করা হয়েছিল কিনা" তিনি সন্দেহ করলেন।

এ এক মজার 'সভ্য' হওয়া। আমার কাছে কেউ কোনো দিন চাঁদা চান নি, আমিও দিই নি, অথচ নিয়মিত 'আমন্ত্রণলিপি' ডাকে পেতাম। অধিবেশনের শেষে সর্বদা জলযোগের আয়োজন থাকত। প্রথম কয়েকটা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার পর জলযোগের আগেই পলায়নের চেষ্টা করে কৃতকার্য হই নি— সিঁড়ির কাছে মোতায়েন রথীন্দ্রনাথের অনুচরের হাতে ধরা পড়তে হয়েছে।

অধিবেশনের সময় ছিল সন্ধ্যাবেলা। নাটকের অভিনয় হলে সেই ঘরেই হত স্টেজ বেঁধে। অধিকাংশ অধিবেশন ছিল প্রবন্ধপাঠের। তা ছাড়া হত গানবাজনা, খোসগল্প, পুস্তকপাঠ ও আলোচনা। কোনোবার হয়তো শুধু মেলামেশার জন্যেই হত— 'বিষয়' লেখা থাকত "সদালাপ"। এই করে অনেক নতুন বন্ধুতা সেখানে আরম্ভ হয়েছে।

স্বয়ং কবি ছিলেন বিচিত্রা-সভার প্রাণ। যাঁরা আসতেন তাঁদের কারও কারও কথা একটু বলি। তা বলতে গিয়ে নিছক তথ্য ছাড়া মতামত যা কিছু ব্যক্ত হবে তা অবশ্য আমার নিজস্ব। সেজন্য সে বিষয়ে মতদ্বৈধতার অবকাশ কিছু থাকতে পারে, কিন্তু তা থাকে তো থাক্‌, নয়তো প্রবন্ধটি স্মৃতিকথা হয় না, হয় শুধু তথ্যের রসহীন বিবৃতি।

আগে একালের নবীন পাঠকদের জন্যে সেকালের কথা একটু বলে নিই।

আমাদের ছাত্রাবস্থায় কলকাতার পথেঘাটে লোকচলাচল ঢের কম ছিল। যানবাহন অনেক অল্প, তখনও ঘোড়ার গাড়ির যুগ চলছে, বড়লোকের মোটরগাড়ি চলত, কিন্তু মোটরবাসের নামগন্ধও ছিল না। আজকের মত সর্বত্র পথেঘাটে সভাসমিতিতে মেয়েদের দেখা যেত না— তাঁদের গতিবিধিতে স্বাধীনতার অভাব ছিল। ছাত্রদের মেলামেশার জায়গা ছিল মাত্র দুটি, কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট আর Y.M.C.A., উভয়ে একই পাড়ায়— কলেজপাড়ায়। আর ছাত্রসংখ্যাই বা কত ছিল! আজকের শুধু সিটি বা বঙ্গবাসী কলেজে যত ছাত্র পড়ে আমাদের সময়ে কলকাতার সবকটা কলেজে তত ছাত্র ছিল কিনা সন্দেহ। আর ছাত্রী ছিল তো মুষ্টিমেয়। বড় বড় বক্তাদের বক্তৃতার স্থান ছিল— এখন ভাবলে কৌতুক বোধ হয়— গোলদিঘির পাড়ে, বীডন উদ্যানে, কাশিমবাজার রাজবাড়ির বাগানে, পশুপতি বসুর বাড়ির উঠোনে, পান্তির মাঠে (যেখানে এখন বিদ্যাসাগর কলেজের হস্টেল)— এই কয়টা খোলা জায়গার কথা মনে পড়ছে; আর Albert Hall, Overtoun Hall, Student's Hall আব কদাচিৎ কোনো বিশেষ ব্যাপারে কলকাতার Town Hall।

এই সব জায়গায় আমরা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, গোখেলে, মহাত্মা গান্ধী ইত্যাদি মহা মহা দেশনায়কের বক্তৃতা শুনতাম। দেশবন্ধু পার্ক বা দেশপ্রিয় পার্কের মত খোলা জায়গা কল্পনাতেও ছিল না। মাইক, রেডিয়ো, টকি তখন আবিষ্কারও হয় নি। এতেই প্রতীয়মান হবে শিক্ষিত বাঙালীর জীবনযাত্রার পরিমণ্ডল তখন কত সংকীর্ণ ছিল। সে তুলনায় এখন দেশের শিক্ষিত লোকের সাংস্কৃতিক প্রসারের ব্যবস্থা যে কত বেড়ে গেছে তা মনে করে অবাক হতে হয়। বিচিত্রার মত একটা মিলনকেন্দ্র সে সময়েই সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু আজকের দিনে তার সম্ভাব্যতা কল্পনায় আনা যায় না। ভেবে দেখি, রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্রুতকীর্তি, সর্বজনপূজ্য, দেশজোড়া তাঁর নাম— সাহিত্যের ক্ষেত্র ছাড়িয়েও বহুদূরবিস্তৃত। ১৯১৫ সাল থেকে তিনি 'সার্ রবীন্দ্রনাথ' নামে সাহেবমহল আর রাজপুরুষদেরও শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের পাত্র, মান্যগণ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন। অথচ সেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা ক্ষুদ্র একটা চক্রের মধ্যে মাসের পর মাস পেয়েছি প্রায় আপনার জনের মত, স্বল্পায়তন স্থানে— একটা বাড়ির দুতলায়। আজকের দিনে হলে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এবং রবাহূতের দল তাঁকে সেখানে ঘিরে ফেলত, প্রবেশদ্বার ভেঙে হট্টগোল করে ধুন্ধুমার বাধিয়ে দিত তাঁকে 'দর্শন' করবার জন্যে।

বিচিত্রা-সভায় সর্বদা যাঁরা আসতেন তাঁদের কথা পরে বলব, প্রথমে বলি সেখানে যাঁদের কদাচিৎ আবির্ভাব হতে দেখেছি তাঁদের কথা।

সেখানে একবারের 'ডাকঘর' অভিনয়ে শ্রীমতী আনি বেসান্ট, পণ্ডিত মালবীয় ইত্যাদি কংগ্রেসের কয়েকজন নেতৃবর্গ দেখতে এসেছিলেন, তবে সেদিন আমার আমন্ত্রিত হওয়ার সৌভাগ্য হয় নি। এর কয়েকদিন আগে যখন 'ডাকঘর' হয়েছিল তখন উপস্থিত ছিলাম, সে বিষয়ে পরে কিছু বলব।

বিচিত্রায় আসতে দেখেছি সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসুকে। তিনি ছিলেন কবির প্রিয়বন্ধু। দুই বন্ধুর মিলনে যে উভয়েই বেশ খুশি হয়েছেন তা তাঁদের বাক্যে ও ব্যবহারে স্পষ্টই দেখা গেল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে বোধহয় একদিন দেখেছিলাম সেখানে। তিনিও কবির বন্ধু; তাঁর মডার্ন রিভিউ আর প্রবাসী পত্রিকাদ্বয় তখন অবিসংবাদিতভাবে ভারতবর্ষের দুটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকা, দেশের জনমতগঠনের

বাহন। সে সময়ে তিনি শ্বেতশ্মশ্রু সৌম্যমূর্তি গৌরবর্ণ সুদর্শন পুরুষ ছিলেন, কথা বলতেন কম— তাও ধীরে ধীরে। শান্ত মানুষটি, কোনো স্থানে নিজেকে জাহির করতে অনিচ্ছুক।

কবির আর-একজন প্রিয় বন্ধু একদিন এসেছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তিনি তখন বৃদ্ধ, সুপুরুষ, মুণ্ডিতশ্মশ্রু, তাঁর হাসি বড় মিষ্ট ছিল। বিশেষত একই পাড়ার মানুষ বলে আমি তাঁকে ভালো করেই চিনতাম। তাই তিনি দুতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন দেখে আমার একটু ভাবনা হল; কারণ তখন মস্তিষ্কের পীড়ায় কখনো কখনো কিছুদিন ধরে তাঁকে শয্যা নিতে হত। আরও ভাবনা হল দেখে যে, তিনি কিছুতেই বসছেন না, কবির সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে এদিক-ওদিক আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর রথীন্দ্রনাথ একটা মস্ত তাকিয়া নিয়ে তাঁর পিছন পিছন চলেছেন; উদ্দেশ্য, তিনি বসলেই তাকিয়াটা তাঁর পিছনে ঠেলে দেবেন। অবশেষে তিনি কবির কাছে গিয়েই বসলেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদিন একটা গল্প পড়েছিলেন। ফোটোতে তাঁর যে গোঁফদাড়ি-কামানো চোখালো চেহারার সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেই সময়ে তাঁর সে চেহারা ছিল না। তার মাত্র বছরখানেক আগে বর্মাপ্রবাস ছেড়ে তিনি দেশে এসে বসেছেন। লেখক বলে খুব নামডাক হওয়া সত্ত্বেও কলকাতার সাহিত্যসমাজে তিনি তখনও ব্যক্তিগতভাবে তত পরিচিত হন নি। চেহারায় কিছুমাত্র পালিশ ছিল না। প্রচুর কালো গোঁফদাড়ি ছিল, চুল অপরিপাটি। দেহ সামান্য মোটার দিকে, সার্ট বা কোটের উপর একটা চাদর গায়ে থাকত। ফরাসের উপর আমরা তাঁকে ঘিরে বসেছিলাম। সুসভ্য সুভদ্র মেয়ে-পুরুষের এমনি একটা সম্মিলন-স্থানে, সকলের ব্যগ্র কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির মধ্যে হয়তো তিনি একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। কিন্তু গল্প পড়বার সময় কোনো কুণ্ঠার ভাব প্রকাশ করেন নি; যদিও গল্পটি ফাঁদা ছিল বনবাদাড়ে; বামুনের ছেলের অবনত শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে সহবাস, সাপুড়ের মেয়েকে নিকা করা ইত্যাদি নিতান্ত অসামাজিক ব্যাপার নিয়ে। জিনিসটা episodic ধরণের, লেখকের পরবর্তী কালের সৃষ্টি শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের মধ্যে একটা পরিচ্ছেদ হিসেবে বসিয়ে দেওয়া যায়। গল্পে কৌতুক ও শ্লেষ যথেষ্ট ছিল— শ্রোতারা খুব হেসেছিলেন, কবি সুদ্ধ। গল্পটা শরৎচন্দ্রের মত শক্তিশালী লেখকের পক্ষে শিল্পকৃতির ভালো নিদর্শন নয়— বাঁধুনিতে ঢিলে, preachingএর আতিশয্য আছে, কিন্তু রচনাটি লেখকের নিজস্বতায় উজ্জ্বল; এর থেকে সামান্য উদ্ধৃতিও পাঠককে বুঝতে কষ্ট দেয় না— লেখাটা কার। এই গল্প পরে 'ভারতী'তে 'বিলাসী' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

বিচিত্রায় সর্বদা আসতেন দুই ঠাকুরবাড়ির মেয়েপুরুষ প্রায় সকলেই, বিচিত্রা-স্টুডিয়োর শিল্পীবৃন্দ— গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদল।

ঠাকুরভ্রাতারা বিধিদত্ত বিচিত্র শক্তির অধিকারী ছিলেন। কবি-রচিত নাটকের অভিনয়ে তাঁদের অভিনয় দেখেছি— অতি উঁচুদরের নট ছিলেন তাঁরা। আগের বছর শীতকালে (১৯১৬ জানুয়ারি) 'ফাল্গুনী'তে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁদের অভিনয় দেখেছিলাম। ফাল্গুনীর প্রথম অভিনয়ের সময় তার curtain raiser হিসেবে যে ছোট নাটিকাটি অভিনীত হয়েছিল সেই 'বৈরাগ্যসাধন'এ গগনেন্দ্রনাথ রাজা সেজেছিলেন, আর 'বৈকুণ্ঠের খাতায়' বৈকুণ্ঠ। এই দুটি ভূমিকায় তাঁকে খুব মানাত। অবনীন্দ্রনাথও খুব ভালো নট ছিলেন, 'বৈকুণ্ঠের খাতায়' তিনকড়ি সেজে তিনি সকলকে চমৎকৃত করেছিলেন। তাঁর কথা বলবার নিজস্ব একটা ভঙ্গি ছিল, কতকটা bantering ভঙ্গি, তাই কোনো মজাদার ভূমিকায় তাঁর impersonation ভারী চমৎকার হত।

'ডাকঘরে' তিনি কবিরাজ সেজেছিলেন, আর কবি স্বয়ং হয়েছিলেন ঠাকুর্দা ; অমলের ভূমিকা নিয়েছিল আশামুকুল বলে একটি ছেলে, সে অভিনয় ভুলবার নয়। শ্রীঅসিতকুমার হালদার দইওয়ালা সেজেছিলেন —এই কয়জনের কথাই ভালো করে মনে আছে।

প্রমথ চৌধুরীকে সেখানে দেখেছি। আলোচনায় মাঝে মাঝে যোগ দিতেন তিনি। তবে তাঁর একটা মুদ্রাদোষ ছিল, সে জন্যে তাঁর বক্তব্য সহজভাবে অগ্রসর হতে পারত না— আর লোকে শুনতে কৌতুকবোধ করত।

আর আসতেন সুকুমার রায় (চৌধুরী)। তখনকার দিনে যে যুবকদল সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় প্রয়াসী ছিলেন, তিনি তাঁদের নেতা ছিলেন বলা যায়। কোনো কোনো মানুষ দেখা যায় আত্মীয়বন্ধু-মহলে যাঁর আবির্ভাবমাত্র ছেলেবুড়ো সকলের মধ্যে একটা খুশির প্রবাহ বহে যায়, সুকুমার রায় ছিলেন তেমনি ধরণের মানুষ। তাঁর প্রকাণ্ড দেহ, ঢেউখেলানো চুল, গালের উপর একটা আঁচিল ছিল। উজ্জ্বল মুখশ্রী, ভাবভঙ্গি অতিশয় আকর্ষণীয়। জ্যেষ্ঠদের ও বন্ধুমহলে, সর্বত্র তিনি স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি আলোচনায় অনেক সময়ে যোগ দিতেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনিও ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। এঁর একটি আশ্চর্য স্বভাব ছিল এই যে, বন্ধু-মহলের বাইরে তিনি একেবারে মুখ খুলতেন না। একদম চুপ। বহরমপুরে একবার কোনো সাহিত্য-সম্মিলনে যোগ দিয়ে তিনি ট্রেনে যে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের কামরায় কলকাতায় ফিরছিলেন— কৃষ্ণনগর থেকে আমি সেই কামরায় উঠি। বেশ ভিড় ছিল, তা ছাড়া সাহিত্যিকরা অনেকে ছিলেন, তাঁর বিশেষ বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর পাশেই বসে। তাঁদের উভয়ের সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল, চারুবাবুর ইঙ্গিতেই আমি তাঁদের গাড়িতে গিয়ে উঠি। দেখলাম, সাহিত্যিকেরা হৈ হৈ করতে করতে চলেছেন, কিন্তু কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছনোর তিন ঘণ্টার যাত্রার মধ্যে তিনি ভুলেও একবার একটা কথাও উচ্চারণ করেন নি, তাঁর পাশে উপবিষ্ট চারুচন্দ্রের সঙ্গেও না।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্র-নারায়ণ বাগচী, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, শ্রীকালিদাস নাগ, শ্রীঅমলচন্দ্র হোম, শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, কিরণশঙ্কর রায়, ইন্দিরা দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীমতী শান্তা দেবী, শ্রীমতী সীতা দেবী— এঁদের শুধু নাম উল্লেখ করেই থামতে হল। বিস্তারিত কিছু বলবার যোগ্য এঁরা নন এমন কথা অবশ্যই মনে করি না, তবে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার তাড়া আছে। তা ছাড়া, 'এখন যাঁরা বর্তমানে আছেন মর্তলোকে' তাঁদের কথা কিছু বলা এখানে শোভন হবে না। অবশ্য আমি শুধু সাহিত্যপাঠকদের কাছে পরিচিত নামই উল্লেখ করবার চেষ্টা করলাম, অন্যান্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং সম্ভ্রান্ত অনেক মেয়েপুরুষ যাঁরা আসতেন তাঁদের নয়। উভয় ক্ষেত্রেই সকলের মুখও আমি চিনতাম না, আর সকলের কথা স্মরণেও নেই, তাই অনেকের নাম হয়তো বাদ গেল।

আমার দুর্ভাগ্যক্রমে বিচিত্রার সবকয়টি আমন্ত্রণলিপি আমি সযত্নে রক্ষা করি নি। সতেরোখানা মাত্র আমার কাছে রয়েছে দেখছি, সেগুলির তালিকা দিলাম।—

অধিবেশনের তারিখ	বিষয়
১২ আশ্বিন ১৩২৪ শুক্রবার	'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয়
২৫ আশ্বিন বৃহস্পতিবার	'ডাকঘর' অভিনয়

অধিবেশনের তারিখ	বিষয়
১২ অগ্রহায়ণ বুধবার	গানবাজনা
২৬ অগ্রহায়ণ বুধবার	'পাত্র ও পাত্রী' : শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪ পৌষ বুধবার	বাংলাভাষা আলোচনা : শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
২৫ পৌষ বুধবার	চিত্রশিল্প আলোচনা স্থান : ভারতীয় চিত্রপ্রদর্শনী, ৭।১ করপোরেশন স্ট্রীট
৩ মাঘ বুধবার	সাহিত্যপাঠ : শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৪ মাঘ বুধবার	'শিল্প ও শিল্পী' : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১ ফাল্গুন বুধবার	সদালাপ
৮ ফাল্গুন বুধবার	সচিত্র প্রবন্ধ 'রূপ ও রেখা' : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৫ ফাল্গুন বুধবার	'বাংলা ছন্দ' : শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
২২ ফাল্গুন বুধবার	'আয়ারল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের সমস্যার সাদৃশ্য' : শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৯ ফাল্গুন বুধবার	'ভক্ত দাদূর বাণীশিল্পের রহস্য' : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
৬ চৈত্র বুধবার	প্রবন্ধপাঠ : শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৪ চৈত্র বৃহস্পতিবার	একটি গল্প : শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২০ চৈত্র বুধবার	'বাংলাভাষাতত্ত্বের একাংশ' : শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
২৭ চৈত্র বুধবার	সংগীত

একবারের অধিবেশনে জনৈক অন্ধ্রদেশীয় যন্ত্রশিল্পী অধ্যাপক বীণ বাজিয়েছিলেন। দুই-আড়াই ঘণ্টা ধরে তিনি অনেকগুলি গৎ বাজিয়েছিলেন এমনি সুন্দর যে, আমার মত অজ্ঞের কানেও তা মধুবর্ষণ করেছিল, কবি এবং অন্যেরাও বেশ উপভোগ করেছিলেন। উভয়ে সংগীত-আলোচনা কিছু করলেন— ইংরেজিতে। অধ্যাপক দু-একটা ইউরোপীয় সুরও বাজালেন। সেই সন্ধ্যার মধুর স্মৃতিটুকু আমার মনে রয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার জনৈক সংগীতজ্ঞ একবার ইংরেজি গীতাঞ্জলির কয়েকটা কবিতার সঙ্গে সুর বসিয়ে তার music বা স্বরলিপি কবিকে পাঠান, কবি সেটি বিচিত্রায় এনেছিলেন। বাজানো হল। কবি নিজে কবিতাটি পড়তে থাকলেন আর ইন্দিরা দেবী পিয়ানোতে ঐ সুরটা সেই সঙ্গে বাজালেন। এই ভাবে তিন-চারটা পড়া আর বাজনা হওয়ার পর কবি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, কেমন লাগছে?" আমাদের কারও বিশেষ সুবিধে লাগে নি, অনেককেই মাথা নাড়তে দেখা গেল। কবি তখন পড়া ছেড়ে দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, এক কাজ করে দেখা যাক— বাংলায় এই পরীক্ষা করে দেখা যাক কেমন হয়।" গীতাঞ্জলির কয়েকটা গান তিনি কবিতার মত করে টেনে টেনে কিন্তু বিনা সুরে পড়ে যেতে লাগলেন আর সঙ্গে সঙ্গে দিনেন্দ্রনাথ গানের সুরটি এস্রাজে বাজালেন, অর্থাৎ কবির কবিতা পড়ার পশ্চাৎপটে গানের সুর এস্রাজে বাজতে লাগল। এবার ফল ভালোই হল, সকলেই খুশি। আমার মনে আছে কবিকণ্ঠে 'মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে' পাঠের সঙ্গে বেহাগ সুরে এস্রাজ বাজনা অতীব উপভোগ্য হয়েছিল।
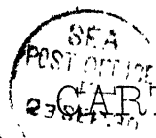
CARTE POSTALE

Ce côté est exclusivement réservé à l'adresse.

Mrs R. Tagore
6 Dwarkanath Tagore's Lane
Jorasanko
Calcutta

India

মৃণালিনী দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র
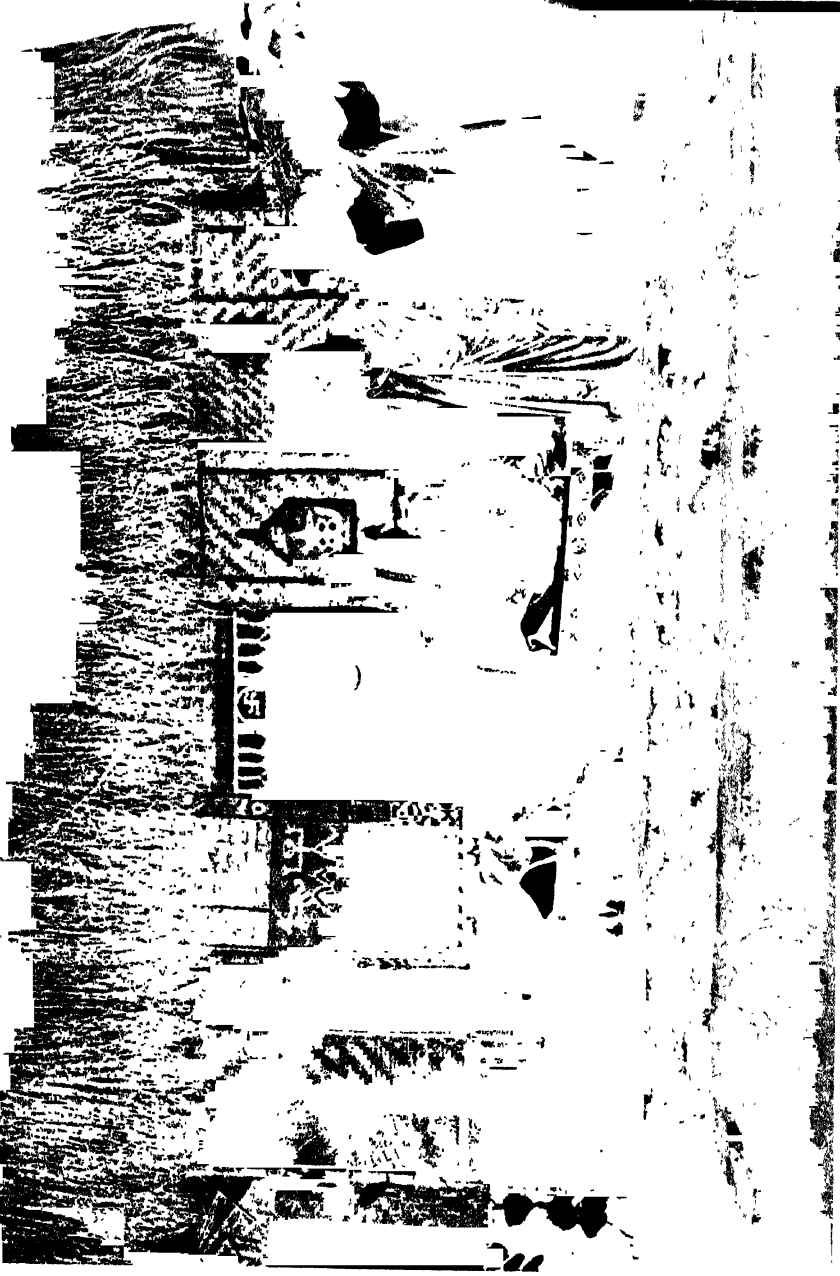
'ডাকঘর' অভিনয়ের শেষ দৃশ্য

গগনেন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ

আশামুকুল

১৯১৭ (১৩২৪) সালে জোড়াসাঁকো বিচিত্রা-ভবনে অভিনয়মঞ্চে গৃহীত ফটোগ্রাফ। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সৌজন্যে

আইরিশ কবি A.E.-লিখিত *The National Being* নামক বই থেকে কবি স্থানে স্থানে টিপ্পনী সহকারে পড়ে একদিন আলোচনা করেছিলেন। আর একদিন ঐভাবে Sir Horace Plunkett-রচিত সমবায়নীতি-বিষয়ক কোনো একটা নিবন্ধ পড়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যেদিন তাঁর ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধ পড়েছিলেন সেদিন আমি বিচিত্রায় ছিলাম না। কিন্তু ছন্দ সম্বন্ধে প্রচুর সুন্দর সুন্দর উদাহরণ সমেত রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোজ্ঞ প্রবন্ধটি যেদিন পড়েন সেদিন উপস্থিত ছিলাম। সেদিনকার আলোচনার উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ এই যে, প্রবন্ধপাঠের পর সুকুমার রায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন "গদ্যে কি ছন্দ আছে?" এ কথা শুনে সকলেই মৃদু হেসেছিলেন। কবি একটু চুপ করে থেকে বললেন, "সাধারণ গদ্যের কথা যদি ছেড়ে দাও তো, যাকে বলে impassioned prose তার মধ্যে একটা ছন্দ পাওয়া যায়।" কবির তখনকার এই উক্তিটি আমি significant বলে মনে করি। বাংলা গদ্যে ছন্দের সম্ভাব্যতা বিষয়ে এখন বোধ হয় কারো মনে জিজ্ঞাসাই ওঠে না। আর তা সম্ভব হয়েছে স্বয়ং কবিরই জন্যে, তিনি কত অল্পসময়ের মধ্যে জিনিসটা বাংলা ভাষায় আরম্ভ করে তাকে চলন্ত করে দিয়ে গেছেন, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার।

গানবাজনা, সদালাপ, খোসগল্প—এ সবও বিচিত্রায় হত। কবির নতুন রচিত গান মাঝে মাঝে হয়েছে। একবার অনেকগুলি গানের মধ্যে 'কান্নাহাসির দোলদোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা' -গানটি মিলিতকণ্ঠে অজিতকুমার চক্রবর্তী, শ্রীকালিদাস নাগ আর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গেয়েছিলেন, বড় ভালো লেগেছিল। দিনেন্দ্রনাথ এস্রাজ বাজাতেন, অবনীন্দ্রনাথও একবার বাজিয়েছিলেন মনে হয়। কবিকে অনুরোধ করা হল প্রবাসীতে কয়েকদিন আগে প্রকাশিত 'বল বল বন্ধু বল'[১] গানটি গেয়ে শোনাতে। তিনি একটু গুন গুন করে শেষে বললেন—"হবে না, সুরটা মনে আসছে না।"

আর আর যেসব অধিবেশনে গিয়েছি সে সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু মনে আসছে না।

বিচিত্রা-সভা বেশি দিন চলে নি। কেমন করেই বা চলবে। কবি ক্রমশই কলকাতায় আর উপস্থিত থাকতে পারতেন না। ১৯১৮ সালের শেষে অজিতকুমার চক্রবর্তী পরলোকে গেলেন। রথীন্দ্রনাথের ক্লাব চালানোর উৎসাহ কমে এল; এমনি করে আস্তে আস্তে, শ্রীনন্দলাল বসুর ভাষায়, "পাত্তাড়ি গোটাতে হল—শুনলুম গুরুদেবের ফাণ্ড্ ফুরিয়েছে।" এমন অবস্থা আসবার আগে আমাকেও চলে যেতে হল কলকাতা ছেড়ে অনেক দূরে, তাই বিচিত্রার শেষ অবস্থা আমি আর দেখি নি।

শেষ বার এই লালবাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে যখন দেখি তখন আরও ২১ বছর পার হয়ে গেছে। লালবাড়ি তখন বিচিত্রার শুধু স্মৃতি বহন করছে। আমার তৎকালীন কর্মস্থান থেকে কয়েক দিনের ছুটিতে কলকাতায় এসেছিলাম। ২৩ কার্তিক ১৩৪৬ (১৯৩৯ সালের ৯ নভেম্বর) তারিখে সস্ত্রীক জোড়াসাঁকোয় কবি-সন্দর্শনে যাই, সেদিন কবি সেই বিচিত্রার ঘরে তাঁর আত্মীয়স্বজন আর অনেক সাহিত্য-রসিক ভক্ত পাঠকে পরিবৃত হয়ে একটি নতুন রচিত গল্পের প্রথম খসড়াটা তাঁদের পড়ে শোনালেন। গল্পটির নাম 'শেষ কথা'[২]। কবির তখন জরার অবস্থা, সেই দিনই অথবা হয়তো তার আগের দিন মাত্র

১ প্রবাসী ১৩২৪ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত।

২ গল্পটি 'তিনসঙ্গী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। রচনা তারিখ—৪, ১০, ৩৯।

মংপু থেকে কলকাতায় ফিরেছেন শান্তিনিকেতনের পথে। বেশ ক্লান্ত ছিলেন। ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে তাঁর পাঠ আমি ভালো করে শুনতে পাই নি। কবির পাঠ শেষ হলে অনেক কাল পরে আমাদের অনেকগুলি পুরানো বন্ধুবান্ধবীর সঙ্গে সেখানে মিলন হয়েছিল। তার মধ্যে মনে পড়ছে কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ তাঁর নবপরিণীতা সুন্দরী বিদেশিনী স্ত্রীকে আমাদের সঙ্গে আলাপ করে দিয়েছিলেন। খানিক বিশ্রম্ভালাপের পর কবিকে প্রণাম করে আমরা বিদায় নিলাম— সেই আমার কবিকে শেষ দেখা।

চিঠিপত্র

6 DWARKANATH TAGORE STREET
CALCUTTA

শ্রীযুক্ত অমল হোমের ভগিনী
শ্রীমতী বীণা বসুকে লিখিত

কল্যাণীয়াসু

তোমরা শান্তিনিকেতন থেকে খুসি হয়ে গেছ শুনে খুসি হলুম। এমনি করেই আমাদের আশ্রমের সঙ্গে তোমাদের হৃদয়ের যোগ হোক এই কামনা করি। ২৫ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল প্রায় একলা একলা এখানে আমরা নীড় নির্ম্মাণ করতে লেগেছি — এই খানে আমাদের গান, এই আকাশে আমাদের মুক্তি বিহার, এই সখ্যে সুখে আমাদের জীবন সৃষ্টি রচনা। এই মনে করেই খুব ভেবেছিলুম যে, দেশের লোক খুসি হবে। অবশেষে দিন যখন ফুরিয়ে আসে, ছুটি নেবার সময় গোধূলি বেলা এল তখন তোমরা

কেউ কেউ পথিকের মত আমাদের
জীবনপথের পাশে ক্ষণকালের
ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছে, বলেছে, খুসি
হলো। আমার মনে তোমাদের মুখের
এই কথা সন্ধ্যাবেলার পূরবী সুরের
মত শোনালো। তোমরা ফিরে
চলে গেছ, আমি ফিরব, আবার
আরো দূরে যাবার সময় এলো।
ইতি ১০ চৈত্র ১৩৩৭

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞান

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

ব্যাপক অর্থে কোনো বিশেষ জ্ঞানকেই বলি বিজ্ঞান। কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ-লব্ধ জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলব। কবিরা পরীক্ষা করেন না, তবে পর্যবেক্ষণ করেন। এই অর্থে কবি মাত্রেই কিছু-না-কিছু পরিমাণে বৈজ্ঞানিক। মহৎ কবিদের পর্যবেক্ষণ করবার এক-একটা বিশিষ্টতা থাকে। তাঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যটুকু পর্যবেক্ষণের সেই বিশিষ্টতার মধ্যে বিধৃত। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। শুধু ব্যতিক্রম বলি কেন, পর্যবেক্ষণের বিশিষ্টতায় রবীন্দ্রনাথ যেন কিছুটা একক ও অনন্যপ্রকৃতির। রসের আনন্দসাগরে তরী ভাসিয়েছেন কবি। তাঁকে আনন্দ যুগিয়েছে বিজ্ঞানও। তাই বলে রসের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে দিক হারান নি কবি। বরং বিজ্ঞানই অনেক সময় তাঁকে পথ দেখিয়েছে; অযথা উচ্ছ্বাসের জোয়ার থেকে তাঁর কাব্যতরীকে সামলেছে। কবির কাছে বিজ্ঞান একদিকে যেমন আনন্দের উপচার, অন্যদিকে তেমনি উচ্ছ্বাসের নিয়ামক। তবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে আত্মসাৎ করে পাণ্ডিত্য অর্জন নয়, বিজ্ঞান-শিক্ষায় নিজেকে শিক্ষিত করে তোলার দিকেই ছিল তাঁর প্রবণতা। অর্থাৎ, অনেক কিছু জেনে ভারী হওয়া নয়, অল্প কিছু জেনে তৈরি হতে চেয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলি এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না, অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই। কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধ বিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করিনে।[১]

কবির এই অনুমান যথার্থ। কল্পনার জগতে বিজ্ঞান তাঁর কোনো লোকসান ঘটায় নি; যুক্তি ও বিচারের রসদ যুগিয়ে বরং তাঁকে উপকৃতই করেছে। এই লাভ সম্ভব হত না, যদি তিনি জ্ঞানপিপাসুর লোভী দৃষ্টি নিয়ে বিজ্ঞানের রাজদরবারে হানা দিতেন। শিক্ষার্থীর কৌতূহল আর রসিকের তৃষ্ণা ছিল বলেই বিজ্ঞান তাঁর কাছে খাদ্য নয়, আনন্দ। বৈজ্ঞানিক সত্যের রসটুকু পেয়েই তিনি খুশি, তত্ত্বের ভারবাহী হতে তিনি অনিচ্ছুক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> বিজ্ঞান থেকে যাঁরা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরা তপস্বী।—মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, আমি রস পাই মাত্র। সেটা গর্ব করবার মতো কিছু নয়, কিন্তু মন খুশি হয় বলে যথা লাভ।[২]

প্রকৃতই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে শুধুমাত্র জ্ঞানের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করবার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের বরাবরই অনীহা ছিল। তাই দেখি, জ্ঞানী ও পাণ্ডিত্যাভিমানী বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানকে যাঁরা শুধুমাত্র প্রয়োজনের

---

১ বিশ্বপরিচয়, ২য় সংস্করণ (মাঘ, ১৩৪৪)। ভূমিকা পৃ. ।৶০

২ উপরি-উক্ত গ্রন্থ। ভূমিকা পৃ. ।৶০

বেড়াজালে আবদ্ধ রেখে জ্ঞানচর্চায় নিরত থাকতে উৎসুক, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের স্বাগত জানাতে পারেন নি। সন্ধ্যাসংগীতের (১২৮৮) 'গান সমাপন' কবিতায় জ্ঞানী বৈজ্ঞানিকদের প্রতি কটাক্ষের পরিচয় সুস্পষ্ট—

এমন পণ্ডিত কত রয়েছেন শত শত
এ সংসার-তলে,
আকাশের দৈত্যবালা উন্মাদিনী চপলারে
বেঁধে রাখে দাসত্বের লোহার শিকলে।
আকাশ ধরিয়া হাতে নক্ষত্র-অক্ষর দেখি'
গ্রন্থ পাঠ করিছেন তাঁরা,
জ্ঞানের বন্ধন যত ছিন্ন করে দিতেছেন,
ভাঙি ফেলি' অতীতের কারা।

জ্ঞানকে বোঝা হিসাবে গ্রহণ করতেই আপত্তি। কিন্তু যখন জ্ঞানের রাজ্যে বৈজ্ঞানিক মহাসত্যের প্রকাশ ঘটে, কবির কাছে তখন তা বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দের প্রতিমূর্তি। জগৎজোড়া নিয়মের রাজ্যে আশ্চর্য শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিভ্রমণশীল গ্রহ-নক্ষত্রাদির সুনির্দিষ্ট কক্ষপথের কথা কল্পনা করে কবিমানস বিস্মিত ও আনন্দিত। প্রভাতসংগীত (১২৯০) কাব্যের 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতায় ভগবানের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বৈজ্ঞানিক সত্যের আশ্রয় নিয়েছেন—

চক্র পথে ভ্রমে গ্রহ তারা,
চক্র পথে রবি শশী ভ্রমে,
শাসনের গদা হস্তে লয়ে
চরাচর রাখিলা নিয়মে।

উল্লিখিত দু-একটি কবিতার কথা স্মরণে রেখেও মানসীর পূর্বে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি নিয়ে আলোচনা করলে মনে হয়, এই পর্বে রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞানের প্রভাব খুবই সামান্য। কি সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীত এবং কি ছবি ও গান (১২৯১), ও কড়ি ও কোমল (১২৯৩), কোনো কাব্যেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির উল্লেখযোগ্য কোনো পরিচয় নেই। জগৎ ও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের অভাব এবং কবির রোমান্টিক দৃষ্টির প্রাধান্যই এজন্যে দায়ী এবং বোধ করি, এই কারণেই একমাত্র কড়ি ও কোমল ছাড়া এই পর্বের অন্যান্য কাব্যে উচ্ছ্বাসের আধিক্য সুস্পষ্ট। কড়ি ও কোমলের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা দেখা দিয়েছে।" কিন্তু কবিতাগুলো আলোচনা করলে মনে হয়, বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং জগৎ ও জীবনকে স্বাভাবিকভাবে দেখবার প্রয়াস এই কাব্যে থাকলেও বিজ্ঞানের প্রভাব এতে নেই।

কড়ি ও কোমলের পরবর্তী পর্বে দেখি, প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে কবির পরিচয় নিবিড় ও অন্তরঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবিদৃষ্টিও সংযত ও সংহত হচ্ছে। অতএব, সংগত কারণেই এই পর্বে বিজ্ঞানের আরও সুস্পষ্ট প্রভাব থাকার কথা। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক কাব্য মানসীর (১২৯৭) বেলায় এ কথা

সর্বাগ্রে প্রযোজ্য এবং সর্বাধিক প্রযোজ্য পরবর্তী কাব্য সোনার তরীর (১৩০০) ক্ষেত্রে। মানসীর কোনো কোনো কবিতায় বৈজ্ঞানিক মহাসত্যের আশ্চর্য সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। যেমন 'মরণস্বপ্ন' কবিতায়—

চিরযুগরাত্রি ধ'রে শতকোটি তারা
পরে পরে নিবে গেল গগনমাঝার ;

সোনার তরী প্রসঙ্গেও একই কথা বলা চলে। অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে গ্রহ-নক্ষত্র পর্যন্ত মহাজগতের চিরচঞ্চল স্বরূপটি 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায় পরিব্যক্ত—

গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল,
ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল—
গগনে গগনে জ্যোতি-অঞ্চল
পড়িছে খসিয়া খসিয়া ॥

কিন্তু জ্যোতির্ময় নক্ষত্রলোক অপেক্ষা স্নেহময় ভূলোক কবির বেশি প্রিয়। ধরিত্রীর সঙ্গে কবির অন্তরের যোগসূত্র, নাড়ীর টান। তাই এ পৃথিবীর আকাশ-বাতাস, মাটি-মানুষ, গিরি-নির্ঝর সব কিছুই তাঁর পরম প্রিয়। রবীন্দ্রনাথের এই অপরূপ প্রকৃতি-প্রীতির ও মানবপ্রেমের ভিত্তিমূল সৃষ্টিরহস্যের গভীরে প্রসারিত। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে, উপনিষদের রসলালিত ক বর এই চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠা বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর, দার্শনিক তত্ত্বের উপর নয়। বৈজ্ঞানিক বলেন, সৃষ্টির আদি-পর্বে পৃথিবী ছিল আগুনের এক পিণ্ড। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সূর্য প্রদক্ষিণ করল এই অগ্নিময় পৃথিবী। সূর্য-পরিক্রমার পথে আগ্নেয় পৃথিবীর উপরিভাগ ক্রমশঃ শীতল হতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে সৃষ্টি হল জল ও বায়ু, প্রাণ ও পাথার। তাই, স্বীকার করতে বাধা নেই, আজকের সকল প্রাণই সেদিনের সেই পৃথিবীতে বিলীন হয়ে ছিল। আজকের সকল কিছুই সেদিনের সেই পৃথিবী-প্রসূত। আজকের দুনিয়ায় প্রকৃতি ও প্রাণিজগতের যে বৈচিত্র্য নজরে পড়ে, তা ক্রমবিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলেও সব কিছুরই মূলে রয়েছে লক্ষ বছর আগেকার সেই পৃথিবী। পৃথিবীর সঙ্গে তাই আমাদের নাড়ীর যোগ। এই বৈজ্ঞানিক মহাসত্যকে রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই পৃথিবী তাঁর কাছে মায়ের মতো। লক্ষ কোটি বছরের গর্ভধারিণী, পুরাতনী, মমতাময়ী মা। তাই সমুদ্রের অশ্রান্ত ধ্বনি শুনে তাঁর মনে পড়ে—

মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন ওই ভাষা জানে—
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে ; সেই জন্মপূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী-'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন

তব মাতৃহৃদয়ের, অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।[৩]

জন্মের পূর্বে ভ্রূণ হয়ে আমরা এই পৃথিবীতে ছিলাম। আবার মৃত্যুর পরেও এই পৃথিবীরই মাটির সঙ্গে আমরা একাত্ম হয়ে থাকব। আমাদের জন্ম, জীবন ও মরণের আশ্রয় এই পৃথিবী লক্ষ কোটি বছর ধরে আমাদের নিয়ে সূর্য প্রদক্ষিণ করছে। সোনার তরীর 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবি বললেন—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা- সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্তচরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।

তাই তৃণ-লতা, তরু-গুল্ম, ফুল-ফল সব কিছুরই মধ্যে যে এক অখণ্ড জীবনপ্রবাহ বিরাজিত, সত্যদ্রষ্টা কবি তার সঙ্গে নিজের জীবনের এক অকৃত্রিম যোগসূত্র অনুভব করেন। বারবার তাঁর মনে জাগে, এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি বস্তুই তাঁর চিরসঙ্গী, তাঁর সুখদুঃখের নিত্যসহচর। সৃষ্টির ঊষাকাল থেকে একই বন্ধনে সকলে আবদ্ধ। বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠ এই বিশিষ্ট ভাবটি রবীন্দ্রকাব্য-জগতের বহু স্থানেই খুঁজে পাই। চৈতালি (১৩০৩ সালে লিখিত) কাব্যের 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় দেখি, ভরা দুপুরে শান্ত পল্লী-প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে কবির নিজেকে এক একবার 'পরবাসী' বলে মনে হয়। মনে হয়, এই স্নিগ্ধ-সুন্দর পরিবেশের সঙ্গে তিনি নেহাৎ-ই যেন যোগসূত্রহীন এক আগন্তুক। কিন্তু এ আশঙ্কা সাময়িক। যখনই তিনি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর আদ্যিকালের যোগসূত্রের কথা স্মরণ করেন, তখন নিজেকে আর প্রবাসী বলে মনে হয় না। তখন মনে হয়, সৃষ্টির প্রভাতে, জীবন-সৃষ্টির আদি-পর্বে পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ, নদী-পর্বত সকলের সঙ্গেই তিনি একদিন এক হয়ে ছিলেন। তাই যখন আদিম যুগের সেই সৃষ্টি-রহস্যের কথা মনে জাগে, তখন বিশ্বপ্রকৃতির সকল কিছুই তাঁর পরম প্রিয় ও একান্ত অন্তরঙ্গ বলে মনে হয়। চৈতালির 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় দেখি—

প্রবাসবিরহদুঃখ মনে নাহি বাজে ;
আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে ;
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে— ধরণীর বক্ষতলে

৩ সোনার তরী। সমুদ্রের প্রতি।

পশু পাখি পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে— জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে, মাতৃস্তনে শিশুর মতন,
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।

একই মহাসত্যের প্রকাশ ঘটেছে উৎসর্গ (১৩১০ সালে লিখিত) কাব্যের 'প্রবাসী' কবিতায়। বিশ্বভুবন আমাদের জন্মজন্মান্তরের সঙ্গী। হাজার বাঁধনে এর সঙ্গে আমরা আবদ্ধ। এ সত্যকে অনুভব করলে এ জগতে নিজেকে আর প্রবাসী বলে মনে হয় না—

এ সাতমহলা ভবনে আমার চিরজনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।
তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে,
দূরে এসে ঘর চাই বাঁধিবারে—
আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে ঘরের বাসনা মিটাতে!
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায় চিরজনমের ভিটাতে!

বিশ্বজগতের সঙ্গে আদ্যিকালের আত্মীয়তার কথা স্মরণে রাখলে প্রকৃতির সঙ্গে মানবের সাদৃশ্যও ধরা পড়ে। কবি এ সাদৃশ্যের কথাই বলেছেন বিচিত্রিতা (১৩৪০) কাব্যের 'পুষ্প' কবিতায়। নারীকে লক্ষ্য করে পুষ্পের উক্তি—

তোমার আমার দেহে আদিছন্দ আছে অনাবিল
আমাদের মিল।
তোমার আমার মর্মতলে
একটি সে মূল সুর চলে,
প্রবাহ তাহার অন্তঃশীল॥

অতএব, দেখা যাচ্ছে, বিশ্বসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও বিবর্তনবাদ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মবোধকে পরিপুষ্ট ও প্রভাবিত করেছে। সোনার তরী থেকে এ ভাবনার সূত্রপাত। তারপর চৈতালি ও উৎসর্গ হয়ে বিচিত্রিতা পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। সুদীর্ঘকাল ধরে এই বিশেষ ভাবনা রবীন্দ্র-কল্পনাকে প্রভাবিত করলেও সোনার তরীর পরবর্তী রচনা চিত্রায় (১৩০২) বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব নেই। চিত্রায় কবি যে বিশুদ্ধ ও বস্তুনিরপেক্ষ সৌন্দর্যের ধ্যান করেছেন সেখানে যুক্তিনিষ্ঠ সত্য অপেক্ষা আদর্শনির্ভর কল্পনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। চিত্রার সমসাময়িক কালে লেখা চৈতালির কোনো কোনো কবিতায় বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য প্রভাব থাকলেও চৈতালির পরবর্তীকালে লেখা কণিকা (১৩০৬), কথা (১৩০৬) ও কাহিনীর (১৩০৬) কোনো কবিতায়ই বৈজ্ঞানিক সত্যের বিশেষ কোনো উল্লেখ নেই। কণিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতায় কবি জগৎ ও জীবনের মহান সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এদিক থেকে এবং কবিতাগুলির

সংহত রূপায়ণের দিক থেকে চিন্তা করলে কবির বৈজ্ঞানিকসুলভ পরিমিতিজ্ঞান এখানে বিস্ময়কর। কিন্তু কথা ও কাহিনীর কবিতাসমূহে প্রাচীন ভারতের ধর্ম, পুরাণ ও ঐতিহাসিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে কবি যে মহান আদর্শের অনুধ্যান করেছেন সেখানে বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব না থাকাই স্বাভাবিক; এবং বস্তুতঃ নেই-ও।

কাহিনীর পরবর্তী কাব্য কল্পনায় (১৩০৭) পরিহাসপ্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যের উল্লেখ দেখা গেল। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে পরিহাসছলে প্রয়োগ করবার প্রচেষ্টা প্রথম দেখেছিলাম চিত্রায়। কিন্তু চিত্রার 'শীতে ও বসন্তে' কবিতায় যা ছিল অস্পষ্ট ইঙ্গিত মাত্র, কল্পনার 'উন্নতি-লক্ষণ' কবিতায় তাই সুস্পষ্ট বিদ্রূপে বিলসিত। বস্তুতঃ, সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য আলোচনা করলে মনে হয়, যখনই ভোগসুখে পরিপূর্ণ দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে কবির মহত্তর জীবনাদর্শের বিরোধ ঘটেছে, তখনই বিজ্ঞানের স্থূল তত্ত্ব তাঁর কাছে অসার ও অর্থহীন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। চিত্রা থেকে শুরু করে কল্পনা হয়ে ক্ষণিকা (১৩০৭) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় সুস্পষ্ট। ক্ষণিকার 'অতিবাদ' কবিতায় কবি তীক্ষ্ণ পরিহাসছলে গাণিতিক তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন—

> সত্য থাকুন ধরিত্রীতে
> শুষ্ক রুক্ষ ঋষির চিতে,
> জ্যামিতি আর বীজগণিতে,
> কারো ইথে আপত্তি নেই,—

এ ছাড়া অপেক্ষাকৃত সরল ও অনাড়ম্বর কয়েকটি কাব্যেও ব্যঙ্গচ্ছলে বৈজ্ঞানিক সত্যের উল্লেখ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য পলাতকা (১৩২৫), ছড়ার ছবি (১৩৪৪), প্রহাসিনী (১৩৪৫) ও ছড়া (১৩৪৮)। পলাতকা কাব্যের 'আসল' কবিতায় মানচিত্রের নীরস তথ্যের প্রতি কিশোর কবির অনাসক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট। ছড়ার ছবির 'যোগীন্দা' কবিতায় দেখি, সন্ধ্যার শান্ত পরিবেশে প্রদীপের অস্পষ্ট আলোয় যোগীন্দার কাছে অদ্ভুত সব গল্প শোনার কথা স্মরণ করতে গিয়ে ইলেক্‌ট্রিক আলোর প্রতি কবি-মানস বিরূপ হয়ে উঠেছে—

> সেই সেকালের সন্ধ্যা মোদের সন্ধ্যা ছিল সত্যি,
> দিন-ভ্যাঙানো ইলেক্‌ট্রিকের হয় নিকো উৎপত্তি।

রেল, মোটর ও বিদ্যুৎ-প্রভাবিত প্রগতিমুখর আধুনিক সভ্যতার প্রতি কবির বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের পরিচয় প্রহাসিনী কাব্যের 'নারীপ্রগতি' কবিতায়ও সুস্পষ্ট। ছড়ার 'মামলা' কবিতায় কবি ব্যঙ্গচ্ছলে বিজ্ঞানীদের কথা উল্লেখ করেছেন।

কল্পনা কাব্যে পরিহাসসৃষ্টির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে ব্যবহারের কথা বলছিলাম। প্রসঙ্গতঃ বিভিন্ন কাব্যে ব্যঙ্গচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে কিভাবে প্রয়োগ করেছেন, তা নিয়ে আলোচনা করা গেল। তবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে কবির ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবই কল্পনায় বিজ্ঞান-প্রভাব সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধার পরিচয়ও এই কাব্যে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'জগদীশচন্দ্র বসু' শীর্ষক কবিতায় বন্ধু জগদীশচন্দ্রের প্রতি কবির শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রিয় বৈজ্ঞানিক বন্ধুর কৃতিত্বে মুগ্ধ কবি লিখেছেন—

বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।

কল্পনার সমসাময়িক কাব্য ক্ষণিকার (১৩০৭) দু-এক জায়গায় কবি ব্যঙ্গচ্ছলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কথা বলেছেন। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো বিজ্ঞানের প্রভাব এ কাব্যে নেই। পরবর্তী রচনা নৈবেদ্যের (১৩০৮) কবিতাগুলো আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ ও মহত্তর জীবনাদর্শ-প্রণোদিত হলেও বৈজ্ঞানিক সত্যের সংহত প্রকাশ এ কাব্যে রয়েছে। ইতিপূর্বে প্রভাতসংগীত কাব্যের 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতায় ভগবৎ-মহিমার বর্ণনায় বৈজ্ঞানিক সত্যের উল্লেখ দেখেছিলাম। কিন্তু প্রভাতসংগীতে যে ভাবনা ছিল ধূসর ও অস্পষ্ট নৈবেদ্যে তা' আরও সুসংহত ও কবিত্বময় বাণীরূপ পেল। নৈবেদ্যে বিশ্বপিতার মহিমার বর্ণনায় বৈজ্ঞানিক সত্য স্থান পেয়েছে। উদাহরণ প্রসঙ্গে 'অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর' গানটির কথা ধরা যাক। এখানে কবি বলেছেন, সব কিছু ভগবানে নিবেদন করলে হারাবার ভয়ে অনুক্ষণ উতলা হতে হয় না। কারণ, অণু-পরমাণু দিয়ে গড়া, লক্ষ লক্ষ চন্দ্র-সূর্যে ভরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনো কিছুই হারায় না—

তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু,
কভু না হারায় অণু পরমাণু

গ্রহ-সূর্য থেকে শুরু করে মানবদেহ এমনকি তৃণ পর্যন্ত সর্বত্রই রয়েছে এই অণু-পরমাণু। জগদীশ্বরের গড়া এই বিশ্বভুবনে তাঁকে কেন্দ্র করে অনন্তকাল ধরে একই অণু-পরমাণুর চাঞ্চল্য। তাই হেমন্তের শান্ত দুপুরে জনশূন্য দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর আর ক্ষীণরেখা নদীর দিকে তাকিয়ে কবির মনে হয়—

এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধরে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।[৪]

নৈবেদ্যের কোনো কোনো কবিতায় কবিমানসের বিশেষ এক একটি ভাবনাকে ব্যক্ত করার কালে বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রকাশ ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে 'আবার আমার হাতে বীণা দাও তুলি' নামক গানটিতে শীতে পাখির দেশান্তর যাত্রার বর্ণনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

সহসা কঠিন শীতে মানসের জলে
পদ্মবন মরে যায়, হংস দলে দলে

---

৪ নৈবেদ্য (পৌষ ১৩৬২) ২৩ সংখ্যক।

সারি বেঁধে উড়ে যায় সুদূর দক্ষিণে
জনহীন কাশফুল্ল নদীর পুলিনে ;

নৈবেদ্যের পরবর্তী রচনাসমূহ খেয়া (১৩১৩), গীতাঞ্জলি (১৩১৭), গীতিমাল্য (১৩২১) ও গীতালিকে (১৩২১) ঘিরে রবীন্দ্রকাব্যের যে অধ্যাত্মযুগ, সেখানে বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো প্রভাব নেই। তবে খেয়ার 'প্রতীক্ষা' কবিতায় জোয়ারের বর্ণনায় কবির পর্যবেক্ষণলব্ধ প্রাকৃতিক জ্ঞানের পরিচয় সুস্পষ্ট। গীতাঞ্জলি ও গীতালির কোনো কবিতায়ই উল্লেখ করবার মতো বিজ্ঞানের কোনো প্রভাব নেই। একমাত্র গীতিমাল্যের 'এই যে এরা আঙিনাতে' নামক গানটির শেষদিকে কবির বিজ্ঞান-চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়—

জ্বলে নেভে কত সূর্য
নিখিল ভুবনে।
ভাঙে গড়ে কত প্রতাপ
রাজার ভবনে।

এই সময়ে (১৩১০-১৩২১) লেখা অপর তিনটি কাব্য শিশু (১৩১০ সালে লিখিত), স্মরণ (১৩১০ সালে রচিত) ও উৎসর্গ (১৩১০)। এদের প্রথম দু'টিতে বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো প্রভাব নেই। একমাত্র উৎসর্গের কোনো কোনো কবিতায় বিজ্ঞানচিন্তার প্রভাব পড়েছে।

গীতিমাল্যের পরবর্তী কাব্য বলাকায় (১৩২৩) বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব নেই বটে, কিন্তু কাব্যটির মূলে যে প্রচ্ছন্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় মেলে, সে দিক থেকে বিচার করলে মনে হয়, এই কাব্যেই বিজ্ঞানের প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি। মানুষ, প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের যে গতিচাঞ্চল্যকে কবি জীবনধর্ম ও উন্নতিলক্ষণ বলেছেন, তা বৈজ্ঞানিকের চিন্তাদর্শের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। বিজ্ঞানের মতেও গতিই জীবন, চাঞ্চল্যই প্রাণধর্ম। হংসবলাকাকে কেন্দ্র করে গতিময় বিশ্বচরাচরের চিরন্তন চাঞ্চল্য কেমন করে কবির চোখে ধরা পড়ল, কবি-প্রদত্ত বিজ্ঞান-সত্য-নির্ভর বর্ণনা থেকেই তা জানতে পারি—

> সেদিন সন্ধ্যায় আকাশপথে যাত্রী হংসবলাকা আমার মনে এই ভাব জাগিয়ে দিল— এই নদী, বন, পৃথিবী, বসুন্ধরার মানুষ, সকলে এক জায়গায় চলেছে ; তাদের কোথা থেকে শুরু, কোথায় শেষ, তা জানি নে। আকাশে তারার প্রবাহের মতো, সৌর জগতের গ্রহ-উপগ্রহের ছুটে চলার মতো, এই বিশ্ব কোন্ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে প্রতি মুহূর্তে কত মাইল বেগে ছুটে চলেছে। কেন তাদের এই ছুটাছুটি তা জানি নে, কিন্তু ধাবমান নক্ষত্রের মতো তাদের একমাত্র এই বাণী— 'এখানে নয়' 'এখানে নয়'।[৫]

বলাকার পরবর্তীকালে প্রকাশিত কয়েকটি কাব্য পলাতকা (১৩২৫), শিশু ভোলানাথ (১৩২৯), লেখন (১৩৩৪), মহুয়া (১৩৩৬) ও স্ফুলিঙ্গ (১৩৫২)। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত গ্রন্থটি ছাড়া আর কোনোটিতেই বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো প্রভাব নেই।

৫ বলাকা (শ্রাবণ ১৩৬৩) পরিশিষ্ট ; পৃ: ১১৯।

মহুয়ার পরে প্রকাশিত পর পর কয়েকটি কাব্যেই বিজ্ঞানচিন্তার প্রভাব নজরে পড়ে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য বনবাণী (১৩৩৮)। এই কাব্যে বৃক্ষ ও লতা-গুল্মের সঙ্গে মানুষের নিগূঢ় যোগসূত্রের কথা বর্ণনার কালে কবি বৈজ্ঞানিক সত্যের আশ্রয় নিয়েছেন। 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতার একাংশ—

সুন্দরের প্রাণমূর্তিখানি
মৃত্তিকার মর্তপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্যলোক হতে—
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে।

বনবাণীর পরবর্তী রচনা পরিশেষ (১৩৩৯) কাব্যের 'প্রণাম' কবিতায়ও বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রকাশ ঘটেছে। প্রায় একই সময়ে লেখা পুনশ্চের (১৩৩৯) কোনো কোনো কবিতায় উপমা-প্রয়োগে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় মেলে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, বীথিকা (১৩৪২) ও সানাই (১৩৪৭) কাব্যের কোনো কোনো কবিতায়ও উপমা-প্রয়োগে বৈজ্ঞানিক সত্যের অবতারণা করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ সানাই কাব্যের 'জ্যোতির্বাষ্প' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পুনশ্চের কথা বলছিলাম। এর পরবর্তী কয়েকটি কবিতাগ্রন্থেও বিজ্ঞানের বিশেষ প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। পুনশ্চের সমসাময়িক রচনা বিচিত্রিতা ও বীথিকায় বিজ্ঞানের প্রভাব নিয়ে আগেই বলেছি। এবার সমসাময়িক কালের অপর কয়েকটি কাব্য শেষ সপ্তক (১৩৪২), পত্রপুট (১৩৪৩) ও শ্যামলী (১৩৪৩) নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। শেষ সপ্তক কাব্যের 'তুমি প্রভাতের শুকতারা' কবিতায় দেখি, সুদূরের রহস্যময় শুকতারার সঙ্গে কবির এক নিগূঢ় প্রীতির সম্পর্ক রয়েছে। তবে বিজ্ঞানের তত্ত্বকে কেন্দ্র করে নয়, এ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে জীবনের সত্য ও সুন্দরকে ভিত্তি করে। শুক্রগ্রহ সম্বন্ধে আবিষ্কৃত তত্ত্ব নয়, গ্রহটির অনাবিষ্কৃত রহস্যই কবির কাছে বড়—

পণ্ডিত তোমাকে বলে শুক্রগ্রহ ;
বলে, আপন সুদীর্ঘ কক্ষে
তুমি বৃহৎ, তুমি বেগবান,
তুমি মহিমান্বিত ;
সূর্যবন্দনার প্রদক্ষিণপথে
তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী,
রবিরশ্মিগ্রথিত দিনরত্নের মালা
দুলছে তোমার কণ্ঠে।

যে মহাযুগের বিপুল ক্ষেত্রে
তোমার নিগূঢ় জগদ্‌ব্যাপার
সেখানে তুমি স্বতন্ত্র, সেখানে সুদূর,
সেখানে লক্ষকোটি বৎসর
আপনার জনহীন রহস্যে তুমি অবগুণ্ঠিত।

পত্রপুট কাব্যের 'পৃথিবী' ও 'উদাসীন' কবিতায় বৈজ্ঞানিক সত্য বিধৃত। 'উদাসীন' কবিতায় চাঁদের অতীত ও বর্তমান অবস্থার কথা আশ্চর্যসুন্দর কবিত্বমণ্ডিত ভাষায় অভিব্যক্ত—

শুনেছি একদিন চাঁদের দেহ ঘিরে
ছিল হাওয়ার আবর্ত।
তখন ছিল তার রঙের শিল্প,
ছিল সুরের মন্ত্র,
ছিল সে নিত্যনবীন।
দিনে দিনে উদাসী কেন ঘুচিয়ে দিল
আপন লীলার প্রবাহ।
কেন ক্লান্ত হোলো সে আপনার মাধুর্যকে নিয়ে।
আজ শুধু তার মধ্যে আছে
আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন দ্বন্দ্ব—
ফোটে না ফুল,
বহে না কলমুখরা নির্ঝরিণী॥

পত্রপুটের প্রায় একই সময়ে লেখা বিশ্বপরিচয়েও (১৩৪৪) চাঁদ সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য রয়েছে।[৬]

> চাঁদ যে নিয়মে অতিমাত্রায় রোদ পোহায় তাতে তার তেতে-ওঠা পিঠের উপরে হাওয়া এত গরম হয়ে উঠেছিল যে চাঁদ তার বাতাসের পরমাণুদের ধরে রাখতে পারে নি, তারা সবাই গেছে বেরিয়ে। যেখানে হাওয়ার চাপ নেই সেখানে জল খুব তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে যায়। বাষ্প হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলের পরমাণু গরমে চঞ্চল হয়ে চাঁদের বাঁধন ছাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। জল হাওয়া যেখানে নেই সেখানে কোনো রকমের প্রাণ টিঁকতে পারে বলে আমরা জানিনে। চাঁদকে একটা তাল-পাকানো মরুভূমি বলা যেতে পারে।

কবির আশ্চর্য-সুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-গ্রন্থ বিশ্বপরিচয়ের সমসাময়িক কালে লেখা শেষ সপ্তক ও পত্রপুটেই শুধু নয়, এই পর্বের শ্যামলী কাব্যেও বিজ্ঞানবিষয়ক সত্য ও অনুমানের উল্লেখ রয়েছে। বস্তুতঃ, বিশ্বপরিচয় রচনাকালে কবির মনে বিজ্ঞানচিন্তার যে জোয়ার এসেছিল তার প্রতিফলন পড়েছে সেই সময়ে রচিত বিভিন্ন কাব্যে। শ্যামলীর 'আমি' কবিতায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় মেলে। শ্যামলীর অন্যত্রও বিজ্ঞানের প্রভাব সুস্পষ্ট। 'তেঁতুলের ফুল' কবিতায় দেখি, উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্বন্ধে কবির জ্ঞান শুধুমাত্র গ্রন্থপাঠের মাধ্যমেই নয়, পর্যবেক্ষণ-প্রসূতও বটে।

শ্যামলীর ঠিক পরে প্রকাশিত কয়েকটি কাব্য হল খাপছাড়া (১৩৪৩), ছড়ার ছবি (১৩৪৪), প্রান্তিক (১৩৪৪) ও সেঁজুতি (১৩৪৫)। ছড়ার ছবিতে বিজ্ঞানের প্রভাবের কথা আগেই বলেছি। খাপছাড়া, প্রান্তিক ও সেঁজুতির কোনো কোনো কবিতায়ও বৈজ্ঞানিক সত্যের উল্লেখ রয়েছে।

---

৬ বিশ্বপরিচয়, ২য় সংস্করণ, মাঘ ১৩৪৪। পৃ. ৯৬।

সেঁজুতির পরবর্তী কাব্য প্রহাসিনী। ব্যঙ্গচ্ছলে বৈজ্ঞানিক সত্যের উল্লেখ-প্রসঙ্গে কাব্যটির কথা আগে বলেছি। কিন্তু প্রহাসিনী কাব্যের বিভিন্ন কবিতা আলোচনা করলে দেখি, ব্যঙ্গচ্ছলেই শুধু নয়, নির্মল রসসৃষ্টির ক্ষেত্রেও এই কাব্যে কবি বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'মাছিতত্ত্ব' কবিতাটি স্মরণীয়।

প্রহাসিনীর সমসাময়িক কালে প্রকাশিত প্রায় সকল কাব্যেই কমবেশী বিজ্ঞানের প্রভাব পড়েছে। সানাই ও ছড়ায় বিজ্ঞানের প্রভাব নিয়ে আগেই বলেছি। এই সময়কার অপর কয়েকটি কাব্য আকাশপ্রদীপ (১৩৪৬), নবজাতক (১৩৪৭), রোগশয্যায় (১৩৪৭), আরোগ্য (১৩৪৭), জন্মদিনে (১৩৪৮) ও শেষলেখার (১৩৪৮) কোনো কোনো কবিতায় দেখি, চরাচরপ্রসারী কল্পনাকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কবি বৈজ্ঞানিক সত্যের আশ্রয় নিয়েছেন। আকাশপ্রদীপ কাব্যের 'বধূ' কবিতার শেষাংশ এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। নবজাতকের 'কেন' ও 'প্রশ্ন' কবিতায় কবির চরাচরবিস্তারী কল্পনার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্যদৃষ্টির পরিচয় আরও সুস্পষ্ট। সূর্যের আলোর সামান্য একটা অংশ এসে এই পৃথিবীতে পড়ে। নক্ষত্রের বেলায়ও তাই। বিশ্বভুবন জুড়ে আলোকের এই বিরাট অপচয় সম্বন্ধে কবির জিজ্ঞাসা,[৭]—

জ্যোতিষীরা বলে,
সবিতার আত্মদান-যজ্ঞের হোমাগ্নিবেদিতলে
যে জ্যোতি উৎসর্গ হয় মহারুদ্রতপে
এ বিশ্বের মন্দির মণ্ডপে,
অতিতুচ্ছ অংশ তার ঝরে
পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের 'পরে।
অবশিষ্ট অমেয় আলোকধারা
পথহারা,
আদিম দিগন্ত হতে
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে নিরুদ্দেশ স্রোতে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে অপার তিমির-তেপান্তরে
অসংখ্য নক্ষত্র হতে রশ্মিপ্লাবী নিরন্ত নির্ঝরে
সর্বত্যাগী অপব্যয়,
আপন সৃষ্টির 'পরে বিধাতার নির্মম অন্যায়।

নবজাতকের 'প্রশ্ন' কবিতায় দেখি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্বের কথা উপলব্ধি করে আপন ক্ষুদ্রতায় কবি অভিভূত। বিরাট বিশ্বভুবনের কথা বলতে গিয়ে নীহারিকা ও তারকাপুঞ্জের বর্ণনায় কবি লিখেছেন,—

চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় বহু দূরে,
কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাল-চক্রপথে ঘুরে।

---

৭ নবজাতক : 'কেন'।

কত বেগ, কত তাপ, কত ভার, কত আয়তন,
সূক্ষ্ম অঙ্কে করেছে গণন
পণ্ডিতেরা, লক্ষ কোটি ক্রোশ দূর হতে
দুর্লক্ষ্য আলোতে॥

আরোগ্য কাব্যের 'বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে' ও 'বিরাট মানবচিত্তে' শীর্ষক কবিতা-দু'টিতেও কবির চরাচরব্যাপী কল্পনার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্যদৃষ্টির পরিচয় আছে। 'শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্য-প্রাঙ্গণে' একমাত্র সত্য আদি জ্যোতি। এই আদি জ্যোতির মধ্যেই কবি নিরপেক্ষ সত্য খুঁজে পেয়েছেন। 'বিশ্বপরিচয়ে' কবির মন্তব্য—

> নিত্য ব'লে যদি কিছু খ্যাতি পেতে পারে তবে সে কেবল এক আদিজ্যোতি, যা রয়েছে সব কিছুরই ভূমিকায়, যার প্রকাশের নানা অবস্থান্তরের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্বের এই বৈচিত্র্য।

আদিজ্যোতিতে আরম্ভ, আদিজ্যোতির মধ্যেই আবার সমাপ্তি। এ সমাপ্তি-প্রাঙ্গণ অমৃতের প্রতীক, অমরত্বের আধার—

এই ঘন-আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশপারাবার,
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্‌বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে,
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি,
চৈতন্যসাগর-তীর্থপথে॥[৮]

অতএব, সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, সুদীর্ঘ কাব্যসাধনার বৈচিত্র্যময় তীর্থপথে বিজ্ঞান নানাভাবে কবিকে প্রভাবিত করেছে। তবে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের স্থূল তত্ত্ব নয়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গূঢ় সত্যই কবির কাছে বড়। যে বিজ্ঞান বিশ্বভুবনের রহস্যের খবর রাখে, জগৎচক্রের মধ্যে ঐক্যের সম্বন্ধ আবিষ্কার করে সে বিজ্ঞানই কবির প্রিয়। তাই দেখলেম, একদিকে ভুবনসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যেমন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মবোধকে প্রভাবিত করেছে, অপরদিকে তেমনি জ্যোতির্ময় বিশ্বলোকের রহস্যময় বিজ্ঞান-বার্তা সমৃদ্ধ করেছে কবির চরাচরবিস্তারী কল্পনাকে।

---

৮ রোগশয্যায়: ২০ সংখ্যক কবিতা।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৮৬১-১৯৪২

শ্রীসুনীতি দেবী

বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদন-বিভাগ আমার পিতৃদেব বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে দিতে অনুরোধ করেছেন। আমার অক্ষম লেখনী তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কথা বিশদভাবে বর্ণনা করতে পারবে না জানি, তবু সন্তানের কর্তব্য হিসাবে যা পারি লিখে যাব।

১৮৬১ সাল— ভারতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, গৌরবোজ্জ্বল প্রভাত নিয়ে উদিত হয়েছিল। নব-প্রভাতের নবরবিরশ্মি পরে ভারত ছাড়িয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কত মনীষী কাব্য সাহিত্য বিজ্ঞান রাজনীতি চিকিৎসাশাস্ত্র— এ সবই তাঁদের বুদ্ধির দীপ্তিতে দীপ্ত করে তুললেন। আমার পিতৃদেব তাঁদের মধ্যে একজন। গত ১৯৬১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর দ্বারভাঙ্গা-হলে তাঁর জন্মশতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

এখানে তাঁর পারিবারিক ও কবিজীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব। তবে তাঁর জীবনকথা বলতে বসলে প্রথমেই মনে পড়ে যে তিনি নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে বড় কুণ্ঠিত হতেন। তাঁর বহু পুরাতন খাতায় এ বিষয়ে একটি লেখা পেয়েছি। সেটি এই: "যিনি শিবস্বরূপ হইলেও মহাকাল, তিনি এ সংসারে আমাদের জন্য চিরজীবনের ব্যবস্থা করেন নাই। আমাদের দেশের সমাজও মৃতের জন্য অগ্নিসংস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, স্মৃতিস্তম্ভ নয়।··আমরা যে-কেহ বাংলাভাষায় দু কথা লিখিয়া থাকি, সকলেই যদি জীবনচরিত লিখিয়া অমর হইতে পারি, তাহা হইলে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় সিংহাসনচ্যুত হইবেন।"

বিজয়চন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে সংক্ষেপে এখন বলি। তাঁর পিতৃপুরুষেরা নাটোরের বারেন্দ্রব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বাদশাহী আমলে 'মজুমদার' খেতাব পেয়ে ফরিদপুরে খালকুলা গ্রামে জমিদারি স্থাপন করেন। তাঁদের আসল পদবী ছিল 'মৈত্র'। এই বংশের হরচন্দ্র মজুমদারের দ্বিতীয় পুত্র আমার পিতা। তাঁর মায়ের নাম নবদুর্গা দেবী। বিজয়চন্দ্র পিতামাতার অপূর্ব রূপলাবণ্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা ও পিতৃব্য এমন তেজস্বী ছিলেন যে, শোনা যায়, তাঁদের জীবদ্দশায় সে গ্রামে কখনও ডাকাতি হয় নি। হরচন্দ্র সেই যুগে গ্রাম্য পাঠশালায় মেয়েদেরও লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন শুনে একটু অবাক লাগে। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করে বিজয়চন্দ্র কৃষ্ণনগরে পড়তে আসেন। সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) তাঁর সহপাঠী হন, ও সেই থেকে এই দুজনের সখ্যবন্ধন চিরজীবন অটুট ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুতে পিতৃদেব 'দ্বাদশী-স্মৃতি' নামে যে কবিতাগুলি লিখেছিলেন, তাতে তাঁর অম্লান বন্ধুপ্রীতির পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

কলেজী শিক্ষার জন্য পিতাকে কলকাতায় আসতে হয়। সেখানে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও উপাসনায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এই কারণে পরিবারবর্গের বিরাগভাজন হওয়াতে বি. এ. পরীক্ষার পরই উড়িষ্যার বামড়া রাজ্যে চাকরি নিয়ে চলে যান। বাইশ বছরের যুবক শ্বাপদসংকুল দুর্গম অরণ্যপ্রদেশে একা যেতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নি। পথে কটকে ভক্তকবি মধুসূদন রাও-এর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়।

মধুসূদন এঁর গুণে এত মুগ্ধ হন যে পরে তাঁর চতুর্দশবর্ষীয়া কন্যা বাসন্তী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। বাসন্তী দেবী গৃহেই শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং নিজ পিতার নিকট সংস্কৃত-সাহিত্য ভালোরূপেই পড়েছিলেন। বিজয়চন্দ্রের বিবাহের পর তাঁর প্রিয়বন্ধু ডাক্তার নীলরতন সরকার হেসে বলেছিলেন, "বিজয় সংস্কৃত-পণ্ডিত বিয়ে করে আমাদের বিপদে ফেলল। আমরা তো নূতন বৌয়ের সঙ্গে কথা বলতেই সাহস পাব না।"

বিবাহের পর কিছুদিন পুরী ও সম্বলপুর জিলা স্কুলে প্রধান-শিক্ষকের কাজ করে আইন-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। সে জন্য কলকাতায় মেসে থেকে পড়াশুনা করতে হত বলে পত্নীকে চুঁচুড়ায় প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গৃহে রেখে আসেন। ভূদেববাবুর পরিবারের সকলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। বাবার কাছে শুনেছি, ভূদেববাবুর কাছে তাঁর স্বাদেশিকতার দীক্ষা। স্বদেশী-আন্দোলনের আগে থেকেই তিনি যথাসম্ভব স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করতেন। স্বদেশী যুগে তাঁর 'ভারতপতাকা' গানটি খুব লোকপ্রিয় হয়েছিল।

বি. এল. পরীক্ষা পাস করে তিনি সম্বলপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন ও অল্পদিনের মধ্যে প্রচুর অর্থ ও খ্যাতি অর্জন করেন। পারিবারিক মনোমালিন্য ইতিমধ্যে দূর হয়ে গিয়েছিল, এবং তাঁর জননী তাঁর কাছে থাকতে আসেন ও পরে তাঁর গৃহেই দেহত্যাগ করেন। এর পর তাঁর পিতা ও পিতৃব্যের মৃত্যু হলে অন্য ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীদের সকল ভার তিনি গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে তাঁর কাছে থেকেই লেখাপড়া শিখে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

সম্বলপুরের নিকটবর্তী উড়িষ্যার কয়েকটি মিত্ররাজ্যেরও তিনি আইন-উপদেষ্টা ছিলেন। এর মধ্যে সোনপুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই রাজপরিবার দু-তিন পুরুষ ধরে তাঁকে যে শুধু 'গুরু' বলে ডাকতেন তা নয়, তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এঁরা তাঁকে অন্তরের ভক্তি-ভালোবাসা দিয়ে এসেছেন। ওকালতি করতে করতে নৃতত্ত্ব পুরাতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে এমন গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন যে, সময়ে সময়ে নিজের জীবিকার্জনের উপায়কেও উপেক্ষা করেছেন। সংস্কৃত পালি ওড়িয়া উর্দু এসব ছাড়া আদিবাসীদের ভাষাও তিনি জানতেন। তারই মধ্যে প্রবন্ধ কবিতা উপন্যাস ও নাটক লেখাও চলত। গুরুগম্ভীর বিষয়ে গবেষণার মধ্যে কি করে অমন সরস মধুর কবিতা লিখতেন ভেবে আমাদের আশ্চর্য বোধ হত। এই সময়ের মধ্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯০৮ সালে ভারতীয় ঐতিহ্য ও ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে তিনি লণ্ডনের ধর্ম-মহাসম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

সম্বলপুরে তাঁর বাড়ি একদিনের জন্যও অতিথিশূন্য থাকত না, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ মাসের পর মাস, এমনকি কয়েক বছরও, আমাদের বাড়িতে থেকে একেবারে নিজের হয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের সেবাতে আমার মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

শত কাজের মধ্যে বাগানে বাবার নিজ হাতে ফুল ফল তোলা ও মালীদের কাজ তদারক করা বাদ যেত না। বাড়ির সব ছেলেমেয়েদের পাহাড়ে জঙ্গলে নদীতে কত যে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে সম্বলপুরের অপূর্ব নৈসর্গিক শোভা উপভোগ করতে শিখিয়েছেন। সংগীত ও চিত্রকলাও তাঁর কম প্রিয় ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল আমায় কোলের কাছে টেনে তাঁর নবরচিত গান শেখাচ্ছেন, আর বাবার উদাত্ত কণ্ঠ এসে তাতে মিশে বাড়ি গম্‌গম্ করছে— এসব স্মৃতি ভুলবার নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আবার তোরা মানুষ হ' গানটি তাঁর বড় প্রিয় ছিল। তাঁর বলিষ্ঠ তেজস্বী মন সব ক্ষুদ্রতার গণ্ডি এড়িয়ে এর মধ্যে বিশ্বপ্রেমের

আবেদনটুকু গভীরভাবে উপলব্ধি করত। রবীন্দ্রনাথের 'একলা চল রে,' গাইতে গাইতে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। চোখ যাবার পর 'মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ' -গানটি শুনতে শুনতে তাঁর চোখে-মুখে এমন ভাব ফুটে উঠত যেন পরমসুন্দর তাঁর চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

আমাদের বাড়িতে এমন-একটি সংস্কৃতির আবহাওয়া তিনি রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে বেড়ে ওঠাতে আমরা পুরাতন ও নবীন সব কবি ও সাহিত্যিকের লেখার সঙ্গে বিনা আয়াসেই পরিচিত হয়ে গিয়েছিলাম। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মজার কবিতা, হেমচন্দ্রের দেশাত্মবোধক কবিতা, মাইকেলের গম্ভীর অমিত্রাক্ষর কবিতা সবই তিনি যথোপযুক্ত স্বরে পড়ে যেতেন। কালিদাসের সংস্কৃত কাব্য তিনি যে সুরে ফোটাতেন তা লেখায় প্রকাশ অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের যেসব কবিতা আমাদের তখন বুঝবার বয়স হয় নি, তাও তাঁর কণ্ঠে শুনে আমরা যেন কাব্যের মধুর রসে ডুবে যেতাম। তাঁর আর-একটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রত্যেক ভাষা তার বিশিষ্ট উচ্চারণে বলতেন। এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণে ইংরাজি উর্দু সংস্কৃত প্রভৃতি আর কারও মুখে শুনেছি বলে মনে হয় না।

তাঁর পূর্ববর্তীদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতিকে প্রতিদিন স্মরণ করতেন। তাঁর সমসাময়িক প্রায় সকল মনীষীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ও ডাক্তার নীলরতন সরকার তাঁর সুহৃদ্ ও সখা ছিলেন সে কথা আগেই বলেছি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ির সকলের মধ্যে তাঁর বিশেষ যোগ ছিল রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী দেবী ও সরলা দেবীর সঙ্গে। আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গেও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সর্বদাই পত্রবিনিময় হত। তার অনেকগুলি 'প্রবাসী'তে[১] প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি পড়লে দুজনের আন্তরিক যোগের কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। ১৯১৪ সালে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে তিনি সম্বলপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। তখন রবীন্দ্রনাথ নিজে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছেন।

একটি কথা উল্লেখ না করে পারছি না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মানুষের প্রতিকৃতি বেশ ভালো আঁকতেন। যে যে মুখশ্রী তাঁর মনে ছাপ রাখত একটি খাতায় সেইসব মুখের ছবি এঁকে রাখতেন। পিতার প্রতিভাদীপ্ত ললাট ও আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু তাঁকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছিল বলে প্রথম আলাপেই তিনি তাঁর সেই খাতায় বাবার প্রতিকৃতি এঁকে রাখেন। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং শেষজীবনে অনেকদিন আমাদের বাড়িতে বাবার সঙ্গে একত্র বাস করে গিয়েছিলেন।

পারিবারিক জীবনে তিনি যে কি আদর্শপুরুষ ছিলেন তা বলবার ভাষা আমার নেই। তাঁর বড় নাতনি বলেছে, 'দাদা আমাদের জীবনের সূর্য ছিলেন'। এর চেয়ে সত্য কথা আর নেই। তিনি বড় থেকে ছোট সকলের অন্তর ও বাহিরের সব অন্ধকার দূর করে আলোকময় করে রেখেছিলেন। শিশুদের সঙ্গে এমনভাবে মিশতেন যে তারা তাদের সব কথা নিশ্চিন্তমনে তাঁকে বলত ও তাঁকে সব রকম খেলার সাথি করে নিত। খাবার সময়ে সকলে একত্র বসলে কত মজার মজার ছড়া কাটতেন— মাছ ফল মিষ্টান্ন এসব নিয়ে মুখে-মুখে কবিতা রচনা করে তাদের মনোরঞ্জন করতেন। আবার পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলেও কেউ উঠতে চাইতেন না। যুবকের দলও তাঁর কাছে কত যে আসতেন তার

১ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০

ইয়ত্তা নেই। অসাধারণ পণ্ডিত হয়েও লোকের কাছে পাণ্ডিত্য ফলাও করতেন না। সকলের মতামত ধৈর্য ধরে শুনতেন, নিজের মত জোর করে কারও উপর চাপাতেন না। শিশুদের সঙ্গে ব্যবহারেও 'গুরুগিরি' করতে দেখি নি তাঁকে। তাঁর মত মজলিসী লোক এ যুগে দুর্লভ। জমিদারি ছেড়ে আসার অনেক পরেও যখন গ্রামে গিয়েছেন, প্রজারা দলে দলে এসে তাঁর কাছে সুখদুঃখের কথা বলেছে, প্রাণের প্রীতি জানিয়েছে।

জীবনে যখন পূর্ণোদ্যমে কাজ করছেন তখন অতিরিক্ত চোখের শ্রমে চক্ষু দুটি অন্ধ হল। তখন বিধাতার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও তাঁর মুখে শোনা যায় নি। দিলীপকুমার রায় 'ভারতজ্যোতি' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার ১৩৬৫ শ্রাবণ মাসে একটি প্রবন্ধে বলেছেন, "সব মানুষই দুঃখে একটু 'আহা-উহু' শুনতে ভালোবাসে, কিন্তু বিজয়চন্দ্র এসবের উর্ধ্বে ছিলেন।" কেউ তাঁর অসহায়তা নিয়ে শোকপ্রকাশ করলে সে কথা চাপা দিয়ে হাসিমুখে অন্য গল্প করেছেন। তাঁর 'হেঁয়ালি' কাব্যগ্রন্থে 'অন্ধের মৃগয়া' শীর্ষক কবিতাগুলিতে এই দুঃখজয়ী বীরের বিরাট মনুষ্যত্ব ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। অন্ধ অবস্থায় আঠাশ বছর বেঁচে ছিলেন। সে বছরগুলি একটিও বৃথায় যায় নি। সে যেন এক ঐশ্বর্যময় যুগ। কলকাতায় আসার পরই সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন-চারটি বিষয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তাঁর ছাত্রদের কাছে শুনেছি তাঁর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির কথা। কোন্ বইয়ে কোন্ পাতায় কি আছে বলে দিতেন। ঘড়ির দিকে চেয়ে পড়াবার উপায় ছিল না বটে, তবে ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটায় তাঁর বক্তৃতা শেষ করতেন, এমন ছিল তাঁর সময়জ্ঞান। এই বছরগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করেছেন, 'বঙ্গবাণী' পত্রিকা সম্পাদন করেছেন, গবেষণামূলক বাংলাভাষার ইতিহাস, ওড়িয়া প্রাচীন কবিতা সংকলন, জীবনবাণী (প্রবন্ধমালা), কবিতার বই হেঁয়ালি, রুচিরা, ছিটেফোঁটা ও আরও অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, স্কুল ও কলেজ পাঠ্য বইও লিখেছেন। সোনপুর রাজ্যের আইন-উপদেষ্টার কাজও সঙ্গে সঙ্গে চালিয়েছেন। যখন অবিশ্রাম মুখে বলে যেতেন, লেখক বা লেখিকা বদল হত বারবার, কারণ একজন অত লিখে উঠতে পারত না— কিন্তু তাঁর বলায় শ্রান্তি ছিল না। মনের শক্তির সঙ্গে শারীরিক শক্তিও যেন তাল রেখে চলত। অন্ধ হয়ে চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত হলেও, কারও হাত ধরে মাইলের পর মাইল স্বচ্ছন্দগতিতে হেঁটে যেতেন। চোখ থাকতে তাঁর সঙ্গে সাঁতারে কেউ পেরে উঠত না। অন্য ব্যায়াম করতে দেখি নি, তবে হাঁটা বা টেনিস্ খেলা দৈনিক কাজ ছিল।

তাঁর বিরাট গ্রন্থাগারের কথাও একটু বলি। জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্য বিষয়ে নতুন কিছু প্রকাশিত হলে তখনই কিনতেন। বাড়ির এমন ঘর ছিল না যেখানে বই ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য সংস্কৃত ও পালি এবং ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য গ্রন্থাগারে দান করা হয়েছে।

তাঁর সব বইয়ের আলোচনার স্থান এটা নয়। বাংলাভাষার গবেষক ছাত্রেরা তাঁর লেখা নিয়ে যথেষ্ট চর্চা করেছেন। তাঁর সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা, খাঁটি সংস্কৃত কবিতা, তাঁর ছন্দ মিল প্রভৃতির কথা নানা পত্রিকায় আলোচিত হতে দেখেছি। তাঁর কবিতার মিষ্টত্ব এখনও অনেক প্রবীণেরা ভোলেন নি। তাঁর 'ঠাকুরমা সেই' দীর্ঘ কবিতাটি সম্বন্ধে স্বর্ণকুমারী দেবী বলেছিলেন "এত মিষ্টি কবিতা কমই পড়েছি।" তাঁর কয়েকটি পংক্তি উদ্‌ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।—

ঠাকুরমা সেই ছেলেবেলায় ঘুম-পাড়ানর ফন্দিতে,
এক যে রাজার মজার গল্পের হুঁ-হুঁ-জোড়া সন্ধিতে
এমনি করে ঢেলে দিতেন নিদ্রালসের আবল্লি,
নেতিয়ে পড়তে হ'তই ঘুমে রাজা রানী যা বল্লেই।· ·

নানা উপন্যাসের গ্রন্থে ভরা এখন আলমারি ;
রুদ্ধ তাহে কেবল শুদ্ধ বাতাসটুকু জানলারই।· ·

নেইক তাজা শাঁসাল প্রাণ ! গল্পে এখন শানায় কই ?
পরীর রাজ্যে ওড়ার মত শক্তি আমার ডানায় কই ?
হারানো সে পরান কোথা কৌতূহলে কান-খাড়া ?
মিইয়ে আছি বাসি মুড়ি, কিংবা চিটে ধানঝাড়া।

কবি নজরুল একবার বলেছিলেন, "আপনার লেখায় যে অপ্রত্যাশিত মিলগুলি এসে পড়ে তা পড়তে ভারি চমৎকার লাগে।"

তার পর গ্রামের নদী চন্দনার বিষয় যে লিখেছেন—

আয় রে ছুটে প্রাণের তটে ক্ষুদ্র নদী চন্দনা

তাও যেন প্রত্যেকের মনে ঢেউয়ের দোলা দিয়ে যায়। নববধূ-বরণে শাশুড়ী যখন বলছেন —

পরের মেয়ে ? ও মা, কথা বললি তোরা কাকে ?
পরের মেয়ে হলে তুলে নিতে কোলে
উঠত কি রে সুখের ঢেউ বুকের থাকে থাকে ?

তখন সেই কোমলহৃদয়া মায়ের সঙ্গে আমাদেরও বুক ভরে ওঠে না কি ?

সত্যই তাঁর হৃদয় যেমন বিশাল তেমনই কোমল ছিল। আত্মীয় ছাড়াও বহু লোক তার সাক্ষ্য দেবেন। একজন প্রবীণ অধ্যাপক বলছিলেন, "আমরা কাছে গিয়ে তাঁর হাত ধরলে তাঁর চোখ-দুটি আনন্দে এমন দীপ্ত হয়ে উঠত যে মনেই হত না তিনি অন্ধ।"

তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য হল সবটুকুই তাঁর নিজস্ব। অন্য কারও ছাপ তাতে নেই। শুধু গম্ভীর, শুধু মিষ্ট, শুধু নিখুঁত ছন্দ ও মিলই তাঁর কবিতা নয়। তা ছিল একেবারে প্রাণবন্ত। হাসি ও ব্যঙ্গের কবিতায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর 'সৃষ্টির রহস্য' 'বাঙ্গালার পলিটিক্‌স্‌' 'হায় রে সেকাল' এই কবিতাগুলি এখনও অনেকের কণ্ঠস্থ।

বাংলার পলিটিশিয়ান যে ভেবে মরেন —

প্লেগে নাকি হয় মাটি
হনলুলু, ওটাহাটি,
দুর্ভিক্ষ হয়েছে নাকি নবাজোমলা স্কাইনে ?
কি হবে উপায় হায় ভেবে দিশে পাই নে।

কিংবা

আইরিশ বিলে নাকি
লাগিয়াছে ঠোকাঠুকি,
মেরেছে থাপ্পড় বেলী ধরিয়া ও'ব্রাইনে।
যায় দিবা অনিদ্রায়,
পলিটিক্‌স্‌-ভাবনায়

ইত্যাদি ১৯০০ সালে লেখা কবিতা এখনকার রাজনীতিবিদ্‌দের সম্বন্ধেও খাটে না কি? 'হায় রে সেকাল' কবিতায় বৃদ্ধ যখন আধুনিকদের গালাগালি দেওয়া শেষ করবার সময় স্বগতোক্তি করেন: 'সেকালেই বা কি করেছি তাও তো জানি নে' তখন কি না হেসে থাকা যায়? ১৮৯২ সালে লেখা 'শাব্দপ্রেম বা শ্রীমতী অমল ধবল শতদলবাসিনী' কবিতাটির দুটি মাত্র পংক্তি উদ্ধৃত করছি—

নামটি শুনেই শাশুড়ী হলেন হতভম্বা,
শ্বশুর বলেন, মন্দ কি?— তবে একটু লম্বা।

বাকিটা পাঠকপাঠিকা নিজেরা পড়ে উপভোগ করবেন।

তাঁর বই এখন বাজারে দুর্লভ। বিজ্ঞাপনের যুগে তাঁর বই বিনা-বিজ্ঞাপনে বিক্রী হয়ে যেত, এটা তাঁর লোকপ্রিয়তারই পরিচয়। তাঁর শেষবয়সের কবিতাগ্রন্থ 'যজ্ঞভস্ম' ও 'রুচিরা' এখনও কিছু পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি পত্রপত্রিকা তাঁর লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে। এখন সেসব খুঁজে পাওয়াও কঠিন। শিশুসাহিত্যেও তাঁর দান কিছু কম নয়। পুরনো মুকুল সন্দেশ ও রামধনুতে সেগুলি পাওয়া যাবে। তাঁর ধাঁধাগুলিও ভারি কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ ছিল।

তাঁর 'জীবনবাণী' বইটি তাঁর জীবনদর্শনের মূর্ত ছবি। তিনি চোখ বুজে ধ্যানাসনে বসে ভগবানকে খোঁজেন নি, কিন্তু ভগবানে কতটা বিশ্বাস থাকলে এমন বীরের মত সব অসহনীয় ব্যথাও হাসিমুখে বহন করা যায় তা আমরা সবাই বুঝতে পারি। তাঁর একটি গানে প্রশ্ন আছে:

কোথায় তোমার সঙ্গে আমার কবে প্রথম পরিচয়?

তার উত্তরে নিজেই বলেছেন যে—

ধ্যানে, জ্ঞানে, সুখের ফুল্ল বুকে বা নিজের বেদনার আকুলতায় তাঁকে পাই নি।
কবে কোথায় পরের ব্যথায় আকুল হয়ে কেঁদেছি,
মন ভুলায়ে হাত বুলায়ে কখন কাকে সেধেছি,
সেথায় বুঝি আমার খোঁজে এসেছিলে প্রেমময়!

—

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কয়েকটি বাংলা গ্রন্থ

ফুলশর, ১৯০৪॥ যজ্ঞভস্ম, ১৯০৪॥ পঞ্চকমালা, ১৯১০॥ কালিদাস, ১৯১১॥ হেঁয়ালি, ১৯১৫॥ প্রাচীন সভ্যতা, ১৯১৮॥ গীতগোবিন্দ: মূল ও অনুবাদ, ১৯১৯। জীবনবাণী, ১৯৩৩॥

সম্পাদিত গ্রন্থ

সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাবলী॥ বঙ্গবাণী॥

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

১৮৬১ - ১৯৪২

নীলরতন সরকার
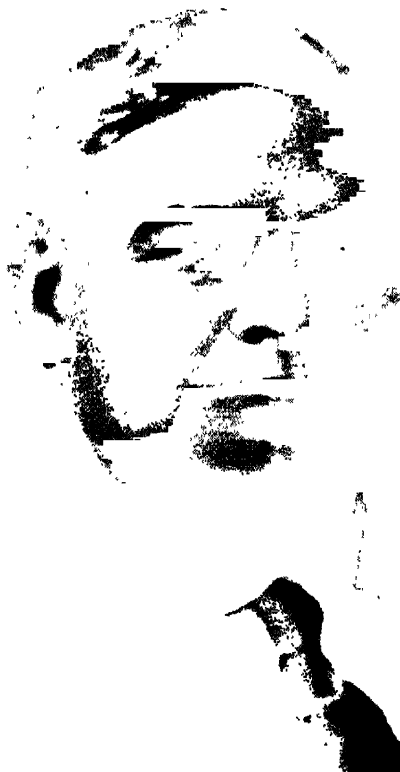
১৮৬১ - ১৯৪৩

নীলরতন সরকার ১৮৬১-১৯৪৩

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মানুষের জীবনের মূল্য কি ?

অবশ্য মানুষমাত্রেই এবং প্রাণীমাত্রেই, নিজের জীবনকে অমূল্য মনে করে— অন্ততঃপক্ষে যতদিন না তাহার জীবন রোগে বা ব্যর্থতায় বা শোকেতাপে দুর্বহ হইয়া পড়ে। কিন্তু সমাজ দেশ ও জাতি কাহারও জীবনের মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে তাহার যাচাই করে বিভিন্ন পন্থায়। মান-মর্যাদা খ্যাতি-প্রতিপত্তি ঐশ্বর্য-প্রতাপ এ সকলের সাময়িকভাবে মূল্য পাইয়া থাকেন প্রায় সকল ধনীমানী বা যশঃপ্রতাপ-শালী লোকমাত্রেই, বিশেষ, সমাজের এক শ্রেণীর লোকের কাছে। কিন্তু সেই খ্যাতি-প্রতিপত্তি বা ঐশ্বর্য-প্রভাব যদি লোকহিতকারী কোনো কাজে নিযুক্ত না হয়, দেশের ও দশের কোনো উপকারে না আসে তবে তাহার মূল্য কয়জনে কতদিন দেয় ?

সমাজ যদি উন্নত বা উন্নতিকামী হয়, দেশ ও জাতি যদি জাগ্রত ও প্রগতিশীল হয়, তবে সেই জীবনকেই মূল্যবান বলা হয় যে-জীবনের লক্ষ্য দেশ জাতি ও সমাজকে প্রগতির পথে ও উন্নততর জীবনের পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করা। সেই জীবনকেই মহামূল্য বলা হয় যাহা সমগ্র জীবনযাত্রা পথে লক্ষ্যভ্রষ্ট বা আদর্শচ্যুত হয় নাই, অন্যদিকে সে জীবনের পরিণতি যাহাই হউক না কেন। যে জীবনের যাত্রাপথ নিরুদ্দেশযাত্রার মত বা স্বার্থসিদ্ধির অন্বেষণের মত, তাহার মূল্যই-বা কি মানই-বা কি ?

আমাদের বাংলাদেশের পরম সৌভাগ্যক্রমে গত শতাব্দীতে এরূপ কয়েকজন মনীষী মহাপুরুষ এ দেশে জন্মগ্রহণ করেন যাঁহারা একদিকে যেমন জ্ঞানেগুণে প্রভাবপ্রতিপত্তি ও ধনেমানে দেশ-দেশান্তরে খ্যাতিলাভ করেন অন্যদিকে তেমনই তাঁহাদের সকল শক্তিসামর্থ্য ও মনীষা দেশের ও জনসাধারণের উন্নয়নে ব্যাপক ও পূর্ণভাবে নিয়োগ করেন। ইঁহাদের মধ্যে তিন জন একই বৎসরে আগে পরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে আজীবন সৌহার্দ্য ছিল। ইঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, মধ্যম ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ ছিলেন ডাক্তার নীলরতন সরকার।

জন্মকালে ইঁহাদের তিন জনের জীবনপথের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল, কিন্তু পূর্ণবয়সের আদর্শবাদ ও আত্মনিবেদনে ইঁহাদের মধ্যে একইভাবের প্রেরণার নিদর্শন পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন ধনেমানে প্রতিষ্ঠিত পরিবারে। তাঁহার পরের জীবন সর্বজনবিদিত।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তাহা ছিল অপেক্ষাকৃত সচ্ছল মধ্যবিত্ত অবস্থার। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিদেশযাত্রা করিতে তাঁহাকে বিশেষ বৃত্তির সাহায্য লইতে হয় কিন্তু এ দেশে শিক্ষালাভের জন্য তাঁহাকে কোনো কষ্ট পাইতে হয় নাই। পরের জীবনে তাঁহার পথ ছিল সহজ ও সরল।

নীলরতন সরকারের জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হয় অতি শৈশবে। ২৪-পরগনা জেলার ডায়মণ্ডহারবারের নিকটস্থ নেতরাগ্রামে ইংরাজি ১৮৬১ সালের ১লা অক্টোবরে তিনি এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবার পূর্বে যশোহরে ছিল এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও শোভাবাজারের দেব-পরিবারের সহিত ইহার দূর-সম্পর্ক ছিল। পিতা নন্দলাল সরকারের ইনি দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। যখন ইহার বয়স

তিন বৎসর মাত্র সেই সময় এক প্রবল ঝড়বৃষ্টি ও জলোচ্ছ্বাসে এই পরিবারের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয় এবং সেই সঙ্গে চাষের জমিও নোনাজলে নষ্ট হইয়া যায়। স্ত্রীপুত্রপরিবার লইয়া নন্দলাল সরকার অসহায় অবস্থায় জয়নগরে শ্বশুরালয়ে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন।

সেখানেও সংসার সহজ অবস্থায় ছিল না। নন্দলাল সরকার মহাশয়ের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। এই বৃহৎ পরিবারের সন্তানদিগকে পালনের জন্য স্নেহময়ী মাতা থাকমণি নিজেকে বঞ্চিত করিয়া ও অশেষ কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া সংসার চালাইতেন। এইভাবে নিজের উপর সমস্ত অভাব-অনটনের ভার টানিয়া লওয়ায় তাঁহার শরীর ভাঙিয়া যায়। নীলরতনের বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর তখন তাঁহার মাতা দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, প্রায় বিনা চিকিৎসায়, মৃত্যুমুখে পতিত হন। মায়ের এইরূপ অসহায় অবস্থায় মৃত্যু উঁহার কিশোরমনে গভীর রেখাপাত করে এবং সেই মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়াইয়াই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি চিকিৎসা-বিদ্যা পূর্ণরূপে শিক্ষা করিয়া রুগ্ন ও আর্ত মানবের কষ্টলাঘব করিতে আজীবন চেষ্টিত থাকিবেন। তাঁহার স্বভাব-চরিত্রের যে উদারতা, আত্মনিবেদন ও স্নিগ্ধ মিষ্ট ব্যবহার পরের জীবনে খ্যাত হয় সে সবই এই স্নেহমমতাময়ী মাতার দান।

তাঁহার শিক্ষারম্ভ হয় জয়নগরে এবং সেখানেই স্কুল হইতে ১৮৭৬ সালে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া তিনি ঐ বৎসরই ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুলে প্রবেশ করেন। ঐ সময় হইতেই তাঁহাকে নিজের শিক্ষার ও ভরণ-পোষণের জন্য অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত থাকিতে হয়। সমস্ত পরিবার ঐ সময়ে কলিকাতা চলিয়া আসায় সেই পরিবার প্রতিপালনও এক সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র নিজের শিক্ষা বন্ধ করিয়া স্কুলমাস্টারি করিয়া ঐ সমস্যা আংশিকভাবে পূরণ করিয়া মধ্যমভ্রাতার উচ্চশিক্ষার পথ মুক্ত না করিয়া দিলে নীলরতনের বিদ্যার্জনের আকাঙ্ক্ষা হয়তো ব্যর্থ হইত। জ্যেষ্ঠের এই মহত্ত্ব তিনি কোনোদিন ভুলেন নাই এবং নিজে উপার্জনক্ষম হইবামাত্রই তিনি দাদাকে সম্পূর্ণরূপে সংসারভার হইতে মুক্ত করেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠের স্বার্থত্যাগ সত্ত্বেও তাঁহাকে শিক্ষকের কাজ করিয়া ও বৃত্তিলাভ করিয়া নিজের শিক্ষার খরচ ও আংশিকভাবে সংসারের খরচ মিটাইতে হয়।

তিনি ক্যাম্বেলে প্রবেশ করেন ১৮৭৮ সালে এবং ১৮৭৯ সালে কৃতিত্বের সহিত বাংলাভাষায় ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ সময়ে উক্ত স্কুলের অধ্যক্ষ ডাঃ এস. সি. ম্যাকেঞ্জি তাঁহার মেধা ও চিকিৎসায় দক্ষতা দৃষ্টে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে উচ্চতর চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য চেষ্টিত হইতে উৎসাহ দেন। এবং সেই চেষ্টায় তিনি প্রথমে জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লি কলেজ ও পরে মেট্রোপলিটন (এখন বিদ্যাসাগর) কলেজে প্রবেশ করিয়া ১৮৮৩ সালে এল. এ. (এখন আই. এ.) ও ১৮৮৫ সালে বি. এ. পাস করেন। ঐ সময় ঐ জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লি কলেজে নরেন্দ্রনাথ দত্ত— পরের জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ— তাঁহার সহপাঠী ছিলেন!

বি. এ. পাস করিবার পর তিনি মেডিকাল কলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহার শিক্ষক ডাঃ ম্যাকেঞ্জি মেডিকাল কলেজের কর্তৃপক্ষের সহিত ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইবার সুযোগ দেন। ১৮৮৮ সালে এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মেয়ো হাসপাতালের হাউস সার্জন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইখানে থাকিতেই তিনি ১৮৮৯ সালে এম. এ. ও এম. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৮৯ সালেই তিনি বরিশালের ব্রাহ্মপ্রচারক গিরীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রথমা কন্যা নির্মলাকে বিবাহ করেন। ১৮৯০ সালে তিনি সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা আরম্ভ করেন।

এই শিক্ষা ও বিদ্যালাভের বৃত্তান্ত শুনিতে প্রায় যে-কোনও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তানের পড়াশুনার ইতিবৃত্তেরই মত মনে হয়। কিন্তু ১৮৭৬ হইতে ১৮৭৯ পর্যন্ত বিদ্যার্থী নীলরতনের জীবন যদি-বা অপেক্ষাকৃত কম অভাব-অনটনের মধ্যে চলে, ১৮৭৯ সালের পর একদিকে সংসার অচল অন্যদিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার অত্যধিক খরচ— এই দুই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া উপার্জন ও অর্থসঞ্চয়ের প্রশ্ন সমাধান করিতে হয়। অটুট দৃঢ়সংকল্প ও অসাধারণ মেধা না থাকিলে তাঁহার উচ্চশিক্ষার অভিলাষে এইখানেই জলাঞ্জলি দিয়া অন্য শত শত 'ভার্নাকুলার' ডাক্তারের মত তাঁহাকে দিনগত-পাপক্ষয়ে জীবনযাপন করিতে হইত। কিন্তু 'সুখ-সোয়াস্তি'র কথা ভুলিয়া তিনি এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৭৯ হইতে ১৮৮১ পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে তিনি কলেজে ভর্তি হইতে পারেন। ১৮৮১ হইতে ১৮৮৮ সালে পাস করিয়া মেয়ো হাসপাতালে কাজ পাওয়া পর্যন্ত এই অর্থাগমের জন্য পরিশ্রম ও অভাব-অনটন সমানে চলে, উপরন্তু উচ্চশিক্ষালাভের জন্য অনন্যমনা হইয়া অধ্যয়ন ও হাসপাতালে ফলিত-চিকিৎসার নিরীক্ষণ সমান অধ্যবসায়ের সহিত চালাইতে হয়। যে অসীমধৈর্য দৃঢ়চিত্ত ও ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের ক্ষমতা তাঁহাকে ছাত্রজীবনে সফল করে তাঁহার কর্মজীবনে সেই সকল গুণ তাঁহাকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। উপরন্তু তাঁহার উদার সহানুভূতিযুক্ত হৃদয় এবং নির্মল দ্বেষ-হিংসা মুক্ত মন তাঁহাকে ডাক্তার-বন্ধু ও সহযোগী হিসাবে সর্বজনপ্রিয় করে।

তাঁহার কর্মজীবনের সীমা সুদূরপ্রসারিত ছিল। চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, স্বদেশীযুগের শিল্পজাগরণের অন্যতম কর্ণধার ও স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতৃবর্গের সহযোগী রূপে তিনি বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পরিচিত ও খ্যাত ছিলেন।

মেডিকাল কলেজে ছাত্র অবস্থাতেই তাঁহার চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রতিভার নিদর্শন দেখা দেয়। দারিদ্র্যের বিষম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি গুডিভ স্কলার হইয়াছিলেন এবং ধাত্রীবিদ্যা ও মেডিকাল জুরিস্‌প্রুডেন্সে অনার্স প্রাপ্ত হন। ছাত্রজীবনের এই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় তাঁহার ব্যবহারিক জীবনে চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ জ্ঞান সমীক্ষা ও দক্ষতার জন্য খ্যাতিলাভের পূর্বাভাস মাত্র ছিল। এই খ্যাতির মূলে একদিকে যেমন ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অন্যদিকে ছিল রোগীর প্রতি সহানুভূতি। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সার্ নীলরতনকে শ্রদ্ধা-নিবেদনে বলিয়াছেন :

"আমি প্রথম যখন তাঁহাকে রোগী পরীক্ষা করিতে দেখি তখনই রোগীর আত্মীয়স্বজনের প্রতি তাঁহার ভদ্র ব্যবহার এবং রোগের বিবরণ শোনায় তাঁহার অশেষ ধৈর্য্য লক্ষ্য করি। সেই সময়েই আমি দেখি যে, রোগের খুঁটিনাটি ও ক্ষুদ্রতম বৃত্তান্তের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি কিরূপ সজাগ ও প্রখর। পরে আমি জানিয়াছিলাম যে রোগ-সম্পর্কিত সূক্ষ্মতম বিষয়ের প্রতি এইরূপ তীক্ষ্ণ সমীক্ষণই তাঁহাকে চিকিৎসকরূপে এরূপ উচ্চাসন দিয়াছে।"

চিকিৎসার ক্ষেত্রে পূর্বেকার দিনে 'সাহেব ডাক্তার', অর্থাৎ আই. এম্. এস. ও আর. এ. এম্. সি. (I. M. S ও R. A. M. C.) শ্রেণীর সেনানী পদস্থ চিকিৎসক ও শল্যচিকিৎসক সর্বোচ্চ স্থান পাইতেন। এদেশীয় চিকিৎসক যতই বিজ্ঞ বা বিচক্ষণ হউন-না কেন মর্যাদায় ও পদগৌরবে উহাদের সমশ্রেণীতে স্থান পাইতেন না। 'ভিজিট' অর্থাৎ দক্ষিণার পরিমাণ ঐ সাহেবদের বা দুই-চারিজন আই. এম্. এস্.-শ্রেণীর ভারতীয়ের বেলায় হইত ১৬৲ টাকা, দেশীয়দের ২৲ ৪৲ বা ৮৲ টাকাই যথেষ্ট মনে করা হইত। ডাক্তার

নীলরতন সরকার তাঁহার সহপাঠী বন্ধু সার্জন সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে বলেন যে ইহা যথাযথ নহে এবং ভারতীয় চিকিৎসকগণের উচিত ইহাকে অপমান বলিয়া বিচার করা। এই বলিয়া তিনি স্থির করেন যে তিনিও ১৬৲ টাকাই দক্ষিণা লইবেন। কিছুদিন পরে ডাক্তার সর্বাধিকারীও তাঁহার চিকিৎসক পিতার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া ঐ ভিজিটই গ্রাহ্য করেন। ভারতীয় চিকিৎসকদিগের আত্মসম্মান ও মানমর্যাদা প্রতিষ্ঠার এই প্রথম সোপান গঠন এইভাবে ডাক্তার নীলরতন সরকার করেন।

কিন্তু অর্থাগমই তাঁহার চিকিৎসক-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। উপার্জন তিনি যথেষ্ট করিয়াছিলেন এবং শিল্প-অনুশীলনে ও জনসাধারণের উন্নয়ন এবং জাতীয় প্রগতির নানা আয়োজনে জলের মত অর্থ ব্যয় না করিলে তিনি বিশাল সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন, ইহা সত্য। কিন্তু রোগক্লিষ্ট দরিদ্রের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি এতই প্রবল ছিল যে অসংখ্য রোগী তাঁহার কাছে বিনা দক্ষিণায় চিকিৎসা ও ব্যবস্থা পাইত। যখন তাঁহার শতবার্ষিকীর ঘোষণা হয় সেই সময় একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান কবি পূর্বপাকিস্তান হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি একদিন এক প্রকাশকের কার্যালয়ে লেখককে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলেন যে, ডাক্তার সরকারের স্মৃতিতর্পণে তাঁহারও সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার আছে।

তিনি বলেন, "আমি তখন ছাত্র; আমার সম্বল কিছু বৃত্তি এবং অন্যভাবে সংগৃহীত অতি অল্প টাকা। সেই সময় একবার আমার পিতা দীর্ঘকাল রোগে ক্লিষ্ট ও জীর্ণ হইয়া চিকিৎসার শেষ চেষ্টায় কলিকাতায় আসেন। দেশের চিকিৎসকেরা রোগের কোনও উপশম করিতে না পারিয়া সবশেষে তাঁহাকে কলিকাতায় চিকিৎসা করাইতে পরামর্শ দেন। সেই শেষ চেষ্টায় তিনি কলিকাতায় আসিয়া আমার মেসে উঠেন।

"আমি স্থানীয় নামকরা ডাক্তারকে ডাকিয়া তাঁহাকে দেখাই। কিছুদিন পরে ঐ ডাক্তার আমায় বলেন যে তিনি প্রতিকারের কোনও কিছু ঠিক করিতে পারিতেছেন না এবং রোগীকে একবার সার্ নীলরতনকে দেখাইলে ভালো হয়। আমি প্রশ্ন করিয়া জানিলাম যে সার্ নীলরতনের ভিজিট চৌষট্টি টাকা, তবে তাঁহার ঘরে দেখাইলে বত্রিশ টাকা। আমার অর্থসামর্থ্য অল্প, কিন্তু অন্যদিকে পিতার জীবনমরণ সমস্যা। কোনোক্রমে বত্রিশ টাকার ব্যবস্থা করিয়া, একদিন গিয়া সার্ নীলরতনের সঙ্গে দিন ও সময় ঠিক করিলাম। সেইদিন যথাসময়ে পিতাকে লইয়া গেলাম। সার্ নীলরতন প্রথমে রোগের বিষয় ও পরে রোগীর খাওয়া থাকা ও পারিপার্শ্বিক অনেক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ও শুনিলেন। তাহার পরে অতি যত্নের সঙ্গে অতি সূক্ষ্মভাবে রোগীকে পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর প্রেস্‌ক্রিপসন্ লিখিয়া দিয়া আহার পথ্য ও রোগীর সেবার খুঁটিনাটি বিশদভাবে আমাদের বুঝাইলেন। পরে এই ব্যবস্থায় পনেরো দিন চলিয়া পুনর্বার তাঁহার কাছে আসিতে বলিলেন। আমি উঠিবার সময় টাকা দিতে গেলে তিনি বলিলেন, 'ওসব পরে দেখা যাইবে।' আমার তো চিন্তা বাড়িয়া গেল, আর একবার দেখানো মানে আবার ঐ টাকা, এ ছাড়া ঔষধপত্রের ও রোগীর পথ্যের খরচ তো আছেই।

"যাহা হউক ঔষধ ও পথ্য-ব্যবস্থায় পিতার বেশ উপকার দেখা গেল। সুতরাং যে করিয়াই হউক আরও বত্রিশ টাকা যোগাড় করিয়া এবং পূর্বেকার বত্রিশ টাকা সমেত চৌষট্টি টাকা লইয়া পুনর্বার সার্ নীলরতনকে রোগী দেখাইলাম। ব্যবস্থায় উপকার হইয়াছে শুনিয়া তিনি প্রসন্নমুখে আমার পিতাকে বলিলেন, 'আপনার রোগ ধরা পড়িয়াছে এবং সারিবেও, তবে সময় লাগিবে; সুতরাং আপনি দেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন। ঔষধ এখান হইতে লইয়া যাইবেন, দেশে যাইলে পথ্যের ব্যবস্থা সহজ ও ভালো হইবে।'

এই বলিয়া তিনি আবার সযত্নে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে পুনর্বার পরীক্ষা করিয়া নূতন প্রেস্‌ক্রিপসন্ এবং আহারাদির ব্যবস্থা লিখিয়া দিলেন। উঠিবার সময় তাঁহাকে টাকা দিতে গেলে তিনি উঠিয়া আমার পিঠে হাত দিয়া চলিতে চলিতে হাসিমুখে বলিলেন 'তোমার বাবার কথায় বুঝিলাম তুমি এখানে কলেজের ছাত্র। তোমার কাছে তোমার বাবার চিকিৎসাই বড় কথা হওয়া ঠিক। ওই টাকা তুমি তাঁর ঔষধ-পথ্যে লাগিয়ো।' এই বলিয়া তিনি ফিরিয়া অন্য রোগীকে লইয়া তাঁহার কন্‌সাল্টিং-ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিলেন। আমার পিতা ঐ ব্যবস্থায়ই আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন এবং যতদিন জীবিত ছিলেন প্রত্যেক পত্রে বা দেখা হইলে মুখে সার্ নীলরতনের সংবাদ লইতেন ও আমায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে বলিতেন। তাঁহার সৌজন্য ও মহত্ত্ব আমার পিতা কখনও ভুলেন নাই।"

এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আমাদের সকলেরই জানা আছে। আমাদের জানা নাই এরূপ অনেক কিছুই (যেমন উপরের বৃত্তান্ত) অন্যের জানা আছে। ডাক্তার সরকার এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিতেন না— অন্যের কাছে শুনিতেও চাহিতেন না।

এ দেশে রুগ্ন ও পীড়িত লোকের শুশ্রূষা ও আরোগ্য -ব্যবস্থা এখনও যথেষ্ট নাই, এই শতাব্দীর আরম্ভে তাহা আরও কম ছিল। এ দেশে চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার জন্য মেডিকাল কলেজও ভারতে অল্প কয়েকটি মাত্র ছিল। ডাক্তার সরকারের বিশেষ আগ্রহ ছিল এ দেশে ভারতীয় চিকিৎসকের কাছে ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থার চলন করার জন্য। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, বেসরকারী কলেজে ঐভাবে শিক্ষা দিলে ছাত্রদিগের সকল দিকে সুবিধা হইবে। এই কারণে তিনি তাঁহার কলেজ অব্ ফিজিসিয়ান্স অ্যাণ্ড সার্জনস অব্ বেঙ্গল স্থাপিত করেন এবং পরে আর-একজন চিকিৎসা-শিক্ষাব্রতীর সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহার ক্যালকাটা মেডিকাল স্কুলের সহিত যুক্ত করিয়া বর্তমান আর. জি. কর মেডিকাল কলেজের গোড়াপত্তন করেন। ঐ অন্যজনের নাম ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর। এবং ভারতে চিকিৎসা-বিদ্যায় শিক্ষাদানের ইতিহাসে তাঁহারও স্থান উচ্চে। প্রথমে ১৯১৫-১৬ সালে কারমাইকেল মেডিকাল কলেজ নামে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড কারমাইকেল সেই সময়ে বাংলার গবর্নর ছিলেন এবং ডাক্তার নীলরতন সরকারকে তিনি অতি বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধেয় লোক জানিয়া তিনি এই কলেজ স্থাপনে ও উহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দানে সম্মতি দিয়াছিলেন। এই কলেজ ও হাসপাতালের জন্য টাকা তুলিতে তিনি বহু পরিশ্রম ও নিজের অনেক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন। আমরা জানি, অনেক ক্ষেত্রে নিজের প্রাপ্য দক্ষিণা ছাড়িয়া দীর্ঘদিন চিকিৎসা করিয়া তিনি অনেক ধনী ব্যক্তির নিকট এইরূপ প্রতিষ্ঠানের জন্য টাকা আনিতেন। বস্তুতপক্ষে প্রথম দিকে এই কলেজ স্থাপনের জন্য যে সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ টাকা তুলিবার শর্ত লর্ড কারমাইকেল নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন সে টাকা ডাক্তার সরকারের অক্লান্ত চেষ্টা না থাকিলে কখনই উঠিত না।

এইভাবে তিনি চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ও যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল -স্থাপনায় সাহায্য করেন। উক্ত দুই প্রতিষ্ঠানেরই তিনি প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

তিনি ভারতীয় চিকিৎসকদিগকে সংঘবদ্ধ করার জন্য বহু চেষ্টা করায় ১৯২৮ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত অল-ইণ্ডিয়া মেডিকাল কনফারেন্সে ইণ্ডিয়ান মেডিকাল এসোসিয়েসন স্থাপিত হয়। বোম্বাইয়ের ডাক্তার দেশমুখ উহার প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরের কনফারেন্সে ডাক্তার সরকার রিসেপ্‌সন

কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে এবং পরে আলাপ-আলোচনায় এই সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তিনি এরূপ যুক্তি ও তথ্য উপস্থিত করেন যে সেই কনফারেন্স সঙ্গে সঙ্গে এই অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনে রাজি হয়। ১৯৩২ সালে তিনি এই অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা মেডিকাল ক্লাবের স্থপয়িতা-প্রেসিডেণ্ট। ১৯২৩ হইতে ১৯২৯ পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং তাহার পর ইহার 'পেট্রন' ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার মূল্যবান লাইব্রেরি তিনি এই ক্লাবে দান করেন। এই ক্লাব স্থাপিত হয় ১৯০১ সালে ডাক্তার সরকারের ৬১নং হ্যারিসন রোডের বাসভবনে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তিনি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগ -প্রতিষ্ঠার জন্য সার্ তারকনাথ পালিত, সার্ রাসবিহারী ঘোষ, খয়রা-রাজ প্রভৃতি ধনীগণ যে বিশাল সম্পত্তি ও বিরাট দান করেন, তাহার মূলে এই শিক্ষাব্রতী চিকিৎসকের প্রভাবই সর্বপ্রধান প্রেরণার আকর ছিল। প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসায় দুর্লভ জ্ঞান ও বিচক্ষণতার সঙ্গে নির্মল নির্লোভ ও নিরহংকার স্বভাব যুক্ত হওয়ায় এই পরম অমায়িক সজ্জন, উচ্চতম রাজপুরুষ ও ধনীমানী সমৃদ্ধ লোক হইতে সাধারণ দুঃখী দরিদ্র পর্যন্ত যে-কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিত সেই সকলের কাছেই সম্মান মর্যাদা ও বন্ধুত্ব আকর্ষণ করিতে পারিতেন। সেই কারণে ইঁহারই অনুরোধে সার্ তারকনাথ পালিত তাঁহার আপার সার্কুলার রোডস্থ (এখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) বিশাল ভূসম্পত্তি প্রথমে বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউটকে ব্যবহার করিতে দেন। পরে উহা এবং বহু লক্ষ টাকা ও নিজের বাসভবন (বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডস্থ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন।

জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ্ ও বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউটের (এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) আদি প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নীলরতন সরকার। বেঙ্গল টেকনিকাল স্থান পাইয়াছিল তারকনাথ পালিতের ঐ আপার সার্কুলার রোডের গৃহে ও উহার সংলগ্ন বিস্তৃত জমিতে। কিন্তু তখন আয় প্রায় কিছুই ছিল না। তখনকার ছাত্রদের কাছে শোনা যায় যে, একমাত্র আয় ছিল সকাল হইতে বেলা একটা পর্যন্ত ডাক্তার সরকারের সমস্ত উপার্জন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি কার্যে তাঁহার সহায়তা ও পরামর্শ অকাতরে তিনি দিতেন। ১৮৯৩ সাল হইতে তিনি উহার ফেলো ছিলেন। ১৯১৯ হইতে ১৯২১ তিনি উহার উপাচার্য ছিলেন। পরে ১৯২৪-১৯২৭ পর্যন্ত তিনি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিল অব্ আর্টসের প্রেসিডেণ্ট, কাউন্সিল অব্ সায়েন্সের প্রেসিডেণ্ট (১৯২৪-৪২), ডিন অব্ দি ফাকল্টি অব্ মেডিসিন (১৯৩৯-৪১) এবং ডিন অব্ দি ফাকল্টি অফ সায়েন্স (১৯৩৩-৩৯) ছিলেন। ১৯২০ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এম্পায়ার য়ুনিভার্সিটিজ কংগ্রেসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ডেলিগেট হইয়া গিয়াছিলেন। শিক্ষাব্রতী ও জ্ঞানী হিসাবে তখন তাঁহার খ্যাতি বিদেশে ছড়াইয়াছে। সেই কারণে ঐ বৎসরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডি. সি. এল. এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় এল. এল. ডি. ডিগ্রী দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করে।

বিশ্বভারতীর তিনি 'প্রধান' ও ট্রাস্টি ছিলেন। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরেরও তিনি পরিচালক-সংসদের সভ্য ছিলেন। কলিকাতা জাদুঘরের তিনি একজন ট্রাস্টি ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ১৯৪১

সালে ডি. এস.সি উপাধি দেন এবং পরে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের (Zoology) আসন তাঁহার নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নিজের কৈশোর ও যৌবনে শিক্ষালাভে যে কষ্ট ও অন্তরায় তিনি পাইয়াছিলেন অন্যের ক্ষেত্রে তাহা যাহাতে না ঘটে সেই চেষ্টায় এই পরহিতকামী শিক্ষাব্রতী বাংলার শিক্ষা-সম্পর্কিত প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান ও পরিষদের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং প্রত্যেকটির অগ্রগতির জন্য তিনি সক্রিয়ভাবে চেষ্টিত ছিলেন।

তিনি নিজের চাতরার স্কুলের হেডমাস্টারির কথা এবং পরে ডক্টর অঘোর চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডুর পিতা)-স্থাপিত গ্রে স্ট্রীটের স্কুলে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা তাঁহার শিক্ষাব্রতের প্রথম সোপান মনে করিতেন। এই গ্রে স্ট্রীটের স্কুলে নরেন্দ্রনাথ দত্তও (স্বামী বিবেকানন্দ) তাঁহার সহকর্মী ছিলেন। শিক্ষার পথ সরল ও প্রগতিশীল করার চেষ্টা সেইজন্য তাঁহার মধ্যে কর্মজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। ১৯০৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন নিয়মাবলী-প্রণয়নে— যাহার ফলে বিজ্ঞান ও সাহিত্য ইত্যাদি আই. এ. ও আই. এস.সি. এবং বি. এ., এম. এ. ও বি. এস.সি., এম. এস.সি. পরীক্ষায় ও শিক্ষা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়— ডাক্তার সরকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন।

তার পর আসে তাঁহার শিল্প-প্রযোজনার চেষ্টার কথা। নিজের শৈশব কৈশোর ও প্রথমযৌবনে বাঙালীর আর্থিক অসহায় অবস্থা প্রতিপদে অনুভব করার ফলে তাঁহার মনে ধারণা হয় যে ভারতীয় তথা বাঙালীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে তাহার একমাত্র পথ হইবে ফলিত-বিজ্ঞান অনুযায়ী শিল্প-প্রযোজনায়। তাঁহার এ ধারণাও ছিল যে বিদেশী শিল্পকে এ দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া দাঁড় করাইতে হইলে ভারতীয়দের অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, কেননা এখানের কাঁচা মাল, শ্রমিক, জল, বাতাস সব-কিছুই ইয়োরোপ হইতে ভিন্ন প্রকারের এবং সেই কারণে প্রথম দিকে প্রতিপদে ভুল ও লোকসান হইবেই। বিদেশীয়েরা পারতপক্ষে সেইসকল ভুল ও লোকসান এড়াইবার পন্থা কোনো ভারতীয়কে ঠিক মত শিখাইবে না। কাজের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ঐ সময় ও পয়সার লোকসান মূল খরচের মধ্যে ধরিতে হইবে এই ছিল তাঁহার মত। এবং সেইজন্য বিভিন্ন শিল্পের ও ব্যাপারিক যোজনায় তিনি অকাতরে অর্থদান করিয়া গিয়াছেন। লাভ-লোকসানের হিসাব দেখিবার মত লোক তাঁহার কেহ ছিল না যে তাঁহার দিকটাই টানিয়া চলে। নিজের ডাক্তারী ও অন্য নানা কাজের মধ্যে অবসরও তাঁহার ছিল না যে এ বিষয়ে তিনি হিসাব বুঝিয়া সেইমত টাকা ফেলিবেন। কাজেই লাভ যাহা-কিছু এই অগাধ টাকা ঢালিবার ফলে আসে— টাকার হিসাবে বা অভিজ্ঞতার হিসাবে— তাহার সব-কিছুই পায় অন্য লোকে, তাঁহার ভাগে পড়ে খরচের ও লোকসানের অঙ্ক। ইহার জন্য তিনি কখনও এক মুহূর্তের জন্য আক্ষেপ করেন নাই।

নিজে নির্মলচিত্ত ও সৎ ছিলেন সেইজন্য অন্যের কথা সহজ ও সরল মনে বিশ্বাস করিতেন। বহু ভদ্রবেশধারী ঠগ বহুবার নূতন শিল্প প্রযোজনার বা সাধারণের উপকারের জন্য হিতকারী সভা বা অনুষ্ঠানের খরচ বলিয়া বিস্তর টাকা লইয়াছে। সেসকল তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনিতেন না। তাঁহার টাকায় দেশের শিল্পপ্রগতির পথ পরিষ্কার হইল এবং সেই শিল্প বা ব্যাপারিক প্রযোজনার অভিজ্ঞতা দেশের কোনো লোক পাইল—এককথায় তাঁহার অর্জিত টাকা দেশ ও দশের অগ্রগতির সহায়ক হইল— ইহাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন, কেননা ইহাই ছিল তাঁহার কাম্য।

এইভাবে তিনি ট্যানিং সাবান রঞ্জনশিল্প ও অন্য রাসায়নিক পদার্থের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত ইত্যাদি কাজের কারখানা, চা-বাগান ও কয়লার খনি ইত্যাদিতে অজস্র টাকা দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের এসকল বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাব এবং অন্যের সততায় বিশ্বাস থাকায় অশেষ ক্ষতি ও ঋণের ভার বহন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি নামিয়াছিলেন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ যখন হয় সেই সময়। কংগ্রেসে অবশ্য তিনি ১৮৯০ হইতেই যোগ দিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশী-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করিবার ফলেই শিল্পপ্রযোজনায় নামিয়াছিলেন এবং সেই সময়ের নেতৃবর্গের সহিত মিলিত হইয়া জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ ও বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউটের কর্মসচিবের পদ গ্রহণ করেন। কিভাবে তিনি তাঁহার কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন তাহার সামান্য বিবরণ আগেই দিয়াছি।

১৯১৯ সালে চরম ও নরম -পন্থীদের মধ্যে বিবাদ হইলে তিনি কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়ান। 'লিবারেল পার্টি'র কার্যক্রমে কোনো প্রেরণা বা শক্তি না দেখায় তাহাতে তিনি যোগদান করেন নাই। বস্তুতপক্ষে তাঁহার মন ছিল চরমপন্থীদের দিকে, তবে নিজেকে জাহির করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরোধী ছিল, সেই কারণে তিনি তখনকার রাজনীতি হইতে সরিয়া দাঁড়ান। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃবর্গের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত যোগ পূর্ণ ও প্রকাশ্য ভাবে রহিয়া যায়।

গান্ধীজি ও তাঁহার মধ্যে সশ্রদ্ধ প্রীতির বন্ধন ছিল। মতিলাল নেহরু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাজে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জীবিত থাকিতে, কলিকাতায় আসিয়া ডাক্তার সরকারের শর্ট স্ট্রীটের ভবনে থাকিয়া গিয়াছেন এবং পরে দার্জিলিংএ তাঁহারই গ্লেন ইডেন ভবনে থাকিয়া সেখানে কনফারেন্স করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র অসুস্থতার কারণে প্রথমবার মুক্তি পাইয়াছিলেন মেডিকাল সার্টিফিকেটে ডাক্তার নীলরতন সরকারের স্বাক্ষর ছিল বলিয়া।

তিনি বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন ১৯১২ সাল হইতে আনুমানিক ১৯৩০ পর্যন্ত। সেখানের কাজে বা তর্কে নিখুঁত তথ্যের উপর যুক্তি-স্থাপনাই ছিল তাঁহার রীতি। তর্কবিতর্কের মধ্যে তাঁহার অংশ গ্রহণ এতই ভদ্র ও সৌজন্যপূর্ণ হইত যে সেখানেও তাঁহার সঙ্গে অসদ্ভাব কাহারও ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় গত শতাব্দীর শেষ দিকে। পরে এই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়া আজীবন ছিল। দুজনেরই জীবন আদর্শবাদে ও ভগবদ্‌বিশ্বাসে প্রভাবিত ও আলোকিত ছিল, যদিও কর্মক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল দুজনার মধ্যে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের অনেকেই তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া জানিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ তো 'ডাক্তারবাবু'র কথার ওজন দিতেন অন্য সকলের পরামর্শের উপরে, বিশেষত শারীরিক ব্যাপারে। তাহার কারণ, ডাক্তার সরকার তাঁহাকে বুঝিতেন ভালো এবং তাঁহার মতামতকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে মানাইয়া লইয়া চলিতেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬) আশি বৎসর বয়সে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। রোগের অবস্থা যখন নিদারুণ তখন তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া ডাক্তার সরকারের চিকিৎসায় রাখা হয়। দীর্ঘ দিনের চিকিৎসায় রোগের উপশম হয়, কিন্তু তাঁহার শরীর ভয়ানক দুর্বল ও ক্ষীণ হইয়া আসে। রোগের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার পর দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার অভ্যাসমত স্নানাহার ও ওঠাবসা করিতে চাহেন। গৃহচিকিৎসক তাহাতে সন্ত্রস্ত হইয়া পৌত্র দিনেন্দ্রনাথকে (১৮৮২-১৯৩৫) বলেন যে উঁহাকে এসব বিষয়ে সামলাইতে না

পারিলে পুনর্বার ঐ রোগের আক্রমণ আসিবে এবং শরীরের এই নিদারুণ ক্ষীণ অবস্থায় তাহা মারাত্মক হইবে। কিন্তু বৃদ্ধের শরীরের অবস্থা যতই ক্ষীণ হউক মনের জোর ও জেদ অতি প্রবল ছিল এবং কোনো বিষয়ে বাধা পাইলে তিনি তাহা করিতে বদ্ধপরিকর হইতেন। দিনেন্দ্রনাথের কাছে শুনিয়াছি যে ঠেকাইবার একমাত্র উপায় ছিল তাঁহাকে বলা যে, 'নীলরতনবাবু বারণ করিয়া গিয়াছেন'। তাহাতে কাজটা তৎক্ষণাৎ স্থগিত হইত এবং ডাক্তার সরকার আসিলে তাঁহার সম্মুখে বিষয়টা তোলা হইত। তিনি বুঝিয়া আপোস করিতেন।

একদিন দ্বিজেন্দ্রনাথ হুকুম করিলেন পেলেটির বাড়ি থেকে দুইরঙের আইসক্রীম আনাইতে, কেননা তিনি তাহাই খাইবেন। বাড়ির ডাক্তার বলিলেন, উহা এই অবস্থায় শুধু দুষ্পাচ্য নয়, অতটা শীতল পদার্থ খাইলে আবার ঠাণ্ডা লাগিয়া একটা বিপদ আসিতে পারে। দিনেন্দ্রনাথ প্রমাদ গণিয়া বলিলেন 'নীলরতনবাবু বারণ করেছেন'।

দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথমে অবিশ্বাস করিলেন, কারণ আইসক্রীম সম্পর্কে কোনো কথা 'ডাক্তারবাবুর' সামনে বলার কোনোই কারণ এতাবৎ ঘটে নাই। দিনেন্দ্রনাথ তবুও পুনর্বার বলিতে রফা হইল যে ডাক্তার সরকার প্রত্যহ যেমন দেখিতে আসেন সেই রূপ আসিলে এ কথা তাঁহার কাছে তোলা হইবে। বলা বাহুল্য, ডাক্তার সরকার আসিতেই দিনেন্দ্রনাথ ও গৃহচিকিৎসক প্রথমেই এই কথা তাঁহাকে জানাইলেন।

রোজ যেভাবে পরীক্ষা করা হয় তাহা হইবামাত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ আইসক্রীম খাওয়ার কথা বলিলেন এবং জানাইলেন যে তাহা আনাইয়া দেওয়া অতি আবশ্যক। ডাক্তার সরকার প্রথমে হাসিমুখেই বলিলেন 'ওটায় হয়তো কিছু ক্ষতি করবে, এখন ওটা থাক্ না'।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহাতে জোরের সঙ্গে বলেন, 'ডাক্তারবাবু, আমার এই শরীরটার সঙ্গে আমি ঘর করছি আজ আশি বছর। ওর কখন কোন্‌টা প্রয়োজন, কিসে ওর কতটা লাভ কতটা লোকসান, এ কথা আমার চেয়ে আর কে বেশি বুঝবে? আমি বুঝছি যে ওর এখন ঐ আইসক্রীম নিতান্তই প্রয়োজন, সেই জন্যেই বলছি।'

দিনেন্দ্রনাথের কাছে শুনিয়াছি যে, ডাক্তার সরকার তাঁহাকে বিশদভাবে বুঝাইয়া ফলের স্বাদগন্ধযুক্ত দুইরঙা 'ওয়াটার আইস' অর্থাৎ আইসক্রীম সোডা জাতীয় পানীয় জমানো আইসক্রীম পেলেটির ওখান হইতে আনিতে বলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু কে বা কয়জন ছিলেন জানি না। কিন্তু বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া যাঁহাদের তিনি জানিতেন ডাক্তার নীলরতন সরকার তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। এই সম্পর্কের কারণে ডাক্তার সরকারের সন্তানসন্ততিগণও রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-ভালোবাসা যথেষ্ট পাইয়াছেন। ডাক্তার সরকারের দিক হইতে এই বন্ধুত্ব অসীম প্রীতি ও আত্মীয়তার বন্ধন স্বরূপ ছিল। কবিগুরু অসুস্থ হইলে বা তাঁহার বিদেশযাত্রা ইত্যাদি বিশেষ কাজ উপস্থিত হইলে ডাক্তার সরকার শত ব্যস্ততা ও দায় থাকা সত্ত্বেও সব-কিছু ছাড়িয়া রবীন্দ্রনাথের নিকটে যাইতেন। যে বৎসর (১৯২৪) রবীন্দ্রনাথ প্রথম চীনযাত্রা করেন, ডাক্তার সরকার তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া চীনযাত্রারম্ভের দিনে খিদিরপুর জাহাজঘাটায় যাইয়া তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।

যেবার রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিসর্প রোগে আক্রান্ত হইয়া নিদারুণভাবে পীড়িত হইয়া পড়েন,

সেবার সংবাদ পাইবামাত্র ডাক্তার সরকার সকল কাজ ছাড়িয়া সঙ্গে কয়জন রোগনির্ণয়কারী চিকিৎসক লইয়া বোলপুর রওনা হইয়াছিলেন। সঙ্গে যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বীজাণু ও রক্ত -পরীক্ষায় নিপুণ একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক চিকিৎসক ছিলেন যাঁহার সহিত ডাক্তার সরকারের স্নেহ ও বিশ্বাসের বিশেষ যোগ ছিল। তাঁহার কাছে শুনিয়াছি যে, সকলের জন্য প্রথমশ্রেণীর রেলটিকিট ক্রয় এবং দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান ঔষধ ক্রয়ের জন্য কয়েক শত টাকা ডাক্তার সরকার তাঁহাকে দিয়াছিলেন, যাহাতে টিকিট বা ঔষধ ক্রয়ের টাকার জন্য যাওয়াতে দেরি না হয়।

অনেক অবস্থাপন্ন 'আত্মীয় বন্ধু' সজ্ঞানে ও সুস্থ অবস্থায় নিজের দায় নানা অজুহাতে তাঁহার উপর চাপাইয়া দিতেন। যাঁহারা প্রকৃত বন্ধু বা নিকটের আপনজন তাঁহারা ঐ কপট-বন্ধুদের এইরূপ ছলচাতুরীতে রাগ দেখাইলে তিনি শুধু হাসিয়া বলিতেন, "ও নিয়ে ভেবে কি লাভ?"

তাঁহার অতিথিবাৎসল্য ছিল ভারতবিখ্যাত। বোম্বাই মাদ্রাজ সিংহল হইতে বহুলোক তাঁহার গৃহে দিনের পর দিন, এমনকি মাসের পর মাস, থাকিয়া যাইতেন। বাঙালী বন্ধুর পরিচিত লোক সপরিবারে তাঁহার বাড়িতে থাকিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না এরকমও আমরা জানি, যদিও অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের নিজেদের সহিত ডাক্তার সরকারের মৌখিক পরিচয়ও ছিল না। দূর দেশ হইতে পরিচিত লোকের আত্মীয়-স্বজন রোগমুক্তির আশায় তাঁহার গৃহে আসিয়া বিনাখরচে চিকিৎসা ও আশ্রয় পাইত। দরিদ্র আশ্রিত জনের তো কথাই ছিল না।

প্রসিদ্ধ নগরনির্মাতা পাট্রিক গেডিসের (Sir Patrick Geddes) স্ত্রী লখনউতে টাইফয়েড-রোগে আক্রান্ত হইয়া শেষ অবস্থায় সার নীলরতনের গৃহে আসিয়া মারা গিয়াছিলেন। তাঁহার যন্ত্রণালাঘবের জন্য যাহা কিছু সম্ভব সবই ডাক্তার সরকার করিয়াছিলেন। গেডিস এই যত্নের কথা কখনও ভুলেন নাই, এ কথা তাঁহার পুত্র আর্থার বলিতেন।

তাঁহার ধর্মজ্ঞান প্রখর ও প্রগাঢ় ছিল। তিনি জীবন্ত ধর্মচেতনা বলিতে কি বুঝিতেন তাহা তাঁহার এক All-India Theistic Conference-এর (যাহা আগেকার দিনে নিখিলভারত কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে হইত) সভাপতির ভাষণে পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন—

No form of religion has any life-value today, which fails to yield a living inspiration to social services— more specially the service of the lowly and the overburdened, the afflicted and the downcast, the oppressed and the fallen.

তিনি বলিতেন এইরূপ সেবাব্রত যাহাতে নাই সেরূপ ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাস আত্মবিলাস মাত্র। এই বিশ্বাস ও আত্মনিবেদনই ছিল তাঁহার জীবনবেদ, তাঁহার জীবনসংগ্রামের অস্ত্র।

বিংশ শতাব্দীর কাব্যসূচনা

ভবতোষ দত্ত

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই বাংলা কাব্যের ধারা পূর্ববর্তী শতাব্দীর তুলনায় বেগবতী হয়ে ওঠে। এই সময় থেকেই আরম্ভ হল রবীন্দ্রযুগ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা আমাদের সাহিত্যে যত হয়েছে, রবীন্দ্রযুগের কাব্যপ্রবণতা ও কবি নিয়ে আলোচনা তত হয় নি। রবীন্দ্রনাথকেই একমাত্র আলোচনাযোগ্য প্রধান কবি মনে করেছি : রবীন্দ্রকাব্যের নিকষে যাঁর কাব্য যতটুকু খাঁটি বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাঁকে ততটুকুই উল্লেখ্য মাত্র বিবেচনা করে নিশ্চিন্ত হয়েছি। কিন্তু এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে উনবিংশ শতাব্দীর কবিদের চেয়ে এই শতাব্দীর বৃহৎকবিপ্রতিভার ছায়ায় পুষ্ট কবিদের কাব্যবিষয় ও কাব্যরীতি যথেষ্ট আকর্ষণীয়। এ কথাও স্বীকার করতে বাধা নেই যে এই পথ প্রস্তুত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথেরই দ্বারা। গত শতাব্দীর শেষ দশকেই রবীন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট কাব্যগুলি লিখেছিলেন। এতে যে অভিনবত্ব, শব্দপ্রয়োগনৈপুণ্য নূতন ছন্দের ও স্তবকবন্ধের সৃষ্টিতে যে অপরিসীম নিষ্ঠা প্রকাশ পেল, তার ফলে কল্পনায় ও শব্দপ্রয়োগে অসতর্কতা বিংশ শতাব্দীতে আর ক্ষমার যোগ্য থাকল না। এই জন্যে মনে হয় বাংলা কবিতায় নতুনত্ব আর যে দিক দিয়েই আসুক-না কেন, কাব্যচর্চার এটাই হয়েছে সর্বনিম্ন মান। তার একটা প্রমাণ এই যে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকের শক্তিশালী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিষয়-নির্বাচনে ও অনুপ্রেরণায় হেমচন্দ্রের যুগের কবি হলেও ছন্দনির্মাণে ভাষাসচেতনতায় স্তবকরচনায় রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত শিল্পনিষ্ঠারই অনুগামী। হেমচন্দ্রের যুগের শৈথিল্য তাঁর কাব্যে নেই। এমন কবিও আছেন যাঁরা হেমচন্দ্রের অনুপ্রাণনায় কাব্যসাধনা আরম্ভ করে অবশেষে রবীন্দ্রীয় শিল্পসৌন্দর্যবাদে আত্মসমর্পণ করেছেন। কবি কামিনী রায় এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট। কামিনী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯) হেমচন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে কবির নিজস্ব বিশেষত্ব থাকলেও হেমচন্দ্রের প্রভাবও সুস্পষ্ট। কিন্তু তাঁর শেষ কাব্য 'দীপ ও ধূপ ' (১৯২৯) ও 'জীবনপথে'-তে (১৯৩০) রবীন্দ্রনাথের ছায়াও যথেষ্ট সঞ্চারিত। এই উত্তরণ-কাল সম্পর্কে তাঁর নিজের মন্তব্যও যথেষ্ট অর্থপূর্ণ—

'এখনকার বিচারে তাঁহার [হেমচন্দ্রের] রচনার মধ্যে অনেক ত্রুটি পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু আমরা সেকালে কলাকুশলতা (art) হইতে কবির উচ্ছ্বসিত হৃদয় (heart) দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম।'[১]

কাব্যকে সামাজিক উপলক্ষে বদ্ধ না রেখে আর্ট হিসাবে চর্চা করবার আদর্শ রবীন্দ্রনাথই প্রবর্তন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন মানসী চিত্রা প্রভৃতি কাব্য লিখছিলেন, হেমচন্দ্র তখনও জীবিত এবং তাঁর অনুগামীরও কোনো অভাব ছিল না। বরং বলা যায় রবীন্দ্রনাথের চেয়েও হেমচন্দ্রকে অনুগমনের চিহ্নই তখন সুলভ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর গুরু বিহারীলালের মতই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে ভাবমূলক কবিতা রচনা করছিলেন। অকিঞ্চিৎকর ব্যতিক্রম বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক প্রেরণায় কবিতা বিশেষ লেখেন নি। রবীন্দ্রকাব্যের এই নতুন সৌন্দর্যকে অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল। রোমান্টিকতা-বিরোধী স্পষ্ট ভাবের

---

১ 'কামিনী রায়', সাহিত্যসাধকচরিতমালা

কাব্য ও রোমান্টিক ভাবময় কাব্যের আদর্শ বাংলা কাব্যে কিছুকাল যে দ্বিধার সৃষ্টি করেছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই মোটামুটি তার একটা অবসান হল।

কিন্তু সত্যই অবসান হয় নি। কেননা এই দুই আদর্শের বিরোধিতা রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও যেমন, রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালেও তেমনি অব্যাহত ছিল। বিহারীলাল শিল্পপটু কবি ছিলেন না বটে, কিন্তু ভাবমগ্ন বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদী কবি ছিলেন। এই ধরণের রোমান্টিক কল্পনা সেকালে সমাদৃত না হলেও দু জন প্রধান কবিকে প্রভাবিত করেছিল তাঁরা হচ্ছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং অক্ষয়কুমার বড়াল। সাধারণত আমাদের মধ্যে এই মত প্রচলিত যে, উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে দুটি বিরোধী প্রবৃত্তি আমাদের দেশে জন্ম নিয়েছিল— মহাকাব্যের ও গীতিকাব্যের। কিন্তু বাঙালির স্বভাবগত গীতিপ্রাণতার ফলে প্রথম প্রবৃত্তি স্বল্পকালস্থায়ী একটি যুগ সৃষ্টি করে লুপ্ত হয়ে গেল এবং দ্বিতীয় প্রবৃত্তিই জয়যুক্ত হল। রবীন্দ্রনাথই তার প্রমাণ। কিন্তু এ কথা ভেবে দেখতে হবে মহাকাব্য লুপ্ত হয়েছে সত্য কিন্তু কল্পনারীতির দুই আদর্শ কোনো কালেই লুপ্ত হয় নি। মধুসূদন-হেমচন্দ্রের কাব্যে অশরীরী কল্পনার সূক্ষ্মতা ছিল না, ছিল স্পষ্ট স্পর্শগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়গম্য কাহিনীর বস্তুনিষ্ঠা। বিংশ শতাব্দীতে কাহিনীগত স্পষ্টতার আদর্শের স্থানে এল বাস্তবাশ্রিত স্পষ্ট এবং রোমান্টিকবিরোধী গীতিকল্পনা যার মধ্যে এক ধরণের রবীন্দ্রবিরোধের সুর শোনা গেল। এই নূতন রোমানটিকতাবিরোধীদের প্রথমে আছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, তার পর প্রমথ চৌধুরী ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। মোহিতলাল মজুমদার ঠিক রোমান্টিকতাবিরোধী ছিলেন না, তবে এক অভিনব বাস্তববাদের প্রবর্তক হিসাবে এঁদেরই দলভুক্ত করতে পারি। এঁদের অনুবর্তী হচ্ছে কল্লোলগোষ্ঠী। সকলেই জানেন রবীন্দ্রকাব্যাদর্শের বন্ধন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই ছিল এঁদের বৈশিষ্ট্য।

২

দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—

'আর্যগাথায় যেমন বিশুদ্ধ গীতিমাধুর্যের নিষ্কলঙ্ক প্রকাশ আষাঢ়ে-তে তেমনি প্রকাশ নিদারুণ ব্যঙ্গরসের। একটি ব্যক্তিমনের প্রকাশ অপরটি সামাজিক মনের। অনেক সময়ে এ দুই গুণ একই মানসে থাকে, অনেক সময়ে থাকে না। দ্বিজেন্দ্রলালে এই দুই গুণ যে কেবল প্রচুর পরিমাণে ছিল তাহা নহে, স্বাভাবিক অধিকারে ছিল। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে গীতিমাধুর্য ও ব্যঙ্গরস দুটিই তাঁহার প্রতিভার মৌলিক গুণ।'[২]

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতায় সামাজিক মনের এই বিশিষ্ট রূপ স্যাটায়ারের আকারে দেখা দিয়েছে বটে, 'মন্দ্র'-কাব্যে স্যাটায়ার আলাদা হয়ে আসে নি; সেখানে লিরিক এবং স্যাটায়ার মিশে গিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন কল্পনা-ভঙ্গির সূত্রপাত করেছে। প্রমথনাথ আরও বলেছেন—

'সাহিত্যে লিরিসিজ্‌ম্‌ ও স্যাটায়ারের সার্থক সংমিশ্রণের মত কঠিন কাজ অল্পই আছে। বায়রণের ডন জুয়ান ও হাইনের অনেক রচনা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দ্বিজেন্দ্রলাল এই দুরূহ শিল্পে চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ না করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে বাংলা সাহিত্যের তিনি শ্রেষ্ঠ এবং খুব সম্ভব একক।'[৩]

---

২ বাংলার কবি, পৃ ৭১

৩ বাংলার কবি, পৃ ৭৪

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরবর্তী দু জন কবিকে অনায়াসেই যুক্ত করা যায়। প্রমথ চৌধুরীর কবিতাতে স্যাটায়ার এবং লিরিকের লক্ষণ একই সঙ্গে পাওয়া সম্ভব। সমালোচকমহলে মতদ্বৈধ হতে পারে এই নিয়ে যে, লিরিকের চেয়ে স্যাটায়ারের দিকেই প্রমথ চৌধুরীর কবিতার আকর্ষণ বেশি। তবু এই দিক দিয়ে তাঁর যে স্বাতন্ত্র্য ছিল, রবীন্দ্রনাথের নিকটসান্নিধ্যে থেকেও তিনি তা বিসর্জন দেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর কবিতার উপর মাত্র একান্ত নির্ভর না করে কাব্যবিচার দ্বারাও উভয়ের সহমর্মিতা প্রমাণ করা যায়। বিশেষ করে ভাষা ব্যবহারে উভয়ে সগোত্র। দুজনেরই ভাষা গদ্যাত্মক, সংলাপভঙ্গির অনুগত। প্রমথ চৌধুরীর কবিতা ক্ষুদ্রকায় বলে সংলাপভঙ্গি অত প্রকট নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্র'-কাব্যের দীর্ঘ কবিতায় তা খুবই স্পষ্ট। শব্দের ব্যবহারে দুজনেই নিরঙ্কুশ। এ বিষয়ে পূর্বতন কবিতার সংস্কার দ্বারা তাঁরা কেউ নিয়ন্ত্রিত নন। নিরঙ্কুশ গদ্যাত্মক শব্দ প্রয়োগ অবশ্যই শৈথিল্যজনিত নয়। উনবিংশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে শব্দ সম্পর্কে সচেতন ভাবনার যে অভাব দেখা যায়, এঁদের মধ্যে তা নেই। এ কথা বলা যায় যে সজ্ঞানেই তাঁরা এই বিশেষ ধরণের শব্দ ব্যবহার করে গিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকেও এ দিক দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের অনুবর্তী বলে ধরে নিতে পারি। লিরিক ও স্যাটায়ারের মিশ্রণ-প্রয়াস তাঁর মধ্যেও লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রাদর্শের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ সচেতন। বিশেষত তাঁর কবিতার তর্কভঙ্গি মৌখিক চলিত শব্দ ব্যবহার ও সংলাপরীতি দ্বিজেন্দ্রলালেরই পরবর্তী স্তর মাত্র। ছন্দের দিক দিয়ে এঁদের নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল দলমাত্রিকের সঙ্গে বিশিষ্ট কলামাত্রিকের গাম্ভীর্য মিশিয়ে এক নতুন 'স্বাভাবিক ছন্দ'ই[৪] উদ্‌ভাবন করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী বিদেশী স্তবকবন্ধ ব্যবহার করলেও নিয়েছিলেন বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতিকে। যতীন্দ্রনাথ কাজে লাগিয়েছিলেন ছয়মাত্রার সরল কলামাত্রিক রীতিকে। এই ছন্দটির প্রবর্তন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তত্ত্বগতভাবে বলতে গেলে যতীন্দ্রনাথের ছন্দব্যবহার ছিল আপাতবিভ্রান্তিকর (paradoxical)। এর সুপরিমিত ধ্বনিপর্বভাগ বরং লিরিকের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। ব্যঙ্গরসপ্রধান কাব্যে এই ছন্দটি কিভাবে সুপ্রযোজ্য হয়েছে, তা বিশেষ পর্যালোচনার বিষয়। যতীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন—

'যতীন্দ্রনাথের কাছে কি পেয়েছিলাম আমরা? পেয়েছিলাম এই আশ্বাস যে আবেগের রুদ্ধশ্বাস জগৎ থেকে সাংসারিক সমতল ক্ষেত্রে এলেও কবিতা বেঁচে থাকতে পারে। পেয়েছিলাম একটি উদাহরণ যে পরিশীলিত ভাষা ও সুবিন্যস্ত ছন্দের বাইরে চলে এলেও কবিতার জাত যায় না। 'মরীচিকা'য় তিনি যে তিনমাত্রার ছন্দকে অনেকটা গদ্যের ভঙ্গিতে বন্ধুরভাবে ব্যবহার করেছিলেন, সে ছন্দেরই একটা নির্দিষ্ট সুপরিমিত প্রকরণ নিয়ে গড়ে উঠলো অচিন্ত্যকুমারেব অমাবস্যার কবিতাবলী।

'আরো কিছু পেয়েছিলাম। প্রথমত প্রবন্ধধর্মী যুক্তিতর্কের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ এক-একটি আলোজ্বলা রেশতোলা পংক্তি ('রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন্ বারাঙ্গনা') বিরল বলেই তাদের চমৎকারিত্ব যেন বেশি। দ্বিতীয়, একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। ভিন্ন মানে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন থেকে ভিন্ন।'

যতীন্দ্রনাথের কাব্যের 'সাংসারিক সমতল' 'প্রবন্ধধর্মী যুক্তিতর্ক' এবং 'ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি'—এ সব কিছুরই

---

৪ এই শব্দটি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন। দ্র ছন্দ (১৯৬২)

সূচনা ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে। কিন্তু সত্যই দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রবণতাকে যুক্ত করে কেউ দেখেন নি। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার মধ্যে যতীন্দ্রনাথের পূর্বাভাস লক্ষ করেছেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যেই যে তার সূত্রপাত ছিল, এ কথাটা শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্রের একটি ত্বরিত উক্তি ছাড়া আর কোথাও দেখি নি।[৫] বস্তুত কথাটা বিশদ পর্যালোচনার যোগ্য এবং প্রতিষ্ঠিতব্য। বুদ্ধদেব বসুর মতে বাংলা কবিতায় যতীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে 'রূপের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে নয়'। কারণ যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ একটি অন্যনিরপেক্ষ সত্যবোধ— সে বোধ স্থির অপরিবর্তনীয়। তার থেকে গতিশীল চিন্তার সূত্রপাত হতে পারে না। কথাটা প্রকারান্তরে শশিভূষণ দাশগুপ্তও স্বীকার করেছেন। যতীন্দ্রনাথের প্রথম সুপরিচিত কাব্যগুলিতে, 'মরীচিকা' 'মরুশিখা' এবং 'মরুমায়া'য় এক কথাই ঘুরে ফিরে এসেছে বিভিন্ন বিষয়ের উপলক্ষে। এই নির্বিশেষ অপরিবর্তনীয় সত্য ভাবনার ফলে তাঁর কাব্য একরকম নির্বেদকেই প্রশ্রয় দেয়। 'সায়ম্' থেকে কবিমনের যে পরিবর্তনের লক্ষণ পাওয়া যায় তা পরের কাব্যে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতে এই পরিবর্তন অপ্রত্যাশিত কিছু নয়; এমনকি এর কারণও প্রথম দিকের কাব্যে নিহিত ছিল। তবে এ কথাও সত্য যে যতীন্দ্রনাথের কাব্যের সুরের পরিবর্তন নেহাতই তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাংলা কাব্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এর কোনো প্রভাব নেই। কিন্তু তাঁর কাব্যের সংশয় ও অবিশ্বাসের প্রবৃত্তি? আধুনিকতর বাংলা কাব্যের সেটা একটা বড় বৈশিষ্ট্য।

যতীন্দ্রনাথের কাব্যের এই সংশয় ও অবিশ্বাস একটা স্বয়ম্ভূ কিংবা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপলব্ধি রূপে আসে নি। অনেকটা পূর্বযুগের নিশ্চিন্ত বিশ্বাসপ্রবণতার প্রতিক্রিয়ায় উৎপন্ন। তার প্রমাণ তাঁর কবিতার বিশেষ প্রতিবাদপ্রবণ তির্যক্ ভঙ্গি। তিনি প্রধানত প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রতিবাদই করেছেন। কোনো স্থির আদর্শ (সে আদর্শ নতুন হলেও) তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন নি কিংবা করতে চান নি। এদিক দিয়ে তাঁর কবিতার কোনো তত্ত্ব কিংবা বাণী নেই। পরের যুগকে প্রভাবিত করতে হলে একটি ভাবগত আদর্শ বা বাণী চাই যা অনুবর্তীদের কল্পনা ও চিন্তাকে রূপান্তরণে ও গঠনে সাহায্য করতে পারে। যতীন্দ্রনাথ যে সময়ের কবি, সেই সময়ে আর-একজন কবি পরবর্তীদের উপর প্রভূত প্রভাব রেখে গিয়েছিলেন। তিনি মোহিতলাল মজুমদার।

মোহিতলাল এবং যতীন্দ্রনাথ একই পর্যায়ের কবি। এই পর্যায়ই 'কল্লোল' প্রভৃতির আধুনিক কাব্যান্দোলনের পূর্বসূরী। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের প্রভাব যেমন রূপের দিক থেকে এবং সংশয়-অবিশ্বাসের প্রবৃত্তি-সৃষ্টিতে, মোহিতলালের প্রভাব তেমনি জীবনধ্যানে, বাস্তব-প্রতিষ্ঠিত সৌন্দর্যসাধনায় অর্থাৎ প্রকৃতিপন্থায় নবমানবতাবাদে— রূপের দিক থেকে ততটা নয়। মোহিতলালের কাব্যের ভাষা ও ছন্দ ধ্রুপদী চালের গাম্ভীর্যে পূর্ণ। এর পিছনে আছে যথেষ্ট নিষ্ঠা ও সতর্ক উপস্থাপনা। এই কাব্যরূপ সম্ভ্রম ও বিস্ময় উৎপাদন করলেও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তাকে সঙ্গী করা কঠিন। যতীন্দ্রনাথের ভাষার আটপৌরে ভঙ্গি সেজন্যই সহজব্যবহার্য। এই ভাষায় রচিত উজ্জ্বল শাণিত বচনগুলি সহজেই মুখে মুখে চলে যায়। পরবর্তী কালে কবিতাকে লোকজীবনের বাস্তবক্ষেত্রে নামিয়ে নিয়ে আসবার যে চেষ্টা হয়েছে যতীন্দ্রনাথের কাব্যভাষা

---

৫ কবিতার বিচিত্র কথা (১৯৫৭), পৃ ১৯৫

তার একটা পথনির্দেশ দিয়েছিল। মোহিতলালের কাব্যকলা সেদিক থেকে তেমন অনুসৃত হয় নি। আধুনিক বাংলা কাব্যের একটা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা এই যে নবীন কবিরা কোনো একজনের মধ্যে পূর্ণ আদর্শের সন্ধান পান নি। তাঁরা মোহিতলালের থেকে পেয়েছিলেন বাণী— প্রেতপুরী নাগার্জুন কালাপাহাড় রুদ্রবোধন পান্থ বুদ্ধ প্রভৃতি কবিতায়, আর যতীন্দ্রনাথ থেকে পেয়েছিলেন ভাষা ভঙ্গি ও রূপরীতি। মোহিতলালের দেহকৌতূহল এবং বাস্তব-সৌন্দর্যবাদ নবীন কবিগোষ্ঠীর পুরোধা বুদ্ধদেব বসু এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার কিছু আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত হরনাথ পাল।

মোহিতলাল আধুনিক বাংলা কাব্যের নূতন ধারার অন্যতম প্রবর্তক রূপে গণ্য হলেও রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার ও বরণ করেই কাব্যচর্চা করেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে প্রধানত স্বীকার করেছিলেন কবিতাকে শিল্পসুষমামণ্ডিত করার আগ্রহে। তাঁর প্রথম দিকের কবিতার ভাবে এবং ভাষাতেও সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবই বরং স্পষ্টতর। স্বপনপসারী নিশ্চিন্ত রূপোল্লাস পরের কাব্যে ধীর-গম্ভীর হয়ে বাণীরূপ গ্রহণ করেছে। মোহিতলালের প্রসঙ্গে তাঁর যেমন কাব্যকলাপরীক্ষার একটা নিজস্ব প্রয়োজনীয়তা আছে তেমনি তাঁর ভাবকল্পনার আলোচনার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা আছে। মোহিতলালের শেষের কাব্যে— 'হেমন্তগোধূলি'তে— উদ্ধত বিদ্রোহিতা অনেকটাই শান্ত হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যতীন্দ্রনাথের মতোই এও তাঁর কবিশক্তির ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণ। অবশ্য ভাবের পরিবর্তনকেই কবিশক্তির ক্ষয়িষ্ণুতা বলে না। তবু এই পরিবর্তন অধ্যাত্মবিশ্বাসের অভিমুখী বলে মোহিতলালের সেই যোদ্ধরূপ এর মধ্যে পাই না।

মোহিতলাল বাংলা কাব্যে যে নতুন আদর্শ নিয়ে এসেছিলেন, পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তার 'আধুনিকতা' ছিল 'চিরকালের আধুনিকতা'। বাস্তবকে স্বীকার করার বলিষ্ঠ সাহসের সঙ্গে মানুষের নিত্যকালীন আকাজ্ক্ষা ও প্রেমের হাহাকার ধ্বনিত করেছিলেন তিনি। মানবাত্মার এই তৃপ্তিহীন পিপাসার কাব্যই মোহিতলাল রচনা করেছিলেন। যতীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের কেন্দ্রীয় ভাব যেমন দুঃখবোধ, মোহিতলালের জীবনদর্শনের কেন্দ্রীয় ভাবটি তেমনি কামনা। কামনার একটা স্থূল রূপ আছে, আবার তার একটা মহিমময় ব্যর্থতা ও সাফল্যের রূপও আছে। জীবনের প্রতি অনুরাগের আর একটি রূপ ফুটেছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। বস্তুতঃ কবিরা কবি হন এই জীবনেরই প্রেমে। মোহিতলালের কাব্যেও প্রকৃতি মানুষ ও জীবনের প্রতি অপরিসীম মমতার রসসৃষ্টি হয়েছে। জীবনের এই নিত্যসৌন্দর্যবস্তুর শিল্পরচনার সাফল্যের দিকটিই হরনাথ পাল মোহিতলালের প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন। মোহিতলালের এই কাব্য বিশুদ্ধ অরূপের সাধনা নয় বলেই পরবর্তী কাব্যের আদর্শ এর থেকে পুষ্টি লাভ করেছিল। কিন্তু রূপ ও দেহজীবনের প্রতি আগ্রহ তাঁর যতই থাক্ রূপের মধ্যে অরূপের পিপাসাই তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছে বিশ্বাসের ধ্রুবলোকে, যেখানে নীড় বাধে না আধুনিকের দল।

বস্তুত লক্ষ করলে দেখা যায়, মোহিতলাল বা যতীন্দ্রনাথ কারও কাব্যের মূলেই কোনো যুগোচিত বা অন্য কোনো সাময়িক কারণ কিছু ছিল না, যার থেকে এই শ্রেণীর কাব্যের উদ্ভব হতে পারত। নজরুল ইসলামের কাব্যরচনার মূলে যেমন সাময়িক প্রবর্তনা ছিল, এঁদের কাব্যে সে রকম কিছুর সন্ধান মেলে না। এঁরা জীবন সম্পর্কে গভীরতর চিন্তা করেছেন। তাঁদের সেই গভীর অন্বেষণই বিচিত্র কাব্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। এই

অন্বেষণ যতই গভীর হয়েছে ততই তাঁরা হয়েছেন উদ্‌ভ্রান্ত। একজন ব্যর্থ সন্ধানে নিরস্ত হয়ে বললেন—

একমাত্র সত্য এ যে! ধরণীর এই দ্বীপ মিথ্যাপারাবারে
মুক্তিতীর্থ মৃত্যুকারাগারে।

আর যতীন্দ্রনাথ জীবনটাকে অর্থহীন প্রলাপ ('a tale told by an idiot') বলে বিস্মরণের শান্তি খুঁজেছেন, শেক্সপীয়র যেমন বলেছিলেন—

Canst thou not minister to a mind diseased
Pluck from the memory a rooted sorrow,
Raze out the written troubles of the brain
And with some sweet oblivious antidote
Cleanse the stuffed bosom of that perilous stuff
Which weighs upon the heart?

শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিগুলিতে জীবনের যে দুঃখের রূপ ফুটে উঠেছে, তারই লিরিক রূপ প্রকাশ পেয়েছে এই দুই কবির কাব্যে। শেক্সপীয়রের ক্লান্ত নায়করা প্রার্থনা করেছে ক্লান্তিহর ঘুম যা জীবনের দুঃখদহনকে ভুলিয়ে দেয়—

To die, to sleep,
To sleep: perchance to dream.

যতীন্দ্রনাথের কাব্যের নিদ্রাবাচক শব্দগুলি বারবার সেই বেঁচে থাকার অপরিসীম ক্লান্তিকেই ফুটিয়ে তুলেছে। এই তুলনার দ্বারা বুঝতে পারা যায় এঁদের কাব্য সাময়িক উপলক্ষকে কিভাবে অতিক্রম করে গিয়েছে। নজরুলের কাব্যের এই বৈশিষ্ট্য নেই।

এ বিষয়ে নজরুল নিজেই যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। দেশের এবং জাতির দুর্দিনে 'চিত্তসাগর মথন-করা চিন্তামণিমুক্তা' আহরণ করতে তিনি আগ্রহ দেখান নি। নজরুল ইসলামকে এই দুইজনের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁর আবির্ভাবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নির্ণয় করা হয় সত্য, কিন্তু মোহিতলাল যতীন্দ্রনাথ যেমন চেয়েছেন তিনি জীবনের রহস্যকে তেমন বুঝতে চান নি। নজরুলের মন একটি যুগের মন। প্রথম মহাযুদ্ধ, রাজনৈতিক আন্দোলন, জনজাগরণ প্রভৃতি সাময়িক সামাজিক উত্তেজনার সঙ্গে তাঁর কাব্য জন্মসূত্রে দৃঢ়বদ্ধ। কথাটা নজরুলের প্রতি কটাক্ষ অথবা প্রশস্তি উভয় অর্থে নেওয়া যেতে পারে। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার গুপ্ত বলছেন—

'তাঁর ব্যক্তিগত ব্যথাবদনার জন্যেই শুধু নয়, স্বজাতি ও স্বদেশের অপমান অত্যাচার বেদনা ও লাঞ্ছনা-জনিত দুঃখের কারণেও কবি বড় কিছু চিন্তা করবার অবকাশ পান নি। দুঃখবেদনার প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাই নজরুলকে সত্যেন্দ্রনাথ যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল থেকে পৃথক একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছে। উক্ত তিনজন কবির মত বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রজ্ঞা ও মননশীলতার অধিকারী না হয়েও নজরুল তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত সর্বানুভূতির জোরেই বাংলা সাহিত্যে একটি অনন্যসাধারণ আসন লাভ করেছেন।'[৬]

---

৬ নজরুলচরিতমানস, পৃ ৩১১

বিবিধ কারণে, এটাই বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হয়ে রয়েছে। নজরুলের জীবনী-পাঠক এবং কাব্যপাঠক উভয়েই জানেন আবেগপ্রবণতাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। আবেগের সঙ্গে যতটুকু সতর্ক অনুশীলন শিল্পসার্থকতার পক্ষে অত্যাবশ্যক, দুর্ভাগ্যক্রমে ততখানি সতর্কতা তাঁর ছিল না; বরং তিনি এই সতর্কতাকে প্রকারান্তরে উপহাসই করে গিয়েছেন। এজন্য মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে কবি সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যভাষায় ছন্দ ও শব্দভাবনায় যে ক্লাসিক রীতির প্রতিষ্ঠার আয়োজন ও উদ্যম করে-ছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর পর যা সত্যই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল সেই উদ্যম স্বল্পকালস্থায়ী একটা পর্যায় সৃষ্টি করে নিঃশেষ হয়ে গেল। নজরুলের আকস্মিক উদ্দামতা শিল্পের নিষ্ঠা সংযম ও গভীরতাকে পর্যুদস্ত করে যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলালের কাব্যকেও জনরুচিতে ম্লান করে দিয়েছিল।

নজরুলের কাব্যসমালোচকই এ কথা বলেছেন যে—

'বস্তুত আবেগপ্রাবল্যই বিদ্রোহ বিক্ষোভ ইত্যাদি সম্বন্ধীয় কবিতাকে সহজেই আবেদনপূর্ণ করে তুলতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে আবেগজনিত হৈচৈটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রজ্ঞার দ্বারা এই আবেগ যথাযথভাবে চালিত না হওয়ায় পরবর্তীকালে নজরুলের আবেগপ্রধান কবিতায় একঘেয়েমি দেখা দিয়েছে এবং তাতে পরিপক্কতার কোনো রঙ্ ধরে নি। প্রেম-বা প্রকৃতিসম্পর্কিত কবিতাবলীতে নজরুলের হৈচৈ ও চড়া গলার সুর খুবই কম। এখানে কবি আশ্চর্যভাবে রসনিমগ্ন। এইসব কবিতায় উদ্দীপনার পাশাপাশি একটি গ্রাম্যপ্রশান্তি লক্ষ্য করা যায়।'[৭]

অনেকেই মনে করেন এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাতেই নজরুলের সত্যকার সাফল্য ঘটেছে। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে গভীরতা ও সাময়িকতা দুয়েরই আকর্ষণ ছিল। এতে তাঁর অনেক বড় কবিতারই রস বিচলিত হয়েছে। সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতাটিই একটি দৃষ্টান্ত। মোহিতলালের গদ্যকথিকা 'আমি' (মানসী ১৩২১ পৌষ) নজরুলকে প্রেরণা দিয়েছিল, এটা স্বাভাবিক কিন্তু মোহিতলাল-কল্পিত মৃত্যুহীন প্রাণের বিদ্রোহ-মহিমা নজরুলের কবিতায় দেশ এবং কালের সাময়িক বিদ্রোহিতায় পরিণত হয়ে দ্বিধা ঘটিয়েছে তাও লক্ষ না করে পারা যায় না।

৩

কিন্তু বাংলা কাব্যে রোমান্টিক ভাবের আদর্শ রবীন্দ্রনাথে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করল সেই বিস্ময় বাংলার কবিকে কিছুদিন পর্যন্ত চকিত করেছে এ কথাও সত্য। এই শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা সার্থক অনুসরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সতীশচন্দ্র রায় এবং প্রিয়ম্বদা দেবী বিশেষ স্মরণীয়। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এঁরা রবীন্দ্রানুগামী বলে বর্ণিত হলেও বিশুদ্ধ রসের বিচারে এঁদের স্বাতন্ত্র্য অবশ্যস্বীকার্য। এঁদের অকৃত্রিম হৃদয়াবেগ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-স্টাইলকে নিজের নিজের প্রয়োজনে প্রযুক্ত করেছে। সতীশচন্দ্রের মধ্যে রবীন্দ্রকাব্যের শব্দচয়নবৈশিষ্ট্যই যে অক্ষুণ্ণ ছিল তা নয়, রবীন্দ্রমানসের 'অশরীরী আনন্দে'র স্পর্শও তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল। প্রিয়ম্বদা দেবী আয়ত্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সংহত পরিমিত ক্ষুদ্রকায় কাব্যরূপ। রবীন্দ্রনাথের মতই তাঁর কাব্যে এসেছিল অর্থগভীরতা। ব্যাপ্তি নয়, গভীরতাই তাঁর কবিতার গুণ।

---

৭ নজরুলচরিতমানস, পৃ ৩৩১

এই দুই কবির এই দুই বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রপ্রভাবের ফল। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য বিহারীলাল-প্রবর্তিত সৌন্দর্যবাদের ফল। সেকালের দিনে এই রোমান্টিক সৌন্দর্যবাদকেই কাব্যরচনার উপজীব্য করেছিলেন অক্ষয়কুমার বড়ালের মত কবি। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও এই আদর্শের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী। তাঁদের কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রপরবর্তী তদনুগামী কবিদের সাদৃশ্য কোথায়? সে যুগ প্রধানত হেমচন্দ্রের যুগ। বস্তুগ্রাহ্য পরিমিত স্পর্শক্ষম কল্পনার জগৎ ছিল সেকালের ভাবজগৎ। সেকালের সৌন্দর্যবোধও ছিল এমনি বস্তুগ্রাহ্য ও স্পষ্ট। বিহারীলালের সারদামঙ্গলেও তাই ক্ষীণ হলেও একটি কাহিনীর কাঠামো না থেকে পারে নি; দ্বিজেন্দ্রনাথ তো রূপক সৃষ্টি করে নির্বিশেষকেই সবিশেষ করতে চেয়েছেন। অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যেও আমাদের বাঙালি জীবনের সুপরিচিত পরিবেশের স্পষ্টতা অক্ষুণ্ণ। তাঁদের কাব্যভাষা, অনেক সময়েই মনে হয়, যেন লিরিকের ভাষা নয়। সেকালের কাহিনীকাব্যের ভাষাকেই কবিরা লিরিকে ব্যবহার করেছেন মাত্র। গীতিকবিতার ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যখন শব্দকে পরিমিত অর্থের গুরুভার থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে ব্যঞ্জনা ও সুরের ঐশ্বর্যে সম্পন্ন করলেন, বাংলা গীতিকাব্য তখন সত্যই আপন ভাষা খুঁজে পেয়েছিল; এই বিশিষ্ট ভাষা বা স্টাইলকেই রবীন্দ্রানুগামী কবিরা ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রকাব্যভাষার সংগীতধর্মকে পরের যুগে বিশেষ ভাবে চর্চা করেছেন চার জন— যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক এবং শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়।[৮] এঁরা সবাই বিশ্বাস ও আশ্বাসের কবি। জীবনের রুদ্র জিজ্ঞাসার রূপ এঁদের কাব্যে নেই। এমনকি কেউ কেউ মধ্যযুগের বাংলা কাব্যসংস্কারের সঙ্গে এঁদের যুক্ত করে বিচার করেছেন। মধ্যযুগোত্তর বাংলা কাব্যসাহিত্যের নানা আদর্শের উদয়-বিলয়ের সঙ্গে এঁদের যেন কোনো যোগই ঘটে নি। প্রকারান্তরে এটাই মেনে নিতে হয় যে রবীন্দ্রনাথের মত অত বড় সৌন্দর্যবাদী কবির কাব্যেও চলচ্চিত্ততার যে লক্ষণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তাঁর অনুগামীদের মধ্যে তা নেই। বাংলার প্রকৃতিতেই যে এঁরা শুধু নির্ভর করেছেন তা নয়, বাংলার যে সংস্কৃতির একটা নিজস্ব সাধনা ও সিদ্ধি ছিল এঁরা তারই দ্বারা সমাচ্ছন্ন। কুমুদরঞ্জনের সম্বন্ধে বিশী মহাশয় যখন বলেন যে, তাঁর মধ্যেই 'রবীন্দ্রপ্রভাব ন্যূনতম' তখন কথাটা আমাদের কাছে বিস্ময়কর ঠেকলেও কথাটা একদিক দিয়ে ঠিক। 'রবীন্দ্রপ্রভাব' শব্দটা আমরা বিশেষ এক অর্থেই গ্রহণ করে থাকি। আধুনিক রবীন্দ্রবিরোধী আদর্শের প্রসঙ্গেই এই শব্দটার বিশেষ প্রয়োগ করে থাকি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বৈচিত্র্য ও বিস্তার নির্বিশেষ সৌন্দর্য -সাধনার সূত্রে দেশ ও কালকে অতিক্রম করে গিয়েছে, কুমুদরঞ্জনের মত কবিরা সেই কাব্যপ্রকৃতির দ্বারা ততখানি প্রভাবিত না হয়ে নাগরিক পাঠকের কাছে প্রায় বিগত বাংলার পল্লীজীবনের সৌন্দর্যে স্বেচ্ছালগ্ন হয়ে থাকলেন।

বাংলা কাব্যের এই দুই আদর্শ একবার সমন্বিত হবার চেষ্টা করেছিল কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে। এর একটা প্রমাণ এই যে রোমান্টিক এবং রোমান্টিকতাবিরোধী দুই আদর্শের কবিই প্রথম যুগে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে ঋণ গ্রহণ করেছেন; ইতিহাসের দিক দিয়েও সত্যেন্দ্রনাথকেই উভয়ের পূর্বসূরী বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। মোহিতলাল নজরুল এবং যতীন্দ্রনাথকেও যেমন সত্যেন্দ্র-প্রভাব স্বীকার

---

৮ প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য বা রমণীমোহন ঘোষ প্রভৃতি কবিরা বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য নন।

করতে দেখি করুণানিধান কালিদাস রায় প্রভৃতিকেও তেমনি সত্যেন্দ্রনাথের ভাষা ও ভাবরীতির অনুসরণ করতে দেখি। দুই প্রকৃতির কবিই সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে নিজের নিজের আদর্শের সন্ধান পেয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তথ্যনিষ্ঠ প্রত্যক্ষতার কবি বলেই সাধারণত পরিচিত কিন্তু তিনি নিজে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে না পারলেও দ্বিজেন্দ্রলালের মত অশরীরী কল্পনারীতির বিরোধী ছিলেন না। তার প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ ছিল এবং তাঁর কবিতায় সেই সূক্ষ্মতা সৃষ্টির প্রয়াস বিরল নয়। এটি লক্ষ করেছেন শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্র—

'মননাতিরেক ও হৃদয়বিরলতা সাধারণভাবে সত্যেন্দ্র-কাব্যের এই দুই প্রধান লক্ষণের কথা মেনে নিয়ে সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬) থেকে শুরু করে তাঁর শেষ পর্বের রচনা অবধি সমান্তরাল এই দুটি প্রবণতারই প্রকাশ ঘটেছিল। রবীন্দ্রকাব্যের অন্তর্মুখিতার প্রভাব তিনি সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। আবার বস্তুবর্ণননিষ্ঠ শব্দ ছন্দ অলংকার কারুকৃৎ নিজস্ব সত্তার বহির্মুখিতাও তিনি পরিহার করতে পারেন নি। 'ফুলের ফসলে' ও 'কুহু ও কেকা'তে এবং পরবর্তী অন্যান্য গ্রন্থেও এই দুই ধারার সমান্তরলতা স্পষ্ট।'[৯]

রবীন্দ্ররীতির প্রতি এই শ্রদ্ধার ফলে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কবিতা অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির গভীরতার অভাবে খেয়ালি কল্পনার লীলাবিলাসে পর্যবসিত। তবে প্রকৃতিবর্ণনায় তাঁর বিশিষ্টতা স্বীকার করতেই হবে। ফুলের ফসলের কবিতায় তাঁর সাফল্য সমালোচকরা স্বীকার করেছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ বস্তুনিষ্ঠার ফলে তাঁর প্রকৃতি হয়েছে চিত্রার্পিত। রবীন্দ্রমানসে প্রকৃতি যেমন রূপ ও রেখাকে অতিক্রম করে ভাবের প্রতীকে পরিণত হয়ে যায়, সত্যেন্দ্রনাথে তেমন অতিক্রমণের দৃষ্টান্ত নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর পক্ষে যতদূর সম্ভব এসব কবিতায় তিনি মেনে নিয়েছেন। প্রাকৃতিক বস্তুকে তিনি ভাবের রূপক-এ পরিণত করতে পারতেন না বটে তবু রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি প্রয়োজন-নিরপেক্ষভাবে প্রকৃতি ও মানবমনের পারস্পরিক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। শ্রীমতী সনজীদা খাতুন সত্যেন্দ্রকাব্যের বিষয়-বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদা করে আলোচনা করেও তাঁর উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তৎসত্ত্বেও শ্রীমতী সনজীদা যখন বলেন—

'সত্যেন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন তখন পর্যন্ত বাংলা কাব্যে প্রধানত অবাস্তব কল্পনার চর্চা চলছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে ঐ সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ ঘটে যাওয়ায় ঐ পথে আর কোনো নতুন সম্ভাবনা ছিল না। এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো কোনো রচনায় কাব্যের নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল। এ পথে সাহিত্যে বাস্তবতার অবতারণা হচ্ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের সাধনা এই পথটিকে পাকা করে দিল।'[১০]

তখন এই শেষের কথাটিও স্ববিরোধী না হয়ে প্রণিধেয় হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বসূরিত্ব আলোচনা করেছি। সত্যেন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে সেই বিষয়ই যদি আবার উত্থাপনের প্রয়োজন হয়, তবে বুঝতে হবে সত্যেন্দ্রনাথেও সেই আদর্শই দেখা দিয়েছিল পরবর্তী কালেও যতীন্দ্রনাথকে

৯ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ (২য় সং), পৃ ১৩৯

১০ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ ১৯৯

যা উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। তবে এ বিষয়ে শুধু মাত্র দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথকে যুক্ত না দেখে উনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিকতাবিরোধী হেমচন্দ্রীয় ধারার সঙ্গেই তাঁকে যুক্ত করে দেখাই সংগত। এ বিষয়ে মোহিতলাল যা বলেছিলেন তা খুবই অর্থপূর্ণ—

'আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দী যে নবজাগরণ আনিয়াছিল—বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবি ও মনীষী তাহার যে মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন তাহারই সাধনক্ষেত্রের এক প্রান্তে সত্যেন্দ্রনাথের কবিচিত্ত কর্ষিত হইয়াছিল, তিনিও সেই নব্যসংস্কৃতির পতাকা বহন করিয়াছিলেন।'[১১]

নিভৃত বাণীসাধনা নয়, জাগ্রত জনসমাজের মধ্যে থেকে নিত্য নতুনের অগ্রগতির সঙ্গে জয়ধ্বনি যুক্ত করে একটা যুগের প্রতিনিধিত্ব যেমন সেকালে করেছিলেন হেমচন্দ্র তেমনি একালে করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথের ধীশক্তি ও গ্রহণক্ষমতা অধিকতর পরিণত ছিল বলে এ বিষয়ে হেমচন্দ্রের চেয়েও তাঁর কাব্যবৈচিত্র্য ছিল অনেক বেশি এবং মার্জিত। সেকালের সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের মতোই তিনি যে বুদ্ধিবাদী তথ্যপ্রিয় সেই সঙ্গে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত নব ভাব-প্রবুদ্ধ কবি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর কবিদের মতই জীবনের শুভ পরিণামে ও মানবকল্যাণে তাঁর বিশ্বাস ছিল অটল। এ যুগের সংশয় অবিশ্বাস বা ব্যঙ্গপরায়ণতা তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করে নি। এই বিশ্বাস এবং শুভবোধের সঙ্গে এই শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলন, শূদ্রগরিমার নবঅভ্যুত্থান এবং বিশ্বতোমুখী জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনের আনন্দ সহজেই মিলিত হতে পেরেছিল। তাই নজরুলের মত আধুনিকমনা কবিদের পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ থেকে ভাবের প্রেরণা সংগ্রহ করা সহজ হয়েছিল।

সত্যেন্দ্রনাথের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সবচেয়ে ফলপ্রসূ হয়েছে কাব্যের শিল্পচেতনার ক্ষেত্রে। উনবিংশ শতাব্দীর কবিদের চিত্তপ্রবণতার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের মিল যতই থাক, সত্যেন্দ্রকাব্যের ভাষা ও ছন্দপরিপাট্যের সঙ্গে মধুসূদনকে বাদ দিলে আর কোনো কবির তুলনা হয় না। সত্যেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে আদর্শ অবশ্যই পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। ভাষাগত শুচিতা, ছন্দগত কৌতূহল, পরীক্ষা ও সাদৃশ্য রবীন্দ্রসাহিত্যে চিরকালের বিস্ময়। রবীন্দ্রপ্রবর্তিত শিল্পাদর্শের পর বাংলাসাহিত্যে শৈথিল্য একেবারেই সহ্য করা হয় না। শিল্পনিষ্ঠায় সত্যেন্দ্রনাথ কখনও কখনও আতিশয্য দেখিয়েছেন, এ কথা সত্য। শব্দ ও ছন্দের অতিরিক্ত অনুশীলনে কাব্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এ বিষয়ে সমালোচকমহলেও দ্বৈমত্য নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আরও কিছু বলবার থাকে। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এক শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কিছুমাত্র বিনয় না করেও বলা যায় ভাষা ও ছন্দের উপর সত্যেন্দ্রনাথের দখল ছিল তাঁর চাইতে বেশি।— দ্রষ্টব্য সনজীদা খাতুনের গ্রন্থ, পৃ ১৮৯। তুলনার মধ্যে না গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি যে সত্য, একটু ভাবলেই বোঝা যায়। যেসব দুরূহ কিংবা অল্পপ্রচলিত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছিলেন, সেগুলিতে তাঁর পুঁথিগত ভাষার উপরে বিস্ময়জনক অধিকার প্রমাণিত করে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্রর বিস্তৃত আলোচনায় সত্যেন্দ্রনাথের যুগে বাংলা ভাষা ও শব্দসম্পর্কিত অনুসন্ধান ও গবেষণার ব্যাপকতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। সত্যেন্দ্রনাথের শব্দচেতনাকে এরই সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে দেখা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

---

১১ অধুনিক বাংলা সাহিত্য, 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত'

এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে লোকপ্রচলিত খাঁটি বাংলা ভাষারীতিকে কাব্যে অক্ষয় প্রতিষ্ঠা দেওয়া। এই ব্যাপারে তিনি কবিদের মধ্যে নিশ্চয়ই সর্বপুরোবর্তী। রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি অন্ততঃ এই বিষয়ে যথার্থ। বাংলা কবিতায় ফার্সী শব্দকেও তিনিই স্বাভাবিক করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনিই বাঙালি কবিদের সচেতন করে দিয়েছিলেন ফার্সী শব্দকে রোমান্‌টিক কাব্যকল্পনায় ব্যবহার করতে। আধুনিক কাব্য যখন প্রাত্যহিকতার পথে নেমে আসছে, সত্যেন্দ্র-প্রবর্তিত ভাষারীতির এই অফুরন্ত সম্ভাবনা তখন তাতে শক্তিসঞ্চার করেছিল; তাঁর ছন্দের পরীক্ষা ও উদ্‌ভাবন দুর্লভ শক্তির পরিচায়ক—এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য শ্রীমতী সনজীদার বইখানি দ্রষ্টব্য—কিন্তু তাঁর ছন্দকীর্তি তাজমহলের মতই আশ্চর্য এবং নিঃসঙ্গ। সেখানে তাঁর সার্থক এবং ব্যাপক অনুবর্তন নেই।

প্রবন্ধটি এই বইগুলির পর্যালোচনাসূত্রে লিখিত—

বাংলার কবি। প্রমথনাথ বিশী। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ৪'০০ টাকা
কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়। শশিভূষণ দাশগুপ্ত। এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং। ৪'০০ টাকা
কবি মোহিতলাল। হরনাথ পাল। এস ব্যানার্জি অ্যাণ্ড কোং। ৫'০০ টাকা
কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার। ক্ষেত্র গুপ্ত। গ্রন্থনিলয়। ২'৭৫ টাকা
নজরুলচরিতমানস। সুশীলকুমার গুপ্ত। ভারতী লাইব্রেরী। ১০'০০ টাকা
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ। হরপ্রসাদ মিত্র। কথামালা প্রকাশনী। ৮'০০ টাকা
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সনজীদা খাতুন। ভারতী লাইব্রেরী। ৫'০০ টাকা

রবীন্দ্র-অভিধান। প্রথম খণ্ড। শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসু। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৬। ছয় টাকা।

রবীন্দ্র-রচনা-কোষ। প্রথম খণ্ড: প্রথম পর্ব। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব ও শ্রীবাসুদেব মাইতি। পরিবেশক ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলকাতা ৯। সাড়ে ছয় টাকা।

রবীন্দ্রশতবর্ষের উৎসব শেষ হল। এই একবৎসরব্যাপী উৎসব আলোকচিত্র, মাটির পুতুল এবং কবির পাণ্ডুলিপির প্রদর্শনীতে অথবা রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রপ্রতিভা-বিশ্লেষণী বক্তৃতামালা পরিবেশনেই শেষ হয়ে যায় নি। রবীন্দ্রনাথের জীবন কর্মসাধনা এবং সাহিত্যসাধনার আলোচনামূলক বহু বই এই এক বছরে প্রকাশিত হয়েছে। এসব বই শুধু বাংলায় লেখা হয় নি; হয়েছে ভারতের এবং বিদেশের নানা ভাষায়। এ ছাড়া কবির রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ প্রচারও শতবার্ষিক উৎসবের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে রচিত এই বইগুলি শতবার্ষিক উৎসবের স্থায়ী দান। বিদেশী কোনো লেখকের স্মরণোৎসব উপলক্ষ্যে এত বই প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানি না। সংখ্যার প্রাচুর্যের জন্যই সামগ্রিক বিচারে গুণের দিকটা কিছু খাটো হয়েছে; কতকগুলি বই প্রচারপুস্তিকার মতই দুদিন পরে হারিয়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তীকালের পাঠকদের জন্য অনেকগুলি বই বেঁচে থাকবে। এদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রসাহিত্যবোধক কয়েকটি রেফারেন্স বই।

রবীন্দ্ররচনার পরিমাণ বিপুল এবং বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। সাধারণ পাঠক তাই রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠের জন্য সহায়ক গ্রন্থ কামনা করে। বিদেশের খ্যাতনামা লেখকদের রচনা পাঠের সহায়ক হিসাবে এ জাতীয় বই অনেক প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বসূত্র, ব্যক্তির নাম, জায়গার নাম, কিংবা অপরিচিত কোনো তত্ত্বের উল্লেখ পাঠকের নিকট প্রায়ই রচনা উপভোগের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। লেখক ও পাঠকের মধ্যে কালের ব্যবধান যত বাড়ে এই জাতীয় সাহিত্যবোধক গ্রন্থের প্রয়োজন তত বেশি অনুভূত হয়।

ব্রাউনিং-সাইক্লোপিডিয়ার সংকলক বার্ডো এই শ্রেণীর সহায়ক গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "Up to its appearance there was no single book to which the reader could turn, which gave an exposition of the leading ideas of every poem, its key-note, the sources— historical, legendary or fanciful— to which the poem was due, and a glossary of every difficult word or allusion which might obscure the sense to such readers as had short memories or scanty reading"

কোনো লেখকের রচনা উপভোগের জন্য উপরোক্ত তথ্যগুলি জানবার সুযোগ পেলেই সাহিত্যবোধক গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বলা চলে। তবে রেফারেন্স গ্রন্থের দুটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এর সঙ্গে যোগ করতে হবে। প্রথমত, রেফারেন্স বই শুধু তথ্য পরিবেশন করবে, মত নয়; দ্বিতীয়ত, এই তথ্য সংক্ষেপে এবং একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে বিন্যাস করা আবশ্যক। সমালোচনা একটি বিশেষ মানসিকতার মাধ্যমে

পাঠককে সাহিত্যের পরিচয় দেয়। অপরপক্ষে সাহিত্যবোধক রেফারেন্স’ বই বুদ্ধিমান রুচিশীল পাঠককে রসোপলব্ধির জন্য আত্মনির্ভর হতে সহায়তা করে। সাহিত্যবোধক রেফারেন্স বই থাকলে পাঠককে সমালোচনা-গ্রন্থের অরণ্যে পথ হারাতে হয় না।

রবীন্দ্ররচনাবোধক আলোচ্য রেফারেন্স বই দুটিতে এই আদর্শ কতদূর সফল হয়েছে তা এখনো সম্পূর্ণরূপে বলা চলে না। কারণ দুটি বইয়েরই মাত্র একটি করে ভাগ বেরিয়েছে। সম্পূর্ণ বই পেলেই সামগ্রিক বিচার সম্ভব।

শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসু -সংকলিত ‘রবীন্দ্র-অভিধানে’র প্রথম খণ্ড আমরা পেয়েছি। সংকলক, তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন, ‘যতদূর সম্ভব প্রত্যেকটি গান গল্প কবিতা নাটক উপন্যাস প্রবন্ধ ও চরিত্রের আলোচনা করবো এই রকমই পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সমুদ্রের সব তরঙ্গ কে কবে ধরেছে। বাদ নিশ্চয়ই কিছু পড়েছে।’

বাদ কিছু-কিছু পড়েছে, কিন্তু সেগুলি হয়তো পাঠকদের চোখে পড়বে না। তবে সংকলক তাঁর অভিধানের ক্ষেত্র সংকুচিত করবার ফলে এর উপযোগিতা হয়তো কিছু কমেছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় যেসব নাম পূর্বসূত্র ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন তাদের টীকা দেওয়া হয় নি। ‘বন্দী বীর’ পড়ে কেউ যদি ‘অলখ নিরঞ্জনে’র অর্থ রবীন্দ্র-অভিধানে দেখতে চান তা হলে পাবেন না। আবার কিছু-কিছু তথ্য আছে যা পাঠক রবীন্দ্র-অভিধানে আশা করবেন না; যেমন, শ্রীঅরবিন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী অথবা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর পারিবারিক পটভূমিকা।

অনেকগুলি প্রসঙ্গই বেশ দীর্ঘ এবং বিস্তৃত করে লেখা। তার ফলে একমাত্র ‘অ’ অক্ষর দিয়েই একটি খণ্ড পূর্ণ হয়েছে। সবগুলি অক্ষর শেষ হলে অভিধানের আয়তন অত্যন্ত বৃহৎ হয়ে পড়বার আশঙ্কা আছে। সংক্ষেপে যথাযথ তথ্যটুকু সত্বর সংগ্রহ করবার সুযোগ না থাকলে রেফারেন্স বইয়ের উপযোগিতা হ্রাস পায়।

ভূমিকায় সোমেনবাবু বলেছেন, ‘অভিধানের কাজ অর্থ পরিস্ফুট করা— সমালোচনা নয়’। কার্যত অনেক ক্ষেত্রে এই আদর্শ রক্ষিত হয় নি। তিনি নিজে সমালোচনা না করলেও বিভিন্ন সমালোচকের মতামত এত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে কোনো কোনো প্রসঙ্গ সমালোচনাধর্মী হয়ে পড়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ‘অচলায়তন’ প্রসঙ্গটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অচলায়তন সম্পর্কে সুকুমার সেন, বিনায়ক সান্ন্যাল, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতামত উদ্ধৃত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ২৭শে অগ্রহায়ণের (১৩১৮) যে চিঠির অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে তা ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার উত্তর নয়; রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ডের ৫০৮ পৃষ্ঠার টীকা থেকে দেখা যায় যে আর্যাবর্তে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের আলোচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি ললিতকুমারকে লিখেছিলেন। সোমেনবাবু বলেছেন, অচলায়তন প্রথমে যদুনাথ সরকারকে উৎসর্গ করা হয়, কিন্তু “পরবর্তী মুদ্রণে আর উৎসর্গপত্র দেখতে পাওয়া যায় না।” রচনাবলীর অন্তর্গত অচলায়তনে উৎসর্গপত্রটি এখনও রয়েছে। অচলায়তন প্রথম কবে অভিনীত হয়েছিল এ তথ্যটি প্রায় এগারো পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ প্রবন্ধে পাওয়া যাবে না। অথচ নাটক সম্পর্কিত আলোচনায় এটি একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য।

সোমেনবাবুর কঠোর পরিশ্রমের পরিচয় পেয়ে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। তাঁর অভিধান থেকে ছাত্র

শিক্ষক ও সাধারণ পাঠক রবীন্দ্র-রচনা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। অনেকগুলি প্রসঙ্গ পৃথক প্রবন্ধের মত স্বয়ংসম্পূর্ণ।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব ও শ্রীবাসুদেব মাইতি -সংকলিত রবীন্দ্র-রচনা-কোষ ভিন্ন জাতের বই। এখানে রবীন্দ্র-রচনা সম্বন্ধে তথ্য বা ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। এটি হল রবীন্দ্র-রচনার ইন্‌ডেক্স। নির্ঘণ্টে সাধারণত বিষয় প্রসঙ্গ নাম ইত্যাদি স্থান পায়। কিন্তু এখানে 'রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার শিরোনাম ও প্রথম ছত্র, গানের প্রথম ছত্র, গল্প-প্রবন্ধের শিরোনাম, গল্প-উপন্যাস-নাটকে বর্ণিত পাত্রপাত্রীর নাম, সকল প্রকার রচনায় উল্লিখিত ব্যক্তি, স্থান, দেবদানব, বিশেষ বিশেষ বস্তু ও ঘটনা, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, হিন্দী, ইংরেজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশের উদ্ধৃতি, বেদ, উপনিষদাদির মন্ত্রাংশ, প্রবাদ-প্রবচনাদি, অর্থবোধক বিশেষ শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশ, কবির রচিত উদ্ভট শব্দ এবং তাঁহার জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও বিষয়াদি বর্ণানুক্রমিকভাবে রবীন্দ্র-রচনা-কোষের এই পর্বে সংকলিত হইয়াছে।'

রবীন্দ্র-রচনা-কোষ দুখণ্ডে সম্পূর্ণ হবে। প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে উপরে আভাস দেওয়া হল। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম খণ্ডের নির্বাচিত প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা ও টীকা থাকবে। এর ফলে পুনরুক্তি ঘটবে। প্রত্যেকটি খণ্ডের থাকবে কয়েকটি ভাগ বা পর্ব। আলোচ্য পর্বে স্বরবর্ণ শেষ হয়েছে। সুতরাং দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ বইএর আয়তন বৃহৎ হবে।

সংকলকদের পরিকল্পনা থেকে দেখা যায় তাঁরা একটি বইয়ের মধ্যে কন্‌করডান্স, কবিতার প্রথম লাইনের সূচী, বচনাভিধান, সাধারণ নির্ঘণ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যগুলি একত্র করতে চেয়েছেন। নানা বিষয়ের সংমিশ্রণ পাঠকের নিকট সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া আলোচ্য গ্রন্থে শুধু এইটুকু হদিশ পাওয়া যাবে যে, একটি প্রসঙ্গ রবীন্দ্র-রচনাবলীর কোথায় আছে। তার অতিরিক্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা পাবার জন্য আবার আর-একটা বই খুঁজতে হবে। দুটি খণ্ড একত্র করলে এবং প্রসঙ্গগুলির ব্যাখ্যা থাকলে আয়তন যেমন কমত তেমনি বইএর উপযোগিতাও বাড়ত। রবীন্দ্রনাথের কোন্ বইএর কোন্ পৃষ্ঠায় একটি প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে, শুধু এই নির্দেশটুকু পাবার জন্য খুব কম পাঠকই রেফারেন্স বইয়ের প্রয়োজন অনুভব করবেন।

অন্য জাতীয় রেফারেন্স গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য কিছু থাকলেও রবীন্দ্র-রচনা-কোষে সাধারণ নির্ঘণ্ট বা ইনডেক্সের লক্ষণই স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধগ্রন্থের নির্ঘণ্ট নেই, এটা পাঠকদের অনেক দিনের অভিযোগ। কিন্তু বই থেকে পৃথক করে নির্ঘণ্ট করা কতদূর যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে ভেবে দেখবার মত। সংস্করণ পরিবর্তনের সঙ্গে প্রসঙ্গটি অন্য পৃষ্ঠায় চলে যেতে পারে; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র-রচনাবলীর পঞ্চাশ হাজার ক্রেতা আলোচ্য পর্বের রচনা-কোষ থেকে সহায়তা পাবেন না।

নির্ঘণ্ট হিসাবে বিচার করলেও প্রসঙ্গনির্বাচন এবং তাদের বিন্যাস সম্বন্ধে ত্রুটি চোখে পড়বে। "The standard index entry describes its subject accurately, briefly and under the initial heading where the majority of people seeking it will most naturally look." ইন্‌ডেক্সের এই সংজ্ঞা মনে রেখে রচনা-কোষের পাতার উপর চোখ বুলালেই দেখা যাবে ইনডেক্সের মূলসূত্র সর্বত্র রক্ষিত হয় নি। 'আমি কোনোদিন পরীক্ষা দিইনি' 'আমি গান গাবার উদ্যোগ করেছিলুম' 'আমি চলেছি সমুদ্রপারে' 'আমি ছেলেদের ভালবাসি' ইত্যাদি বাক্যাংশ নির্ঘণ্টের অন্তর্ভুক্ত করায়

জায়গা বেশি লেগেছে এবং এজাতীয় নির্ঘণ্ট পাঠকদেরও বিশেষ কাজে আসবে বলে মনে হয় না। যথাক্রমে 'পরীক্ষা' 'গান' 'সমুদ্র' 'ছেলে' এই মূল প্রসঙ্গগুলি নির্ঘণ্টে থাকলেই যথেষ্ট হত বলে মনে হয়। 'আমি' দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যত বাক্য আরম্ভ করেছেন তার কতকগুলি রচনা-কোষে নেওয়া হয়েছে, এবং অন্যগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে, তার কারণ সংকলকরা দেন নি।

রবীন্দ্র-অভিধান এবং রবীন্দ্র-রচনা-কোষের সংকলকরা ব্যক্তিগত উদ্যমে যে বিরাট কাজের সূচনা করেছেন তার জন্য তাঁরা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। বাংলা ভাষায় সাহিত্যবোধক রেফারেন্স বই -সংকলনের ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন এঁরা। আশা করি, তাঁদের বই শীঘ্র সম্পূর্ণ হয়ে রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রচারে সহায়তা করবে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি-প্রণাম। বিশু মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, কলিকাতা ৭। পাঁচ টাকা।

কালপুরুষ। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -সম্পাদিত। গ্রন্থবিতান, কলকাতা ২৬। তিন টাকা।

শতাব্দী শতক [১৮৬১-১৯৬১]। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত -সম্পাদিত। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, কলকাতা ১২। চার টাকা।

দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০) তাঁর 'গোলাপগুচ্ছে'র "হারজিৎ" (১৩১৯) কবিতার নীচে একটি মন্তব্যে জানিয়েছিলেন, 'বঙ্গের নবীন কবিদিগের যিনি শিরোমণি ও নেতা, তাঁহার লেখার অনুকরণে এই কবিতাটি লিখিয়াছি।' বয়সে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কয়েক বছরের বড়। রবীন্দ্রনাথকে সে-কালের নবীন কবিদের শিরোমণি এবং নেতা হিসেবে চিনে নিতে তাঁর অসুবিধা হয় নি। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭) কিন্তু কটাক্ষ করে লিখেছিলেন—

না হয় না হবে মানে
রস চাই— কবিতার।
মিষ্টি হলে বেঁচে যাই
ভাবনা থাকে না আর
মাঝেতে ইংরাজী কথা
(জানা আছে কত দূর) · ·

'মানসী'র "নিন্দুকের প্রতি নিবেদন" লেখাটিতে এইসব আঘাতে জর্জরচিত্ত রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হয়েছিল—

কেন হীন ঘৃণা, ক্ষুদ্র এ দ্বেষ,
বিদ্রূপ কেন ভাই!
আমার এ লেখা কারো ভালো লাগে,
তাহা কি আমার দোষ?

কেহ কবি বলে (কেহ বা বলে না)—
কেন তাহে তব রোষ ?

সে লেখার তারিখ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮। তার বছর-তিনেক পরেই তখনকার 'সাহিত্যে' পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথ নিজে এগিয়ে এসে কাব্যবিশারদের 'মিঠেকড়া'র জবাব লিখেছিলেন। কালীপ্রসন্নের ব্যঙ্গবিদ্রূপের উত্তরে পাল্টা বিদ্রূপ নিক্ষেপ করবার সামর্থ্য ছিল তাঁর। তিনি জবাব দিয়েছিলেন—

বায়স কহিল হর্ষে, শোন পক্ষী সব
আম্রের মদিরা নিয়ে ওই যে ডাকিছে
উহু! উহু! শুনে ওর কুহু কুহু রব
আমার বায়স-প্রাণ ফাটিয়া যাইছে।

এ উক্তি স্বতঃস্ফূর্ত, স্বপ্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সেকালের সমকালীন কবি এবং পাঠক সকলেই যে একসঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, তা নয়। পাঠকের পক্ষেও সামর্থ্যের ত্রুটি ছিল, লেখকদের দিকেও সমকালীনতার বাধা ছিল। কালীপ্রসন্নই একমাত্র প্রতিবাদী ছিলেন না। তাঁর কথা দিয়ে বিরোধী ধারার আলোচনা শুরু করলে একে একে অনেকের নাম মনে আসতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলাল, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি একাধিক বিরোধী ছিলেন। গল্পরচনার বিরুদ্ধ সমালোচনায় নেমেছিলেন প্রসিদ্ধ বিপিনচন্দ্র পাল। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে সে-প্রতিবাদের প্রতিবাদ লিখতে হয়েছিল। বড় শক্তিকে এরকম অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হয়। মানুষের মন এক বিস্ময়। এসব ক্ষেত্রে মন সত্যিই বরণে অপেক্ষাকৃত বিমুখ, কিন্তু বিরোধে তার যেন আগ্রহের অন্ত নেই! কবিমনের স্বরূপ জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আরো কিছুদিন পরে তাঁর 'ক্ষণিকা'য় লিখেছিলেন—

কাব্য প'ড়ে যেমন ভাবো
কবি তেমন নয় গো।

তার পর, আরো ষাট-বাষট্টি বছর কেটে গেল। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত অথবা রবীন্দ্র-সম্পর্কিত অথবা ১৮৬১ থেকে ১৯৬১—এই শতবর্ষের মধ্যে লেখা নানা কবির কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশের উদ্যম এখন নিঃসন্দেহে অবাধ। অবাধ এবং স্বাভাবিক। রবীন্দ্র-বিরোধের কথা একালেও যে পুরোপুরি অনুপস্থিত তা নয়। তবে, সে অন্য ভূমিকায়, অন্য অর্থে। বিশু মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'কবি-প্রণাম' বইখানিতে যথাক্রমে 'বন্দনা' 'সংগীত' এবং 'বিলাপ'—এই তিন বিভাগে রবীন্দ্র-প্রতিভার উদ্দেশে নিবেদিত এক শ পঞ্চাশজন কবির কবিতা-সংগ্রহের ভূমিকায় সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একাশি জন কবির কবিতা-সংগ্রহ 'কালপুরুষ' সম্পাদনা করে ভূমিকায় জানিয়েছেন যে, এর আগেও রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত বাংলা কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, সাধারণতঃ সেসব সংকলনে কবি-রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশেই শ্রদ্ধা-প্রীতি-বন্দনার ভাব ব্যক্ত হত। আর, 'আজিকের তরুণ কবিরা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মুগ্ধ, সন্দেহ নেই ; কিন্তু কবিতার বাইরেও যে তাঁর প্রতিভার অন্য আশ্রয় এবং উপকরণ আছে, এজন্যও তাঁরা গভীর আনন্দ অনুভব করেন।' তা ছাড়া আগেকার সংকলনে একালের অবশ্যস্বীকার্য প্রতিনিধিস্থানীয় অনেক কবিই অনুপস্থিত ছিলেন। অতএব একালের নতুন সংকলনের প্রয়োজন মানতেই হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত -সম্পাদিত 'শতাব্দী শতক'এর ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্র-

নাথের জন্মকাল থেকে ধরে পরবর্তী একশ বছর— অর্থাৎ মধুসূদন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত— বাংলা কবিতার ধারাটি যে নানা সমৃদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্যের চিহ্নে চিহ্নিত, তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রজন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষে তাই তাঁরা এই সংকলন প্রকাশ করেছেন। সম্পাদকদের নিজেদের কথায়, 'মধুসূদন থেকে আধুনিক কালের তরুণতর কবি পর্যন্ত কত বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল তার পরিচয়ের অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক,'— এবং 'একটি মাত্র সংকলন গ্রন্থে কোনো সময়ে সমস্ত কৃতী কবিকে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না ; সম্পাদককে এক জায়গায় এসে থামতেই হয়'। এই অনিবার্য অসম্পূর্ণতার কথা এই তিনখানি গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন সম্পাদক সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। তিনখানি তিন রকমের সংকলন। 'শতাব্দী শতক' স্পষ্টভাবে পৃথক শ্রেণীর ; 'কবি-প্রণাম' এবং 'কালপুরুষ' কতকটা সমশ্রেণীর হলেও দুয়ের মধ্যে আপেক্ষিক প্রকৃতিভেদ আছে। প্রথমোক্ত বইয়ে মধুসূদন, বিহারীলাল, বলদেব, সুরেন মজুমদার ইত্যাদি সেকালের কবিরা তো আছেন,— একালে, ১৯৩৩ সালে যাঁরা জন্ম গ্রহণ করেছেন, এরকম তিনজন কবিও আছেন। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, হেমেন্দ্রকুমার আর হেমেন্দ্রলাল রায় এবং আরো কয়েকজনের জায়গা হলে ভালো হত। তবে, স্থান-সংকোচের কথা সম্পাদকের স্বীকৃতিতেই সূচিত। অতএব সে-বিষয়ে কোনো তীব্র অনুযোগ অবান্তর। 'কালপুরুষ' এবং 'কবি-প্রণাম' দুখানি সংগ্রহেরই লক্ষ্য অন্যরকম। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে লেখা কবিতা সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে এই দুখানি বইয়েতেই, 'শতাব্দী-শতকে তা নয়। 'কবি-প্রণাম'এর আসর দরাজ। তাতে প্রসিদ্ধ-অনতিপ্রসিদ্ধ সব রকম কবিই আছেন। অন্যক্ষেত্রে যাঁদের নাম আছে, কিন্তু কবি হিসেবে যাঁরা বিশেষ পরিচিত নন, এমন অনেক রবীন্দ্রভক্তেরও জায়গা আছে এই সম্মিলনে। বইখানির তিন বিভাগে যথাক্রমে 'সপ্তপর্ণতরুতলে বন্দনারত রবীন্দ্রনাথ' 'সংগীতরত রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ' এবং 'সপ্তপর্ণতরুলের শূন্য বেদিকা'— এই তিনখানি আলোকচিত্র এবং তা ছাড়া সুরম্য মলাটের উপর রবীন্দ্রনাথের রঙিন প্রতিকৃতি ছাপা হয়েছে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু ইত্যাদি কয়েক-জনের রচনা কতকটা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বললে ভুল হবে না। তেমনি 'কালপুরুষ'এর সতীশচন্দ্র রায়ের 'শান্তিনিকেতন'ও উল্লেখযোগ্য। নানা কবি নানা কথা বলে গেছেন, বলছেন, বলবেনও। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্রে রেখে 'কালপুরুষ' এবং 'কবি-প্রণাম' দুখানি সংকলনই এইদিক থেকে এক কবিতা-সমারোহের ধারণা জাগিয়ে তোলে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজে কবি, তাঁর নির্বাচনে প্রশংসনীয় রুচির ছাপ পড়েছে। বিশু মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রিয় সাহিত্যিক, তাঁর ঢালাও আসরের আমন্ত্রণে অনেকেই যোগ দিয়েছেন, 'মুখবন্ধে' অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের 'বহুমুখী প্রতিভায় মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক উদ্ভাসিত হয়েছে বলে কবি সাহিত্যিক সংগীতকার রাজনীতিক শিক্ষাবিদ্ সমাজসংস্কারক ও ধর্মগুরু সকলেই সাগ্রহে এ সমারোহ-উৎসবে যোগদান করেছেন।' আর 'শতাব্দী-শতকে' দুইই আছে— তরুণ কবি আনন্দ বাগচীর কবিতায় যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছে, বাকি অধিকাংশ রচনাতেই তেমনি অন্যান্য প্রসঙ্গ বিদ্যমান।

একই উপলক্ষ্যে এই তিনখানি কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হওয়া সত্যিই তৃপ্তিকর ব্যাপার।

হরপ্রসাদ মিত্র

স্বরলিপি

আমি আশায় আশায় থাকি।
আমার তৃষিত আকুল আঁখি॥
ঘুমে-জাগরণে-মেশা প্রাণে স্বপনের নেশা—
দূর দিগন্তে চেয়ে কাহারে ডাকি॥
বনে বনে করে কানাকানি অশ্রুত বাণী,
কী গাহে পাখি।
কী কব না পাই ভাষা, মোর জীবন রঙিন কুয়াশা
ফেলেছে ঢাকি॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

সা সা II সা -া সন্ -সা । রা -সা -রা -সা I রা -পা -া -া । -া -া -া -া I
আ মি আ ০ শা০ য়্ আ ০ ০ ০ শা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I মা -ধপা মা -জ্ঞা । -া -া মা মা I {মা -া মা -পা । পা -া পা -া I
থা ০ কি ০ ০ ০ আ মার্ তৃ ০ ষি ০ ত ০ আ ০

I -পা -ধা -ণা -র্সা । -ধা -র্সা র্সণা ণা I পধা -া পা -া । (পা -ধা মা -া)} I
০ ০ ০ ০ ০ ০ কু ল আঁ০ ০ খি ০ আ ০ মার্

I -পধা -মা মজ্ঞা -রা II
০০ ০ কা০ র্

-া -া II {মা -া পা -া । ণা২ -পা না -া I না -া র্সা -র্রা । না -া র্সা -া I
০ ০ ঘু ০ মে ০ জা ০ গ ০ র ০ ণে ০ মে শা ০ ০

I মা -া মা -পা । পা -া পা -া I পা -ধা ণা -র্সা । র্সণা -ণধা পা -া} I
প্রা ০ ণে ০ স্ব ০ প ০ নে ০ র ০ নে ০ শা ০

I র্রা -া -া জ্জ্ঁা । র্রা -া জ্জ্ঁা -া I র্রা -র্সা র্সা -া । -া -া -া -া I
দূ ০ র্ দি গ ন্ তে ০ চে ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -র্রা র্সর্সা -না । না -া না -র্সা I র্সা -া -া -া । -া -া -া -া I
কা ০ হা ০ রে ০ ডা ০ কি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -র্রা -জ্জ্ঁা জ্জ্ঁা । র্রা -া র্রা -র্মজ্জ্ঁা I র্রা -া র্সা -া । -া -া -া -া I
দূ ০ র্ দি গ ন্ তে ০ চে ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -র্রা র্সণা -া । ধা -পা মা -ধপা I মা -জ্ঞা -া -া । -া -া রা -সা II
কা ০ হা০ ০ রে ০ ডা ০ কি ০ ০ ০ ০ ০ কা র্

-া -া II {ধা -া ণা -া । ধা -া ধা -র্সা I ণা -া ণা -া । ধা -া পা -া I
০ ০ ব ০ নে ০ ব ০ নে ০ ক ০ রে ০ কা ০ না ০

I পধা -া -মা -া । পা -া -া -া I পর্সা -া -া -া । ণা -ধা পা -া I
কা ০ ০ ০ নি ০ ০ ০ অ ০ ০ ০ শ্রু ০ ত ০

I মা -া -ধপা -মপা । মা -জ্ঞা -া -া I জ্ঞা -া -া -া । রা -া সা -া I
বা ০ ০০ ০০ নী ০ ০ ০ কী ০ ০ ০ গা ০ হে ০

I সরা -া -ন্‌া -া । সা -া -া -া} I {মা -া -পা -া । না -া না -া I
পা ০ ০ ০ খি ০ ০ ০ কী ০ ০ ০ ক ০ ব ০

I না -া -া -া । র্সা -া -র্রা -া I র্সা -া -না -া । র্সা -া -া -া I
না ০ ০ ০ পা ০ ০ ই ভা ০ ০ ০ ষা ০ ০ ০

I -া -া -া -া । মা -া -া -গা I মা -া -পা -া । ধা -া ধা -মা I
০ ০ ০ ০ মো ০ ০ র্ জী ০ ০ ০ ব ০ ন ০

I ধা -া ণা -া । র্সা -া র্সা -া I ণা -ধা -র্সণা -ধা । পা -া -া -া I
র ০ ঙি ০ ন ০ কু ০ য়া ০ ০০ ০ শা ০ ০ ০

I পর্সা -া ণা -ধা । পা -ধা মা -ধপা I মা -জ্ঞা -া -া । -া -া রা সা II II
ফে০ ০ লে ০ ছে ০ ঢা ০ কি ০ ০ ০ ০ ০ "আ মি"

সম্পাদকের নিবেদন

গত এক বৎসরকাল দেশে ও বিদেশে রবীন্দ্রশতপূর্তি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবীন্দ্রশতবার্ষিক-উৎসবসমাপ্তি উপলক্ষে বিশ্বভারতী পত্রিকার এই সংখ্যা রবীন্দ্রপ্রসঙ্গের বিভিন্ন আলোচনা দ্বারা ভূষিত করে বর্ধিত কলেবরে প্রকাশ করা হল।

এই সংখ্যার উদ্‌বোধন করা হল রবীন্দ্রনাথের প্রথম-প্রকাশিত প্রবন্ধ দিয়ে— 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী'। এই রচনাটি এখনও কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার ১২৮৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা থেকে রচনাটি এখানে উদ্ধার করা হল। রচনাটি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ এই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন -লিখিত 'অগ্রদূত' শীর্ষক প্রবন্ধে আছে।

গত সংখ্যায় আমরা রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম ও ষষ্টিতম বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক আয়োজিত কবিসংবর্ধনার বিবরণ পত্রস্থ করেছি। বর্তমান সংখ্যায় আর-একটি তথ্য পরিবেশন করা হল। রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি-উৎসব' উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের 'আশ্রমবাসিবৃন্দ' ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ তারিখে শান্তিনিকেতনে কবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। সেই উৎসবের দুষ্প্রাপ্য অনুষ্ঠানপত্রটি সংরক্ষণের উদ্দেশে তার প্রতিলিপি মুদ্রিত হল; উক্ত উৎসব উপলক্ষে পূর্বদিন শান্তিনিকেতনে রাজা নাটক অভিনীত হয়, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা -সহ তার দুষ্প্রাপ্য অনুষ্ঠানসূচীর প্রতিলিপিও আমরা মুদ্রিত করলাম।

এই সঙ্গে আমরা দুজন রবীন্দ্রসমসাময়িক রবীন্দ্র-অন্তরঙ্গের কথা স্মরণ করলাম। কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২) ও ডাক্তার নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩) সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশ করে তাঁদের প্রতি শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হল।

—

স্বীকৃতি

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উৎসবে 'অর্ঘ্যাভিহরণ'এর অনুষ্ঠানপত্র ও রাজা নাটকের অনুষ্ঠানসূচী এবং চীনযাত্রার পূর্বে জাহাজঘাটায় রবীন্দ্রনাথ ও নীলরতন সরকার আলোকচিত্রদ্বয় শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

রবীন্দ্রনাথের পত্র ও 'বিচিত্রা'র আমন্ত্রণলিপি শ্রীসুকুমার বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের আলোকচিত্র তাঁর কন্যা শ্রীসুনীতি দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ির আলোকচিত্র শ্রীঅনিল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'বিচিত্রা'-গৃহের ও পাথুরিয়াঘাটা-ঠাকুরবাড়ির আলোকচিত্র শ্রীবীরেন্দ্র সিংহ -কর্তৃক গৃহীত।

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বর্ষসূচী

অষ্টাদশ বর্ষ । শ্রাবণ ১৩৬৮ - আষাঢ় ১৩৬৯

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

অষ্টাদশ বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৬৮ - আষাঢ় ১৩৬৯ : ১৮৮৩-৪ শক

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী